রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস

পম্পা মজুমদার

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা ৯ ॥ কলিকাতা ২৯

RABIND A SAMASKRITIR BHARATIYA RUP O UTSA

By Pampa Mazumdar.

প্রকাশ ১০ শ্রাবণ ১৯৬০

প্রকাশক শ্রীশকুমার কুণ্ড

জি জ্ঞা সা

১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ২৯

৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

'জিজ্ঞাসা' প্রকাশন বিভাগ : ১এ, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর : সুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার

শ্রীগোপাল প্রেস

১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা ৪

যে ভারতপথিকেরা

যুগে যুগে এই ভারতের পথপরিক্রমা করেছেন

এবং

যাঁরা ভবিষ্যতে এই পথের পথিক হবেন

তাঁদের উদ্দেশে

এই গ্রন্থ উৎসর্গ করলাম।

যথার্থ পুরাতন ভারত, যে ভারত চিরনূতন— যে ভারতের বাণী, আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি— তাকেই আমি চিরদিন ভক্তি করেছি। আর সব শেষে যদি বলতে হয় তবে বলতে হবে তা হলে বুঝবে আমার চিত্ত সেই ভারতের অধিবাসী— এই মহাভারতের ভৌগোলিক সীমানা। না ... ।

—রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

তরুণ লেখিকা শ্রীমতী পম্পা মজুমদার তাঁর এই গ্রন্থের জন্য একটি ভূমিকা লিখে দেবার অনুরোধ জানিয়েছেন। আমি সানন্দে সম্মত হয়েছি। তার বিশেষ কারণ আছে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমি যখন রবীন্দ্র-অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে বিশ্বভারতীতে যোগ দিই তখনই আমি দুটি গ্রন্থের পরিকল্পনা নিয়ে কাজে অগ্রসর হই— রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ও ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ। প্রথমটির উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজীবনের আদিপর্বে, যে পর্বের রচনাবলী এখন 'অচলিত' বলে চিহ্নিত সে পর্বে কবির মনো-বিকাশের ও তৎকাল-রচিত সাহিত্যের বিশদ পরিচয় দেওয়া। আর দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথ কিভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিকে স্বাঙ্গীকৃত করে তাকে নবরূপে জন্মান্তরিত করলেন তার পরিচয় দেওয়া। নানা কর্তব্যের তাড়নায় ও প্রতিবন্ধকতায় এ দিকে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয় নি। ফলে দুটি কাজই অর্ধপথে স্তব্ধ হয়ে যায়। তাই আশায় ছিলাম যদি কোনো যোগ্য ছাত্রের সন্ধান পাই তবে তাদের দিয়েই নিজের অপূর্ণ সংকল্পকে পূর্ণতা দান করা যাবে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবর্ষ-উৎসবের সময় পূর্বতন সংকল্পের প্রেরণায় আবার যখন নূতন করে কাজে ব্রতী হই প্রায় সে সময়েই তরুণ অধ্যাপিকা শ্রীমতী পম্পা আমার কাছে এলেন রবীন্দ্রসাহিত্য-গবেষণার অভিপ্রায় নিয়ে। তাঁর মেধা ও জ্ঞাননিষ্ঠার পরিচয় পেতে বিলম্ব হল না। দেখলাম বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে, বিশেষতঃ রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় যথেষ্ট ব্যাপক ও গভীর, অধিকন্তু সংস্কৃত ভাষা আর সাহিত্যের উপরেও তাঁর অধিকার বেশ প্রশংসনীয়। বাংলায় এম. এ. পাশ-করা ছাত্র বা অধ্যাপকের পক্ষে এটা একটা দুর্লভ গুণ। তাই আশান্বিত হয়ে তাঁর উপরেই রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ নিয়ে গবেষণার ভার দিলাম। কিন্তু নিজের যোগ্যতার প্রতি সন্দিহান হয়ে তিনি এই দুঃসাধ্য কাজের ভারগ্রহণে সাহসী হলেন না। কিন্তু আমারও এ সুযোগ ছাড়তে ইচ্ছা হল না। ফলে আমার কাছে নিরন্তর উৎসাহ ও প্রবর্তনা পেয়ে অবশেষে তিনি এ কাজে ব্রতী হলেন। কিন্তু এ বিষয়ে প্রধান অন্তরায় হল ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব, আর এটাই ছিল তাঁর প্রাথমিক কুণ্ঠার মূলকারণ। তাই ভারতসংস্কৃতির স্বরূপ ও রবীন্দ্র-মানসের সঙ্গে তাঁর নিগূঢ় সম্পর্কের কথা অর্থাৎ ভারতসংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে রবীন্দ্র-সংস্কৃতি কিভাবে ধীরে ধীরে গঠিত ও বিকশিত হয়ে উঠল সে ইতিহাস তাঁকে দীর্ঘ কাল ধরে বিশ্লেষণ করে বোঝাতে হয়েছে। আমার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় নি।

এ সময়ে তাঁর প্রখর বুদ্ধি, দুর্লভ স্মৃতিশক্তি ও সনিষ্ঠ জ্ঞানস্পৃহার পরিচয় পেয়ে আমি যেমন মুগ্ধ হয়েছি তেমনি আনন্দিত হয়েছি তাঁর অনায়াস প্রকাশভঙ্গি ও সাবলীল রচনাকুশলতা দেখে। আর আশান্বিত হয়েছি তার ক্লান্তিহীন অধ্যবসায়ের পরিচয় পেয়ে। তাঁর মনেও সমস্ত কুণ্ঠা কেটে গিয়ে দেখা দিল আনন্দ ও উৎসাহ।

প্রথমেই আরম্ভ হল রবীন্দ্রসাহিত্য মন্থন করে ভারতীয় উপাদান সংগ্রহ ও তার উৎস নিরূপণের দুঃসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ কাজ। এ কাজেও তাঁর নিপুণতার অভাব দেখা গেল না। এক দিকে বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্য আর অন্য দিকে অগাধ সংস্কৃত সাহিত্য, এই দুই সমুদ্রে অবগাহন করে তিনি মাঝে মাঝে এমন সব বস্তু আহরণ করতে লাগলেন যা আমার জানা ছিল না আর যার সন্ধান পেয়ে আমি শুধু বিস্মিত নয়, উপকৃতও হয়েছি। শুধু সংস্কৃত নয়, পালি ও মধ্যযুগীয় সন্তসাহিত্য তথা বৈষ্ণব-বাউল পদাবলীও তাঁর বিচরণক্ষেত্রের পরিধিভুক্ত হল। এভাবে তিনি তার অদম্য তরুণ শক্তি ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা নিয়ে যে দুঃসাধ্য সাধন করেছেন, আমার পক্ষে এই পরিণত বয়সে বহুমুখী কর্তব্যের আকর্ষণে বিক্ষিপ্ত চিত্ত নিয়ে তা করা সম্ভব হত না।

শুধু তথ্যসংকলনে নয়, নবনব তথ্যের তাৎপর্য অনুধাবনেও তিনি যে ক্ষিপ্র বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তাও কম কৃতিত্বের কথা নয়। এভাবে তথ্যসংকলনের কাজ যখন সমাপ্ত হল তখন তাদের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক বিশেষ প্রকৃতি কথা স্বতঃই উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তাকেই বলা যায় রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লেখিকা তা [illegible] করেছেন। এ ক্ষেত্রে যে স্বচ্ছ দৃষ্টি, সংযত বিচারবুদ্ধি ও বলিষ্ঠ রচনানৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে তা যে কোনো প্রতিভাবান্ নবীন লেখকের পক্ষে শ্লাঘনীয়। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রমাণ [illegible] যে, ভারতসংস্কৃতিকে রবীন্দ্রনাথ কোন দৃষ্টিতে দেখেছেন, কিভাবে তাকে তিনি আধুনিক কালের কাছে উপস্থাপিত করেছেন, কিভাবে তাকে নিজস্ব রূপ দিয়ে [illegible] অথচ যে তার পরিচয়টুকু দিতেই ব্যস্ত হয়েছেন। রবীন্দ্রচিন্তার বিশ্লেষণে যথাসম্ভব অনুসরণের চেষ্টাও তিনি করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ও চিন্তার সমালোচনা বা বিচার করতে গিয়ে নিজের চিন্তা দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে আচ্ছন্ন করে ফেলেননি। এক কথায়, তাথ্যিকতাই এই গ্রন্থের আসল বৈশিষ্ট্য, আত্মিকতা নয়। অধিকাংশ রবীন্দ্রগবেষণা-গ্রন্থের প্রধান দুর্বলতা এখানেই। এসব গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথকে যতখানি পাওয়া যায় তার চেয়ে বেশি পাওয়া যায় লেখককে। বর্তমান গ্রন্থের লেখিকা এ বিষয়ে যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন আধুনিক কালে তা খুবই দুর্লভ। তা ছাড়া

রবীন্দ্রনাথকে আংশিকভাবে উপস্থাপিত করলে স্বভাবতঃই নিজের চিন্তা দিয়ে ফাঁক পূরণের প্রবণতা দেখা দেয়। সামগ্রিকভাবে উপস্থাপিত করলে নিজের চিন্তা যোজনার ক্ষেত্র স্বতঃই সংকুচিত হয়ে আসে। বর্তমান গ্রন্থেও তাই হয়েছে। অবশ্য এ কথা সত্য যে, নিজের ছায়া বর্জন ক'রে যেমন কেউ চলতে পারে না তেমনি কোনো লেখকের পক্ষেই নিজেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা সম্ভব নয়। কিন্তু মধ্যাহ্ন-আলোর ন্যায় সত্যের পূর্ণ আলোতেও নিজের ছায়া পায়ের কাছে প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসে। সত্যনিষ্ঠ গবেষক ও সমালোচকের পক্ষে এটাই আদর্শ। সুখের বিষয় বর্তমান গ্রন্থে এই আদর্শ অনুসরণেরই প্রয়াস দেখা যায়।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের গুরুত্ব স্বতঃপ্রকাশ। যিনি একটু মন দিয়ে এই খণ্ডের তথ্যসম্ভার তথা তার সংকলন ও বিন্যাস-প্রণালী অনুধাবন করবেন তিনি অনায়াসেই উপলব্ধি করবেন এরকম একখানি সংকলনগ্রন্থ রচনা করতে জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসার কতখানি বিস্তার, কি গভীর নিষ্ঠা ও অশ্রান্ত অধ্যবসায় আর সর্বোপরি কেমন সত্যাশ্রয়ী ভাবকল্পনার প্রয়োজন। এরকম একটি সংকলনগ্রন্থই যে কোনো গবেষককে সাহিত্যজগতে স্থায়ী মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আর এই দ্বিতীয় খণ্ডের সুদৃঢ় ও প্রশস্ত ভিত্তিভূমির উপরে রচিত মূলগ্রন্থখানি (প্রথম খণ্ড) দীর্ঘকাল লেখিকার স্মরণীয় কীর্তিরূপে বিরাজ করবে, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। গবেষণার এরকম আদর্শ পাশ্চাত্য দেশে বিরল নয়। কিন্তু আমাদের দেশের অনায়াস কীর্তিলুব্ধ তরুণ গবেষক [illegible] এজাতীয় আদর্শকে শ্রমসাধ্য ও দুরধিগম্য আখ্যা দিয়ে সযত্নে পরিহার করেন ও সহজপ্রাপ্য সন্ধানেই তৎপর হন। বর্তমান লেখিকা যে এই সহজপন্থার ধারা অনুসরণ করেননি তা শুধু প্রশংসার বিষয় নয় [illegible] বিষয়ও বটে। [illegible] এরূপ এক কঠিন পথের অভিযাত্রী হতে পারে কে না।

একথা [illegible] বলছি না যে, এ গ্রন্থে কোথাও [illegible] বিচক্ষণ পাঠকের [illegible] ছিদ্র বা ত্রুটি ধরা পড়বে না। কিন্তু এ কথা [illegible] স্বীকার করবেন যে, এ গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা গুণসম্পদের তুলনায় [illegible] নিতান্তই উপেক্ষণীয়। তাই [illegible] পারি যে, আধুনিক [illegible] গবেষকের নাম যখন বিস্মৃতিতে লুপ্ত [illegible] গবেষণার [illegible] যখন নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে তখনও এই গ্রন্থের মর্যাদা হ্রাস পাবে না। রবীন্দ্রপ্রতিভার অনুপম আদর্শ ও আকর্ষণীয় রূপ [illegible] গবেষকদের পথ দেখাবে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যদি কোনো উৎসাহী গবেষক রবীন্দ্রসংস্কৃতির পাশ্চাত্য উৎসের স্বরূপসন্ধানে ব্রতী হন তা হলে রবীন্দ্রনাথকে পূর্ণতর রূপে জানা সহজ হবে।

পরিশেষে সানন্দে জানাচ্ছি, ছাত্রের কৃতিত্বেই শিক্ষকজীবনের চরিতার্থতা। আমার ছাত্রী শ্রীমতী পম্পার এই অসামান্য কৃতিত্বে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। তা ছাড়া এই গ্রন্থের দ্বারা তিনি আমার পূর্বতন অপূর্ণ পরিকল্পনাকে অনেকাংশে পূর্ণ করলেন, এটা আমার পক্ষে কম পরিতোষের বিষয় নয়। আশীর্বাদ করি তাঁর সুফলপ্রসূ লেখনী নব-নবতর কৃতিত্বের পথে চালিত হয়ে শিক্ষকের শিক্ষাদানকে আরও সার্থক করে তুলুক।

'রুচিরা'
শান্তিনিকেতন

প্রবোধচন্দ্র সেন

লেখিকার নিবেদন

বৈদিক ঋষি তথা ব্যাসবাল্মীকি ও কালিদাসের রচনায় ভারতভারতের আত্মা ধরা দিয়েছে, এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত। আর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি এঁদেরই উত্তরসাধক। তাঁর রচনাতে ভারতীয় ভাবধারা যেন যথার্থ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। তাই কারও মতে 'He is the greatest Indian of history', কেউ বা বলেছেন 'He is India'। অর্থাৎ ভারতসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা বা প্রতিনিধি তিনিই। ভারতীয় ভাবধারাকে তিনি এক দিকে যেমন সার্থকভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন, অপর দিকে তেমনি এই ধারা তাঁর নব-নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার কিরণসম্পাতে উদ্ভাসিত হয়ে নূতন রূপ ধরেছে তাঁর সৃষ্টিতে। বস্তুতঃ তাঁকে বলা যায় যথার্থ 'স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি'।

এই ভারত-আত্মার স্বরূপ যে কি যথাস্থানে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এ স্থলে সংক্ষেপে বলা যায়, মানবচৈতন্যের মধ্যে বিশ্বাভিমুখী মিলনের সাধনাই ভারত-আত্মার সাধনা এবং এই অভিপ্রায়সিদ্ধির মূল পন্থা প্রীতি বা মৈত্রীভাবের বিস্তার। এই প্রীতি ও বিশ্বানুভূতির পথে যুগে যুগে ভারতীয় সাধকের সাধনার ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। সন্ত কবীর এই 'ভারতপথ'-এর পথিক রূপে আপনার পরিচয় দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই আখ্যায় ভূষিত করেন রাজা রামমোহনকে। আর আধুনিক কালে 'ভারতপথের গান' রচয়িতা কবি রবীন্দ্রনাথকে এই 'ভারতপথের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপথিক' বলা চলে। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' তিনি বিশ্ববাসীকে মেলাতে চেয়েছেন। কেননা তাঁর মানসলোক উজ্জ্বল করে ফুটে রয়েছে সংস্কৃতি-চেতনাময় ভারতবর্ষের এই চিরন্তন সাধনার রূপ এবং তা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর জীবনব্যাপী বাণীসাধনায়। তাঁর সাহিত্যে তাই ভারতসংস্কৃতির এই মূল কথাটি বিচিত্র সুরসমবায়ে পুনঃপুনরাবৃত্ত ধ্রুববাণীরূপে ধ্বনিত হয়েছে। ভারতসংস্কৃতির এই চিরাগত ধ্রুববাণীর প্রকাশ ঘটেছে নানা যুগে নানা রূপে। কিন্তু তার সর্বাঙ্গীণ ও সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রসাহিত্যে। আর তা দেখা দিয়েছে নূতন প্রাণে প্রাণবন্ত ও নূতন শক্তিতে ক্রিয়াশীল হয়ে।

যে মূল উপাদানগুলিকে আশ্রয় করে রবীন্দ্রচিত্ত ভারতসংস্কৃতির এই বিচিত্র রূপকে আপনার করে গ্রহণ করেছে, যার ফলে তিনি নিজেকে চিরন্তন 'মহাভারতের অধিবাসী' ('চিঠিপত্র' ৯, পত্র-২০) বলে পরিচয় দিয়েছেন, সেই মূল উপাদানগুলির

স্বরূপসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ ভারতসংস্কৃতির যে চিরন্তন উপাদান-গুলির ভিত্তিতে রবীন্দ্রসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার স্বরূপ না জানলে রবীন্দ্রমানসের যথার্থ পরিচয়টি পাওয়া যায় না। তাঁর তিরোধানের পর বহু বৎসর বিগত হয়েছে। কিন্তু এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে ভারতসংস্কৃতির মূল উপাদানগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের যোগাযোগ সম্বন্ধে কোনো সর্বাঙ্গীণ আলোচনা হয় নি। বিচ্ছিন্নভাবে যা কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে সেগুলিও উপকরণনির্দেশসম্বলিত তথ্যভিত্তিক আলোচনা নয়। অথচ রবীন্দ্রনাথের মানসপ্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করতে গেলে প্রতি পদেই এইজাতীয় কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়।

প্রায় দশ বৎসর পূর্বে বিশ্বভারতীর তদানীন্তন রবীন্দ্র-অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এই প্রয়োজনের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁরই প্রবর্তনায় আমি এই গবেষণায় প্রবৃত্ত হই। এই গ্রন্থের পরিকল্পনা ও নামকরণ থেকে শুরু করে প্রত্যেক পদক্ষেপেই তিনি আমার পথনির্দেশ করেছেন। তাঁর উপদেশ-নির্দেশ ব্যতীত এই গ্রন্থরচনা আমার পক্ষে সম্ভবপর হত না।

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় উপাদান নিরূপণ করার যে প্রয়াস পেয়েছি সে সম্বন্ধে বলতে হয়, এই কাজে বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের প্রয়োজন। কিন্তু তা সহজসাধ্য নয়, স্বল্পকালসাধ্যও না। তাই নিজ শক্তিসীমার প্রতি দৃষ্টি রেখে আলোচ্য বিষয়ের একটা নির্দিষ্ট পরিধি মেনে নিতে হয়েছে। নীচে এই পরিধির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

পরিধি-নির্দেশ

ভারতসংস্কৃতি রবীন্দ্রমানসকে কতদূর অধিকার করেছিল তার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দেওয়া এই গ্রন্থের লক্ষ্য নয়। তা ছাড়া 'সংস্কৃতি' শব্দটিও অতি ব্যাপক। সংস্কৃতি বলতে বোঝায় কোনো ব্যক্তি বা জাতির সর্বাঙ্গীণ চিত্তোৎকর্ষ। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের নির্দিষ্ট পরিসরে এই বৃহৎ বিষয়ের বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই। এই আলোচনার জন্য যে প্রতিভার প্রয়োজন তাও আমার নেই। তাই প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্য থেকে যে উপাদানগুলি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন, শুধু সেইগুলি সংকলন ও যথাসম্ভব তার উৎস নির্ণয় এবং পৌর্বাপর্য বজায় রেখে সেগুলিকে কালক্রম অনুযায়ী সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল ভাবে উপস্থাপিত করা, আর তার থেকে রবীন্দ্র-মানসের যে রূপটি স্বতঃই ফুটে ওঠে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া, এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে বর্তমান গ্রন্থ রচিত।

এই উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখে গ্রন্থটিকে দুটি খণ্ডে বিভক্ত করেছি। ভারতসংস্কৃতির যেসব উপাদান রবীন্দ্রভাবনার প্রধান অবলম্বন, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সেগুলিকে যথাসম্ভব সমগ্রভাবে রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে সংকলন করে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। আর এইসব উপাদানের আলোকে রবীন্দ্রচিত্তের যে রূপটি স্বতঃই সুস্পষ্ট রেখায় ফুটে ওঠে, প্রথম খণ্ডে তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে প্রয়াসী হয়েছি। বস্তুতঃ এ গ্রন্থের খণ্ড-দুটি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। দ্বিতীয় খণ্ডের ভিত্তির উপরেই প্রথম খণ্ড রচিত। এই হিসাবে বলা চলে, প্রথম খণ্ডের চেয়ে দ্বিতীয় খণ্ডেরই মূল্যবত্তা বেশি।

এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্যের উপাদানগুলিকে রবীন্দ্রচিত্ত যেভাবে গ্রহণ করেছে ও যেভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেছে প্রথম খণ্ডে আমি শুধু সেটুকুই অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার সত্যতাবিচার বা তাঁর মতামতের মূল্যনির্ণয়ের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করি নি। সে সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মতামতও আমি প্রকাশ করি নি। অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতির রবীন্দ্রভাষ্যকেই যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে পরিস্ফুট করতে চেষ্টিত হয়েছি, তার বিচার করতে নয়; তার শুধু আলোচনাই করেছি, সমালোচনা নয়। আর এই প্রসঙ্গে আমি শুধু তর্কাতীত বিষয়গুলিকে উপস্থাপন এবং সমস্ত বিতর্কনীয় ও সন্দিগ্ধ বিষয়কে সযত্নে পরিহার করে চলার প্রয়াস পেয়েছি।

সেই সঙ্গে এ কথাও বলতে হয়, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সার্থক উত্তরাধিকারী হলেও রবীন্দ্রনাথ তার অন্ধ সমর্থক ছিলেন না এবং সর্বাংশে তার অনুকরণ বা অনুসরণ করাও তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। তার ত্রুটিবিচ্যুতি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং প্রয়োজনমতো ক্ষমাহীন ভাষায় পুনঃপুনঃ তিনি তার সমালোচনা করেছেন, ধিক্কার দিয়েছেন। কিন্তু ভারতসংস্কৃতির যে মহত্ত্বের কথা রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন অক্লান্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, ভারতস্বীকৃত যে দুর্গম জীবনপথকে রেখাঙ্কিত করে তিনি সে-পথে বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন, বলেছেন 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়', বর্তমান গ্রন্থে আমি ভারতের সেই মহত্ত্বের দিকটি নিয়েই আলোচনা করেছি। যে অংশে তার ত্রুটি এবং যে ত্রুটির পরিণামে তার আদর্শচ্যুতি ও পতন, তার বিস্তৃত আলোচনা আমার উদ্দেশ্য-বহির্ভূত। তবে প্রসঙ্গক্রমে ও প্রয়োজন অনুসারে স্থানে স্থানে সে সম্বন্ধেও রবীন্দ্রমতকে নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছি।

এই গ্রন্থে বিষয়গত সীমার ন্যায় স্বভাবতঃই একটি কালগত সীমাও মেনে নিতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মনে ভারত-ইতিহাস সমগ্ররূপেই ধরা দিয়েছিল। প্রাচীনতম

মোহেনজোদড়ো-হরপ্পা থেকে অধুনাতম কাল পর্যন্ত কোনো যুগই তাঁর বিশ্বতোমুখী দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায় নি। কিন্তু ভারত-ইতিহাসের সব যুগ বা সব ক্ষেত্র সমভাবে প্রাণবন্ত বা ফলপ্রসূ ছিল না। ভারতবর্ষের যুগযুগব্যাপী পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর ইতিহাসে সংস্কৃতির উৎকর্ষের মতো অপকর্ষও ঘটেছে বারেবারেই। কিন্তু ভারত-ইতিহাসের যেসব যুগ ও যেসব ক্ষেত্র কালজয়ী সংস্কৃতিসম্পদ্ উৎপাদনে সমর্থ হয় নি, সেসব যুগ ও ক্ষেত্র বর্তমান গ্রন্থের পরিধিবহির্ভূত। ভারতসংস্কৃতির যে বিশিষ্টতাগুলি রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে, জ্ঞানে ও চিন্তায় অনুপ্রবিষ্ট, সেইগুলিই শুধু এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। সেই কারণেই বেদপূর্ব সিন্ধুসভ্যতার যুগ আমাদের আলোচনাসীমার মধ্যে আসে নি। আর নীচের দিকে কবীর-দাদূ-রজ্জব প্রভৃতি সন্ত এবং মদন-গগন-লালন (১৭৭৭-১৮৯০) -প্রমুখ বাউলদের বহির্বর্তী ভারতবর্ষের উষব অধ্যায়টিও স্বভাবতঃই ওই সীমার বাইরে পড়ে গেছে।

রামমোহনের (১৭৭২/১৭৭৪-১৮৩৩) সময় থেকে যে নূতন যুগের 'তিমির-বিদার উদার' অভ্যুদয় ঘটে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেই যুগের প্রতিভূ। এই যুগের কথা তাই গ্রন্থের অবতারণা অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে মূল বিষয়ের মুখবন্ধরূপে। মূল বিষয়কে আবার তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। এই তিন পর্বের আট, আট ও দুই অধ্যায়ে ঋক্‌সংহিতা থেকে শুরু করে বাউল পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ন পর্ব থেকে সংগৃহীত রবীন্দ্রসংস্কৃতির উপাদানগুলির পরিচয় ও আলোচনা হয়েছে। সব শেষে একটি অধ্যায় যুক্ত হয়েছে আলোচিত বিষয়ের উপসংহাররূপে।

এবার প্রথম খণ্ডে আলোচিত বিষয়গুলির পরিচয় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিসরে দেওয়া গেল।

অধ্যায়ক্রম

অবতারণা অধ্যায়ে রবীন্দ্র-আবির্ভাবের পটভূমিরূপে তৎপূর্ব যুগের বাংলাদেশে তথা ঠাকুরপরিবারে ভারতসংস্কৃতির পুনর্জাগরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আর উপসংহার অধ্যায়ে রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপের একটি সামগ্রিক অথচ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অধ্যায়-দুটি ছাড়া এই গ্রন্থে আছে আর মোট আঠারোটি অধ্যায়।

প্রথম পর্বের আটটি অধ্যায়ে যথাক্রমে—বৈদিক সাহিত্য, বৌদ্ধ সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ধর্মশাস্ত্র, নীতিসাহিত্য এবং পুরাণপ্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বের আট অধ্যায়ে যথাক্রমে অশ্বঘোষ-শূদ্রক ও বিশাখদত্ত, কালিদাস,

বাণভট্ট-ভর্তৃহরি ও অমরু, ভবভূতি, শংকরাচার্য-সোমদেব ও বিহ্লণ, জয়দেব, হেবর-লিনের কাব্যসংগ্রহ এবং ভাষা-ছন্দ ও অলংকার সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে প্রথম পর্বের অধ্যায়গুলি বিষয়-অনুযায়ী এবং দ্বিতীয় পর্বের অধ্যায়-গুলি ব্যক্তিনাম অনুসারে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ প্রথম পর্বের সাহিত্যগুলি কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয় এবং বিষয়ের গুরুত্বে তার রচয়িতাদের ব্যক্তি-পরিচয় লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের সাহিত্যগুলি বিশিষ্টতা লাভ করেছে তাদের রচয়িতার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে। তাই এ পর্বে রচয়িতার প্রাধান্য। তৃতীয় পর্বে দুটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে বৈষ্ণব পদাবলী। দ্বিতীয় অধ্যায় আবার দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম পর্যায়ে মধ্যযুগের কবীর-নানক-চৈতন্য প্রভৃতি সন্তসাধকের এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে লালন-গগন-মদন প্রভৃতি বাউলের বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য কালগত বিচারে লালন-প্রমুখ বাউলকে মধ্যযুগের বলা যায় না। কিন্তু তাঁদের মধ্যে মধ্যযুগীয় ভাবধারার অনুবর্তন দেখে তাঁদের মধ্যযুগের সাধক পর্যায়ে স্থান দেওয়া হয়েছে।

এই গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে অনেকগুলি পূর্বে অনালোচিত থাকলেও কতকগুলি, বিশেষতঃ উপনিষদ্, কালিদাসের সাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের যোগাযোগ নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা দেখা যায়। কিন্তু পূর্বগামীদের আলোচনা প্রধানতঃ ভাবগত বা তত্ত্বগত, উপকরণাশ্রিত নয়। পক্ষান্তরে এই গ্রন্থের আলোচনা মুখ্যতঃ উপকরণগত, তত্ত্বাশ্রিত নয়। বলা যেতে পারে এখানেই বর্তমান প্রয়াসের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য।

প্রথম অধ্যায়ে যে বৈদিক সাহিত্যের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ তার অন্তর্গত। রবীন্দ্রসাহিত্যে উপনিষদের উপকরণই সর্বাধিক। তাই উপনিষদ্‌কে স্বতন্ত্র একটি পরিচ্ছেদে রাখা হল। আর ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের উপাদান স্বল্প বলে এ-দুটিকে সংহিতার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হল। মহানির্বাণতন্ত্র বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত না হলেও ভাবসাম্যের অনুরোধে তাকে উপনিষদের পরিশিষ্টে স্থান দেওয়া হয়েছে।

বেদমন্ত্র বাল্যকাল থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত রবীন্দ্রমানসে কি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তার ভাবধারা, ভাষাভঙ্গি ও ছন্দোবৈচিত্র্য রবীন্দ্ররচনায় কতদূর অনুসৃত হয়েছে বৈদিক সংহিতার প্রসঙ্গে তা অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর উপনিষদ্-প্রসঙ্গে বলতে হয়, রবীন্দ্রমানসে তথা তাঁর সাহিত্যে তার গুরুত্বই সব থেকে বেশি। তবে এ সম্বন্ধে এত দিক্ থেকে এত কিছু আলোচনার অবকাশ আছে যে, বর্তমান গ্রন্থে তার সর্বাঙ্গীণ আলোচনা সম্ভব নয়; নিষ্প্রয়োজনও বটে। তাই এ স্থলে

রবীন্দ্রব্যবহৃত উপনিষদের শ্লোকগুলিকে অবলম্বন করে কবিচিত্তে ঔপনিষদিক ভাবধারার বিবর্তন ও ক্রমপরিণতির ইতিহাসটি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

বুদ্ধের চারিত্রমহিমা, বৌদ্ধ ধর্মদর্শন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি রবীন্দ্রচিত্তে কতদূর ছায়াপাত করেছিল সে সম্বন্ধে কয়েকটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা দেখা গেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাই রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রাপ্ত বৌদ্ধ উপাদানগুলিকে অবলম্বন করে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পবিচয়, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কবির ধারণার বিবর্তন এবং তার কোন্ কোন্ আদর্শের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার বিবরণ দেওয়া হল।

রামায়ণ ও মহাভারত রবীন্দ্রমনকে গভীরভাবে অধিকার করে ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর সাহিত্যে সে প্রসঙ্গ বহুবার উল্লিখিত হলেও কবি প্রত্যক্ষভাবে তার থেকে বিশেষ উপাদান গ্রহণ করেন নি। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে তাই রামায়ণ-মহাভারতের সাহায্যে ভারতের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারে কবির প্রয়াস, কাব্য হিসাবে এই মহাকাব্য দুটির মূল্য স্বীকার ও তার মর্যাদাদান এবং এই কাব্যবর্ণিত আদর্শ অনুসরণে কবির উৎসাহদানের বিষয় তথ্যসহ সংক্ষেপে বর্ণিত হল।

ভগবদ্‌গীতার সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের যোগের বিষয়টি পঞ্চম অধ্যায়ের উপজীব্য। গীতা মহাভারতের একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও ভারতসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার প্রভাব ও মর্যাদা অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথের চিত্তে এবং সাহিত্যে তাব গুরুত্ব কম নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ্-প্রীতির কথাই বাহুল্যের সঙ্গে বলা হয়, গীতা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের কথা প্রায় বলাই হয় না। অথচ গীতাও যে তাঁর চিত্তকে গভীরভাবে অধিকার করে ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাই এই অধ্যায়ে প্রমাণ-উদধৃতিসহ রবীন্দ্রনাথের গীতাচিন্তার বিষয় পাঁচটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এ ক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের কথা মোট আটটি উপচ্ছেদে যথাসম্ভব সামগ্রিকভাবে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছি। এইজন্য অন্যান্য অধ্যায়ের তুলনায় এ অধ্যায়টি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ছয়টি সংহিতা, বিশেষতঃ মনুসংহিতার সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের সম্বন্ধ নিরূপণ, অর্থাৎ এগুলির প্রতি রবীন্দ্রমনোভাবের ক্রমবিবর্তন এবং ধর্মশাস্ত্রোক্ত উপদেশ-বিধির প্রতি কবির সমর্থন ও অসমর্থনের কথা পর্যালোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য সংহিতার তুলনায় মনুসংহিতার উপকরণ অনেক বেশি। তাই এটিকে স্বতন্ত্র উপচ্ছেদে রেখে অন্য পাঁচটি সংহিতাকে একত্র আনা হয়েছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে সংস্কৃত নীতিবাক্য ও প্রকীর্ণ শ্লোকের অজস্র উদ্‌ধৃতি ও উল্লেখ চোখে পড়ে। সেই উদ্‌ধৃতিগুলিকে অবলম্বন করে সংস্কৃত নীতিসাহিত্যের সঙ্গে কবির

পরিচয় এবং সাহিত্য তথা নীতি-উপদেশ হিসাবে সেগুলির যে মূল্য কবি নির্ধারণ করেছেন তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে।

অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত পুরাণপ্রসঙ্গ সম্বন্ধে বলতে হয় রবীন্দ্রসাহিত্যে পুরাণের দুটি-মাত্র প্রত্যক্ষ উদ্‌ধৃতি চোখে পড়ে। কিন্তু পুরাণের নানা কাহিনী, বিশেষতঃ তার দেব-দেবীকল্পনা রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবেই জড়িয়ে আছে। তাই রবীন্দ্রসংস্কৃতির প্রসঙ্গে সেগুলিকে বাদ দিলে কবির মানসলোকের পরিচয়টাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অথচ রবীন্দ্রসাহিত্যে পৌরাণিক উপাদানের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে গেলে একটি স্বতন্ত্র গবেষণাগ্রন্থ রচনা করতে হয়। এই অধ্যায়ে তাই পুরাণের কাহিনী ও দেবদেবী-কল্পনা রবীন্দ্রসাহিত্যে যে কত বিভিন্ন রূপে ও কত বিচিত্র তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র মাত্র দেবার প্রয়াস পেয়েছি।

নবম অধ্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত। এই অধ্যায়ে বৌদ্ধকবি অশ্বঘোষ, মৃচ্ছকটিক-রচয়িতা শূদ্রক ও মুদ্রারাক্ষস-প্রণেতা বিশাখদত্তের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের পরিচয় কতটুকু তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মহাকবি ভাস সম্বন্ধে কবির নীরবতার কারণও অনুমান করার চেষ্টা করেছি।

কবি কালিদাসের সঙ্গে রবীন্দ্রচিত্তের গভীর সাধর্ম্যের কথা এবং রবীন্দ্ররচনায় কালিদাসের ভাবধারা, দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষাভঙ্গির নিগূঢ় ছায়াপাতের কথা সুবিদিত। এ সম্বন্ধে নানা দিক্ থেকে আলোচনাও হয়েছে যথেষ্ট। তাই দশম অধ্যায়ে রবীন্দ্র-উদ্‌ধৃত কালিদাসের উক্তি ও তাঁর সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের আলোকে অন্যদের, বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় কালিদাসের প্রতি কবির দৃষ্টি কোন্ কোন্ দিক্ থেকে বিশিষ্ট তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে প্রয়াসী হয়েছি। বলা বাহুল্য রবীন্দ্ররচনায় কালিদাসের উপকরণ খুবই বেশি। তাই এই অধ্যায়টি আকারে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়ে বাণভট্ট, ভর্তৃহরি ও অমরু এই কবিত্রয়ের কবিত্ব তথা ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত এবং তাঁদের কাব্যের সঙ্গে কবির পরিচয়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এঁদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য ও উদ্‌ধৃতির পরিমাণ স্বল্প বলে এই তিন কবিকে একত্রে আলোচনা করা হল।

কবি ভবভূতি ও তাঁর কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এবং সে সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের আনুপূর্বিক বিবরণ দানই দ্বাদশ অধ্যায়ের উপজীব্য। সংস্কৃত সাহিত্যে কবি হিসাবে ভবভূতির গুরুত্ব যথেষ্ট; রবীন্দ্রনাথও তাঁকে কালিদাসের সমগোত্রীয় বলে মনে করেছেন। তাই রবীন্দ্ররচনায় ভবভূতি সম্বন্ধে মন্তব্য বা তাঁর কাব্যের উদ্‌ধৃতির পরিমাণ নিতান্ত স্বল্প হলেও তাকে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে স্থান দেওয়া হয়েছে। সেই

সঙ্গে ভবভূতি সম্বন্ধে কবির এই বাক্‌পরিমিতির সম্ভাবিত কারণ নির্ণয়ের কিছু প্রয়াস দেখা যাবে এই অধ্যায়ে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রাপ্ত উপকরণের সাহায্যে শংকরাচার্য, সোমদেব ও বিহ্লণের রচনার সঙ্গে কবির পরিচয়, সে সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এবং রবীন্দ্ররচনায় তার ছায়াপাতের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। উপকরণ-বিরলতার জন্য এই তিন কবিকে একত্র আনা হল।

কবি জয়দেব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে, বিশেষতঃ তার ছন্দ-সৃষ্টিতে গীতগোবিন্দের প্রভাব চতুর্দশ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথ জয়দেবকে প্রথম শ্রেণীর কবিমর্যাদা না দিলেও আবাল্য-অভ্যস্ত গীতগোবিন্দের ছন্দ ও ভাষাভঙ্গি রবীন্দ্রসাহিত্যে এতভাবে অনুসৃত হয়েছে যে রবীন্দ্রসৃষ্টিতে গীতগোবিন্দের সবিশেষ মূল্য অস্বীকার করা যায় না। সেই কারণেই জয়দেবকে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হল হেবর্লিনের কাব্যসংগ্রহ। প্রথম বি [illegible] পূর্বে আমেদাবাদে (১৮৭৮) 'ডাক্তার মোহন হেবার্লিন কর্তৃক সমাহৃত' 'বা [illegible] গ্রন্থের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় আর [illegible] গ্রন্থের স [illegible] অধিকাংশ সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হন। সুতরাং [illegible] রবীন্দ্রমনের যোগসূত্র রচনায় এ গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ এই [illegible] গ্রন্থ থেকে কোন্ কোন কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন [illegible] এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন কাব্যের বেলায় এ কবি 'কাব্যস [illegible]'র সংস্করণ [illegible], উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ সহ সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের ভাষা, ছন্দ ও অ[illegible] রবীন্দ্রচিত্তে কতদূর রেখাপাত করেছে এবং তাঁর সাহিত্যে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে, ষোড়শ অধ্যায়ে তা দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে [illegible]।

সপ্তদশ অধ্যায় থেকে তৃতীয় পর্বের সূত্রপাত। উপনিষদের মতো বৈষ্ণব পদাবলীও রবীন্দ্রচিত্তকে গভীরভাবে অধিকার করেছিল। এই অধ্যায়ে আছে বৈষ্ণবপদাবলীর সঙ্গে কবির বহুকালব্যাপী পরিচয়, বৈষ্ণব ধর্মের সাধনা ও ভাবধারা সম্বন্ধে রবীন্দ্রদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন পদকর্তার কবিত্ব সম্বন্ধে কবির মনোভাবের বিবর্তন ও তাঁদের পদাবলীর রসবিশ্লেষণ, সর্বোপরি পদাবলীর উদ্ধৃতি তথা তার ভাষা-ছন্দ-সুরের সাহায্যে সাহিত্যের অলংকরণ ইত্যাদি বিষয়ের সতথ্য ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

অষ্টাদশ অধ্যায়টিকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে প্রথম পর্যায়ে আলোচিত

হয়েছে শ্রীচৈতন্য ও কবীর-দাদূ-নানক-রামানন্দ-প্রমুখ মধ্যযুগীয় সন্তদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এবং তাঁদের ঐক্যমন্ত্র ও সহজ সাধনপদ্ধতির প্রতি কবির সুগভীর অনুরাগের বিষয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলা দেশের বাউল এবং তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রমনোভাবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাউল গানের সঙ্গে কবির পরিচয় যেমন ঘনিষ্ঠ, তাঁর চিত্তে ও সাহিত্যে তার প্রভাব তেমনি গভীর ও চিরস্থায়ী। এই পর্যায়ে উক্ত বাউল গানের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, রবীন্দ্রসাহিত্যের উপর বাউল গানের ভাষা ছন্দ-অলংকারের প্রতিফলন, স্বয়ং কবির বাউল গান রচনার প্রয়াস এবং তার দার্শনিক ভাবধারার প্রতি তাঁর একান্ত আনুগত্যের আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বিবৃত হল।

এই গ্রন্থের অন্তর্গত তিন পর্বের আঠারোটি অধ্যায়ের বিবরণ থেকে বোঝা যাবে ভারতীয় সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদান আহরণ ও আত্মসাৎ করে কিভাবে রবীন্দ্রসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। গ্রন্থের পুরোভাগে স্থাপিত 'বিষয়নির্দেশ'-এর প্রতি দৃষ্টি দিলে এই আলোচনার সামগ্রিক রূপটি পরিস্ফুট হবে।

এখানেই প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি। এবার 'উপাদান-সংগ্রহ'-শীর্ষক দ্বিতীয় খণ্ডে অনুসৃত বিন্যাসপ্রণালীর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে।

উপাদান-সংগ্রহ

এই খণ্ডে আছে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রাপ্ত ভারতীয় সংস্কৃতির উপাদানের তালিকা। এই উপাদানের বিষয়গুলিকে যথাসম্ভব ঐতিহাসিক কালক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যের রচনাকাল প্রসঙ্গে প্রধানতঃ Cambridge History of India Vol. 1. এবং পরবর্তী সাহিত্যের রচনাকাল সম্বন্ধে A. B. Keith এর A History of Sanskrit Literature গ্রন্থে-ধৃত মত অনুসৃত হয়েছে। তবে যুগবিভাগের মোটা সীমারেখাটি মানা হলেও সর্বক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়ের পৌর্বাপর্য রক্ষা করা হয় নি। যেমন উপনিষদ্ বা কালিদাসের রচনাপ্রসঙ্গে। বিভিন্ন উপনিষদ্ বা কালিদাসের বিভিন্ন গ্রন্থরচনার কালক্রম নির্ণয়ে মতভেদের অবকাশ যথেষ্ট। বর্তমান ক্ষেত্রে সে আলোচনা আবশ্যকও নয়, অভিপ্রেতও নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ যে উপনিষদ্ বা কালিদাসের যে গ্রন্থ থেকে সর্বাধিক-সংখ্যক উপাদান ব্যবহার করেছেন, সেটিকে প্রথমে স্থান দিয়ে বাকিগুলিকে ক্রমশঃ ওই একই পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে। উপাদানগুলিকে এইভাবে প্রয়োগগত গুরুত্বক্রমে সাজানোর ফলে

রবীন্দ্রমানসের একটি বিশেষ প্রবণতা বোঝবারও সহায়তা হবে। উপাদানগুলির সংকলনপ্রণালীর অন্যান্য পরিচয় দেওয়া আছে এই বিভাগের মুখবন্ধে।

এই উপাদানসংগ্রহের শেষে রবীন্দ্রব্যবহৃত সংস্কৃত ও পালি প্রাকৃত শ্লোকের একটি বর্ণানুক্রমিক সূচি দেওয়া হল। রবীন্দ্রনাথ শ্লোকগুলিকে খণ্ড বা পূর্ণ যে আকারে ব্যবহার করেছেন সেই আকার ঠিক রেখে সেগুলিকে তাদের আদি অংশ ধরেই এই সূচিতে সাজানো হল। আশা করি তাতে রবীন্দ্রসাহিত্য-গবেষকের সহায়তা হবে।

অনুষঙ্গ

এই বিভাগে স্থান পেয়েছে উৎসনির্দেশ ও নির্দেশিকা। এই গ্রন্থরচনায় যেসব প্রামাণিক পুস্তক ও প্রবন্ধ থেকে উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে, উৎসনির্দেশে সেগুলির একটি নির্বাচিত তালিকা দেওয়া গেল। তালিকাটি 'রবীন্দ্রব্যবহৃত ও রবীন্দ্র-সম্পাদিত গ্রন্থ' এবং 'বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত বিবিধ গ্রন্থ', এই দুই ভাগে বিন্যস্ত। এই গ্রন্থে প্রয়োজনমতো আমার পূর্বরচিত কয়েকটি প্রবন্ধের সহায়তা নিয়েছি। সেগুলিও এই তালিকায় উল্লিখিত হল।

উৎসনির্দেশে উল্লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের জন্য যেসব গ্রন্থাগারের সহায়তা নিতে হয়েছে সেগুলি হল বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং রবীন্দ্রভবন, বিদ্যাভবন ও হিন্দীভবন গ্রন্থাগার। অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকেও বহু গ্রন্থ ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি। এ ছাড়া বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ গ্রন্থাগার এবং প্রয়োজনমতো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃত কলেজ ও বিদ্যাসাগর কলেজের গ্রন্থাগার ব্যবহার করে উপকৃত হয়েছি।

গ্রন্থশেষে একটি নির্দেশিকা যুক্ত হয়েছে। তবে এই নির্দেশিকায় গ্রন্থের দুই খণ্ডে ব্যবহৃত সমস্ত নামশব্দ নিঃশেষে ও নির্বিচারে সংকলিত হয় নি, কিছু কিছু বর্জিত হয়েছে। নির্দেশিকার ভূমিকায় এই বর্জনের কারণ উল্লিখিত হল।

পরিশেষ

প্রায় দশবৎসরব্যাপী কঠিন পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হল। যদি এ গ্রন্থের দ্বারা রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপটি সামগ্রিকভাবে উপলব্ধির কিছুমাত্র সহায়তা হয় তা হলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করব। এ জাতীয় গ্রন্থে কিছু কিছু অপূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে যাওয়া প্রায় অনিবার্য, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। যদি পাঠক ও সমালোচকগণ ওসব ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা হলে আমি কৃতজ্ঞ হব।

এই গ্রন্থরচনায় আমি সর্বাধিক উপকৃত হয়েছি অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের কাছে শিক্ষালাভের দ্বারা। তাঁর প্রদত্ত শিক্ষাব প্রতিদান স্বরূপ এই গ্রন্থখানি দেখে তিনি যদি কিছুমাত্র সন্তোষ লাভ করেন তা হলে সেটাই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তাঁকে জানাই আমার প্রণাম। আব আজকালকার এই দুর্দিনে যিনি নেহাত বিদ্যোৎসাহিতার প্রেরণায় এই-জাতীয় একখানি অ-জনপ্রিয় গ্রন্থ-প্রকাশেব গুরুভার বহনে অগ্রণী হয়েছেন, 'জিজ্ঞাসা' সংস্থার সেই দুঃসাহসী প্রকাশক শ্রীযুক্ত শ্রীশকুমার কুণ্ড মহাশয়ের কাছেও আমার ঋণ কম নয়। তাঁকে জানাই আমার আন্তবিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। তা ছাড়া আর যাঁদের কাছ থেকে কিছু-না-কিছু সহায়তা পেয়েছি তাঁদের কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ কবছি। ১লা আষাঢ় ১৩০৯

ডি-১/৪ বেলগাছিয়া ভিলা
কলিকাতা ৩৭

পম্পা মজুমদার

বিষয়-নির্দেশ

প্রথম খণ্ড

রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম খণ্ড

অবতারণা

আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথকে ভারতসংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক বলা যায়। ভারতসংস্কৃতির মৌল অভিপ্রায়কে আত্মস্থ করে নিয়ে আজীবন অস্খলিত নিষ্ঠায় কবি তার ভাবধারাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছেন। সেই সঙ্গে তার আদর্শকে সবার সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। বস্তুতঃ সমগ্র ভারতসংস্কৃতি যেন রবীন্দ্রনাথের মানসসত্তার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। তার ফলে অতীত ভারত রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে এমন প্রবল আবেগের সঞ্চার করেছে এবং তাঁর ধ্যানে এত উজ্জ্বল রূপে ধরা দিয়েছে। তাঁর অসংখ্য মননমূলক প্রবন্ধ ও কবিতা তার পরিচয় বহন করে।

ভারতীয় ঐতিহ্যের ভাবধারা রবীন্দ্রমানসকে কতদূর অধিকার করেছিল এবং তিনি কিভাবে তাকে গ্রহণ করে আপন রচনায় ব্যবহার করেছিলেন তার প্রত্যক্ষ উপকরণ ও তার প্রয়োগবৈশিষ্ট্যের বিষয় পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করা যাবে। এবার দেখা যাক কিসের প্রেরণা এই ভাবধারার প্রতি কবির মনকে আকর্ষণ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের চিত্তে এই প্রেরণার উদ্ভবের ইতিহাস জানতে গেলে দেখা যাবে কবির জন্মের পূর্ব থেকেই বহু বাঙালী মনীষী অতীত ভারতের চিন্তা কর্ম সংকল্প ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারাকে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে সুস্পষ্ট চেতনার আলোয় প্রবাহিত করে দেবার জন্য সাধনা করে চলেছিলেন। কেননা তাঁরা বুঝেছিলেন যে, আমাদের দেশের সমগ্র ইতিহাসটিই দেশবাসার অবচেতনায় বিরাজিত থেকে ভাবী পরিণতির জন্য কাজ করে চলেছে। তাঁদের সেই সম্মিলিত সাধনায় প্রস্তুত ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। সুতরাং ভারতবোধের প্রতি কবিচিত্তের আকর্ষণকে আকস্মিক বলা যায় না। সে আকষণ পূর্বতন ধারারই স্বাভাবিক পরিণতিমাত্র। অতএব রবীন্দ্রমানসে ভারতীয় ভাবধারার স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে প্রথমে ভারতের লুপ্ত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে কবির পূর্বসূরীদের প্রয়াসের পরিচয় নেওয়া দরকার।

২

পাশ্চাত্ত্য দেশের প্রবর্তনাতেই যে ভারতে প্রথম জাতীয় সংস্কৃতির চেতনা জেগে ওঠে, সে কথা সুবিদিত। মধ্যযুগে ভারত যখন তার গৌরবময় অতীতকে ভুলে গিয়ে নানা ক্ষুদ্রতা সংকীর্ণতার অচল সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তখন 'য়ুরোপীয় চিত্তের

জঙ্গমশক্তি' তার 'স্থাবর মনের উপর আঘাত' করে তাকে নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত করে তুলেছিল। যে বিদেশীদের চেষ্টায় ভারতের অতীত ইতিহাস ও সংস্কৃতির পুনরুদ্‌বোধন ঘটেছিল, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন স্যর চার্লস্ উইলকিনস, স্যর উইলিয়ম জোন্স্, এইচ টি. কোলব্রুক -প্রমুখ মনীষিবৃন্দ। এঁদের মধ্যে উইলকিন্স্, ওয়ারেন হেস্টিংস-এর উৎসাহে ১৭৮৫ সালে ভগবদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই ঘটনাই ভারতসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের প্রথম পদক্ষেপ। তাঁর পরে বহুভাষাবিদ্ মনীষী জোন্স্ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ্ উদ্‌ঘাটন করে বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। তাঁরই চেষ্টায় ভারতের তথা এশিয়ার অন্যান্য দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি -চর্চার উদ্দেশ্যে এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয় (১৭৮৪)।

শ্রীরামপুরের প্রোটেসটান্ট মিশন আবার দেশীয় ধর্মকে খ্রীস্টধর্মের তুলনায় অসার প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় শাস্ত্রগুলি প্রকাশ করতে থাকেন। এ ছাড়া বিদেশী সিভিলিয়ানদের দেশী ভাষা ও আইন শিক্ষা দেবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ভারতীয় ভাষা সাহিত্য ব্যাকরণ আইন প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থ মুদ্রণ করেন। এই-ভাবেই জোনস প্রমুখ মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহেব শ্রদ্ধা নিয়ে, অন্যেরা কেউ অবজ্ঞায়, কেউ জিজ্ঞাসু নিস্পৃহ কৌতূহলে, কেউ বা প্রয়োজনের তাড়নায়, ভারতের অতীত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে ও তার চর্চায় ব্রতী হন। তবে তাঁদের উদ্দেশ্য যেমনই হক, এদেশবাসীর জীবনে তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। কারণ তাদের প্রয়াসেই ভারতীয়েরা প্রথম নিজেদের অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশেই প্রথম ভারতসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের সূত্রপাত দেখা যায়। নূতন চেতনালব্ধ বাঙালী মনীষিগণ আপন আপন প্রবণতা অনুসারে ভারতীয় ঐতিহ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। এবং দেশে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব তথা শাস্ত্রসাহিত্য নিয়ে অনুশীলন চলতে থাকে। এইসব শাস্ত্রবচনের নজিরেই সেকালের জটিল কিছু-বা বিকৃত ধর্মের ও নানা দুর্নীতিতে পূর্ণ সমাজের সংস্কার সাধিত হতে থাকে। সেই সঙ্গে মধ্যযুগের অধঃপতিত সাহিত্যের মানকেও উন্নত করে তোলার চেষ্টা চলে। এইভাবে দেশকে অতীত গৌরবের ক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আগ্রহে জাতীয় জনমানসে স্বদেশপ্রেমের চেতনা জেগে ওঠে। ফলে, সেই সময়ে দেশে এক অভূতপূর্ব তথা সর্বাংগীণ উদ্দীপনার সঞ্চার দেখা গিয়েছিল। এই যুগেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর আবির্ভাবকালের এই গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন। তিনি নিজে তার বিবরণ দিয়ে লিখেছেন—

I was born in 1861: That is* not an important date of history, but it belongs to a great epoch in Bengal, when the currents of three movvments had met in the life of our country. One of these, the religious, was introduced by a very great-hearted man of gigantic intelligence, Raja Rammohan Roy. ...There was a second movement equally important. Bankimchandra Chatterjee,...was the first pioneer in the literary revolution which happened in Bengal about that time. ..There was yet another movement started about this time called the National. It was not fully political, but it began to give voice to the mind of our people trying to assert their own personality.

—'The Religion of An Artist'

দেশব্যাপী এই ত্রিবিধ আন্দোলনের অগ্রনায়ক ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪ মতান্তরে ১৭৭২-১৮৩৩)। তাঁর অন্তরে সত্যের যে ক্ষুধা ছিল তারই প্রেরণায় মোহ-মুক্ত বুদ্ধিতে তিনি প্রতীচ্যের ভাবধারাকে অসংকোচে গ্রহণ করে প্রাচ্য ভাবধারার সঙ্গে সমন্বিত করে দিয়েছিলেন। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি তৎকালীন হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ -সংস্কারে প্রয়াসী হন এবং এক দিকে সহমরণ প্রথা নিবারণের উদ্যোগ করেন, অন্য দিকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্য খ্রীস্টান মিশনারীদের আক্রমণের উত্তর দেন। এইসব সমাজসংস্কারে ও ধর্মীয় বিচারে প্রায়শঃ তাঁকে হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করে যুক্তি আহরণ করতে হত। সেই উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালবিস্মৃত ঈশ কঠ মাণ্ডূক্য তলবকার প্রভৃতি উপনিষদ্, মহানির্বাণতন্ত্র ইত্যাদি গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। অতএব রবীন্দ্রনাথে ভাষায় বলা চলে—

আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে, রামমোহন রায় তাহারও পথপ্রদর্শক।

—'আধুনিক সাহিত্য', বঙ্কিমচন্দ্র ১৩০১ বৈশাখ

আবার এই জাতীয় শাস্ত্রালোচনার ফলে ঔপনিষদিক ধর্ম তাঁর হাতে 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য হিন্দুধর্ম'রূপে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। সুতরাং সেই যুগের শাস্ত্র সমাজ ও ধর্মের সংস্কারে ও পুনরুদ্ধারে রামমোহনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—

যেদিন বাংলাদেশে প্রগাঢ় অন্ধতা, কৃত্রিমতা, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে

রামমোহন রায়ের আগমন হল সেদিন এই বিমুখ দেশে তিনিই একলা ভারতের নিত্য পরিচয় বহন করে এসেছেন।

—'চারিত্রপূজা', ভারতপথিক রামমোহন রায় ১৩৪০ পৌষ

ভারতপথিক রামমোহনের এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু সর্বশ্রেণীর মানুষের মনোরঞ্জন করতে পারে নি। রক্ষণশীলদের অগ্রগণ্য ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) রামমোহনের ভাবধারার মধ্যে বিদেশী প্রভাব লক্ষ করেছিলেন। তাই ভবানীচরণ ঔপনিষদিক সংস্কৃতির পরিবর্তে পৌরাণিক সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে উদ্‌যোগী হন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবত, পুরাণ, মনু প্রভৃতি বিশখানি সংহিতা গ্রন্থ, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য -প্রণীত স্মৃতিগ্রন্থ 'প্রাচীন ধরণের তুলট কাগজে' পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য তাঁর এই প্রয়াস ভারতসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের সহায়কই হয়েছিল।

ধর্মসাধনায় রামমোহনের অনুবর্তীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)। প্রথম জীবনে তিনি একান্তভাবে রামমোহনের অনুসরণ করলেও পরবর্তী কালে অক্ষয়কুমার দত্তের বিশ্লেষণী মনীষার সংস্পর্শে এসে তাঁর মতের কিছু পরিবর্তন ঘটে। তখন তিনি বৈদিক ধর্মকে আগাগোড়া অভ্রান্ত বলে স্বীকার না করে 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মে'র স্থলে 'ব্রাহ্মধর্মে'র প্রবর্তন করেন। দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পরে যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। এই প্রসঙ্গে তাঁর সহযোগী কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-৮৪) কথা স্মরণ করতে হয়। কোনো কোনো বিষয়ে মহর্ষির সঙ্গে তাঁর মতের পার্থক্য থাকলেও বৃহৎ মানবতাবোধ ও আশ্চর্য ঔদার্যে তিনি ভারতসংস্কৃতির বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। তাঁর প্রবর্তনায় 'হিন্দুশাস্ত্রম্‌' নামে যে গ্রন্থটি সংকলিত হয় তার আখ্যাপত্রে দেখা যায়—

A compilation of theistic texts from the Hindu, Buddhist, Shikh, Jewish, Christian, Mahomedan, Parsee, Chinese.

সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রতি কেশবচন্দ্রের এই আগ্রহকে ভারতীয় ঐক্যানুভূতির তথা মহর্ষির উত্তরাধিকার বলে মনে করা যেতে পারে।

মহর্ষির আর একজন অনুবর্তী হলেন রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯)। তিনি একাধিক উপনিষদের ইংরেজি তর্জমা করেন। এই উদারমনা মনীষীই সার্বভৌম ধর্মাদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে কবীর দাদূ ও নানকপন্থী, বৈষ্ণব, জৈন প্রভৃতি সকলকেই 'হিন্দু' অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় বলে নির্দেশ করেন এবং উক্ত ধর্মগুলিকে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত বলে ঘোষণা করে বলেন—

আমরা যতই লইব ততই বাঁচিব আর যতই ছাটিব ততই মরিব।

—'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' ১২৯৩ ফাল্গুন, ভূমিকা[১]

ধর্ম-আন্দোলনের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ এই জাতীয় বিস্ময়কর ঔদার্যের পরিচয় দিলেও তাঁরা মুখ্যতঃ ঔপনিষদিক সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এই যুগে অন্যান্য বহু ধর্মসম্প্রদায়ও নিজ নিজ ধর্মের সংস্কারসাধনে ব্রতী হন। তাঁদের মধ্যে স্বামী দয়ানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী প্রভৃতি 'আর্যসমাজী'গণ লুপ্তপ্রায় বৈদিক সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। সিংহলের দেবমিত্র ধর্মপাল (১৮৬৪-১৯৩৩) বৌদ্ধধর্মের পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। তবে তার পূর্বে কেশবচন্দ্রের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন (১৮৪৭-৯৫)-প্রমুখ অনেকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির চর্চায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ওই যুগেই রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-৮৬) ও তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানকে নূতন পথে পরিচালিত করেন। মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) এবং তাঁর পরবর্তী নবীনচন্দ্র (১৮৪৭-১৯০৯)-প্রমুখ ব্যক্তিরা হিন্দু পৌরাণিক সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস পান। আর মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১) প্রভৃতির চেষ্টায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম নূতন রূপে জেগে ওঠে।

এই ধর্ম-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সকলেই যে রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী ছিলেন তা নয়। তাঁদের অনেকে কবির সমসাময়িক ছিলেন এবং অনেকের সঙ্গে কবির যোগাযোগও ঘটেছিল। আবার ধর্ম আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এই সময় দেশে একটা নাস্তিকতার আন্দোলনও দেখা গিয়েছিল। তার প্রভাব রবীন্দ্রনাথকেও কিছু পরিমাণে স্পর্শ না করে পারে নি। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি নিজেই তার পরিচয় দিয়ে লিখেছেন—

> যদিও এই ধর্মবিদ্রোহ আমাকে পীড়া দিত, তথাপি ইহা যে আমাকে একেবারে অধিকার করে নাই তাহা নহে। যৌবনের প্রারম্ভে বুদ্ধির ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এই বিদ্রোহিতা আমার মনেও যোগ দিয়াছিল।

— 'জীবনস্মৃতি' ১৯১২, ভগ্নহৃদয়

নাস্তিকতা সম্বন্ধে কবির এই মনোভাব পরবর্তী কালে 'চতুরঙ্গ'-এর (১৩২৩) জ্যাঠামশায়, 'যোগাযোগ'-এর (১৩৩৬) বিপ্রদাস এবং 'তিনসঙ্গী' গ্রন্থের অন্তর্গত রবিবার গল্পের (১৩৪৬) অভীককুমারের মধ্যে রূপলাভ করে।

যাই হক, যে ধর্মীয় আন্দোলনের উত্তেজনার মধ্যে কবির বাল্য ও কৈশোর কেটেছে এবং প্রথম যৌবনে কবি স্বয়ং যার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও নিরপেক্ষ থাকতে

১ 'সাহিত্যসাধক-চরিতমালা' ৪র্থ খণ্ড, রাজনারায়ণ বসু ১৩৫২, পৃ ৯২

পারেন নি, সেই আবহাওয়া রবীন্দ্রমানসের গঠনে যে অনেকখানি সহায়তা করেছিল সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

৩

ধর্মসংস্কারের প্রয়োজন ছাড়া নিরপেক্ষ জ্ঞানানুশীলনের জন্যও এই যুগে ভারতীয় শাস্ত্র-গ্রন্থগুলির পুনর্বিচার শুরু হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একনিষ্ঠ জ্ঞানসাধক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-৯১) নাম অগ্রগণ্য। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতি ও ইতিহাসের উদ্ধার, প্রচার ও বিচারে একক রাজেন্দ্রলালকে এক হিসাবে দিক্‌পাল বলা যায়। তাঁর 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' নামক মাসিক পত্রে তার কিছু পরিচয় আছে। এই পত্রের সূত্রেই রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে কবির প্রথম পরিচয় এবং এই পত্রিকার সাহায্যেই তিনি ভারততত্ত্ব ও ইতিহাস সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তবে রাজেন্দ্রলালের Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (1882) গ্রন্থের দ্বারাই রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হন। গ্রন্থটি তাঁর চিন্তাকে উদ্রিক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কল্পনাকেও সঞ্জীবিত করেছিল। পরবর্তী 'বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি' অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আর ব্যক্তিগতভাবে রাজেন্দ্রলালকে কবি যে কি দৃষ্টিতে দেখতেন এবং তাঁর সংস্পর্শে যে কতদূর উপকৃত হতেন সে বিষয়ে স্বয়ং কবির সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি আছে 'জীবনস্মৃতি'তে। সেখানে কবি বলেছেন—

> রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন।...তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম।...আমি যখন-তখন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম।... কোনো একটা বড়ো প্রসঙ্গ তুলিয়া তিনি নিজেই কথা কহিয়া যাইতেন।...আর-কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপে এত নূতন নূতন বিষয়ে এত বেশি করিয়া ভাবিবার জিনিস পাই নাই।...এমন অল্প বিষয় ছিল যে-সম্বন্ধে তিনি ভালো করিয়া আলোচনা না করিয়াছিলেন এবং যাহাকিছু তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল তাহাই তিনি প্রাঞ্জল করিয়া বিবৃত করিতে পারিতেন।
>
> —'জীবনস্মৃতি', রাজেন্দ্রলাল মিত্র

এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, রাজেন্দ্রলালের কাছ থেকে কবি প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির যে পরিচয় লাভ করেছিলেন গুণে ও পরিমাণে তা সামান্য নয়।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত-উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি আর একজন মনীষীর দৃষ্টিও বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)। তিনি দেখেছিলেন—"সংস্কৃত ভাষায়, রাজতরঙ্গিণী ব্যতিরিক্ত, প্রকৃত

পুরাবৃত্ত গ্রন্থ একখানিও নাই।" আবার "সেই সঙ্কলিত পুরাবৃত্ত সর্বসাধারণলোক-সংক্রান্ত নহে", তা শুধু কাশ্মীরের রাজন্যবর্গের উত্থান-পতন ও তাদের জীবনবৃত্তান্তের সংকলন মাত্র। তাই আমাদের দেশে 'সর্বসাধারণ'-এর ইতিহাস-উদ্ধারের পন্থা নির্দেশ করে তিনি বলেছেন—

> প্রকৃত পুরাবৃত্তের নিতান্ত অসম্ভাবস্থলে বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন ব্যতিরেকে, পূর্বকালীন ভারতবর্ষীয়দিগের আচার ব্যবহার প্রভৃতি পরিজ্ঞানের আর কোনও পথ নাই।

—'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' ১৮৫৩, উপসংহার

এখানে বিদ্যাসাগর যে কথা বলেছেন, পরবর্তী কালে রবীন্দ্ররচনায় ঠিক সেই ভাবেরই উক্তি শোনা গেছে।—

> যখন আমরা বলি যে ভারতবর্ষে ইতিহাসের উপকরণ মিলে না তখন এই কথা বুঝিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে য়ুরোপীয় ছাঁদের ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, ভারতবর্ষের ইতিহাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নহে।

—'প্রাচীন সাহিত্য', ধম্মপদং ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ

সাধারণ জনজীবনের উত্থানপতনের ইতিহাসই কবির মতে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস। এই ইতিহাসের উপকরণ কবি ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্য-গ্রন্থগুলির মধ্যে সংগুপ্ত দেখেছিলেন এবং তার থেকে ইতিহাস উদ্ধার করার জন্য দেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি নিজেও এই পথেই বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র ইত্যাদি থেকে ইতিহাসের বহুতর উপকরণ আহরণ করেন। তাঁর ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা (১৩১৮), A vision of India's History (1923) প্রভৃতি একাধিক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তার পরিচয় আছে।

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রও ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে আত্মবিস্মৃতিই হিন্দুজাতির অবনতির কারণ। তাই তাঁর নানা প্রবন্ধে হিন্দু তথা ভারতীয়ের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা দেখা যায়। এই কাজের জন্য তিনি প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রগুলিকে অবলম্বন করেন এবং সেগুলিকে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বিচার করে অসাধারণ বিশ্লেষণী ক্ষমতার সাহায্যে তার থেকে তথ্য আহরণ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রয়াসের যথার্থ মর্যাদা বুঝে বলেছিলেন—

> বস্তুত আমাদের শাস্ত্র হইতে ইতিহাস-উদ্ধারের দুরূহ ভার কেবল বঙ্কিম লইতে পারিতেন। এক দিকে হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্মগ্রহণে য়ুরোপীয়গণের অক্ষমতা, অন্য

দিকে শাস্ত্রগত প্রমাণের নিরপেক্ষ বিচার সম্বন্ধে হিন্দুদিগের সংকোচ···যথার্থ ইতিহাসটিকে এই উভয়সংকটের মাঝখান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। দেশানুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে এবং সত্যানুরাগের সাহায্যে তাহার অমূলক অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই-সকল ক্ষমতাসামঞ্জস্য বঙ্কিমের ছিল। সেইজন্য মৃত্যুর অনতিপূর্বে তিনি যখন প্রাচীন বেদ পুরাণ সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন তখন বঙ্গসাহিত্যের বড়ো আশার কারণ ছিল, কিন্তু মৃত্যু সে আশা সফল হইতে দিল না।

— আধুনিক সাহিত্য', বঙ্কিমচন্দ্র ১৩০১ বৈশাখ

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন করে যেতে না পারলেও কবি তাঁর সারা জীবন ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে যে কি ধারায় আলোচনা করে গিয়েছেন, কবির এই উক্তির মধ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) বঙ্কিমের মতো নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের সমালোচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি অনুবাদসহ সমগ্র ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে সূত্রসাহিত্য, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, মহাকাব্য, গীতা, পুরাণ ইত্যাদি প্রধান প্রধান হিন্দুশাস্ত্রগুলি সম্পাদনা করে নয় খণ্ডে প্রকাশ করেন। এই কাজে, বিশেষতঃ ঋগ্বেদের সম্পাদনায় তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উত্তরসাধক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫৩-১৯৩১) বিশেষ সহায়তা পেয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যচর্চায় হরপ্রসাদের দানও কম নয়।

যাই হক, এঁদের সম্মিলিত প্রয়াসে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের যে পুনরুজ্জীবন চলেছিল, প্রথম জীবন থেকেই রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র ও পুরাবৃত্ত-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃত ভাষার চর্চাও অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-প্রমুখ মনীষিবৃন্দের প্রয়াসে সে সময়ে কালিদাস, ভবভূতি, ভর্তৃহরি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি বহু কবির বিবিধ কাব্য-নাটকের অনুবাদ ও সমালোচনায় সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা দেখা যায়। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে যথাস্থানে এগুলির বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যাবে।

এই যুগের মনীষিবৃন্দ সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং তার পুনঃপ্রচারে আগ্রহী ছিলেন। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ উইলিয়ম জোন্‌সই প্রথম সংস্কৃত ভাষার মহিমা অনুভব করে অকুণ্ঠিতভাবে জানিয়েছিলেন—

More perfect than the Greek, more copious than the Latin and more exquisitely refined than either.

—'Sir W. Jones' Works'[১]

মনীষী রাজনারায়ণ বসুর 'স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে' জোন্সের এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

অবনীর সকল ভাষা এক দিকে, আর অন্য দিকে সুচারু সুমধুর শব্দরত্নাকর মহাভাষা সংস্কৃতকে পরিমাণ করিলে আমারদিগের সংস্কৃতই সকল অপেক্ষা গুরুতর হইবে।[২]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও সংস্কৃত ভাষার প্রসারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তাঁর 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবে' (১৮৫৩) তিনি সংস্কৃত ভাষা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করে দেখান যে, ভারতবর্ষে তৎকালপ্রচলিত হিন্দী বাংলা প্রভৃতি ভাষা "সমুদয় অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে।··ভূরি পরিমাণে সংস্কৃত কথা লইয়া ঐ সকল ভাষায় সন্নিবেশিত না করিলে তাহাদের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা যাইবেক না"। সেই সঙ্গেই তিনি বলেন যে, দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে গেলে য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানকে প্রচলিত দেশী ভাষায় অনুবাদ করা প্রয়োজন এবং এই অনুবাদের ভাষা গঠন করার জন্যও সংস্কৃত ভাষার সাহায্যের দরকার। বিদ্যাসাগরের এই মন্তব্যের প্রসঙ্গে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করতে হয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থে প্রায় অনুরূপ ভাবেরই উক্তি করেছেন—

এ কথা স্বীকার করতেই হবে, সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা অচল। কী জ্ঞানের কী ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ-বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে।··· খাঁটি বাংলা ছিল আদিম কালের, সে বাংলা নিয়ে এখনকার কাজ ষোলো-আনা চলা অসম্ভব।

– 'বাংলাভাষা-পরিচয়' ১৯৩৮, অধ্যায় ১০

সংস্কৃত ভাষার এইজাতীয় উপযোগিতা অনুভব করেই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বেথুন সোসাইটিতে প্রদত্ত তাঁর এক ভাষণে (১৮৬৩) বলেছিলেন—

Academic education for natives...should not be *exclusively*

১ 'সাহিত্যসাধক-চরিতমালা' ৪র্থ খণ্ড, রাজনারায়ণ বসু ১৩৫২, বাংলা ভাষার অনুশীলন, পৃ ২৮

২ 'সাহিত্যসাধক-চরিতমালা' ৪র্থ খণ্ড, রাজনারায়ণ বসু ১৩৫২, বাংলা ভাষার অনুশীলন সম্পর্কে বক্তৃতা ১৮৪৮ জুন ১, পৃ ২৩

English, it must have Sanscrit or Arabic by its side·· The purity of the vernacular again depends in a great measure on the proper cultivation of Sanscrit.

—The proper place of Oriental Literature in Indian Collegiate Education[১]

বিদ্যাসাগর বা কৃষ্ণমোহনের উক্তিতে সংস্কৃত শিক্ষাদানের যে মূল উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত হয়েছে, তা হল সংস্কৃতের সাহায্যে দেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন। তাঁদের অন্তরের এই অভিপ্রায় যিনি সার্থক করে তুলেছিলেন তিনি হলেন তৎকালের শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ ভাষায় পারদর্শী বঙ্কিম তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে অপরিণত বাংলা ভাষাকে সুগঠিত করে তাকে সমস্ত রকম ভাবপ্রকাশের উপযোগী করে তোলেন। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, এমন কি বিজ্ঞান পর্যন্ত যে কতদূর প্রাঞ্জল অথচ সুসংগত ভাবে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তাঁর বিভিন্ন রচনায় তার নিদর্শন আছে।

ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আদর্শও বঙ্কিমচন্দ্রকেই নির্ধারণ করতে হয়েছিল। তাঁর একক প্রয়াসেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এমন উন্নতি লাভ করে। তাঁর এই দুষ্কর সাধনা ও সিদ্ধির গৌরব কীর্তন করে পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

> বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত। দার্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন, সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়রবিরশ্মিসমুজ্জ্বল তুষারকিরীট চতুর্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদ্‌বর্গের কত ঊর্ধ্বে সমুত্থিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে, একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।
>
> —'আধুনিক সাহিত্য', বঙ্কিমচন্দ্র ১৩০১ বৈশাখ

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বহস্তে প্রস্তুত এই বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রপ্রতিভা এত সত্বর এমন সার্থক পরিণতি লাভ করতে পেরেছিল।

৪

ভারতসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই দেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রেমের সূচনা দেখা দেয়। প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতনতাই স্বদেশের প্রতি তাঁদের মমত্ববোধকে জাগ্রত

১ 'সাহিত্যসাধক-চরিতমালা' ৬ষ্ঠ খণ্ড, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬২, বিশপ্‌স কলেজ: সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক বিবিধ প্রতিষ্ঠান, পৃ ৫৫ পাদটীকা

করে তুলেছিল। তারই প্রেরণায় পূর্বোক্ত মনীষিগণ স্বদেশের বিস্মৃতপ্রায় পুরাবৃত্ত, শাস্ত্রসাহিত্য প্রভৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তবে স্বদেশপ্রেম যাঁর জীবনে প্রত্যক্ষ সত্যরূপে দেখা দিয়েছিল এবং দেশবাসীকে এ বিষয়ে সক্রিয় করে তুলতে যিনি প্রয়াসী হয়েছিলেন তিনি হলেন মনীষী রাজনারায়ণ বসু। জাতীয় জীবনের গৌরবকে অনুভব ও উপলব্ধি করাব আকাঙ্ক্ষাই তাঁর প্রয়াসের লক্ষ্য ছিল এবং এই আকাঙ্ক্ষাকে তিনি আজীবন কর্মে রূপদান করার চেষ্টা কবেছিলেন। যে সমস্ত বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টায় তাঁর এই দেশানুরাগ ব্যক্ত হয়েছিল, তার মধ্যে 'Prospectus of a society for the promoiton of National Feeling among the educated natives of Bengal' শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন (১৮৬১), ঠাকুর পরিবাবেব সহায়তায় 'হিন্দুমেলা' স্থাপন (১৮৬৫) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ -প্রতিষ্ঠিত 'সঞ্জীবনী সভা'ব মূলেও তাঁর প্রেরণা কার্যকরী হয়েছিল। সেইজন্য তাঁকেই যথার্থভাবে বলা যায়— 'Grandfat'·er of Indian Nationalism'। ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাই তাঁর সম্বন্ধে তিনি শ্রদ্ধানত চিত্তে লিখেছেন—

> দেশেব উন্নতিসাধন ক্বিবাব জন্য তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান কবিতেন তাহাব আর অন্ত নাই।...এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশেব প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাঁহার সেই তেজেব জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন।
>
> - 'জীবনস্মৃতি', স্বাদেশিকতা

এই ছত্র ক'টিতে দেশপ্রেমিক রাজনারায়ণের প্রবল দেশানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় রাজনারায়ণের যে তেজ 'সমস্ত দীনতা খর্বতা অপমান'কে দগ্ধ করে দিত, সেই প্রবল তেজ রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও তাঁব রচনায় তার সুস্পষ্ট পবিচয় পাওয়া যায়।

স্বদেশপ্রেমের প্রসঙ্গে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কথাও স্মরণ করতে হয়। ভাবত তথা বাংলা দেশের ইতিহাস-সন্ধানে এবং বাংলা ভাষার অনুশীলনে তাঁর স্বদেশপ্রেম ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর দুই খণ্ড 'বিবিধ প্রবন্ধে' (১৮৮৭ ও ১৮৯২) ও নানা রচনায় বিশেষতঃ 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে (১৮৮২) দেশপ্রীতির যে প্রেরণা তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন তাতে সমগ্র জাতির চিত্ত বিশেষভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল।

তবে রাজনারায়ণ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বেই জনসাধারণের মনে প্রত্যক্ষভাবে

স্বদেশচেতনার জাগরণ ঘটেছিল। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্র-অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন—

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আমল হইতেই প্রকৃতপক্ষে স্বদেশীভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উক্ত পত্রিকাতে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী লিখিয়া. লোকের মনে সর্বপ্রথম দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন; তাহার পর ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় হিন্দুমেলার কল্পনা করিয়া, এবং ৺নবগোপাল মিত্র মহাশয় অনুষ্ঠানে তাহা পরিণত করিয়া, এই স্বদেশীভাবের প্রবাহে সে সময়ে প্রচণ্ড একটা বলসঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। বলিতে গেলে, পূর্বে আদিব্রাহ্মসমাজই তখন স্বদেশীভাবের প্রধান কেন্দ্র ছিল।[১]

সুতরাং তাঁর মতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং আদি ব্রাহ্মসমাজ অর্থাৎ মহর্ষি-প্রভাবিত সংস্থাগুলিতেই প্রথম স্বদেশীভাবের চর্চা শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও এই ভাবের সমর্থন পাই। এ সম্বন্ধে তিনিও লিখেছেন, 'সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়' এবং যখন 'শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে' ঠেকিয়ে রেখেছিল তখন—

আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুন্ন ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।

—'জীবনস্মৃতি', স্বাদেশিকতা

বস্তুতঃ মহর্ষির পিতা দ্বারকানাথ এবং পিতৃব্য নগেন্দ্রনাথের মধ্যে এই জাতীয়তাবোধের উন্মেষ লক্ষ করা গিয়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে এই বোধ আরও প্রখর হয়ে ওঠে এবং তাঁর পুত্রেরা এই ভাবধারাকে বিস্তৃততর করে দেশবাসীর অন্তরে প্রবাহিত করে দেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার পরিচয় দিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে, তাঁরই অর্থানুকূল্যে স্বদেশীভাব প্রচারের জন্য National Paper নামক ইংরেজি পত্র প্রকাশিত হয়।[২] 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও মহর্ষির আর্থিক সাহায্য ও আন্তরিক প্রেরণা বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। এই মেলার প্রথম অধিবেশন হয় ১৮৬৭ সালে। সুতরাং বাল্যকাল থেকেই হিন্দুমেলার উচ্ছ্বাস-উৎসাহের সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল। এই মেলার নবম অধিবেশনে তিনি প্রথম প্রকাশ্য সভায় তাঁর 'হিন্দুমেলার

১-২ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' ১৩২৬, নব্যতন্ত্র, গৃহসংস্কার, হিন্দুমেলা, পৃ ১৩১

উপহার' কবিতাটি (১৮৭৫) পাঠ করেন। আর পরিণত বয়সে হিন্দুমেলার গুরুত্বের পরিচয় দিয়ে জানান—

ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়।

—'জীবনস্মৃতি', স্বাদেশিকতা

হিন্দুমেলা ঠাকুর পরিবারের সকলের মধ্যেই বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল এবং এই উপলক্ষে তাঁদের অনেকেই জাতীয় ভাবের উদ্দীপক গান রচনা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি', সত্যেন্দ্রনাথের 'জয় ভারতের জয়' এবং 'মিলে সবে ভারত সন্তান', গণেন্দ্রনাথের 'লজ্জায় ভারতযশ গাইব কি করে' প্রভৃতি গানগুলি তার নিদর্শন। এই গানগুলির থেকে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় সংগীত রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন এ কথা বলা চলে।

আবার কিশোর রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত সঞ্জীবনী সভার সভ্য ছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি যেভাবে এই স্বদেশী সভার উদ্দেশ্য ও তার ব্যবস্থাপনার বর্ণনা করেছেন তাতে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রচিত্তে তার প্রভাব উপেক্ষণীয় ছিল না।

ঠাকুর পরিবারে দেশপ্রীতির এই জ্বলন্ত আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় সংস্কৃতির প্রতিও একান্ত অনুরাগ দেখা গিয়েছিল। চিত্র সাহিত্য সংগীত প্রভৃতি শিল্পকলার চর্চায় তাঁদের সে অনুরাগ সর্বদা প্রকাশ পেত। বস্তুতঃ সে যুগের ঠাকুর পরিবারকে ভারতীয় সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্রভূমি বললে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মানসগঠনের পক্ষে তাঁদের পারিবারিক পরিবেশ ও আবহাওয়া যে বিশেষ অনুকূল ছিল এবং রবীন্দ্র-সংস্কৃতির মৌল উপাদানগুলি যে প্রধানতঃ তাঁদের পরিবার থেকে আহৃত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সেইজন্য কবি নিজেই বলেছেন—

আমাদের পরিবারে আমার জীবনরচনার যে ভূমিকা ছিল তাকে অনুধাবন করে দেখতে হবে।

—'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ

অতএব কবির উক্তি অনুসরণ করে এবার তাঁর পারিবারিক পরিবেশের পরিচয় নেওয়া যাক।

৫

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার রহস্যচ্ছলে আত্মপরিচয় দিয়ে লিখেছিলেন—

ভাতে যথা সত্য হেম, মাতে যথা বীর,
গুণজ্যোতি হরে যথা মনের তিমির ;

নবশোভা ধরে যথা সোম আর রবি,
সেই দেবনিকেতন আলো করে কবি ॥

—'স্বপ্নপ্রয়াণ' ১৯৬৪, বিলাসপুর-প্রয়াণ ২৭

এখানে দ্বিজেন্দ্রনাথ সুকবির যে বাসস্থান নির্দেশ করেছেন, সাধারণ অর্থে তা যেমন সত্য, বিশেষ অর্থেও তা তেমনি ব্যঞ্জনাবহ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকেতনে স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথসহ সত্যেন্দ্র-হেমেন্দ্র-বীরেন্দ্র-গুণেন্দ্র-জ্যোতিরিন্দ্র-সোমেন্দ্র ও রবীন্দ্র, এই অষ্টরত্নের দ্বারা পরিবৃত হয়েই বাস করতেন কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ। এ উক্তি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। একদা কৌতুকচ্ছলে রবীন্দ্রনাথ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার 'দশমরত্ন' হতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সে ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে নি। বিক্রমাদিত্যের রাজৈশ্বর্য না থাকলেও ঠাকুর পরিবারে মধ্যমণি রবীন্দ্রনাথসহ দেবেন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র-সত্যেন্দ্র-জ্যোতিরিন্দ্র-গণেন্দ্র স্বর্ণকুমারী-গগনেন্দ্র ও অবনীন্দ্র এই নবরত্নের সমাবেশ ঘটেছিল এবং উজ্জয়িনীর রাজসভার চেয়ে তা কোনো অংশেই কম ছিল না।

সে যুগের বাংলা দেশে ঠাকুর পরিবারই যে সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কবি স্বয়ং তাঁদের এই পারিবারিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়ে লিখেছেন—

> আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধাঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম সেখানে সমস্তই বিরল।… এই নির্বাসন এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক।… বাংলা ভাষাটাকে তখন শিক্ষিত সমাজ অন্দরে মেয়েমহলে ঠেলে রেখেছিলেন, সদরে ব্যবহার হত ইংরেজি।…আমাদের বাড়িতে এই বিকৃতি ঘটতে পারে নি। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই।…
>
> আমাদের বাড়িতে আর-একটি সমাবেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।…এই যেমন একদিকে তেমনি অন্য দিকে আমার গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়। তখন বাড়ির হাওয়া শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যরস-সম্ভোগে আন্দোলিত, সার্‌ ওয়াল্‌টর স্কটের প্রভাবও প্রবল।

—'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৫, ১৩৩৮ পৌষ

রবীন্দ্র-অঙ্কিত এই চিত্র থেকে বোঝা যায় যে ঠাকুর পরিবারে আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রাচ্য সংস্কৃতির চর্চা চলত। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার অবাধ সঞ্চরণেও কোনো

বাধা ছিল না। সুতরাং তাঁদের গৃহেই প্রাচ্যপাশ্চাত্ত্য -সংস্কৃতির যথার্থ মিলনের সূচনা দেখা গিয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনে তার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই প্রধানতঃ ঠাকুর পরিবারে এই মিলনমূলক ভাবধারার প্রবর্তন হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের উক্তিতেই তার প্রমাণ মেলে। পিতৃসঙ্গে হিমালয় ভ্রমণের স্মৃতি বর্ণনা করে কবি শ্রদ্ধানত চিত্তে লিখেছিলেন—

> আমার পিতাকে এই প্রথম নিকটে দেখেছি, আর হিমালয় পর্বতকে। উভয়ের মধ্যেই ভাবের মিল ছিল। হিমালয় এমন একটি চিরন্তন রূপ যা সমগ্র ভারতের—যা একদিকে দুর্গম, আর-এক দিকে সর্বজনীন। আমার পিতার মধ্যেও ভারতের সেই বিদ্যা চিন্তায় পূজায় কর্মে প্রত্যহ প্রাণময় হয়ে দেখা যাচ্ছিল যা সর্বকালীন, যার মধ্যে প্রাদেশিকতার কার্পণ্যমাত্র নেই।
>
> — কালান্তর', বৃহত্তর ভারত ১৩৩৪ শ্রাবণ

মহর্ষির জীবন ও তার কর্মের আলোচনা করলে কবির এই মন্তব্যের যাথার্থ্য বোঝা যাবে। তার সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে দেখি বেদ-উপনিষদের মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে তাতে মহাভারত গীতা মনুসংহিতা ইত্যাদির শ্লোকও সমমর্যাদায় স্থান পেয়েছে। তাঁর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দিলেও এ কথাটি স্পষ্ট হবে। ১৭৭৪ শকের ভাদ্র থেকে চৈত্র এই ছয় সংখ্যায় দেখি 'কোরাণের উপদেশ সংগ্রহ' স্থান পেয়েছে। ওই শকেরই আশ্বিন সংখ্যায় 'পারসীক ধর্ম', কার্তিক সংখ্যায় 'ললিতবিস্তর' অবলম্বনে 'শাক্যসিংহের জীবনচরিত', মাঘ সংখ্যায় 'কংফুচের জীবনচরিত' এবং পৌষ সংখ্যায় 'ব্রাহ্মধর্মের উদারতা' নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকাতেই (১৭৯৭-৯৯শক) মহর্ষির 'ভগবদ্গীতার শ্লোকসংগ্রহ' এবং 'ভগবদ্গীতা বিষয়ে বক্তৃতা' প্রকাশিত হয়। এর থেকে বোঝা যায় সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রতি তিনি কতদূর আগ্রহী ছিলেন। শিখধর্মের প্রতিও যে তাঁর অনুরাগ ছিল, 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থ থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আবার শুধুমাত্র ভারতীয় শাস্ত্রসাহিত্যই নয়, পারস্যের কবি হাফেজের বাণীও তাঁর চিত্তকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।—

> প্রাচীন ভারতের তপোবনের ঋষিরা যেমন তাঁর গুরু ছিলেন, তেমনি পারস্যের সৌন্দর্যকুঞ্জের বুলবুল হাফেজ তাঁর বন্ধু ছিলেন।
>
> —'শান্তিনিকেতন' ২, সামঞ্জস্য ১৩১৭ মাঘ

সুতরাং মহর্ষির চিত্তে দেখি বিভিন্ন দেশের বিচিত্র ভাবধারা বেশ অবিরোধে সুসমঞ্জস ভাবেই মিলে গিয়েছিল। এইরূপ পিতার সান্নিধ্যের ফলে কবি রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রকার

সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও অন্ধ সংস্কারের ঊর্ধ্বে একটি বৃহৎ ঔদার্যের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রমানসের গঠনে কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের দান তাঁর পিতার অপেক্ষা কম নয়। মহর্ষির দুই ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে গণেন্দ্রনাথের প্রবল দেশানুরাগ ও গুণেন্দ্রনাথের শিল্প-সাহিত্য-সম্ভোগের অবারিত আনন্দের কথা কবি 'জীবনস্মৃতি'তে স্মরণ করেছেন এবং বলেছেন যে তাঁরা তাঁদের পরিবারে সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিলেন।

মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী দ্বিজেন্দ্রনাথ কাব্য, দর্শন, সংগীত ও গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দেন। বিশেষতঃ দর্শনশাস্ত্রে তাঁর অসামান্য অধিকার ছিল এবং তাঁর আলোচনাতেই সম্ভবতঃ রবীন্দ্রচিত্তে দর্শনশাস্ত্রের প্রতি আগ্রহের সঞ্চার হয়। তবে দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার যে দিকটি কবিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল, সেটি হল তাঁর কাব্যপ্রাণতা। কবির বাল্যকালেই 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য (১৮৭২) লিখিত হয় এবং 'এই কাব্যের রচনা ও আলোচনার হাওয়ার' মধ্যে থাকাতে তার সৌন্দর্য সহজেই কবির হৃদয়ের তন্তুতে তন্তুতে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। এ সম্বন্ধে কবি নিজেই লিখেছেন যে, যদিও তাঁর বালক বয়সে ওই কাব্যের সম্পূর্ণ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব ছিল না, তবু—তখনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল-আবডাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না।

—'জীবনস্মৃতি', বাড়ির আবহাওয়া

কবির জীবনে তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব এবং প্রেরণাও কম নয়। বিলাতপ্রত্যাগত আই. সি. এস. সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রমনের পরিচয় সাধন করিয়ে দেন। বিলাতযাত্রার পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে অবস্থানকালেই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে কবির স্বাধীন অনুপ্রবেশ ঘটে। তাঁর সংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিন্তাধারার সংস্পর্শেই রবীন্দ্রচিত্তে এমন বলিষ্ঠ ঔদার্য দেখা গিয়েছিল।

পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রতিও সত্যেন্দ্রনাথ সমান আগ্রহী ছিলেন। তাঁর মেঘদূতের পদ্যানুবাদ (১৮৯১), বৌদ্ধধর্ম (১৯০১), শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (১৯০৫) প্রভৃতি গ্রন্থ তার পরিচয় বহন করে। তাঁর 'নবরত্নমালা' নামক সংকলন গ্রন্থের (১৯০৭) সঙ্গেও কবির ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। উক্ত গ্রন্থে উদ্‌ধৃত বহুসংখ্যক সংস্কৃত শ্লোক ও মরাঠী তুকারামের অভঙ্গের কিছু অনুবাদ রবীন্দ্রকৃত।

তবে রবীন্দ্রনাথের মানসপ্রকৃতির উদ্‌বোধনে সবচেয়ে বেশি দান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের।

কবি নিজেই লিখেছেন যে জ্যোতিদাদা ছিলেন একাধারে তাঁর ‘ভাই বন্ধু ও সহযোগী’। সাহিত্য, সংগীত, অভিনয় সর্ব ক্ষেত্রেই তিনি রবীন্দ্রপ্রতিভার মধ্যে একটা প্রবল উৎসাহের সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবল দেশানুরাগের কথা সুবিদিত। তবে স্বদেশের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের সংস্কৃতির প্রতিও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তাই একযোগেই তিনি সংস্কৃত এবং ফরাসী নাটকের অনুবাদ করে চলেছিলেন—আবার দেশী ও বিলাতী উভয়বিধ সংগীতের অনুশীলনেও তাঁর উৎসাহের অভাব ঘটে নি। এই সংগীতচর্চায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুগামী ছিলেন। কবি নিজেই লিখেছেন—“এই দেশী ও বিলাতী সুরের চর্চার মধ্যে বাল্মীকিপ্রতিভার জন্ম হইল।”

সাহিত্যচর্চার মধ্যে [illegible] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তিলকের ‘গীতারহস্য’ গ্রন্থের অনুবাদ (১৯২০) করেন এবং [illegible]নাথের ভাষ্য, অনুবাদ করে করে ‘সংস্কৃত নাটকশ্রেণী’ প্রায় শেষ করে গেছেন। তাঁর অনুবাদগুলিই যে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে কবিকে বহু পরিমাণে অনুপ্রাণিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর সাহচর্য কবিকে বিশেষ উৎসাহ দিত এবং তার ফলেই নাট্যশিল্পে কবির অনুরাগ ও দক্ষতার সূত্রপাত হয়। চিত্রশিল্পেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নৈপুণ্য ছিল। তবে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিদাদার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নি।

এভাবেই সাহিত্য ও শিল্পকলার সব ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহযোগিতা রবীন্দ্রপ্রতিভাকে অবাধে বিকশিত হবার সুযোগ দিয়ে তার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার ঘটিয়েছিল। তাঁর এই ঋণকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করে পরিণত বয়সে কবি লেখেন—

> এমনি করিয়া ভিতরে বাহিরে সকল দিকেই সমস্ত বিপদের সম্ভাবনার মধ্যেও তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন, কোনো বিধিবিধানকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই এবং আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে তিনি সংকোচমুক্ত করিয়া দিয়াছেন।
>
> —‘জীবনস্মৃতি’, বাল্মীকিপ্রতিভা

মহর্ষির গৃহে তাঁর পুত্রদের মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চর্চার এই যে বিপুল আয়োজন চলেছিল তার রসসম্ভোগের জন্যও তাঁর গৃহে কিছু রসিক ব্যক্তির সমাগম ঘটত। সেইজন্যই তাদের ‘বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত’। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যালোচনার বিশেষ অনুকূল সঙ্গী ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। ইংরেজী বাংলা দুই সাহিত্যেই তাঁর ব্যুৎপত্তি এবং অনুরাগ ছিল যথেষ্ট। তাঁর সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ বালক কবির সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করে তুলতে যথেষ্ট সহায়তা

করেছিল। বালক রবীন্দ্রনাথের আর একজন 'সাহিত্যের সঙ্গী' ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী। সাহিত্যে তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যচর্চায় অংশী ছিলেন। কাদম্বরী দেবী আবার কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও বিহারীলালের 'বেশ একটু পরিচয়' হয়ে যায়। বিহারীলাল কালিদাস ও বাল্মীকির কবিত্বে বিশেষ মুগ্ধ ছিলেন এবং সেই মুগ্ধতা তিনি রবীন্দ্রনাথের অন্তরেও সঞ্চার করে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর সে প্রয়াস নিষ্ফল হয় নি।

এইভাবেই দেখা যায় যে, ঠাকুর পরিবারের অনুকূল আবহাওয়া ও প্রেরণা নবীন সূর্যালোকের মতো রবীন্দ্রপ্রতিভার বিকাশচেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করে দিয়েছিল। সেইসঙ্গে তৎকালীন যুগপরিবেশ থেকেও তিনি তাঁর মানসপ্রবণতা অনুযায়ী উপকরণ আহরণ করে নিয়েছিলেন। তারই ফলে ক্রমশঃ রবীন্দ্রসংস্কৃতি এমন পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করতে পেরেছিল। আজ পর্যন্ত আমরা তারই উত্তরাধিকার ভোগ করছি।

ভারতসংস্কৃতির কোন্ কোন্ উপাদানের আশ্রয়ে এই বিশাল রবীন্দ্রসংস্কৃতি বিকশিত হয়ে উঠেছিল পরবর্তী অধ্যায়গুলি তারই পরিচয় বহন করে।

প্রথম পর্ব

বৈদিক সাহিত্য

ভারতসংস্কৃতির আদিতম জয়স্তম্ভ বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আবাল্য পরিচয়। এই পরিচয়ের ইতিহাস বিবৃত করে কবি নিজেই লিখেছেন—

> আমাদের বাড়িতে আর-একটি সমাবেশ হয়েছিল, সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।
>
> —'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৫, ১৩৩৮ পৌষ

'প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারত' বলতে কবি এখানে প্রধানতঃ বৈদিক ভারত তথা বৈদিক সংস্কৃতিকে বোঝাতে চেয়েছেন। বস্তুতঃ মহর্ষির প্রবর্তনায় সে যুগে একমাত্র ঠাকুর পরিবারেই সংহিতা ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদ্‌-সংবলিত সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের চর্চা দেখা যায়। পরিবারের এই অনুকূল পরিবেশে শৈশব থেকেই কবির সঙ্গে বৈদিক সাহিত্যসংস্কৃতির পরিচয় এবং তার প্রতি কবির অনুরাগের সঞ্চার। বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ যোগ কতদূর ঘনিষ্ঠ ছিল, তাঁর আর একটি উক্তি থেকে তা বোঝা যায়। সেখানে তিনি বলেছেন—

> আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবধন বিদ্যার্ণব ·তিনি ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ থেকে উপনিষদের শ্লোক ব্যাখ্যা করে আবৃত্তি করাতেন। তাঁর বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে পিতৃদেব তাঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। বাল্যকাল থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনের যে আদর্শ আমার মনে ছিল তার কাজ এমনি করে শুরু হয়েছিল কিন্তু তার মূর্তি সম্যক্‌ উপাদানে গড়ে ওঠে নি।
>
> —'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', অধ্যায় ৩, ১৩৪০ আশ্বিন

মহর্ষি-সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে সমগ্র বৈদিক সাহিত্য থেকে নির্বাচিত কিছু কিছু মন্ত্র দেখা যায়। বাল্যে অধীত এই মন্ত্রগুলি কবির চিত্তে যে কত গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের তপোবনাদর্শ কবির চিন্তাকে যে কতদূর প্রভাবিত করেছিল তাঁর সারা জীবনের রচনায় সে পরিচয় ছড়িয়ে আছে। কবিপ্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম তারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তবে তপোবনের যে কল্যাণময় নির্মল সুন্দর মানসমূর্তি কবিকে আকর্ষণ করেছিল তার চিত্রটি কবি পেয়েছিলেন মুখ্যতঃ কালিদাসের কাব্য থেকে।[১]

---

১ দ্রষ্টব্য : দ্বিতীয় পর্ব, কালিদাস অধ্যায় : পরিচ্ছেদ ৮

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্ব থেকেই মহর্ষির পরিবার পৌরাণিক হিন্দুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সে সম্বন্ধে কবি লিখেছেন—

> বাড়িতে পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত পূজার দালান শূন্য পড়ে ছিল, তার ব্যবহার-পদ্ধতির অভিজ্ঞতামাত্র আমার ছিল না।
>
> —'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ

জন্মাবধি কবি তাঁর বাড়িতে মাঘোৎসব প্রভৃতি যেসব অনুষ্ঠান দেখেছেন, সেগুলি সবই ছিল ব্রাহ্মমতে যথাসম্ভব বৈদিক পদ্ধতির অনুষ্ঠান। তাঁর নিজের উপনয়ন অনুষ্ঠানও এইভাবেই হয়েছিল। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে লিখেছেন যে বেদান্তবাগীশকে সঙ্গে নিয়ে মহর্ষি স্বয়ং বৈদিক মন্ত্র থেকে উপনয়নের অনুষ্ঠান সংকলন করে নেন। তার পর দীর্ঘ দিন ধরে বালক রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহাধ্যায়ী অন্য দুইজন বালককে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে সংগৃহীত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে বারংবার আবৃত্তি করিয়ে নিয়ে যথাসম্ভব প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতির অনুসরণ করে তাঁদের উপনীত করা হয়। এই উপনয়ন উপলক্ষেই কবি গায়ত্রী মন্ত্রের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হন। এই মন্ত্র তাঁর বালক মনকে যে কত গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল 'জীবনস্মৃতি'তে (পিতৃদেব) কবি তা বিশদভাবেই বর্ণনা করেছেন। পরিণত বয়সেও তিনি এই প্রসঙ্গটি স্মরণ করে মন্তব্য করেন—

> উপনয়ন-অনুষ্ঠানে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করবার দীক্ষা পেয়েছিলেম পিতৃদেবের কাছ থেকে।
>
> —'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', অধ্যায় ৩, ১৩০০ আশ্বিন

এর থেকে বোঝা যায় মহর্ষির তত্ত্বাবধানে বিশুদ্ধ উচ্চারণে বেদ-উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে কবি তার তাৎপর্যও হৃদয়ঙ্গম করতে শিখেছিলেন।

আবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্‌যোগে এবং রাজনারায়ণ বসুর প্রেরণায় 'সঞ্জীবনী সভা' নামে এক স্বাদেশিকের সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সভায় জাতীয় সংস্কৃতির প্রতীকরূপে 'লালরেশমে জড়ান বেদমন্ত্রের একখানা পুঁথি' থাকত, সভ্যদের দীক্ষা হত ঋক্‌মন্ত্রে এবং 'সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্' (বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' ১৩২৬ ফাল্গুন, পৃ ১৬৭)। বালক রবীন্দ্রনাথও এই সভার সভ্য ছিলেন।

পারিবারিক আবহাওয়া থেকে রবীন্দ্রনাথ বৈদিক সংস্কৃতিকে যে সহজভাবেই আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন, তাঁর বাল্যে রচিত কবিতাগুলির থেকেও তার প্রমাণ মেলে। ১৮৭৫ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় (শক ১৭৯৭ আষাঢ়) চৌদ্দ বৎসরের কবি

রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির খেদ' প্রকাশিত হয়।[১] এই কবিতায় বৈদিক যুগের যে চিত্র প্রকাশ পেয়েছে তা হল—

ঋষিগণ সমস্বরে
অই সামগান করে
চমকি উঠিছে আহা! হিমালয় গিরি।

এবং

সরস্বতী-নদী-কূলে,
কবিরা হৃদয় খুলে
গাইছে হরষে আহা সুমধুর গীত

এর দুবছর পরে আর একটি কবিতায় ভারতের দুর্দশা দেখে অতীত গৌরব স্মরণ করে কবি লেখেন—

তুমি শুনিয়াছ সরস্বতী কূলে,
আর্য্য কবি গায় মন প্রাণ খুলে,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি—ভারতে আজি কি সুখের দিন?

—হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতা[২]

উপরের উদ্ধৃতি দুটিতে দেখা গেল বৈদিক যুগ বলতে রবীন্দ্রহৃদয়ে সরস্বতীতীরবর্তী আর্য ঋষিকবির আশ্রমের ছবিই আঁকা ছিল। আর-একটু বড়ো বয়সে ছান্দোগ্য উপনিষদের অন্তর্গত জাবাল সত্যকামের কাহিনীটি রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে কবি সরস্বতীতীরেই আর্যগুরু গৌতমের আশ্রম কল্পনা করেন।—

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রম-মাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি আহরণ
বনান্তর হতে;··· ··· ···
··· ··· ··· ···
··· সবে মিলি লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটিরপ্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি-আলোকে।

—'চিত্রা', ব্রাহ্মণ ১৩০১ ফাল্গুন

ওই একই সময়ে প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতিতে উদ্‌বুদ্ধ সত্যসন্ধ রামমোহনকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে আর্য ঋষিকে স্মরণ করে বলেন—

১ দ্রষ্টব্য: প্রবোধচন্দ্র সেন -লিখিত 'ভোরের পাখি' প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিক-পৌষ

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -লিখিত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' ১৩৪৯, পৃ ৬৬

উপনয়ন উপলক্ষে কবি যে গায়ত্রীমন্ত্রের আবৃত্তি ও তার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে শেখেন, পরবর্তী কালেও তা যে তাঁর চিত্তকে গভীরভাবে অধিকার করে ছিল রবীন্দ্ররচনার একাধিক স্থলেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে'র প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশে (১৩০৮ পৌষ ৭) দেখি ছাত্রদের নিত্যকার ধ্যানের মন্ত্র হিসাবে তিনি এই গায়ত্রী মন্ত্রেরই প্রবর্তন করেন। এর কিছুদিন পরে কুঞ্জলাল ঘোষকে লেখা এক পত্রে (১৩০৯ পৌষ ২৭) কবি এই মন্ত্রের যে বিশদ ব্যাখ্যা করেন তাতেও মন্ত্রটির প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।

যাই হক, বাল্যে দেখা বৈদিক পদ্ধতির এই উপনয়ন অনুষ্ঠান কবির চিত্তে এমন স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল যে পরবর্তী কালে তাঁর আয়োজিত সব অনুষ্ঠানেই বেদমন্ত্র অপরিহার্য অঙ্গরূপে দেখা দিয়েছে। শ্রীনিকেতনে বার্ষিক উৎসবের অভিভাষণে ('পল্লীপ্রকৃতি', উপেক্ষিতা পল্লী ১৯৩৪ ফেব্রুআরি) এবং ভুবনডাঙার জলাশয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কথিত ভাষণে ('পল্লীপ্রকৃতি', জলোৎসর্গ ১৯৩৬ অগস্ট) তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া একটি পত্রে দেখি কবি লিখেছেন—

> আজ সকালে হলচালন-উৎসব হবে। লাঙল ধরাতে হবে আমাকে। বৈদিক মন্ত্রযোগে কাজটা করতে হবে বলে এর অসম্মানের অনেকটা হ্রাস হবে।
>
> —'পথে ও পথের প্রান্তে', অধ্যায় ৪০, ১৩৩৬ শ্রাবণ

লঘু সুরের এই মন্তব্য থেকেও বেদমন্ত্রের প্রতি কবিমনের বিশেষ শ্রদ্ধা ও আস্থার আভাস পাওয়া যায়।

কবির নিজের রচনাতেও স্থানে স্থানে বেদের উদ্‌বৃতি চোখে পড়ে। 'শারদোৎসব' নাটকের (১৯০৮) রাজসন্ন্যাসী বিজয়াদিত্য বেদমন্ত্রেই শরতের আবাহন করেন। উক্ত নাটক রচনার যুগে কবি তাঁর ধর্মতত্ত্বের বক্তৃতাগুলিতে পুনঃপুনঃ বেদমন্ত্র ব্যবহার করছিলেন। সেই কারণেই ওই নাটকে বেদমন্ত্র তাঁর লেখনীতে স্বভাবতঃ এসে গিয়েছিল। শারদোৎসবের পরিবর্তিত সংস্করণ 'ঋণশোধে' (১৯২১) সংক্ষেপার্থে মন্ত্রগুলি বর্জিত হয়। পরবর্তী কালেও তাঁর কাছে বেদমন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা যে নিঃশেষ হয়ে যায় নি, 'তপতী' নাটকে (১৯২৯) উদ্‌ধৃত ঋক্‌, অথর্ব প্রভৃতি সংহিতার মন্ত্রগুলি তার পরিচয় বহন করে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধগুলিতেও বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারংবার বেদমন্ত্রকে স্মরণ করেন। প্রথম জীবনে সশ্রদ্ধ মুগ্ধতায় তিনি প্রসঙ্গতঃ এগুলি উদ্‌ধৃত করেন মাত্র। মধ্য জীবনে 'শান্তিনিকেতন' বক্তৃতামালায় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা উপলক্ষে আপন মতের সমর্থনে অথবা বৈদিক বাণীর মহান্‌ আদর্শকে সর্বসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করার

উদ্দেশ্যে তিনি বেদমন্ত্রের অজস্র উদ্ধৃতি দিয়েছেন ও তার ব্যাখ্যা করেছেন।

মধ্য জীবনেই তিনি বেদমন্ত্রের অনুবাদ শুরু করেন। তবে 'গীতাঞ্জলি' পর্বের (১৯০৮) আগে কৃত কিছু অনুবাদ হারিয়ে গেছে। শুধু 'আত্মদা বলদা' ইত্যাদি মন্ত্রের (ঋক্‌ ১০।১২১।২) অনুবাদটি ১৮৯৪ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পাওয়া যায়। যাই হক, ১৯০৯ সালে ৭ই পৌষের উৎসব উপলক্ষে তার দ্বিতীয় পর্বের অনুবাদগুলি দেখা যায়। এই পর্বে তার প্রিয় বেশ কিছু সংখ্যক মন্ত্র অনূদিত হয় এবং দুএকটিতে সুর সংযোগ করে সেগুলিকে তিনি গানে রূপায়িত করেন। বাকি-গুলি উপযুক্ত সুর নির্বাচনের অভাবে ওইভাবেই পরিত্যক্ত হয়। পরবর্তী কালেও প্রয়োজনমতো কবি যে বেদমন্ত্রে সুর দান করতেন ইন্দিরা দেবীকে লেখা এক পত্রে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—

আমার কোটরে ফিরে গিয়ে বেদগানে সুর দেবার চেষ্টা করব।

— চিঠিপত্র ৫, পত্র ৮০, ১৯১৯ অকটোবর ২২

দ্বিতীয় পর্বের অনুবাদগুলি অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনের কাছে রক্ষিত ছিল। বর্তমানে সেগুলি 'রূপান্তর' গ্রন্থে (বিশ্বভারতী) বিধৃত হয়েছে। তৃতীয় পর্বের অনুবাদ সম্বন্ধে অধ্যাপক সেন লিখছেন—

১৯১ সালের পরে তাঁহাকে যাব কতকগুলি বেদমন্ত্রের অনুবাদের জন্য ধরি। সেগুলি হইবে কবিতা, গান নয়। তাহার মধ্যে ঋগ্‌বেদের উষা পর্জন্য প্রভৃতির স্তুতি ও বসিষ্ঠের মন্ত্র আছে। অথর্ববেদের কতকগুলি মন্ত্র দেখিয়া তিনি অতিশয় মুগ্ধ হন। অথর্বের পৃথ্বীসূক্ত, স্কম্ভসূক্ত, মহীসূক্ত, ব্রাত্যসূক্ত, বিরাটস্তুতি, উচ্ছিষ্টস্তোত্র, শান্তিমন্ত্র প্রভৃতি কতকগুলি মন্ত্র তাঁহার চিত্তকে এমন নাড়া দিয়াছিল যে তিনি সেগুলির অনুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এইগুলি তিনি দেখিবার জন্য কাহাকে দেন। কিন্তু পরে তাহা আর ফেরত পান নাই।

—রবীন্দ্রনাথের বেদমন্ত্রানুবাদ বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ শ্রাবণ-আশ্বিন, পৃ ১০

বেদমন্ত্রের অনুবাদ কবির এই পর্যন্ত। পরবর্তী কালে তাঁর রচনায় ইতস্ততঃ দু একটি মাত্র অনুবাদ চোখে পড়ে। তবে অনুবাদ না করলেও প্রথম জীবনের তুলনায় উত্তর জীবনেই বেদমন্ত্রের ভাবধারা যে তাকে নিগূঢ়তররূপে অধিকার করেছিল, তার সাহিত্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে (১৯৩৩) ও 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে (১৯৪০) কবি তাঁর জীবনদর্শনের পরিচয় দিতে গিয়ে বেদের অজস্র উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যার সাহায্যেই আপন বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগের প্রতি দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় কবির প্রথম জীবনে ব্যবহৃত বৈদিক উদ্‌ধৃতিগুলির অধিকাংশই 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ থেকে নেওয়া। সম্ভবতঃ এই উদ্‌ধৃতিগুলির মূল উৎসের সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। কবি নিজেও এইগুলিকে সাধারণ শাস্ত্রবচন রূপেই উদ্‌ধৃত করেছেন, তার উৎস নির্দেশ করেন নি। কিন্তু তাঁর পরিণত বয়সের উদ্‌ধৃতিগুলিতে ঋক্, অথর্ব ইত্যাদি উৎসের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। তার থেকে মনে হয় যে প্রথম বয়সের সাহিত্যে তিনি শৈশবাভ্যস্ত মন্ত্রগুলিই ব্যবহার করেছিলেন। তাৎপর্য ব্যাখ্যার দিক্ থেকেও দেখা যায় তখনও তিনি ব্রাহ্মধর্মের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু পরবর্তী জীবনে ব্যবহৃত উদ্‌ধৃতিগুলি অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত। সেগুলি তাঁর ব্যক্তিগত মনোভাবের অনুকূল বলেই সযত্নে নির্বাচিত এবং সেগুলির ভাষ্যও একান্ত-ভাবেই তাঁর নিজের।

অবশ্য শেষ জীবনে সচেতন বিচারবুদ্ধির বিশ্লেষণ করেই তিনি এই মন্ত্রগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এ কথা বলা যায় না। এগুলি তাঁর অনুভূতির গভীরে গিয়ে তার চেতনাকে আশ্রয় করেছিল। তাই শেষ বয়সে রচিত শেষ সপ্তক (১৯৩৫), পত্রপুট (১৯৩৬), প্রহাসিনী (১৯৩৯), নবজাতক (১৯৪০), রোগশয্যায় (১৯৪০), আরোগ্য (১৯৪১), জন্মদিনে (১৯৪১), প্রভৃতি কাব্যের বহু কবিতায় বিচিত্র প্রসঙ্গে কবি বারে বারেই বেদমন্ত্রকে স্মরণ করেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, রবীন্দ্রমানসে বেদমন্ত্রের গুরুত্ব কতদূর ছিল এবং প্রথম থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত কবি কতভাবে তাকে স্মরণ করেছেন। তবে সেই সঙ্গে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারক হিসাবে এগুলির স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকার করলেও নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতে তিনি তার মূল্য যাচাই করতে কুণ্ঠিত হন নি। তাই গ্রাম্য ছড়াকে ঋক স্তোত্রের সমান আসন দিয়ে কবি অসংকোচে লেখেন—

> প্রাচীন ঋগ্‌বেদ ইন্দ্র-চন্দ্র বরুণের স্তবগান উপলক্ষে রচিত—আর মাতৃহৃদয়ের যুগলদেবতা খোকা এবং পুঁটুর স্তব হইতে ছড়ার উৎপত্তি।
>
> —'লোকসাহিত্য', ছেলেভুলানো ছড়া ১৩০১

বলা বাহুল্য কবির এই মন্তব্যে ঋক্‌মন্ত্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নি।

২

বৈদিক মন্ত্রগুলির প্রতি কবির আকর্ষণের অন্যতম প্রধান কারণ হল তিনি তার মধ্যে

ভারতসংস্কৃতির মূল অভিপ্রায়টি সংগুপ্ত দেখেছিলেন। সেটি হল বিচিত্র বিরোধ-বিভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করবার অভিপ্রায়। তাঁর প্রথম শেখা গায়ত্রী মন্ত্রে এই ভারতীয় সমন্বয়প্রবণতাটির পরিচয় পাওয়া যায়। গায়ত্রী মন্ত্রের যে তাৎপর্য তিনি অনুধাবন করেছিলেন, তা হল—

> গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের ও অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে—এইজন্যই আর্যসমাজে এই মন্ত্রের এত গৌরব।
>
> —'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম', প্রথম কার্যপ্রণালী ১৩০৯ কার্তিক

পরবর্তী কালে এই মন্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

> বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবচিত্ত, এই দুইকে এক করে মিলিয়ে আছেন যিনি তাঁকে এই দুইয়েরই মধ্যে এক রূপে জানবার যে ধ্যানমন্ত্র সেই মন্ত্রটিকেই ভারতবর্ষ তার সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের সারমন্ত্র বলে বরণ করেছে।
>
> এক দিকে ভূলোক অন্তরীক্ষ জ্যোতিষ্কলোক, আর এক দিকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের চেতনা—এই দুইকেই যাঁর এক শক্তি বিকীর্ণ করছে, এই দুইকেই যাঁর এক আনন্দ যোগ করছে, তাঁর, তার এই শক্তিকে, বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার বুদ্ধির মধ্যে ধ্যান করে উপলব্ধি করবার মন্ত্র হচ্ছে এই গায়ত্রী।
>
> —'শান্তিনিকেতন' ২, ভক্ত ১৩১৬ পৌষ

এই মন্ত্রে ঋষিকবি যে এক বৃহৎ ঐক্যের মধ্যে আপন চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন সেই উদার প্রার্থনার মহত্ত্বে কবি এ মন্ত্রের প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই ঐক্যের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে 'বিশ্বভারতী'তে রূপদান করেন। এই উপলক্ষে তিনি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাদিবসের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন—

> এই অনুষ্ঠানের প্রথম সূচনা-দিনে আমরা আমাদের পুরাতন আচার্যদের আহ্বান-মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেম—যে মন্ত্রে তাঁরা সকলকে ডেকে বলেছিলেন, 'আযন্তু সর্বতঃ স্বাহা', বলেছিলেন, 'জলধারাসকল যেমন সমুদ্রের মধ্যে এসে মিলিত হয়, তেমনি করে সকলে এখানে মিলিত হোক।' সেদিন সেই বেদমন্ত্র-আবৃত্তির ভিতরে আমাদের আশা ছিল, ইচ্ছা ছিল।
>
> —'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১২, ১৩৩২ পৌষ

বিশ্বভারতীর মধ্যে কবি সেই আশা সেই আকাঙ্ক্ষা সার্থক করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাই কবির বক্তব্য হল—

> বিশ্বভারতী এই বেদমন্ত্রের দ্বারাই আপন পরিচয় দিতে চায়—'যত্র বিশ্বং ভবত্যেক-

নীড়ম্'। যে আত্মীয়তা বিশ্বে বিস্তৃত হবার যোগ্য সেই আত্মীয়তার আসন এখানে আমরা পাতব।

— বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১২, ১৩৩২ পৌষ

এখানে লক্ষণীয় যে বৈদিক মন্ত্রের মধ্যেই কবি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত আদর্শের সার্থক রূপায়ণ দেখেছিলেন। পরবর্তী কালেও তাঁকে নানা উপলক্ষে বেদের ঐক্যমন্ত্রকে স্মরণ করতে দেখা গেছে। শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবের অভিভাষণে তিনি অথর্ববেদের বাণী স্মরণ করেছেন।—

সং বো মনাংসি সংব্রতা সমাকূতীর্ণমামসি।
অমী যে বিব্রতা স্থন তান বঃ সংনময়ামসি ॥ ৩।৮।৫

এখানে তোমরা, যাহাদের মন বিব্রত, তাহাদিগকে এক সংকল্পে এক আদর্শে এক ভাবে একব্রত ও অবিরোধ করিতেছি, তাহাদিগকে সংনত করিয়া ঐক্য প্রাপ্ত করিতেছি।

—'পল্লীপ্রকৃতি', উপেক্ষিতা পল্লী ১৯৩৪ ফেব্রুআরি

উক্ত অভিভাষণে কবি ওই শ্লোকের সঙ্গে অথর্ববেদের আর দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করে তার অনুবাদ করেন এইভাবে।--

তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি সহৃদয়, সংপ্রীতিযুক্ত ও বিদ্বেষহীন করিতেছি। ধেনু যেমন স্বীয় নবজাত বৎসকে প্রীতি করে, তেমনি তোমরা পরস্পরে প্রীতি কর। ৩।৩০।১

...

ভাই যেন ভাইকে দ্বেষ না করে, ভগ্নী যেন ভগ্নীকে দ্বেষ না করে। একগতি ও সব্রত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে কল্যাণবাণী বলো। ৩।৩০।৩

এই বলে তিনি মন্তব্য করেছেন—

আজ যে বেদমন্ত্র-পাঠে এই সভার উদ্বোধন হল অনেক সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতে তা উচ্চারিত হয়েছিল। একটি কথা বুঝতে পারি, মানুষের পরস্পরের মিলনের জন্যে এই মন্ত্রে কী আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে।

—পূর্ববৎ

আর যে বেদমন্ত্রে মানুষের মিলনবাণী ধ্বনিত, তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ যে কত আন্তরিক উক্ত মন্তব্যে সেই কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কবি তাঁর রচনায় বৈদিক ঐক্যবাণীর প্রতি তাঁর সাগ্রহ সমর্থন জানিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না, বর্তমান বিরোধ-বিভেদের দিনে তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকেও সেই মহান্

আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, 'ভারতবর্ষের মহাক্ষেত্রে যে নানা জাতি ও নানা শক্তির সমাগম' হয়েছে, তাদের সম্মিলিত ঐক্যসাধনার মধ্যেই ভারতের কল্যাণ নিহিত। কল্যাণসাধনার এই পথকে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতপথ' বলে উল্লেখ করেছেন এবং এই পথের পথিকরূপে তিনি যে 'ভারতপথের গান' রচনা করেছেন তা সর্বমানবের মিলনের প্রত্যাশাই বহন করে এনেছে।—

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওংকারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

৩

বৈদিক ঋষিকবির মিলনসাধনার ধারাকে আধুনিক কালে প্রবাহিত করে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বৈদিক সংস্কৃতির যথার্থ উত্তরসাধক হয়েছিলেন। কবি নিজেও তাঁর এই উত্তরাধিকার সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। হিবার্ট বক্তৃতায় তাই তিনি স্পষ্টভাবেই বলেন—

When I look back upon those days, it seems to me that unconsciously I followed the path of my Vedic ancestors.

— The Religion of Man' 1931, Chapter VI, The vision

কবি যে আপনার অজ্ঞাতে অসচেতনভাবে বৈদিক পূর্বসূরীর পথ অনুসরণ করেছিলেন তার কারণ বৈদিক ভাবধারা কবির অন্তরে সংজাত সম্পদ্ রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেইজন্য ঋষিকবির অনুভূতির সঙ্গে রবীন্দ্র-অনুভূতির এমন মিল দেখা যায়, আর তারই ফলে রবীন্দ্ররচনার অনেক স্থলে বেদের বাণীর আশ্চর্য প্রতিধ্বনি শোনা গেছে।

ঋষিকবির সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের এই সাধর্ম্যের কারণ হল জগৎ ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে উভয়ের মধ্যে মিল ছিল। একে ঠিক জীবনদর্শনের সাদৃশ্য বলা চলে না, কেননা বৈদিক ঋষির কোনো সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত জীবনদর্শন ছিল না। সেই প্রাচীন যুগে যখন কোনো শিক্ষা বা অভ্যাসের সংস্কার তাঁদের মনকে আচ্ছন্ন করে

রাখে নি, তখন তাঁরা চিত্তের অবারিত স্পর্শশক্তি দিয়ে অব্যবহিতভাবে জগৎকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের বাণী তাঁদের সত্যোলব্ধ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিরই প্রকাশ; আর এইখানেই তাঁরা কবি। কবির দৃষ্টিতেই এই সৃষ্টিকে দেখে তাঁরা বলেছিলেন—

অন্তি সন্তং ন জহাতি
অন্তি সন্তং ন পশ্যতি
দেবস্য পশ্য কাব্যম্
ন মমার ন জীর্যতি।

কাছে আছেন তাঁকে ছাড়া যায় না, কাছে আছেন তাঁকে দেখা যায় না, কিন্তু দেখো সেই দেবের কাব্য, সে কাব্য মরে না, জীর্ণ হয় না।

— আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ

এই সৃষ্টিকে—এই 'দেবের কাব্য'কে রবীন্দ্রনাথও কবির দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন। তাই এই মন্ত্রের প্রতি তাঁর এমন আন্তরিক আকর্ষণ ও সাগ্রহ সমর্থন। আবার তাঁর দৃষ্টিতে এই 'কাব্যে'র রচয়িতা দেবতা হলেন শুক ঋষির বন্ধু। তাই এ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন—

বন্ধুর প্রকাশ ভালো লেগেছে। এর চেয়ে স্তবগান কি আর-কিছু আছে? দেবস্য পশ্য কাব্যম্। মন বলছে কাব্যকে দেখো, এ দেখার অন্ত চিন্তা করা যায় না।

—পূর্ববৎ

আর সেই সঙ্গে তিনি সুস্পষ্টভাবে আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছেন—

এ কথা বলব, সৃষ্টিতে আমার ডাক পড়েছে এইখানেই, এই সংসারের অনাবশ্যক মহলে। ইন্দ্রের সঙ্গে আমি যোগ ঘটাতে এসেছি যে যোগ বন্ধুত্বের যোগ। জীবনের প্রয়োজন আছে অন্নে বস্ত্রে বাসস্থানে, প্রয়োজন নেই আনন্দরূপে, অমৃতরূপে। সেইখানে জায়গা নেয় ইন্দ্রের সখারা।

—পূর্ববৎ

বলা বাহুল্য, সংসারের এই 'অনাবশ্যক মহল' হল কাব্যের মহল এবং 'ইন্দ্রের সখা' হলেন কবিরা। অন্যত্রও রবীন্দ্রনাথ আপন পরিচয় দিয়ে বলেছেন—'তপোভঙ্গ-দূত আমি মহেন্দ্রের', 'আমি কবি' ('পূরবী', তপোভঙ্গ ১৩৩০ কার্তিক)। সুতরাং কবিধর্মের সূত্রেই যে বৈদিক কবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়তা, এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।

এই 'দেবের কাব্য'কে—চিরপুরাতন বিশ্বের রহস্যকে বিস্ময়ভরা নবীন দৃষ্টিতে

দেখতে পারা, এই কবিধর্মেরই লক্ষণ। বৈদিক কবির চোখে স্বভাবতঃই এই সরল দৃষ্টি ছিল। রবীন্দ্রনাথ তা লক্ষ করেছিলেন।—

> যাহারা সরল চক্ষে দেখিয়াছে সকলেই এমনি করিয়া দেখিয়াছে। বৈদিক কবিরাও জলে স্থলে প্রাণকে দেখিয়াছেন, হৃদয়কে দেখিয়াছেন। নদী মেঘ ঊষা অগ্নি ঝড় বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে নহে ইচ্ছাময় মূর্তিরূপে তাঁহাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।
>
> —'পথের সঞ্চয়', কবি য়েট্স ১৩১৯ ভাদ্র

বিশ্বকে দেখার সেই 'সরল চোখ' রবীন্দ্রনাথের ছিল এবং কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তা প্রখরতর ও নিগূঢ়তর হয়ে ওঠে। সত্তর বছরের কবি তাই সে সত্যকে স্বীকার তথা প্রকাশ করে বলেছেন--

> আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি নি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না, বিস্ময়ের অন্ত পাই নি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদিকালের যে অনাহতবাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত তাকে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম।
>
> —'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৫, ১৩৩৮ পৌষ

কবির এই উক্তিতে যেন বৈদিক কবির অনুভূতির অভ্রান্ত প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তাই এই বৃহৎ বিশ্বের অসীম রহস্য সম্বন্ধে বৈদিক কবির বিস্ময়ব্যাকুল আকূতি রবীন্দ্রচিত্তে স্পন্দন তোলে।--

> অথ কো বেদ যত আবভূব। ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।... কে জানে কি হইতে ইহা হইল। এই সৃষ্টি কোথা হইতে হইল, কেহ ইহা সৃষ্টি করিয়াছে কি করে নাই।
>
> —বিবিধ প্রসঙ্গ', প্রকৃতি পুরুষ ১২৮৮ চৈত্র

কবির নিজের কণ্ঠেও এই বিস্ময়ভরা অনুভূতির গান শোনা যায়।—

আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান ॥

... ...

জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান

—'গীতিবিতান', প্রকৃতি, ৮-সংখ্যক গান

কিন্তু এই 'অজানা' রহস্যের কোনো মীমাংসা কবি খুঁজে পান নি। প্রথম জীবনে ঋষিকবির জিজ্ঞাসাকে অনুভব করে কবি তাকে রূপ দিয়ে লেখেন—

> বৈদিক ঋষি-কবিরা মহা-অন্ধকারের রাজ্য হইতে দিগন্তপ্রসারিত সমুদ্রগর্ভ হইতে তরুণ সূর্যকে উঠিতে দেখিয়া···সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'এ কোথা হইতে আসিল'।

—'সমালোচনা', ডি প্রোফণ্ডিস ১২৮৮ আশ্বিন

আর সারা জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে দাঁড়িয়েও তিনি এই 'অজানা' রহস্যকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে লিখে গেছেন—

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলে নি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিমসাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

—'শেষলেখা', ১৩-সংখ্যক কবিতা ১৯৪১ জুলাই ২৭

এই অনুভূতির ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ বৈদিক কবির আত্মীয়।

৪

বৈদিক ভাবধারার সঙ্গে রবীন্দ্র-মনোভাবের এত মিল ছিল বলে অনেক ক্ষেত্রেই কবি সচেতনভাবে আপন বক্তব্যের সমর্থনে বেদমন্ত্রের উদ্‌ধৃতি দিয়েছেন ও নূতনভাবে তার ব্যাখ্যা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ 'শেষ সপ্তক' কাব্যের একটি কবিতার কথা ধরা যাক। ওই কবিতায় কবি অথর্ববেদের—

পরি দ্যাবা পৃথিবী সদ্য আয়ম্
উপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য।

মন্ত্রটি উদ্‌ধৃত করে লেখেন—

ঋষি কবি বলেছেন—

ঘুরলেন তিনি আকাশ পৃথিবী,
শেষকালে এসে দাঁড়ালেন
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।
কে এই প্রথমজাত অমৃত,
কী নাম দেব তাকে ?
তাকেই বলি নবীন
সে নিত্যকালের।

— শেষ সপ্তক চল্লিশ-সংখ্যক কবিতা ১৩৪২ বৈশাখ

কবির মতে এই বিশ্বজগতে জরা মৃত্যু বুঁড়িং উপরকা। পত্রপুটের মতো আপনাকে কেবলই বিদীর্ণ করে চলেছে ঋষির চেতনায়। আর তারই মধ্যে থেকে চিরনবীনতার অমৃত পুষ্পই ফুটে উঠছে।

এখন রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যাই ঠিক ঋষিকবির অভিপ্রেত অর্থ কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে। সম্ভবত এটি কবির ভাবোদ্দীপক ব্যাখ্যামাত্র। তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, যুগ যুগ ধরে ভারতীয় ভাষ্যকারেরা তাঁদের ভাষ্যে আপন মতকে শাস্ত্রের উপর আরোপ করে দিয়ে বেদের অনুবাদ ও ভাষ্য প্রস্তুত করেছেন। মনীষী রবীন্দ্রনাথেরও সে অধিকার ছিল। সুতরাং কবির এই ব্যাখ্যাকে বেদের রবীন্দ্রভাষ্য বলে মেনে নেওয়া যায়। এর সপক্ষে আর একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ঋগ্বেদে পাই—

অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি।
যুধেদাপিত্বমিচ্ছসে। ৮।২১।১৩

রবীন্দ্রনাথ এই মন্ত্রটি উদ্ধৃত করে তার অনুবাদ করেছেন এইভাবে।—

হে ইন্দ্র তোমার শত্রু নেই, তোমার নায়ক নেই, তোমার বন্ধু নেই, তবু প্রকাশ হবার কালে যোগের দ্বারা বন্ধুত্ব ইচ্ছা কর।

— 'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬ ১৩৪৭ বৈশাখ

রবীন্দ্রনাথের এই অনুবাদ বৈদিক কবির বক্তব্যকে যে কতদূর অতিক্রম করে গেছে পূর্বোক্ত মন্ত্রের রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত অনুবাদ দেখলেই তা বোঝা যাবে। সেই অনুবাদটি হল—

হে ইন্দ্র তুমি জন্মাবধি শত্রুরহিত ও বহুকাল হইতে বন্ধুরহিত। তুমি যে বন্ধুত্ব ইচ্ছা কর, সে কেবল যুদ্ধদ্বারা লাভ করিয়া থাক।

—'ঋগ্বেদ সংহিতা' ১৯৬৩, বঙ্গানুবাদ : অষ্টম মণ্ডল

মূলানুগ এই অনুবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রকৃত অনুবাদের সম্পূর্ণ মিল নেই। আবার উক্ত মন্ত্রের অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে কবি তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন—

> যতবড়ো ক্ষমতাশালী হোন-না কেন সত্যভাবে প্রকাশ পেতে হলে বন্ধুতা চাই, আপনাকে ভালো লাগানো চাই। ভালো লাগাবার জন্য নিখিল বিশ্বে তাই তো এত অসংখ্য আয়োজন। তাই তো শব্দের থেকে গান জাগছে, রেখার থেকে রূপের অপরূপতা। সে যে কী আশ্চর্য সে আমরা ভুলে থাকি।
>
> —'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ

রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা দেখে তাঁর নিজের রচিত একটি গান মনে পড়ে।—

আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।
... ...
তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ-বেশে—
প্রভু, নিত্য আছ জাগি।

—'গীতাঞ্জলি', ১২১-সংখ্যক গান ১৩১৭ আষাঢ়

এই গানে কবিহৃদয়ের যে অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, উক্ত বেদমন্ত্রের রবীন্দ্রভাষ্যে যেন তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। অনুরূপভাবেই দেখি কবি অথর্ববেদের একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করে তার অনুবাদ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

অবির্ বৈ নাম দেবতর্ তেনাস্তে পরীবৃতা।
তস্যা রূপেণেমে বৃক্ষা হরিতা হরিতস্রজঃ ॥ ১০।৮।৩১

> সেই দেবতার নাম অবি, তাঁর দ্বারা সমস্তই পরিবৃত—এই-যে সব বৃক্ষ, তাঁরই রূপের দ্বারা এরা হয়েছে সবুজ, পরেছে সবুজের মালা। ঋষিকবি দেখতে পেয়েছিলেন কবির প্রকাশকে কবির দৃষ্টিতেই। সবুজের মালা-পরা এই অবির আবির্ভাবের এমন কোনো কারণ দেখানো যায় না যার অর্থ আছে প্রয়োজনে। বলা যায় না কেন খুশি করে দিলেন। এই খুশি সকল পাওনার উপরের পাওনা।
>
> —'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ

বৈদিক কবির কল্পনায় এই মন্ত্রে এ অর্থ তার সবটুকু ব্যঞ্জনা নিয়ে কি এইভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল?

কখনও কখনও কবি একই মন্ত্রকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিচিত্র অর্থে ব্যবহার করেছেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ঋগ্‌বেদের 'মধুবাতা ঋতায়তে'·· ইত্যাদি মন্ত্রটি (১।৯০।৬-৮) ধরা যাক। মধ্য জীবনে ধর্মবিষয়ক বক্তৃতায় বা শ্রাদ্ধসভায় পঠিত বিভিন্ন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ ছয়বার এটি ব্যবহার করেন। সে সময়ে এই মন্ত্রের যে তাৎপর্য কবির মনে প্রতিভাত হয়েছিল, তা হল—

> বৈরাগ্য যখন স্বাতন্ত্র্যের মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্যে আমাদের মহাসত্যের পরিচয়-সাধন করিয়ে দেয় · তখন যে আনন্দ সেই আনন্দই প্রেম।·· সেই প্রেমই মুক্তি—সমস্ত আসক্তির মৃত্যু। এই মৃত্যুরই সৎকার-মন্ত্র হচ্ছে—মধুবাতা ঋতায়তে···। (অর্থাৎ) বায়ু মধু বহন করছে, নদীসিন্ধুসকল মধু ক্ষরণ করছে। ওষধিবনস্পতি-সকল মধুময় হোক, রাত্রি মধু হোক, উষা মধু হোক, পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হোক, সূর্য মধুমান্‌ হোক।
>
> যখন আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে তখন জল স্থল আকাশ, জড় জন্তু মনুষ্য, সমস্তই অমৃতে পরিপূর্ণ— তখন আনন্দের অবধি নেই।

—'শান্তিনিকেতন' ১, বৈরাগ্য ১৩১৫ ফাল্গুন ১৫

এখানে কবি সচেতনভাবে সমস্ত আসক্তির অতিশায়ী এক মধুময় পৃথিবীর সন্ধান বলে দিয়েছেন। আর শেষ বয়সে জীবনের সমস্ত দুঃখবেদনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পরেও তাঁর চোখে পৃথিবী স্বভাবতঃই মধুময় রূপে দেখা দিয়েছে। তাই সিন্ধু-কাফির সুরে বাঁধা গান শুনে তাঁর মনে হয়—

> শুনতে শুনতে সরে গেল সংসারের ব্যবহারিক আচ্ছাদনটা,
> যেন কুঁড়ির থেকে পূর্ণ হয়ে ফুটে বেরোল
> অগোচরের অপরূপ প্রকাশ,
> ··· ··· ···
> একদা মৃত্যুশোকের বেদমন্ত্র
> তুলে ধরেছে বিশ্বের আবরণ, বলেছে—
> পৃথিবীর ধূলি মধুময়।
> সেই সুরে আমার মন বললে—
> সংগীতময় ধরার ধূলি।

—'পত্রপুট', পাঁচ সংখ্যক কবিতা ১৯৩৫ অকটোবর

আবার কৌতুকরস পরিবেশন করার জন্যও কবি অনায়াসে এই মন্ত্রটি ব্যবহার করেন। 'প্রহাসিনী' কাব্যের মধুসন্ধায়ী পর্যায়ের তৃতীয় কবিতার শিরোনাম 'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'। তাতে মধুসন্ধানী কবি মধু পেয়ে খুশি হয়ে মধুদাত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন—

শ্যামল আরণ্যমধু বহি এল ডাক-হরকরা—
আজি হতে তিরোহিতা পাণ্ডুবর্ণী বৈলাতী শর্করা।
... .
দেখিনু বেদের মন্ত্র সফল হয়েছে তব প্রাণে
তোমারে বরিল ধরা মধুময় আশীর্বাদ দানে।

—'প্রহাসিনী' : সংযোজন মধুসঞ্চায়ী-৩ ১৯৪০ মার্চ ৫

এখানে স্নিগ্ধ কৌতুকের সুরে এই মন্ত্রকে স্মরণ করলেও এর প্রতি কবির শ্রদ্ধা যে কত গভীর ছিল, তা বোঝা যায় তাঁর শেষ জীবনের আর একটি কবিতায়। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পূর্বে সদ্য রোগমুক্ত কবি এই বাণীর প্রতি তাঁর সুগভীর আস্থা জ্ঞাপন করে জানিয়ে গেছেন—

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি,
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।

—আরোগ্য ...-সংখ্যক কবিতা ... [illegible]

৫

বৈদিক ভাবধারার প্রতি রবীন্দ্রনাথের যতদূর অনুরাগ ছিল, তার প্রকাশভঙ্গির প্রতি তাঁর আকর্ষণ তার চেয়ে কম ছিল না। বস্তুতঃ বেদমন্ত্র তাঁর চিত্তকে যতদূর অধিকার করতে পেরেছিল তার প্রধান কারণ তার ছন্দ ও ভাষাভঙ্গির সৌন্দর্য। কবি তাঁর রচনায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে একাধিকবার তার উল্লেখ করেছেন। প্রথমে বৈদিক ছন্দ সম্বন্ধে কবির মনোভাবের পরিচয় নেওয়া যাক। ছন্দ সম্বন্ধীয় এক প্রবন্ধে কবি এক সময়ে লিখেছিলেন—

> ভারতবর্ষে বেদমন্ত্রে ছন্দ প্রথম দেখা দিল, মন্ত্রে প্রবেশ করল প্রাণের বেগ, সে প্রবাহিত হতে পারল নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে, আবর্তিত হতে থাকল মননধারায়। মন্ত্রের ক্রিয়া কেবল জ্ঞানে নয়, তা প্রাণে মনে, স্মৃতির মধ্যে তা চিরকাল স্পন্দিত হয়ে

বিরাজ করে। ছন্দের এই গুণ।

—'ছন্দ', গদ্যছন্দ ১৩৪১ বৈশাখ

এই গুণেই ছন্দোবদ্ধ বেদমন্ত্র কবির স্মৃতিতে জাগরূক ছিল।

গদ্যছন্দের আদিরূপও তিনি বেদের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন—

যজুর্বেদের গদ্যমন্ত্রের ছন্দকে ছন্দ বলেই গণ্য করা হয়েছে। তার থেকে দেখা যায় প্রাচীনকালেও ছন্দের মূল তত্ত্বটি গদ্যে পদ্যে উভয়ত্রই স্বীকৃত।

—পূর্ববৎ

এই উক্তির কয়েক বছর পরে শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত এক ভাষণে ('ছন্দ' প. ব. স, গদ্যকবিতার গতিক্রম ১৯৩৯ অগস্ট ২৯) দেখি রবীন্দ্রনাথ 'যজুর্বেদের উদাত্ত ছন্দে' গদ্যছন্দের মুক্ত পদক্ষেপের প্রমাণ লক্ষ করেছেন। এই মন্তব্যগুলির থেকেই বৈদিক ছন্দ সম্বন্ধে কবির সচেতনতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

তবে, ছন্দের চেয়ে বৈদিক ভাষাভঙ্গি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল বেশি। ভাষার গুরুত্ব সম্বন্ধে বৈদিক ঋষিরা যে কতখানি সচেতন ছিলেন ঋগ্বেদে বাগ্দেবতার মহিমময় স্তবটিতে (১০।১২৫।৩?) তার পরিচয় আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে ভাষা হলেন রাষ্ট্রী। তিনি পূজনীয়দের মধ্যে প্রথমা। তিনি যাকে অনুগ্রহ করেন তাকেই বলবান্ করেন, সৃষ্টিকর্তা করেন ঋষি করেন এবং প্রজ্ঞাবান করেন। এর থেকেই বোঝা যায় ভাষাশক্তির উপর ঋষিকবির আস্থা কত গভীর ছিল। রবীন্দ্রনাথ বাগ্দেবতার এই স্তবটির সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন এবং ভাষার গুরুত্ব ও উপযোগিতা প্রতিপাদন করার জন্য তিনি তার 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থে এই স্তোত্রটির অনুবাদ সংকলন করে দিয়েছেন।

আবার ঋষিকবি বাগ্দেবতার বন্দনা করেই যে ক্ষান্ত থাকেন নি, ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতাকেও যে যতদূর সম্ভব কাজে লাগিয়েছিলেন, সেটিও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। বৈদিক সাহিত্যের প্রকাশসৌন্দর্য কবিকে যে কতদূর মুগ্ধ করেছিল তার প্রমাণ তিনি তাঁর কবিতার বহু স্থলেই বেদের মন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন, কখনও বা স্বেচ্ছায় বৈদিক বাচনভঙ্গিটি পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ কবির বিশেষ প্রিয় উষাসূক্তের কথা ধরা যাক। প্রথম জীবনে তিনি লিখেছিলেন—

প্রাচীন কালের লোকেরা প্রকৃতিকে এবং সংসারকে যেরকম ভাবে দেখত আমরা ঠিক সেভাবে দেখি নে।…বিশ্ব সম্বন্ধে মানুষের মনের ভাব যে অনেকটা পরিবর্তিত হয়ে গেছে তার আর সন্দেহ নেই। বৈদিক কালের ঋষি যেভাবে উষাকে

দেখতেন এবং স্তব করতেন আমাদের কালে ঊষা সম্বন্ধে সে ভাব সম্পূর্ণ সম্ভব নয়।

—'সাহিত্য' : সংযোজন, মানবপ্রকাশ ১২৯৯ ভাদ্র-আশ্বিন

এ ছাড়া 'যে ঋষি কবিরা ত্রিষ্টুভ্ ছন্দে তরুণী ঊষার বন্দনা' করেছিলেন, ১৩০৯ সালে ('ভারতবর্ষ', নববর্ষ) কবি তাঁদের কথা স্মরণ করেন। আর শেষ জীবনে শুনি তাঁর ঊষার স্তুতি—

হে ঊষা তরুণী,
নিশীথের সিন্ধুতীরে নিঃশব্দের মন্ত্রস্বর শুনি
যেমনি উঠিলে জেগে, দেখিলে তোমার শয্যাশেষে
তোমারি উদ্দেশে
রেখেছে ফুলের ডালি
শিশিরে প্রক্ষালি
কোন মৌন-অন্ধকারে কে প্রেমিক প্রচ্ছন্ন রাতের।

-- 'বিচিত্রিতা' দান

এই কবিতাটির সম্বন্ধে অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন—

> বৈদিক ঊষা-বর্ণনার সঙ্গে যাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিয়াছে তাঁহার নিকটে বুঝাইয়া বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই ঊষার এই বর্ণনার সহিত বৈদিক ঊষা-বর্ণনার কি ঘনিষ্ঠ যোগ।

—'উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস', অধ্যায় ১

অনুরূপভাবেই তিনি 'ধর্ম' গ্রন্থের অন্তর্গত দিন ও রাত্রি প্রবন্ধে রাত্রির বর্ণনা দেখে বলেছেন যে সামান্য পার্থক্য সত্ত্বেও এটিকে 'রাত্রিসূক্ত' বলা যেতে পারে।

এখানে বৈদিক সূক্ত ও রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে প্রকাশভঙ্গির যে সাধর্ম্য দেখানো হল, তা যে রবীন্দ্রনাথের উপর বৈদিক সাহিত্যের সচেতন প্রভাবজাত, তা নাও হতে পারে। তবে প্রত্যক্ষভাবেও কবি বৈদিক ভাষাভঙ্গির প্রতি তাঁর অনুরাগ বারে বারেই প্রকাশ করেছেন। এক সময়ে তিনি লিখেছিলেন—

> রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, আমি যেন মৃত্যু সম্বন্ধে কোনো একটি বেদমন্ত্র আবৃত্তি করে সেইটে কাকে বুঝিয়ে বলছি। আশ্চর্য তার রচনা, যেন একটা বিপুল আর্তস্বরের মতো, অথচ তার মধ্যে মরণের একটা বিরাট বৈরাগ্য আছে।

—'জাপানযাত্রী', অধ্যায় ৩, ১৩২৩ বৈশাখ

উক্ত মন্তব্যে বেদমন্ত্রের আশ্চর্য রচনানৈপুণ্যের প্রতি কবির বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। এর কিছুকাল পরে কোনো এক অনুষ্ঠানে বেদমন্ত্র-পাঠের পর অভিভাষণ

দিতে গিয়ে তিনি ওই মন্ত্রগুলির সম্বন্ধে বলেন—

> যে বেদমন্ত্রগুলি এইমাত্র পড়া হল তারপরে আমি আর কিছু বলা ভালো মনে করি না। সেগুলি এত সহজ, এমন সুন্দর, এমন গম্ভীর যে, তার কাছে আমাদের ভাষা পৌঁছয় না। জলের শুচিতা, তার সৌন্দর্য, তার প্রাণবত্তার অকৃত্রিম আনন্দে এই মন্ত্রগুলি নির্মল উৎসের মতো উৎসারিত।
>
> —'পল্লীপ্রকৃতি', জলোৎসর্গ ১৩৪৩ ভাদ্র

এখানে বৈদিক ভাষার সাবলীল প্রকাশসৌন্দর্যের কাছে আপনার ভাষাদৈন্য অনুভব করে কবি সংকুচিত। এমন কি তাঁর আজীবন সাহিত্যসাধনার শেষ প্রান্তে পৌঁছেও তিনি আপনার প্রকাশক্ষমতার অভাবে বৈদিক বাণীর সহায়তায় লেখেন—

> তাই আজ বেদমন্ত্রে হে বজ্রী, তোমার করি স্তব।
>
> —'নবজাতক', রূপ-বিরূপ ১৯৪০ জানুআরি

কখনও বা জ্যোতিঃস্বরূপ সবিতার কাছে তাঁর 'নিঃশব্দ বন্দনা' পাঠিয়ে আক্ষেপ করেন—

> মনে মনে ভাবিয়াছি, প্রাচীন যুগের
> বৈদিক মন্ত্রের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার
> মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে।
> ভাষা নাই, ভাষা নাই,
> চেয়ে দূর দিগন্তের পানে
> মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডুনীল মধ্যাহ্ন-আকাশে।
>
> —'আরোগ্য', ৩-সংখ্যক কবিতা ১৯৪১ ফেব্রুআরি

বৈদিক কবির উদ্দেশ্যে এইটিই কবি রবীন্দ্রনাথের শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক

বৈদিক সংহিতার পরেই ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের কথা স্মরণ করতে হয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের স্থান নগণ্য। তাঁর রচনায় ঐতরেয় ও ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকের একটি করে মন্ত্রের উদ্‌ধৃতি চোখে পড়ে।

প্রথমে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কথা ধরা যাক। উক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ পঞ্চিকা, পঞ্চম অধ্যায় প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত শিল্পসম্বন্ধীয় কিছু অংশ কবি ব্যবহার করেছেন। ১৩৪০ সালে সাহিত্যতত্ত্বের প্রসঙ্গে কবি প্রথম এটি স্মরণ করে বলেন—'আত্ম-সংস্কৃতির্বাব শিল্পানি' ('সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব)। এ স্থলে তিনি বলতে চেয়েছেন, জীবনযাত্রার অভাবমোচনের জন্য যেমন মানুষের নানা বিদ্যা, নানা চেষ্টা, তার 'মনের মানুষ'কে

সরস করে জাগিয়ে রাখার জন্য তেমনি তার শিল্প, তার সাহিত্য। এই শিল্পসাহিত্যের মধ্য দিয়ে সে আপনাকে সম্যক্‌রূপে সংস্কৃত করে তুলছে। তার দ্বারা সে আপনিই প্রকাশিত হয়ে উঠছে।

এর কয়েক মাস পরে ছন্দের প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে এই কথাটিই কবি স্পষ্টতর করে ব্যাখ্যা করলেন।—

> ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছেন, আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি। শিল্পই হচ্ছে আত্মসংস্কৃতি। সম্যক্ রূপদানই সংস্কৃতি, তাকেই বলে শিল্প। আত্মাকে সুসংযত করে মানুষ যখন আত্মার সংস্কার করে, অর্থাৎ তাকে দেয় সম্যক রূপ সেও তো শিল্প। মানুষের শিল্পের উপাদান কেবল তো কাঠপাথর নয়, মানুষ নিজে। বর্বর অবস্থা থেকে মানুষ নিজেকে সংস্কৃত করেছে। এই সংস্কৃতি তার স্বরচিত বিশেষ ছন্দোময় শিল্প। এই শিল্প নানা দেশে, নানা কালে, নানা সভ্যতায়, নানা আকারে প্রকাশিত, তার নানা বিচিত্র ভাব ছন্দ। ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে। শিল্পাচারের যজমান আত্মাকে ছন্দোময় করে, তাকে করে সংস্কৃত।
>
> —ছন্দ ছন্দের প্রকৃতি . [illegible] বর্ষা

উল্লিখিত অংশে দেখি শিল্পসম্বন্ধীয় উক্তিটির দ্বারাও কবি ছন্দকে তার বাঁধা সাহিত্যের সংকীর্ণতা থেকে বৃহত্তর পরিধিতে বিস্তৃত করে দিয়েছেন। এর পরে সংস্কৃতি শব্দের অর্থ, তার তাৎপর্য ও তার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়েও তিনি এই উদ্ধৃতিটিই স্মরণ করেছেন ('বাংলা শব্দতত্ত্ব', কালচার ও সংস্কৃতি ১৩৪২)।

এই তিন বারই তিনি উক্ত শ্লোকাংশটি তার রচনায় ব্যবহার করেছেন। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে এই উদ্ধৃতিটি তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্যে কখনও ব্যবহৃত হয় নি এবং এটি 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থেও পাওয়া যায় না। এর থেকে অনুমান করা চলে যে, পরিণত বয়সে বিশেষ প্রয়োজনে কবি সযত্নে এটি আহরণ করেছিলেন এবং সমগ্র ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে তিনি সম্ভবতঃ পরিচিত ছিলেন না।

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গেও কবির সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে। এই গ্রন্থের অন্তর্গত 'যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব' (১।৩।৯) ইত্যাদি মন্ত্র হিন্দুবিবাহের একটি সুপরিচিত মন্ত্র। তাই এ শ্লোকাংশের উদ্ধৃতি মূল ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের সঙ্গে কবির পরিচয় সূচিত করে না। বিশেষতঃ এই গ্রন্থের আর কোনো উদ্ধৃতি রবীন্দ্রসাহিত্যে চোখে পড়ে নি। আবার 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থেও এই মন্ত্রটি পাওয়া যায় না এবং এই মন্ত্রের প্রসঙ্গে তাঁকে 'তুভ্যং অহং সম্প্রদদে' ইত্যাদিও স্মরণ করতে দেখা যায়। তার থেকে মনে হয়, এই মন্ত্রটি কবি সুপ্রচলিত বিবাহপদ্ধতি থেকেই গ্রহণ করেছিলেন, মূল গ্রন্থ

থেকে নয়।

কবি বিচিত্র প্রসঙ্গেই এই মন্ত্রটি কাজে লাগিয়েছেন। তার অর্থব্যাখ্যার মধ্যেও কবির সৃষ্টিপ্রবণতা কাজ করেছে। তাই কখনও কখনও একই মন্ত্রকে তাঁর বিভিন্ন রচনায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। দুএকটি উদাহরণ দিলেই কবির এই মন্ত্রপ্রয়োগের বৈশিষ্ট্যটি বোঝা যাবে। প্রথমতঃ একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদ ইংরাজের কপট আন্তরিকতার প্রতি কটাক্ষ করে নরম ভাবে মন্তব্য করে বলেন—

> ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলি তাহার দৃষ্টান্ত। ইংরেজ ক্রমাগতই তাহাদের কানে মন্ত্র আওড়াইতেছে, 'যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব', কিন্তু তাহারা শুধু মন্ত্রে ভুলিবার নয়—পণের টাকা গনিয়া দেখিতেছে।

—'রাজাপ্রজা, কন্সীবিধলিজম্ ১৩১২

এদিকে 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থমালার কোনো এ মন্ত্র কবি আধ্যাত্মিক রূপকরূপে গ্রহণ করেছেন। এখানে তিনি পরমাত্মা ও মানবাত্মাকে যথাক্রমে [illegible] বলেছেন যে, 'যদেতদ্ হৃদয়ং মম' ইত্যাদি মন্ত্র [illegible] এক হওয়ার বর্ণনা করে দিয়েছেন (শান্তিনিকেতন [illegible])। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে অনেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধটিকে বর-বধূর দাম্পত্য সম্বন্ধরূপে কল্পনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ একটি কবিতাংশ উল্লেখ করা যায়।—

ওগো বর, ওগো বধু
জান না কি তুমি— ধুলায় বসিয়া
এ বালা তোমারি বধু।
রতন আসন তুমি এরি তরে
রেখেছ সাজায়ে নির্জন ঘরে
সোনার পাত্রে ভরিয়া রেখেছ নন্দনবনমধু—
ওগো বর ওগো বধু।

— খেয়া বালিকা বধূ ১৩১২ শ্রাবণ ১৫

কাব্যদৃষ্টিতে পরমসত্তা এই ভাবেই বালিকাকে তার অগোচরেই অসীম স্নেহে আপন বলে গ্রহণ করেন। কবির একাধিক রচনাতে এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে। বলা বাহুল্য, এটি বিশুদ্ধভাবেই রবীন্দ্রদর্শন।

যাই হক, ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের উক্ত মন্ত্রটি কবি শেষ জীবনেও স্মরণ করেছেন। সাহিত্যের দেশকালাতীত চিরন্তন মূল্য নির্ধারণ করতে গিয়ে তাই তিনি মন্তব্য করেন—

যদি বলি 'তুভ্যমহং সম্প্রদদে', তা হলেই কি বর এসে হাত পাতেন। নিত্য কাল এবং নিখিল বিশ্ব এই কথাই বলেন—'যদেতদ্ হৃদয়ং মম' তার সঙ্গে তোমার সম্প্রদানের মিল থাকা চাই। তোমার অনন্তং যা দেবেন আমি তাই নিতে পারি। তিনি মেঘদূতকে নিয়েছেন, তা উজ্জয়িনীর বিশেষ সম্পত্তি না। তার মন্দাক্রান্তার মধ্যে পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সকল নদীরই কলধ্বনি মুখরিত।

— সাহিত্যের পথে, সাহিত্য ১৩৩০ বৈশাখ

আর কাব্যে ছন্দের উপযোগিতা বোঝাবার উদ্দেশ্যেও কবি এই মন্ত্রের সাহায্যেই তাঁর প্রকাশভঙ্গিকে সুন্দরভাবে অলংকৃত করে তুলেছেন।—

এ পর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁঠ বেঁধে দিয়েছে ছন্দ। পরস্পরকে বলিয়ে নিয়েছে যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। বাক্ এবং অবাক্ বাঁধা পড়েছে ছন্দের মাল্যবন্ধনে। এই বাক্ এবং অবাকের একান্ত মিলনেই কাব্য।

— 'ছন্দ', গদ্যকবিতার রূপ ও বিকাশ ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা পত্র ১৩৩৯ কার্তিক ১

এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ কখনও কৌতুকসৃষ্টি কখনও বা সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়োজনে সাধারণ অর্থেই বারংবার মন্ত্রটি স্মরণ করেছেন। তবে এটির প্রয়োগক্ষেত্র পরিবর্তিত হলেও তার অর্থ ও তাৎপর্যের বিশেষ বদল করা হয় নি।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের একটি মাত্র শরৎ প্রশস্তিকে (১।৪।১) কবি তার 'শারদোৎসব' নাটকে (১৩১৫ ভাদ্র) ব্যবহার করেছেন। উক্ত নাটকের রাজসন্ন্যাসী বিজয়াদিত্য এই 'বেদমন্ত্র'টি উচ্চারণ করে শরতের আবাহন করেছেন। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই নাটকের প্রয়োজনেই উক্ত উদ্ধৃতিটি নির্বাচিত হয়েছে। তা ছাড়া এ কথাও বলা চলে যে বেদমন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা সমস্ত অনুষ্ঠানকে বিশেষ গুরুত্ব ও মহিমায় মণ্ডিত করার বিশেষ প্রবণতাটিও এখানে সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের উপাদান এর বেশি আর দেখা যায় নি।

দ্বিতীয় পর্যায়

উপনিষদ্

রবীন্দ্রমানসের গঠনে উপনিষদের উপকরণই যে সবচেয়ে বেশি এ কথা সর্বজনবিদিত। তাঁর 'মনের হাওয়া তৈরি করা'র ব্যাপারে উপনিষদের গুরুত্ব যে কতদূর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লেখা এক পত্রে[১] (১৩২৮ কার্তিক ১৪) কবি নিজেই তার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে উদ্ধৃত ও উল্লিখিত উপনিষদের অজস্র উপাদানগুলি তারই প্রমাণ

১ দ্রষ্টব্য. তৃতীয় পর্ব বৈষ্ণব পদাবলী অধ্যায়: পরিচ্ছেদ ১

বহন করে। পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগটি দেখলে এই উদ্ধৃতি, অনুবাদ ও উল্লেখের পরিমাণ বোঝা যাবে। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যে উপনিষদের স্থান যে কোথায় সে কথাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাঁর ধর্মসম্পর্কিত গদ্যরচনাগুলি তো প্রায় উপনিষদের বাণীরই ভাষ্যরচনা। আবার শুধু গদ্যেই নয়, কবিতাতেও দেখি তিনি প্রত্যক্ষভাবে উপনিষদ্‌কে স্মরণ করেছেন।

উপনিষদের এই অজস্র উদ্ধৃতিগুলি কবি কিভাবে প্রয়োগ করেছেন, কিভাবে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁর নিজের বাণীর সঙ্গে উপনিষদের কোন্ কোন্ বাণীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগ আছে, তার সম্যক্ পরিচয় ও সর্বাংগীণ আলোচনার জন্য একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। আর উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের যোগাযোগ বিষয়ে বিভিন্ন দিক্ থেকে এ পর্যন্ত বেশ কিছু আলোচনাও হয়েছে। অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস' গ্রন্থে উপনিষদের ভাবনার সঙ্গে কবিমনের নিগূঢ় যোগসূত্র আবিষ্কার করে দার্শনিক দিক থেকে তার বিশ্লেষণ করেছেন। এ ছাড়া বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য-প্রমুখ অনেকে রবীন্দ্রমানসের সঙ্গে উপনিষদের সম্পর্ক নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তবে এ বিষয়ে সূক্ষ্মতর এবং পূর্ণতর আলোচনার অবকাশ এখনও আছে। কিন্তু এই জাতীয় আলোচনা বর্তমান নিবন্ধের অভিপ্রায়-বহির্ভূত। অথচ রবীন্দ্রমানসের আলোচনায় উপনিষদের গুরুত্ব এত বেশি যে তাকে বাদ দিলে রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপটি পরিস্ফুট হতে পারে না। তাই বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রব্যবহৃত উপনিষদের শ্লোকগুলি অবলম্বন করে কবিচিত্তে ঔপনিষদিক ভাবধারার বিবর্তন বা ক্রমপরিণতির একটু পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যাক।

২

প্রধানতঃ ঔপনিষদিক তত্ত্বের সঙ্গেই রবীন্দ্রমানসের সুগভীর যোগ ছিল। কিন্তু সমগ্র উপনিষদ্‌কে কবি দেশকালনিরপেক্ষ নিছক তত্ত্ব হিসাবে দেখেন নি, তার ঐতিহাসিক পটভূমি সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। অবশ্য উপনিষদ্ থেকে কবি কখনও সচেতনভাবে ইতিহাস নিষ্কর্ষণের চেষ্টা করেন নি। তবে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারা নির্ণয়ের উপলক্ষে প্রসঙ্গক্রমে মধ্যে মধ্যে তিনি উপনিষদ্ সম্বন্ধে যে মন্তব্যগুলি করেছেন, তার থেকেই ঔপনিষদিক যুগপরিবেশ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্ররচনার নানা স্থানেই সে পরিচয় বিকীর্ণ হয়ে আছে। এ সম্বন্ধে কবিকৃত দুএকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করলেই এ কথার সত্যতা বোঝা যাবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে বিশেষ

সামাজিক পরিবেশেই উপনিষদ্‌গুলির বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব। তাই সে যুগের সামাজিক অবস্থাটি বিবৃত করে তিনি লিখেছেন—

> একদা ব্রাহ্মণেরা যখন আর্যদের চিরাগত প্রথা ও পূজাপদ্ধতিকে আগলাইয়া বসিয়াছিলেন, যখন সেই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডকে ক্রমশই তাঁহারা কেবল জটিল ও বিস্তারিত করিয়া তুলিতেছিলেন, তখন ক্ষত্রিয়েরা সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক ও মানুষিক বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে জয়োল্লাসে অগ্রসর হইয়া চলিতেছিলেন।··· মৃত্যুর সম্মুখে যাহারা একত্র হয় তাহারা পরস্পরের অনৈক্যকে বড়ো করিয়া দেখিতে পারে না।·· অতএব ·· আর্যদলের মধ্যকার ঐক্যসূত্রটি ছিল ক্ষত্রিয়দের হাতে। এইরূপে একদিন ক্ষত্রিয়েরাই সমস্ত অনৈক্যের অভ্যন্তরে একই যে সত্য-পদার্থ, ইহা অনুভব করিয়াছিলেন। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা হইয়া উঠিয়া ঋক যজুঃ সাম প্রভৃতিকে অপরাবিদ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত হোম যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডকে নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছে। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা সম্পূর্ণ আশ্রয় লাভ করিয়াছিল এবং সেইজন্য ব্রহ্মবিদ্যা 'রাজবিদ্যা' নাম গ্রহণ করিয়াছে।
>
> —'ইতিহাস', ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ১৩১৯ বৈশাখ

এখানে সুস্পষ্টভাবে উপনিষদের উল্লেখ না থাকলেও এই 'ব্রহ্মবিদ্যা' বা 'রাজবিদ্যা'র অর্থ যে উপনিষদ্ এবং কবি যে এখানে উপনিষদের পটভূমির কথাই লিখেছেন, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

আবার শুধু উপনিষদের উদ্ভব নয়, ভারতচিন্তার ইতিহাস সম্বন্ধেও তিনি যে সচেতন ছিলেন, উক্ত প্রবন্ধে তারও পরিচয় আছে। সে বিষয়ে তিনি লিখেছেন—

> ভারতবর্ষের ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে আমরা দুইটি ধারা দেখিতে পাই, নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম, অভেদ ও ভেদাভেদ। এই ব্রহ্মবিদ্যা কখনো একের দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকিয়াছে, কখনো দুইকে মানিয়া সেই দুয়ের মধ্যেই এককে দেখিয়াছে। দুইকে না মানিলে পূজা হয় না, আবার দুইয়ের মধ্যে এককে না মানিলে ভক্তি হয় না। ··বৈদিক দেবতা যখন মানুষ হইতে পৃথক তখন তাঁহার পূজা চলিতে পারে, কিন্তু পরমাত্মা ও জীবাত্মা যখন আনন্দের অচিন্ত্যরহস্যলীলায় এক হইয়াও দুই, দুই হইয়াও এক, তখনই সেই অন্তরতম দেবতাকে ভক্তি করা চলে। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যার আনুষঙ্গিকরূপেই ভারতবর্ষে প্রেমভক্তির ধর্ম আরম্ভ হয়।
>
> —'ইতিহাস', ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ১৩১৯ বৈশাখ

উপনিষদ্‌গুলি একজন মাত্র ব্যক্তির রচনা নয় বলেই সবগুলি উপনিষদ্ কোনো একটি

বিশেষ মতবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি যেসব চিন্তাধারা পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে দেখা গিয়েছিল, তার পূর্বাভাস এই উপনিষদ্‌গুলির নানা স্থানে পাওয়া যায়। অথচ প্রাচীন কাল থেকেই ভাষ্যকারেরা এই সহজ সত্যকে অস্বীকার করে সব উপনিষদ্‌গুলিকেই কোনো কোনো বিশেষ মতবাদের কোঠায় ফেলে ভাষ্য রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আধুনিক যুগসুলভ ইতিহাসদৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন যে একটিমাত্র মতের দ্বারা এই বিভিন্ন উপনিষদ্‌গুলিকে সমন্বিত করা যায় না। তাই সহজেই তিনি এই ব্রহ্মবিদ্যার উক্ত দুই ধারাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং তার দ্বারাই ভারত-ইতিহাসের অন্তর্নিহিত সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন।

উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বচিন্তার ধারার মতো তিনি তার শিক্ষাদর্শের ধারা সম্বন্ধেও যে অবহিত ছিলেন, আর একটি প্রাসঙ্গিক উল্লেখ থেকে সে কথা বোঝা যায়। শেষ বয়সে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ সম্বন্ধে আলোচনা উপলক্ষে তিনি উপনিষদের যুগকে স্মরণ করেন।—

> উপনিষদের কালেও ভারতবর্ষে একরকম বিদ্যাকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছিল, তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু পাঞ্চালদেশের 'পরিষদ'এ জৈবালি প্রবাহণের কাছে এসেছিলেন। এই স্থানটি আলোচনা করলে বোঝা যায়, ঐ পরিষদ ঐ দেশের বড়ো বড়ো জ্ঞানীদের সমবায়ে। এই পরিষদ্ জয় করতে পারলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ হত। অনুমান করা যায় যে, সমস্ত পাঞ্চালদেশের মধ্যে উচ্চতম শিক্ষার উদ্দেশে সম্মিলিতভাবে একটা প্রতিষ্ঠান ছিল, বিদ্যার পরীক্ষা দেবার জন্যে সেখানে অন্যত্র থেকে লোক আসত। উপনিষদ্ কালের বিদ্যা যে স্বভাবতই স্থানে স্থানে শিক্ষা-আলোচনা তর্কবিতর্ক ও জ্ঞানসংগ্রহের জন্য আপন আশ্রয়রূপে পরিষদ্ রচনা করেছিল, তা নিশ্চিত অনুমান করা যেতে পারে।
>
> —'শিক্ষা', বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ : ভাষণ ১৯৩২ ডিসেম্বর

এর থেকে বোঝা যায়, ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে কত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কবি এই উপনিষদ্‌গুলির পরিচয় গ্রহণ করেছিলেন ও তার অন্তর্নিহিত তথ্যগুলিকে অধিগত করে নিয়েছিলেন।

৩

উপনিষদ্ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসবোধের অভাব না থাকলেও এ বিষয়ে কয়েকটি

প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের অধিক কবি আর অগ্রসর হন নি। কিন্তু উপনিষদের ভাবাদর্শই যে আজীবন রবীন্দ্রমানসকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল কবি নিজেই সে সত্য বারংবার স্বীকার করেছেন। তাই পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবীকে এক পত্রে লেখেন—

> আমার জীবনের মহামন্ত্র পেয়েছি উপনিষদ্ থেকে, যে উপনিষদ্কে একদা বাংলা-দেশের বেদ-বর্জিত নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা বলেছিল রামমোহন রায়ের জাল-করা,—যে উপনিষদ্ মানুষের আত্মার মধ্যেই পরমাত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন, যে উপনিষদের অনুপ্রেরণায় বুদ্ধদেব বলে গিয়েছেন জীবের প্রতি অপরিমেয় প্রীতিই ব্রহ্মবিহার।
>
> —'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-২০, ১৩৩৮ আষাঢ় ৩

এখানে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে উপনিষদের গুরুত্ব নিরূপণ করে কবি ঔপনিষদিক মন্ত্রকেই তাঁর 'জীবনের মহামন্ত্র'-রূপে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, বাল্যকাল থেকে সুদীর্ঘ আশি বৎসর বয়স পর্যন্ত উপনিষদের সঙ্গে যাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় তিনি কি আজীবন উপনিষদ্কে একই দৃষ্টিতে দেখেছেন? তার বয়োবৃদ্ধি ও মানসবিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও কি স্বাভাবিক ভাবেই বিবর্তিত হয় নি?

এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আমার ধর্ম' নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

> একজন লেখক আমার রচিত ধর্মসংগীতের একটি সমালোচনা বের করেছিলেন। তাতে বেছে বেছে আমার কাঁচাবয়সের কয়েকটি গান দৃষ্টান্তস্বরূপ চেপে ধরে তিনি তাঁর ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছেন।
>
> —'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৩, ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক

কবির বক্তব্য হল, এ রকম খাপছাড়া করে দেখাকে সত্য দেখা বলা যায় না। এর কিছু কাল পরে তিনি আর একটি প্রবন্ধে সুস্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দেন—

> যে মানুষ সুদীর্ঘ কাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিক ভাবে দেখাই সংগত।
>
> —'কালান্তর', রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত ১৩৩৬ অগ্রহায়ণ

সুতরাং উপনিষদ্ সম্বন্ধে কবির প্রকৃত মনোভাব জানতে হলে কবিমানসে উপনিষদ্-ভাবনার বিবর্তনের ধারাটি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পারিবারিক আবহাওয়ার পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন—

> আমার জন্ম যে পরিবারে সে পরিবারের ধর্মসাধন একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ্ এবং পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন এবং আর-আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জাতকর্ম থেকে

আরম্ভ করে আমার সব সংস্কারই বৈদিক মন্ত্র দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অবশ্য ব্রাহ্মমতের সঙ্গে মিলিয়ে।

—'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, পরিশিষ্ট : মানবসত্য

অতএব বাল্যাবধি কবি ব্রাহ্মসমাজবিহিত উপনিষদের মন্ত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তবু কবি নিজেই লিখেছেন—

আমাদের পরিবারে যে-ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনো সংস্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই।

—'জীবনস্মৃতি' ১৯১২, ভগ্নহৃদয়

সম্ভবতঃ সেই কারণেই তাঁর প্রথম যুগের রচনায় উপনিষদের শ্লোকের কোনো স্পষ্ট উল্লেখ বা আলোচনা পাওয়া যায় না। কিন্তু মহর্ষিদেব যখন কবিকে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদকরূপে নির্বাচন করালেন (১২৯১ আশ্বিন ১৮৮৪), তখন থেকে তিনি বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজবিহিত ধর্মের অনুশীলনে ব্রতী হন। সেই সময়ে তিনি রামমোহন রায় সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ (ভারতী ১২৯১ মাঘ) লেখেন, তাতে "তরুণ কবি ব্রাহ্মমতের ধর্ম ও বিশ্বাসকে সমর্থন ও প্রচার" করেন (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-কৃত 'রবীন্দ্রজীবনী' ১ম খণ্ড ১৩৬৭, পৃ ১৮৮)। সুতরাং এই সময় থেকেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম এবং উপনিষদের শ্লোকগুলির সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন হতে থাকেন, এ কথা বলা চলে। এর পরে ব্রহ্মমন্ত্র (১৯০১) এবং ঔপনিষদ ব্রহ্ম (১৯০১) পুস্তিকা দুটিতে মুখ্যতঃ উপনিষদ্‌বর্ণিত ধর্মতত্ত্বেরই আলোচনা দেখা যায়। তবে তখনও পর্যন্ত "আদি ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্ম দুই প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত হয়—রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধর্মমতের দীপ্তি এখনো হয় নাই" ('রবীন্দ্রজীবনী' ১ম ১৩৬৭, পৃ ৪৫৭)।

কিন্তু প্রায় এই সময়েই কবি 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের (১৯০০) অন্তর্গত যে সনেটগুলি লেখেন তাতে তাঁর অন্তরের অনুভূতিরই প্রকাশ দেখা গেছে। ওই কাব্যের একটি সনেটে কবি বলেন—

তোমারে বলেছে যারা পুত্র হতে প্রিয়,
বিত্ত হতে প্রিয়তর, যা-কিছু আত্মীয়
সব হতে প্রিয়তম নিখিল ভুবনে,
আত্মার অন্তরতর, তাদের চরণে
পাতিয়া রাখিতে চাহি হৃদয় আমার।

—'নৈবেদ্য', ৭৯-সংখ্যক সনেট

এখানে বৃহদারণ্যকের 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ'...ইত্যাদি শ্লোকটির (১।৪।৮) উল্লেখ

করে এই মন্ত্রের উদ্গাতা ঋষির প্রতি কবি তাঁর একান্ত আনুগত্য স্বীকার করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় ওই সময়েই উপনিষদের মন্ত্রগুলির প্রতি তাঁর আকর্ষণ কত গভীর হয়ে গিয়েছিল। এর কয়েক বছর পরে নির্ঝরিণী সরকারকে লেখা কবির এক পত্রে (১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৭) দেখি—

> কোনো কোনো লোক ঈশ্বরকে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য এক একটি মন্ত্রকে আশ্রয় করে থাকেন।…আমিও উপনিষদের কোনো কোনো শ্লোককে এইরূপ আশ্রয়ের মত অবলম্বন করে থাকি। এই রকম এক-একটি মন্ত্র তুফানের সময় হালের মত কাজ করে।

—'চিঠিপত্র' ৭, পত্র-৩, ১৯০৮ মে ৩০

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লেখা আর একটি পত্রেও (১৩১৭ পৌষ ১৮) দেখি কবি লেখেন—

> আমি উপাসনাকালে এবং অন্য সময়েও 'পিতা নোঽসি' এবং 'অসতো মা' এই দুই মন্ত্র বারম্বার উচ্চারণ করতে থাকি—করিতে করিতে যে পর্যন্ত আমার মন এই দুটি মন্ত্র সম্বন্ধে সজ্ঞান হইয়া না উঠে ততক্ষণ ছাড়ি না। 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' এ মন্ত্রও অনেক সময় আমার বিশেষ উপকারে আসিয়াছে—কোনো সাংসারিক কারণে মন ক্ষুব্ধ হইলে বা কোনো প্রকার ক্ষতি বা অনিষ্টের আশঙ্কায় মন উদ্বিগ্ন হইলে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ মন্ত্র জপ করিয়া একটি গভীর শান্তি ও মঙ্গলের মধ্যে মন প্রবেশ করে।

—'চিঠিপত্র' ৭ (১৩৬৭), গ্রন্থপরিচয়, পৃ ১৮৭

যতীন্দ্রনাথকে লেখা আর একটি পত্রেও (১৩১৭ ফাল্গুন ৯) দেখি তিনি লিখেছেন—

> যখন একটু অবকাশ পাবে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—শান্তম্ শিবমদ্বৈতং এই মন্ত্রটাকে মনের একেবারে তলা পর্যন্ত গ্রহণ করবার চেষ্টা কোরো—ঐ কথাগুলো যেন রক্তের সঙ্গে মিশে তোমার নাড়ির মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে।

—পূর্ববৎ

এই উদ্ধৃতি দুটির থেকে বোঝা যায় ব্যক্তিগতভাবেও উপনিষদের মন্ত্রগুলি কবির চিত্তকে কত গভীরভাবে অধিকার করেছিল এবং কবির জীবনে তার প্রভাব কত নিগূঢ় ছিল। এই সময়ে তাঁর প্রদত্ত 'শান্তিনিকেতন' ভাষণগুলিতেও এই মন্ত্রগুলির প্রতি তাঁর সুগভীর আস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু ১৯৩০ সালের হিবার্ট বক্তৃতায় আপন জীবনদর্শনের যে পরিচয় কবি জানালেন তাতে দেখি—

The solitary enjoyment of the infinite in meditation no longer

satisfied me, and the texts which I used for my silent worship lost their inspiration without my knowing it.

—'The Religion of Man' 1931, Ch. XII The Teacher

যে মন্ত্রগুলিকে একদিন কবি একান্ত সত্য বলে জেনেছিলেন, সেই নীরব উপাসনার মন্ত্রগুলির প্রেরণাশক্তি তাঁর অজ্ঞাতেই কখন একসময়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাঁর 'মানুষের ধর্মে'ও তিনি এ সম্বন্ধে বলেছেন—

একসময় বসে বসে প্রাচীন মন্ত্রগুলিকে নিয়ে ঐ আত্মবিলয়ের ভাবেই ধ্যান করেছিলুম। পালাবার ইচ্ছে করেছি, শান্তি পাই নি তা নয়। বিক্ষোভের থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। এভাবে দুঃখের সময় সান্ত্বনা পেয়েছি। ···আবার এমন একদিন এল যেদিন সমস্তকে স্বীকার করলুম, সবকে গ্রহণ করলুম। · সব জড়িয়ে দেখলুম সকলকে।

—'মানুষের ধর্ম', পরিশিষ্ট : মানবসত্য

সুতরাং কবির জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি যত অগ্রসর হয়েছে, উপনিষদের মন্ত্রগুলির প্রতি তাঁর আত্যন্তিক আসক্তিও ততই হ্রাস পেয়েছে। তাঁর জীবনে ক্রমশঃ ওই ধ্যান ও মন্ত্র-আবৃত্তি যে কত নিরর্থক বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল, একটি কবিতায় তিনি সে কথা অকুণ্ঠ ভাষায় বিবৃত করেছেন। সেখানে তিনি নিজের অন্ত স্বরূপের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
সকল মন্দিরের বাহিরে
আজ আমার পূজা সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে,
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

—'পত্রপুট', পনেরো ১৩৪৩ বৈশাখ

এখানে কবি সমস্ত রকম বাহ্য পূজার্চনা ও মন্ত্রোচ্চারণ ছেড়ে বার হয়ে এসেছেন সব দেবালয়ের বাইরে। তিনি নিজেকে 'মন্ত্রহীন' বলে ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর দেবতা বা তাঁর ব্রহ্ম হয়ে গেছেন 'নরদেবতা' বা 'মানবব্রহ্ম'। তাঁকে তিনি দেখেছেন তাঁর নিজেরই মনে। তখন তাঁর কাছে উপনিষদের মন্ত্রগুলির বিশেষ ঐশী শক্তি সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

তবু মনে রাখতে হবে যে, উপনিষদ্‌কে কবি কখনও সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন নি। তাই ১৯৩১ সালেও তিনি উপনিষদ্‌কে তাঁর 'জীবনের মহামন্ত্র' বলে স্বীকার করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে শেষ জীবনে তিনি এই মন্ত্রগুলির সম্বন্ধে মোহমুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) বা 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে (১৯৪০) আপন জীবনাদর্শকে পরিস্ফুট করে তোলার জন্য তিনি নির্দ্বিধায় উপনিষদের সহায়তা গ্রহণ করেছেন।

৪

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনেও উপনিষদের কতকগুলি মন্ত্র স্মরণ করেছেন। কিন্তু একটু লক্ষ করলে বোঝা যাবে যে সেগুলির অধিকাংশই তাঁর প্রথম জীবনে ব্যবহৃত মন্ত্র নয়। তাঁর চিন্তার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উদ্‌ধৃতি নির্বাচনেরও বদল হয়েছে। তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে এমন কতকগুলি মন্ত্র পাওয়া যায়, যা পূর্বে কখনও উদ্‌ধৃত হয় নি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। উক্ত গ্রন্থের এক স্থলে কবি বলেছেন—

বৃহদারণ্যকে একটি আশ্চর্য বাণী আছে—

অথ যোঽন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে
অন্যোঽসৌ অন্যোঽহম্ অস্মীতি
ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম্ ॥

যে মানুষ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, সেই দেবতা অন্য আর আমি অন্য এমন কথা ভাবে, সে তো দেবতাদের পশুর মতোই।

অর্থাৎ, সেই দেবতার কল্পনা মানুষকে আপনার মধ্যে বন্দী করে রাখে, তখন মানুষ আপন দেবতার দ্বারাই আপন আত্মা হতে নির্বাসিত, অপমানিত।

—'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ৩

এ স্থলে কবির বক্তব্য হল, যে দেবতাকে নিজের থেকে পৃথক্ করে বাইরে স্থাপন করা হয়, তাঁকে স্বীকার করলে তার দ্বারা নিজেকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। কেননা, মানুষের প্রকৃত দেবতা থাকেন মানুষেরই মধ্যে। তিনিই কবির 'নরদেবতা' বা 'মানবব্রহ্ম'। এই মনোভাবের থেকেই কবি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের আর একটি মন্ত্র (৬।১৮) স্মরণ করে বলেছেন—

মানুষ আপন বুদ্ধিতে স্বীকার করে বিশ্বমনের প্রজ্ঞাকে।' তং হ দেবম্ আত্মবুদ্ধিপ্রকাশম্—সেই দেবতাকে আমাদের আত্মায় জানি যিনি আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক। আমার মন আর বিশ্বমন একই, এই কথাই সত্যসাধনার মূলে, আর ভাষান্তরে

এই কথাই সোঽহম্।

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ৩

এখানে কবি অকুণ্ঠিতভাবে অদ্বৈতবাদের সোঽহম্ তত্ত্বকে আপনার মনের মতো ব্যাখ্যা দিয়ে গ্রহণ করেছেন। তিনি অনুভব করেছেন যে সকল মানুষই বিশ্বমানবের অন্তর্গত। সুতরাং কোনো মানুষ সেই বিশ্বমানব থেকে পৃথক্ নয়।—সব মানুষেরই তাই 'সোঽহম্' বাণী ঘোষণা করবার অধিকার আছে।

যাই হক,এ স্থলে লক্ষ করবার মতো বিষয় হল, কবির পরিণত বয়সের এই জীবন-দর্শন তাঁর প্রথম বা মধ্য জীবনের উপলব্ধির থেকে বিশেষভাবেই স্বতন্ত্র। তাই মহর্ষি-প্রভাবিত ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ও আবাল্য ব্রাহ্ম সংস্কারে অভ্যস্ত হয়ে যে কবি লিখেছিলেন—

ভক্ত করিছে প্রভুর চরণে
জীবন সমর্পণ,
ওরে দীন, তুই জোড়-কর করি
কর্ তাহা দরশন।

—'নৈবেদ্য' ১৯০০, ১৬-সংখ্যক সনেট

কিংবা দেবতার প্রতি অন্তরের আকুতি নিবেদন করে যিনি বলেছিলেন—

আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।

—'গীতাঞ্জলি', ৪৬-সংখ্যক গান ১৩২৬ পৌষ

পরিণত বয়সে সেই কবিই ধীরে ধীরে এই সংস্কারের জাল কেটে মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীন উপলব্ধির ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বললেন 'সোঽহম্'। এর থেকেই বোঝা গেল যে অনুভূতির জগতে তিনি কতদূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর পরিণত বয়সে নির্বাচিত উদ্ধৃতিগুলির সঙ্গে তাঁর পূর্বোদ্ধৃত মন্ত্রের আর মিল থাকে নি। অর্থাৎ, এ যুগে কবি আপন অনুভূতি ও ভাবনার সমর্থনে অনুরূপ ভাবের মন্ত্রগুলি সযত্নে নির্বাচন করে নিয়ে এবং কিছু পরিমাণে তার উপর নিজের ভাবনা আরোপ করে দিয়ে তাকে আপন করে নিয়েছেন। তাই উপনিষদের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে কবি এইভাবে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

মানুষের যা চরম পাবার বিষয় তার সঙ্গে মানুষ একাত্মক,··· —

নাবিরতো দুশ্চরিতান্ নাশান্তো নাসমাহিতঃ
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।

> ·· কেবল জানার দ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। হওয়ার দ্বারা পেতে হবে, দুশ্চরিত থেকে বিরত হওয়া, সমাহিত হওয়া, রিপুদমন করে অচঞ্চলমন হওয়া দ্বারাই তাঁকে পেতে হবে। অর্থাৎ, এ এমন পাওয়া যা আপনারই চিরন্তন সত্তাকে পাওয়া।
>
> —'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ অধ্যায় ২

এখানেও দেখি কবির 'হওয়ার দ্বারা পাওয়া' ইত্যাদি একটি প্রিয় তত্ত্ব উপনিষদের বাণীর উপর আরোপিত হয়ে নূতন অর্থে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এই মন্তব্যের সপক্ষে আর একটি প্রমাণ দেওয়া চলে। উপনিষদের উক্ত মন্ত্রটি (কঠ ১।২।২৪) কবির 'ব্রাহ্মধর্ম' 'নবরত্নমালা' এবং 'উপনিষৎ সংগ্রহ' এই তিনটি গ্রন্থেই উদ্ধৃত আছে। সুতরাং প্রথম জীবন থেকেই কবি এই মন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রথম বয়সের রচনায় এ মন্ত্রের উল্লেখ নেই। তার থেকে বোঝা যায় যে পরবর্তী কালে আপন ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কবি মন্ত্রটি গ্রহণ করেছেন ও তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

কখনও কখনও কবি একই উদ্ধৃতিকে প্রথম জীবনে যে অর্থে ব্যবহার করেছিলেন পরবর্তী কালে সেই অর্থকে অল্পাধিক পরিমাণে পরিবর্তিত করে নেন। উদাহরণস্বরূপ কবির বহু-ব্যবহৃত 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্' (ঈশ, ১৫) ইত্যাদি মন্ত্রটি ধরা যাক। এই শ্লোকে, সত্যের যে মুখ জ্যোতির্ময় আবরণের দ্বারা আবৃত তার আবরণ উন্মোচন করে দেবার জন্য উপনিষদের ঋষি পূষণের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও এই অর্থেই এই মন্ত্রকে একাধিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। কিন্তু এক স্থলে তিনি এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বললেন—

> মানুষের প্রকাশের আলো একলা নিজের মধ্যে নয়, সকলের সঙ্গে মিলনে। সেইজন্যেই মানুষ কেবলই আপনাকে আপনি বলছে—'অপাবৃণু', খুলে ফেলো, তোমার একলা-আপনের ঢাকা খুলে ফেলো, তোমার সকল আপনের সত্যে প্রকাশিত হও।
>
> —'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ৭, ১৩৩০ বৈশাখ

উপনিষদের অর্থকে কবি এখানে আপনার মনের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ নিজের ভাবনাকে উপনিষদের বাণীর মধ্যে প্রতিফলিত দেখেছেন। এমনই ভাবেই কবি বৃহদারণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী মৈত্রেয়ীর একটি বাণীর থেকে ('যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্' ২।৪।৩) জীবনের পর্বে পর্বে নূতন নূতন তাৎপর্য নিষ্কাশন করে নিয়েছেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

> উপনিষৎ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্য পল্লবিত তা নয়, এতে তপস্যার কঠোরতা ঊর্ধ্বগামী হয়ে রয়েছে। সেই অভ্রভেদী সুদৃঢ় অটলতার মধ্যে একটি মধুর ফুল ফুটে আছে—তার গন্ধে আমাদের ব্যাকুল

করে তুলেছে। সেটি ওই মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা-মন্ত্রটি।

—'শান্তিনিকেতন' ১, প্রার্থনা ১৩১৫ পৌষ ৩

উক্ত মন্তব্যেই এ মন্ত্রের প্রতি কবির আকর্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ১৮৯১ সাল থেকে ('য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি', ভূমিকা ১২৯৮ বৈশাখ ১৬) কবি তাঁর রচনায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই বাণীটি স্মরণ করেছেন। তবে প্রথম জীবনে তিনি মৈত্রেয়ীর এই প্রার্থনাকে ব্রহ্মজ্ঞান বা মোক্ষলাভের আকৃতি বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু ১৯০৮ সালে তিনি প্রথম উপলব্ধি করলেন যে মৈত্রেয়ী শরীরের অমরতা চান নি এবং আত্মার নিত্যতা সম্বন্ধেও তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল না। তবে এই অমৃত কি ? কবি নিজেই এ প্রশ্ন উত্থাপন করে তার সমাধান করেছেন। তিনি বলেছেন—

> এমন কোন্ মানুষ এমন কোন্ উপকরণ আছে যাকে নিয়ে বলতে পারি, এই আমার চিরজীবনের সম্বল লাভ হয়ে গেল।…প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই।…সংসারের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে এই-যে প্রেমের আভাস দেখতে পেয়ে আমরা মৃত্যুর অতীত পরম পদার্থের পরিচয় পাই, তাঁর স্বরূপ যে প্রেমস্বরূপ তা বুঝতে পারি—এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাবার জন্যে আমাদের অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করি তখন আমরা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসেই ঠেলে দিয়ে বলতে পারি : যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্ !

—পূর্ববৎ

পরবর্তী কালের একটি কবিতাতেও এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে নায়িকার প্রতি নায়কের উক্তিরূপে বসানো হয়েছে—

"ভারতের একজন নারী বলেছিলেন একদিন—
উপকরণ চান না তিনি
তিনি চান অমৃত
এই তো নারীর পণ।"
… … …
"ভালোবাসাই সেই অমৃত
উপকরণ তার কাছে তুচ্ছ।"

—'শ্যামলী', অমৃত ১৯৩৬ জুলাই

এই কবিতার নায়িকা 'অমিয়া'কে লক্ষ করে নায়ক বলেছে যে মৈত্রেয়ীপ্রার্থিত সেই অমৃতের জন্য অমর্ত্যলোকের সন্ধান নিষ্প্রয়োজন ; 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি'র মধ্যেই সেই ভালোবাসার অমৃত লুকানো আছে। বলা বাহুল্য মৈত্রেয়ীর বাণীর এই ব্যাখ্যায়

উপনিষদের ঋষিকণ্ঠের আড়াল থেকে আধুনিক কবির কণ্ঠই শোনা যায়।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে, কাহিনীর নায়কের উক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রভাবনার যোগ না থাকা সম্ভব। কিন্তু পূর্বোদধৃত প্রার্থনা প্রবন্ধটিতেই কবিকে বলতে শোনা গেছে যে, 'সংসারের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে'ই এই 'প্রেমের আভাস' দেখা যায়। সুতরাং নায়কের এই ব্যাখ্যার সম্বন্ধে যে রবীন্দ্রমনের পরিপূর্ণ সম্মতি আছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আর এই জাতীয় চিন্তা কবির মনে না থাকলে তিনি নায়কের মুখে তা দিতে পারতেন না। যাই হক, এইভাবে রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রে উপনিষদের অনুগমন না করে তার অর্থকে সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন, কখনও বা তাকে নূতন করে সৃষ্টি করে নিয়েছেন।

৫

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে উদ্ধৃত মন্ত্রগুলির অধিকাংশই যদিও তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় নি, তবু তার রচনায় উপনিষদের এমন কতকগুলি মন্ত্র দেখা যায় যেগুলিকে কবি তাঁর প্রথম জীবন থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত নানা প্রসঙ্গে দিয়েছেন। তার তাৎপর্যেরও বিশেষ কোনো ব্যত্যয় ঘটান নি। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' (তৈত্তি. ব্রহ্ম. ১), 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' (মাণ্ডূক্য ৭), 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' (মুণ্ডক ২।২।৭), 'কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ' (তৈত্তি. ব্রহ্ম. ৭) প্রভৃতি মন্ত্রগুলি এই জাতীয়। এইগুলির মধ্যে কবির সর্বাধিক ব্যবহৃত শ্লোকখণ্ড হল 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্'। পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে দেখা যাবে, রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গে অন্ততঃ পঞ্চাশ বার এটি প্রযুক্ত হয়েছে। ১৯০৩ সালে কবি প্রথম এ মন্ত্রটি ব্যবহার করেন ('ধর্ম', ধর্মের সরল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ) এবং ১৯৪০ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধেও ('আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ) এটি স্মরণ করেন। এই মন্ত্রের প্রসঙ্গে সরসীলাল সরকারকে কবি এক সময়ে বলেছিলেন[১]—

> উপনিষদের এই মন্ত্র আমারও জীবনের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্র নিয়ে শান্তিনিকেতন পত্রিকায় বহুবার অনেক কথাই লিখেছি। সুতরাং ইহার আভাস যে আমার কবিতাগুলির মধ্যেও থাকবে তা কিছুই বিচিত্র নয়।
>
> —'চিঠিপত্র', ৭ (১৩৬৭), গ্রন্থপরিচয় পৃ ১৮৫

এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় উক্ত মন্ত্রটি কবির চিত্তকে কতদূর অধিকার করেছিল।

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' মন্ত্রটিও কবির বিশেষ প্রিয়। এটিও ১৯০৩ সাল থেকে

১ 'প্রবাসী' ১৩৩৫ আষাঢ়, অনিলকুমার বসু-কর্তৃক লিখিত

('ধর্ম', ধর্মের সরল আদর্শ) ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ('ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ৩, ১৩৪৭ মাঘ) বিভিন্ন রচনায় বিবিধ প্রসঙ্গে কবি বহুবার ব্যবহার করেছেন। পূর্বোক্ত মন্ত্রটির মতো এটিও এক সময়ে কবির ধ্যানের মন্ত্র ছিল। 'A Vision of India's History' (1962 p 45) গ্রন্থে এই মন্ত্র দুটির প্রতি কবির অন্তরের আকর্ষণ সুস্পষ্ট ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে। তবে প্রথম জীবনে তিনি এই মন্ত্রগুলিকে একান্তভাবে অবলম্বন করে যেভাবে সাংসারিক বিঘ্নবিপদ থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন, পরবর্তী কালে তাঁর সে ভাবটি অন্তর্হিত হয়েছিল।

'আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি' বাণীটিও কবি ১২০২ সাল থেকে ('ধর্ম', প্রাচীন ভারতের একঃ ১৩০৮ ফাল্গুন) ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ('আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ) নানা উপলক্ষেই স্মরণ করেছেন। তাঁর জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ উপলব্ধির[১] সঙ্গেও উপনিষদের এই আনন্দমন্ত্রটি যুক্ত হয়ে আছে। শেষ জীবনে 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে তিনি সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছেন যে সদর স্ট্রীটের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে সূর্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে একদিন তাঁর মনে হল, তাঁর মনের পরদা যেন খুলে গেছে, সব আবরণ খসে পড়েছে। সত্য সেদিন যেন তাঁর কাছে মুক্তরূপে প্রকাশ পেলেন। তখন—

> দুজন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলেছে। তাদের দেখে মনে হল কী অনির্বচনীয় সুন্দর।···সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম, যেখানে আছে চিরকালের মানুষ।· তাদের মধ্যে যে-আনন্দ দেখলুম সে সখ্যের আনন্দ, অর্থাৎ এমন-কিছু যার উৎস সর্বজনীন সর্বকালীন চিত্তের গভীরে।···মানবসম্বন্ধের যে বিচিত্র রসলীলা, আনন্দ, অনির্বচনীয়তা, তা দেখলুম সেইদিন।··
>
> আনন্দমাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে
> আনন্দে হতেছে কভু লীন,
> চাহিয়া ধরণীপানে নব আনন্দের গানে
> মনে পড়ে আর-এক দিন।
>
> ···এখনও বাসনা আছে, হয়তো সমস্ত বিশ্বের আনন্দরূপকে কোনো-এক শুভমুহূর্তে আবার তেমনি পরিপূর্ণভাবে কখনও দেখতে পাব। এইটে যে একদিন বাল্যাবস্থায় সুস্পষ্ট দেখেছিলুম সেইজন্যেই 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি' উপনিষদের এই বাণী আমার মুখে বার বার ধ্বনিত হয়েছে।

—'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, পরিশিষ্ট : মানবসত্য ২

১ এই অনুভূতি কবির জীবনে যে কত গভীর ছিল, তাঁর 'জীবনস্মৃতি' (প্রভাত সংগীত), 'The Religion of man' (The Vision) প্রভৃতি গ্রন্থে তার পৌনঃপুনিক উল্লেখ থেকে তা বোঝা যায়।

কবির এই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি থেকে বোঝা যায়, এই মন্ত্র আজীবন কবিকে কিভাবে প্রেরণা দিয়েছে। অবশ্য কবি নিজেই বলেছিলেন যে হিবার্ট বক্তৃতা বা 'মানুষের ধর্মে' যা বলা হয়েছে, 'অনুভূতির থেকে উদ্ধার করে অন্য তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে যুক্তির উপর খাড়া করে সেটা বলা' ('মানুষের ধর্ম', পরিশিষ্ট : মানবসত্য ২)। কিন্তু আশি-বৎসরের আয়ুঃক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বুদ্ধির অতীত যে অনুভূতি, তার গভীরতা থেকে স্বভাবতঃই যে বাণী কবির মনে এসেছে সেটি উপনিষদের এই আনন্দবার্তা।—

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল
আনন্দ-অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।

—'রোগশয্যায়', ২৫-সংখ্যক কবিতা ১৯৪০ নভেম্বর ২৮

এই অনুভূতিতেই তিনি পুনর্বার স্বীকার করেন—

এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দ অমৃতরূপে—
আজি প্রভাতের জাগরণে
এ বাণী উঠিল বাজি মর্মে মর্মে মোর।

—'রোগশয্যায়', ২৮-সংখ্যক কবিতা ১৯৪০ নভেম্বর ২৯

অনুরূপভাবেই কবি 'কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ' ইত্যাদি মন্ত্রটি ১৯০৩ সাল (ধর্ম', ধর্মের সরল আদর্শ) থেকে ১৯৩৩ সাল ('মানুষের ধর্ম', অধ্যায় ৩) পর্যন্ত বিভিন্ন প্রসঙ্গে স্মরণ করে শেষে পৃথিবী থেকে বিদায়ের আসন্ন ক্ষণে তাঁর পরম উপলব্ধির কথাটি প্রকাশ করে বলেছেন--

যে চেতনা উদ্ভাসিয়া উঠে
প্রভাত আলোর সাথে
. . . .
তখন বুঝিতে পারি ঋষির সে বাণী—
আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহমন হইত নিশ্চল।
কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

—'রোগশয্যায়', ৩৬-সংখ্যক কবিতা ১৯৪০ ডিসেম্বর ৩

আর প্রায় একই সময়ে রচিত 'জন্মদিনে' কাব্যের অন্তর্গত ১৩-সংখ্যক (১৩৪৭

মাঘ ১১) ও ২৩-সংখ্যক কবিতাতেও (১৩৪৭ পৌষ ৭) কবি উপনিষদের বাণীর অনুসরণে আপন চৈতন্যের মধ্যে সবিতার আবাহন করে বলেছেন 'অপাবৃণু'।—

হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত।

—'জন্মদিনে', ২৩-সংখ্যক কবিতা ১৯৪০ ডিসেম্বর ২২

সুতরাং উপনিষদ্‌কে তাঁর জীবনের মহামন্ত্ররূপে স্বীকৃতিদান কবির অত্যুক্তি নয়।

৬

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের পর্বে পর্বে কখনও সচেতনভাবে কখনও বা স্বভাবতঃ উপনিষদের বাণীকে স্মরণ করেছেন। আবাল্য উপনিষদের রসে পুষ্ট কবিমানসের পক্ষে সেইটিই স্বাভাবিক। তবে উপনিষদের শুধু ভাবধারা নয়, বহু স্থলে কবি স্বেচ্ছায় তার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সেগুলিকে আপন সাহিত্যরচনায় ব্যবহার করেছেন। তাই উপনিষদের শ্লোকগুলির কবিত্ব ও প্রকাশসৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁর উচ্ছ্বসিত মন্তব্য চোখে পড়ে। প্রসঙ্গতঃ এক স্থলে তাঁকে বলতে শোনা যায়—

এরূপ পরিপূর্ণ আনন্দময় মুক্তির বার্তা এমন সুগভীর রহস্যময় বাণীতে অথচ এমন শিশুর মতো অকৃত্রিম সরল ভাষায় উপনিষদ্ ছাড়া আর কোথায় ব্যক্ত হইয়াছে?

— 'সঞ্চয়', ধর্মের নবযুগ ১৩১৮

সুতরাং বৈদিক সংহিতার প্রকাশভঙ্গি সম্বন্ধে কবির যে মনোভাব দেখা গেছে, উপনিষদ্ সম্বন্ধেও প্রায় সেই কথা। আর রবীন্দ্রসাহিত্যে উপনিষদের প্রকাশভঙ্গি যে কিভাবে অনুসৃত হয়েছে অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস' গ্রন্থে (অধ্যায় ১) তার বিস্তৃত আলোচনা আছে। তাই এ বিষয়ে অধিক আলোচনা থেকে বিরত থাকা গেল। তবে রবীন্দ্রসাহিত্যে উপনিষদের এত উপকরণ যে চোখে পড়ে এবং কবি যে নানাভাবেই সেগুলি স্মরণ ও তার প্রয়োগ করেছেন, তার পশ্চাতে রবীন্দ্রমনের কোন্ অনুভূতি সক্রিয় ছিল সেটি দেখা প্রয়োজন।

উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কারণ হিসাবে বলতে হয়, উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে প্রকাশিত যে মন আর রবীন্দ্রনাথের যে মন, এই উভয়ের মধ্যে একটি সহজ মিল ছিল। শশিভূষণ দাশগুপ্ত একে লক্ষ করেই বলেন—

রবীন্দ্রনাথের সত্যদর্শনের পন্থা বৈদিক কবিগণের পন্থার একান্ত অনুরূপ।

— উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস' ১৩৬৮, অধ্যায় ১

এখানে 'বৈদিক কবি' বলতে উপনিষদের ঋষিকেই বুঝতে হবে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, বৈদিক ঋষির সঙ্গে রবীন্দ্রচিত্তের যে সাধর্ম্যের কথা পূর্বে বলা হয়েছে উপনিষদের ঋষির সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের সাধর্ম্য ঠিক সেই জাতীয় নয়। বৈদিক ঋষির মধ্যে যে সবল অনুভূতি ও সহজ কবিদৃষ্টি ছিল স্বভাবকবি রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরাধিকারী ছিলেন। অন্যদিকে, ঔপনিষদিক ঋষির চিন্তাধারা ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মনীষী কবি রবীন্দ্রনাথের মিল ছিল। তাই দুই দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বৈদিক তথা ঔপনিষদিক ঋষির উত্তরসূরী।

যাই হক, কবি নিজে উপনিষদের সঙ্গে আপনার এই সাধর্ম্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তারই সঙ্গে মিশেছিল উপনিষদের ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। তাই এর বাণী কবিকে উৎসাহ দিয়েছে প্রেরণা দিয়েছে, নিজের মতকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠরূপে আবিষ্কার করার সুযোগ দিয়েছে। সেই কারণেই তিনি নিজের বক্তব্যকেও উপনিষদের বাণীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে প্রণোদিত হয়েছিলেন। আর সেইজন্যই কবি তাঁর ধর্মানুভূতি ও অধ্যাত্মচিন্তাকে বারে বারে উপনিষদের বাণীর সঙ্গে যুক্ত করে প্রকাশ করেছেন। তবে একটি মৌল অনুভূতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রমনের সঙ্গে উপনিষদের কবির নিগূঢ় যোগ ছিল। এবার তারই একটু পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যাক। স্টপফোর্ড ব্রুকের সঙ্গে ধর্মবিষয়ক আলোচনার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> আমাদের উপনিষদের বাণীতে কোনো বিশেষ দেশকালের ছাপ নেই।—তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যাতে কোনো দেশের কোনো লোকের কোথাও বাধতে পারে।
>
> —'শান্তিনিকেতন' ২ অগ্রসর হওয়ার আহ্বান ১৩২০ পৌষ ৭

উপনিষদ সম্বন্ধে কবির এই অভিমত যে কতদূর সত্য উপনিষদের প্রতি প্রাচ্যদেশীয় মুসলমান দারা শিকোহ্‌ ও পাশ্চাত্ত্যদেশীয় দার্শনিক শোপেনহাউয়ারের উচ্ছ্বসিত মন্তব্যে তার প্রমাণ মেলে। সাম্প্রদায়িকতাবর্জিত এই উদার দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রদৃষ্টিরও বৈশিষ্ট্য। তাঁর রচিত ধর্মসংগীতগুলি তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই গানগুলির বৃহৎ সত্যের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান—কোনো সম্প্রদায়েরই কোনো বিরোধ নেই বলে তা যে-কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মসংগীতরূপে গৃহীত হতে পারে।[১] সত্যের এই দেশকালনিরপেক্ষ

---

১ বস্তুতঃ তা হয়েও থাকে। এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মসংগীতবিষয়ক সংকলন গ্রন্থ 'আনন্দসংগীতে' (১৯৩৯) রবীন্দ্রসংগীত আছে এবং মিশনারী-চালিত বিদ্যালয়ে তা গীত হয়।

উদার স্বরূপটি কবি প্রথম জীবনেই অনুভব করেছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা তাঁর অন্তরের গভীরতর উপলব্ধিতে পৌঁছেছিল এবং শেষ বয়সে তিনি তাকে অকুণ্ঠিত ভাষায় প্রকাশ করে বলেছেন—

> আমাকে কোনো সম্প্রদায়ে বা কোনো দেশখণ্ডে বদ্ধ করে দেখো না। আমি যাঁকে পাবার প্রয়াস করি সেই মনের মানুষ সকল দেশের সকল মনের মানুষ, তিনি স্বদেশ স্বজাতির উপরে।

—'চিঠিপত্র' ৯, হেমন্তবালাকে লেখা পত্র-২৩, ১৩৩৮ আষাঢ় ১২

এই সময়েই হিবার্ট বক্তৃতা ও 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে তিনি তাঁর এই সর্বজনীন মানবধর্মের সত্যকে উপনিষদের ভাষাতেই রূপ দান করে বললেন—

> আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব।

—'মানুষের ধর্ম', ভূমিকা ১৩৩৯ মাঘ ১৮

কবি যে নিছক উপনিষদের প্রেরণাতেই পরিণত বয়সে এই সর্বজনীনতার উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন এ কথা বলা না গেলেও উপনিষদের মধ্যে এই বৃহৎ সত্যের প্রতিফলন দেখেই তিনি যে তার বাণীকে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় বরণ করে নিয়ে নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছিলেন—

> আমি উপনিষদ্‌কে সর্ব ধর্মের ভিত্তি বলে মানি।

—'চিঠিপত্র' ৯, হেমন্তবালাকে লেখা পত্র-৫৮, ১৯৩১ নভেম্বর ৮

সে কথা অস্বীকার করা যায় না। এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতিই উপনিষদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের চরম শ্রদ্ধাঞ্জলি।

পরিশেষ : মহানির্বাণতন্ত্র

মহানির্বাণতন্ত্র বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত নয়। তবে তার আলোচনা এখানে বোধ হয় অসংগত হবে না কারণ উপনিষদের ভাবধারার সঙ্গে মহানির্বাণতন্ত্রের ভাবের সুগভীর সাদৃশ্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ কঠোপনিষদের 'মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্'··· ইত্যাদি (২৩।২) বা 'ভয়াদগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ'···ইত্যাদি (২।৩।৩) শ্লোকাংশের সঙ্গে মহানির্বাণতন্ত্রের 'ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্'···ইত্যাদি (৩।৬১) শ্লোক স্মরণ করা যেতে পারে। উভয়ের মধ্যে ভাবের সাদৃশ্যটি লক্ষণীয়। এই জাতীয় ভাবের সংগতি দেখেই রামমোহন রায় মহানির্বাণতন্ত্রকে উপনিষদের পর্যায়ে স্থাপন করেছিলেন। আবার উপনিষদের আদর্শের সমর্থক ও পরিপূরক বলেই মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথও তাঁর 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে বেদ-উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গে মহানির্বাণতন্ত্রের শ্লোকগুলিকেও সংকলন করেছেন। সেই হিসাবে এখানেও উপনিষদের পরেই মহানির্বাণতন্ত্রকে স্থান দেওয়া হল।

রবীন্দ্রসাহিত্যে মহানির্বাণতন্ত্রের মাত্র তিনটি শ্লোক চোখে পড়ে। কিন্তু সংখ্যায় অধিক না হলেও গুরুত্বের দিক্ থেকে এগুলির মূল্য কম নয়। প্রথমেই ধরা যাক কবির সর্বাধিকব্যবহৃত নিম্নোক্ত শ্লোকটি।—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ যদ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥ ৮।২৩

বিভিন্ন প্রসঙ্গে দশবার কবি এটি ব্যবহার করেছেন। প্রথমতঃ 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' পুস্তকে (১৯০১) ধর্মতত্ত্বের উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি এ শ্লোক স্মরণ করেন এবং মূলানুগ বাংলা অনুবাদসহ তার ব্যাখ্যা করেন। ওই একই সময়ে লিখিত একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধে ('ভারতবর্ষ', প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ। ১৯০১) ভারতীয় রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে গৃহাশ্রমের গুরুত্ব প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যে তিনি এই শ্লোকটিই উদ্ধৃত করেন। এর পরে শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালার একটি ভাষণে কবি শ্লোকটির দ্বিতীয়ার্ধকে অবলম্বন করে তার ব্যাখ্যা দিলেন এইভাবে।--

যা কিছু করবে সমস্তই ব্রহ্মে সমর্পণ করবে। তোমার সংসারকে তোমার প্রিয়জনকে, তোমার সমস্ত কিছুকেই তাঁকে নিবেদন করে দাও— এই যে ত্যাগ এ যে পরিপূর্ণতার মধ্যে বিসর্জন

—শান্তিনিকেতন ১ ত্যাগের ফল ১৩১৫ অগ্রহায়ণ

এই ব্যাখ্যা শ্লোকটির সরলার্থের চেয়ে কিছু অধিক অর্থ বহন করে। তার দ্বারাই বোঝা যায় রবীন্দ্রমন কিভাবে এ শ্লোককে গ্রহণ করেছিল।

উক্ত মন্তব্যের এক মাস পরে লেখা আর একটি প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কবির মনোভাব স্ফুটতররূপে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে কবি মহানির্বাণতন্ত্রোক্ত গৃহীর কর্মকে ভগবদ্-গীতার কর্মযোগের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে কর্মের পশ্চাতে দুই রকমের প্রেরণা থাকে—হয় প্রয়োজনের, নয় তো আনন্দের প্রেরণা। প্রয়োজনের তাগিদে কৃত কর্ম আমাদের চিত্তকে বদ্ধ করে, কিন্তু আনন্দ স্বভাবতঃই কর্মের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। এই বলে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, 'আনন্দের ধর্ম যদি কর্ম হয় তবে কর্মের দ্বারাই সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে। গীতায় একেই বলে কর্মযোগ'। আর এই প্রসঙ্গে তিনি মহানির্বাণতন্ত্রের উক্ত শ্লোকের উল্লেখ করে বলেছেন—

এইজন্যই গৃহস্থের প্রতি উপদেশ আছে, তিনি যে যে কাজ করবেন তা নিজেকে যেন নিবেদন না করেন—তা করলেই কর্ম তাঁকে নাগপাশে বাঁধবে— ...তিনি... যে যে কর্ম করবেন সমস্ত ব্রহ্মকে সমর্পণ করবেন। তা হলে, সতী গৃহিণী যেমন সংসারের সমস্ত ভোগের অংশ পরিত্যাগ করেন অথচ সংসারের সমস্ত ভার অশ্রান্ত যত্নে বহন করেন—কারণ, কর্মকে তিনি স্বার্থসাধনরূপে জানেন না, আনন্দসাধন-রূপেই জানেন—আমরাও তেমনি কর্মের আসক্তি দূর করে, কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন করে, কর্মকে বিশুদ্ধ আনন্দময় করে তুলতে পারব।

—'শান্তিনিকেতন' ১, কর্ম ১৩১৫ পৌষ ২•

এখানে কবি নিঃসন্দেহেই শাস্ত্রকারের ভাবনাকে বহু দূরে সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে 'নৈবেদ্য' কাব্যের (১৯০১) একটি সনেটের দুটি পংক্তি মনে পড়ে। ভারতসংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে সেখানে কবি বলেছেন—

কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।

—'নৈবেদ্য', ৯৪-সংখ্যক কবিতা

সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও গীতার কর্মযোগ তথা মহানির্বাণতন্ত্রের উক্ত শ্লোকের ভাবটি যে এ ক্ষেত্রে কবির মনে সক্রিয় ছিল এ অনুমান করা চলে। কবি অন্যত্র বহু স্থলে এই কর্মতত্ত্বের বিচিত্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পরবর্তী 'ভগবদ্গীতা' অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার কর্মযোগ প্রবন্ধে (১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১) তিনি পুনরায় এই শ্লোক এবং তার এই ব্যাখ্যাই স্মরণ করেছেন। তবে পর বৎসরে কবি উক্ত বাণীর নূতন ব্যাখ্যা দিয়ে লিখেছেন—

শাস্ত্র বলিয়াছেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ 'যদ্ যদ্ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ'।... ইহাতে একই কালে কর্ম এবং বিরাম, চেষ্টা এবং শান্তি, দুঃখ এবং আনন্দ। ইহাতে এক দিকে আমাদের আত্মার কর্তৃত্ব থাকে ও অন্যদিকে যেখানে সেই কর্তৃত্বের নিঃশেষে বিলয় সেইখানে সেই কর্তৃত্বকে প্রতিক্ষণে বিসর্জন দিয়া আমরা প্রেমের আনন্দ লাভ করি।

—'ধর্ম', মনুষ্যত্ব ১৩১৮ ফাল্গুন

স্পষ্টই বোঝা যায় এখানে পূর্বোক্ত অর্থের আরও একটু সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে।

এবার এই শ্লোকের প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল থেকেই সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য আশ্রমের মধ্যে একটা বিরোধ চলে আসছিল। বৌদ্ধ

যুগে সংসারত্যাগী ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর বিশেষ প্রসার দেখা যায়। তারই প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তী যুগে গীতায় কর্মত্যাগী সন্ন্যাসের আদর্শ নিন্দিত হয়েছে এবং মহানির্বাণতন্ত্রের বর্তমান শ্লোকে ব্রহ্মনিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গার্হস্থ্যধর্মের অনুশীলন কীর্তিত হয়েছে। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস-আদর্শের এই বিরোধ-ব্যাপারে কবির মনের প্রবণতা যে কোন দিকে ছিল, মহানির্বাণতন্ত্রের উক্ত শ্লোকের পৌনঃপুনিক উল্লেখেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' পুস্তকে উক্ত শ্লোকের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

ব্রহ্মবাদী ঋষি ব্রহ্মচারী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যকে অনুশাসন করিতেছেন প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ, সন্তানসূত্র ছেদন করিবে না, অর্থাৎ গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

—ঔপনিষদ ব্রহ্ম', ১৯০১

এই মন্তব্য থেকে বোঝা গেল, ব্রহ্মনিষ্ঠতা ও গার্হস্থ্যের সমন্বয়সাধনার আদর্শই কবিকে মহানির্বাণতন্ত্রের উক্ত শ্লোকের অনুরাগী করে তুলেছিল এবং সেই কারণেই তিনি বারে বারে শ্লোকটি স্মরণ করেছেন।

উক্ত শ্লোকটিকে রবীন্দ্রনাথ শুধু তত্ত্বব্যাখ্যার প্রয়োজনেই ব্যবহার করেন নি, ব্যক্তিগত জীবনেও এই আদর্শ অনুসরণের সার্থকতা সম্বন্ধে তাঁর গভীর আস্থা ছিল। তাই পিতৃদেবের আত্মকৃত্য উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে মহর্ষি সম্বন্ধে কবি বলেন—

তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন।

— চারিত্রপূজা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২, ১৩১১ মাঘ

এই একটি মাত্র মন্তব্যেই মহর্ষির প্রতি এবং এই শ্লোকের আদর্শের প্রতি কবির সুগভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত হয়েছে। পরিণত বয়সেও এই শ্লোকের প্রতি কবির শ্রদ্ধা যে কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি, তাঁর A Vision of India's History (1923) গ্রন্থে তার অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে তিনি বলেছেন—

I love India, because she has saved through tumultuous ages the living words that have issued from the illuminated consciousness of her great sons: ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ Thus we have come to know that what India truly seeks is to perform their karma in the presence of the Eternal, with the pure knowledge of the spiritual meaning of existence.

—'A Vision of India's History', 1962 p 45 46

এই বাণীর প্রতি কবির শ্রদ্ধার এইটিই শেষ স্বীকৃতি।

মহানির্বাণতন্ত্রের রবীন্দ্রব্যবহৃত আর একটি মন্ত্র হল 'ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং

ভীষণানাম্' (৩৷৬১)। ভাবের সাদৃশ্যবশতঃ কবি সর্বদাই এটিকে পূর্বোদ্ধৃত কঠোপনিষদের শ্লোক দুটির সঙ্গেই স্মরণ করেছেন। 'ধর্ম' গ্রন্থের দুঃখ (১৩১৪ ফাল্গুন) এবং 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের দীক্ষা (১৩১৫ পৌষ ৭), ভয় ও আনন্দ (১৩১৫ চৈত্র ২৯) এবং সুন্দর (১৩১৭ চৈত্র ১৫) প্রবন্ধত্রয়ে এই শ্লোকটি উদ্‌ধৃত হয়েছে। ব্রহ্মের রুদ্ররূপের এই প্রকাশকে কবি কখনও মানবজীবনের বিঘ্নবিপদরূপে, কখনও প্রকৃতির অমোঘ নিয়মরূপে, কখনও বা সুখবিলাসের অতীত সমস্ত অমঙ্গলের বিনাশকারী ভয়ঙ্কর মঙ্গলরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার আবাহন করেছেন। এই ভাবেই এই শ্লোককে কবি জীবনের নূতন নূতন ক্ষেত্রে নানা প্রসঙ্গে প্রয়োগ করেছেন।

মহানির্বাণতন্ত্রের আর একটি কবিব্যবহৃত শ্লোকাংশ হল—'ধর্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতম্' (৮৷৬৭)। নানা উপলক্ষে কবি এটি চারটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। ১৮৮৭ সালে কবি প্রথম এটির উল্লেখ করেন ('সমাজ', পরিশিষ্ট : হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন)। এর পরে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর ঐতিহাসিক চিত্র নামক পত্রিকায় বিদেশীবর্ণিত ইতিহাস থেকে সত্য উদ্ধার করবার যে প্রয়াস পান, সেই চেষ্টাকে ধর্মযুদ্ধ নামে অভিহিত করে তিনি এই শ্লোকটি স্মরণ করেন ('ইতিহাস', ঐতিহাসিক চিত্র ১৩০৫ ভাদ্র)। পরিণত জীবনে 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) গ্রন্থে মৃত্যুর অতিশায়ী মনুষ্যত্বের শক্তিকে অভিনন্দিত করে রবীন্দ্রনাথ এই বাণীটি উদ্‌ধৃত করেন। আর শেষ বয়সে ১৯৩৭ সালে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনকে লক্ষ করে তিনি এই ধর্মযুদ্ধের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেন—

> ধর্মযুদ্ধ বাইরে জেতবার জন্য নয়, হেরে গিয়েও জয় করবার জন্য। অধর্মযুদ্ধে মরাটা মরা। ধর্মযুদ্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে, হার পেরিয়ে থাকে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত।
>
> —'মহাত্মা গান্ধী', মহাত্মা গান্ধী ১৩৪৪ আশ্বিন

রবীন্দ্রসাহিত্যে মহানির্বাণতন্ত্রের উপাদান এইটুকুই। এই গ্রন্থ থেকে এর বেশি শ্লোক তিনি ব্যবহার করেন নি।

এই গ্রন্থের যে তিনটি শ্লোক কবি উদ্‌ধৃত করেছেন সেগুলি সবই মহর্ষি-সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে পাওয়া যায়। তবে মহর্ষি তাঁর গ্রন্থে ধৃত শ্লোকগুলির কোনো উৎস নির্দেশ করেন নি। রবীন্দ্রসাহিত্যেও মহানির্বাণতন্ত্রের এই শ্লোকগুলির উৎস কোথাও উল্লিখিত হয় নি। কেবল 'ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ',…ইত্যাদি শ্লোকটিকে কবি এক স্থলে (ঔপনিষদ ব্রহ্ম) মনুর উক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মনু-সংহিতাতে উক্ত শ্লোকটি পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী 'ব্রাহ্মধর্ম'

গ্রন্থে সংকলিত শ্লোকগুলির যথাসম্ভব উৎস নির্দেশ করে যে সংস্করণ (১৯৩৭) প্রকাশ করেন তাতে উক্ত শ্লোকের আকরগ্রন্থ হিসাবে মহানির্বাণতন্ত্রই উল্লিখিত হয়েছে। মনুসংহিতা নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ আজীবন এই শ্লোকটিকে মনুসংহিতার অন্তর্গত বলেই ধারণা পোষণ করে গেছেন, কেননা পরবর্তী কালের রবীন্দ্রসাহিত্যের কোথাও এটিকে মহানির্বাণতন্ত্রের শ্লোকরূপে উল্লিখিত দেখা যায় নি।

আবার মহর্ষির 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে উক্ত শ্লোকের প্রথম পংক্তির শেষাংশে পাই 'তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ'। সতীশচন্দ্র -সম্পাদিত সংস্করণেও এই পাঠই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথও সর্বত্রই 'তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ' লিখেছেন। অথচ মহানির্বাণতন্ত্রের যে কয়টি সংস্করণ আমার দেখার সুযোগ হয়েছে তার সব ক'টিতেই 'তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ' স্থলে পেয়েছি 'ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ'। তাই মনে হয় 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ থেকেই এই শ্লোকের সঙ্গে কবি পরিচিত হয়েছিলেন।

মহানির্বাণতন্ত্রের অন্য শ্লোক দুটির সম্বন্ধেও বলা যায় যে ওগুলিকে কবি 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। সুতরাং মূল মহানির্বাণতন্ত্রের সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না, এমন অনুমান বোধ করি অসংগত নয়।

বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালানি এক সময় লিখেছিলেন—

> Buddhism has never ceased to inspire the best minds of India. Both Tagore and Gandhi are the two greatest as they are the latest testimonies to this fact Only once in his life said Rabindranath, did he feel like prostrating himself before an image, and that was when he saw the Buddha at Gaya.

— Visva Bharati Quarterly' 1913 April, p 179

এই একটি উক্তির মধ্য দিয়েই বুদ্ধদেবের প্রতি সমস্ত ভারতীয় মনীষীর, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম শ্রদ্ধা অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে। ১৯১৪ সালে বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধমূর্তি দর্শন করে কবি তাঁর প্রণতি জানাবার জন্য যে আকুলতা অনুভব করেছিলেন, শেষ জীবনেও তাঁর সেই মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয় নি। ১৩৪১ সালের পরিণতমনা কবি তাই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাভরে জানিয়েছিলেন—

> আমি যাকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি।

—'বুদ্ধদেব' বুদ্ধদেব

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বোধ করি বুদ্ধদেবই একমাত্র মনীষী যাঁর চরিত্রমহিমায় আকৃষ্ট হয়ে রবীন্দ্রনাথ আজীবন বারংবার তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। তবে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের বিবর্তন ঘটেছিল। তাই প্রথম জীবনে বুদ্ধের ব্যক্তিরূপটি যখন কবির কাছে বিশেষ প্রত্যক্ষ ছিল, তখন তিনি লিখেছিলেন—

> আমি একজন বুদ্ধের ভক্ত। বুদ্ধের অস্তিত্বের বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমি সেই স্থানে যাই, যেখানে বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত আছে, সেই শিলা দেখি যাহার উপর বুদ্ধের পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে তখন আমি বুদ্ধকে কতখানি প্রাপ্ত হই।

—সমালোচনা', অনাবশ্যক ১২৯০ শ্রাবণ

কিন্তু পরবর্তী কালে কবি বুদ্ধকে মনুষ্যত্বের সর্বোত্তম উৎকর্ষের প্রতিরূপ হিসাবে দেখে-ছিলেন। তাই 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে তিনি যাঁকে 'সর্বজনীন সর্বকালীন মানব' রূপে অর্ঘ দিয়েছিলেন, বুদ্ধের মধ্যে তিনি সেই মহামানবেরই প্রতিভাস লক্ষ করেন। সেই সময়ে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা এক পত্রে দেখি এ সম্বন্ধে তিনি সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন—

আমার মনের মানুষ কোনো ব্যক্তিবিশেষ নন এ কথা নিশ্চয় জেনো। তাঁর আভাস পেয়েছি ইতিহাসে নরোত্তমদের মধ্যে। যেমন ভগবান বুদ্ধ। তিনি সকল মানুষের মুক্তির জন্যে আত্মদান করেছিলেন।

—'চিঠিপত্র' ৯ পত্র-৫২, ১৯৩১ অকটোবর ২১

শেষ জীবনে কবি এই 'নরোত্তম'-এর প্রতিই তাঁর প্রণাম জানিয়েছিলেন।

পুণ্যচরিত বুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতদূর, রবীন্দ্রপূর্ব যুগের বাংলা দেশে বৌদ্ধ ধর্মের ভূমিকা কি ছিল, বুদ্ধের চারিত্রমহিমা রবীন্দ্রসাহিত্যে কতদূর প্রতিফলিত হয়েছে অথবা বৌদ্ধ-ধর্ম ও-দর্শন সম্বন্ধে কবির দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যবিচার তথা তার যৌক্তিকতানির্ণয় ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করার ক্ষেত্র এটি নয়। তা ছাড়া ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়ার 'রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি' গ্রন্থে (১৯৬৭) এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। তাই রবীন্দ্রচিত্তের গঠনে ও পরিপোষণে বৌদ্ধ উপাদানের পরিমাণ কতটুকু অর্থাৎ বুদ্ধদেবের আদর্শ এবং তাঁর ধর্ম ও দর্শন থেকে কবি কতটুকু গ্রহণ করেছিলেন এবং কতটুকু বর্জন করেছিলেন, বর্তমান প্রবন্ধে তারই সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়ার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমে বৌদ্ধ সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে কবির কতদূর পরিচয় ছিল এবং তার দ্বারা তিনি কিভাবে নতন সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিলেন সেটি অনুধাবন করা প্রয়োজন।

২

বৌদ্ধ সাহিত্য বা শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ উপকরণ রবীন্দ্ররচনায় বিশেষ দেখা যায় না। যেটুকু দেখা গেছে তার মধ্যে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal গ্রন্থটিই প্রধান। 'জীবনস্মৃতি' থেকে জানা যায় যে রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আকৈশোর পরিচয়। মনে হয়, তাঁর এই গ্রন্থটির সঙ্গেও কবি প্রথমাবধি পরিচিত ছিলেন। এই গ্রন্থ যে তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল, প্রথম জীবনে ইন্দিরা দেবীকে লেখা এক পত্র থেকে সে কথা জানা যায়। তিনি লিখেছেন—

মফস্বলে যখন যাই তখন অনেকগুলো বই সঙ্গে নিতে হয়। কখন্ কোন্‌টা দরকার বোধ হবে আগে থাকতে জানবার জো নেই, সেই জন্যে আমার সঙ্গে 'নেপালীজ বুদ্ধিষ্টিক লিটারেচর' থেকে আরম্ভ করে সেক্‌স্‌পীয়র পর্যন্ত কত রকমেরই যে বই আছে তার আর ঠিকানা নেই।

—'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-৮৬, ১৮৯৩ মার্চ ৩

রাজেন্দ্রলালের উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি কবিতা, নাটক ও নাট্যকাব্য রচনা করেছেন। এই গ্রন্থের কবিব্যবহৃত খণ্ডটি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। ওই গ্রন্থের মলাট ও আখ্যাপত্রের মাঝখানের সাদা পৃষ্ঠায় কবি যে কাহিনীগুলি তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন তার নাম ও পৃষ্ঠাসংখ্যা স্বহস্তে এইভাবে লিখে রেখেছেন।—

33	শ্রেষ্ঠভিক্ষা	159	মস্তকবিক্রয়
	পূজারিণী		
67	উপগুপ্ত		
121	মালিনী		
135	পরিশোধ		
224	চণ্ডালী		
20	মূল্যপ্রাপ্তি		

298 নগরলক্ষ্মী

উক্ত পৃষ্ঠাগুলিকেও কবি গ্রন্থের মধ্যে চিহ্নিত করে রেখেছেন। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত উপগুপ্ত 'অভিসার' নামক কবিতায় এবং চণ্ডালী 'চণ্ডালিকা' নামক নৃত্যনাট্যে রূপ লাভ করেছে।

উল্লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠভিক্ষা-পূজারিণী মূল্যপ্রাপ্তি অবদানশতক, মস্তকবিক্রয়-পরিশোধ মহাবস্তাবদান, অভিসার বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, নগরলক্ষ্মী কল্পদ্রুমাবদান এবং অনুল্লিখিত সামান্যক্ষতি দিব্যাবদানমালা থেকে গৃহীত হয়েছে। এই সবগুলি কবিতাই ১৮৯৭ থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যে রচিত এবং 'কথা' কাব্যের (১৯০) অন্তর্গত। এগুলির মধ্যে পূজারিণী, শ্রেষ্ঠভিক্ষা ও মস্তকবিক্রয় কবিতা তিনটির কাহিনী প্রায় অপরিবর্তিতরূপে মূল গ্রন্থ থেকে নেওয়া।

'মালিনী' নাটিকার (১৮৯৬) কাহিনী পরিবর্তিত আকারে মহাবস্তাবদান থেকে গৃহীত। 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৩) শার্দূলকর্ণাবদান কাহিনীর হুবহু অনুসৃতি হলেও উপসংহারে কবি চণ্ডালকন্যা প্রকৃতিকে উন্নততর মহিমা দান করেছেন। এ ছাড়া 'রাজা' নাটকের (১৯১০) কাহিনী মহাবস্তাবদান কাহিনী থেকে প্রায় অবিকৃতভাবে নেওয়া। তবে তার উপস্থাপনায় বিশেষতঃ উপসংহারে আধুনিক কবিমনের সুস্পষ্ট ছায়াপাত দেখা যায়। পরিশেষে উল্লেখ করতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অচলায়তন' নাটকের পঞ্চক ও মহাপঞ্চক নাম দুটি রাজেন্দ্রলালের গ্রন্থের The Story of Panchaka থেকে নিয়েছেন।

এই বৌদ্ধ কাহিনীগুলি কবির মনকে যে কত দীর্ঘদিন ধরে অধিকার করে রেখেছিল তার প্রমাণ হল, ১৯১০সালে লেখা 'রাজা' নাটক ১৯২০সালে 'অরূপরতন'-এ পরিণত হয়েছে এবং ১৯৩১ সালে 'শাপমোচন' কথিকায় রূপ লাভ করেছে। তেমনি পূজারিণী কবিতা (১৮৯৯) দীর্ঘ কাল পরে 'নটীর পূজা'য় (১৯২৬) এবং পরিশোধ কবিতা (১৮৯৯) 'শ্যামা' নামে নৃত্যনাট্যে (১৯৩৯) রূপান্তর লাভ করে। ওইভাবেই 'চণ্ডালিকা' নাটিকাকে কবি পাঁচ বৎসর পরে নৃত্যনাট্যে (১৯৩৩) রূপায়িত করেন।

একই কাহিনীকে দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে নূতন করে রূপ দেবার ফলে স্বভাবতই কবির চিন্তাধারার ক্রমবিবর্তনটি তাতে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। দুএকটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি বোঝা যাবে। প্রথম বয়সের লেখা পরিশোধ কবিতার শেষাংশে দেখি নায়ক বজ্রসেন নায়িকা শ্যামাকে তার কলঙ্কিত প্রেমের জন্য ধিক্কার দিয়েছে ও আঘাত করে পরিত্যাগ করেছে। তার এই ক্ষমাহীন কঠোরতার মধ্যেই এ কবিতার সমাপ্তি। কিন্তু 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে দেখি শ্যামার কৃপায় প্রাণলাভ করে যে বজ্রসেন একদিন মুগ্ধ কণ্ঠে গেয়েছিল—

হেনো প্রেম চিরঋণী আপনারি হরষে
সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে।

সেই বজ্রসেনই শেষে শ্যামাকে ক্ষমা করতে না পেরে পরিত্যাগ করে এবং আপনার এই ক্ষমাহীন কাঠিন্যে অনুতাপদিগ্ধ কণ্ঠে বলে—

ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষম হে মম দীনতা পাপীজনশরণ প্রভু।
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা পাপীজনশরণ প্রভু॥

বজ্রসেনের চরিত্রের এই পরিবর্তনটুকুর দ্বারাই বোঝা যায় 'পাপীজনশরণ প্রভু' বুদ্ধের আদর্শকে কবি এখানে কত গভীরভাবে অনুভব করেছেন। সেই আদর্শের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাটিও এখানে বাবাহাং ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। তেমনই পূজারিণী কবিতায় বুদ্ধের বেদীমূলে ভক্ত সেবিকা শ্রীমতীর আত্মদান একটি সাধারণ ত্যাগের কাহিনী-রূপে বর্ণিত হয়েছিল। কিন্তু 'নটীর পূজায়' তা নিগূঢ় অর্থে ও তাৎপর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই নাটিকার বক্তব্য ব্যাখ্যা করে কবি নিজেই লিখেছেন—

বুদ্ধদেবকে নটী যে অর্ঘ্য দান করতে চেয়েছিল সে তার নৃত্য। অন্য সাধকেরা

তাঁকে দিয়েছিল যা ছিল তাদেরই অন্তরতর সত্য, নটী দিয়েছে তার সমস্ত জীবনের অভিব্যক্ত সত্যকে। মৃত্যু দিয়ে সেই সত্যের চরম মূল্য প্রমাণ করেছে। এই নৃত্যকে পরিপূর্ণ করে জাগিয়ে তুলেছিল তার প্রাণমনের মধ্যে তার প্রাণের প্রাণ।

—'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ

বৌদ্ধ কাহিনীতে তো বটেই, এমন কি কবির নিজের প্রথম জীবনের রচনাতেও এই জাতীয় ভাবনার সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব ছিল না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ওই গ্রন্থটি ছাড়া কিছু কিছু মূল বৌদ্ধ গ্রন্থের সঙ্গেও কবি পরিচিত ছিলেন। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' এবং 'মহাশ্রদ্ধোৎপাদন শাস্ত্র' নামক গ্রন্থ দুটির সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কথা পরবর্তী 'অশ্বঘোষ শূদ্রক ও বিশাখদত্ত' অধ্যায়ে (দ্বিতীয় পর্ব) আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ প্রবন্ধে (১৩০৫, 'শব্দতত্ত্ব') দেখি দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে উদ্‌ধৃত 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থের আটটি ছত্র (অধ্যায় ২১) কবি উদ্‌ধৃত করে তার ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে মূল 'ললিতবিস্তর'-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল বলে মনে হয় না।

ত্রিপিটক শাস্ত্রের সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ যোগ কতদূর ছিল তা জানার উপায় নেই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা থাকলেও তাতে বৌদ্ধ শাস্ত্রধৃত শ্লোকের উদ্‌ধৃতি বিশেষ দেখা যায় না। তবে কেশবচন্দ্র সেনের প্রবর্তনায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ 'হিন্দুশাস্ত্রম্' নামে যে সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন (১৯০৪) তাতে এই জাতীয় উদ্‌ধৃতি দেখা যায়। এই সংকলন-গ্রন্থটির সঙ্গে কবির পরিচয় থাকা সম্ভব। মহর্ষি-সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে বুদ্ধের বচন পাওয়া যায় না। তবে মহাভারতের অন্তর্গত 'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং'...ইত্যাদি শ্লোকটি (উদ্যোগ ৩৮।৩৪) ওই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে এবং এই শ্লোকের অনুরূপ ধম্মপদের 'অক্কোধেন জিনে কোধং'...ইত্যাদি শ্লোকটি (কোধ বগ্‌গো) রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন। ধম্মপদের অন্যান্য শ্লোক তাঁর রচনায় বিশেষ পাওয়া যায় না।

ধম্মপদ কিন্তু কবির অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ ছিল এবং এটিকে কবি বিশেষভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। তাই চারুচন্দ্র বসু-সম্পাদিত 'ধম্মপদং' গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ-কালেই কবি এটির বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশ করেন (বঙ্গদর্শন ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ)। এ ছাড়া তাঁর 'নিজের পুস্তকখানির বিভিন্ন পৃষ্ঠার মারজিনে কালীতে ও পেনসিলে ছন্দোবদ্ধ অনুবাদও করেন' ('রূপান্তর' ১৯৬৫ বিশ্বভারতী, গ্রন্থপরিচয়: পাণ্ডুলিপি-চিত্রের বিবরণ, ধম্মপদ)। তিনি যমকবগ্‌গো, অপ্‌পমাদবগ্‌গো ও চিত্তবগ্‌গো সম্পূর্ণ

এবং পুপ্‌ফবগ্‌গোর প্রথম দশটি শ্লোক অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ বিশ্বভারতী পত্রিকায় (১৩৫৫ শ্রাবণ-আশ্বিন) প্রকাশিত হয়। অবশ্য তার পূর্বে যমকবগ্‌গো ও পুপ্‌ফবগ্‌গোর অনুবাদ শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৩৫১) প্রকাশিত হয়েছিল।

ধম্মপদ ছাড়া সুত্তপিটকের খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত খুদ্দকোপাঠের মঙ্গলসুত্ত, সুত্তনিপাতের মেত্তভাবনা, বিশেষতঃ করণীয়মেত্তসুত্তটি এবং দীঘনিকায়ের আটানাটিয সুত্তটি রবীন্দ্রসাহিত্যে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে এই শ্লোকগুলি ব্যবহারের কাল এবং কোনটি কতবার উদধৃত হয়েছে তার পরিসংখ্যান দেওয়া আছে। তার থেকে রবীন্দ্রমনে কোন শ্লোকের গুরুত্ব কতদূর তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

উপরোক্ত শ্লোকগুলি ছাড়া রবীন্দ্রসাহিত্যে যে পালি শ্লোক দেখা যায় সেগুলি সবই অর্বাচীন কালের রচনা। স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে এগুলি কবি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন। পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া সংকলিত বৌদ্ধদের নিত্যব্যবহার্য গ্রন্থ 'হস্তসার' এ (১৮৯৩) ত্রিপিটকের মূল শ্লোকগুলির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অর্বাচীন কবিদের রচিত বহু প্রচলিত শ্লোকও পাওয়া যায়। রবীন্দ্রব্যবহৃত কিছু ত্রিপিটকের শ্লোক ও অর্বাচীন শ্লোকের কয়েকটি এই গ্রন্থে দেখা যায়। সুতরাং মনে হয় এই গ্রন্থ থেকেই উক্ত শ্লোকগুলির সঙ্গে কবি পরিচিত হয়েছিলেন। এ ছাড়া সমণ পুন্নানন্দ সামী -সংকলিত 'রত্নমালা' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯২৪) কবিব্যবহৃত প্রায় সমস্ত শ্লোকই পাওয়া গেছে। তবে এ সংকলন-গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করতেন কি না, তা জানা যায় নি। গুণালংকার মহাস্থবির ও সমণ পুন্নানন্দ সামী সংকলিত 'রত্নমালা'র প্রথম সংস্করণটি (১৯১২) বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের গ্রন্থতালিকায় রয়েছে, যদিও পুস্তকটি বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এমন অনুমান বোধ করি অসংগত হবে না যে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি দেখেছিলেন এবং স্থলবিশেষে এটির সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। 'হস্তসার' এবং 'রত্নমালা' গ্রন্থে প্রাপ্ত শ্লোকগুলি পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে যথাস্থানে চিহ্নিত করা হল।

বৌদ্ধ সাহিত্যের সঙ্গে কবির পরিচয় এই পর্যন্ত। তবে তার পালিভাষার প্রতি কবির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। অবশ্য ভাষার সৌন্দর্য তার কারণ নয়। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে তিনি সাধারণ্যে প্রচলিত পালিভাষার ধর্মপ্রচারের উপযোগিতার কথা স্মরণ করেন এবং বলেন—

যে ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিশ্বাসপ্রশ্বাস

নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করতে পারে, বুদ্ধ সেইজন্য পালিভাষায় ধর্মপ্রচার করিয়াছেন।

— 'শিক্ষা', পরিশিষ্ট শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি।

পালিভাষা সম্বন্ধে কবির মন্তব্য এর বেশি অগ্রসর হয় নি।

৩

বৌদ্ধ শাস্ত্রসাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরিচয় বিশেষ না থাকলেও বৌদ্ধ ধর্মদর্শন সম্বন্ধে তিনি অনবহিত ছিলেন না। সহজ অনুভূতি দিয়েই এই ধর্মের মূল সত্যকে কবি অনুভব করেছিলেন। তাই প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের কিছু সংস্কারকে সমর্থন এবং কিছু বর্জন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় নানাভাবেই তাঁর মতবাদ বা সিদ্ধান্তকে ব্যক্ত করেন। রবীন্দ্রচিন্তায় বৌদ্ধধর্মের এই স্বরূপটি কি তা অনুধাবন করার আগে গৌতম বুদ্ধের ধর্মমতের মূল বক্তব্যটি জানা প্রয়োজন।[১]

বুদ্ধের সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য হল দুঃখ কি, দুঃখের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়, দুঃখের নিরোধ কি এবং কি প্রকারে দুঃখের নিরোধ হয়, তার উপায় আবিষ্কার করা (দীঘনিকায়: মহাসতিপট্ঠান সুত্ত, মজ্ঝিমনিকায়: সতিপট্ঠান সুত্ত ও সচ্চবিভঙ্গ সুত্ত)। তাই বুদ্ধ কোনো অসীম বা অনন্তের সন্ধান করেন নি, অজ্ঞেয় বা দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সমাধানও খোঁজেন নি। সুত্তপিটকের দীঘনিকায় ও মজ্ঝিমনিকায়ের মধ্যে যথাক্রমে পোট্ঠপাদ ও মালুঙ্কাপুত্রের যে কাহিনী আছে, তা এই কথার সমর্থক। রবীন্দ্রনাথও বুদ্ধের উদ্দেশ্য বুঝেছিলেন। তাই তিনি লিখেছেন—

বুদ্ধকে যখন মানুষ জিজ্ঞাসা করলে, কোথা থেকে এই সমস্ত হয়েছে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, আমরা কোথায় যাব, তখন তিনি বললেন, 'তোমার ও সব কথায় কাজ কী? আপাতত তোমার যেটা অত্যন্ত দরকার সেইটেতে তুমি মন দাও। তুমি বড় দুঃখে পড়েছ। সেইটে মেটাবার উপায় করে তবে অন্য কথা।'

— শান্তিনিকেতন' ১ম, ভূমা ১৩১৫ চৈত্র ১৪

পরবর্তী কালেও কবি এই প্রসঙ্গটি স্মরণ করে বলেছিলেন—

বুদ্ধকে যখন কোনো একজন চরমতত্ত্বের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি বলেছিলেন,

১ বুদ্ধের ধর্মমত প্রসঙ্গে এখানে বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ মহেশচন্দ্র ঘোষের (১৮৬৮-১৯৩০) মত অনুসৃত হল। রবীন্দ্রনাথও তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কবির 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থের অন্তর্গত বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ প্রবন্ধে (১৩১৮) তার পরিচয় আছে।

'আমি চরমের কথা বলতে আসি নি, আমি বলব পথের কথা।'

—'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ২

বুদ্ধনির্দিষ্ট পথ কোনটি? বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ মহেশচন্দ্র ঘোষ বলেছেন যে, তা হল আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ('বুদ্ধপ্রসঙ্গ' ১৩৬৩, গোতমের সাধনা ও সিদ্ধি)। এই মার্গ বা পথ কাম্যবস্তুর উপভোগ বা দুঃখময় দেহনির্যাতনের পথ নয়, তা এই দুই অন্তপথের মধ্যম পথ। এই পথে সাধনার পদ্ধতি দুটি—সম্যক্ সমাধি ও ব্রহ্মবিহার। এই দুটিই ধ্যানের পদ্ধতি এবং উভয়ই গোতমের অনুমোদিত। এই দুই পদ্ধতিতেই গোতম সাধনা করেছিলেন। এই বলে মহেশচন্দ্র মজ্ঝিমনিকায় ৪৩, মহাবেদল্লসুত্ত অনুসারে এই দুই পদ্ধতির ব্যাখ্যা করে বলেছেন, সম্যক সমাধি ও ব্রহ্মবিহারের প্রণালীর মধ্যে পার্থক্য আছে। সম্যক্ সমাধিতে চিত্তের যে বিমুক্তি হয় তা হল অনিমিত্ত অর্থাৎ উচ্চ সমাধি অবস্থায় বাহ্যবস্তুর চিন্তাবিহীনতা, আকিঞ্চন্য অর্থাৎ অন্তরে প্রবল নাস্তিত্বের ভাব এবং শূন্যতা অর্থাৎ আমিত্বজ্ঞান ও মমত্ববোধবিরহিত চিত্তবিমুক্তি। কিন্তু ব্রহ্মবিহারে চিত্তের যে বিমুক্তি তাতে চিত্তের প্রসার বাড়ে, তা অসীম ও অপ্রমাণ অর্থাৎ প্রমাণ বা পরিমাণরহিত। তাই এর নাম অপ্রমাণচিত্ত বিমুক্তি।

এই দুই পদ্ধতির প্রণালীতে পার্থক্য থাকলেও উভয়ের লক্ষ্য ও ফল এক এবং উভয়ই অর্হত্বপ্রাপ্তি ও নির্বাণলাভের উপায়। এই নির্বাণের ব্যাখ্যা করে মহেশচন্দ্র বলেছেন—

> নির্বাণ অর্থ—সংসার অবস্থার নির্বাণ, ব্যাবহারিক সত্তার নির্বাণ, উপাধির নির্বাণ। ব্যাবহারিক সত্তার বিনাশ হইলে, পারমার্থিক সত্তার প্রকাশও হইবে। সুতরাং নির্বাণের দুই দিক্: এক বিনাশের দিক্, অপর, প্রকাশের দিক। ব্যাবহারিক সত্তাকে বিনষ্ট করিয়া যে পারমার্থিক রূপকে উৎপন্ন করিতে হইবে, তাহা নহে। পারমার্থিক রূপের উৎপত্তি নাই। ব্যাবহারিক সত্তাকে নির্মূল কর, তখন একমাত্র পারমার্থিক সত্তাই প্রকাশিত থাকিবে। ইহাই নিত্যাবস্থা, ইহাকে নির্বাণ বলা হইয়াছে।

—'বুদ্ধপ্রসঙ্গ', নির্বাণতত্ত্ব ১৩৬৪

এবার এই নির্বাণ ও তার উপায়স্বরূপ সম্যক সমাধি বা নিষেধাত্মক দিক এবং ব্রহ্মবিহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণ করা যাক। কবি বলেন—

> স্বয়ং বুদ্ধের মনে এই নির্বাণ শব্দটির অর্থ যে কী ছিল তা এখানে আলোচনা করে কোনো ফল নেই, কিন্তু দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করাই যে চরম সিদ্ধি, এই ধারণা বৌদ্ধযুগের পর হতে

নানা আকারে ন্যূনাধিক পরিমাণে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছে।

—'শান্তিনিকেতন' ২, সামঞ্জস্য ১৩১৭ মাঘ

অবশ্য প্রথম জীবনে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কবির নিজেরও এই ধারণাই ছিল। তাই ইন্দিরা দেবীকে লেখা তাঁর এক পত্রে তিনি বলেছিলেন—

তারা (বৌদ্ধরা) বলে যতক্ষণ অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ দুঃখের সংশোধন হতে পারে না, একেবারে নির্বাণ চাই।··আমি বলি যা হয়েছে বেশ হয়েছে, এই-যে আমি হয়েছি এবং এই আশ্চর্য জগৎ হয়েছে, বড় তোফা হয়েছে—এমন জিনিসটা নষ্ট না হলেই ভালো। বুদ্ধদেব তদুত্তরে বলেন, এ জিনিসটা যদি রক্ষা করতে চাও তা হলে দুঃখ সইতে হবে। আমি নরাধম তদুত্তরে বলি, ভালো জিনিস এবং প্রিয় জিনিস রক্ষা করতে যদি দুঃখ সইতেই হয় তাহলে দুঃখ সব।

—'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১০৩, ১৮৯৩ জুলাই ॥

ওই একই সময়ে কবি লেখেন—

বুদ্ধ বলিলেন, বস্তুই বা কী, আর মনই বা কী, কিছুর মধ্যেই নিত্যপদার্থ নাই, অনন্ত বিশ্বমরীচিকা কেবল স্বপ্নপ্রবাহমাত্র। স্বপ্ন দেখিবার বাসনা একবার ধ্বংস করিতে পারিলেই মানুষের মুক্তি হয়, এবং ব্রহ্ম ও আত্মা নামক কোনো নিত্য-পদার্থ না থাকাতে একবার নির্বাণলাভ করিলে আর দ্বিতীয়বার অস্তিত্বলাভের সম্ভাবনামাত্র থাকে না।

—'সমাজ', পরিশিষ্ট, কর্তব্যনীতি ১৩০০

সুতরাং প্রথম জীবনে কবি নির্বাণের নঞর্থক দিকটিই দেখেছিলেন। কিন্তু যে কবি এই 'সুন্দর ভুবনে' মানুষের সজীব চিত্তের মাঝে বেঁচে থাকতে চান এবং যিনি জীবনের উপান্তে দাঁড়িয়েও গভীর আত্মোপলব্ধির দৃঢ়তায় ঘোষণা করেন--

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়

— 'শেষ লেখা', ১১-সংখ্যক কবিতা ১৯৪১ মে ১৩

তিনি স্বভাবতঃই এই বৌদ্ধ নাস্তিত্বের দর্শনকে সমর্থন করতে পারেন না।

কিন্তু এই নাস্তিত্ববাদই বৌদ্ধধর্মের চরম কথা কি না সে বিষয়ে ক্রমশঃ তাঁর সংশয় জাগে। তাঁর মনে হয়, যে রাজপুত্র একদিন সংসার ত্যাগ করে দুঃখমুক্তির সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সিদ্ধিলাভ করবার পরেও তিনি কি কারণে সর্ব মানবের দুঃখ

দূর করার জন্য এই দুঃখময় সংসারের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। তিনি যে শুধুমাত্র আপন মুক্তি নিয়েই নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেন নি তার কারণ—

> তাঁহার মতো অদ্ভুত শক্তিমান পুরুষ বহুকাল একাগ্রচিন্তার পর যে সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাহা যে সকল মানুষেরই নয় এ কথা তিনি এক মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করেন নাই।
>
> —'সঞ্চয়', ধর্মের অধিকার ১৩১৮

সেইজন্যই বুদ্ধ তাঁর এই দুঃখজয়ের মন্ত্রটি সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের জীবনের আলোকে বৌদ্ধধর্মের যে পরম সত্যটি উপলব্ধি করেন, তা হল—

> নির্বাণটি কী? সে কী শূন্যতা?
>
> যদি শূন্যতাই হত তবে কেবলই সমস্তকে অস্বীকার করতে করতে, 'নয় নয় নয়' বলতে বলতে, একটার পর একটা ত্যাগ করতে করতেই, সেই সর্বশূন্যতার মধ্যে নির্বাপণ লাভ করা যেত।
>
> কিন্তু, বৌদ্ধধর্মে সে পথের ঠিক উল্টা পথ দেখি যে। তাতে কেবল তো মঙ্গল দেখছি নে—মঙ্গলের চেয়েও বড়ো জিনিসটি দেখছি যে। মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে। অর্থাৎ, তাতে একটা কোনো ভালো উদ্দেশ্য সাধন করে, কোনো-একটা সুখ হয় বা সুযোগ হয়। কিন্তু প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ, প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা, সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না এই প্রেমের ভাবে, এই আদানহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্যে বুদ্ধদেবের উপদেশ আছে, তিনি তার সাধন প্রণালীও বলে দিয়েছেন।
>
> এ তো বাসনাসংহরণের প্রণালী নয়, এ তো বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়, এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম 'মেত্তিভাবনা'—মৈত্রীভাবনা সর্বত্র মৈত্রীকে দয়াকে বাধাহীন করে বিস্তার।
>
> —'শান্তিনিকেতন' ১, ব্রহ্মবিহার ১৩১৫ চৈত্র ১১

এই বলে উদ্‌ধৃতি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রী-ভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলার নাম ব্রহ্মবিহার। সুতরাং নির্বাণের শূন্যতার স্থলে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিহারের প্রেমভাব লক্ষ করেছেন। কিন্তু এইটুকুই বৌদ্ধধর্মের একমাত্র বক্তব্য নয়। এই ধর্মে কতকগুলি বিধিনিষেধের অনুজ্ঞাও কবি লক্ষ করেছিলেন। সে সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, দুঃখনিবৃত্তির পথে বুদ্ধ—

প্রথমে কতকগুলি নিষেধ স্বীকার করিয়ে মানুষকে শীল গ্রহণ করতে আদেশ করেন। তাকে বললেন, 'তুমি লোভ কোরো না, হিংসা কোরো না, বিলাসে আসক্ত হোয়ো না'।

তবে সেইসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করে দিয়েছেন—

বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেন নি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন।

—'শান্তিনিকেতন' ১, আদেশ ১৩১৫ চৈত্র ৯

সুতরাং কবি দেখেছেন, বৌদ্ধধর্মের এক দিকে বাসনাবর্জনের শিক্ষা অন্য দিকে প্রেম-বিস্তারের উপদেশ। এর কোনোটিকেই তিনি বাদ দেন নি। তবে 'ভালোবাসার অমৃত'-এর মধ্যেই যিনি 'সৃষ্টির শেষ রহস্য'কে উপলব্ধি করেছিলেন তিনি যে স্বভাবতঃই শীলসাধনার বিধিনিষেধের চেয়ে ব্রহ্মবিহারের প্রেমবিস্তারের প্রতিই আকৃষ্ট হবেন তাতে সন্দেহ নেই। সেইজন্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে বলতে হয়েছে—

বৌদ্ধশাস্ত্রে যাকে বলে পঞ্চশীল সে শুধু 'না'-এর সমষ্টি, কিন্তু সকল বিধিনিষেধের উপরেও অন্তরে আছে ভালোবাসা, সে 'না' নয়—'হাঁ'। মুক্তি তার মধ্যেই। সকল জীবের প্রতি প্রেম যখন অপরিমেয় হবে, প্রতিদিন সকল অবস্থায় যখন কামনা করব সকলের ভালো হোক, তাকেই বুদ্ধ বলেছেন ব্রহ্মবিহার, অর্থাৎ বৃহৎ সত্য যিনি তাঁকে পাওয়া। এইটিই সদর্থক, কেবলমাত্র পঞ্চশীল বা দশশীল নঞর্থক।

—'কালান্তর', নবযুগ ১৩৩৯ পৌষ

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানস-প্রবণতা অনুযায়ী শীলসাধনার কঠোরতার স্থলে বৌদ্ধ-ধর্মের বিশ্বব্যাপী প্রেমের প্রসারিত ঔদার্যকেই বরণ করে নিয়েছিলেন। এ স্থলে বলা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিহারের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে তা সংগত কি না সে প্রশ্ন অবান্তর। কবি কী দৃষ্টিতে তাকে দেখেছিলেন শুধু সেইটুকুই আমাদের আলোচ্য।

৪

বৌদ্ধধর্মে রবীন্দ্রনাথ যে প্রেমসাধনার জয়গৌরব কীর্তন করেছেন, বুদ্ধের আপন জীবনসাধনাতেই তাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বলেন—

বুদ্ধদেব যখন বোধিদ্রুমের তলায় বসে কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন তখন তাঁর পীড়িত চিত্ত বলেছে 'হল না', 'পেলুম না'। তাঁর পাওয়ার পূর্ণ রূপের প্রতিমা বাইরে দেখতে

পেলেন কখন? যখন সুজাতা অন্ন এনে দিলে। সে কি কেবল দেহের অন্ন। তার মধ্যে যে ভক্তি ছিল, প্রীতি ছিল, সেবা ছিল, সৌন্দর্য ছিল—সেই পায়স-অন্নের মধ্যেই অমৃত অতি সহজে প্রকাশ পেল।

—'সাহিত্যের পথে', সৃষ্টি ১৩৩১

কঠোর আত্মকৃচ্ছ্রের সাধনায় বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভ করেন নি। কিন্তু সুজাতার ভক্তি প্রীতি-মিশ্রিত সহজ সেবায় তিনি সিদ্ধির পূর্ণরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সুজাতার এই সেবার পশ্চাতে ছিল নারীধর্মের তথা মানবধর্মের সহজ প্রেরণা, যা সংকীর্ণ স্বার্থের অতিশায়ী, সর্বমানবপ্রীতির মধ্যেই যার উদার প্রসার। বুদ্ধের অন্তরেও ছিল নিখিল বিশ্ববাসীর প্রতি এই অহেতুক প্রেম। তাকে ব্যাখ্যা করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

বুদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে। তাহা জল ভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে।

—ধর্ম', উৎসবের দিন ১৩১১ মাঘ

মনে রাখতে হবে, এ তাঁর কৃপাবিতরণ নয়। সাধারণ মানুষের সম্বন্ধে তিনি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নি, সকলের মধ্যেই মানবতার মহিমাকে উপলব্ধি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মানবের প্রতি বুদ্ধের এই শ্রদ্ধাকে লক্ষ করে তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর মতে—

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন।

'বিচিত্র প্রবন্ধ', মন্দির ১৩১০ পৌষ

পরবর্তী কালে জাভায় গিয়ে বোরোবুদুরের মন্দিরগাত্রে কবি যে চিত্রগুলি দেখেছিলেন তার থেকে বৌদ্ধধর্মে মানবসাধারণের স্থান যে কোথায় তার সুস্পষ্ট পরিচয় পেয়েছিলেন। মন্দিরগাত্রে খোদিত জাতকমূর্তিগুলিতে তিনি 'প্রতিদিনের প্রাণলীলার অজস্র প্রতিরূপ' দেখেছিলেন। তা দেখে তাঁর মনে হয়েছিল—

বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। জাতককাহিনীর মধ্যে খুব একটা মস্ত কথা আছে, তাতে বলেছে যুগ যুগ ধরে বুদ্ধ সর্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশ প্রকাশিত। প্রাণীজগতে নিত্যকাল ভালোমন্দর যে দ্বন্দ্ব চলেছে সেই দ্বন্দ্বের প্রবাহ ধরেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধের মধ্যে

অভিব্যক্ত। তার চরম বিকাশ হচ্ছে অপরিমেয় মৈত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ।

—'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র-১৯, ১৯২৭ সেপ্টেম্বর ২৬

বৌদ্ধধর্ম এই মৈত্রীর শক্তিকে মানবেতর জীবের মধ্যেও অভিব্যক্ত দেখেছেন। জাতক কথায় তার পরিচয় আছে। বৌদ্ধধর্মের এই ভাবটি কবিকে যে কতদূর মুগ্ধ করেছিল তার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে তা জানা যায়। কবি বলেন যে এক সময়ে তিনি একটি গাভীকে স্নিগ্ধচক্ষে একটি গাধার গা চেটে দিতে দেখেছিলেন। এই দেখে তার মনে হয়েছিল, বুদ্ধই যে কোনো এক জন্মে সেই গাভী হতে পারেন এ কথা বলতে জাতককারের একটুও বাধত না। কেননা যে অপরিমাণ প্রীতি ভিন্ন-জাতীয় প্রাণীকেও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করে বৌদ্ধধর্মের মূল শক্তিই যে সেখানে, এবং বৌদ্ধদর্শনের সমস্ত কূট তর্ককে ছাপিয়ে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাও পৌঁছেছে সেইখানেই।

বুদ্ধদেবের এই মৈত্রীর বাণীটি যে মন্ত্রে কবির কাছে সুস্পষ্ট আকারে ধরা দিয়েছে সেটি হল—

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে।
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং॥

এই বাণীকে কবি 'ব্রহ্মবিহার' প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করে দেখেছেন এবং বলেছেন—'এক পুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই অপরিমেয় প্রেমে সমস্ত বিশ্বকে আপন করে দেখাকেই ব্রহ্মবিহার'। এই শ্লোকটি কবির বিশেষ প্রিয় ছিল এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুবার তিনি এটি উদ্ধৃত বা তার উল্লেখ করেছেন। ১৩১১ সালে কবি প্রথম শ্লোকটি উদ্ধৃত করেন। ('ধর্ম', উৎসবের দিন)। এর পরে শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালায় কবি এই শ্লোকের অন্তর্নিহিত গভীর সত্যটি উপলব্ধি করে একাধিক স্থলে তার ব্যাখ্যা করেন ('শান্তিনিকেতন' ১, আদেশ, পূর্ণতা প্রভৃতি)। 'Sadhana' গ্রন্থেও (১৯১৩) আপন জীবনদর্শনের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি এই বাণীটি স্মরণ করেন (*Realisation in Love*)। আর শেষ জীবনে 'The Religion of Man' (1931) এবং 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) গ্রন্থে সেই জীবনের সত্যোপলব্ধির পরিচয়-প্রসঙ্গে এই মন্ত্রটিই তাঁর মনে এসেছে। এর থেকে বোঝা যায় কবির জীবনতত্ত্বের সঙ্গে এই বাণীটি কত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। আবার ধর্মব্যাখ্যার প্রসঙ্গেই নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও কবি যে এটিকে অনুসরণযোগ্য বলে মনে করতেন, হেমন্তবালা দেবীকে লেখা তাঁর একটি পত্র থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায় ('চিঠিপত্র' ৯, পত্র-২০ ১৩৩৮ আষাঢ় ৩)।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ 'ব্রহ্মবিহার'-এর ব্রহ্মকে উপনিষদের ব্রহ্মের

সঙ্গে অবিরোধে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। তাই পূর্বোক্ত পত্রেই দেখি কবি লিখেছেন—'উপনিষদের অনুপ্রেরণায় বুদ্ধদেব বলে গিয়েছেন জীবের প্রতি অপরিমেয় প্রীতিই ব্রহ্মবিহার।' এই পত্রের পূর্বেও কবি উপনিষদের ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন—

> ব্রহ্মকে চাওয়াই যে সকলের চেয়ে বড়োকে চাওয়া। উপনিষৎ বলেছেন: ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। ভূমাকেই, সকলের চেয়ে বড়োকেই, জানতে চাইবে। সেই চাওয়া সেই পাওয়ার রূপটা কী।
>
> —'শান্তিনিকেতন' ১, ব্রহ্মবিহার ১৩১৫ চৈত্র ১১

এই রূপটি কবি বৌদ্ধদের ব্রহ্মবিহারের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাঁর মতে—'অপরিমিত মানসে, অপরিমিত মৈত্রীকে সর্বত্র প্রসারিত করে দিলে ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয়।' এই মিলনেই ব্রহ্মের সাকার উপলব্ধি।

এই ভাবেই কবির কাছে 'ব্রহ্মবিহার' ও বুদ্ধ উপনিষদের ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে গেছেন। অবশ্য বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ মহেশচন্দ্র ঘোষও বৌদ্ধদের ব্রহ্মকে উপনিষদের ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন বলেই মনে করতেন (দ্রষ্টব্য: বুদ্ধের ব্রহ্মবাদ, প্রবাসী ১৩১৮ শ্রাবণ, বুদ্ধের ধর্মে ব্রহ্মের স্থান, প্রবাসী ১৩০৮ ভাদ্র)। যাই হক, এ সম্বন্ধে অধিক বিচার এ স্থলে অবাস্তব।

৫

বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে একটি বৃহৎ প্রেমের সত্তাকে দেখেছিলেন, তাকে নিছক কবিকল্পনার সৃষ্টি বলে উপেক্ষা করা যায় না। এমন কি প্রথম জীবনে বৌদ্ধ ধর্মকে তিনি যে শূন্যতা ও নাস্তিত্ববাদের ধর্ম বলে বর্ণনা করেছিলেন তাকেও শুধুমাত্র প্রচলিত ধারণার অনুবর্তনমাত্র বলা যায় না। যথাসম্ভব প্রামাণ্য শাস্ত্রের আলোচনা করেই তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। তার বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ প্রবন্ধে (বুদ্ধদেব' ১৩১৮) তার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম জীবনে কবি যে বৌদ্ধ শূন্যতাবাদের কথা বলেছেন প্রকৃতপক্ষে সেটি হল হীনযানী সম্প্রদায়ের মত। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট বলেছেন—'আমরা সাধারণত হীনযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধদের ধর্মকেই বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছি'। তার কারণ ভারতবর্ষে মহাযান সম্প্রদায় বিশেষ দেখা যায় না এবং যে পালি সাহিত্যগুলি অবলম্বন করে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, সেগুলি সবই হীনযান মতাবলম্বী। সেইজন্য রবীন্দ্র-অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথও লিখেছিলেন—

> বুদ্ধোপদিষ্ট মূল ধর্মের আভাস যদি কোথাও থাকে তাহা পালি ধর্মশাস্ত্রে থাকাই

সম্ভব ; আর হীনযান মত যদি সেই শাস্ত্রসম্মত হয় তাহা হইলে ঐ মতটিই আদিম ধর্মের অনুযায়ী হওয়া সম্ভব।

—'বৌদ্ধধর্ম' (১৯০১), সপ্তম পরিচ্ছেদ : বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর ও বিকৃতি

মনে হয় প্রথম জীবনে কবিও এই ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু নিজে স্বাধীনভাবে বৌদ্ধধর্মের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে হীনযান মতটি 'পুঁথি-পড়া বিদেশী পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের গ্রন্থের শুষ্কপত্র' থেকে পাওয়া। অথচ তাঁর ধারণা—'ধর্মকে চিনিতে গেলে তাহাকে জীবনের মধ্যে দেখিতে হয়'। বস্তুতঃ যেসব দেশে বৌদ্ধধর্ম আজও সজীব সেই চীন-জাপান প্রভৃতি দেশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে কবি দেখতে পান, সেখানে মহাযান মতবাদ প্রচলিত। এই মহাযান মতে শূন্যতার স্থলে 'বিশ্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন' দেখা যায়। কিন্তু সেইসঙ্গে আত্মশক্তির স্থলে দৈবশক্তির প্রতি অসীম নির্ভরতাও মহাযানের বৈশিষ্ট্য। তাই 'নাম জপকরা এবং নামাবলী আবৃত্তিও আমরা মহাযান-বৌদ্ধসম্প্রদায়ে দেখিতে পাই'। স্বভাবতঃই কবি মহাযানের এইদিক্‌টি সমর্থন করতে পারেন নি। তাই তাঁকে বলতে হয়েছে—'হীনযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে, মহাযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে', এবং এই দুইকে মিলিয়ে নিয়েই তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। সেই সত্যের এক দিকে হীনযানের আত্মশরণ মন্ত্র—'অত্তা হি অত্তনো নাথ কো হি নাথো পরোসিয়া', এবং অন্য দিকে মহাযান-কথিত সর্বব্যাপিনী মৈত্রীর মন্ত্র। তবে এই দুই-এর মধ্যে মহাযানের প্রেমধর্মের প্রতিই কবির আকর্ষণ ছিল বেশি। কেননা তিনি অনুভব করেছিলেন—

> বৌদ্ধধর্মের মূলে একটি কঠোর তত্ত্বকথা আছে, কিন্তু সেই তত্ত্বকথায় মানুষকে এক করে নি—তার সঙ্গে মৈত্রী, করুণা এবং বুদ্ধদেবের বিশ্বব্যাপী হৃদয়প্রসারই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে।

—'শান্তিনিকেতন' ২, বসের ধর্ম

কবির এই উক্তি যে কতদূর সত্য, ভারতবর্ষের ইতিহাসেও তার প্রমাণ মেলে। বৌদ্ধ মৈত্রীভাবনার প্লাবনই একদিন ক্ষুদ্র বিরোধ-বিচ্ছিন্নতাকে ভাসিয়ে দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষকে এক করে দিয়েছিল। তারই প্রেরণায় সর্বত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল স্বদেশের সীমা লঙ্ঘন করে দেশ দেশান্তরে প্রেমের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই বাণী মিসর থেকে জাপান এবং মধ্য এশিয়া থেকে যবদ্বীপ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। আবার এই প্রেমশক্তির প্রেরণাই যে বৌদ্ধ ভারতকে শিল্প ও সাম্রাজ্য-শক্তির চরম বিকাশলাভে সহায়তা করেছিল সেই ঐতিহাসিক সত্যকেও অস্বীকার করা যায় না। এ সম্বন্ধে কবি প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন—

বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনোকালে হয় নাই।

—'পথের সঞ্চয়', যাত্রার পূর্বপত্র ১৩১৮ আষাঢ়

এখানে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কাল বলতে যে অশোকের রাজত্বকালকেই বোঝাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ দেবপ্রিয় অশোকের রাজত্বের যুগটিই ভারত-ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও গৌরবময় যুগ। সে যুগের সমৃদ্ধির পশ্চাতে যে কিসের প্রেরণা কার্যকরী হয়েছিল সে কথা রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে দিয়েছেন।—

বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ যখন প্রেমের সেই ত্যাগধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছিল তখনি সমাজে তাহার এমন একটি বিকাশ ঘটিয়াছিল।

তার কারণ এই ধর্মের সাধক রাজপুত্র সর্বমানবের দুঃখমোচনের উদ্দেশ্যে একদিন রাজ্য ত্যাগ করে পথে পথে ঘুরেছিলেন এবং সিদ্ধিলাভ করেও তিনি তাঁর সেই সাধনার ফল সর্বমানবের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করে দিয়েছিলেন। তাই সেই অলোক-সামান্যকে মানুষ দুঃসাধ্য সাধন করেই তার ভক্তি জানিয়েছিল। সেই উদ্দেশ্যেই তারা অন্ধকার গুহাভিত্তিতে ছবি এঁকে, দুর্গম পর্বতচূড়ায় মন্দির গড়ে অনন্য কারুনৈপুণ্যে অপূর্ব শিল্প সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাদের এই প্রয়াস হল -

খ্যাতিলোভহীন নিষ্কাম কৃচ্ছ্রসাধনায় আপন শ্রেষ্ঠশক্তিকে উৎসর্গ করা চিরবরণীয়ের চিরস্মরণীয়ের নামে। এর চেয়ে মহত্ত্বর অর্ঘ্য এল ভগবান বুদ্ধের পদমূলে যেদিন রাজাধিরাজ অশোক শিলালিপিতে প্রকাশ করলেন তাঁর পাপ, অহিংস্র ধর্মের মহিমা ঘোষণা করলেন, তাঁর প্রণামকে চিরকালের প্রাঙ্গণে রেখে গেলেন শিলাস্তম্ভে।

'বুদ্ধদেব', বুদ্ধদেব ১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ

বস্তুতঃ শিল্পসম্পদ্ তথা সাম্রাজ্যশক্তির সমবায়ে বৌদ্ধযুগের সর্বাংগীণ সমৃদ্ধি যেন সম্রাট্ অশোকের ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করেই সার্থক হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধের প্রেমাদর্শও তাঁরই কল্যাণকর্মের দ্বারা সফলতা লাভ করেছিল। রাজ্যবিস্তারও এই রাজচক্রবর্তীর কল্যাণ-কর্মেরই অন্তর্গত। সেটি লক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাট অশোক তাঁহার রাজশক্তিকে ধর্মবিস্তারকার্যে মঙ্গলসাধনকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা যে কী সুতীব্র তাহা আমরা সকলেই জানি।···সেই বিশ্বলুব্ধ রাজশক্তিকে তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জন

দিয়া তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।...ইহা যুদ্ধসজ্জা নহে ...ইহা মঙ্গলশক্তির অপর্যাপ্ত প্রাচুর্য, ইহা সহসা চক্রবর্তী রাজাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজাডম্বরকে এক মুহূর্তে হীনপ্রভ করিয়া দিয়া সমস্ত মনুষ্যত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

—'ধর্ম', উৎসবের দিন ১৩১১ মাঘ

অস্ত্রশক্তির দ্বারা দিগ্‌বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মশক্তির দ্বারা বিশ্ববিজয়ই যে অশোকের জীবনাদর্শের মূলকথা তাঁর শিলালিপিগুলিতে তার প্রমাণ আছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁর ত্রয়োদশ শিলানুশাসন থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল—

"এযে চ মুখমুতে বিজয়ে দেবানং প্রিয়স যো ধমবিজয়ো।"

অর্থাৎ অশোকের মতে ধর্মবিজয়ই শ্রেষ্ঠ বিজয়।[১]

আবার অশোকের কর্ম ও বাণীর সঙ্গে পরিচিত কবি নিজেই অশোকের 'শ্রান্তিহীন সেবা' ও মঙ্গলকার্যের বিবরণ দিয়ে বলেছেন—

রোগীদের জন্য ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা, এমন কি পশুদের জন্যও চিকিৎসালয় এখানে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং জীবের দুঃখ নিবারণের চেষ্টা নানা আকার ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছিল।

—'পাথের সঞ্চয়', যাত্রার পূর্বপত্র ১৩১৯ আষাঢ়

বলাবাহুল্য, এই কাজ সহজ কাজ নয়। অশোক নিজেই তাঁর পঞ্চম শিলানুশাসনে বলেছিলেন—

"কলাণং দুকরং। যো আদিকরো কলানস সো দুকরং করোতি"।

অর্থাৎ কল্যাণ দুষ্কর, যিনি আদি কল্যাণকৃৎ তিনি দুঃসাধ্য সাধন করেন।[২]

কিন্তু এই বিপুল শক্তিসাধ্য সেবাও যা শিল্পকলার অপর্যাপ্ত বিকাশের অন্তরালে শুধু কৃচ্ছ্রসাধনের দুঃখ থাকলে তা মানুষকে এমন প্রেরণা দিতে পারত না। যে স্বার্থবুদ্ধিহীন প্রেম মানুষকে এই পথে প্রবর্তনা দেয় তাতে পাওয়া যায় আত্মোৎসর্গের আনন্দ। বুদ্ধদেবের জীবনে রবীন্দ্রনাথ সেই আনন্দ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।—

বুদ্ধদেবের কতখানি আনন্দের অধিকার ছিল যাহাতে রাজ্যসুখের আনন্দ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই।

—'সাহিত্য', সৌন্দর্য ও সাহিত্য ১৩১৪ বৈশাখ

এই আনন্দের উত্তরাধিকারই বুদ্ধভক্ত সাধক শিল্পীর দলকে আরাম ও সুখের

১-২ দ্রষ্টব্য: অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন-প্রণীত 'ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে অশোক প্রবন্ধ।

সংকীর্ণতায় বাঁধা পড়তে দেয় নি; দুঃখের দুর্গম পথে তাঁরা কল্যাণের ব্রত নিয়ে আত্মবিসর্জনের আনন্দে এগিয়ে গেছেন। বুদ্ধপ্রবর্তিত মৈত্রীর প্রেরণাতেই তাঁদের মধ্যে মনুষ্যত্বের এই চরম বিকাশ দেখা গিয়েছিল, সেইটুকুই বৌদ্ধধর্মের সব চেয়ে বড়ো সার্থকতা।

বুদ্ধের জীবন ও তাঁর ধর্মকে রবীন্দ্রনাথ কী দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, এতক্ষণের আলোচনায় আশা করি তার আভাসটি ধরা দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধের মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্ব বহু বিচিত্র মতের অভিঘাতে পরস্পরবিরোধী হয়ে উঠে বিভিন্ন শাখায় ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই আবর্তে বুদ্ধের প্রকৃত বাণী ও তাঁর মানবতার উচ্চ আদর্শও অবনতির পথে ক্রমে ক্রমে বিকৃতির অতলে নেমে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাই প্রচলিত বৌদ্ধ শাস্ত্র বা মতবাদের মধ্যে বুদ্ধের আদর্শ বা বৌদ্ধ সংস্কৃতির সন্ধান করেন নি। বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যকে মিলিয়ে নিয়ে কবি তাঁর মতবাদকে গড়ে নিয়েছিলেন। তাই শাস্ত্রের বাঁধা তত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের মিল হয় নি।

কবি দেখেছিলেন অস্খলিত কঠোর তপস্যা দিয়েই বুদ্ধ আপনাকে গড়ে তুলেছিলেন। দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধন নয়, অন্তরের সংযমসাধনই সেই তপস্যা। সেই সাধনাই তাঁর চরিত্রকে ত্যাগে কঠোর অথচ করুণায় কোমল করে তুলেছিল। তাই খাদ্যহারা মানবের বেদনায় করুণ যে আঁখিদুটি সন্ধ্যাতারার মতো ফুটে থাকে, তাঁর কবিতায় কবি তারই উদ্দেশে তাঁর প্রণাম রেখে গেছেন। আর রবীন্দ্রসাহিত্যের ত্যাগনিষ্ঠ ভিক্ষু উপগুপ্ত এবং আনন্দ ক্ষমাসুন্দর বুদ্ধচরিত্রের স্নিগ্ধ বিভাতেই এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে! তাই এই নরোত্তমের প্রতি কবির অপরিসীম শ্রদ্ধা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এক পরম অর্ঘ রচনা করেছে।—

এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,
মানুষের জন্মক্ষণ হতে
নারায়ণী এ ধরণী
যাঁর আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহু যুগ,
যাঁহাতে প্রত্যক্ষ হল ধরায় সৃষ্টির অভিপ্রায়,
শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে
তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে—
প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে

এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।

—'জন্মদিনে', ৬-সংখ্যক কবিতা ১৩৪৭ বৈশাখ

কবির এই শ্রদ্ধার আলোকেই বর্তমানের দুঃখপীড়িত মানুষ আড়াই হাজার বছর আগেকার এই দুঃখজয়ের মন্ত্রদাতা মহামানবকে চিনে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধ সংস্কৃতি আলোচনার বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা সেইখানেই।

রামায়ণ

'কাহিনী' কাব্যের অন্তর্গত ভাষা ও ছন্দ কবিতায় (আ. ১৩০৩) রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি বলেছিলেন—

দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে,
তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দগানে।

অতএব তাঁর জিজ্ঞাস্য—

"কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা মাঝে দুঃখ মহত্তম,—
কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি তাঁর পুণ্য নাম।"
নারদ কহিলা ধীরে "অযোধ্যার রঘুপতি রাম"।

উৎকলিত কবিতাংশটিতে রামায়ণ রচনার সূত্রপাতের কথা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার দ্বারা রামায়ণের মর্মকথা তথা এই কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব দুই-ই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে। আর এই কবিতায় তথ্যজ্ঞানের অভাবে শঙ্কিত বাল্মীকিকে নারদ যে আশ্বাস দিয়েছিলেন—'কবি, তব মনোভূমি অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো' সে কথা রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটির সম্বন্ধেও বলা চলে। এখানে রামায়ণের আদর্শকে কবি অনেকাংশেই 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' বাল্মীকির মুখে আরোপ করে দিয়েছেন।

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে অসংখ্যবার রামায়ণকে স্মরণ করেছেন এবং বহু ক্ষেত্রে সেই কাহিনীগুলিকে এমন অভাবনীয় তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছেন, তাতে এমন তত্ত্ব আরোপ করে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে তা আধুনিক লেখকের নূতন সৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যথাস্থানে তার আলোচনা করা হবে। এ স্থলে দেখা প্রয়োজন রামায়ণ কত ভাবে কত দিক থেকে রবীন্দ্রমনকে স্পর্শ করেছিল এবং রবীন্দ্রমানসে তার গুরুত্বই বা কতদূর।

রামায়ণ রবীন্দ্রনাথের মনকে তিন দিক্ থেকে প্রেরণা দিয়েছিল। প্রথমতঃ এই কাহিনী থেকে কবি নূতন সাহিত্যসৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এই জাতীয় মহাকাব্যটির গুরুত্ব কোথায় এবং কতদূর সেটি ব্যাখ্যা করে তিনি আধুনিক পাঠকের মনে মুদ্রিত করে দেবার চেষ্টা করেছেন এবং সেই আদর্শ অনুসরণের জন্য দেশের জনসাধারণকে উৎসাহিত করেছেন। তৃতীয়তঃ তিনি এই প্রচলিত কাহিনীকল্পনার অন্তর্নিহিত মূল সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করে ও তার ব্যাখ্যা করে তাকে নূতনরূপে পাঠকসমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। এবার একে একে এগুলির পরিচয় নেওয়া যাক।

২

'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, চাকরদের মহলে যেসব বই নিয়ে তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়, তার মধ্যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রধান। তখন থেকেই তিনি রামায়ণ আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে তার রস-উপভোগও করতেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখেছেন—

> রামায়ণ পড়ার একটা দিনের ছবি মনে স্পষ্ট জাগিতেছে।...দিদিমা...যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন সেই মার্বেলকাগজ-মণ্ডিত কোণছেঁড়া-মলাট-ওয়ালা মলিন বইখানি কোলে লইয়া মায়ের ঘরের দ্বারের কাছে পড়িতে বসিয়া গেলাম। ...রামায়ণের কোনো-একটা করুণ বর্ণনায় আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া, দিদিমা জোর করিয়া আমার হাত হইতে বইটা কাড়িয়া লইয়া গেলেন।
>
> —জীবনস্মৃতি', শিক্ষারম্ভ

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পরে আর একটু বড়ো বয়সে বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের সঙ্গেও কবির পরিচয় হয়েছিল। পিতার সঙ্গে ডালহৌসি পাহাড়ে গিয়ে তিনি মহর্ষির কাছে 'বাল্মীকির স্বরচিত অনুষ্টুভ ছন্দের রামায়ণ' পড়ে এসেছিলেন। কিন্তু তা 'ঋজুপাঠ' গ্রন্থে উদ্ধৃত সামান্য অংশমাত্র। পরবর্তী কালে মূল বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে তিনি কতদূর পরিচিত হয়েছিলেন তা জানা যায় নি। তবে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' (১২৮৭) এবং 'কালমৃগয়া' (১২৮৯) গীতিনাট্য দুটিতে সংস্কৃত রামায়ণের যথাক্রমে আদিকাণ্ডের প্রখ্যাত—'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ' (২।১৫) ইত্যাদি এবং অযোধ্যাকাণ্ডের 'পুত্র ব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাম্প্রতম্' (৬৪।৫৪) ইত্যাদি শ্লোক দুটি উৎকলিত দেখা যায়। এ ছাড়া দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকাতেও ('প্রাচীন সাহিত্য', রামায়ণ ১৩১০ পৌষ) আদিকাণ্ড থেকে একাধিক শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। এর কিছু কাল পরে প্রাচীন ভারতের তপোবনসংস্কৃতির পরিচয়

দিতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের অযোধ্যা ও অরণ্যকাণ্ডের একাধিক শ্লোক উদ্ধৃত করেন ('শান্তিনিকেতন' ২, তপোবন ১৩১৬)। তাঁর রচনায় রামায়ণ থেকে উদ্ধৃতির সীমা এই পর্যন্ত। পরবর্তী কালে সংস্কৃত রামায়ণের শ্লোকের ব্যবহার তাঁর সাহিত্যে চোখে পড়ে নি। উপাদান-সংগ্রহ বিভাগটি দেখলেই এই উক্তির সত্যতা বোঝা যাবে। সুতরাং রবীন্দ্রসাহিত্যে রামায়ণের প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি অপেক্ষাকৃত স্বল্প।

রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে নতুন সাহিত্যসৃষ্টিও তাঁর বেশি নয়। প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের উপর কিন্তু রামায়ণের সুগভীর প্রভাব ছিল। তাঁদের হাতে রামায়ণ যে কতভাবে অনুকৃত অনুসৃত ও অনূদিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকেই মহাকবি অশ্বঘোষ রামায়ণের আদর্শে বুদ্ধচরিত রচনা করেন।[১] তাঁর পরবর্তী কবিরা রামায়ণকে আদর্শমাত্র না রেখে প্রত্যক্ষভাবে রামকাহিনীকে অবলম্বন করে কাব্য নাটক ইত্যাদি রচনা করেছেন। কালিদাস (রঘুবংশ), ভবভূতি (উত্তর-রামচরিত), মুরারি (অনর্ঘরাঘব), ভট্টহরি (ভট্টিকাব্য) প্রভৃতি তাঁদের অগ্রগণ্য। রামায়ণের চর্চা বাংলা দেশেও যথেষ্ট ছিল। অভিনন্দ (আ. খ্রী. ৯ম শতক) এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর (খ্রীঃ ১১শ—১২শ শতক) রামচরিত তার উদাহরণ। তবু বাংলা ভাষার আদি রামায়ণ-রচয়িতা কবি হলেন কৃত্তিবাস। এই দিক থেকে এটিকে বাংলার আদি কাব্য বলা চলে, অন্ততঃ এটি যে বাংলার প্রথম জাতীয় মহাকাব্য তাতে সন্দেহ নেই। শুধু বাংলা নয়, ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাগুলিতেও রামায়ণের অনুসরণ দেখা যায়। তুলসীদাসের (১৫৩২ ১৬২৩) হিন্দী কাব্য রামচরিতমানস তার মধ্যে প্রধান। আধুনিক কালের বাঙালী কবিদের কাছেও রামায়ণের আকর্ষণ যে কমে নি মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তা ছাড়া এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র ঘোষের রাবণবধ-অভিমন্যুবধ-লক্ষ্মণবর্জন (১২৮৮) ও সীতার বিবাহ-রামের বনবাস-সীতাহরণ (১২৮৯), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পাষাণী (১৩০৭) ও সীতা (১৩০৯) এবং হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরীর দশাননবধ কাব্য (১৩১০) প্রভৃতি স্মরণ করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এমন প্রত্যক্ষভাবে রামায়ণের মূল কাহিনীর অনুসরণে কোনো সাহিত্যসৃষ্টি করেন নি। কেবল রামেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-কৃত 'সংক্ষিপ্তম্ বাল্মীকীয় রামায়ণম্' গ্রন্থটি (১৯০৫) তিনি সম্পাদন করেছিলেন। তবে তিনি রামায়ণের কোনো কোনো ঘটনাকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম জীবনে লেখা 'বাল্মীকিপ্রতিভা' গীতিনাট্যের কাহিনী মূলতঃ রামায়ণ থেকেই নেওয়া।

১ দ্রষ্টব্য : দ্বিতীয় পর্ব, অশ্বঘোষ, শূদ্রক ও বিশাখদত্ত অধ্যায়

অবশ্য এটি লেখার প্রত্যক্ষ প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' (১২৮৬) কাব্য থেকে। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

> বাল্যকালে বাল্মীকিপ্রতিভা-নামক একটি গীতিনাট্য রচনা করিয়া 'বিদ্বজ্জন-সমাগম'-নামক সম্মিলন উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম। সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন-কি, স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্যন্ত বিহারীলালের সারদামঙ্গলের আরম্ভভাগ হইতে গৃহীত।
>
> — আধুনিক সাহিত্য', বিহারীলাল ১৩০১ আষাঢ

২১ বৎসর বয়সে কবি যে 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যটি রচনা করেছিলেন তার কাহিনীও রামায়ণ থেকে নেওয়া। এর পরে অহল্যার প্রতি (১২৯৭ 'মানসী') এবং পতিতা (১৩০৪ 'কাহিনী') নামক দুটি কবিতাও তিনি রামায়ণে বর্ণিত কাহিনী অবলম্বন করেই লিখেছিলেন। তবে এই কবিতা দুটিতে যে সুগভীর ভাবময় তাৎপর্য আরোপ করা হয়েছে এবং যেভাবে তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে তাতে তা আদি কবির স্থূল কল্পনাকে বহু দূরে অতিক্রম করে গেছে। তাই অভিশপ্তা ঋষিপত্নী অহল্যাকে সম্বোধন করে যখন কবি বলেন

নবীন উৎসাহে
ছুটেছে অনঙ্গ পথে মরুদ্দিগবিজয়ে
সংসার আকারে, উঠিত সে ক্ষুব্ধ হয়ে
তোমার পাষাণ ঘেরি করিতে নিপাত
অথবা অভিশাপ তব সে আঘাত
জাগাত কি জীবনের কম্প তব দেহে?

তখন এ জিজ্ঞাসার আড়াল থেকে আধুনিক কবির কণ্ঠকে নিঃসন্দেহেই চেনা যায়। তেমনি তাপস ঋষ্যশৃঙ্গ পতিতা নারীর বন্দনা করে যেভাবে বলেছেন—

'আনন্দময়ী মূর্তি তুমি,
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার,
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।"

এবং তা শুনে সেই নারীর যে অনুভূতি—

ধন্য রে আমি ধন্য বিধাতা
সৃজেছ আমারে রমণী করি।
তাঁর দেহময় উঠে মোর জয়,
উঠে জয় তাঁর নয়ন ভরি।

সেই আশ্চর্য অনুভূতিকল্পনার কোনো তুলনা বাল্মীকির কাব্যে পাওয়া সম্ভব নয়। পূর্বোদ্ধৃত ভাষা ও ছন্দ কবিতাটির সম্বন্ধেও সেই কথা। আসলে রামায়ণবর্ণিত কাহিনীর সূত্রটুকু মাত্র অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে সম্পূর্ণ নূতন রূপে সৃষ্টি করে নিয়েছেন। এইভাবেই তিনি 'সোনার তরী' কাব্যের অন্তর্গত পুরস্কার কবিতায় (১৩০০) মূল রামায়ণের ভাবনির্যাসটুকু ধরে দিয়েছেন। অবশ্য যাঁরা রামায়ণ অবলম্বন করে কাব্যরচনার প্রয়াস পেয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই যথাসম্ভব আপন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছেন। তবে এ বিষয়ে কবি রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসই যে সবচেয়ে সার্থক তাতে সন্দেহ নেই।

পরবর্তী কালে কবি আর প্রত্যক্ষভাবে রামায়ণের উপকরণকে কাজে লাগান নি। তাঁর সাহিত্যে তা সূক্ষ্মভাবে মিশে গিয়েছিল। তবে কখনও কখনও রবীন্দ্রসাহিত্যে রামায়ণের পরোক্ষ উপাদানকেও চেনা যায়। তাই 'চিত্রা' কাব্যের নগরসংগীত কবিতায় (১৩০২ ?) যেখানে দেখি—

কোন মায়ামৃগ কোথায় নিত্য
স্বর্ণঝলকে করিছে নৃত্য
তাহারে বাঁধিতে লোলুপচিত্ত
ছুটিছে বৃদ্ধবালকে।

সেখানে আধুনিক জনমানসের ধনলিপসার আড়াল থেকে স্বর্ণমৃগের প্রতি সীতার লুব্ধতার চিত্রটিই মনে আসে। তেমনি তাঁর আর একটি গানেও শুনি—

তোরা যে যা বলিস ভাই,
আমার সোনার হরিণ চাই।
ও সেই মনোহরণ চপল চরণ
সোনার হরিণ চাই॥
সে-যে চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়,
যায় না তারে বাঁধা।
সে-যে নাগাল পেলে পালায় ঠেলে,
লাগায় চোখে ধাঁধা।

—গীতবিতান', প্রেম ১৮৪-সংখ্যক গান

স্পষ্টই বোঝা যায়, এখানে কবির কল্পনায় স্বর্ণমৃগের মরীচিকারই অনিবার্য ছায়াপাত ঘটেছে।

রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করে কবির নূতন সৃষ্টি এর বেশি অগ্রসর হয় নি।

তবে দীর্ঘ দিন পরে লেখা 'রক্তকরবী' নাটকের (১৩৩৩) কাহিনীও রামায়ণ থেকেই গৃহীত বলে রবীন্দ্রনাথ দাবী করেছেন। এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক।

৩

প্রথম-সংস্করণ 'রক্তকরবী' নাটকের প্রস্তাবনা ১৩৩১ সালে লিখিত কবির একটি অভিভাষণ। তাতে রবীন্দ্রনাথ রহস্যচ্ছলে বলেছিলেন—

> রামায়ণের গল্পের ধারার সঙ্গে এর যে একটা মিল দেখছি তার কারণ এ নয় যে, রামায়ণ থেকে গল্পটি আহরণ করা। আসল কারণ, কবিগুরুই আমার গল্পটিকে ধ্যানযোগে আগে থাকতে হরণ করেছেন।

এই বলে তিনি তাঁর 'রক্তকরবী'র সঙ্গে রামায়ণের সাদৃশ্য বর্ণনা করে বলেছেন—

> হঠাৎ মনে হতে পারে, রামায়ণটা রূপক কথা। বিশেষত যখন দেখি, রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি ; রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর ; আর-একটিতে শান-বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি।···রাম ও রাবণ এক দিকে দুই মানুষের ব্যক্তিগত রূপ, আর-এক দিকে মানুষের দুই শ্রেণীগত রূপ। আমার নাটকও একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণীর।···আদিকবির সাত কাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না, এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে, তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পা... ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ, সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।

এখানে রক্তকরবী এবং রামায়ণের মধ্যে কবি যে মিল দেখিয়েছেন, তার প্রসঙ্গ অবান্তর। আসলে কবি রামায়ণের উপর একটা নূতন ভাব, একটা নূতন তাৎপর্য আরোপ করে দিয়েছেন এবং বলা বাহুল্য রামায়ণের এই নূতন ভাষ্যটি রবীন্দ্রকল্পনারই সৃষ্টি। রাম ও রাবণকে তিনি যে দুটি প্রতীক ফেলেছেন তার একটি হল কর্ষণজীবী সভ্যতা এবং অন্যটি আকর্ষণজীবী সভ্যতা। কর্ষণজীবী সভ্যতার প্রতীক নবদূর্বাদল-শ্যাম রাম আর দশমুণ্ড বিশহস্তের অধিকারী বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ আকর্ষণজীবী সভ্যতার প্রতিনিধি। সে মূর্তিমতী কৃষিলক্ষ্মী সীতাকে স্বর্ণমায়ায় প্রলুব্ধ করে হরণ করেছিল অর্থাৎ কর্ষণজীবী সভ্যতা ধনলোভে আকর্ষণজীবী সভ্যতার কবলে পড়ে নির্জিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় হল রামের অর্থাৎ কৃষিসভ্যতা আকর্ষণজীবী

সভ্যতাকে পরাস্ত করল। ওই সময়েই লেখা কবির আর একটি প্রবন্ধে তিনি এই ভাবটিই সংহত আকারে প্রকাশ করেন।—

রামায়ণিক লড়াইয়ের মূল হচ্ছে সীতাহরণ, অর্থাৎ কৃষিক্ষেত্রের প্রতি উপদ্রব। রামচন্দ্র যে কৃষিধর্মরক্ষক বীরত্বের প্রতিরূপক (symbol) তা তাঁর লোকবিখ্যাত নবদূর্বাদলের মতো শ্যামবর্ণের দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

—'সমাজ', ভারতবর্ষীয় বিবাহ ১৩৩২

এর কিছু দিন পরে জাভায় গিয়ে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির যে 'ভাঙাচোরা' রূপ দেখেছিলেন তার মধ্যে রামায়ণকাহিনীর রূপান্তর তাঁর দৃষ্টিকে বিশেষভাবেই আকৃষ্ট করেছিল। জাভায় প্রচলিত রামায়ণে রামসীতা ভাইবোন। সেই ভাইবোনে বিবাহ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই কাহিনীর অন্তরালে সত্য প্রচ্ছন্ন দেখেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন যে সীতা বা হলবিদারণরেখাকে পৃথিবীর কন্যা বলা যায়। আর শস্যকে যদি নবদূর্বাদলশ্যাম বলে কল্পনা করা যায় তবে সেই শস্য হয় পৃথিবীর পুত্র। এই রূপক অনুযায়ী রামসীতা ভাইবোন এবং পরস্পর পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ।

জাভায় প্রচলিত কাহিনীর এই ভাষ্য করেই কবি ক্ষান্ত থাকেন নি। রামায়ণের অন্তর্নিহিত কৃষিসভ্যতার রূপকটি রবীন্দ্রকল্পনাকে এমনভাবে অধিকার করে রেখেছিল যে তিনি তার তাৎপর্য আবিষ্কারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং বলেন—

কৃষির ক্ষেত্র দুরকম করে নষ্ট হতে পারে—এক বাইরের দৌরাত্ম্যে, আর-এক নিজের অযত্নে। যখন রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গেল তখন রামের সঙ্গে সীতার আবার মিলন হতে পেরেছিল। কিন্তু, যখন অযত্নে অনাদরে রামসীতার বিচ্ছেদ ঘটলো তখন পৃথিবীর কন্যা সীতা পৃথিবীতেই মিলিয়ে গেলেন। অযত্নে নির্বাসিতা সীতার গর্ভে যে যমজ সন্তান জন্মেছিল তাদের নাম লব কুশ। লবের মূল ধাতুগত অর্থ ছেদন, কুশের অর্থ জানাই আছে। কুশ ঘাস একবার জন্মালে ফসলের খেতকে-যে কিরকম নষ্ট করে সেও জানা কথা। আমি যে মানেটা আন্দাজ করছি সেটা যদি একেবারেই অগ্রাহ্য না হয় তাহলে লবের সঙ্গে কুশের একত্র জন্মানোর ঠিক তাৎপর্য কি হতে পারে, এ কথা আমি পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করি।

—'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র-৭ ১৯২৭ অগস্ট ১

রামায়ণকে কৃষিসভ্যতা বিস্তারের ইতিহাসরূপে কল্পনা করা রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও প্রচলিত ছিল। তবে লবকুশের যে ব্যাখ্যা কবি দিয়েছেন তা নূতন এবং এই নিয়ে মতভেদের অবকাশ আছে।

মূল কাহিনী ছাড়া রামায়ণের অন্যান্য নানা প্রক্ষিপ্ত ঘটনা বা কাহিনীকেও কবি

নূতন রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। যবদ্বীপ যাত্রার পূর্বে বৃহত্তর-ভারত-পরিষদের বিদায়-সম্বর্ধনা উপলক্ষে তিনি যে ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেন, ভারতবর্ষ একদিন নিজের ক্ষুদ্র আত্মকোটরের মধ্যে অবরুদ্ধ না থেকে বহু দুঃখের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর বিশ্বে নিজেকে সম্প্রসারিত করেছিল। তিনি রামায়ণের মধ্যে সেই সাধনারই প্রতিরূপ লক্ষ করেছিলেন। তাই তাঁর বক্তব্য—

> রামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধন করেছিলেন তখন কাঠবেড়ালিরও স্থান হয়েছিল সেই কাজে।...সীতাকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করাই পৃথিবীতে সকল মহৎ সাধনার রূপক। সেই সীতাই ধর্ম, সেই সীতা জ্ঞান, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি; সেই সীতা সুন্দরী; সেই সীতা সর্বমানবের কল্যাণী। নিজের কোটরের মধ্যে প্রভূত খাদ্য-সঞ্চয়ের ঐশ্বর্য নিয়ে এই কাঠবেড়ালির সার্থকতা ছিল না, কিন্তু সীতা-উদ্ধারের মহৎ কাজে সে যে নিজেকে নিবেদন করেছিল এইজন্যেই মানবদেবতা তার পিঠে আশীর্বাদরেখা চিহ্নিত করেছিলেন।

—'কালান্তর' বৃহত্তর ভারত ১৩৩৪ শ্রাবণ

অনেক ক্ষেত্রে আবার কবি নিজের মনের কোনো ভাব প্রকাশের জন্য রামায়ণ-কাহিনীকে ব্যবহার করেন। তাই মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির আদর্শ বোঝাতে গিয়ে তিনি রামায়ণের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেন—

> মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে।...রাবণের ঘরে সীতা লোভের দ্বারা বন্দী, রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত, সেইখানেই তাঁর সত্য-প্রকাশ। প্রেমের কাছে দেহের অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়, লোভের কাছে তার স্থূল মাংস।

— আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৫, ১৩৩৮ পৌষ

এখানে রামায়ণের রূপককে বহির্বিষয়ক কাহিনীর মধ্যে না রেখে কবি তাকে টেনে নিয়েছেন মানুষের অন্তর্লোকের গভীরে। আর এই গভীরতার থেকে তিনি এক দিকে যেমন সাহিত্যসৃষ্টির রহস্য সন্ধান করেছেন, অন্য দিকে তেমনি তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার মহনীয় তাৎপর্যও সংগুপ্ত দেখেছেন। তাই রামায়ণের কাহিনী স্মরণ করে তিনি বলেন, অশোকবনে বন্দিনী সীতার কাছে রামের দূত তাঁর আংটি নিয়ে এসেছিল। সেই আংটি দেখে সীতা বুঝেছিলেন, রাম তাঁকে ভোলেন নি; তাঁকে উদ্ধার করার জন্যই তিনি এসেছেন। তেমনি—

> ফুলও আমাদের কাছে সেই প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে। সংসারের সোনার লঙ্কায় রাজভোগের মধ্যে আমরা নির্বাসিত হয়ে আছি; রাক্ষস আমাদের কেবলই বলছে,

'আমিই তোমার পতি, আমাকেই ভজনা করো।'· ·সে (ফুল) চুপিচুপি·· বলে··· আমি সেই সুন্দরের দূত, আমি সেই আনন্দময়ের খবর নিয়ে এসেছি। এই বিচ্ছিন্নতার দ্বীপের সঙ্গে তাঁর সেতু বাঁধা হয়ে গেছে, তিনি তোমাকে এক মুহূর্তের জন্যে ভোলেন নি, তিনি তোমাকে উদ্ধার করবেন। · তখনি আমরা বুঝতে পারি, এই সোনার লঙ্কাপুরীই আমার সব নয় —এর বাইরে আমার মুক্তি আছে।

—'শান্তিনিকেতন' ২, শ্রাবণসন্ধ্যা

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থেও (অধ্যায় ২) মানুষকে উপকরণবহুল পার্থিব জীবনের চেয়ে মহত্তর জীবনের সন্ধান দিতে গিয়ে তিনি রামায়ণকে স্মরণ করে বলেছেন, স্বর্ণলঙ্কার ঐশ্বর্যবান রাবণের পরাভব হল রামচন্দ্রের কাছে অর্থাৎ বাইরে যিনি দরিদ্র, আত্মায় যিনি ঐশ্বর্যবান তাঁর কাছে।

রামায়ণের এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথকে যে শুধু পরিণত বয়সেই অধিকার করেছিল তা বলা যায় না। প্রথম বয়সেই 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের অপূর্ব রামায়ণ প্রবন্ধে কবি বলেছিলেন, রাজা রামচন্দ্র অর্থাৎ মানুষ প্রেম নামক সীতাকে নানা রাক্ষসের হাত থেকে রক্ষা করেও শেষে শাস্ত্রের কানাকানিতে তাকে মৃত্যুতমসার তীরে নির্বাসিত করে দেন। তার পরে কুশ এবং লব, কাব্য এবং ললিতকলা এরা মানুষের কাছে প্রেমমঙ্গলের গান গাইতে, আজও সে গান শেষ হয় নি। দেখা হয় নি জয় হয় কার— ত্যাগপ্রচারক বৈরাগ্যধর্মের, না প্রেমমঙ্গল গানের।

বাল্মীকিরচিত কাহিনীর উপর কবি যেমন নূতন তত্ত্ব আরোপ করেছেন, রামায়ণের কতকগুলি প্রচলিত ব্যাখ্যাকেও তেমনি তিনি আপন আধ্যাত্মিক ভাবনার রঙে রঞ্জিত করে প্রকাশ করেছেন—

লোকে প্রসিদ্ধি আছে যে, রাবণ ভগবানের শত্রুতা করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে, সত্যের নিকট পরাস্ত হইলে নিবিড়ভাবে সত্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সত্যকে অবিরোধে অসংশয়ে সহজে গ্রহণ করিলে তাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না।

—'সমাজ', পূর্ব ও পশ্চিম ১৩১৫

এইভাবেই কবি রামায়ণের প্রচলিত ভক্তি ও বিশ্বাস -মিশ্রিত ব্যাখ্যাকে নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছেন।

রামায়ণকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ নানা তত্ত্বের অবতারণা করেছেন, কখনও বা তার নূতন ভাষ্য করেছেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিশীল কল্পনা সেইখানে থেমে থাকে নি। বাল্মীকির কল্পনা যেখানে কৃপণ, সেখানেও রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-উৎসের করুণাবারি

স্বতঃই উৎসারিত হয়েছে। তাই অব্যক্তবেদনা ম্লানমুখী ঊর্মিলার প্রসঙ্গে বাল্মীকির প্রতি অনুযোগ করে কবি বলেছেন—

> লক্ষ্মণ তাঁহার দেবতাযুগলের জন্য কেবল নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ঊর্মিলা নিজের চেয়ে অধিক নিজের স্বামীকে দান করিয়াছিলেন, সে কথা কাব্যে লেখা হইল না।

—'প্রাচীন সাহিত্য', কাব্যের উপেক্ষিতা ১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ

তবে আদিকবির কাব্য ঊর্মিলার জন্য স্থানসংকোচ করেছিল বলেই রবীন্দ্রহৃদয় যেন অগ্রসর হয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়েছে এবং চিরকালের জন্য তাকে অমর করে দান করেছে।

৪

রামায়ণকে রবীন্দ্রনাথ যে কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী সভ্যতার দ্বন্দ্বের রূপক বলে ব্যাখ্যা করেছেন সেটি নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়। কবি মনে করেন সমস্ত বৃহৎ কাব্যই মানবজীবনসম্ভব, তা পুরোপুরি কাল্পনিক হয় না। তাই রামায়ণ রচিত হবার পরেই রামচরিত সম্বন্ধে নানা জনশ্রুতি ও পুরাণকথা দেশময় ব্যাপ্ত হয়েছিল। তার ভিত্তি সত্যমূলক সন্দেহ নেই। সেই জনশ্রুতিই রামায়ণ কাব্যে দানা বেঁধে উঠেছিল। কবি তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি (১৩১৪ আষাঢ় 'সাহিত্য') ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা (১৩১৯ 'ইতিহাস') প্রভৃতি প্রবন্ধে রামায়ণের অন্তর্নিহিত সেই সত্যকেই ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেছেন। তিনি দেখেছেন, আর্য আধিপত্যের আগে যে দ্রাবিড় জাতীয়েরা ভারতের আদিম নিবাসীদের জয় করেছিল তারা অসভ্য ছিল না। তাদেরই বংশ দাক্ষিণাত্যের কোনো দুর্গমস্থানে পরাক্রান্ত হয়ে উঠে এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য স্থাপন করে।—

> রামচন্দ্র বানরগণকে অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদিগকে দলে লইয়া বহু দিনের চেষ্টায় ও কৌশলে এই দ্রাবিড়দের প্রতাপ নষ্ট করিয়া দেন, এই কারণেই তাঁহার গৌরবগান আর্যদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল।

—'সাহিত্য', সাহিত্যসৃষ্টি ১৩১৪ আষাঢ়

এই প্রবন্ধে কবি রামায়ণকাহিনীর গল্পাংশ যথাসম্ভব বর্জন করে তার সত্য ইতিহাসটি যথাযথভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন। ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা প্রবন্ধে এই বিশ্লেষণই ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে। রামায়ণের মূলে কবি একটি সমাজবিপ্লব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেটি হল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ। ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির প্রতীক

হলেন রামচন্দ্রের কুলগুরু বশিষ্ঠ, আর ক্ষাত্রধর্মের পক্ষে ছিলেন বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্রই রামকে তাঁর পিতার অমতে কুলধর্মের বিপক্ষে টেনে নেন এবং তাঁর দ্বারা ক্ষত্রদ্বেষী ব্রাহ্মণ পরশুরামকে পরাস্ত করেন।

রাম আবার কৃষিবিস্তারের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। সেই সময়ে ক্ষত্রিয় রাজা জনক এক দিকে ব্রহ্মজ্ঞান এবং অন্য দিকে কৃষিবিদ্যার অনুশীলন করছিলেন। তাঁর কাজের বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল শৈব আরণ্যকেরা। তাই জনক ঘোষণা করেছিলেন—

> শিবোপাসকদের প্রভাবকে নিরস্ত করিয়া যিনি দাক্ষিণখণ্ডে আর্যদের কৃষিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন তিনিই যথার্থ ভাবে ক্ষত্রিয়ের আদর্শ জনকরাজার অমানুষিক মানসকন্যার সহিত পরিণীত হইবেন।··· রাম যখন বনের মধ্যে গিয়া কোনো কোনো প্রবল দুর্ধর্ষ শৈববীরকে নিহত করিলেন তখনই তিনি হরধনুভঙ্গের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তখনই তিনি সীতাকে অর্থাৎ হলচালনরেখাকে বহন করিয়া লইবার অধিকারী হইতে পারিলেন।
>
> —ইতিহাস ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ১৩১৯

তাঁর কৃষিনৈপুণ্যের পরিচয়স্বরূপ বলা যায় হলচালনের অযোগ্য পাষাণ অহল্যা ভূমি, যাকে দক্ষিণাপথে অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম ঋষি গৌতম অভিশপ্ত বলে পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন, সেই কঠিন পাষাণকেও রামচন্দ্র সজীব করে তুলেছিলেন।

সুতরাং আর্য অনার্যের দ্বন্দ্বে আর্য রাম আপন কৃষিসভ্যতাকে অনার্যশক্তির হাত থেকে রক্ষা করে এবং আর্যধর্মকে অনার্য শৈবধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পরে ক্রমশঃ আর্যের সঙ্গে অনার্য সভ্যতার এবং আর্যধর্মের সঙ্গে শৈব-ধর্মের সমন্বয় ঘটে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন দেখিয়েছেন—

> তখন এককালের যজ্ঞবিরোধী শিব যজ্ঞেশ্বর বলে স্বীকৃত ও মহেশ্বর বলে পূজিত হলেন। আর, কৃষিসম্পদের অন্যতমা দেবতা অন্নপূর্ণা তাঁরই গৃহিণী বলে স্বীকার্য হলেন।
>
> —'রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি', রামায়ণ

রামচন্দ্র যে অনার্যদের নির্জিত করেই আর্যদের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এ কথা বলা যায় না। আশ্চর্য ঔদার্যে তিনি অনার্যদের মিত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং ভারত-ইতিহাসের চরম লক্ষ্য যে ঐক্যসাধন ব্রত, তাকে সার্থক করে তুলেছিলেন। রামচরিত্রের এই দিকটিকে লক্ষ করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যে আর্য-উপনিবেশকে অগ্রসর করিয়া দিবার উপলক্ষে যেদিন গুহক চণ্ডালরাজের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন, যেদিন কিষ্কিন্ধ্যার অনার্য-

গণকে উচ্ছিন্ন না করিয়া সহায়তায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং লঙ্কার… বিভীষণের সহিত বন্ধুতার যোগে… শত্রুতা নিরস্ত করিয়াছিলেন, সেইদিন ভারতবর্ষের অভিপ্রায় এই মহাপুরুষকে অবলম্বন করিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছিল।

—'রাজাপ্রজা', সমস্যা ১৩১৫

কিন্তু আর্যদের মধ্যে যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ দেখা দিয়েছিল, যার প্রথম পদক্ষেপেই রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ ভার্গব পরশুরামকে পরাজিত করেছিলেন এবং সম্ভবতঃ যার ফলে যৌবরাজ্যে অভিষেকের মুখে তাঁকে নির্বাসনে যেতে হয়েছিল, সে বিরোধের মীমাংসা সহজে হয় নি। তবু সে ক্ষেত্রেও রাম আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। পরাভূত পরশুরামকে হত্যা না করে উদার ক্ষমায় তিনি তাকে বশ করেছিলেন।

রামায়ণের এই সমন্বয়ধর্মের তাৎপর্যকে রবীন্দ্রনাথ যে কত গভীরভাবে সত্য বলে অন্তরে অনুভব করতেন তাঁর পরবর্তী কালের রচনায় তা বোঝা যায়। তাই সমবায়-নীতির উপযোগিতা বোঝাতে গিয়ে তিনি কৃষিবিদ্ তথা ব্রহ্মবিদ্ জনককে স্মরণ করেন, কেননা জনকই সভ্যতার অন্নময় তথা জ্ঞানময় ধারাকে একত্রে সমন্বিত করেছিলেন। সেইসঙ্গেই কবি বলেন, প্রবল পরাক্রান্ত রাবণকে—

মেরেছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানরের সংঘবদ্ধশক্তি। একটি প্রেমের আকর্ষণে সেই সংঘটি বেঁধেছিল। আমরা যাঁকে রামচন্দ্র বলি তিনিই প্রেমের দ্বারা দুর্বলকে এক করে তাদের ভিতর প্রচণ্ড শক্তিবিকাশ করেছিলেন।

—'সমবায়নীতি', ভারতে সমবায়নীতির বিশিষ্টতা ১৩৩৪ শ্রাবণ

এর কিছু কাল পরে লেখা নবযুগ প্রবন্ধেও (১৩৩৯, 'কালান্তর') কবি এই প্রসঙ্গটিই স্মরণ করেন। ওই সময়ে পারস্যযাত্রী কবি (১৯৩২ এপ্রিল) পথে সম্রাট্ দারিয়ুসের প্রাসাদ দেখে যে ইতিহাস-আলোচনা করেন, তাতেও রামায়ণের অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে ('পারস্যে', অধ্যায় ৫)। আর শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ (১৩৪৬ ভাদ্র ১২, পল্লীপ্রকৃতি') সম্বন্ধে অভিভাষণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কৃষির মহিমা বর্ণনা করার উপলক্ষে সীতার উদ্ভব ও অহল্যা-উদ্ধারের তাৎপর্যের কথা স্মরণ করেন।

রামায়ণকে কবি যে কত সূক্ষ্ম ও সতর্ক ইতিহাসবোধ দিয়ে বিচার করেছিলেন তার প্রমাণ, তিনি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডকে প্রক্ষিপ্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন। কবি বলেন, যে-রামচন্দ্র একদিন চণ্ডালকেও মিত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন, উত্তরকাণ্ডে তিনিই শূদ্র তপস্বীর দণ্ডদাতা। আবার যে সীতাকে তিনি সুখে দুঃখে রক্ষা করে প্রাণপণে শত্রু হস্ত থেকে উদ্ধার করেছেন, তাকেই এখানে তিনি লোকাপবাদ ভয়ে পরিত্যাগ করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় এই কাণ্ডের রাম সমাজরক্ষকের ফরমাশের সৃষ্টি।

আসলে সমাজে যখন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ মিটে গেল এবং ক্ষত্রিয়ের পরিবর্তে ব্রাহ্মণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল তখন ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের অনুকূল করে রামায়ণের নূতন সংস্করণ রচিত হয়। তখন থেকে—

> রামচন্দ্র যে একদা তাঁহার স্বজাতিকে বিদ্বেষের সংকোচ হইতে প্রেমের প্রসারণের দিকে লইয়া গিয়াছিলেন…সে কথাটা মরিয়া গিয়াছে এবং ক্রমে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে তিনি শাস্ত্রানুমোদিত গার্হস্থ্যের আশ্রয় ও লোকানুমোদিত আচারের রক্ষক।
>
> —'ইতিহাস', ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ১৩১৯

কবির এই মন্তব্যের ঐতিহাসিকতা যে সংশয়াতীত অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের বিচারে তা সমর্থিত হয়েছে। তিনি বলেছেন—

> সম্রাট্ অশোকের প্রভাবে যখন দেশে বেদ ও ব্রাহ্মণ-বিরোধী বৌদ্ধধর্ম প্রবল হয়ে হয়ে ওঠে তখন ব্রাহ্মণগণ আত্মরক্ষার প্রয়োজনে একদিকে ক্ষত্রিয়পূজিত বিষ্ণুকে স্বীকার করে নিয়ে বিষ্ণুভক্ত ক্ষত্রিয়দের দলে টেনে নিলেন। অপরদিকে ক্ষত্রিয়-কাব্য রামায়ণকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজের অনুকূলরূপে সংস্কার করে নিয়ে এক কল্পিত আদর্শ রামরাজাকে বৌদ্ধসমাজের স্বীকৃত অশোকের আদর্শ ধর্মরাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে খাড়া করলেন।
>
> —'রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি' ১৯৬২, রামায়ণ

উত্তরকাণ্ড-সংবলিত এই নূতন রামায়ণই আমরা পাই। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, উত্তরকাণ্ড সম্বন্ধে ইতিহাসসচেতন কবির এই অভিমত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়। আবার বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে যে দশরথজাতক এবং মহাভারতের বনপর্বে যে রামোপাখ্যান পর্বাধ্যায় আছে, তাতে দেখি রাবণবধের পরে সীতাসহ রামের প্রত্যাবর্তন ও রাজ্য-প্রাপ্তিতেই এ কাহিনী সমাপ্ত। সীতাবিসর্জন এতে নেই। এর দ্বারাও উত্তরকাণ্ড সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যুক্তিই সমর্থিত হয়। উত্তরকাণ্ড-সম্পর্কিত ভাবনাটি যে দীর্ঘদিন কবিকে অধিকার করে ছিল, তার প্রমাণ ১৩১১ সালে 'আত্মশক্তি' গ্রন্থের স্বদেশী-সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট নামক প্রবন্ধে পাওয়া যায়। সেখানে তিনি পরোক্ষে এই ভাবনাটি প্রকাশ করেন। আর ১৩৪০ সালে তিনি প্রমাণসহ তাঁর এই বিচারকে স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন—

> উত্তরকাণ্ড এল বিশেষ কালের বুলি নিয়ে।…সে যুগে ব্যবহারের যে আটঘাট বাঁধবার দিন এল তাতে রাবণের ঘরে দীর্ঘকাল বাস করা সত্ত্বেও সীতাকে বিনা প্রতিবাদে ঘরে তুলে নেওয়া আর চলে না। সেটা যে অন্যায় এবং লোকমতকে অগ্রগণ্য করে সীতাকে বনে পাঠানোর এবং অবশেষে তাঁর অগ্নি পরীক্ষার যে

প্রয়োজন আছে, সামাজিক সমস্যার এই সমাধান চরিত্রের ঘাড়ে ভূতের মতো চেপে বসল। তখনকার সাধারণ শ্রোতা এই সমস্ত ব্যাপারটাকে খুব একটা উঁচুদরের সামগ্রী বলেই কবিকে বাহবা দিয়েছে। সেই বাহবার জোরে ওই জোড়াতাড়া খণ্ডটা এখনও মূল রামায়ণের সজীব দেহে সংলগ্ন হয়ে আছে।

— সাহিত্যের স্বরূপ, সাহিত্যের মাত্রা

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, রামায়ণের রূপকার্থ নির্ণয়ে কবি যতদূর উৎসাহী, রামায়ণ থেকে ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের ঐতিহাসিক স্বরূপ নির্ণয়ে তিনি তার থেকে কম আগ্রহী নন। সেই সঙ্গে রামায়ণ থেকে ধর্ম ও সমাজ বিবর্তনের যে এক দীর্ঘকালের (মৌর্যপর্ব কাল থেকে মৌর্যোত্তর কাল) ইতিহাস কবি তুলে ধরেছেন, তার গুরুত্বও যথেষ্ট।

৫

রামায়ণ থেকে রূপকার্থ বা ঐতিহাসিক তথ্য নিষ্কর্ষণ করা হলেও মনে রাখতে হবে যে এটি কাব্য এবং রবীন্দ্রনাথ তার কাব্যরূপকে কখনও অস্বীকার করেন নি। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই কাব্যরূপের ব্যাখ্যারও অভাব নেই। পূর্বেই দেখা গেছে, সাহিত্যের মাপকাঠিতে বিচার করে কবি এই কাব্য থেকে ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। যেমন রামচরিত্রের অসংগতি থেকেই তিনি প্রমাণ করেন যে, উত্তরকাণ্ড পরবর্তী কালের যোজনা। সাহিত্য হিসাবেও তিনি উত্তরকাণ্ডকে সম্পূর্ণ অসার্থক বলে মত প্রকাশ করেন।—

তিনি (রামচন্দ্র) প্রজারঞ্জনের জন্য নিরপরাধা সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন। এত বড়ো নিঃস্ব ছবি খুব অল্পই আছে সাহিত্যের চিত্রশালায়।

—'সাহিত্যের স্বরূপ', সাহিত্যে চিত্রবিভাগ ১৩৪৮ বৈশাখ

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, রামচন্দ্র যে প্রজানুরঞ্জনের জন্যই সীতাকে পরিত্যাগ করেছিলেন এ কাহিনী ভবভূতির কাব্যে পাই। বাল্মীকির রামায়ণে আছে 'রাজকুলসুলভ অকীর্তিশঙ্কাবশতঃ' সীতাত্যাগ।[১] যাই হক, শাস্ত্রবুদ্ধিরচিত উত্তরকাণ্ড যে সার্থক হয় নি, রবীন্দ্রনাথের এই বিচার সংশয়াতীত। কিন্তু উত্তরকাণ্ড ছাড়া মূল রামায়ণকে কবি সার্থক সাহিত্য হিসাবে মর্যাদা দিয়েছেন আজীবন। তাঁর মতে—

এই রামায়ণকথা হইতে ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা আপামরসাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে, আনন্দ পাইয়াছে, কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য

১ দ্রষ্টব্য : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'বিবিধ প্রবন্ধ' ১ম খণ্ড, উত্তরচরিত ১২৭৯

করিয়াছে তাহা নহে, ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে ; ইহা যে কেবল তাহাদের ধর্মশাস্ত্র তাহা নহে, ইহা তাহাদের কাব্য।

—'প্রাচীন সাহিত্য', রামায়ণ ১৩১০ পৌষ

রবীন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে এ কাব্য থেকে সাহিত্যরসই উপভোগ করেছেন। 'আলোচনা' গ্রন্থের এক প্রবন্ধে (সৌন্দর্য ও প্রেম : তত্ত্বের বার্ধক্য ১২৯১ আষাঢ়) তিনি বলেছিলেন, বাল্মীকির যুগে যেসব তত্ত্ব প্রচলিত ছিল, তার অধিকাংশকেই এ যুগে আর সত্য বলে গ্রহণ করা চলে না। কিন্তু 'সেই প্রাচীন ঋষি-কবি হৃদয়ের যে চিত্র দিয়াছেন, তাহার কোনোটাই এখনও অপ্রচলিত হয় নাই'। সার্থক কাব্য মানুষের সেই হৃদয়ভাবেরই ছবি। তার সুর মানবের চিরন্তন স্নেহ-প্রেম-আনন্দ-বেদনারই সুর। রামায়ণে কবি সেই সুর শুনেছেন। এর কিছু কাল পরে আর একটি কবিতায় তিনি বলেছিলেন, রাম-লক্ষ্মণ-সীতার অসহ ও নিদারুণ অভিমানের ঘটনা স্থায়ী হয় নি। কালের চক্রে তার তীব্রতা হ্রাস পেয়ে ক্রমে মুছে গেছে। কিন্তু তার প্রতিফলন কবির মনে যে বেদনার সৃষ্টি করেছিল তা কাব্যের আকারে উৎসারিত হয়ে চিরন্তন সাহিত্যের সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তাঁর মনে হয়—

শুধু সেদিনের একখানি সুর
চিরদিন ধরে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর
মধুর করুণ তানে,
সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে
আজিও সে গীত মহাসংগীতে
বাজে মানবের কানে।

—'সোনারতরী', পুরস্কার ১৩০০ শ্রাবণ

রামায়ণ কাব্যে কবি সেই 'মহাসংগীত'ই শুনেছেন এবং তাঁর পরবর্তীদের কাছে তা-ই পরিবেশন করেছেন।

কাব্যরসের উপভোগ ছাড়া সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গেও দেখি সাহিত্যের আদর্শরূপে কবি বারংবার রামায়ণকে স্মরণ করেছেন। তাই ট্র্যাজেডির বিষয় বোঝাতে গিয়ে তিনি 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের কৌতুকহাস্যের মাত্রা (১৩০১ ফাল্গুন) এবং 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের সাহিত্যতত্ত্ব (১৩৪০ ভাদ্র) প্রবন্ধ দুটিতে রামায়ণকে স্মরণ করেছেন। সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার বিচার ('সাহিত্য', মানবপ্রকাশ ১২৯৯

ভাদ্র-আশ্বিন) বা 'সিদ্ধবস' ('সাহিত্য', ঐতিহাসিক উপন্যাস ১৩০৫ আশ্বিন) বোঝাবার প্রয়োজনে তিনি মহাভারতের সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণকেও স্মরণ করেছেন।

সংস্কৃত রামায়ণের সবল মধুর ভাষাও তাঁর চিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল। তাই প্রথম বয়সে মধুসূদন দত্তকে কটাক্ষ করে তিনি লিখছিলেন—

ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্য যত প্রকার পরিশ্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত তাহা তিনি করিয়াছেন। একবার বাল্মীকির ভাষা পড়িয়া দেখ দেখি, বুঝিতে পারিবে মহাকবির ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, হৃদয়ের সহজ ভাষা কাহাকে বলে?

—'সমালোচনা', মেঘনাদবধ কাব্য ১২৮৯ ভাদ্র

এই উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে বাল্মীকির সরল অথচ হৃদয়গ্রাহী ভাষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। জীবনের শেষ পর্যন্ত কবির এই অনুরাগ অক্ষুণ্ণ ছিল।

তবে রামায়ণের চরিত্রসৃষ্টিই তাকে মুগ্ধ করেছিল সবচেয়ে বেশি। নানা প্রসঙ্গে কৃত কবির মন্তব্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই দেখি সাহিত্যে চরিত্রসৃষ্টির আদর্শ হিসাবে তিনি বিভিন্ন উপলক্ষে রামায়ণকে স্মরণ করেছেন। প্রথম জীবনে সাহিত্যে আদর্শ চরিত্রসৃষ্টির সার্থকতা কোথায় তা দেখাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, রামচন্দ্রের গুণবর্ণনার উদ্দেশ্য তত্ত্ব ব্যাখ্যা নয়—

কিন্তু ভালো যে কত ভালো, অর্থাৎ ভালোকে যে কত ভালো লাগে তাহা সাত-কাণ্ড রামায়ণেই প্রকাশ করা যায়, দর্শনে বিজ্ঞানে কিম্বা সুচতুর সমালোচনায় প্রকাশ করা যায় না।

—'সাহিত্য', সংযোজন: কাব্য ১২৯৮ চৈত্র

পরবর্তী কালে লেখা আর একটি প্রবন্ধেও ('সাহিত্য', সৌন্দর্য ও সাহিত্য ১৩১৪ বৈশাখ) কবি সার্থক সাহিত্যিক চরিত্রের উদাহরণ হিসাবে রামচরিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন। তবে প্রকৃত সাহিত্যগুণঋদ্ধ চরিত্র হিসাবে কিন্তু তিনি রামের তুলনায় লক্ষ্মণকেই মর্যাদা দিয়েছেন বেশি। প্রথম বয়সে এ সম্বন্ধে তিনি লঘু সুরে বলেছিলেন—

প্রাপ্য জিনিসের চেয়ে ফাউ যেমন বেশি ভালো লাগে তেমনি অধিকাংশ সময়েই অপ্রাসঙ্গিক কথাটায় বেশি আমোদ পাওয়া যায়, অনেক সময়ে রামের চেয়ে হনুমান এবং লক্ষ্মণ বেশি প্রিয় বলে বোধ হয়।

— সাহিত্য', সংযোজন: আলোচনা (পত্র) ১২৯৮ ফাল্গুন

এর পরে দেখি তিনি একাধিক স্থলেই অকুণ্ঠিতভাবে লক্ষ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন—

> রামচন্দ্রের ভক্তদের আমি ভয় করি, তাই খুব চুপিচুপি বলছি, সাহিত্যে রামের চেয়ে লক্ষ্মণ বড। বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিশ্চয়ই মানবেন যে, রামকে তিনি ভালো বলেন, কিন্তু লক্ষ্মণকে তিনি ভালোবাসেন।
>
> —'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি', ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১৫

শেষ বয়সেও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে ('ছন্দ', গদ্যকবিতার রূপ ও বিকাশ ৩, পত্র-৩, ১৩৩৯ কার্তিক ১২) কবি নিঃসংশয়ে ঘোষণা করেন যে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস লক্ষ্মণকে উজ্জ্বল কববার জন্যই বাল্মীকি তার পটভূমিকায় রামের একঘেয়ে ভালোত্বের ভূমিকাটি এঁকেছেন। পরিশেষে আব একটি প্রবন্ধে তিনি তাঁর অন্তরের সমস্ত দরদ দিয়ে সৃষ্টি হিসাবে লক্ষ্মণ চরিত্রের সার্থকতা প্রতিপাদন করেছেন।—

> যে লক্ষ্মণ আপন হৃদয়ের বেদনার সঙ্গে অমিল হলে অধৈর্যের সঙ্গে উডিয়ে দিতেন শাস্ত্রের উপদেশ এবং দাদার পন্থার অনুসরণ, অথচ চিরাভ্যস্ত সংস্কারের বন্ধনকে কাটাতে না পেরে নিষ্ঠুর আঘাত করতে বাধ্য হয়েছেন আপন শুভবুদ্ধিকে, যার মতন কঠিন আঘাত জগতে আর নেই— সেই সর্বত্যাগী লক্ষ্মণের ছবি তাঁর দাদার ছবিকে ছাপিয়ে চিরকাল সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।
>
> — 'সাহিত্যের স্বরূপ', সাহিত্যে চিত্রবিভাগ ১৩৪৮ বৈশাখ

অবশ্য দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা'র অন্তর্গত লক্ষ্মণ প্রবন্ধেও দেখি চরিত্রের ঋজুতায়, বলিষ্ঠ সৌন্দর্যে এবং অনমনীয় পুরুষকারে লক্ষ্মণ যে রামের চেয়ে মহনীয় হয়ে উঠেছেন, এমন কথার আভাস রয়েছে।

শুধু লক্ষ্মণ নয়, কৈকেয়ী মন্থরা প্রভৃতির চরিত্রকেও কবি হৃদয়ের ভাবসংঘাতে ও রাগ-অনুরাগের দ্বন্দ্বে উজ্জ্বল বর্ণে মণ্ডিত প্রকাশ করেছেন ('সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব ১৩৪০ ভাদ্র; 'বাংলাভাষা-পরিচয়' ১৯৩৮, অধ্যায় ৫)। আবার চরিত্রকে সুসংগত করে সৃষ্টি করার দায়িত্বটুকুই যে শুধু লেখকের, কিন্তু মন্দ চরিত্রের মন্দ কাজের জন্য লেখক যে দায়ী নন, সেই কথাটি প্রতিপন্ন করার জন্যও কবি বাল্মীকির শরণ নিয়েছিলেন। তাঁর 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস (১৩২৩) প্রকাশের পর অভিযোগ উঠেছিল যে সন্দীপকে দিয়ে সীতাকে তিনি অপমান করিয়েছেন। তার উত্তরে কবি বলেছিলেন—

> আমি কৈফিয়ত স্বরূপ বাল্মীকির দোহাই মানিব,— তিনি কেন রাবণকে দিয়া সীতার অপমান ঘটাইলেন? তিনি তো অনায়াসেই রাবণকে দিয়া বলাইতে পারিতেন যে, মা লক্ষ্মী, আমি বিশ হাতে তোমার পায়ের ধুলা লইয়া দশ ললাটে তিলক কাটিতে আসিয়াছি।
>
> —সাহিত্যবিচার, প্রবাসী ১৩২৬ চৈত্র

দীর্ঘ দিন পরে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা এক পত্রেও কবি এ সম্পর্কে বলেছিলেন যে সন্দীপের চরিত্রে ভদ্রতার আদর্শ নেই বলেই—

সীতার সম্বন্ধে সে যদি এমন কিছু বলে যা সীতার পক্ষে সম্মানকর নয় তাহলে সেটাকে রবীন্দ্রনাথের বাণী বলা মূঢ়তা।

—'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৪৩, ১৩৪১ আষাঢ় ২০

কাব্য হিসাবে রামায়ণকে রবীন্দ্রনাথ যেমন উপভোগ করেছেন বা তার সমালোচনা করেছেন, তেমনি আপন সাহিত্য অলংকরণের জন্য তার থেকে তিনি উপমার উপকরণ আহরণ করেছেন। তাই একটি শিশিরভেজা বাতাবি গাছে নূতন কচি পাতার আবির্ভাবে পুলকিত কবির মনে হয়—

একদিন তমসার কূলে বাল্মীকি
আপনার প্রথম নিশ্বসিত ছন্দে
চকিত হয়েছিলেন নিজে,—
তেমনি দেখলেম ওকে।

—'শেষ সপ্তক', তিন-সংখ্যক কবিতা

অপর অনেক ক্ষেত্রে সচেতনভাবে না হলেও মজ্জাগত রামায়ণিক সংস্কার কবির রচনাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। তাই জাভাযাত্রী রবীন্দ্রনাথের চোখে বর্ষাস্নাত ধরণীর শ্যামল পত্রপ্রাচুর্য অহল্যাভূমির শাপমোচনের স্মৃতি বয়ে আনে ('জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র-১ ১৩৩৪ শ্রাবণ)। কখনও বা সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধের সমস্যাগুলিও রামায়ণ প্রসঙ্গের উল্লেখে বিশেষরূপে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। প্রথম মহাযুদ্ধের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে ওই কাব লেখেন—

যুদ্ধ) যখন মিটল তখন দেখা গেল ঘুরে ফিরে সেই বন্ধটাই এসেছে সন্ধিপত্রের মোড়কে পরে। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে যার প্রকাণ্ড লেজটা দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আঁতকে উঠেছিল, আজ লঙ্কাকাণ্ডের গোড়ায় দেখি সেই লেজটার উপর মোড়কে মোড়কে সন্ধিপত্রের স্নেহসিক্ত কাগজ জড়ানো চলেছে।

—'কালান্তর', শিক্ষার মিলন ১৯২১

আবার মীরা দেবীকে লেখা এক পত্রে দেখি কবি স্নিগ্ধ কৌতুকের সুরে রামায়ণের প্রসঙ্গে স্মরণ করেছেন।

এখানে তামিল কাবি খেতে হয়েছে— স্পষ্টই বোঝা গেছে, যে-দ্বীপে লঙ্কাকাণ্ড হয়েছিল এরা তার খুব কাছেই থাকে।

—'চিঠিপত্র' ৪, পত্র-৫৮, ১৯২৭ অগষ্ট ১৪

৬

রামায়ণ থেকে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের উপকরণ সংগ্রহ করলেও সেটুকুই রামায়ণ সম্বন্ধে তাঁর শেষ কথা নয়। তাঁর মতে—

> রামায়ণ-মহাভারতের যে সমালোচনা তাহা অন্য কাব্য-সমালোচনার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। রামের চরিত্র উচ্চ কি নীচ, লক্ষ্মণের চরিত্র আমার ভালো লাগে কি মন্দ লাগে, এই আলোচনাই যথেষ্ট নহে। স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ধরিয়া ইহাদিগকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে।
>
> —'প্রাচীন সাহিত্য', রামায়ণ ১৩১০ পৌষ

এই দিক্ থেকেই রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের গুরুত্ব বিচার করেছেন। তিনি দেখেছেন যে, কাহিনীর প্রতি প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো মোহ ছিল না। তাই রামায়ণের ছয় কাণ্ডে যে গল্পটি বেদনা ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গড়ে উঠেছিল, একমাত্র উত্তরকাণ্ডেই তা যখন চূর্ণ হয়ে গেল তখনও তার জন্যে ভারতীয় পাঠক কখনও অনুযোগ করে না। কারণ ভারতবাসী রামায়ণের মধ্যে নিছক গল্পরসের সন্ধান করে নি। তারা তার মধ্যে গভীরতর আদর্শের সন্ধান করেছিল। প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ কাব্য যখন গ্রথিত হয় তখন রাম-রাবণের যুদ্ধকাহিনী আর মুখ্য ছিল না। তখন সমাজধর্ম তথা গৃহধর্মরক্ষার প্রয়োজনই প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাই—

> বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্তরসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।
>
> —'প্রাচীন সাহিত্য', রামায়ণ ১৩১০ পৌষ

তাই এক দিকে পিতা-পুত্র-ভ্রাতা পতি-পত্নী প্রভৃতি সকলের সঙ্গে সকলের যে আদর্শ প্রীতিভক্তির বন্ধন রামায়ণে তারই গৌরব বর্ণিত হয়েছে। অন্য দিকে তিনি আদর্শ রাজারূপে, ব্রাহ্মণ্যধর্মের রক্ষাকর্তারূপে পূজিত। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, প্রথমোক্ত আদর্শটি ভারতবর্ষ সাদরে গ্রহণ করেছিল। তার গৌরব আজও অম্লান। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আদর্শটি বিশেষ কালে বিশেষ প্রয়োজনে রচিত। সেইজন্য তার মহিমা আজ আর জীবন্ত নয়, তা 'রাম-রাজ্যে'র ক্ষীণ স্মৃতিতে মাত্র পর্যবসিত।

রামায়ণের গার্হস্থ্য মহিমা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবেই আকৃষ্ট করেছিল। তাই প্রথম জীবনে 'চিঠিপত্র' পুস্তিকায় প্রাচীনপন্থী ষষ্ঠীচরণের বকলমে কবি লিখেছিলেন—

কর্তব্যের অনুরোধে রাম যে রাজ্য ছাড়িয়া বনে গেলেন তাহাই বীরত্ব, এবং সীতা

ও লক্ষ্মণ যে তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন, তাহাও বীরত্ব। ভরত যে রামকে ফিরাইয়া আনিতে গেলেন তাহা বীরত্ব, এবং হনুমান যে প্রাণপণে রামের সেবা করিয়াছিলেন তাহাও বীরত্ব। হিংসা অপেক্ষা ক্ষমায় যে অধিক বীরত্ব, গ্রহণের অপেক্ষা ত্যাগে অধিক বীরত্ব, এই কথাই আমাদের কাব্যে ও শাস্ত্রে বলিতেছে।

—চিঠিপত্র' ১৮৮৭, অধ্যায় ৫

এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, ভারতবর্ষে রামায়ণের কোন আদর্শটি প্রাধান্য পেয়েছে। এর পরে তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে রামায়ণে—

মনুষ্যের যতপ্রকার উচ্চ অঙ্গের হৃদয়বন্ধন আছে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহাতে সর্বপ্রকার হৃদয়বৃত্তিকে মহৎ ধর্মনিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচারিত। সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যে নাই।

—'লোকসাহিত্য', গ্রাম্যসাহিত্য ১৩০৫

প্রায় এই সময়ে লিখিত 'কাহিনী' কাব্যের অন্তর্গত ভাষা ও ছন্দ কবিতাতেও (আ. ১৩০৪) এই জাতীয় ভাবের অনুবর্তন দেখা যায়। তবে সেই সঙ্গে কবি আক্ষেপ করেছেন যে, পৌরুষ ও ধর্মপরতার আদর্শ হিসাবে বাঙালীরা রামকে গ্রহণ করতে পারে নি। জাভার রামায়ণকাহিনীর রূপায়ণ দেখেও তাঁর মনে হয়েছে ভক্তবীর হনুমান বাংলাদেশে যোগ্য সমাদর পান নি। 'তার লেজের দৈর্ঘ্য ও তার বানরত্বই বাঙালির মনকে বেশি করে অধিকার করেছে ('জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র-১৪, ১৯২৭ সেপ্টেম্বর ১৭)। আর ১৯৩৮ সালে তিনি স্পষ্টই লিখেছেন —

একমাত্র কাহিনী ছিল রামায়ণ মহাভারতকে অবলম্বন করে যা মানবচরিত্রের নতোন্নতকে নিয়ে হিমালয়ের মতো ছিল দিক থেকে দিগন্তরে প্রসারিত। কিন্তু ·· তার অভ্রভেদী মহত্ত্বের কঠিন মূর্তি সমতল বাংলার রসাতিশয্যের সঙ্গে মেলে না। তা বিশেষ ভাবে বাংলার নয়, তা সনাতন ভারতের।

—বাংলাভাষা-পরিচয়', অধ্যায় ১১

কিন্তু তবু তো বাঙালী দীর্ঘদিন ধরে একটানা পয়ার ছন্দে রামায়ণ গান গেয়ে এসেছে। তারা রস পেয়েছে কোথায়? বাল্মীকির রামায়ণ মুখ্যতঃ 'নরচন্দ্রমা'র কথা। কিন্তু তার আদর্শ গুণগুলি সাধারণ মানুষের পক্ষে সুলভ নয়। তাই ক্রমশঃ তিনি অসাধারণ ও দেবকল্প হয়ে উঠতে থাকেন। তবু সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে তিনি নন। সুতরাং তখন থেকে তিনি ভক্ত-বৎসল দেবতা হয়ে উঠলেন। বাংলা কৃত্তিবাসী

রামায়ণ সেই ভক্ত-বৎসল রামের জয়গাথা। অবশ্য রামায়ণের এই ভক্তিবাদ ইতিহাসের দিক্ থেকেও সত্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> রামচন্দ্র ধর্মের দ্বারাই অনার্যদিগকে জয় করিয়া· তাহাদের ভক্তি অধিকার করিয়াছিলেন। · দক্ষিণে তিনি কৃষিস্থিতিমূলক সভ্যতা ও ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন।
>
> —'ইতিহাস', ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ১৩১৯

তাই বাঙালীর রামায়ণ গৃহাশ্রমের আদর্শ শিক্ষা দিলেও তা প্রধানতঃ সবল ভক্তিতে তার রসবোধের তৃপ্তি সাধন করেছে। সেইজন্যই বাংলাদেশের ঘরে ঘরে, হাটে বাজারে সর্বত্র রামায়ণপাঠ দেখা যায়। এই ভক্তিমিশ্রিত গার্হস্থ্য রস বাঙালীর যে কতদূর মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল তার পরিচয় দিয়ে কবি বলেছেন যে এখন মনে হয় 'নিতান্ত তুচ্ছ লোকের ক্ষুদ্র কাজের পিছনে রাম-লক্ষ্মণ আসিয়া দাঁড়াইতেছেন, অন্ধকার বাসার মধ্যে পঞ্চবটীর করুণামিশ্রিত হাওয়া বহিতেছে' ('সাহিত্য', বিশ্বসাহিত্য ১৩১৩ মাঘ)। কেননা 'ভারতবাসীর ঘরের লোক এত সত্য নহে, রাম লক্ষ্মণ সীতা তাহার পক্ষে যত সত্য' ('প্রাচীন সাহিত্য', রামায়ণ ১৩১০ পৌষ)।

শেষ জীবনেও এ ধারণার সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে নি। তখনও তিনি বলেছেন, যে-ইচ্ছা মানুষের শ্রেষ্ঠ ইচ্ছা সাহিত্যের যোগেই তা ব্যক্ত হয়ে উঠে মানুষের উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। সেই কারণেই—

> রামায়ণ মহাভারত ভারতবাসী হিন্দুকে বহুযুগ থেকে মানুষ করে এসেছে। একদা ভারতবর্ষ যে আদর্শ কামনা করেছে তা ঐ দুই কাব্যে চিরজীবী হয়ে গেল।
>
> —সাহিত্যের পথে, পঞ্চাশোর্ধ্বম্ ১৩৩৬ ফাল্গুন

সুতরাং অতীত কালে এই কাব্য ভারতবাসীকে যেমন মহান আদর্শে উদবুদ্ধ করেছিল এ যুগেও কবি তারই পুনরুজ্জীবন কামনা করেছেন এবং তাঁর সারা জীবনের রামায়ণ আলোচনার সার্থকতাও সেইখানে।

মহাভারত

ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভারতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ॥

—'মহাভারত', ১।৫৬।৩৩ (পুণা সং)

'হে ভারতশ্রেষ্ঠ! ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে এই গ্রন্থে যা আছে তা [হয়তো] অন্যত্রও আছে। যা এখানে নেই তা অন্য কোথাও নেই'।

প্রাচীন ভারতের অন্যতম মহাকাব্য মহাভারত সম্বন্ধে এ কথা অত্যুক্তি নয়। 'যা নাই ভারতে তাহা নাই ভাবতে' এই প্রবাদটির দ্বারাও এই অর্থই সূচিত হয়। রবীন্দ্রনাথও এই মহাগ্রন্থকে সর্বাংগীণ ভারতীয় সংস্কৃতির ভাণ্ডার, বিশ্বকোষ বা 'সজীব বিশ্ববিদ্যালয' বলে মনে করেছেন। তিনি এ সম্বন্ধে বলেছেন—

…মনে পড়ে ভারতবর্ষে বেদব্যাসের যুগ, মহাভারতের কাল। দেশে যে বিদ্যা, যে মননধারা, যে ইতিহাসকথা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল, এমন-কি দিগন্তের কাছে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেছে, এক সময়ে তাকে সংগ্রহ করা তাকে সংহত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে।… দেশ একান্ত ইচ্ছা করেছিল, আপন সূত্রচ্ছিন্ন বস্তুগুলিকে উদ্ধার করতে, সংগ্রহ করতে, তাকে সূত্রবদ্ধ করে সমগ্র করতে এবং তাকে সর্বলোকের ও সবকালের ব্যবহারে উৎসর্গ করতে।… এর মধ্যে একটি প্রবল চেষ্টা, অক্লান্ত সাধনা, একটি সমগ্রদৃষ্টি ছিল। এই উদ্যোগের মহিমাকে শক্তিমতী প্রতিভা আপন লক্ষীভূত করেছিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারত নামটিতেই। মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বল রূপ যাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন 'মহাভারত' নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমগুলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকে দেখেছিলেন তাঁরা মনে।

—'শিক্ষা', বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ১৯৩২ ডিসেম্বর

এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে, 'দেশ আপন বিরাট চিন্ময়ী প্রকৃতিকে' আপন 'চিৎপ্রকর্ষের যুগব্যাপী ঐশ্বর্যকে', নিঃশেষে প্রকাশ করেছে মহাভারতের মধ্যে। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে মহাভারতের গুরুত্ব তাই অপরিসীম। 'ভারতপথিক' রবীন্দ্রনাথ মহাভারতকে যে কী দৃষ্টিতে দেখেছিলেন বর্তমানে সেটিই আমাদের আলোচ্য।

২

ব্যাস-কৃত সমগ্র সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কতদূর ছিল তা নিঃসংশয়ে বলার উপায় নেই। তবে কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতো কাশীদাসী মহাভারতও যে তিনি অধিগত করেছিলেন তা জানা গেছে। তিনি স্বয়ং লিখেছেন—

> আমরা পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশিরামদাসের মহাভারত পড়িতে বসিতাম।

—'শিক্ষা', পরিশিষ্ট : শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি

বাল্যের এই মহাভারত পাঠ কবির মনে যে গভীর ভাবেই মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর বাল্যের রচনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'অভিলাষ'-এ (১৮৭৪) তিনি মহাভারতের প্রসঙ্গ স্মরণ করেন। পরবর্তী কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার'-এ (১৮৭৫) দেখি মহাভারতের গুরুত্ব বিশেষভাবেই স্বীকৃত হয়েছে। কবিতাটি শুরুই হয়েছে—

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন পরি,
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—

ইত্যাদি বলে। সেখানে আদর্শ স্বাধীন আর্য নৃপতিরূপে অভিনন্দিত হয়েছেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতাতেও (১৮৭৭) 'অর্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর' ও যুধিষ্ঠির রাজার 'ভারত শাসন'-এর সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায় মহাভারতীয় জীবনাদর্শ সেই বাল্যকালেই কবির মনকে অধিকার করেছিল। এই প্রভাব যে কবির জীবনে চিরস্থায়ী হয়েছিল তাঁর পরবর্তী কালের সাহিত্যে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। যথাস্থানে তার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া যাবে।

কাশীদাসী মহাভারত ছাড়া কবি কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারতের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। তবে পূর্বোক্ত কবিতাগুলি তিনি যেরূপ বালক বয়সে লেখেন তাতে মনে হয় সম্ভবতঃ তখনও তিনি কালীসিংহের মহাভারতের সঙ্গে পরিচিত হন নি। এগুলি তাঁর কাশীদাসী মহাভারত পাঠেরই ফল। তবে মহাভারত প্রসঙ্গে তিনি স্বয়ং যে গ্রন্থটির কথা একাধিক বার স্মরণ করেন সেটি কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারত। তাঁর 'সমাজ' গ্রন্থের অন্তর্গত হিন্দু-বিবাহ প্রবন্ধে (১২৯৪) বিবাহ ও নারী-মর্যাদার প্রসঙ্গে যে-মহাভারত থেকে দৃষ্টান্ত উৎকলিত হয়েছে তা ব্যাস-সংকলিত সংস্কৃত মহাভারত থেকে গৃহীত নয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'কালী সিংহ কর্তৃক অনুবাদিত মহাভারত আমার অবলম্বন'। এর কিছু কাল পূর্বেই 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থের অধিকার এবং অনধিকার প্রবন্ধ দুটিতে (১২৮৮) দেখি রবীন্দ্রনাথ 'কালী

সিংহের অনুবাদিত মহাভারত। আশ্বমেধিক পর্ব। অনুগীতা পর্বাধ্যায়। দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়'-এর অন্তর্গত ৪২ এবং ৪৩ পৃষ্ঠা থেকে দুটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেন। সেখানে তিনি উক্ত উদ্ধৃতি দুটির অন্তর্নিহিত ভাবের সুগভীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন। সুতরাং কালীসিংহের মহাভারতটি তিনি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করে তার মর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পরিণত বয়সেও এ গ্রন্থ যে তাঁর স্মৃতিতে উজ্জ্বল ছিল, তার প্রমাণ বাংলার সাধু ও চলতি ভাষার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন—

> উতঙ্কের গুরুদক্ষিণা আনবার সময় তক্ষক বিঘ্ন ঘটিয়েছিল, এইটে থেকেই সর্পবংশ-ধ্বংসের উৎপত্তি: এর ক্রিয়া কটাকে অল্প একটু মোচড় দিয়ে সাধু ভাষার ভঙ্গী দিলেই কালীসিংহের মহাভারতের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।
>
> — বাংলাভাষা-পরিচয়' ১৯৩৮, অধ্যায় ৯

এর থেকে কালীসিংহের ভাষাভঙ্গির প্রতিও তাঁর সচেতনতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে বলা আবশ্যক যে সাধারণভাবে দেশের বৃহত্তর জনসাধারণ কাশীদাসী মহাভারতে অভ্যস্ত থাকলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে শিক্ষিত সমাজে কালী-সিংহের মহাভারতই জনপ্রিয় হতে থাকে। কারণ 'মহাভারতের বিপুলতা, বৈচিত্র্য, গভীরতা, বিভিন্ন বিষয়ক জ্ঞান ও চিন্তা, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মাদর্শ' প্রভৃতির সর্বাংগীণ পরিচয় কাশীদাসী মহাভারত থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথও স্বাভাবিক কারণেই কালীসিংহের অনুবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

বৈয়াসকি মহাভারতেরও বেশ কিছু উদধৃতি রবীন্দ্রসাহিত্যে দেখা গেছে। তবে তার থেকে সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল কি না তা বোঝা যায় না। কারণ কবিব্যবহৃত সব শ্লোকই মহর্ষি-সম্পাদিত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত দেখা যায়। পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে তার পরিচয় আছে। বাল্যকাল থেকে এই গ্রন্থে অভ্যস্ত কবির পক্ষে উক্ত শ্লোকগুলি ব্যবহার করাই স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথ এক দিকে যেমন মহাভারতের শ্লোক উদ্‌ধৃত করেছেন, অন্য দিকে তেমনি তার কাহিনী অবলম্বন করে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মহাভারতের কাহিনীভাণ্ডার এত বিপুল যে ভাস (দূতবাক্য, ঊরুভঙ্গ, কর্ণভার, দূত-ঘটোৎকচ, মধ্যমব্যায়োগ, পঞ্চরাত্র) থেকে শুরু করে কালিদাস (কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা), ভারবি (কিরাতার্জুনীয়), ভট্টনারায়ণ (বেণীসংহার), ত্রিবিক্রমভট্ট (নলচম্পূ), রাজশেখর (বালভারত), ক্ষেমেন্দ্র (ভারতমঞ্জরী), মাঘ (শিশুপালবধ), শ্রীহর্ষ (নৈষধচরিত), অনন্তভট্ট (ভারতচম্পূ), মাধবভট্ট (সুভদ্রাহরণ) পর্যন্ত বহু খ্যাত ও অখ্যাতনামা কবি মহাভারত থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি

করেছিলেন। কথাসরিৎসাগর ও পঞ্চতন্ত্রেও মহাভারতের বিভিন্ন আখ্যায়িকা সংগৃহীত আছে।[১] আধুনিক যুগেও মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, শর্মিষ্ঠা নাটক এবং বীরাঙ্গনা কাব্যের একাধিক পত্রিকার কাহিনী মহাভারত থেকে নেওয়া। হেমচন্দ্র তাঁর বৃত্রসংহার এবং নবীনচন্দ্র তাঁর রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনেই লিখেছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রসাহিত্যেও মহাভারতের ছায়াপাত ঘটা বিচিত্র নয়।

প্রথমতঃ কবি মহাভারতের আদিপর্বের অর্জুনবনবাসপর্বাধ্যায়ের অন্তর্গত চিত্রাঙ্গদার কাহিনী অবলম্বন করে 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য (১২৯৯) রচনা করেন। আদিপর্বেরই সম্ভবপর্বাধ্যায়ের কচ ও দেবযানীর কাহিনী নিয়ে 'বিদায়-অভিশাপ' (১৩০১) রচিত হয়। 'নরকবাসে'র (১৩০৪) আখ্যান বনপর্বের তীর্থযাত্রাপর্বাধ্যায় থেকে গৃহীত। এ ছাড়া 'গান্ধারীর আবেদন' (১৩০৪) সভাপর্বের অনুদ্যূতপর্বাধ্যায় থেকে এবং 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' (১৩০৬) উদ্‌যোগ পর্বের ভগবদ্‌যানপর্বাধ্যায় থেকে নেওয়া এ কথা বলা চলে।

রবীন্দ্ররচিত এই নাট্যকাব্যগুলিতে মহাভারতের উপাখ্যান গৌণ হয়ে গেছে। তাতে মুখ্য হয়েছে মানবহৃদয়ের নানা বিরুদ্ধ ভাবসংঘাতের বিশ্লেষণ। আধুনিক জীবনবোধ ও মানসিকতার আবেদনে সেগুলি নূতন রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'র (১৩৪২) ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন—

> ...সত্যের প্রথম উপক্রম সাজসজ্জায়, বহিরঙ্গে,
> বর্ণবৈচিত্র্যে—
> তারই আকর্ষণ অসংস্কৃত চিত্তকে করে অভিভূত
> একদা উন্মুক্ত হয় সেই বহিরাচ্ছাদন,
> তখনই প্রবুদ্ধ মনের কাছে তার পূর্ণ বিকাশ।

এই তত্ত্বটি চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্মকথা।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে চিত্রাঙ্গদা কাহিনীকে অবলম্বন করে কবি একটি বিশেষ তত্ত্বকথা প্রকাশ করেছেন এবং সে তত্ত্ব বিশেষভাবে আধুনিক মনের সৃষ্ট। তেমনি মহাভারতের কচ দেবযানী-সংবাদে দেখি দেবযানীর অভিশাপে ক্রুদ্ধ হয়ে কচ তাকে প্রত্যভিশাপ দিয়েছিল। আর রবীন্দ্রনাথের কচ ক্ষমাসুন্দর হাস্যে আশীর্বাদ করেছে—

> আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে।
> ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।

'নরকবাসে' রবীন্দ্রনাথের ঋত্বিক ব্রাহ্মণ্য-অভিমানে ক্ষত্রিয়ের উপরে প্রভুত্ব করার

১ ডঃ যূথিকা ঘোষ-লিখিত মহাভারত ও রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ ('রবীন্দ্র শতায়ন': বেথুন বিদ্যায়তন স্মারক গ্রন্থ) থেকে তালিকাটি গৃহীত।

মোহে মানবধর্মকে অনায়াসে লঙ্ঘন করে যান আর ক্ষত্রিয় পিতা সোমক পুণ্যবান হয়েও 'নরধর্ম' 'রাজধর্ম' বিশেষতঃ 'পিতৃধর্ম' লঙ্ঘন করার অনুতাপে স্বেচ্ছায় নরক বরণ করেন। মূল কাহিনীতে ঋত্বিকের মানবধর্ম ও সোমকের পিতৃধর্ম -লঙ্ঘনজনিত পাপ ও তজ্জনিত অনুতাপের সূক্ষ্ম অথচ প্রবল দ্বিধার প্রশ্ন নেই। তেমনি রবীন্দ্রনাথের গান্ধারী ন্যায়ধর্ম, কল্যাণধর্মকে যেভাবে অপত্যস্নেহের বহু ঊর্ধ্বে ধ্রুব আদর্শরূপে ধরে রেখেছেন এবং কর্ণ তাঁর বীরধর্মকে ও কুন্তী তাঁর মাতৃহৃদয়ের অবরুদ্ধ স্নেহবেদনাকে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তাতে তাঁরা মহাভারতের কাল থেকে আধুনিক যুগের জীবনবোধের সমতলে নেমে এসেছেন।

প্রত্যক্ষভাবে মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে সাহিত্যরচনা কবির এই পর্যন্ত। এ ছাড়া তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বাংলায় মহাভারতের যে মূল আখ্যানভাগ সংকলন করেছিলেন তাকে কবি সংহত আকারে সম্পাদন করে 'কুরু পাণ্ডব' (১৩৩৮) নামে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের বিজ্ঞাপনে কবি লেখেন—

> যে রচনারীতি বিশেষভাবে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবান্বিত তাহাকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে বাংলাভাষায় ছাত্রদের অধিকার সম্পূর্ণ হইতে পারিবে না। এই কথা মনে রাখিয়া এই গ্রন্থখানির প্রবর্তন হইল।
>
> —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -কৃত রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয় ১৩৭৯ পৃ ৫

তবে শুধু ভাষার প্রয়োজনেই নয় কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের গল্পাংশ বালকমনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলে মনে করেও হয়তো তিনি এই গ্রন্থ সম্পাদনে উদযোগী হন। কেননা, বালিকা নন্দিনীকে লেখা এক পত্রে (১৩৩৮ আষাঢ় ২০) কবিকে বিশেষ সরস করে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের উদযোগপর্বের বর্ণনা করতে দেখা গেছে ('চিঠিপত্র' ৪, পত্র-৪)।

মহাভারতের কাহিনী বা তার শ্লোকের ব্যবহার রবীন্দ্রসাহিত্যে যথেষ্ট ব্যাপক না হলেও বহু বিচিত্র ক্ষেত্রে বিবিধ প্রসঙ্গে তার অনায়াস আত্মপ্রকাশ দেখা যায়। এ ছাড়া তিনি অনেক সময়ে সচেতনভাবে মহাভারতের অন্তর্নিহিত বিবিধ তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কারের প্রয়াস পেয়েছেন। এবার তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যাক। এ প্রসঙ্গে আসার আগে আর একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রসাহিত্যের বহু স্থলেই শকুন্তলার নানা উল্লেখ ও আলোচনা দেখা যায়। বলা বাহুল্য সে শকুন্তলা বিশেষভাবে কালিদাসের শকুন্তলা, মহাভারতের অন্তর্গত ব্যাসের শকুন্তলা নয়।

৩

মহাভারত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে লিখেছিলেন—

আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সংজ্ঞা অনুসারে মহাভারত ইতিহাস না হইতে পারে কিন্তু ইহা যথার্থই আর্যদের ইতিহাস। ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত।

—'ইতিহাস', ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ১৩১৯

মহাভারতেই রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির সমর্থন আছে, 'জয়নামেতিহাসোহয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা'। আদিতে মহাভারত ছিল 'জয়' নামের একটি ইতিহাস গ্রন্থ। আকারেও তা কয়েক হাজার শ্লোকের সংকলন ছিল মাত্র। পরে ক্রমশঃ দীর্ঘ দিন ধরে নানা উপাখ্যান ও তত্ত্বালোচনা যুক্ত হতে হতে বর্তমানে তার শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষের অধিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বৃহৎ গ্রন্থের উদ্‌ভবের কারণ নির্ণয় করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধপ্লাবনের ফলে আর্যসমাজের দ্বারে যখন বহু সংখ্যক দেশী ও বিদেশী অনার্য এসে উপনীত হল, তখন ধর্মে কর্মে আর্যসমাজের সর্বত্র এক উচ্ছৃঙ্খলতা ও অদ্ভুত অসংগতির সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময়ে আর্যপ্রকৃতি এই 'প্রলয় ঝড়ে আপনার ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলিকে' একত্র করে আপনাকে সুস্পষ্টরূপে অনুভব ও প্রকাশ করতে চাইলে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তখন—

সংগ্রহকর্তাদের কাজ দেশের প্রধান কাজ হইল। তখনকার যিনি ব্যাস, নূতন রচনা তাঁহার কাজ নহে পুরাতন সংগ্রহেই তিনি নিযুক্ত। এই ব্যাস একব্যক্তি না হইতে পারেন কিন্তু ইনি সমাজের একই শক্তি। কোথায় আর্যসমাজের স্থিরপ্রতিষ্ঠা ইনি তাহাই খুঁজিয়া একত্র করিতে লাগিলেন। সেই চেষ্টার বশে ব্যাস বেদ সংগ্রহ করিলেন। ব্যাসের আর এক কাজ হইল ইতিহাস সংগ্রহ করা। আর্যসমাজের যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি এক করিলেন। শুধু জনশ্রুতি নহে, আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনীতিকেও তিনি এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত।

— ইতিহাস', ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ১৩১৯

তাই মহাভারতে স্বভাবতঃই আর্যজাতির তৎকালীন ইতিহাসের প্রতিফলন পড়েছে, এবং রবীন্দ্রনাথ তার থেকে আর্যজাতির সংঘাত ও সমন্বয়মূলক একটি ইতিবৃত্তের সন্ধান পেয়েছেন। মহাভারতে তিনি একটি সামাজিক উপপ্লবের আভাস দেখেছিলেন। সেটি হল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং তারই ফলস্বরূপ বৈদিক ধর্মের সঙ্গে ভক্তিধর্মের বিরোধ। এই দ্বন্দ্বের মূলে ছিলেন ক্ষত্রিয় বীর কৃষ্ণ। তিনি বেদবিহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিপক্ষ এবং ক্ষত্রিয়-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের গুরু ছিলেন। বলা আবশ্যক তৎকালীন

বহু ক্ষত্রিয় রাজা কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পক্ষপাতীরূপে ক্ষত্রিয় বৈষ্ণবদের শত্রু ছিলেন। জরাসন্ধ তাঁদের অন্যতম। তিনি বহু ক্ষত্রিয় রাজাকে বন্দী ও পীড়ন করেন। পরিশেষে কৃষ্ণের সাহায্যে পাণ্ডবেরা তাঁকে বধ করেন। এই কাহিনীকে ব্যাখ্যা করে কবি বলেছেন—

> এই ব্রাহ্মণ-পক্ষপাতী ক্ষত্রবিদ্বেষী রাজাকে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দ্বারা যে বধ করিয়াছিলেন এটা একটা খাপছাড়া ঘটনামাত্র নহে। শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া তখন দুই দল হইয়াছিল। সেই দুই দলকে সমাজের মধ্যে এক করিবার চেষ্টায় যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন তখন শিশুপাল বিরুদ্ধদলের মুখপাত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করেন। এই যজ্ঞে সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, সমস্ত আচার্য ও রাজার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বপ্রধান বলিয়া অর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছিল। এই যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণের পদক্ষালনের জন্য নিযুক্ত ছিলেন পরবর্তীকালের সেই অত্যুক্তির প্রয়াসেই পূর্বকালীন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের ইতিহাস স্পষ্ট দেখা যায়।
>
> —'ইতিহাস', ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ১৩১৯

কিছু কাল পরে রবীন্দ্রনাথ বহু নূতন তথ্য ও মন্তব্য যোগ করে উক্ত প্রবন্ধের যে ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেন তাতে মহাভারতবর্ণিত বহু ঘটনা ও চরিত্রের অচিন্তিতপূর্ব ব্যাখ্যা ও ভারত-ইতিহাসের কিছু নূতন উপকরণ পাওয়া যায়। সেখানে তিনি বলেছেন—

> The Kurukshetra war, described in the Mahābhārata, was a war between two parties, one of which had rejected Krishna, the other consisting of his followers, guided by him in the war···The very fact that Krishna was the charioteer of Arjuna is proof enough that it was a war of rival creeds, and for that very reason the battleground of Kurukshetra has ever remained a sacred spot of pilgrimage.
>
> —'A Vision of India's History' 1962, p 17

এখানে তিনি বলেছেন, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ যদি শুধুমাত্র ভ্রাতৃদ্বন্দ্বই হত তাহলে সারা ভারতের রাজন্যবর্গ তাতে এমনভাবে যোগ দিতেন না। সেই জন্যই এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধে কৃষ্ণবিরোধী কুরুপক্ষের সেনাপতি হলেন ব্রাহ্মণ দ্রোণ এবং তাঁর সহযোগী হলেন ব্রাহ্মণ কৃপ ও অশ্বত্থামা। আবার ক্ষত্রিয় দ্রুপদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ দ্রোণের বিবাদ ছিল। দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন তাই কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডবের পক্ষে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

স্মরণ করেছেন যে দ্রোণ ছিলেন ক্ষত্রদ্বেষী ব্রাহ্মণ পরশুরামের শিষ্য, পাণ্ডববিরোধী কর্ণও ছিলেন তাই। পরবর্তী কালে 'জাভা-যাত্রীর পত্রে' (পত্র ৯, ১৯২৭ অগস্ট ১) রবি মহাভারতের এই অর্থই গভীরতর বিশ্লেষণের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করেন। সেখানে তিনি বলেন, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ মুখ্যত মতবাদ নিয়ে যুদ্ধ, তত্ত্ব নিয়ে যুদ্ধ, তা রাজ্য-লাভের যুদ্ধের চেয়ে অনেক গভীর।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছাড়া মহাভারতের কতকগুলি খণ্ড খণ্ড কাহিনী থেকেও রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক উপকরণের সন্ধান পেয়েছেন। রাজা জন্মেজয়ের সর্পসত্রের মধ্যে তিনি নাগবংশ-ধ্বংসের মতো গোষ্ঠীবৈরিতা দেখেছেন (ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা)। খাণ্ডববন-দাহনের মধ্যেও তিনি একটা ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব লক্ষ করেছিলেন। এক বনে যে 'প্রতিকূল মানবশক্তি' ছিল তাকে পাণ্ডবেরা ধ্বংস করে। এরা অনার্য এবং এদের মধ্যে ইন্দ্র পূজকেরাও ছিল, কেননা কাহিনীতে পাই 'ইন্দ্র বৃষ্টিবর্ষণে খাণ্ডবের আগুন নেবাবার চেষ্টা করেছিলেন' ('জাভা যাত্রীর পত্র', পত্র ৭)। কখনও কখনও অনেক অতীত কীর্তির কিছু নিদর্শন দেখে মহাভারতের যুগের কথা কবির মনে পড়ে যায় এবং সেই সূত্র থেকে তিনি ঐতিহাসিক তথ্য-অনুসন্ধানে সচেষ্ট হন। তাই পারস্যসম্রাট দারিয়ুসের প্রাসাদ দেখে কবি মন্তব্য করেন —

> দেখে মনে পড়ে মহাভারতের ময়দানবের কথা। বোঝা যায় বিশাল প্রাসাদ নির্মাণের বিদ্যা যাদের জানা ছিল তারা যুধিষ্ঠিরের স্বজাতি ছিল না। হয়তো বা এই দিক থেকেই রাজমিস্ত্রি গেছে। যে পুরোচন পাণ্ডবদের জন্যে সুড়ঙ্গ বানিয়েছিল সেও তো যবন।
>
> —'পারস্যযাত্রী', অধ্যায় ৫ ১৯৩২ এপ্রিল

এর থেকে বোঝা যায় মহাভারতের কাহিনী তাঁর চিত্তের কতখানি অধিকার করে ছিল এবং তিনি কিভাবে তাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য ইতিহাসের পরিধিতে টেনে আনার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

৪

মহাভারতকে রবীন্দ্রনাথ এক দিকে যেমন ইতিবৃত্তের সংকলন বলে মনে করেছেন, অন্য দিকে তেমনি তাকে রূপকমূলক বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর মতে মহাভারতে বর্ণিত রূপকগুলির অন্তরালে নানা নিগূঢ় তত্ত্ব সংগুপ্ত আছে। যেমন অর্জুনের লক্ষ্যবেধ ও কৃষ্ণার বিবাহ। মূল মহাভারতে লক্ষ্যবেধের বর্ণনায় দেখি, শূন্যে একটি ঘূর্ণ্যমান চক্রের মধ্যে লক্ষ্যটি স্থির হয়ে আছে এবং নীচে রক্ষিত একটি জলপাত্রে তার প্রতিবিম্ব

পড়েছে। কৃষ্ণার পাণিপ্রার্থী বীরকে ওই প্রতিবিম্ব দেখে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে হবে। এই কাহিনীটির ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—

> This trial is obviously of a spiritual nature. The fixed centre of Truth in the heart of the revolving wheel of the World (*Samsara*) is reflected in the depth of our own being, which can be reached by the one-pointed concentration of Yoga. Is not this the doctrine of the Gitā in the language of a picture?
>
> — A Vision of India's History 1962, p 26

বোধ করি কবি এখানে ভগবদ্গীতার 'ধ্যানযোগ' অধ্যায়ের নিম্নলিখিত শ্লোক দুটির কথা স্মরণ করে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন।—

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্। ৬।১২ ১৩

রবীন্দ্রোক্ত 'one-pointed concentration' এবং 'তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা' কথা দুটির ভাবগত সাদৃশ্য আকস্মিক নয় বলেই মনে হয়। যাই হক, লক্ষ্যবেধ কাহিনীর উক্ত রূপকার্থের প্রমাণ হিসাবে কবি উপনিষদের নিম্নোক্ত শ্লোকাংশটিও এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন—

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। ২।২।৪

এর থেকে বোঝা যায়, উপনিষদের ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় এই জাতীয় রূপকের ব্যবহার প্রাচীন কালে বিশেষ প্রচলিত ছিল। কবি রবীন্দ্রনাথের কাছেও এই বিশেষ রূপকটি বড়ই প্রিয় ছিল। লক্ষ্য অব্যর্থ সাধনের একাগ্র নিষ্ঠার ব্যাখ্যা দিতে তিনি এই রূপকের সাহায্যেই বলেছেন—

> একটি চাকা কেবলই ঘুরছে, তারই মাঝখানে একটি বিন্দু স্থির হয়ে আছে। সেই বিন্দুটিকে অর্জুন বিদ্ধ করে দ্রৌপদীকে পেয়েছিলেন। তিনি চাকার দিকে মন দেন নি, বিন্দুর দিকেই সমস্ত মন সংহত করেছিলেন। সংসারের চাকা কেবলই ঘুরছে, লক্ষ্যটি তার মাঝখানে ধ্রুব হয়ে আছে। সেই ধ্রুবের দিকেই মন দিয়ে লক্ষ্য স্থির করতে হবে, চলার দিকে নয়।
>
> —'শান্তিনিকেতন' ১, বিশ্বাস ১৩১৫ ফাল্গুন ৬

এর থেকে বোঝা যায়, লক্ষ্যবেধের এই ঘটনাকে কবি পুরোপুরি আধ্যাত্মিক সাধনার

রূপক বলে মনে করতেন। কিন্তু এইটুকুই সব নয়। কবির মতে পঞ্চপাণ্ডব যে সম্মিলিতভাবে কৃষ্ণাকে বিবাহ করেছে তার অর্থ এই নয় যে পার্বত্য উপজাতির মধ্যে এই ধরণের বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং পাণ্ডবেরা সেই জাতীয়। এর প্রকৃত অর্থ হল—

> As a matter of fact, it was a sacred rite of ideal polyandry which came to be shared by all the brothers. Krishnā is the impersonation of the truth taught by Krishna himself, which had some association with the Sun-worship which was the original meaning of Vishnu-worship. It is related in the epic that in the vessel carried by Krishnā food would become inexhaustible when she invoked the sun to help her. This must refer to the unlimited spiritual food ready for all guests who chose to come and enjoy it.
>
> —'A Vision of India's History' 1962, p 27

এই প্রবন্ধ রচনার অল্প দিন পরে লিখিত 'জাভা-যাত্রীর পত্রে'ও দেখি (পত্র ৭, ১৯২৭ আগস্ট ১) কবি মহাভারতের এই লক্ষ্যবেধের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং বলেছেন—

> …শূন্যস্থিত লক্ষ্যবেধের মধ্যে এমন একটি সাধনার সংকেত আছে যে, একাগ্র সাধনার দ্বারা কৃষ্ণাকে পাওয়া যায়, আর এই যজ্ঞসম্ভবা কৃষ্ণা এমন একটি তত্ত্ব যাকে নিয়ে একদিন ভারতবর্ষে বিষম দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছিল।

ওই পত্রে কবি আরও বলেছেন, বনবাসের বারো বৎসর পাণ্ডবেরা যে বনে বাস করেছিলেন, সে হচ্ছে ব্রাহ্মণ ঋষিদের বন। সেখানে কৃষ্ণভক্ত ক্ষত্রিয় পাণ্ডবেরা কৃষ্ণের ধর্মমতরূপী কৃষ্ণাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, এবং কৃষ্ণা সেখানকার ব্রাহ্মণ অতিথিদের জন্য তাঁর অক্ষয় অন্নপাত্র থেকে চিত্তক্ষুধা দূর করার জন্য ভাবের অন্ন পরিবেশন করেছিলেন। এইভাবেই ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত অঞ্চলে সেদিন ক্ষত্রিয় কৃষ্ণ-প্রবর্তিত ধর্ম জয়ী হয়েছিল। মহাভারতের এই কাহিনীর রূপকটি কবির চিত্তকে যে গভীরভাবেই অধিকার করেছিল, দীর্ঘ দিন পরে 'পারস্যযাত্রী' গ্রন্থ থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে তিনি লেখেন—

> মহাভারতেও বস্তুত সমাজনীতির দ্বন্দ্ব, এক পক্ষ কৃষ্ণকে স্বীকার করেছে, কৃষ্ণাকে পণ রেখে তাদের পাশা খেলা, অন্য পক্ষ কৃষ্ণকে অস্বীকার ও কৃষ্ণাকে করেছে অপমান।
>
> —'পারস্যযাত্রী', অধ্যায় ৯, ১৯৩২ মে ৭

রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা ঐতিহাসিকের সমর্থন কতদূর পাবে তা বলা কঠিন। তবে প্রতিভাধর মনীষীর এই ভাষ্যকল্পনাকে পুরোপুরি অস্বীকারও করা যায় না। প্রকৃত-পক্ষে এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে যে মন্তব্য করেছেন, সেইটিই তাঁর চরম কথা। তিনি বলেছেন—

মহাভারতের অনেক-কিছুই আমার কাছে সত্য ; তার সত্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক, এমন-কি প্রাকৃতিক কোনো প্রমাণ না থাকতে পারে, এবং কোনো প্রমাণ আমি তলব করতেই চাই নে, তাকে সত্য বলে অনুভব করেছি এই যথেষ্ট।

—'বাংলাভাষা-পরিচয়' ১৯৩৮, অধ্যায় ৫

মহাভারত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে স্বভাবতঃই পূর্বের রামায়ণ অধ্যায়ে উদ্ধৃত কবির ভাষা ও ছন্দ কবিতাটি মনে পড়ে। সেখানে নারদ বাল্মীকিকে বলেছিলেন—

… … … …"সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

বলা বাহুল্য, রামায়ণের প্রকৃত কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথও ভাবের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন এবং তার সত্যতাকে আপন অনুভূতি দিয়ে যাচাই করে নিয়েছিলেন। তাঁর এই দৃষ্টি-ভঙ্গিতেই মহাভারত ও রামায়ণ এক সূত্রে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারতের পারস্পরিক সম্বন্ধটি বিচার করে দেখা প্রয়োজন। কেননা ভারতবর্ষে যুগল মহাকাব্যরূপে এ দুটি সর্বদাই একত্রে উল্লিখিত হয় এবং রবীন্দ্রনাথও অধিকাংশ সময়েই এই গ্রন্থ দুটিকে এক পর্যায়ভুক্ত রূপে স্মরণ করেছেন। প্রথম জীবনে এই কাব্য দুটির সম্বন্ধে কবি বলেছিলেন—

…রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে ;…রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস।…ইহার সরল অনুষ্টুপ্ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে।

—'প্রাচীন সাহিত্য', রামায়ণ ১৩১০ পৌষ

কবির মতে এই কাব্য দুটি ভারতের রূপকমূলক ইতিবৃত্তের সংকলন। উভয়ের মধ্যেই তিনি ভারত-ইতিহাসের একই সামাজিক সংঘর্ষের ইতিহাস সংগুপ্ত দেখেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য হল,—

দুই মহাকাব্যেরই মূল বিষয় ছিল সেই প্রাচীন সমাজবিপ্লব। অর্থাৎ সমাজের

ভিতরকার পুরাতন ও নূতনের বিরোধ।

—'ইতিহাস', ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ১৩১৯

এই বলে তিনি দেখিয়েছেন যে রামচন্দ্র তাঁর সনাতন কুলগুরু বশিষ্ঠকে ছেড়ে বিশ্বামিত্র-প্রদর্শিত নূতন পথে চলেছিলেন, পাণ্ডবেরাও বৈদিক ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে ছেড়ে ক্ষত্রিয় কৃষ্ণের প্রবর্তনায় নূতন আদর্শকে বরণ করে নিয়েছিলেন। এর পরে 'জাভা-যাত্রীর পত্রে' দেখি তিনি মহাকাব্য দুটির মূলে দুটি বিবাহ দেখেছেন। দুই বিবাহই আর্যরীতি অনুসারে অসংগত, কারণ জাভায় প্রচলিত রামায়ণে রামসীতা ভাইবোন; আর পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীর কথা তো বলাই বাহুল্য। দুই বিবাহের পূর্বেই অস্ত্রপরীক্ষা, দুই নায়িকাই মানবী নন—সীতা হলকর্ষণজাতা এবং দ্রৌপদী যজ্ঞসম্ভবা। আবার দুই গ্রন্থের নায়কেরই রাজ্যচ্যুতি ও স্ত্রীসহ বনগমন। অবশেষে দুই কাহিনীতেই শত্রুর হাতে স্ত্রীর অবমাননা ও তার প্রতিশোধ। এই বলে তিনি মন্তব্য করেছেন—

সেইজন্যে আমি পূর্বেই অন্যত্র এই মত প্রকাশ করেছি যে, দুটি বিবাহই রূপকমূলক।

—'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ৭, ১৯২৭ আগস্ট ১

শেষজীবনেও দেখি রামায়ণ-মহাভারত দুটি গ্রন্থেই কবি সমাজরক্ষা ও সমাজনীতির দ্বন্দ্ব লক্ষ করেছেন ('পারস্যযাত্রা', অধ্যায় ৯, ১৯৩২)। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ আজীবন প্রায় সর্বদাই এই দুই গ্রন্থকে একত্রে স্মরণ করেছেন।

তবু এই দুই গ্রন্থকে ঠিক একপর্যায়ভুক্ত বলা চলে না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মহাভারতে ভারতবর্ষ সমগ্রভাবেই ধরা দিয়েছে—'যা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে', সেইজন্য রামায়ণ কাহিনীও মহাভারতে স্থান পেয়েছে। কিন্তু রামায়ণের গুরুত্ব ও গৌরব তাতে ক্ষুণ্ন হয় নি। ভারতবর্ষ তাকে স্বতন্ত্র কাব্য বলেই স্বীকার করেছে এবং তাকে আদি কাব্য বলে মর্যাদা দিয়েছে। কেননা রামায়ণেই প্রথম কাব্যের মুখ্য লক্ষণ সর্গবিভাগ দেখা গেছে। রামায়ণের পূর্ববর্তী কোনো সাহিত্যে এই সর্গবিভাগ দেখা যায় না। মহাভারতের পর্বগুলির নাম অধ্যায়। সুতরাং মহাভারত কাব্য নয়। আবার রামায়ণ মুখ্যতঃ কবিকল্পনার সৃষ্টি। রামকাহিনীর যে জনশ্রুতি দেশে প্রচলিত ছিল, সেই আকারেই তা রামায়ণে ধরা দেয় নি। উত্তরকাণ্ড ছাড়া সমগ্র রামায়ণই একজন কবি একটি বিশেষ অভিপ্রায়ের দিকে লক্ষ রেখে গেঁথে তুলেছেন। কিন্তু মহাভারতে তা হয় নি। পূর্বেই দেখানো হয়েছে—

মহাভারত সংগ্রহের দিনে আর্যজাতির ইতিহাস আর্যজাতির স্মৃতিপটে যেরূপ রেখায় আঁকা ছিল, তাহার মধ্যে কিছু বা স্পষ্ট কিছু বা লুপ্ত, কিছু বা সুসংগত

কিছু বা পরস্পরবিরুদ্ধ, মহাভারতে সেই সমস্তেরই প্রতিলিপি একত্র করিয়া রক্ষিত হইয়াছে।

—'ইতিহাস', ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ১৩১৯

পণ্ডিতদের মতে মহাভারতের রচনাকাল সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি সময় থেকে খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত। সুতরাং মহাভারত কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ অভিপ্রায়ের সৃষ্টি নয়, তা তৎকালীন আর্যসমাজের যথাযথ ইতিবৃত্ত।

অতএব, রামায়ণ ও মহাভারতে ভারতবর্ষ নিজেকে নিঃশেষে প্রকাশ করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু দুটিতে দুইভাবে করেছে। মহাভারতে তার কর্মের ইতিহাস আর রামায়ণে তার মর্মের ইতিহাস বিধৃত। রামায়ণ প্রকাশ করেছে তার সাধনা তার আরাধনা তার সংকল্প। তাই 'রামায়ণে ভারতবর্ষ যাহা চায়, তাহা পাইয়াছে'। আর ভারতবর্ষ স্বভাবতঃ যা তারই নিরাসক্ত নির্লিপ্ত প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পেয়েছে মহাভারতে।

৫

মহাভারত থেকে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করলেও কবি তাকে নিছক ইতিহাসরূপে গণ্য করেন নি। তার সাহিত্যগুণকে তিনি আজীবন যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। তাই ১৩০১ সালে তিনি লেখেন—

আমরা মহাভারতকে ঐতিহাসিক কাব্য বলিয়া গণ্য করি।

—'আধুনিক সাহিত্য', কৃষ্ণচরিত্র

আর ১৩৪০ সালে তিনি মন্তব্য করেন—

মহাভারতে নানা কালে নানা লোকের হাত পড়েছে সন্দেহ নেই। সাহিত্যের দিক থেকে তার উপরে অবান্তর আঘাতের অন্ত ছিল না, অসাধারণ মজবুত গড়ন বলেই টিকে আছে।

—'সাহিত্যের স্বরূপ', সাহিত্যের মাত্রা

সুতরাং জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কবি মহাভারতকে সার্থক সাহিত্যরূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সেইজন্য সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে কবি উদাহরণ-স্বরূপ মহাভারতের প্রসঙ্গ বারে বারেই স্মরণ করেন। প্রথম বয়সে সাহিত্যে শ্লীলতার প্রসঙ্গে কবি মহাভারতের উল্লেখ করে বলেছিলেন—'সুবৃহৎ অনাবরণের মধ্যে অশ্লীলতা নেই' ('সাহিত্য', মানবপ্রকাশ ১২৯৯)। আর শেষ বয়সে কবিকে তাঁর সৃষ্ট একটি বিশেষ চরিত্রের কার্যকলাপের জন্য দায়ী করা হলে তিনি তার প্রতিবাদে মহাভারতের

উল্লেখ করে বলেন, দ্রৌপদীর প্রতি দুঃশাসন বা কীচকের অন্যায় আচরণের জন্য ব্যাসদেব দায়ী নন ('চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৪৩, হেমন্তবালা দেবীকে লেখা, ১৯৩৪ জুলাই ৫)।

এইভাবে সাহিত্য সম্বন্ধীয় আলোচনায় মহাভারতকে কবি নানা উপলক্ষে বারে-বারেই স্মরণ করেন। তবে মহাভারতের চরিত্রসৃষ্টিই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল সমধিক। প্রথম জীবনে তিনি লিখেছিলেন—

> মহাভারতকার এমন একটি মানুষের সৃষ্টি করেন নাই যিনি মনুষ্য-আকারধারী তত্ত্ব-কথা বা নীতিসূত্র মাত্র। মহাভারতকার কবি যে একটি বীরসমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একটি সুমহৎ সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু ক্ষুদ্র সুসংগতি নাই।· মহাভারতের দ্রৌপদী তাঁহার সমস্ত অপূর্ণতা অসংকোচে বক্ষে বহন করিয়া ··ক্ষুদ্র নীতিস্তূপগুলির বহু ঊর্ধ্বে উদার আদিম অপর্যাপ্ত প্রবল মাহাত্ম্যে নিত্যকাল বিরাজ করিতে থাকিবেন।
>
> — আধুনিক সাহিত্য', কৃষ্ণচরিত্র ১৩০১ মাঘ ফাল্গুন

পরবর্তী কালে অবশ্য তাঁর এই জাতীয় উচ্ছ্বাস অত্যুক্তি আর দেখা যায় নি। এখন তিনি উক্ত গ্রন্থ থেকে সার্থক অসার্থক দুই ধরণের চরিত্রই নির্বাচন করে তার বিশ্লেষণ করেছেন। সেই বিচারের সূত্রে তিনি অসংকোচে বলেন, প্রকাশের দিক্ থেকে স্বচ্ছ, রূপের স্পষ্টতায় সুপ্রত্যক্ষ চরিত্রই সাহিত্যের দরবারে স্থান পাবার যোগ্য। তাই 'চরিত্র-নীতি-বিলাসী ঐতিহাসিক' যুধিষ্ঠিরকে বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত করে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেও তিনি পুঁথির পাতা থেকে সজীব হয়ে উঠতে পারেন নি।—

> আর চরিত্রবিলাসী কবি তাঁর ভীমসেনকে নানা অবিবেচনা ও অসংযমের অপরাধে লাঞ্ছিত করেও আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। যারা সত্য কথা বলতে ভয় করে না তার স্বীকার করবেই যে, সর্বগুণের যুধিষ্ঠিরকে ফেলে দোষগুণে জড়িত ভীমসেনকেই তারা ভালোবাসে। তার একমাত্র কারণ ভীমসেন সুস্পষ্ট।
>
> —'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১৫

তাঁর পরিণত বয়সের সাহিত্য-আলোচনাতেও কবিকে এই কথা স্মরণ করতে দেখা গেছে।—'সর্বগুণাধার যুধিষ্ঠিরের চেয়ে হঠকারী ভীম বাস্তব' ('সাহিত্যের স্বরূপ', সাহিত্যের স্বরূপ ১৩৪৪ বৈশাখ), তাই সৃষ্টি হিসাবে ভীমই বেশি সার্থক। আবার কর্ণকে মহাভারতকার যে সবলতা দুর্বলতা -মিশ্রিত একটি জীবন্ত চরিত্ররূপে সৃষ্টি করে তাকে চিরকালের জন্য সাহিত্যের অমরাবতীতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, তার প্রতিও কবির অকুণ্ঠ অভিনন্দন শোনা যায়। ১৩০১ সালে লেখা কৃষ্ণচরিত্র প্রবন্ধে ('আধুনিক

সাহিত্য') কবি প্রথম কর্ণকে সার্থকতার স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। পরে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে ('ছন্দ', গদ্য কবিতার রূপ ও বিকাশ ৫, ১৩৩৯ দেওয়ালি) কবি লেখেন—'কর্ণের চারিত্রশক্তি যুধিষ্ঠিরের চেয়ে অনেক বড়ো'। 'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থেও (সাহিত্যে চিত্রবিভাগ ১৩৪৮) তাঁকে এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে দেখি। শেষোক্ত প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে তিনি ধর্মোপদেশের প্রতীক ভীষ্ম তথা বিদুরকে অসার্থক এবং ধৃতরাষ্ট্রকে সার্থক চরিত্ররূপে প্রতিপন্ন করেছেন। পূর্বে 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের সাহিত্যতত্ত্ব প্রবন্ধে (১৩৪০ ভাদ্র) কবি এই মত প্রকাশ করেছিলেন। আর শেষ বয়সে কবি তাঁর অনন্যকরণীয় ভাষায় ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রের যে মর্মস্পর্শী বিশ্লেষণ করেছেন, তা হল—

> …ধৃতরাষ্ট্র ধর্মবুদ্ধির বেদনায় প্রতি মুহূর্তে পীড়িত অথচ স্নেহে দুর্বল হয়ে এমন অন্ধভাবে সেই বুদ্ধিকে ভাসিয়ে দিয়েছেন যে যদিচ জেনেছেন অধর্মের এই পরিণাম তাঁর স্নেহাস্পদের পক্ষে দারুণ শোচনীয়, তবু কিছুতে আপনার দোলায়িত চিত্তকে দৃঢ়ভাবে সংযত করতে পারেন নি। এই হল স্বয়ং জীবনের কল্পিত ছবি। …এই ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য হারালেন, প্রাণাধিক সন্তানদের হারালেন, কিন্তু সাহিত্যের সিংহাসনে এই দিকভ্রান্ত অন্ধ চিরকালের জন্যে স্থির রইলেন।
>
> —'সাহিত্যের স্বরূপ', সাহিত্যে চিত্রবিভাগ ১৩৪৮ বৈশাখ

সহৃদয় কবির সহানুভূতিসিঞ্চিত এই বিশ্লেষণে ধৃতরাষ্ট্র সত্যই রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকের কাছে অমরত্বের অধিকারী হয়েছেন।

কবি মহাভারতের সার্থক চরিত্রগুলি যেমন বিশ্লেষণ করেছেন তেমনি তার অসার্থক চরিত্রগুলির ব্যর্থতার কারণটিও ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই তাঁর মতে—'ভীষ্মের চরিত্র ধর্মনীতিপ্রবণ—যথাস্থানে আভাসে ইঙ্গিতে, যথাপরিমাণ আলোচনায়, বিরুদ্ধ চরিত্র ও অবস্থার সঙ্গে দ্বন্দ্বে' এই পরিচয়টি প্রকাশ পেলে তার দ্বারাই ভীষ্ম চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে—

> …কোনো-এক কালে আমাদের দেশে চরিত্রনীতি সম্বন্ধে আগ্রহ বিশেষ কারণে অতিপ্রবল ছিল। এইজন্যে…কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ইতিহাসকে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম দীর্ঘ এক পর্ব জুড়ে নীতিকথায় প্লাবিত করে দিলেন। তাতে ভীষ্মের চরিত্র গেল তলিয়ে প্রভূত সদুপদেশের তলায়।
>
> —'সাহিত্যের স্বরূপ', সাহিত্যের মাত্রা ১৩৪০ শ্রাবণ

সুতরাং বোঝা যায় মহাভারতীয় চরিত্রসৃষ্টি সম্বন্ধে কবির প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকলেও এ বিষয়ে নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধির অভাব তাঁর কখনও ঘটে নি।

রবীন্দ্রনাথ মহাভারতকে বিচার-বিশ্লেষণ করে এক দিকে যেমন তার সাহিত্য-মূল্য নির্ধারণ করেছেন, অন্য দিকে তেমনি তার কাহিনীকে আপন সাহিত্যরচনার কাজে ব্যবহার করেছেন। তাই কবি তাঁর বক্তব্যকে সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে তথা সৌন্দর্য সঞ্চার করবার জন্য, কখনও বা মহাভারতীয় রসে ভাবিতমনা বাঙালি পাঠকের মনে সহজে মুদ্রিত করে দেবার জন্য, কখনও বা আবার স্নিগ্ধ কৌতুকরস উদ্রিক্ত করার উপলক্ষে মহাভারতীয় প্রসঙ্গকে উপমা হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এই জাতীয় উপমা-প্রয়োগের গুণে সাধারণ বর্ণনাও যে কত সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে নিচের উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যাবে। স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকের বর্ণনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> তাঁহার দেহের আয়তন বিপুল, তাঁহার মুখশ্রী সুন্দর, কেবল তাঁহার পীড়িত পায়ের দিকে তাকাইয়া মনে হইল, অর্জুন যখন দ্রোণাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন প্রণামনিবেদনের স্বরূপ প্রথম তীর তাঁহার পায়ের তলায় ফেলিয়াছিলেন, তেমনি বার্ধক্য তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভের প্রথম তীরটা ইঁহার পায়ের কাছে নিক্ষেপ করিয়াছে।

— পথের সঞ্চয় স্টপফোর্ড ব্রুক ১৩১৯ কার্তিক

এই একটি মাত্র উপমার যোগে, বৃদ্ধ স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকের মহিমময় আকৃতি ও প্রকৃতি তথা তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিনম্র শ্রদ্ধাটি আশ্চর্য সুন্দররূপে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রথম জীবনে কবি মহাভারতীয় প্রসঙ্গের সহায়তায় ব্যঙ্গরসের অবতারণা করেছিলেন। তথাকথিত দেশোদ্ধারকারী, যারা মঢ় আলস্যে নিষ্ক্রিয় থেকে শুধু অতীতের গৌরবকাহিনী রোমন্থন করে স্ফীত হয়ে ওঠে তাদের প্রতি কটাক্ষ করে লিখেছিলেন—

বক্তৃতাটা লেগেছে বেশ,
রয়েছে বেশ কানে—
কী যেন করা উচিত ছিল
কী করি কে তা জানে।
অন্ধকারে ওই রে শোন
ভারতমাতা করেন 'গ্রোন্',
এ হেন কালে ভীষ্ম দ্রোণ
গেলেন কোন্‌খানে।

—'মানসী', দেশের উন্নতি ১৮৮৮ জ্যৈষ্ঠ

আবার অভিমন্যুর ব্যূহভেদের করুণ কাহিনীটিও দেখি কবির প্রয়োগকৌশলে স্নিগ্ধ কৌতুকরস বিতরণ করেছে। ইন্দিরা দেবীকে এক পত্রে কবি লেখেন—'ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা

অনেকটা অভিমন্যুরই মত, ও প্রবেশ করতেই জানে প্রস্থান করতে নয় ('চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৩, ১৩২৫ বৈশাখ ২)। এইভাবেই শব্দতত্ত্বের মতো নীরস বিষয়ও কবির হাতে উপমাঋদ্ধ হয়ে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষার বিরামচিহ্ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

আমি যে নির্বিচারে চিহ্নস্থয়যজ্ঞে জনমেজয়গিরি করতে বসেছি তা মনে করো না।

—'শব্দতত্ত্ব', চিহ্নবিভ্রাট ১৩৩৯ মাঘ

এ ছাড়া পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস পর্ব, সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যু প্রভৃতি প্রসঙ্গ কবির বিশেষ প্রিয় এবং নানা উপলক্ষে কবি নানাভাবে সেগুলি স্মরণ করেছেন।

সংস্কৃত মহাভারতের একাধিক শ্লোকও কবি প্রয়োজনমতো তার সাহিত্যে প্রয়োগ করেছেন। তার মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত হল শান্তিপর্বের অন্তর্গত—

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা ॥২৫।২৬

পাঁচটি ব্যক্তিগত পত্রে কবি এটি ব্যবহার করেন। প্রথমে ১৮৯৫ সালের ২৮ জুন তারিখে ইন্দিরা দেবীকে লেখা পত্রে ('ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-২১৫)। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লেখা পত্রেও ('চিঠিপত্র' ১, পত্র ১৬, ১৮৯৮ জুন) তার উল্লেখ দেখি। এর পরে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে তিনি এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করে বলেন—

এই মন্ত্রটি আমি সর্বদাই মনে রাখিতে চেষ্টা করি—কোনও ফল পাই নাই তাহা বলিতে পারি না।

—'চিঠিপত্র' ৮, পত্র-১১৫, ১৯০০ আগস্ট

এই শ্লোকটি 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে সংকলিত আছে। সুতরাং শ্লোকটির সঙ্গে কবির আবাল্য পরিচয় বলে মনে হয়। শ্লোকটি তাই তাঁর হৃদয়ে এত গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি মনেপ্রাণে তার নির্দেশ মেনে চলার চেষ্টা করেন। কাদম্বিনী দেবীকে এক পত্রে ('চিঠিপত্র ৭', পত্র-৩, ১৯০৬ মে ৯) কবি ওই শ্লোকের উপদেশ স্মরণ করতে বলেন। আর কন্যা মীরা দেবীকে উক্ত শ্লোকের অনুশাসন অনুসরণ করে চলার উপদেশ দেন ('চিঠিপত্র' ৪, পত্র-৩৪, ১৯২০ জুন)।

এই শ্লোক ছাড়া মহাভারতের আরও দশটি শ্লোক কবি তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন। পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে তার পরিচয় আছে।

৬

সাহিত্য হিসাবে মহাভারতের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও এই গ্রন্থের সমাজনীতির

আদর্শকে কবি সর্বত্র সমর্থন করেন নি। প্রয়োজনমতো তার সমালোচনা করেছেন। অবশ্য তাঁর পূর্বেই কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে (১৮৮৬) বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতকে মুক্ত বুদ্ধি ও ঐতিহাসিক যুক্তি দিয়ে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। কারণ তাঁর মতে 'যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র' ('আধুনিক সাহিত্য', কৃষ্ণচরিত্র ১৩০১)। তাঁর মতামত কতদূর গ্রহণযোগ্য সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। তবে বিচারপদ্ধতির বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্য উত্তরসূরী। তাই মহাভারতীয় যুগে নারীমর্যাদার সমালোচনা করে কবি নির্দ্বিধায় লেখেন—

> অনুশাসনপর্বে অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়ে স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরে যে-কথোপকথন হইয়াছে, বর্তমান সমাজে তাহার সমগ্র ব্যক্ত করিবার যোগ্য নহে।
>
> —'সমাজ', হিন্দুবিবাহ ১২৯৪

এই বলে তিনি আদর্শচরিত্র ভীষ্ম তথা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এ বিষয়ে প্রকাশিত অনতিরূঢ় কিছু কিছু মত ও মন্তব্য অনুবাদ করে দেন। কথা উঠতে পারে, এই অংশগুলি পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ। তাই রবীন্দ্রনাথ মূল কাহিনী থেকেই দেখিয়েছেন—

> ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্মপত্নী দ্রৌপদীকে দ্যূত ক্রীড়ায় পণ স্বরূপে দান করিয়াছেন। · · দ্রৌপদী যদি সত্যই যুধিষ্ঠিরের মান্যা হইতেন, দেবতা হইতেন, তবে যুধিষ্ঠির কখনই তাঁহাকে দ্যূতের পণ্যস্বরূপ দান করিতে পারিতেন না। প্রকাশ্য সভায় যখন দ্রৌপদী যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়াছিলেন তখন ভীষ্ম-দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র-প্রমুখ সভাস্থগণ কে স্ত্রীসম্মান রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ওই দ্রৌপদীই যখন প্রকাশ্যভাবে বিরাটসভায় কীচকের পদাঘাত সহ্য করেন তখন সমস্ত সভাস্থলে কেহই স্ত্রীসম্মান রক্ষা করে নাই।
>
> —পূর্ববৎ

উক্ত প্রবন্ধেই দেখি কবি মহাভারতবর্ণিত বহুবিবাহকে সমর্থন করেন নি। আবার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী রবীন্দ্রনাথ সে যুগের ভাবাদর্শকেও সর্বত্র সমর্থন করতে পারেন না। তাই স্থলবিশেষে কঠোরভাবে তার সমালোচনা করে লেখেন—

> একলব্য পরমনিষ্ঠুর দ্রোণাচার্যকে তার বুড়া আঙুল কাটিয়া দিল, কিন্তু এই অন্ধ নিষ্ঠার দ্বারা সে নিজের চিরজীবনের তপস্যাফল হইতে তার সমস্ত আপন-জনকে বঞ্চিত করিয়াছে। এই-যে মূঢ় নিষ্ঠার নিরতিশয় নিষ্ফলতা বিধাতা ইহাকে সমাদর করেন না, কেননা ইহা তাঁর দানের অবমাননা।
>
> —'কালান্তর', কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ১৩২৪ ভাদ্র

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সে কালের এই আদর্শের সঙ্গে এ কালের চিন্তাধারার মিল হয় নি।

তবু সমগ্রভাবে মহাভারতীয় জীবনাদর্শ রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সমর্থন লাভ করেছিল। সারা জীবনের সাহিত্যে কবি তার অভ্রান্ত প্রমাণ রেখে গেছেন।

মহাভারতবর্ণিত জীবনকে কবি যে কতদূর মহান্ বলে মনে করতেন তাঁর প্রথম জীবনের 'চিঠিপত্র' গ্রন্থে (১২৯২) তার প্রথম নিদর্শন পাই। সেখানে প্রাচীনপন্থী ষষ্ঠীচরণের বকলমে কবি লেখেন যে মনুষ্যত্বের চর্চার দ্বারাই ভীষ্ম-দ্রোণের বীর্যকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব এবং এই মহাভারতীয় শৌর্যের পুনরুজ্জীবন ব্যতীত বর্তমান যুগের দুর্গতি থেকে উদ্ধার পাবার আমাদের অন্য উপায় নেই (অধ্যায় ৫)। এর কিছুকাল পরে দেখি জড় নিশ্চেতন সমাজকে জাগ্রত করে তোলার জন্য তিনি মহাভারতের জীবনাবেগের কথা স্মরণ করেছেন।—

> সে সমাজে সকল পুরুষ সাধু, সকল স্ত্রী সতী, সকল ব্রাহ্মণ তপঃপরায়ণ ছিলেন না। সে সমাজে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, দ্রোণ কৃপ পরশুরাম ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুন্তী সতী ছিলেন, ক্ষমাপরায়ণ যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় পুরুষ ছিলেন এবং শত্রুরক্তলোলুপা তেজস্বিনী দ্রৌপদী রমণী ছিলেন।···সেই বিপ্লবসংক্ষুব্ধ বিচিত্র মানববৃত্তির সংঘাত দ্বারা সর্বদা জাগ্রতশক্তিপূর্ণ সমাজের মধ্যে আমাদের প্রাচীন ব্যূঢ়োরস্কো শালপ্রাংশু সভ্যতা উন্নত মস্তকে বিহার করত।
>
> —যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী', ভূমিকা ১২৯৮

এখানে কবি প্রাচীন ভারতের বলিষ্ঠ জীবনধর্মী সভ্যতাকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। কেননা তিনি জানতেন যে 'প্রাচীন ভারতবর্ষকে কল্পনা করিতে গেলেই নূতন পঞ্জিকার বৃদ্ধব্রাহ্মণ সংক্রান্তির মূর্তিটি আমাদের মনে উদয় হয়' ('সাহিত্য', বাংলা জাতীয় সাহিত্য ১৩০১)। কিন্তু সে ধারণা যে সত্য নয় কবি তা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।—

> ভারতবর্ষ যখন মহান্ ছিল, তখন সে বিচিত্ররূপে বিচিত্রভাবেই মহান্ ছিল। তখন সে বীর্যে ঐশ্বর্যে জ্ঞানে এবং ধর্মে মহান্ ছিল, তখন সে কেবলই মালাজপ করিত না।
>
> —সমাজ', ব্যাধি ও প্রতিকার ১৩০৮

তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, 'বৃহৎ বিচিত্র জীবন-বেগে চঞ্চল, জাগ্রত চিত্তবৃত্তির তাড়নায় নব নব অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হিন্দু সমাজ' যে ভুল ভ্রান্তি মধ্য দিয়েও সত্যের পথে এগিয়ে চলেছিল, 'মহাভারত পড়িলে পাতায় পাতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়' ('শিক্ষা', হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ১৩১৮)। ১৩২১ সালেও তিনি যৌবনের প্রাণশক্তিকে আহ্বান জানিয়ে মহাভারতের প্রাণস্পর্শী জঙ্গম জীবনের আদর্শকেই পুনরায় তুলে

ধরেছেন এবং বলেছেন, সে যুগে 'সমাজটা কোনো সংহিতার কারখানাঘরের ঢালাই-পেটাই-করা ও কারিগরের ছাপ-মারা সামগ্রী ছিল না' ('কালান্তর', বিবেচনা ও অবিবেচনা)। আর শেষ জীবনে পরিণতমনা কবি তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে লিখলেন—

> মহাভারতের প্রশস্ত ক্ষেত্রে একটা মুক্তির হাওয়া আছে।...যাকে আমরা সাধারণত নিন্দনীয় বলি, সেও এখানে স্থান পেয়েছে। যদি আমাদের মন প্রস্তুত থাকে, তবে অপরাধ দোষ সমস্ত অতিক্রম করে মহাভারতের বাণী উপলব্ধি করতে পারা যেতে পারে।...বড়ো বড়ো সব বীরপুরুষ আপন মাহাত্ম্যের গৌরবে উন্নতশির, তাঁদেরও দোষ ত্রুটি রয়েছে, কিন্তু সেই-সমস্ত...আত্মসাৎ করেই তাঁরা বড়ো...মানুষকে যথার্থভাবে বিচার করবার এই প্রকাণ্ড শিক্ষা আমরা মহাভারত থেকে পাই।
>
> —'মহাত্মা গান্ধী', মহাত্মা গান্ধী ১৩৪৪ আশ্বিন

এখানেও কবি মহাভারতীয় চরিত্রগুলির সেই অসামান্য প্রাণশক্তির প্রশস্তি করেছেন যার বলে তাঁরা তাঁদের বৃহৎ ত্রুটিকেও অনায়াসে পরিপাক করে নিয়ে মহান্ রূপে বিরাজিত থাকতে পেরেছেন। জীবনের বেগে স্পন্দমান এই মানবতার আদর্শকেই কবি আমাদের সামনে তুলে ধরে তার দ্বারা আমাদের অনুপ্রাণিত করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

তবু মহাভারত সম্বন্ধে এইটিই তাঁর চরম কথা নয়। তিনি দেখেছেন যে কুরু-পাণ্ডবের দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ উত্থান-পতনময় জীবনচাঞ্চল্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ভীষণ পরিণামের সামনে স্তব্ধ হয়ে থেমে যায় নি। মহাভারতকার তাকে গভীরতর জীবনতত্ত্বের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছেন। ভারতীয় কবির এইজাতীয় কল্পনার কারণ নির্ণয় করে রবীন্দ্রনাথ ১২৯২ সালে বালক পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রাকারে লিখিত এক প্রবন্ধে জানিয়েছিলেন—

> য়ুরোপীয় মহাকবি হইলে পাণ্ডবদের যুদ্ধ জয়েই মহাভারত শেষ করিতেন। কিন্তু আমাদের ব্যাস বলিলেন, রাজ্য গ্রহণ করায় শেষ নহে, রাজ্য ত্যাগ করায় শেষ।
>
> —'চিঠিপত্র', অধ্যায় ৫

কেননা ভারতবর্ষ চিরকাল প্রাণবন্ত জীবনের আদর্শের চেয়ে—কর্মের চেয়ে, জীবনের তত্ত্বকে ও নিরাসক্ত বৈরাগ্যকে বড়ো করে দেখেছে। তাই কৃষ্ণ তথা পঞ্চপাণ্ডবের মহত্ত্ব ও শৌর্যের কথা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জয়গাথায় শেষ হয় না; তাকে ছাপিয়ে শোনা যায় মহাপ্রস্থানের বৈরাগ্যসুর ('প্রাচীন সাহিত্য', কাদম্বরীচিত্র ১৩০৬)। সুতরাং পাণ্ডবদের এই রাজ্যত্যাগ শোকের আঘাতে মুহ্যমান হৃদয়ের পতন নয়, তা স্বস্থ ও

বলিষ্ঠ চিত্তের স্বাভাবিক ত্যাগ, তার স্বাভাবিক পরিণতি। তাকে বিশ্লেষণ করে কবি লেখেন—

> মহাভারতে যে একটা বিপুল কর্মের আন্দোলন দেখা যায় তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিমেষভাবে রহিয়াছে। মহাভারতে কর্মেই কর্মের চরম সমাপ্তি নহে। তাহার সমস্ত শৌর্যবীর্য রাগদ্বেষ হিংসা-প্রতিহিংসা প্রয়াস ও সিদ্ধির মাঝখানে শ্মশান হইতে মহাপ্রস্থানের ভৈরবসংগীত বাজিয়া উঠিতেছে।
>
> —'প্রাচীনসাহিত্য', কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ১৩০৮ পৌষ

এই বিপুল বৈরাগ্যের প্রতি ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তরের আকর্ষণ ছিল। তাই শেষ জীবনেও তাঁকে এই আদর্শ স্মরণ করতে দেখা গেছে।—

> মহাভারতের আখ্যানভাগেরও অধিকাংশ যুদ্ধবর্ণনার দ্বারা অধিকৃত—কিন্তু যুদ্ধেই তার পরিণাম নয়। নষ্ট ঐশ্বর্যকে রক্তসমুদ্র থেকে উদ্ধার করে পাণ্ডবের হিংস্র উল্লাস চরমরূপে এতে বর্ণিত হয় নি। এতে দেখা যায়, জিত সম্পদকে কুরুক্ষেত্রের চিতাভস্মের কাছে পরিত্যাগ করে বিজয়ী পাণ্ডব বিপুল বৈরাগ্যের পথে শান্তিলোকের অভিমুখে প্রয়াণ করলেন—এ কাব্যের এই চরম নির্দেশ।
>
> —'কালান্তর', আরোগ্য ১৩৪৭ মাঘ

জীবনের উপান্তে দাড়িয়ে কবি সকল কালের সকল মানবের কাছে এই 'চরম নির্দেশ'টি পৌঁছে দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয় ভারতীয় প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যটি রবীন্দ্রনাথ শুধু মহাভারতেই প্রত্যক্ষ করেন নি, রামায়ণ কাব্যের অন্তর্নিহিত সুরও এইটিই। সেখানেও কবি দেখেছেন পদে পদে 'পরিপূর্ণ আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যায়, করায়ত্ত সিদ্ধি স্খলিত হইয়া পড়ে—সকলেরই পরিণামে পরিত্যাগ। অথচ এই ত্যাগে দুঃখে নিষ্ফলতাতেই কর্মের মহত্ত্ব ও পৌরুষের প্রভাব' উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কালিদাসের কাব্যেও রবীন্দ্রনাথ এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছিলেন।—

> মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম এবং বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনি কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্য সৌন্দর্যবিলাসেই শেষ হইয়া যায় নাই—তাহাকে অতিক্রম করিয়া তবে কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন।
>
> —'প্রাচীন সাহিত্য' কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ১৩০৮ পৌষ

সেইজন্য শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানে অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক শেষ হয় নি। তপস্যাশুদ্ধ শকুন্তলার সঙ্গে অনুতপ্ত দুষ্মন্তের পুনর্মিলনেই তার অভীপ্সিত পরিণতি। তেমনি

'মদনমথনের দীপ্ত দেবরোষাগ্নিচ্ছটায় নতমুখী লজ্জারুণা গিরিরাজকন্যা'র অকৃতার্থ প্রেমের বেদনাতে কুমারসম্ভব সমাপ্ত নয়।—

> মহাভারতের সমস্ত কর্ম যেমন মহাপ্রস্থানে শেষ হইয়াছে তেমনি কুমারসম্ভবের সমস্ত প্রেমের বেগ মঙ্গলমিলনেই পরিসমাপ্ত।
>
> —'প্রাচীন সাহিত্য', কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ১৩০৮ পৌষ

বলা বাহুল্য, ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাসের কাব্যের অন্তর্নিহিত এই বৈরাগ্যের সুরটি ভারতসংস্কৃতির সাধক রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও অনুস্যূত হয়ে আছে। তাঁর সারা জীবনের সাহিত্যসাধনাকে একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলেই এ কথার সত্যতা বোঝা যাবে। কবি নিজেই এক সময়ে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের মন নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎকে একটি বিশেষ ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেছে। সে ঐক্য ভারতীয় প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় ঐক্য। তার প্রভাব সূক্ষ্ম হলেও তা ব্যাপক এবং দীর্ঘস্থায়ী।—

> সেইজন্য মহাভারতে বর্ণিত ভারত এবং বর্তমান শতাব্দীর ভারত নানা বড়ো বড়ো বিষয়ে বিভিন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে নাড়ীর যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সেই যোগই ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সত্য এবং সেই যোগের ইতিহাসই ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাস।
>
> —'প্রাচীন সাহিত্য', ধম্মপদং ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ

এই যোগের সূত্রেই রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের সঙ্গে মহাভারতীয় জীবনাদর্শের এমন সুগভীর সাদৃশ্য। এই মহাভারতের ভাবধারা রবীন্দ্রলেখনীতে এমন নিপুণভাবে ব্যাখ্যাত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। সেইসঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যেও তা সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। কবি নিজের জীবনেও মহাভারতের এই প্রভাব বিশেষভাবেই অনুভব করতেন। তাই হেমন্তবালা দেবীকে লেখা পত্রে তিনি জানিয়েছিলেন—

> যথার্থ ভারতবর্ষ মহাভারতবর্ষ। মনুসংহিতা ও রঘুনন্দনের ছাঁটাকাটা হাড়-বের-করা শুচিবায়ুগ্রস্ত ভারতবর্ষ নয়।··· আমি ভারতবর্ষের মানুষ—সেই ভারতবর্ষ বাংলার প্রাবল্যাদ্বারাই চিরশুচি,—সেই আমার মহাকাব্যের চিরন্তন ভারতবর্ষ।
>
> —'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১২১, ১৯৩৩ সেপ্‌টেম্বর ২৮

এই উদ্ধৃতিতেই মহাভারতের প্রতি কবির আজীবন পোষিত শ্রদ্ধাটি নিঃশেষে প্রকাশ পেয়েছে। সেই সঙ্গে বোঝা গেছে যে বর্তমান যুগে থেকেও কবি অন্তরে অন্তরে তাঁর ধ্যানের আদর্শভূমি মহাভারতবর্ষেই বাস করতেন। মহাভারতীয় সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করবার তার এইটিই সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি।

ভগবদ্‌গীতা

ভারতসংস্কৃতি ও গীতা : প্রাচীন যুগ ও আধুনিক যুগ

মহা-ভারতীয় সংস্কৃতির সংহততম প্রকাশ গীতা, এ কথা বোধ হয় অত্যুক্তি নয়। কারণ বৈদিক সংস্কৃতির সারভূত যে উপনিষদ্ তারই সারটুকু সংকলিত হয়েছে শ্রীমদ্-ভগবদগীতোপনিষদে। আবার বৌদ্ধ -ধর্ম ও -সংস্কৃতির নির্যাসরূপ যে ধম্মপদ গ্রন্থ তার ভাবধারার সঙ্গেও গীতার আশ্চর্য মিল দেখা যায়।[১] বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্যেও গীতার ছায়াপাত ঘটেছে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। তাঁদের মতে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সদ্ধর্মপুণ্ডরীকের উপর গীতার প্রভাব অতি স্পষ্ট। এ ছাড়া—

> কুষাণ সম্রাট্ কণিষ্কের সমকালীন (খ্রীঃ ৭৮ -১০১) বৌদ্ধ মহাকবি অশ্বঘোষের রচনাতেও গীতার চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে। মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক নাগার্জুনও (খ্রীস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতক) গীতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়।
>
> —প্রবোধচন্দ্র সেন-লিখিত 'বাসুদেব কৃষ্ণ ও ভগবদ্‌গীতা', পূর্বাশা ১৩৫৩ বৈশাখ

পরবর্তী কালে শৈব কবি কালিদাসের রঘুবংশ (১০শ অধ্যায়), বাণভট্টের কাদম্বরী প্রভৃতি কাব্যে গীতার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।[২] এর পরে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকে অদ্বৈতবাদী শংকরাচার্য গীতার ভাষ্যরচনার সূত্রপাত করেন। ওই একই ধারায় পরে পরে দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ মতের অনুকূল করে গীতার ব্যাখ্যা করেন। সে ধারা আজও অব্যাহত।

অতএব বলা যায়, গীতা মূলতঃ বৈষ্ণব ভাগবত সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ হলেও তার উদার অসাম্প্রদায়িক উপদেশে মহামানবতার বাণী ধ্বনিত। সেইজন্যই ভারত-বর্ষের অন্তরের সুমহান্ সত্য এতে নিত্যকালের ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। তুর্কী মনীষী অল্‌বেরুণি (৯৭৩ -১০৪৮) তাঁর ভারতের ইতিহাসে গীতার শ্লোকগুলিকে যেভাবে বারংবার স্মরণ করেছেন তার দ্বারাও এই সত্যই সমর্থিত হয়।[৩] সুতরাং

---

১ উদাহরণস্বরূপ ধম্মপদের যমকবগ্‌গ ২০, দণ্ডবগ্‌গ ১, আত্মবগ্‌গ ৭, সুখবগ্‌গ ৫, অপ্পমাদবগ্‌গ ৩ প্রভৃতি শ্লোকগুলির সঙ্গে যথাক্রমে গীতার ২।৪, ৬।৩২, ৬।৫, ২।৩৮, ৯।২২ প্রভৃতি শ্লোকগুলির তুলনা করা চলে। দ্রষ্টব্য : অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন -প্রণীত 'ধম্মপদ পরিচয়' ১৩৬০, ধম্মপদ-প্রচয়।

২ দ্রষ্টব্য : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর -কৃত 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা' ১৩৩০, উপক্রমণিকা পৃ ৸৹-১৷৹

৩ দ্রষ্টব্য : 'Alberuni's India' 1914, by Dr. Edward C. Sachau

প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে গীতার অবিসংবাদী আধিপত্য সম্বন্ধে সন্দেহ করা চলে না। সেই সঙ্গে লক্ষ করতে হয়, অসাধারণ জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও গীতার কোনো শ্লোকের কোনো গুরুতর পাঠভেদ পাওয়া যায় নি। গীতার প্রতি ভারতীয় জনমানসের একান্ত নিষ্ঠার এ এক সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি।

আধুনিক কালেও গীতার গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি। ভারতীয় নবজাগরণ উপলক্ষে যখন এই আত্মবিস্মৃত জাতির অতীত ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার শুরু হয়, তখন ভারতসংস্কৃতির প্রতীক হিসাবে প্রথমেই গণ্য হয়েছিল গীতা। ওয়ারেন হেস্টিংস এর উৎসাহে ১৭৫৮ সালে স্যর চার্লস্ উইলকিন্স গীতার অনুবাদ করেন। এটিই ইংরেজিতে অনূদিত ও প্রকাশিত প্রথম ভারতীয় গ্রন্থ। পরেও গীতার বহু ইংরেজি অনুবাদ দেখা গেছে। তার মধ্যে এডুইন আর্নল্‌ড্ ও অ্যানি বেসান্টের অনুবাদ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য নানা ভাষাতেও গীতা অনূদিত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে গীতার প্রসার যে কত ব্যাপক ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের একটি উক্তি থেকে তা বোঝা যায়। তিনি বলেছেন —

> সেকালে এমন কোনো ভট্টাচার্য ছিলেন না, যিনি বাংলা পদ্যে গীতার অনুবাদ না করিয়াছেন।
>
> —ভগবদ্গীতা বিষয়ে বক্তৃতা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৯৮ শক, ৮৮

এমন কি উপনিষদ্ভিত্তিক ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক একেশ্বরবাদী 'রামমোহন ভগবদ্গীতা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়' ('সাহিত্যসাধক-চরিতমালা' ১ম, রামমোহন রায় ১৩৫০ ফাল্গুন, গ্রন্থাবলী: বাংলা ও সংস্কৃত পৃ ৯১)। অবশ্য রামমোহনের অনূদিত এই গ্রন্থটি পাওয়া যায় না। শুধু ১৮৫৮ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে' (১৭৮০ শক আষাঢ়) এই গ্রন্থের উল্লেখ করেন। রামমোহনের প্রতিপক্ষ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন কল্পে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পুনর্মুদ্রণ করেন (১৮৩৫)। এর থেকে বোঝা যায় সেই সময় দেশের প্রাচীনপন্থীর দল চিরাচরিত প্রথায় গতানুগতিকভাবে গীতার চর্চা করে চলেছিলেন। কিন্তু সে যুগের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত 'ইয়ং বেঙ্গল' দল দেশীয় সংস্কৃতির সব কিছুকেই অবজ্ঞাভরে অস্বীকার করতে উদ্যত হয়েছিলেন। সুতরাং স্বভাবতঃই তাঁরা গীতাকেও উপেক্ষা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একটি কবিতায় এঁদের মনোভাবের যথার্থ প্রতিচ্ছবি ধরা দিয়েছে। তিনি লিখেছেন—

ভারতে না রহে আর ভারতের বাস।
পুরাণ পুরাণ বলি করে উপহাস॥

কে বা চলে শাস্ত্রপথে সবাই অচল।
নাহি মন গীতায় কি তায় পাবে ফল॥

—'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী' (বসুমতী), বিবিধ : শাস্ত্র এবং শিক্ষাবিভ্রাট

এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় কবি ঈশ্বরগুপ্ত দেশীয় সংস্কৃতি বিশেষতঃ গীতার প্রতি এই উপেক্ষায় কতদূর বেদনাবোধ করেছিলেন। কিন্তু তার প্রতিকার করতে পারেন নি।

সেই যুগে পাশ্চাত্য-শিক্ষিত হয়েও যিনি গীতার প্রতি আগ্রহী হন, তিনি হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। ব্রহ্মোপাসক দেবেন্দ্রনাথ বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি আস্থাবান্ হলেও গীতার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁর 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে শ্রুতিশাস্ত্র এবং দ্বিতীয় খণ্ডে স্মৃতিশাস্ত্র সংকলিত আছে। দ্বিতীয় খণ্ডের সংকলন-কার্যের পরিচয় দিয়ে তিনি লিখেছেন—

এখন দ্বিতীয় খণ্ডের অনুশাসনের জন্য অন্বেষণ পড়িয়া গেল। মহাভারত, গীতা, মনুস্মৃতি প্রভৃতি পড়িতে লাগিলাম।...ইহাতে অন্যান্য স্মৃতিরও শ্লোক আছে, তন্ত্রেরও শ্লোক আছে, মহাভারতের এবং গীতারও শ্লোক আছে।

—'আত্মজীবনী' ১৯৬২, ২৩শ পরিচ্ছেদ পৃ ১৩৭

এ ছাড়া ১৭৯৭-১৭৯৯ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মহর্ষি-কৃত 'ভগবদ্গীতা বিষয়ে বক্তৃতা' ও 'ভগবদ্গীতা হইতে শ্লোকসংগ্রহ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তার থেকেও গীতার প্রতি মহর্ষির সচেতন আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়াসের কথা। তাঁর কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬), ধর্মতত্ত্ব (১৮৮৮) ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৯০২) গ্রন্থত্রয় গীতার প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার সম্যক্ পরিচয় বহন করে। তাঁর শেষ বয়সের উপন্যাস আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) এবং সীতারাম (১৮৮৭) গীতার নিষ্কাম কর্মতত্ত্বের উদাহরণসহ ভাষ্যরচনা। বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া কালীপ্রসন্ন সিংহ, রমেশচন্দ্র দত্ত -প্রমুখ মনীষীরাও গীতার অনুবাদ বা তার আলোচনা করেছেন।[১] তার থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্ব থেকেই দেশে গীতার যে ব্যাপক চর্চা চলেছিল, কবির বাল্যকালেও সেই চর্চার ধারা অব্যাহত ছিল এবং এই যুগপরিবেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথও স্বভাবতঃই গীতার প্রতি অনাকৃষ্ট থাকতে পারেন নি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীতানুরাগের বিষয়টি প্রচলিত ধারণায় ধরা পড়ে নি, তাঁর উপনিষদ্প্রীতি সম্বন্ধে প্রচলিত সংস্কার তাঁর গীতাপ্রীতির কথাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের An Artist in Life নামক মূল্যবান্ গ্রন্থেও

১ দ্রষ্টব্য : 'সাহিত্যসাধক-চরিতমালা'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই প্রচলিত সংস্কারেরই প্রতিফলন দেখা যায়।—

> It is important to remember ·· that while Bankimchandra and, later, men like Tilak and Aurobindo, Gandhi and Raja Gopalachari,··· went to the Gita for their ideological sustenance and emotional and intellectual inspiration, Tagore sought out the Upanishads for his.··· I cannot help pointing out in this connection that Tagore's voluminous writings do not contain more than half-a-dozen references to the Gita.
>
> —'An Artist in Life' 1967, Part one : Influences, p 45

গীতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে মনোভাব এখানে প্রকাশ পেয়েছে তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করা যায় না। উপনিষদ্ তাঁর মনকে গভীরভাবে অধিকার করে থাকলেও গীতার ভাবধারার প্রতি তাঁর হৃদয়ের আকর্ষণ কম ছিল না। তাঁর সারা জীবনের সাহিত্যে তার অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে জানা যায় যে বাল্যকালেই গীতার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল এবং জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নানা প্রসঙ্গে অসংখ্যবার গীতাকে তিনি স্মরণ করেছেন। কিন্তু এ বিষয়টি আজ পর্যন্ত রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রায় উপেক্ষিতই থেকে গিয়েছে।[১] তাই রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ্-প্রীতির প্রতি যতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তার অতি অল্পাংশও তাঁর গীতানুরাগের প্রতি আরোপিত হয় না। অথচ রবীন্দ্ররচনায় গীতার গুরুত্বের বিষয় উপেক্ষিত হলে তাঁর মানসলোকের পরিচয়টাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

এখানে গীতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রমনোভাবের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের গীতাচিন্তা : কালক্রমিক উল্লেখ

গীতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দীর্ঘদিনের। এগার বছর ন' মাস বয়সে উপনয়নের পরে পিতার নির্দেশে গীতার সঙ্গে কবির যে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছিল[২] কবি নিজেই

১ ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য তাঁর মহাভারতপ্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে (সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা : রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা ; ১৩৬৬, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা) প্রসঙ্গক্রমে গীতার কয়েকটি শ্লোকের প্রতি রবীন্দ্রনাথ যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রচেতনায় গীতার রূপ প্রবন্ধেও (ভারতবর্ষ ১৩৭২ বৈশাখ) গীতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

২ দ্রষ্টব্য : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-প্রণীত 'রবীন্দ্রজীবনী' ১ম খণ্ড ১৩৬৭, শান্তিনিকেতনে ও হিমালয়ে পৃ ৩৭

তা বিবৃত করে বলেছেন—

ভগবদ্‌গীতায় পিতার মনের মতো শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদ-সমেত আমাকে কাপি করিতে দিয়াছিলেন।

—'জীবনস্মৃতি' (১৯১২), হিমালয়যাত্রা

শেষ জীবনে লিখিত 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থের (১৯৪০) তৃতীয় অধ্যায়ে কবি পুনর্বার এই প্রসঙ্গটি স্মরণ করেন। মনে হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মহর্ষি-নির্বাচিত গীতার যে শ্লোকসংগ্রহ প্রকাশিত হয় (১৮৭২-৭৭) সেইগুলিই সম্ভবতঃ মহর্ষির এই 'মনের মতো' শ্লোক। 'ভগবদ্‌গীতা বিষয়ে বক্তৃতা'তেও মহর্ষির প্রিয় বিশেষ বিশেষ শ্লোকেরই উদ্ধৃতি থাকা সম্ভব। এই শ্লোকগুলির সঙ্গে কবি বাল্যেই অভ্যস্ত হন। হয়তো সেই কারণেই মহর্ষির এই শ্লোকসংগ্রহ থেকে অন্ততঃ চারটি এবং বক্তৃতা থেকে অন্ততঃ আটটি শ্লোক রবীন্দ্রসাহিত্যে উদ্‌ধৃত হতে দেখা গেছে। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে ধৃত গীতার আর দুটি শ্লোকও রবীন্দ্ররচনায় স্থান পেয়েছে। পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে যথাস্থানে এগুলি উল্লিখিত হল।

বাল্যেই গীতার সঙ্গে পরিচয় হওয়া সত্ত্বেও প্রথম জীবনের সাহিত্যে কবি গীতার বিশেষ উল্লেখ করেন নি। শুধু ১২৯৮ সালে লেখা এক প্রবন্ধে কবি দেশকে শক্তিশালী ও কর্মক্ষম রাখার উদ্দেশ্যে আমিষ বর্জনের প্রতিবাদ করে প্রসঙ্গক্রমে গীতার কর্মযোগকে স্মরণ করে লেখেন—

গীতায় "শ্রীকৃষ্ণ কর্মকে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন"।...কর্মেই মনুষ্যের কতৃশক্তি বা আধ্যাত্মিকতার বলবৃদ্ধি হয়।...প্রবৃত্তির সাহায্যে কর্মের সাধন এবং কর্মের দ্বারা প্রবৃত্তির দমনই সর্বোৎকৃষ্ট।...খোরাক বন্ধ করিয়া প্রবৃত্তির শ্বাসরোধ করা আধ্যাত্মিক আলস্যের একটা কৌশলমাত্র।

—'সমাজ', পরিশিষ্ট: আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত ১২৯৮

এই একটিমাত্র উল্লেখেই গীতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের গভীর উপলব্ধি ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। এ ছাড়া প্রথম জীবনে লিখিত কবির ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে গীতার বহু উপদেশ উল্লিখিত হয়েছে। ১৮৯৪ অক্টোবর ২৫ তারিখে ইন্দিরা দেবীকে লেখা এক পত্রে ('ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১৬৯) কবিকে দেশের হিতসাধনের প্রসঙ্গে গীতার নিষ্কাম কর্মবাদের আদর্শটি স্মরণ করতে দেখা গেছে। ১৯০০ সালের ডিসেম্বরে পত্নীকে লেখা পত্রে ('চিঠিপত্র' ১, পত্র-২০) দেখি তিনি লিখেছেন যে সন্তানদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে যথাকর্তব্য করতে হবে, কিন্তু সস্পৃহভাবে ফলের দিকে তাকিয়ে নয়। ১৮৯৯ অগস্ট ২৮ তারিখে লেখা আর একটি পত্রেও কবি স্বীয় পত্নীকে

সাংসারিক ব্যাপারে স্থৈর্য অবলম্বন করার উপদেশ দিয়ে গীতার 'যস্মান্নোদ্বিজতে··· ইত্যাদি শ্লোকটি (১২।১৫) স্মরণ করেছেন ('চিঠিপত্র' ১, পত্র-১৭)। সুতরাং প্রথম জীবনে ব্যক্তিগতভাবে অন্ততঃ তিনি যে গীতার প্রতি উদাসীন ছিলেন না, বরং তার উপদেশ যে সাগ্রহে মেনে চলতেই চাইতেন, তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু পূর্বোক্ত প্রবন্ধটি ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রসাহিত্য গীতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। তার কারণ কি ?

এই নীরবতার কারণ সম্পর্কে নিঃসংশয়ে কিছু বলা না গেলেও এ বিষয়ে কিছু কিছু অনুমান করা চলে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দেশে যখন ব্যাপক নবজাগরণ দেখা দিল, তখন খ্রীস্টান মিশনারী প্রচারিত খ্রীস্টধর্ম এবং রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম— এই দুইয়ের প্রতিক্রিয়ায় পৌরাণিক হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান দেখা গেল। এই নব্য হিন্দুধর্ম-প্রচারকদের সবচেয়ে বড়ো সহায় হল গীতা। তাঁদের অনেকেই গীতার যে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন তা অনেকাংশেই প্রগতিবিরোধী এবং শিক্ষিত মনের অনুপযোগী। কোনো কোনো মূঢ় ধ্বজাধারী আবার গীতার নানা প্রকার অপব্যাখ্যা করতে থাকেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'হাসির গানে' এর যুগের প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায়। নিরপেক্ষ ধর্মমোহমুক্ত দ্বিজেন্দ্রলালের চোখে এই ধর্ম-প্রচারকদের মনোভাব ও তাদের কার্যকলাপের অসংগতিটি ধরা পড়েছিল। তাই এদের লক্ষ্য করেই তাঁর ব্যঙ্গকশা ঝলসে উঠেছে।—

> বড়ই নিন্দা মোদের সবাই কর্চ্ছে দিনরাতি,
> বলছে মোরা ভণ্ড ভীরু মিথ্যাবাদী জাতি,
> হতাশভাবে শয্যার উপর পড়লাম গিয়ে শুয়ে,
> দুইটি ধারে সবল বেথায় ছড়িয়ে হস্ত দুয়ে,
> ভাবছি এটার সুখের মতন জবাব দেয় কি তা'—
> ঠেকলো হাত এক বইয়ের উপর, তুলে দেখি গীতা।
> —ওমা! তুলে দেখি গীতা।

সুতরাং আর তাঁদের দুশ্চিন্তার কারণ নেই। কেননা—

> এবার যদি নিন্দা কর, কর্ব তা কি জানি—
> অমনি চাঁদের চোখের সামনে ধর গীতাখানি,

তাঁদের কাছে গীতার উপযোগিতাও অভিনব।—

> করি যদি ধাপ্পাবাজি, মিথ্যে মোকর্দমা,
> স'য়ে যাবে,— গীতার পুণ্য আছে অনেক জমা,

মাঝে মাঝে তুলনায় মনে হয় এ হেন,
মুর্গীর কোর্মার চেয়ে আমার গীতাই মিষ্টি যেন—
আমার গীতাই মিষ্টি যেন।

—'হাসির গান' ১৯০০, গীতা আবিষ্কার

এ-ই তাঁদের গীতা-আবিষ্কার। তার ভাষ্যটি আরও অ-পূর্ব। তাঁরা—

বোঝাতেন যে হার্বার্ট স্পেনসার ওয়েবস্টার কি বিড্ডিকার আছে সবই গীতার একটি অধ্যায়েরই মধ্যে।

—'হাসির গান' ১৯০০, চণ্ডীচরণ

রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতঃই এই ধরণের ধর্মব্যাখ্যা পছন্দ করতে পারেন নি। তাঁর 'মানসী' কাব্যের ধর্মপ্রচারক কবিতায় (১৮৮৮) এই জাতীয় ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে কটাক্ষ দেখি। আর গীতার প্রতি অন্ধ ভক্তিকে তিনি যে কি চোখে দেখতেন তার পরিচয় আছে তাঁর 'মুক্তির উপায়' নাটিকায় (১৯৪৮)। সেখানে একনিষ্ঠ গুরুভক্ত ফকিরের সম্বন্ধে তার স্ত্রী বলেছে—

হৈম। দক্ষিণা পেলেই গুরু তালপাতার উপর গীতার শ্লোক লিখে সেগুলো জল দিয়ে ধুয়ে দেন। গীতা-ধোওয়া জলে ঐ বোতলগুলো ভরা। তিন সন্ধ্যে স্নান করে তিন চুমুক করে খান। ওঁর বিশ্বাস, ওঁর রক্তে গীতার বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

—'মুক্তির উপায়', প্রথম দৃশ্য

গীতার মহিমা নিয়ে দেশে যে সময়ে এই ধরণের মত্ততা চলছিল, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় গীতার উল্লেখে বিরত ছিলেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী কালের রচনায় গীতা সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আগ্রহের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ১৩০৯ সালে ভারতবর্ষের ইতিহাস ('স্বদেশ') এবং ১৩১৯ সালে ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ('ইতিহাস') প্রবন্ধ দুটিতে তিনি ভারতসংস্কৃতির ইতিহাসে গীতার স্থান ও তার গুরুত্ব নির্ণয়ে আশ্চর্য গভীর ও অভ্রান্ত ইতিহাসদৃষ্টির পরিচয় দেন। আবার ১৩১৫ থেকে ১৩২২ সালের শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালায় ধর্মব্যাখ্যা করতে গিয়েও তিনি একাধিকবার গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন বা তার উল্লেখ করেছেন। তবে সেগুলি প্রাসঙ্গিক উল্লেখ মাত্র। তখনও পর্যন্ত উপনিষদ্ই তাঁর চিত্তকে গভীরভাবে অধিকার করে ছিল। ওই সময়েই 'সঞ্চয়' গ্রন্থের অন্তর্গত ধর্মের অর্থ, ধর্মের অধিকার প্রভৃতি প্রবন্ধে (১৩১৮) এবং তার কিছু কাল পরে 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'র বিভিন্ন অধ্যায়ে (১৩৩১) গীতার কিছু কিছু উল্লেখ চোখে পড়ে। তবে ১৩৩৪ সালে 'জাভা-যাত্রীর পত্রে'ই প্রথম গীতার বাণীর প্রতি তাঁর আন্তরিক সমর্থনটি প্রকাশ পেয়েছে। উক্ত গ্রন্থের পঞ্চম পত্রে কবি

গীতার নিষ্কাম কর্মবাদের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা যেমন গভীর তেমনি অভাবিত। যথা স্থানে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। যাই হক, এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ গীতাকে যে এমনভাবে স্মরণ করেছেন, তার কারণ জাভা প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতে গিয়ে কবি সেখানে ভারতসংস্কৃতির নানা 'ভাঙাচোরা' রূপ দেখেছিলেন। সেই সূত্রে ওই গ্রন্থেব পত্রে পত্রে কবি ভারতসংস্কৃতির আলোচনা করেছেন এবং অনিবার্যভাবে গীতাকে স্মবণ করেছেন।

পববর্তী কালে হিবার্ট লেকচার (The Religion of Man 1931) ও কমলা বক্তৃতামালায় ('মানুষেব ধর্ম' ১৯৩৩) দেখি পবিণতমনা কবি আপন ধর্মমতেব ব্যাখ্যা উপলক্ষে স্বীয় অনুভূতিব ক্ষেত্রে বেদ-উপনিষদের বাণীব সঙ্গে গীতাকে অবিরোধে মিলিয়ে নিয়েছেন। সেখানে বহুবার বিভিন্ন উপলক্ষে গীতার বাণী স্বতঃই তাঁব মনে এসেছে এবং তাকে প্রামাণিক রূপে গণ্য করে কবি তার দ্বারা আপন বক্তব্যেব সমর্থন খুঁজেছেন।

গীতাকে কবি শুধু একটি প্রথম শ্রেণীব দর্শনগ্রন্থরূপেই দেখেন নি, তার উপদেশ-গুলিব ব্যাবহারিক উপযোগিতার প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত তাঁব পত্রগুলিতে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। 'কালান্তর' গ্রন্থের অন্তর্গত ১৩২৬ থেকে ১৩৪৬ সালের মধ্যে লেখা প্রবন্ধগুলিতে এই অর্থেই গীতাব পৌনঃপুনিক উল্লেখ দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বিপ্লবী জননেতারা তাঁদের ব্রতের মূলমন্ত্ররূপে যে গ্রন্থটি নির্বাচন করে নিয়েছিলেন সেটি হল গীতা। রবীন্দ্রসাহিত্যেও তার প্রতিফলন দেখা গেছে। 'গল্পগুচ্ছে'র অন্তর্গত 'নামঞ্জুর গল্প'-এর (১৩৩২) জেলখাটা নায়ক তাই গীতোক্ত স্থিতধী হবার সাধনায় 'নিস্ত্রৈগুণ্য' হবার উমেদার। আর 'সংস্কার' গল্পে কবি স্পষ্টই লিখেছেন—

তখনকার পুলিশ কারও বাড়িতে গীতা দেখলেই সিডিশনের প্রমাণ পেত।

—'গল্পগুচ্ছ', সংস্কার ১৩৩৫

আবার সেই যুগে স্বদেশীয়ানার নামে অনেকেই যে গীতার অপব্যাখ্যা করে তাকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করতেন রবীন্দ্রনাথের 'ঘবে-বাইরে' (১৩২৩) এবং 'চার অধ্যায়' (১৩৪১) উপন্যাস দুটিতে তার প্রতি কটাক্ষ দেখা গেছে। অবশ্য এই অপপ্রয়োগের জন্য গীতারই বাণী যে কতদূর দায়ী যথাস্থানে তার আলোচনা করা যাবে।

সাহিত্য হিসাবে রবীন্দ্রনাথ গীতাকে যে ত্রুটিহীন বলে মনে করতেন না, তাঁর প্রথম থেকে শেষ জীবনের রচনায় তার পরিচয় আছে। অবশ্য সাহিত্যগত এই ত্রুটির জন্য গীতার গৌরব যে বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায় নি, সেকথাটিও কবি বারংবার স্বীকার

করেছেন। ১৩০৬ সালে সাহিত্য হিসাবে গীতার অসাফল্য বর্ণনা করে তিনি বলেছিলেন—

ভগবদ্‌গীতার মাহাত্ম্য কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু যখন কুরুক্ষেত্রের তুমুল যুদ্ধ আসন্ন তখন সমস্ত ভগবদ্‌গীতা অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতে পারে, ভারতবর্ষ ছাড়া এমন দেশ জগতে আর নাই।

—'প্রাচীন সাহিত্য', কাদম্বরীচিত্র

১৩৪০ সালেও দেখি গীতা সম্বন্ধে তাঁর এই মনোভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নি। তখনও তিনি লিখেছেন—

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে থমকিয়ে রেখে সমস্ত গীতাকে আবৃত্তি করা সাহিত্যের আদর্শ অনুসারে নিঃসন্দেহই অপরাধ। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রকে গীতার ভাবের দ্বারা ভাবিত করার সাহিত্যিক প্রণালী আছে, কিন্তু সৎকথার প্রলোভনে তার ব্যতিক্রম হয়েছে বললে গীতাকে খর্ব করা হয় না।

—'সাহিত্যের স্বরূপ', সাহিত্যের মাত্রা

এই মন্তব্যের কিছু কাল পরে ভারতসংস্কৃতির পরিক্রমা করে তাতে গীতার স্থান নির্ণয়ের উপলক্ষে তিনি লেখেন—

কুরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে এই-যে খানিকটা দার্শনিক ভাবে আলোচনা, এটাকে কাব্যের দিক থেকে অসংগত বলা যেতে পারে, এমনও বলা যেতে পারে যে, মূল মহাভারতে এটা ছিল না। পরে যিনি বসিয়েছেন তিনি জানতেন যে, উদার কাব্যপরিধির মধ্যে, ভারতের চিত্তভূমির মাঝখানে এই তত্ত্বকথার অবতারণা করার প্রয়োজন ছিল।

—'মহাত্মা গান্ধী', মহাত্মা গান্ধী ১৩৪৪ আশ্বিন

গীতাকে কবি যেমন সমগ্ররূপে দেখে তার মূল্য নির্ণয় করেছেন, তেমনি তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধিগত করেও নিয়েছেন। দিলীপ কুমার রায়কে লেখা তাঁর এক পত্রে তার প্রমাণ পাই। সেখানে তিনি গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোক দুটির ছন্দের তুলনামূলক বিচার করে লিখেছেন—

গীতার একটি শ্লোকের আরম্ভ এই অপরং ভবতো জন্ম, ঠিক তার পরবর্তী শ্লোক বহূনি মে ব্যতীতানি। দ্বিতীয়টির সমান ওজনে প্রথমটি যদি লিখতে হয় তাহলে লেখা উচিত 'অপারং ভাব্‌তো জন্ম'। কিন্তু যাঁরা এই ছন্দ বানিয়েছিলেন তাঁরা ছান্দসিকের হাটে গিয়ে নিক্তি নিয়ে বসেন নি।

— ছন্দ', পত্রধারা : দ্বিতীয় পর্যায়, পত্র-৩, ১৩৩৯ মাঘ ১৩

অনুষ্টুপ্ ছন্দের দৃষ্টান্ত আহরণ করতে গিয়ে কবির যে গীতার কথা মনে পড়েছে, তার থেকে বোঝা যায় গীতা তাঁর চিত্তকে কতদূর অধিকার করে ছিল।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে এটুকু আশা করি স্পষ্ট হয়েছে যে রবীন্দ্রসাহিত্যে গীতা উপেক্ষিত তো নয়ই, বরং তাকে তাঁর আশৈশব সহচর বলা চলে। তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। এবার গীতাকে রবীন্দ্রনাথ কোন্ কোন্ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন এবং অন্যদের তুলনায় তাঁর দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যই বা কোথায় সেটি বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

গীতাচিন্তায় রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য

এ পর্যন্ত যে সব মনীষী গীতার আলোচনা করেছেন তাঁদের অধিকাংশের চোখেই গীতা একটি অভ্রান্ত গ্রন্থরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাঁরা গীতার মধ্যে কোনো স্ববিরোধ বা মতানৈক্য দেখেন নি, তাকে নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন এবং আপন আপন বিশেষ মতবাদের কোঠায় ফেলে তার ভাষ্য রচনা করেছেন। শংকরাচার্যের স্বচ্ছ বৈদান্তিক বুদ্ধিও তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। তিনি নিঃসংশয়ে গীতার সমস্ত শ্লোকের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আধুনিক যুগে তিলক তেমনি তাতে শুধুই কর্মযোগ প্রত্যক্ষ করেছেন ('গীতারহস্য')। এ ছাড়া মোটের উপর রামমোহন থেকে শুরু করে গান্ধী, অরবিন্দ, বিনোবা ভাবে পর্যন্ত সকলেই এই পথে চলেছেন।

বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম এ বিষয়ে জাগ্রত বিচারবুদ্ধির পরিচয় দেন। তিনি সনাতন প্রাচ্যসুলভ সবকিছু-মেনে-নেওয়ার মনোভাবকে গ্রহণ না করে আধুনিক পাশ্চাত্য রীতিতে সবকিছু যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন। কোনো ভারতীয় পণ্ডিতের পক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতির কোনো বিষয়কে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করা সম্ভব নয়—এই বোধ নিয়ে তিনি এ কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই দৃষ্টিতে গীতার বিচার করে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা কতদূর সমর্থনযোগ্য বর্তমানে সেটি আমাদের বিচার্য নয়। তবে তিনি যে ধারায় গীতা-আলোচনার সূত্রপাত করেন, সেই ধারা আমাদের দেশে অনেকাংশেই স্বীকৃত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যথার্থই বলেছেন—

> বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে গীতার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন ইংরাজী-শিক্ষিত লোকের মধ্যে উহা বিরলপ্রচার ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যাহার মূলে বাঙ্গালাদেশে সে জিনিষ অচল থাকে না,—তাহা প্রচলিত হয়।
>
> —'চরিতকথা' ১৩৬৫, বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে লেখকের এই উক্তি যে কতদূর সত্য বঙ্কিম-অনুগামী অসংখ্য টীকাকারের ব্যাখ্যায় তা সমর্থিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি পাশ্চাত্ত্যশিক্ষানুরাগীদের মধ্যে গীতা-আলোচনার সূত্রপাত করে দেন। বঙ্কিমের প্রদর্শিত পথে যাঁরা যাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে নানা উপলক্ষে গীতার বিষয় কিছু না কিছু আলোচনা করেছেন। এবার গীতার প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির একটু পরিচয় নেওয়া যাক।

১৩১১ সালে রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতা সম্পাদন করে প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের সুচিন্তিত ও মূল্যবান্ ভূমিকা থেকে বোঝা যায় তিনি ভক্তির বিশেষ সংস্কারের বশবর্তী হয়ে এ কাজে অগ্রসর হন নি। বিচারের ক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিমের মতোই যুক্তিবাদী। তার মতে 'গীতা জ্ঞানমার্গাবলম্বী' (শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা ১৩৩০ উপক্রমণিকা, পৃ ১৷৹)। তবু তিনি বোঝেন—

> গীতা কোনো সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। জ্ঞানী-অজ্ঞান, পণ্ডিত-মূর্খ শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ অধিকারী—সকলেই স্ব স্ব বুদ্ধি ও যোগ্যতা অনুসারে তাঁহার অগাধ ভাণ্ডার হইতে আধ্যাত্মিক অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন।
>
> —'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা', উপক্রমণিকা পৃ ১

১৩২২ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'গীতাপাঠ' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি গীতার দার্শনিক দিকটি নিয়েই আলোচনা করেছেন, তার ঐতিহাসিকতা বিচার করেন নি। তবে তাঁর এই দার্শনিক বিচার পূর্বগামীদের গতানুগতিক পথের থেকে স্বতন্ত্র। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই তার স্মৃতিকথায় লেখেন—

> আমাদের দেশে আমি যে ভাবে দার্শনিক আলোচনা করিয়াছিলাম, সে রকম আমার পূর্বে আর কেহ করেন নাই।
>
> —'সাহিত্যসাধক-চরিতমালা' ৬ষ্ঠ খণ্ড দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৬৫ আষাঢ়, রচনাবলী পৃ ৩০

তাঁর গীতাভাষ্য সম্বন্ধেও এ কথা সত্য। আর এইজাতীয় দার্শনিক বিচারের পর গীতা সম্বন্ধে তিনি তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে অমিয় চক্রবর্তীকে এক পত্রে (১৯১৮ জুলাই ১) লেখেন—

> মোটামুটি বলিতে পারি এই যে, Huxley, Mill প্রভৃতির গ্রন্থাবলীর পরিবর্তে গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে সাধন সম্বন্ধে অনেক সার সার উপদেশ পাওয়া যাইতে পারে।
>
> —পূর্ববৎ, পত্রাবলী পৃ ৪৩

রবীন্দ্রনাথের নতুন দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথও গীতার প্রতি উদাসীন ছিলেন না।

তিলকের সুবৃহৎ গ্রন্থ 'গীতারহস্য'-এর সযত্ন অনুবাদ (শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা রহস্য ১৯২৪) তাঁর এই অনুরাগের পরিচয় বহন করে। তবে আধ্যাত্মিক ভক্তি বা দার্শনিক তত্ত্বের আকর্ষণে তিনি এ কাজে প্রবৃত্ত হন নি। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র বা সত্যেন্দ্রনাথের মতো তার অন্তর্নিহিত ইতিহাসের উদ্ধার বা তার যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণেও তাঁর আগ্রহ দেখা যায় নি। সাহিত্য-সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে তিনি তিলকের গ্রন্থের মূল্য বিচার করেছিলেন এবং যে মনোভাব নিয়ে তিনি সংস্কৃত, ফরাসী প্রভৃতি ভাষার গ্রন্থ অনুবাদ করেন, সেই মনোভাব নিয়েই তিনি এ গ্রন্থেরও ভাষান্তর করেছিলেন।

দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজেরা গীতাকে যথেষ্ট সমাদর করতেন এবং অভ্যাস ও সংস্কারের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তাঁরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে গীতাকে গ্রহণ করেছিলেন। আবার পিতা এবং অগ্রজেরা গীতা সম্বন্ধে এ রকম আগ্রহী ছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও গীতার প্রতি উদাসীন থাকা সম্ভব হয় নি। অবশ্য অগ্রজদের মতো তিনি গীতা সম্বন্ধে কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন নি। তবে নানা স্থানে নানা প্রসঙ্গেই গীতা সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। সেগুলি থেকেই গীতা সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। যে যে বিষয়কে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে এখানে তার কতকগুলির পরিচয় দেওয়া গেল।

ক. ইতিহাস-নির্ণয়

গীতা মূলতঃ ধর্মগ্রন্থ হলেও রবীন্দ্রনাথ তাকে কখনও নিরালম্ব তত্ত্ব হিসাবে দেখেন নি। উপনিষদের মতো গীতাকেও তিনি বিশেষ দেশকালের পটভূমির উপরে স্থাপন করেই দেখেছিলেন। তাই ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে গীতার স্থান, তার গুরুত্ব এবং তার রচনাকাল নিয়ে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন। এবার রবীন্দ্রকৃত মন্তব্যের অনুসরণে এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্যটি প্রতিপন্ন করা যাক।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহজ ইতিহাসবোধ থেকে বুঝেছিলেন গীতার বর্তমান রূপটি তার আদি রূপ নয়। তাই যে বিশেষ সামাজিক পরিবেশে গীতার আদিতম রূপের উদ্ভব তার পরিচয় দিয়ে তিনি এক স্থানে লিখেছিলেন—

> .. there was a period of struggle beween the cult of ritualism supported by the Brahmins, and the religion of love.···In the fact that Krishna, a Kshatriya, was not only at the head of the Vaishnava cult, but the object of its worship, that in his

teaching, as inculcated in the Bhagavad-Gitā, there are hints of detraction against Vedic verses, we fiind a proof that this cult was developed by the Kshatriyas.···

The ideal, which was supported by the Kshatriya opponents of the priesthood, is represented by the Bhagabad-Gītā. It was spoken to the Kshatriya hero Arjuna, by the Kshatriya prophet Krishna. The doctrine of Yoga, . the doctrine of the disinterested concentration of life. ..had its tradition, according to Krishna, along the line of the Rājarshis, the kingly prophets. He says :

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥

"This, handed on down the line, the king-sages knew. This Yoga, by great efflux of time, decayed in the world, O Parantapa,"

—'A Vision of India s History' 1962, P 15

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে দেখা গেল, উপনিষদের মতো গীতাও প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের কালেই উদ্ভূত এবং ক্ষত্রিয় রাজর্ষি-কর্তৃক উপদিষ্ট। সেই হিসাবে একেও রাজবিদ্যা বলা চলে। তবে উপনিষদের মতো গীতা একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর দার্শনিক তত্ত্বচিন্তা নয়। একজন ব্যক্তিই গীতার ধর্মমতের প্রবর্তক এবং তার উপদেশগুলি জীবনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবার উপযোগী।

গীতার আদি রূপটি যে উপনিষদের সমকালেই উদ্ভূত হয়েছিল সে সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। পূর্বোক্ত গ্রন্থেই তিনি এ বিষয়ে লিখেছেন—

According to the Chhāndogya Upanishad, the teacher Ghora, after having explained to his disciple Krishna, who had become *apipāsa,* free from desire, the consecration ceremony... in which austerity, almsgiving, harmlessness, truthfulness are one's gifts for the p iests, winds up his teaching with these words : "In the final hour one should take refuge in these three thoughts : *You are the Indestructible ; you are the*

unshaken, you are the very Essence of Life…"

We find a hint here of the teaching which was developed by Krishna into a great religious movement which preached freedom from desire and absolute devotion to God, and which spiritualized the meaning of ceremonies.

—'A Vision of India's History' 1962, p 29 30

ছান্দোগ্য উপনিষদে গুরু ঘোর আঙ্গিরস, শিষ্য দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা যে প্রচলিত উপদেশগুলির থেকে স্বতন্ত্র এবং সেই উপদেশের ভিত্তিতেই যে কৃষ্ণ তাঁর নূতন ধর্মের প্রবর্তন করেন, সেই তথ্যের প্রতি এ স্থলে রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি আভাস দিয়েছেন যে ঘোর আঙ্গিরসের উপদেশের তাৎপর্যও গীতাতে অনেকাংশেই গৃহীত হয়েছে। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের 'অক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসি' (৩।১৭।৬) ইত্যাদি তত্ত্ব গীতার বাণীর মধ্যে অনুস্যূত দেখা যায়। আবার তিনি যে ছান্দোগ্য উপনিষদের 'তপো দানমার্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি (৩।১৭।৪) ইত্যাদি বাণীর উল্লেখ করেছেন, গীতার—

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥
অহিংসা সত্যম্ । ১৬।১-২

ইত্যাদি শ্লোকে তারই অনুস্মৃতি চোখে পড়ে। এই মনোভাব থেকেই কবি পূর্বোক্ত গ্রন্থে ছান্দোগ্য উপনিষদের 'অপিপাস' শব্দের উল্লেখ করে তার সঙ্গে গীতার নিষ্কামতার আদর্শটি (কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন' ২।৪৭) স্মরণ করেছেন। আবার গীতায় যে দ্রব্যময় যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানময় যজ্ঞকে শ্রেয় বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ছান্দোগ্য উপনিষদে তার পূর্বাভাস লক্ষ করেছেন এবং সে সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—

We find a hint here of the teaching which was developed by Krishna into a great religious movement which spiritualized the meaning of ceremonies.

— A Vision of India's History' 1962, p 29 30

যথাস্থানে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। তবে বোঝা গেল, ছান্দোগ্য উপনিষদই যে গীতার আদি রূপের উৎস সে সম্বন্ধে কবি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাবধারার সঙ্গে গীতার বর্তমান রূপের ভাবধারার এই জাতীয় কিছু কিছু মিল থাকলেও গীতার প্রচলিত বাণীগুলিই যে কৃষ্ণোপদিষ্ট বাণী এমন কথা বলা যায় না। গীতার যে রূপটি আমরা পাই সেটি যে কালক্রমে আদি রূপের

থেকে অল্পাধিক পরিমাণে বিবর্তিত পরিবর্তিত এমন কি কিছু বিকৃতও হয়েছিল, এ কথা মনে করার হেতু আছে। গীতার বর্তমান রূপের মধ্যেই তার সংশয়াতীত নিদর্শন পাওয়া যায়। এ বিষয়েও যে রবীন্দ্রনাথ কতদূর অবহিত ছিলেন, তাঁর একখানি পত্র (১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৮) থেকে তবি সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। ওই পত্রে গীতার সর্বশেষ অর্থাৎ প্রচলিত রূপটির সম্ভাব্য কালের আভাসও পাওয়া যায়। পত্রটি উদ্ধৃত করলেই গীতার দ্বৈতরূপ সম্বন্ধে কবির অভিমত স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাঁর মতে—

> গীতার ঠিক ইতিহাসটি পাওয়া গেলেই ওর হেঁয়ালির মীমাংসা পাওয়া যেত। গীতার মধ্যে কোনো একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ প্রয়োজনের সুর আছে। তাই ওর নিত্য অংশের সঙ্গে একটা ক্ষণিক অংশ জড়িয়ে গিয়ে কিছু যেন বিরোধ বাধিয়ে দিয়েছে। কোনো একজন মহাপুরুষের বাক্যকে কোনো একটি সংকীর্ণ ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করলে যে রকমটি হয়, গীতায় সে রকম একটা টানাটানি আছে। অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্যে আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে তার মধ্যেও বিশুদ্ধ সত্যের সরলতা নেই। আমার মনে হয় বৌদ্ধ উপদেশে ভারতবর্ষকে যখন নিষ্ক্রিয় করে তুলেছিল, যখন অহিংসাধর্মের সাত্ত্বিকতা কেবলমাত্র negative লক্ষণাক্রান্ত, সুতরাং পূর্ণ সত্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল, তখন কোনো একজন মনস্বী পূর্বতন গুরুর উপদেশকে কর্মোৎসাহকরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সম্মুখে একটি সাময়িক প্রয়োজন অত্যন্ত উৎকটভাবে থাকাতে ব্যাখ্যাটির মধ্যে খুব উচ্চভাবের সঙ্গেও তর্কচাতুরী খানিকটা না মিশে থাকতে পারে নি। গীতার সঙ্গে সঙ্গে গীতার সেই ইতিহাসটি যদি দেখতে পাওয়া যেত তা হলে বোঝবার পক্ষে ভারি সুবিধা হত।
>
> —প্রবোধচন্দ্র সেন-লিখিত 'ধম্মপদ পরিচয়' ১৩৬০, পৃ ৬-৭

এখানে রবীন্দ্রনাথ গীতোক্ত বাণীর উপদেষ্টা একজন 'পূর্বতন গুরু' এবং পরবর্তী কালে উক্ত বাণীর সংকলয়িতা একজন 'মনস্বী'র কল্পনা করেছেন। এর থেকে গীতার দুই রূপ সম্বন্ধে কবির সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার গীতার রচনাকাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে অনুমান করেছেন, সে বিষয়ে বলা যায়, গীতার উদ্দেশ্য হল যুদ্ধে প্রবর্তনা দান এবং প্রাণহননের বিরুদ্ধ মনোভাবকে প্রশমিত করা। তার কারণ হিসাবে মনে হয়, দেশে যখন যুদ্ধ করার প্রয়োজন প্রবল সেই সময়েই যুদ্ধবিমুখ মনোভাব দেশে ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই সময়কে ঐতিহাসিক প্রবোধচন্দ্র সেন ভারত-ইতিহাসে কলিঙ্গ যুদ্ধের (খ্রীঃ পূঃ ২৬১) পরবর্তী কাল বলে মনে করেছেন; কেননা সম্রাট্ অশোকের যুদ্ধ-পরিহার নীতির প্রভাবেই দেশে যুদ্ধবিমুখ মনোভাব ক্রমশঃ

ছড়িয়ে পড়ছিল। অথচ অশোকের মৃত্যুর অল্প কাল পর থেকেই বৈদেশিকদের উপর্যুপরি ভারত-আক্রমণ শুরু হয়। তখনই হিংসাবিরোধী মনোভাবকে অতিক্রম করে যুদ্ধে প্রবর্তনা দেবার তথা ধর্ম ও যুদ্ধকে সমন্বিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। সুতরাং প্রবোধচন্দ্র সেন মনে করেন—

> অশোকের মৃত্যুর পরে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে যখন অশ্বমেধপরাক্রম পুষ্যমিত্র-প্রমুখ নৃপতিরা বৈদেশিক আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার কাছাকাছি কোনো সময়ে গীতা রচিত হয়েছিল।
>
> —'ধম্মপদ পরিচয়' গীতার রচনাকাল পৃ ৮

এই মন্তব্য থেকেই গীতার রচনাকাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনুমানের সত্যতা বোঝা যায়। এই প্রসঙ্গে কবির অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের কথাও স্মরণ হয়। তিনি বলেছেন—

> বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের মধ্যবর্তী—খৃষ্টাব্দ প্রবর্তনের কিছু কাল অগ্রপশ্চাৎ উহার জন্ম বলাই সংগত।
>
> —'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' ১৩০০ উপক্রমণিকা পৃ ১৷০

অতএব গীতার রচনাকাল বিষয়ে উভয়ের সিদ্ধান্তের মিল ছিল। তবে সত্যেন্দ্রনাথ গীতার কালনির্ণয় করেছিলেন বহির্মুখী প্রণালীর আশ্রয় নিয়ে। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ গীতার বাণী বিশ্লেষণ করে ও তার অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। এইখানেই রবীন্দ্রদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পেয়েছে।

গীতায় 'নিত্য আদর্শের সঙ্গে' ক্ষণিক 'প্রয়োজনের সুর' জড়িয়ে যাওয়ার জন্য রবীন্দ্রনাথ তার বাণীতে কিছু কিছু বিরোধ দেখতে পেয়েছিলেন। গীতার শ্লোকগুলি একটু প্রণিধান করে দেখলেই এ কথার সত্যতা বোঝা যাবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এক স্থানে 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্' (২।৩৭) ইত্যাদি বলে যুদ্ধবিমুখ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে প্রলুব্ধ করেন। অথচ তার পরের শ্লোকেই তিনি অবিচল স্থৈর্য ও নিষ্কামতার আদর্শ বর্ণনা করে উপদেশ দেন—

> সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
> ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ২।৩৮

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে ৩৭-সংখ্যক শ্লোকের সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে প্রদত্ত প্রলোভনের সঙ্গে পরবর্তী শ্লোকের নিত্য আদর্শের কোনো মিলই নেই। তেমনি ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে দেখি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যকে আত্মশরণ মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে বলছেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥

কিন্তু সেই কৃষ্ণই ১২শ অধ্যায়ের ৬-৭ শ্লোকে শিষ্যকে আত্মনির্ভরতা পরিহার করতে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন—

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।

এখানে তিনি যেন বলতে চান, স্বতন্ত্র বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে অন্ধভাবে তাঁর শরণ নিলেই মোক্ষলাভের আশা সুনিশ্চিত। অথচ দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, 'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ' (২।৪৯) কারণ 'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি' (২।৬৩)। এই জাতীয় স্ববিরোধী উক্তি গীতায় প্রচুর। তাই 'আত্মার অবিনশ্বরত্ব' সম্বন্ধে গীতার উপদেশে কবি 'বিশুদ্ধ সত্যের সরলতা'র বদলে 'তর্কচাতুরী' লক্ষ করেছিলেন। আধুনিক কালেও যে গীতার এই জাতীয় তর্কচাতুরীকে কাজে লাগানো হয়ে থাকে, সেটিও কবির দৃষ্টি এড়ায় নি। বলা বাহুল্য এই বিষয়টি তাঁকে চিরকালই বিশেষ পীড়া দিয়েছে এবং সেই বেদনাবোধ তাঁর সাহিত্যেও নানা স্থানে প্রতিফলিত হয়েছে। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে তার একটু পরিচয় দেওয়া গেল। তার দ্বারা গীতার এই দুর্বল দিকটি সম্বন্ধে কবির মনোভাব অধিকতর পরিস্ফুট হতে পারবে। তাঁর 'পারস্যযাত্রী' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, মানুষ আকাশযানে বসে নির্মমভাবে পৃথিবীতে শতঘ্নী বর্ষণ করতে পারে। কারণ—

> যে বাস্তবের 'পরে মানুষের স্বাভাবিক মমতা, সে যখন ঝাপসা হয়ে আসে তখন মমতারও আধার যায় লুপ্ত হয়ে। গীতায় প্রচারিত তত্ত্বোপদেশও এই রকমের উড়ো জাহাজ—অর্জুনের কৃপাকাতর মনকে সে এমন দূরলোকে নিয়ে গেল, সেখান থেকে দেখলে মারেই বা কে, মরেই বা কে, কেই-বা আপন, কেই-বা পর। বাস্তবকে আবৃত করবার এমন অনেক তত্ত্বনির্মিত উড়ো জাহাজ মানুষের অস্ত্রশালায় আছে, মানুষের সাম্রাজ্যনীতিতে, সমাজনীতিতে, ধর্মনীতিতে। সেখান থেকে যাদের উপর মার নামে তাদের সম্বন্ধে সান্ত্বনাবাক্য এই যে, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।
>
> —'পারস্যযাত্রী', অধ্যায় ১, ১৯৩২ এপ্রিল ১৩

এই জাতীয় তর্কচাতুরী কবিকে যে কতদূর বিচলিত করেছিল, এখানে তা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। এই মন্তব্যের পূর্বেই 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) এবং পরে 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) উপন্যাসে কবি রাজনীতির ক্ষেত্রে এই ধরণের তত্ত্ব-ব্যাখ্যার

প্রয়োগ দেখিয়েছেন। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের ঝুটো দেশসেবী সন্দীপের শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ অমূল্য তাদের অন্যায় কাজের সমর্থনে বলে—

> গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আত্মাকে তো কেউ মারতে পারে না। কাউকে বধ করা, ও একটা কথা মাত্র। টাকা হরণ করাও সেইরকম একটা কথা। টাকা কার? ওকে কেউ সৃষ্টি করে না, ওকে কেউ সঙ্গে নিয়ে যায় না, ও তো কারও আত্মার অঙ্গ নয়।
>
> — ঘরে-বাইরে', বিমলার আত্মকথা

আর 'চার অধ্যায়'-এর বিপ্লবী নায়ক ইন্দ্রনাথ স্বদেশীয়ানার নামে মনুষ্যত্বকে বলি-দেওয়ার বিরুদ্ধ মনোভাবকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে উপদেশ দেয়—

> এই যে ধিক্কার এটাই কুরুক্ষেত্রের উপক্রমণিকা। অর্জুনের মনেও ক্ষোভ লেগেছিল ওই ঘৃণাটাই ঘৃণ্য।
>
> —'চার অধ্যায়', প্রথম অধ্যায়

এই ধরণের তর্কচাতুরী মানুষকে যে শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারে না, উক্ত উপন্যাস দুটির পরিণামে তা প্রকট হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে প্রয়োগের ক্ষেত্র বিচার করেই কবি 'আত্মার অবিনশ্বরত্ব'-ব্যাখ্যার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। • অন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রথম জীবনে অন্ততঃ তিনি যে আত্মাকে অজাত ও অমৃত বলেই মনে করতেন, তাঁর 'শান্তিনিকেতন' (১ম খণ্ড) গ্রন্থের স্বভাবকে লাভ (১৩১৫ চৈত্র ৫) ও আত্মার প্রকাশ (১৩১৫ চৈত্র ৮) প্রবন্ধ দুটিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, রবীন্দ্রনাথ গীতার অন্তর্নিহিত সত্য ইতিহাসটি তার শ্লোকগুলির থেকেই উদঘাটিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং তিনি যে সত্যে উপনীত হয়েছিলেন তা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের বিরোধী নয়। তবে গীতার ইতিহাস-উদ্ধার সম্বন্ধে কবির প্রয়াস এই পর্যন্তই। কারণ এই জাতীয় আলোচনা তাঁর অভিপ্রেত নয়।

খ. সমন্বয়তত্ত্ব

গীতায় রবীন্দ্রনাথ বহু পরস্পরবিরোধী ভাবের সংঘাত লক্ষ করেছিলেন। কিন্তু এই বিরুদ্ধ ভাবগুলিকে একত্রে বিধৃত করে গীতা যে ভারত ইতিহাসের মহত্তম অভিপ্রায়কে সফল করে তুলেছে এবং সেইখানেই যে গীতার চরমতম সার্থকতা সে কথাও রবীন্দ্রনাথ বারংবার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। তাই মহা-ভারতীয় সংস্কৃতির জগতে গীতার স্থান নির্ণয় করে তিনি বলেছেন—

আতস-কাচের একপিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর-এক পিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তিরশ্মি, মহাভারতেও তেমনি এক দিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আর-এক দিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি—সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্‌গীতা। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির যে সমন্বয়যোগ তাহাই সমস্ত ভারত-ইতিহাসের চরমতত্ত্ব। ···ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরমতত্ত্বকে দেখিয়াছিল। মানুষের ইতিহাসের জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম অনেক সময়ে স্বতন্ত্রভাবে, এমন-কি পরস্পর বিরুদ্ধভাবে আপনার পথে চলে; সেই বিরোধের বিপ্লব ভারতবর্ষে খুব করিয়াই ঘটিয়াছে বলিয়াই এক জায়গায় তাহার সমন্বয়টিকে স্পষ্ট করিয়া সে দেখিতে পাইয়াছে। মানুষের সকল চেষ্টাই কোনখানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। তাহাই গীতা।

—'ইতিহাস', ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ১৩১৯

এই বলে তিনি মন্তব্য করেছেন, গীতার মধ্যে যে সাংখ্য, বেদান্ত ও যোগকে একত্রে স্থান দেওয়া হয়েছে, য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মতে সেটা একটা অসংগত ও জোড়াতাড়া ব্যাপার। কিন্তু গীতাকে ঠিক সে দৃষ্টিতে বিচার করা চলে না। কারণ গীতা সংকলনের যুগে 'সমস্ত জাতির চিত্তকে সমগ্র করিয়া এক করিয়া দেখাই তখনকার সাধনা ছিল'। তাই গীতা মূলতঃ সাংখ্য ও যোগকে অবলম্বন করে উপদিষ্ট হলেও এতে বেদান্তের তত্ত্ব এসে মিলেছে, যাতে এই গ্রন্থ তত্ত্বের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে মানুষের কর্তব্য নির্দেশ করতে পারে। তাই কবির মতে—

মহাভারতের এই গীতার মধ্যে লজিকের ঐক্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ না থাকিতেও পারে কিন্তু তাহার মধ্যে বৃহৎ একটি জাতীয় জীবনের অনির্বচনীয় ঐক্যতত্ত্ব আছে। তাহার স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা, সংগতি ও অসংগতির মধ্যে গভীরতম এই একটি উপলব্ধি দেখা যায় যে, সমস্তকে লইয়াই সত্য।

—পূর্ববৎ

রবীন্দ্রনাথের এই একটিমাত্র মন্তব্যেই ভারতসংস্কৃতির ইতিহাসে গীতার মূল্য যথার্থভাবে নিরূপিত হয়েছে। গীতা সম্বন্ধে তাঁর এই অভিমত আজীবন অপরিবর্তিত ছিল। প্রথম জীবনে তিনি লিখেছিলেন—

ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা। ···এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন কেবল সমাজব্যবস্থায় নহে, ধর্মনীতিতেও দেখি। গীতায় জ্ঞান প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা

দেখি তাহা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের।

—'স্বদেশ', ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৩০৯ ভাদ্র

পরিণত বয়সেও তিনি ওই কথারই পুনরুক্তি করে বলেছেন—

একসময়, দেশের মনে নানা কালে নানা স্থানে যা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল তা সংগ্রহ করে, এক করে দেখাবার চেষ্টা, মহাভারতে খুব সুস্পষ্টভাবে জাগ্রত দেখি।… মহাভারতের মাঝখানে গীতা প্রাচীনের সেই সমন্বয়তত্ত্বকে উজ্জ্বল করে।

—'মহাত্মা গান্ধী', মহাত্মা গান্ধী ১৩৪৪ আশ্বিন

উপরের উদ্ধৃতি দুটির থেকে বোঝা গেল গীতার সমন্বয়তত্ত্বটি রবীন্দ্রমনকে কত গভীরভাবে অধিকার করে ছিল।

ভারতের এই মহান্ ঐক্যচেষ্টাকে রবীন্দ্রনাথ যে গীতার মূল লক্ষ্যরূপে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন সেটি নিছক কবিকল্পনা নয়। যে যুগে গীতা সংকলিত হয়েছিল, সেই যুগপরিবেশটি অনুধাবন করলেই রবীন্দ্রনাথের উক্তির সত্যতা বোঝা যাবে। গীতা রচনার কালে দেশে ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র শক্তির বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করেছিল, গীতার শ্লোকেই তার আভাস পাওয়া যায়। এই বিরোধ সম্বন্ধে কবির সচেতনতার পরিচয় পূর্বে দেওয়া হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবেই লিখেছেন—

That this religion of Yoga, as revived by Krishna and inculcated in the Bhagavad-Gītā, was not in harmony with Vedic scriptures is directly affirmed by the Master in his teaching to his disciple Arjuna when he says :

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥

When thy mind, bewildered by the scriptures, shall stand immovable in contemplation, then shalt thou attain unto Yoga.

—'A Vision of India's History' 1962, p 16

উক্ত গ্রন্থেই কবি গীতার যে-স্থলে 'ক্রিয়াবিশেষবহুল' যজ্ঞাদির কর্তা 'বেদবাদরতা'-দের বিশেষ নিন্দা আছে সেই শ্লোকগুলি (২।৪৩-৪৪) উদ্ধৃত করে বলেছেন—

These words are evidently of him, who in his teachings has for his opponents the orthodox multitude, the believers in Vedic texts.

—Ibid

অর্থাৎ সমাজ তখন বৈদিক ও অবৈদিক এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্বে লিপ্ত। পূর্বেই দেখা গেছে বৌদ্ধ উপদেশের বিকৃতি যখন দেশকে জড় ও নিষ্ক্রিয় করে তুলছিল, তখনই গীতা পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সুতরাং সেই যুগের সমাজ ব্রাহ্মণ্য, ক্ষাত্র ও বৌদ্ধ এই তিন সম্প্রদায়ের অভিঘাতে বিশ্লিষ্ট এবং বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম করছিল। সেই বিরোধবিক্ষুব্ধ সমাজকে এক সূত্রে গেঁথে তোলার জন্য সেদিন এমন একটি শাস্ত্রের প্রয়োজন হয়েছিল যা আর্য সমাজের চির-পুরাতন বাণীকেই বহন করবে অথচ যার সম্বন্ধে বিভিন্ন বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের কেউই কোনো তর্ক তুলতে পারবে না। বরং তা সকলকেই একত্রে সম্মিলিত করে দেবে। গীতা সংকলনের অন্তরালে এই মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। গীতার বাণীর মধ্যে তার প্রমাণ দেখা যায়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ঈশোপনিষদে পাই—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ৬

মানবপ্রেমিক বুদ্ধের বাণীতেও এই ভাবের কথা আছে।—

মাতা যথা নিযং পুত্তং আযুসা একপুত্তমনুরক্খে।
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং॥

— সুত্তনিপাত', করণীযমেত্ত সুত্ত ৭

আর গীতায় পাই—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ ৬।২৯

এখানে দেখি উপনিষদের বাণী ও বুদ্ধের উপদেশ গীতায় এসে কেমন অবিরোধে মিলে গেছে। সেই সঙ্গে 'সর্বভূতাত্মা'কে আপনার মধ্যে এবং আপনাকে 'সর্বভূতে'র মধ্যে দেখার যে অনুশাসনটি পাওয়া যাচ্ছে, তাতেও গীতার সমন্বয়-সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে 'সর্বভূতাত্মা'র কল্পনাটি কবিকে বিশেষভাবে অধিকার করেছিল। 'কালান্তর' গ্রন্থের অন্তর্গত কর্তার ইচ্ছায় কর্ম (১৩২৪ ভাদ্র), স্বাধিকার প্রমত্তঃ (১৩২৪ মাঘ) ও বৃহত্তর ভারত (১৩৩৪ শ্রাবণ) প্রবন্ধত্রয়ে তিনি এই বাণীর সামাজিক উপযোগিতার কথা স্মরণ করেছেন এবং 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে উক্ত শ্লোকের অন্তর্নিহিত দার্শনিক ভাবের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন।

গীতার মধ্যে এই সমন্বয়ের ভাবটি প্রচ্ছন্ন আছে বলেই প্রাচীন যুগের দ্বৈত-অদ্বৈত-দ্বৈতাদ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদী পণ্ডিতেরা এক গীতার মধ্যেই আপন আপন যুক্তির সমর্থন খুঁজে নিয়ে নিজেদের মত অনুযায়ী তার পৃথক্ পৃথক্ ভাষ্য রচনা

করেছিলেন। আধুনিক যুগেও তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নি। এই প্রসঙ্গে গীতা সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে।—

Even the leaders of thought and action of the present day—Tilak, Aurobinda Ghose, Gandhi—have written on it, each giving his own interpretation. Gandhiji bases his firm belief in non-violence on it, others justify violence and warfare for a righteous cause.

—'The Discovery of India' 1947 Ch. 4

মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু বা দার্শনিক পণ্ডিতেরা গীতাকে অবলম্বন করলেও গীতা কিন্তু মূলতঃ সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যেই উপদিষ্ট হয়েছিল। গীতার দুটি শ্লোকে তার স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে দেখি—

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০

উক্ত অধ্যায়েরই আর একটি শ্লোক হল—

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫

জনকাদি-প্রদর্শিত যে নিষ্কাম কর্মের আদর্শটি এখানে উক্ত হয়েছে, তার লক্ষ্য 'লোকসংগ্রহ' বা লোকসংহতি অর্থাৎ সমাজরক্ষা। গীতাকারের উপদেশ হল, বিদ্বৎ-মণ্ডলী যে অনাসক্ত কর্মের অনুষ্ঠান করবেন লোককল্যাণের আগ্রহই যেন তার প্রেরণা হয়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যেই গীতা সংকলিত হয়েছিল। তাই তার বাণীতে দেশের বৃহত্তর জনসাধারণকে উদ্‌বুদ্ধ করে তোলার প্রয়াস দেখা যায়। কারণ পূর্বেই দেখা গেছে স্বজনহননে বিমুখ, বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে উৎসাহদানের রূপকের আড়ালে যে সত্য প্রচ্ছন্ন আছে তা হল, বৌদ্ধধর্মের বিকৃতিতে জড়ভাবাপন্ন, কর্মবিমূঢ় জাতিকে নূতন উদ্দীপনায় জাগিয়ে তোলা।

ভারতীয় মনীষিবৃন্দ, যাঁরা যথার্থভাবে গীতার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তাঁরা গীতার এই লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করেন নি। জাতির সংকটের দিনে দেশবাসীর সম্মুখে তাঁরা গীতার আদর্শকেই বারংবার তুলে ধরেছেন। তাই আধুনিক ভারতের 'প্রথম জাগ্রত পুরুষ' রামমোহন অতীত ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারকল্পে মুখ্যতঃ উপনিষদের চর্চা করলেও গীতাকে বিস্মৃত হন নি। উচ্চস্তরের বিদ্বৎমণ্ডলীর জন্য তাঁর উপনিষদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ; আর সর্বসাধারণের চেতনাকে জাগ্রত করে তোলবার

জন্য তাঁর গীতার অনুবাদ। তাঁর উপনিষদের অনুবাদ গদ্যে, কিন্তু ব্যাপকতর প্রচারের জন্য তাঁর গীতার পদ্যানুবাদ।

পরবর্তী কালে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ও সমাজগঠনের প্রয়োজনে গীতাকে আশ্রয় করেন। তাই এক দিকে তিনি গীতার প্রচলিত অর্থের পুনর্বিচার ও তার সংস্কার করে 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা' নামক গ্রন্থ রচনার প্রয়াস পান; অন্য দিকে আনন্দমঠ, সীতারাম বিশেষতঃ দেবী চৌধুরাণীতে গীতার বাণীকে বাস্তবে রূপায়িত করে তাকে সর্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করেন।

রবীন্দ্রনাথও ওই একই উদ্দেশ্যে গীতার সমন্বয়ের আদর্শকে বারংবার স্মরণ করেছেন এবং গীতার এই আদর্শকে তিনি যত গভীরভাবে অনুভব করে সুস্পষ্টরূপে তাকে প্রকাশ করেছেন, আর কেউ তেমন করেছেন কি না সন্দেহ।

গ. স্বধর্মতত্ত্ব

সমগ্র গীতার ভাবধারার মধ্যে যে সমন্বয়তত্ত্বটি অনুস্যূত হয়ে আছে, তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা যেমন সুগভীর, তার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ তত্ত্বের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ তেমনি প্রবল। স্বধর্মতত্ত্ব তার অন্যতম। কয়েকটি নির্বাচিত শ্লোকখণ্ডে রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বের তাৎপর্য আবিষ্কার করে তাঁর রচনার বিভিন্ন প্রসঙ্গে পুনঃপুনঃ সেগুলিকে স্মরণ করেছেন। পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে তার পরিচয় আছে। এবার এই তত্ত্বটি রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কিভাবে প্রতিভাত হয়েছিল তা দেখা যাক।

গীতার একটি বিখ্যাত শ্লোকে পাই—

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ॥ ৩।৩৫

এটি কবির বিশেষ প্রিয় একটি শ্লোকখণ্ড। স্বধর্মজ্ঞাপক এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শংকরাচার্য-প্রমুখ সব ভাষ্যকারেরাই 'স্বধর্ম' শব্দের অর্থ করেছেন বর্ণাশ্রমশাসিত সমাজের ক্ষাত্রধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র স্বধর্মকে এই অর্থেই গ্রহণ করেছেন, শুধু উদারতর দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি 'বর্ণাশ্রম'কে আর্যসমাজ থেকে সমগ্র মানবজাতির পরিধিতে বিস্তৃত করে দিয়েছেন। জ্ঞানচর্চা, কৃষিশিল্প, সংরক্ষণ ও পরিচর্যা এই চারটি বৃত্তিতে মানুষকে ভাগ করে দিয়ে তিনি বলেছেন যে প্রত্যেকের পক্ষে স্ব স্ব বৃত্তিপালনই তার স্বধর্ম। ঐতিহাসিকেরা গীতার মধ্যে বৌদ্ধ-ভাগবত প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস লক্ষ করে 'স্বধর্ম' অর্থে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম ও 'পরধর্ম' বলতে বৌদ্ধধর্ম বুঝেছেন। তাঁদের মতে হিন্দুধর্মকে বৌদ্ধগ্রাসের কবল থেকে মুক্ত করার অভিপ্রায়েই এই শ্লোক রচিত হয়।[১]

১ দ্রষ্টব্য: অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন-রচিত 'ধর্মবিজয়ী অশোক' ১৩৫৪, ধর্মনীতির পরিণাম, পৃ ৯২

উপরের এই ব্যাখ্যাগুলি সবই বঙ্কিমকথিত 'বহির্বিষয়ক কর্ম-সংক্রান্ত'। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'স্বধর্ম'কে অন্তর্বিষয়ক করে নিয়েছেন। 'স্বধর্ম' বলতে তিনি মানুষের ব্যক্তিগত স্বভাবকে বুঝেছেন। তবে এই স্বধর্ম মানুষের জৈববৃত্তিকে ছাড়িয়ে গিয়ে পৌঁছেছে তার মনুষ্যত্বে। তাই কবির মতে একজন মানুষের সমগ্র সত্তা যে সত্যের সঙ্গে অবিরোধে মিলতে পারে সেইটাই তার স্বধর্ম। আর 'পরধর্ম' হল আপন স্বভাবকে অস্বীকার করে পরের অনুকরণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু রচনায় এইভাবেই শ্লোকটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই কবির ভাষ্যটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। ১৩০৯ সালে লেখা এক প্রবন্ধে কবি প্রথম এই শ্লোকটি স্মরণ করেন। সেখানে এশিয়ার প্রতি য়ুরোপের কঠোর ব্যবহার দেখে বিদেশী অনুকরণের বিরুদ্ধে দেশকে সচেতন করে তোলার জন্য তিনি বলেন—

> আত্মানং বিদ্ধি, আপনাকে জানো—ইহাই মুক্তির উপায়। পরধর্মো ভয়াবহঃ, পরের অনুকরণেই বিনাশ।
>
> —ভারতবর্ষ চীনেম্যানের চিঠি

এর প্রবন্ধ রচনার কিছুকাল পরে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে দেখি আধ্যাত্মিক ধর্মবুদ্ধির প্রসঙ্গে কবি এই শ্লোকটির নূতন অর্থ করেছেন। সেখানে শচীশ বলেছে—

> আর সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয় তবে তাহা মারে বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন, যদি তাঁকে পাই তো আমিই তাঁকে পাইব, নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।
>
> — চতুরঙ্গ ১৩২২ শ্রীবিলাস ২

এখানে উক্তিটি যদিও উপন্যাসের নায়কের তবু এই মনোভাব যে স্বয়ং কবিরও তাতে সন্দেহ নেই। কারণ পরবর্তী কালে তিনি রাজনীতি, সমাজনীতি এমন কি সাহিত্য-প্রসঙ্গেও উক্ত শ্লোকের এই জাতীয় ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। ১৩৩০ সালে কবি মানুষের অন্তর্নিহিত সৃষ্টিধর্মের ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন—

> মানুষ নিজের জগতে বিহার করতে না পারলে, পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হলে, তার আর দুঃখের অন্ত থাকে না। তাই তো কথা আছে: স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। আমার যা ধর্ম তাই আমার সৃষ্টির মূলশক্তি, আমিই স্বয়ং আমার আশ্রয়স্থল তৈরি করে তার মধ্যে বিরাজ করব।
>
> —'সাহিত্যের পথে', সভাপতির অভিভাষণ

পর বৎসরই (১৩৩১ ভাদ্র) কবি সাধারণ ব্যাবহারিক জগতের পরিপ্রেক্ষিতে এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে মন্তব্য করেন—

স্বধর্মে জগতে খুব মহৎ লোকেরও নিধন হয়েছে, কিন্তু সে নিধন বাইরের, স্বধর্ম ভিতরের দিক থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছে। আর এও দেখা গেছে, পরধর্মে খুব ক্ষুদ্র লোকেও হঠাৎ বড়ো হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার নিধন ভিতরের থেকে।

—'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৪ সেপ্টেম্বর ২৪

তাঁর শেষ জীবনের উপন্যাস 'চার অধ্যায়ে'ও (১৩৪১) নায়ক অতীন্দ্রের মুখে 'স্বধর্ম' অর্থে স্বভাব বা প্রকৃতির কথা শোনা গেছে। এইভাবেই কবি 'স্বধর্ম'-এর নূতন ভাষ্য করেছেন। সেইসঙ্গে বর্ণাশ্রম-অনুযায়ী স্বধর্মকে স্বীকার করার পক্ষেও তিনি বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করেছেন। আধ্যাত্মিক ধর্মের সঙ্গে জীবিকার কোনো যোগাযোগ তিনি মানতে পারেন নি। মানুষের ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী তার বৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত বলেই তিনি মনে করতেন। তার মতে বিশেষ বিশেষ বৃত্তিকে বংশানুক্রমিক ধারায় প্রবাহিত করে দিয়ে তাতেই সকলের জীবিকা নির্দেশ করা মানবতাবিরোধী কাজ। তাই 'কালান্তর' গ্রন্থের অন্তর্গত শূদ্রধর্ম প্রবন্ধে (১৩৩২ অগ্রহায়ণ) তিনি বলেছেন, আজ ভারতবর্ষে যারা শূদ্ররূপে দাসত্বে পাকা হয়ে উঠেছে, তারা তো স্বভাবতঃই দাস হয়ে জন্মায় নি। সেটা তাদের উপর বিশেষ পরিস্থিতিতে আরোপিত অভ্যাসেরই ফল। সেখানে নিত্যই তাদের স্বভাবকে হনন করা হচ্ছে। এই প্রবন্ধে কবি উক্ত শ্লোকাংশটি তিন বার উদ্ধৃত করেছেন। তার দ্বারাই এ বিষয়ে কবির মনোভাবের তীব্রতা ও প্রবল উত্তেজনা প্রকাশ পেয়েছে।

কবি যেমন বিভিন্ন বিষয় উপলক্ষে এই উদ্‌ধৃতিটি স্মরণ করেছেন, তেমনি তিনি ব্যক্তিগতভাবে আপন স্বধর্ম অনুসন্ধান করার জন্যও এই উদ্‌ধৃতিটি ব্যবহার করেছেন। 'পথে ও পথের প্রান্তে' (পত্র ১৩, ১৩৩৪ বৈশাখ ১) এবং 'কালান্তর' গ্রন্থে (কংগ্রেস ১৩৪৬ আষাঢ়) তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাতে 'স্বধর্ম' রক্ষার প্রতি কবির আন্তরিক আস্থার কথাটি ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে প্রসঙ্গের পরিবর্তন ঘটলেও বিভিন্ন সময়ে উদ্‌ধৃত এই শ্লোকের মূল অর্থটি কবির কাছে অপরিবর্তিতই থেকে গেছে।

এই 'স্বধর্ম' বা আপন সত্যধর্মের উপর কবির সুগভীর আস্থাটি গীতার অন্য একটি বাণীকে উপলক্ষ করেও প্রকাশ পেয়েছে। সেই শ্লোকখণ্ডটি হল—

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। ২।৪০

'এই ধর্মের স্বল্পমাত্র আশ্রয়ও মানুষকে মহৎ ভয় থেকে পরিত্রাণ করে'। এই বাণীটি আশাবাদী কবির মনোভাবের বিশেষ অনুকূল বলে তিনি পুনঃপুনঃ এটিকে স্মরণ করেছেন। কখনও ব্যক্তিমানুষের সুপ্ত আত্মশক্তিকে জাগ্রত করে তোলার জন্য

তিনি এই আশ্বাসবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, মানুষের অন্তর্লীন সত্য বাইরের সব বাধার চেয়ে বড়ো এবং সেই সত্যের সামান্য আশ্রয়ও মানুষকে মহা অধর্ম থেকে বাঁচাতে পারে ('সঞ্চয়', ধর্মের অধিকার ১৩১৮)। কখনও বা সমগ্র সমাজকে তিনি সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন—

> কোনো সমাজে সেই ধর্মকে যতক্ষণ সজীব দেখা যায় ততক্ষণ সেখানকার ভূরি-পরিমাণ দুর্গতির অপেক্ষাও তাহাকে বড়ো করিয়া জানিতে হইবে।
>
> —'পথের সঞ্চয়', যাত্রার পূর্বপত্র ১৩১৯ আষাঢ়

এর পরে 'কালান্তর' গ্রন্থের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতেও কবি অন্ততঃ চারবার (কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ১৩২৪ ভাদ্র, শক্তিপূজা ১৩২৬ কার্তিক, সত্যের আহ্বান ১৩২৮ কার্তিক, স্বরাজসাধন ১৩৩২ আশ্বিন) এই বাণী স্মরণ করেন এবং বলেন—'ধর্মকে পরিমাণের দ্বারা বিচার না করে তার উৎকর্ষের দ্বারা বিচার করাই শ্রেয়' (শক্তিপূজা), কারণ—'সত্যের জোর তার আয়তনে নয়, তার আপনাতেই' (স্বরাজসাধন)। গীতার এই বাণীটি মহর্ষিরও বিশেষ প্রিয়। তিনি তাঁর 'ভগবদগীতা বিষয়ে বক্তৃতা'তে এই শ্লোকটি দুবার উদধৃত করে মন্তব্য করেছিলেন—

> যে ব্যক্তি অল্প ধর্ম করিয়াছে তাহাকে গীতা উৎসাহপ্রদান দ্বারা ধর্মপথে আরও অগ্রসর হইতে আহ্বান করিতেছেন।
>
> —তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৯৯ শক জ্যৈষ্ঠ

তবে এই শ্লোকটিকে মহর্ষি যেখানে শুধুমাত্র নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিলেন, তাঁর পুত্র সেখানে তাকে দেশের মঙ্গলসাধনের ক্ষেত্রে নিয়ে গিয়েছেন। 'মানুষের ধর্ম' পর্যায়ে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ এই বাণীকে উপলক্ষ করে এক বৃহত্তর সত্যের উপলব্ধিতে উপনীত হন। সেখানে তিনি বলেন, ধর্ম বস্তুপুঞ্জমাত্র নয়। কাজেই 'উপকরণবতা জীবিতম্' এই বাণী জীবধর্মের পক্ষে প্রয়োজনীয় হলেও তা মানবধর্মের উপযোগী নয়। পক্ষান্তরে যা 'অপরিমেয়, অনির্বচনীয়, বাইরের দৃষ্টিতে যা স্বল্প, অন্তরে যা অসীম' তা ই হল মানবের চিরন্তন ধর্ম। এই ধর্মের আশ্রয় মানুষের পক্ষে যে কতদূর অপরিহার্য গীতার আর একটি বাণীর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ তা প্রতিপন্ন করে বলেছেন—

> মানুষের যে সংসার তার অহংএর ক্ষেত্র সে দিকে তার অহংকার ভূরিতায়, যে দিকে তার আত্মা সে দিকে তার সার্থকতা ভূমায়। এক দিকে তার গর্ব স্বার্থসিদ্ধিতে, আর এক দিকে তার গৌরব পরিপূর্ণতায়। সৌন্দর্য, কল্যাণ, বীর্য, ত্যাগ প্রকাশ করে মানুষের আত্মাকে, অতিক্রম করে প্রাকৃত মানুষকে, উপলব্ধি

করে জীবমানবের অন্তরতম বিশ্বমানবকে। যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।[১]

—'মানুষের ধর্ম', অধ্যায় ১

মানুষের অন্তর্লীন যে ধর্ম সে এই ভূমার—এই বিশ্বমানবেরই প্রয়াসী। তাকে লাভ করলে আর কোনো অভাবই থাকে না। তাকে লাভ করবার চেষ্টা করাই মানুষের স্বধর্ম বলে কবি মনে করেন। তাই গীতার স্বধর্মতত্ত্ব তাঁর চিত্তকে এমনভাবে অধিকার করেছিল।

'মানুষের ধর্ম' সম্বন্ধে চিন্তা করার পূর্বেই কিন্তু কবির মনে এই জাতীয় ভাবনা ছিল। তার একটি নিদর্শন এখানে উদ্‌ধৃত করা গেল। -

প্রাচীন ভারতে একটা জিনিস প্রচুর ছিল, সেটাকে আমরা খুব মহামূল্য বলেই জানি, সে হচ্ছে সত্যকে খুব বড়ো করে ধ্যান করবার এবং উপলব্ধি করবার মতো মনের উদার অবকাশ। ভারতবর্ষ এক দিন সুখ এবং দুঃখ, লাভ এবং অলাভের উপরকার সবচেয়ে বড়ো ফাঁকায় দাঁড়িয়ে সেই সত্যকেই সুস্পষ্ট করে দেখেছিল, যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

-- কালান্তর', বাতায়নিকের পত্র ১৩২৬ আষাঢ়

উপরের উদ্‌ধৃতি থেকে বোঝা গেল মানুষের জীবনের এই পরম সত্যকেই কবি মানুষের স্বধর্ম বলে মনে করেছেন এবং সেইজন্যই —

স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

ঘ. যজ্ঞতত্ত্ব

গীতার যজ্ঞতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের আর একটি প্রিয় প্রসঙ্গ। কবি তাঁর রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে নানা উপলক্ষে এটিকে স্মরণ করেছেন। তবে এ সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে তত্ত্বটির বিষয় সুস্পষ্টভাবে ধারণা করে নেওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর A Vision of India's History গ্রন্থে (1923) বলেছেন—

Krishna undoubtedly takes his stand against the traditional cult of sacrificial ceremonies, which according to him distracts our minds from the unity of realization when he speaks thus :

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥

১ দ্রষ্টব্য: গীতা ৬।২২

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥

'The flowery speech that the unwise utter, O Partha, clinging to the word of the Veda, saying there is nothing else, ensouled by desire and longing after heaven, the speech that offereth only rebirth as the ultimate fruit of action, that is full of recommendations to various rites for the sake of gaining enjoyments and sovereignty—the thoughts of those misled by that speech cleaving to pleasures and lordship, not being inspired with resolution, is not engaged in contemplation.'

— A Vision of Indian History, 19[illegible] p 16

এখানে গীতার এই শ্লোকগুলিতে (২।৪২-৪৪) স্পষ্টতঃই 'ক্রিয়াবিশেষবহুল' যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠাতা 'বেদবাদরতা'দের প্রতি গীতাকারের কটাক্ষ দেখতে পাওয়া যায়, কেননা তাঁর মতে এই জাতীয় কর্ম যোগসাধনার অন্তরায়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হল, গীতারই তৃতীয় অধ্যায়ের নবম শ্লোকে আছে—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩।৯

যজ্ঞার্থ কর্মব্যতীত অন্য কর্মে লোক কর্মে বদ্ধ হয়, হে কৌন্তেয় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে যজ্ঞার্থ কর্মের অনুষ্ঠান কর।

কৃষ্ণ এখানে স্পষ্ট ভাষায় যজ্ঞ করারই বিধি নির্দেশ করেছেন এবং উক্ত শ্লোকের পরবর্তী ছয়টি শ্লোকে (৩।১০-১৫) যজ্ঞের ফললাভের ব্যাখ্যা করেছেন। গীতার এই দুই পরস্পরবিরোধী উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়?

এটি গীতার একটি বহু আলোচিত সমস্যা এবং বিভিন্ন টীকাকার এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। শংকরাচার্য এবং তদনুসারী শ্রীধর স্বামী 'যজ্ঞ' অর্থে 'ঈশ্বর' বুঝেছেন। যুক্তিবাদী বঙ্কিমচন্দ্র বহু বিচারের পর শেষ পর্যন্ত এগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে সকাম নয় কিন্তু নিষ্কাম দেবপ্রীতির জন্যই যজ্ঞ করার নির্দেশ দিয়েছেন গীতা। এ ছাড়া কেউ কেউ বলেন,

জ্ঞানী যোগীদের পক্ষে যজ্ঞ নিষ্প্রয়োজন হলেও জনসাধারণের জন্য তা বিহিত এবং সেই উদ্দেশ্যেই গীতায় যজ্ঞের বিধি দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এক নূতন ব্যাখ্যায় এই দুই বিরুদ্ধ বাণীকে আশ্চর্যভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

> গীতায় যজ্ঞকেও সাধনাক্ষেত্রে স্থান দিযাছে। কিন্তু গীতায় যজ্ঞ-ব্যাপার এমন একটি বড়ো ভাব পাইয়াছে যাহাতে তাহার সংকীর্ণতা ঘুচিয়া সে একটি বিশ্বের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল ক্রিয়াকলাপে মানুষ আত্মশক্তির দ্বারা বিশ্বশক্তিকে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলে তাহাই মানুষের যজ্ঞ। গীতাকার যদি এখনকার কালের লোক হইতেন তবে সমস্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক অধ্যবসায়ের মধ্যে তিনি মানুষের সেই যজ্ঞকে দেখিতে পাইতেন। যেমন জ্ঞানের দ্বারা অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে যোগ, কর্মের দ্বারা অনন্ত মঙ্গলের সঙ্গে যোগ, ভক্তির দ্বারা অনন্ত ইচ্ছার সঙ্গে যোগ, তেমনি যজ্ঞের দ্বারা অনন্ত শক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ।
>
> —ইতিহাস', ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ১৩১০

এখানে যজ্ঞক্রিয়ায় মানুষের 'আত্মশক্তির দ্বারা বিশ্বশক্তি'কে উদবোধিত করে তোলার যে প্রয়াস বর্ণিত হয়েছে, ছান্দোগ্য উপনিষদের 'পুরুষযজ্ঞে' অনুরূপ ভাবের কথা পাই। সেখানে আছে—

> অথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি, তস্য সর্বেষু লোকেষু
> সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষু চাত্মসু হুতং ভবতি। ৫।২৪।২

> বৈশ্বানর পুরুষ বা পরম ব্রহ্মের স্বরূপ জেনে যজ্ঞে আহুতি দিলে তা নিষ্ফল হয় না—তাতে নিখিলের পরিতৃপ্তি।

এখানে 'সর্বভূত'-এর পরিতৃপ্তির যে ভাবটি আছে, কবি সেটি গীতাবর্ণিত যজ্ঞেও লক্ষ করেছেন। তাই এক স্থলে গীতোক্ত এই যজ্ঞের অর্থটি স্পষ্টতরূপে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন—

> মানুষের বিপুল চাওয়া ক্ষুদ্র-নিজের জন্যে হলে তাতেই যত অশান্তির সৃষ্টি। যেখানে তার সাধনা সকলের জন্যে সেইখানেই মানুষের আকাঙ্ক্ষা কৃতার্থ হয়। এই সাধনাকেই গীতা যজ্ঞ বলেছেন, এই যজ্ঞের দ্বারাই লোকরক্ষা।
>
> —'জাভা যাত্রীর পত্র', পত্র ১, ১৩৩৪ শ্রাবণ

কবির এই ব্যাখ্যায় যজ্ঞ-এর অন্তর্নিহিত যে লোকরক্ষার উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত হয়েছে তা গীতার 'লোকসংগ্রহ'-এর (৩।২০ ও ৩।২৫) অভিপ্রায়ের সঙ্গে স্বাভাবিক ও সুসংগতভাবেই মিলে গেছে। পরবর্তী কালেও কবি বহুবার বিভিন্ন প্রসঙ্গে গীতার 'যজ্ঞ'কে স্মরণ করেছেন। হিবার্ট বক্তৃতায় কবি বিদেশীদের কাছে যজ্ঞের তাৎপর্য ব্যাখ্যা

করে বলেন—

> Zarathustra spiritualized the meaning of sacrifice, which in former days consisted in external ritualism entailing blood-shed. The same thing we find in the Gita, in which the meaning of the word *Yajna* has been translated into a higher significance than it had in its crude form.
>
> — The Religion of Man' Ch V : The Prophet.

এই বলে তিনি মন্তব্য করেছেন যে গীতার মতে 'giving up of self is the true sacrifice'। এখানে ধর্ম-আলোচনার প্রসঙ্গে কবি যজ্ঞকে দার্শনিক দিক্ থেকে দেখে 'ব্রহ্মে'র সঙ্গে তার সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন। তবে তাতেও তাঁর মূল বক্তব্য অপরিবর্তিতই থেকেছে।

এর কিছুদিন পরে দেখি যজ্ঞকে কবি দার্শনিক ভাবের আকাশ থেকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে এনে তাকে সমাজকল্যাণের প্রসঙ্গে পুনবায় স্মরণ করেছেন। সেখানে তিনি বেদবিহিত যজ্ঞের তুলনায় গীতার যজ্ঞের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করে বলেছেন—

> দ্রব্যময় যজ্ঞে মানুষ শুধু নিজের সিদ্ধি খোঁজে, জ্ঞানযজ্ঞে সকলেরই আসন পাতা হল, সমস্ত মানুষের মুক্তির আয়োজন সেইখানে।
>
> —'কালান্তর', নবযুগ ১৩৩৯ পৌষ

গীতাতেই আছে—'শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ (৪।৩৩)। নবযুগের নূতন প্রজন্মকে মানবকল্যাণের ব্রতে দীক্ষিত করবার অভিপ্রায়ে কবি এই বাণী স্মরণ করে তার উক্তরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার কয়েক মাস পরে কমলা বক্তৃতামালায় (১৯৩৩) তিনি বৈদিক যজ্ঞের সঙ্গে গীতার যজ্ঞের ধারাবাহিকতা দেখিয়ে বলেন—

> ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষের আত্মোপলব্ধি বাহির থেকে অন্তরের দিকে আপনিই গিয়েছে, যে অন্তরের দিকে তার বিশ্বজনীনতা।…সফলতালাভের জন্যে সে মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকর্ম নিয়ে বাহ্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছিল—অবশেষে সার্থকতালাভের জন্যে একদিন সে বললে, তপস্যা বাহ্যানুষ্ঠানে নয়, সত্যই তপস্যা, গীতার ভাষায় ঘোষণা করলে, দ্রব্যময় যজ্ঞের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়। ‥তখন মানবের রুদ্ধমনে বিশ্বমানব-চিত্তের উদ্‌বোধন হল।
>
> —'মানুষের ধর্ম', অধ্যায় ১

কবি দেখালেন বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণের যুগে যে জটিল ক্রিয়াবিধির যজ্ঞ ছিল, উপনিষদের যুগে তা 'পুরুষযজ্ঞে'র মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে গীতায় জ্ঞানযজ্ঞের রূপ

নিয়েছে। এই জ্ঞানযজ্ঞে যখন মানুষ বিশ্বের সকল মানুষের আত্মীয় হয়ে উঠতে পারল তখনই সে পৌঁছল তার সত্যবোধের চরম উপলব্ধিতে।

এই উচ্চ ভাবের বাণীটি কবি নিছক তত্ত্বকথা রূপে দেখেন নি, তিনি তাকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। তাই ব্যক্তিগত জীবনে এই বাণীর ব্যাবহারিক উপযোগিতার কথা জানিয়ে হেমন্তবালা দেবীকে কবি এক পত্রে লেখেন—

> ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ··যজ্ঞকে·· বাহ্য উপকরণগত না বলে বলেছেন আন্তরিক। সত্যই যজ্ঞ, দান যজ্ঞ, জীবে দয়া যজ্ঞ, সর্ব মানুষে মৈত্রী যজ্ঞ।
>
> —'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৮৭, ১৯৩৫ অকটোবর ১৯

এইভাবেই তিনি গীতার 'যজ্ঞ'কে বৈদিক কর্মকাণ্ডের থেকে বহু দূরে সম্প্রসারিত করে তাকে স্ফুটতর রূপ দিয়েছেন।

৬. নিষ্কামকর্মের তত্ত্ব

গীতার 'যজ্ঞতত্ত্ব' দীর্ঘ দিন ধরে রবীন্দ্রচিত্তকে যে এমনভাবে অধিকার করেছিল, তার কারণ তার মধ্যে কবি গীতার মর্মবাণীটি অনুস্যূত দেখেছিলেন। সেটি হল তার নিষ্কাম কর্মবাদের তত্ত্ব। পূর্বে উদ্‌ধৃত 'জাভা-যাত্রীর পত্রে'ই তিনি বলেছিলেন—'এই যজ্ঞের পন্থা হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম' (পত্র ১)। এবার এই নিষ্কাম কর্মবাদের প্রসিদ্ধ তত্ত্বটি রবীন্দ্রপ্রতিভার জ্যোতিতে কিভাবে উদ্‌ভাসিত হয়েছিল, তা দেখা যাক। তার দ্বারা গীতার প্রতি তাঁর দৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের আরও কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে।

গীতার এই নিষ্কাম কর্মবাদের গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত এবং অধিকাংশের মতে এটিই গীতার মূল বাণী। এই বিখ্যাত বাণীটির পূর্ণ রূপ হল—

> কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
> মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ২।৪৭

> কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মের ফলে কদাচ নয়। কর্মফলের কামনাই যেন তোমার কর্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয়, অকর্মেও তোমার আসক্তি না হক।

অর্থাৎ কর্ম তোমার অবশ্যই করণীয়, কিন্তু ফলকামনার প্ররোচনায় নয়। পক্ষান্তরে ফলকামনাত্যাগহেতু কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় কত বার যে এই শ্লোকটি স্মরণ বা উদ্‌ধৃত করেছেন, পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে তার পরিচয় আছে। তবে তিনি বারংবার শ্লোকটির প্রথমাংশই উদ্‌ধৃত করেছেন, তার দ্বিতীয়াংশ উদ্‌ধৃত করেন নি। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যায় দ্বিতীয়াংশের তাৎপর্যটিও সর্বদাই অনুস্যূত থেকে গেছে। তিনি কখনও তাঁর বক্তব্যকে

চিরন্তনতার ভিত্তিভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, কখনও বা গীতার মর্মগত এই শ্লোকের সাহায্যে ভারতীয় চিত্তসংস্কৃতিকে নূতন মহিমায় উজ্জীবিত করে তোলার জন্য এটিকে স্মরণ করেন। আর এর দ্বারা তিনি যে সব সময় তত্ত্ব ব্যাখ্যাই করেছেন, তা নয়। জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই তিনি তাকে প্রয়োগ করেছেন। রাজনীতি সমাজনীতিও তার থেকে বাদ যায় নি। ব্যক্তিগত চিঠিপত্র থেকেও বোঝা যায় এই বাণীটি কবি সমস্ত অন্তর দিয়েই গ্রহণ করেছিলেন এবং তার প্রেরণাকে অন্যের অন্তরে সঞ্চার করতেও নিরন্তর চেষ্টিত ছিলেন। এবার গীতার এই বাণীর অর্থ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা যাক।

এই বাণীর এক দিকে এই উপদেশ—'কর্মেই তোমার অধিকার' অর্থাৎ কর্ম তোমার করণীয় এবং অন্য দিকে নিষেধাজ্ঞা—'কর্মের ফল কামনা করো না, অকর্মেও আসক্ত হয়ো না'। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কর্মের ফলভোগের কামনাই সাধারণতঃ মানুষের কর্ম-প্রচেষ্টার মূলে শক্তি সঞ্চার করে থাকে। সেই ফলকামনাকেই যদি বর্জন করা হয় তা হলে মানুষের কর্মপ্রেরণার উৎসধারাই কি শুকিয়ে যায় না? 'কর্মেই তোমার অধিকার, তার ফলভোগে নয়'—এই নিরাসক্ত ও নীরস কর্তব্যবুদ্ধির মধ্যে প্রেরণার বেগ কোথায়? ফলে মানুষের প্রবৃত্তি আকৃষ্ট হবে অকর্মের দিকেই। কিন্তু ওদিকেও নিষেধাজ্ঞা উদ্যত হয়ে আছে—'মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি', অকর্মেও যেন তোমার আসক্তি না হয়। সুতরাং সাধারণ মানুষের পক্ষে গীতার এই উপদেশ বিশেষ সমস্যারই সৃষ্টি করে। উক্ত শ্লোকে এই সমস্যা নিরসনের কোনো উপায় নির্দেশ করা হয় নি। এইখানেই শ্লোকটির দুর্বলতা

বস্তুতঃ নিষ্কাম কর্মের আদর্শ একটি নিষেধাত্মক বা অভাবাত্মক আদর্শ। এরকম আদর্শ জীবনের কাজে লাগে না। তার জন্য চাই সদভাবাত্মক বা প্রেরণাত্মক আদর্শ। পূর্বে উদধৃত 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং' ইত্যাদি শ্লোকে (২।৩৭) যেখানে অর্জুনকে পাপ বা লোকনিন্দার ভয়ে অন্যথায় রাজ্য বা স্বর্গপ্রাপ্তির লোভে কর্মে প্রবৃত্ত হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে সে নির্দেশ প্রেরণাত্মক হলেও নিষ্কাম হয় নি। তার পরবর্তী শ্লোকে (২।৩৮) সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়াজয়কে সমভাবে গ্রহণ করার যে নির্দেশ পাওয়া যায়, তা নিষ্কাম হলেও প্রেরণাত্মক নয়। কিন্তু পূর্বে উদ্ধৃত আর একটি শ্লোকে (৩।৩৫) এই দুই ভাবের সমন্বয় দেখা যায়। সেখানে বলা হয়েছে, অবিদ্বানেরা ফলকামনার বশবর্তী হয়ে যেভাবে কাজ করে বিদ্বানেরা ফলভোগের কামনা ত্যাগ করে শুধুমাত্র লোককল্যাণের আগ্রহে সেভাবেই কাজ করেন। 'চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্'—লোককল্যাণের আগ্রহ—এই উক্তিটুকুর মধ্যেই নিষ্কাম কর্মের প্রেরণাটি নিহিত আছে। এই যে লোককল্যাণের আগ্রহ, তারই অপর নাম প্রেম।

সুতরাং আদর্শ কর্ম শুধু নিষ্কাম নয় সপ্রেমও বটে।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, লোকহিতের আকাঙ্ক্ষাও তো ফলাকাঙ্ক্ষা। কিন্তু একান্তভাবে ফলকামনাহীন হয়ে কর্ম করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; তা মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। বেগহীন গতি যেমন অসম্ভব, প্রেরণাহীন কর্মও তেমনি অসম্ভব। ফলকামনাই সেই প্রেরণা। বস্তুতঃ সর্বপ্রকার ফলকামনাত্যাগের নির্দেশ গীতার অভিপ্রেত নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধিপ্রসূত ফলকামনাত্যাগই গীতার লক্ষ্য, লোকহিতসাধনের ফলত্যাগ নয়। কারণ সমগ্র গীতায় অর্জুনকে যে কর্মপ্রবর্তনা দেওয়া হয়েছে তা জনকল্যাণ-সাধনেরই অভিপ্রায়ে। সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থসাধনের আকাঙ্ক্ষার নামই কাম, আর নিঃস্বার্থ পরকল্যাণসাধনের যে আকাঙ্ক্ষা তাই হল প্রেম। সুতরাং নিষ্কাম কর্ম নিঃস্বার্থ কর্মেরই নামান্তর। আর প্রেমহীন নিঃস্বার্থ কর্ম যে সম্ভব নয়, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং সমগ্রভাবে গ্রহণ করলে গীতার মূল অভিপ্রায় যে স্বার্থবুদ্ধিহীন জনকল্যাণকর সপ্রেম কর্মের প্রবর্তনাদান, সে বিষয়ে বোধ করি সন্দেহের অবকাশ নেই।

গীতার উক্ত শ্লোকটি ভাবের দিক্ থেকে অপূর্ণ হলেও যেসব মনীষী নিষ্কাম কর্মবাদের ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের অনেকেই এই বাণীর অন্তর্নিহিত লোককল্যাণের ভাবটি অনুভব করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা' গ্রন্থে (প্রচার ১২৯৩-৯৫) নিষ্কাম কর্মের সংজ্ঞা দিয়ে বলেন—

> ইহার ভিতর দুইটি আজ্ঞা আছে—প্রথম, কর্ম করিতে হইবে। দ্বিতীয়, সকল কর্ম নিষ্কাম হইয়া করিতে হইবে।

আর এই কর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলেন—

> যাহাকে সৎকর্ম বলি, আর যাহাকে সদসৎ কিছুই বলি না, অথচ করিতে বাধ্য হই, · এই দুইকে আমি ধর্মতত্ত্বে অনুষ্ঠেয় কর্ম বলিয়াছি।

তিনি এই অনুষ্ঠেয় কর্মের উদাহরণস্বরূপ 'পরোপকার' কর্মের কথা বলেছেন এবং মন্তব্য করেছেন, যারা প্রত্যুপকারের আশায়, পুণ্য বা স্বর্গের লোভে কিংবা ঈশ্বরের কৃপালাভের উদ্দেশ্যে পরোপকার করে তারা সকাম কর্মী। কিন্তু—

> নিষ্কামকর্মী তাহাও চাহে না, কিছুই চাহে না, কেবল আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম করিতে চাহে। পরোপকার আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম—এই জন্য আমি করিব, কোনো ফলই চাই না। ইহা নিষ্কাম চিত্তভাব।

—'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা', দ্বিতীয়োঽধ্যায়,[১]

---

১ দ্রষ্টব্য: 'বঙ্কিম-রচনাবলী' ২য় খণ্ড ১৩৬৬: সাহিত্য সংসদ, পৃ৭৩৭

তবে এই ব্যাখ্যার পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে (১২৯১) নায়িকা নিষ্কামকর্মব্রতী প্রফুল্লের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন—

প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম অভ্যাস করিয়াছিল।...তার কোন কামনা ছিল না—কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা।

—'দেবী চৌধুরাণী', তৃতীয় খণ্ড : চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র নিষ্কাম কর্মের অর্থ বুঝেছিলেন জনহিতকর কার্য। তবে এই লোকহিতৈষণার পশ্চাতে তিনি শুধু শুষ্ক নৈতিক কর্তব্যেরই তাগিদ অনুভব করেছিলেন। তাঁর মতে 'পরোপকার' নিষ্কাম কর্মীর অনুষ্ঠেয় কর্ম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিষ্কাম কর্মকে—জনহিতকর ব্রতকে কর্তব্যবুদ্ধির নীরসতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন প্রেমে। তাঁর মতে লোকসাধারণের প্রতি প্রেম থেকেই আসে লোককল্যাণের আগ্রহ। সেই আন্তরিক আগ্রহের প্রেরণায় যে কাজ হয় তা নিষ্কাম হয়েও নীরস হয় না; তার থেকে উচ্ছলিত হয় আনন্দ। এই আনন্দেই কর্মের চরম সার্থকতা। মানুষ যখন ফলকামনার পরিবর্তে, কর্তব্যবুদ্ধির পরিবর্তে প্রেমের প্রেরণায় চালিত হয়ে কর্ম করে, তখন সেই কর্মের মধ্যে বন্ধনের দুঃখ থাকে না, থাকে মুক্তির আনন্দ। তখন সে সমস্ত ত্যাগস্বীকার, দুঃখবরণ এমন কি মৃত্যুবরণের মধ্যেও পায় চরিতার্থতার পরম তৃপ্তি। তাই কবির মতে প্রেম ও আনন্দের মধ্যেই নিষ্কাম কর্মের যথার্থ প্রেরণাশক্তি নিহিত আছে।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর প্রথম জীবনেই এই জাতীয় উপলব্ধিতে পৌঁছতে পেরে-ছিলেন তা বলা যায় না। ১৮৯৪ অক্টোবর ২৫ তারিখে ইন্দিরা দেবীকে লেখা এক পত্রে ('ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১৬৯) প্রথম কবিকে এই বাণী স্মরণ করতে দেখি, কিন্তু তার কোনো ব্যাখ্যা পাই না। তিনি প্রথম তার যে ব্যাখ্যা দেন তা হল—

ফলের আকাঙ্ক্ষা উপড়াইয়া ফেলিলে কর্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হয়। এই উপায়ে মানুষ কর্মের উপরেও নিজেকে জাগ্রত করিবার অবকাশ পায়।

—'ভারতবর্ষ', নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ

দেশহিতের প্রসঙ্গেও এই বাণী স্মরণ করে কবি বলেন যে কর্মের—

ফল লক্ষ্য নহে, ধর্মই লক্ষ্য।...দেশের হিতসাধনের জন্য আমরা প্রাণ সমর্পণ করিব, কেননা সেইরূপ মঙ্গলের জন্য প্রাণ সমর্পণ করাই ধর্ম; কিন্তু কোনো ফল—সে ফলকে ইতিহাসে যত লোভনীয় বলিয়াই প্রচার করুক-না—সেরূপ কোনো ফললাভ করিবার জন্য ধর্মকে বিসর্জন দিব এরূপ নাস্তিকতাকে প্রশ্রয়

দিলে রক্ষা পাইব না।

—'সমূহ', পরিশিষ্ট : দেশহিত ১৩১৫ আশ্বিন

উপরের উদ্ধৃতি দুটিতে দেখা গেল, ফললোভের দাসত্ব থেকে কর্মকে মুক্ত করে আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে অথবা ধর্মবুদ্ধির তাগিদে কর্ম করার কথা বলা হয়েছে, যেমনভাবে বঙ্কিমচন্দ্র কর্তব্যবোধের অনুরোধে কর্ম করার বিধান দিয়েছিলেন। এর পরে রবীন্দ্রনাথ একাধিক প্রবন্ধে এই বাণী উদ্ধৃত বা স্মরণ করলেও তাঁর ব্যাখ্যা এর বেশি অগ্রসর হয় নি। ১৯১৩ সালে এ বিষয়ে তাঁর এক নূতন উপলব্ধি দেখা গেল। তখন তিনি বললেন—

Working for love is freedom in action. This is the meaning of the teaching of disinterested work in the Gītā··

The Gītā says action we must have, for only in action do we manifest our nature. But this manifestation is not perfect so long as our action is not free. In fact our nature is obscured by work done by compulsion of want or fear. The mother reveals herself in the service of her children, so our true freedom is not the *freedom from action* but *freedom in action*, which can only be attained in the work of love. (বক্রলিপি লেখিকার)

—'Sadhana', The Problem of self

এর পর 'জাভা-যাত্রীর পত্রে' এই অর্থটিই স্ফুটতর রূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে—

গীতা বলেছেন, 'কর্ম করো, ফল চেয়ো না'। এই চাওয়ার বাহুটাই কর্মের পাত্র থেকে তার অমৃত ঢেলে নেবার জন্য লালায়িত।·· ফল-চাওয়া কর্মের নাম চাকরি, সেই চাকরির মনিব আমি নিজেই হই বা অন্যেই হোক।···কাজ তার নিজের ভিতর থেকে নিজে যখন কিছুই রস জোগায় না, সম্পূর্ণ বাইরে থেকেই যখন আপন দাম নেয়, তখনই মানুষকে সে অপমান করে।···

যে সমাজ লোভে বা দাম্ভিকতায় মানুষের প্রতি দরদ হারায় নি সে সমাজ ভৃত্য আর আত্মীয়ের সীমারেখাটাকে যতদূর সম্ভব ফিকে করে দেয়। ভৃত্য সেখানে দাদা খুড়ো জেঠার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছয়। তখন তার কাজটা পরের কাজ না হয়ে আপনারই কাজ হয়ে ওঠে। তখন তার কাজের ফলকামনাটা যায় যথাসম্ভব ঘুচে। সে দাম পায় বটে, তবুও আপনার কাজ সে দান করে, বিক্রি

করে না। গুজরাটে কাঠিয়াবাড়ে দেখেছি, গোয়ালা গরুকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। সেখানে তার দুধের ব্যবসায়ে ফলকামনাকে তুচ্ছ করে দিয়েছে তার ভালোবাসায়, কর্ম করেও কর্ম থেকে তার নিত্য মুক্তি। এ গোয়ালা শূদ্র নয়। যে কর্মের অন্তরে মুক্তি নেই, যেহেতু তাতে কেবল লোভ, তাতে প্রেমের অভাব, সেই কর্মেই শূদ্রত্ব।

—'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ৫, ১৯২৭ জুলাই ২৮

নিষ্কাম কর্মবাদের এর চেয়ে সুন্দরতর ও মহত্তর ব্যাখ্যা আর কারও রচনায় আছে কি না জানি না।

গীতার যে শ্লোকগুলির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব রবীন্দ্রচিন্তায় বিশেষ ভাবে প্রাধান্য পেয়েছিল বর্তমান প্রবন্ধে শুধু সেই শ্লোকগুলিই বিশ্লেষিত হয়েছে। বাহুল্য ভয়ে অন্য উদ্ধৃতিগুলির আলোচনা করা গেল না। তবে পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগটিতে দেখা যাবে, গীতার প্রায় অধিকাংশ অধ্যায় থেকেই কবি তাঁর রচনায় উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। তার থেকে বোঝা যায়, গীতার নির্বাচিত শ্লোকগুলির মধ্যেই তাঁর গীতাধ্যয়ন সীমাবদ্ধ থাকে নি, সমগ্র গীতাকেই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধিগত করে নিয়েছিলেন।

উপসংহার

এতক্ষণের আলোচনায় দেখা গেল রবীন্দ্রসাহিত্যে গীতা উপেক্ষিত তো নয়ই, বরং তার গুরুত্ব সমধিক। ব্যক্তিগতভাবেও তিনি যে গীতার প্রতি উদাসীন ছিলেন না এবং স্বয়ং তার উপদেশ স্মরণ ও অন্যকে তা অনুসরণ করতে প্রণোদিত করেছেন তাঁর চিঠিপত্রগুলিই সে পরিচয় বহন করে। তবে তিনি তাঁর অধিকাংশ পূর্বগামীর মতো গীতাকে অভ্রান্ত বলে মেনে নেন নি। যে বাণীগুলিতে কবি তাঁর অন্তরের সায় পেয়েছেন অথবা যার থেকে তিনি প্রেরণালাভ করেছেন, প্রধানতঃ সেগুলিকে নির্বাচন ও প্রয়োজনমতো তার অর্থকে সম্প্রসারিত করে তিনি তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন। তাই অন্যান্য ভাষ্যকারদের মতো গীতার বাণী নিয়ে তিনি দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বজাল বিস্তার না করে তাকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছিলেন।

গীতা সম্বন্ধে নির্বাচনী মনোভাব থাকা সত্ত্বেও সমগ্র গীতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অভাব কখনও ঘটে নি। গীতার যে অসাধারণ ঐক্যশক্তি সংকীর্ণ দেশকালের ঊর্ধ্বে উঠে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সমস্ত বিরুদ্ধতাকে আত্মসাৎ করে সমগ্র ভারতবর্ষের হৃদয়কে একসূত্রে বিধৃত করে রেখেছে, রবীন্দ্রনাথ তাকে বারংবার অভিনন্দিত করেছেন।

সেইজন্যই গ্রন্থ হিসাবে গীতাকে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখে এবং বিচার করেও তিনি তার অন্তরালে যুগসঞ্চিত ভক্তিতে পূর্ণ ভারত-হৃদয়কেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তাঁকে বলতে হয়েছিল—

ভগবদ্‌গীতা আজও পুরাতন হয় নি, হয়তো কোনোকালেই পুরাতন হবে না।

—'সাহিত্যের স্বরূপ', সাহিত্যের মাত্রা ১৩৪০

এইটিই গীতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শেষ কথা।

ধর্মশাস্ত্র

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক্ নিয়মিত হয় যেসব নীতির দ্বারা, তারই সাধারণ নাম ধর্ম। ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলি এই নীতিসমূহের সংকলন। এই ধর্মশাস্ত্রগুলি মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণ্য আদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ গৌরবের যুগ অবসিত হওয়ার পর সনাতন হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টায় এই শাস্ত্রসংহিতাগুলির বিশেষ প্রসার দেখা যায়। তাই এগুলিতে মানবের চিরন্তন নিত্য ধর্ম অর্থাৎ সর্বাংগীণ মনুষ্যত্ব-ধর্মের সঙ্গে বিশেষ দেশকালের প্রয়োজনে রচিত নৈমিত্তিক ধর্ম অর্থাৎ দেশাচারের নিয়মবিধি মিশ্রিত দেখি। সংহিতাগুলির আলোচনা কালে এই ঐতিহাসিক সত্যটি আমাদের মনে রাখতে হবে।

ধর্মশাস্ত্রবিহিত ও ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজব্যবস্থা একদিন ভারতবর্ষকে যে একাগ্রভাবে অধিকার করেছিল, রামায়ণের উত্তরকাণ্ড বা কালিদাসের রঘুবংশ কাব্য তার অভ্রান্ত নিদর্শন। স্মৃতিশাস্ত্রের এক অখণ্ড প্রতাপ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় অব্যাহত ছিল; আজকের হিন্দুসমাজও তার থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নবজাগ্রত বাংলাদেশও এই শাস্ত্রকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারে নি; বরং তার সঙ্গে একটা আপোষ-মীমাংসাই করে নিয়েছিল। তাই ধর্ম বা সমাজের সংস্কার করতে গিয়ে মুক্তবুদ্ধি রামমোহন বা বিদ্যাসাগরকেও জনমতের আনুকূল্য লাভের চেষ্টায় শাস্ত্রবিধির সমর্থন খুঁজতে হয়েছিল। পরবর্তী কালেও বিদেশী শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে মুগ্ধ জাতিকে ঐতিহ্যসচেতন করার জন্য যাঁরা পূর্বতন হিন্দুসংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী ছিলেন, সেই সব রক্ষণশীল ব্যক্তিরা এই প্রাচীন শাস্ত্রসংহিতাগুলিকেই অবলম্বন করেছিলেন। এমন কি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব প্রভৃতি মনীষীরাও এই সংহিতাগুলিকে অবজ্ঞা করতে পারেন নি। তবে তাঁরা তাঁদের সচেতন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে মানবধর্মের শাশ্বত সত্য বাণীগুলিই গ্রহণ করেছিলেন এবং সংকীর্ণ লোকাচারগুলি বর্জন করেছিলেন। কিন্তু প্রগতিবিমুখ গোঁড়া হিন্দুরূপে শশধর তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সংহিতাবিহিত সমস্ত বিধিই অল্পাধিক নির্বিচারে গ্রহণ করতে উৎসুক হয়েছিলেন। মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র অনেকাংশে প্রাচীন রীতিনীতির সমর্থক হলেও শশধর তর্কচূড়ামণির মতো সেগুলিকে নির্বিচারে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁকে বলতে হয়েছিল, হিন্দুর আচরণীয় সব সংস্কারই বিশেষ তাৎপর্যবহ নয়। তার অনেকগুলিই—

মূর্খের আচার মাত্র। যদি ইহা হিন্দুধর্ম হয়, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমরা হিন্দুধর্মের পুনর্জীবন চাহি না।

— 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম', হিন্দু ধর্ম ১২৯২ শ্রাবণ[১]

এর থেকে বোঝা যায়, যুক্তি ও বুদ্ধির নিরিখে যাচাই করে তিনি শাস্ত্রবিধিগুলি অংশতঃ গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্রগুলির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও অনেকটা অনুরূপ মত পোষণ করতেন অর্থাৎ তিনিও বিচার-বিবেচনাপূর্বক শাস্ত্রবিধিগুলিকে গ্রহণ বা বর্জন করবার পক্ষপাতী ছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের যথার্থ স্বরূপ কি এ স্থলে আমরা প্রমাণ উদ্ধৃতি -সহ তা দেখাতে চেষ্টা করব।

ভারতবর্ষে মনুসংহিতা প্রভৃতি অনেকগুলি ধর্মশাস্ত্র প্রামাণিক বলে স্বীকৃত। তার মধ্যে মনুসংহিতা এবং দক্ষ, শঙ্খ, পরাশর, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ ও আপস্তম্ব এই ছয়খানি সংহিতা থেকে রবীন্দ্রসাহিত্যে উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। অতঃপর একে একে এগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

মনুসংহিতা

ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে মানবধর্মশাস্ত্র বা মনুসংহিতার গুরুত্ব সর্বাধিক। মহর্ষি-সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে স্মৃতিশাস্ত্র থেকে যেসব শ্লোক সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে মনুসংহিতার বহু শ্লোকই স্থান পেয়েছে। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থে ধৃত শ্লোক-গুলির দ্বারাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মনুসংহিতার প্রথম পরিচয়। আর শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি যে এই বাল্যপরিচয়ের স্মৃতি বহন করেছিলেন, তাঁর সাহিত্যের সর্বত্র এই শ্লোক-গুলির পৌনঃপুনিক উদ্ধৃতি ও তার প্রসঙ্গ-উল্লেখই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এ ছাড়া বিধুশেখর শাস্ত্রীর অনুরোধে কবি এই গ্রন্থের অন্তর্গত তিনটি শ্লোকের (৪।১৭২-৭৪) অনুবাদ করেন। এর থেকে বোঝা যায় যে মনুসংহিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের অভাব ছিল না। তবে এই শাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব অন্যদের তুলনায় স্বতন্ত্র।

প্রথম জীবনে কবি এক সময়ে বলেছিলেন, 'সাহেবি অনুকরণ আমাদের পক্ষে নিষ্ফল এবং হিঁদুয়ানির গোঁড়ামি আমাদের পক্ষে মৃত্যু' ('সমাজ', হিন্দুর ঐক্য ১৩ ৭)। এখানে 'হিঁদুয়ানীর গোঁড়ামি' বলতে কবি 'অন্ধলোকাচারসংকুল' শাস্ত্রবিধির প্রতি আনুগত্যকে বুঝেছেন। সুতরাং শাস্ত্রবাক্যের প্রতি তাঁর কোনো অন্ধ মোহ ছিল না, তার অভ্রান্ততা সম্বন্ধেও তিনি নিঃসংশয় ছিলেন না। তাই মনুকথিত দেশকালাতীত নিত্য সত্য বাণীগুলিকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন, মনুসংহিতাকে সর্বাংশে অনুমোদন

১ দ্রষ্টব্য : 'বঙ্কিম-রচনাবলী' ২য় খণ্ড১৩৬৬ : সাহিত্যসংসদ, পৃ ৭৭৬

করেন নি। তাঁর এই মনোভাবের সমর্থনে তিনি বলেছেন—

> যিনি মনুসংহিতার দোহাই দেন তাঁহার প্রতি আমার গুটিকতক বক্তব্য আছে। প্রথমত, মনুসংহিতা যে-সমাজের সংহিতা সে-সমাজের সহিত আমাদের বর্তমান সমাজের মূলগত প্রভেদ।
>
> —'সমাজ', হিন্দুবিবাহ ১২৯৪

সুতরাং নির্বিচারে মনুর নীতির অনুসরণ আজকের দিনে সম্ভব নয়, তাতে মঙ্গলও নেই। আবার চন্দ্রনাথ বসু বা শশধর তর্কচূডামণি -প্রমুখ হিন্দুত্বের গোঁড়া সমর্থকেরাও যে সর্বাংশে মনুর মত মেনে চলতেন তাও নয়। তাই তাঁদের প্রতিও কবির কটাক্ষ বর্ষিত হয়েছে।—

> আপন সুবিধামতো মনু হইতে দুই-একটা শ্লোক নির্বাচন করিয়া বর্তমান দেশাচার প্রচলিত···প্রথার পক্ষে প্রয়োগ করা সকল সময়ে সংগত বোধ হয় না।
>
> —পূর্ববৎ

বিধবাবিবাহ ইত্যাদি আন্দোলনের সমর্থকদল এবং বিরোধীদল উভয় পক্ষই যখন আপন আপন যুক্তির সমর্থনে শাস্ত্রবাক্যের নজির তুলেছিলেন, তখনই এ কাজের নিরর্থকতা সপ্রমাণ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'সমাজ' গ্রন্থের অন্তর্গত হিন্দুবিবাহ (১২৯৪), আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত (১২৯৮), কর্মের উমেদার (১২৯৮), আচারের অত্যাচার (১২৯৯), সমুদ্র যাত্রা (১২৯৯), হিন্দুর ঐক্য (১৩০৫) ইত্যাদি প্রবন্ধগুলিতে প্রয়োজনমতো আপ্তবাক্যের বিরোধিতা করেছেন। কবির মতে এই শাস্ত্রসংহিতাগুলি এক বিশেষ যুগে এক বিশিষ্ট সমাজের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে রচিত। নূতন কালে নূতন প্রয়োজনে মানুষ তাকে বদলাবে। সেইটিই স্বাভাবিক। তাই বিবাহের প্রসঙ্গে তাঁকে বলতে শুনি যে, মনু সমাজের কল্যাণ লক্ষ করেই বিবাহের নিয়ম নির্দেশ করেছিলেন। সেই সমাজের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রয়োজনমতো বিবাহের নিয়ম পরিবর্তন করা অন্যায় নয়। 'ইহাতে মনুর অবমাননা করা হয় না।' কারণ—

> মানুষ আচারের চেয়ে বড়ো, মুখোশের চেয়ে মুখ যেমন বড়ো, সংহিতাকারের চেয়ে বিধাতা যেমন বড়ো।
>
> —'চিঠিপত্র' ৯, হেমন্তবালা দেবীকে লেখা পত্র ১০০, ১৯৩২ অক্টোবর ১৮

২

দেখা গেল স্বাধীন চিন্তাশীল মনীষী রবীন্দ্রনাথ নির্বিচারে শাস্ত্রবাক্যকে কখনও মেনে

নিতে পারেন নি। ১২৯১ সালে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের সমর্থক বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এবং ১২৯২-৯৩ সাল পর্যন্ত শশধর তর্কচূড়ামণির সমর্থক চন্দ্রনাথ বসুব সঙ্গে মসীযুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। সেই বিতর্কে সংহিতা সম্বন্ধে তাঁর নির্মোহ মন ও নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হল, সর্বসংস্কার মুক্ত কবির জীবনেও এমন পর্ব এসেছিল যখন তিনি হিন্দুশাস্ত্রবিহিত আচার যথাসম্ভব নিষ্ঠাসহকাবে পালনের পক্ষপাতী হয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর তাঁর এই ধবণেব মানসিকতা লক্ষ কবা যায়।

এই সমযে বচিত কবিব সাহিত্যকৃতিগুলি দেখলে বোঝা যাবে, তখন তিনি প্রাচীন ভাবতীয় ভাবধারায় প্রায় নিমজ্জিত ছিলেন। ব্রহ্মোপনিষদ (১৯০০), ব্রহ্মমন্ত্র-উপনিষদ ব্রহ্ম-নৈবেদ্য (১৯০১) প্রভৃতি গ্রন্থে দেখি তিনি ঔপনিষদিক ধর্মের ব্যাখ্যা কবে সেই আদর্শে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ কবে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রাচীন ভাবতেব এই ভাবাদর্শ যে তপোবনগুলিকে আশ্রয় কবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল সেই তপোবন-গুলি ব্রাহ্মণ্যমহিমায সমুজ্জ্বল ছিল। রবীন্দ্রনাথ তা লক্ষ কবেছিলেন (দ্রঃ 'চৈতালি', প্রাচীনভারত ১৮৯৬) এবং তাবই ফলে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতিকে তথা ভাবতীয় সংহিতাবিহিত ভাবাদর্শকে পুনরুজ্জীবিত কবে তোলার জন্য তিনি একান্তভাবে উৎসুক হয়ে উঠে-ছিলেন। তাই সে যুগে কালিদাসের কাব্য বিচাব করতে বসেও কবিব মনে হয়েছিল—

> ভাবতবর্ষীয় সংহিতায় নরনারীব সংযত সম্বন্ধ কঠিন অনুশাসনের আকারে আদিষ্ট, কালিদাসের কাব্যে তাহাই সৌন্দর্যেব উপকবণে গঠিত।
>
> —'প্রাচীন সাহিত্য', কুমাবসম্ভব ও শকুন্তলা ১৩০৮ পৌষ

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের এই বিচার ঐতিহাসিক Keith এব A History of Sanskrit Literature (1948) গ্রন্থেও সমর্থিত হয়েছে। Keith ও কালিদাসেব মধ্যে 'Unfeigned devotion to the Brahmanical creed of his time' (p160) লক্ষ করেছেন।

যাই হক, এই তপোবন ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিকল্পনার বিষয় করে রেখেই নিরস্ত থাকেন নি, তিনি একে কর্মসাধনার মধ্যে রূপদানের প্রয়াস পেয়ে-ছিলেন। 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম' (১৯০১) তারই পরিণতি। তাঁর এই সময়ের মনোভাব আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত এক পত্রে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন—

> ছেলেবেলা হইতে ব্রহ্মচর্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না।
>
> —'চিঠিপত্র' ৬, পত্র-১৬, ১৯০১ অগষ্ট

এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, কবি তখন 'প্রকৃত হিন্দু' -রূপে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনে ইচ্ছুক। তখন ওই বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ বিধিব্যবস্থাও ছিল হিন্দুশাস্ত্রবিহিত। এই ব্যবস্থার প্রতি কবির যে পূর্ণ সমর্থন ছিল তা বিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যক্ষ-সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত এক পত্র (১৩০৯ অগ্রহায়ণ ১৯) থেকে জানা যায়। সেখানে তিনি লিখেছেন—

> প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দুসমাজবিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না; সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদ-স্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়।
>
> —'স্মৃতি' ১৩৪৮, পৃ ১৪-১৫

কিন্তু তবু কবির মন থেকে দ্বিধা যায় না। তাই তিনি জানতে চান কোনো শাস্ত্রের কোথাও ব্রাহ্মণ-কর্তৃক অব্রাহ্মণকে প্রণাম করার বিধি আছে কিনা। এর থেকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আত্যন্তিক অনুরাগের মধ্যেও কবির মানবতাবোধ তথা যুক্তিনিষ্ঠতার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

এবার ব্রাহ্মণত্ব ও বর্ণাশ্রমের প্রতি তাঁর এই আনুগত্যের উৎসটি কোথায় তা সন্ধান করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অতীত ভারত যে মোহ উৎপাদন করত তাতে প্রধান ভূমিকা ছিল ব্রাহ্মণের। অবশ্য কবি তাঁর অন্তরে যে মার্জিত ব্রাহ্মণ্য-আদর্শকে লালন করতেন বাস্তব জগতের কোথাও কখনও তার অস্তিত্ব ছিল কি না সন্দেহ। তাঁর 'গোরা' উপন্যাসের বিনয় ব্রাহ্মণের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছে তাতে রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার মনোভাবের প্রতিফলন দেখা গেছে।—

> ব্রাহ্মণ, যার ভয় নেই, লোভকে যে ঘৃণা করে, দুঃখকে যে জয় করে, অভাবকে যে লক্ষ্য করে না, যে 'পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ'। যে অটল, যে শান্ত, যে মুক্ত সেই ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষ চায়—সেই ব্রাহ্মণকে যথার্থভাবে পেলে তবেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে।
>
> – 'গোরা' ১৯১০, অধ্যায় ১৮

ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে তিনি দেখেছিলেন যে ভারতীয় সভ্যতা সমাজমূলক, রাষ্ট্র-মূলক নয় এবং একদা এই বৃহৎ সমাজের আদর্শ ও বিধিবিধান প্রবর্তন ও রক্ষার ভার ছিল ব্রাহ্মণের উপর। তাই তাঁর মতে বর্তমান দুর্দশার দিনে দেশকে তার পূর্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে চাই এই ত্যাগচর্যাপূত নিঃস্বার্থ ব্রাহ্মণসম্প্রদায়। তবে

এই ব্রাহ্মণত্বকে কবি নিছক জন্মগত অধিকারের সীমাতেই বেঁধে রাখেন নি। তিনি আশা করেছিলেন—

আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণের কাজ পুনরায় আরম্ভ হইবে। এই পুনর্জাগ্রত ব্রাহ্মণ-সমাজের কাজে অব্রাহ্মণ অনেকেও যোগ দিবেন। প্রাচীন ভারতেও ব্রাহ্মণেতর অনেকে ব্রাহ্মণের ব্রত গ্রহণ করিয়া জ্ঞানচর্চা ও উপদেষ্টার কাজ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণও তাঁহাদের কাছে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই

— ভারতবর্ষ', ব্রাহ্মণ ১৩০৯ আষাঢ়

এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, বর্ণাশ্রমশাসিত হিন্দুসমাজের তথাকথিত ব্রাহ্মণত্বকে কবি স্বীকার করেন নি। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য আদর্শ সম্বন্ধে কবির মন সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হয় নি এবং ভারতসংস্কৃতির যথার্থ ধারক ও বাহক বোঝাতে কবি 'ব্রাহ্মণ' সংজ্ঞাটিই ব্যবহার করেছেন। এমন কি, অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা দেবার প্রশ্নেও তিনি প্রাচীন ভারতে প্রচলিত দেশাচারের নজির তুলেছেন। কিন্তু এ সংস্কারটুকুও তাঁকে বেশিদিন আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে নি। পরিণত বয়সে তিনি স্বাধীন ও নির্মোহ বিচারবুদ্ধিতে ব্রাহ্মণত্বের বিশেষ দাবি অগ্রাহ্য করে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

ব্রাহ্মণই শূদ্রকে বধ করুক বা শূদ্রই ব্রাহ্মণকে বধ করুক, হত্যা অপরাধের পঙ্‌ক্তি একই, তার শাসনও সমান—কোনো মুনিঋষির অনুশাসন ন্যায় অন্যায়ের কোনো বিশেষ দৃষ্টি প্রবর্তন করতে পারে না। সমাজে উচিত অনুচিতের ওজন, শ্রেণীগত অধিকারের বাটখারা-যোগে আপন নিত্য আদর্শের তারতম্য ঘটাতে পারবে না।

— 'কালান্তর' কালান্তর ১৩৪০ শ্রাবণ

অবশ্য মধ্যজীবনে যখন কবির মনোভাবকে অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল বলা যায় তখনও, নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে এই ন্যায়ান্যায় বোধ কবির অন্তরে সমভাবে জাগ্রত ছিল এবং ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়ের অমর্যাদা ও হীনাবস্থা দেখে তিনি এক ভয়াবহ পরিণামের আশঙ্কা করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য হল—

প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে তেমনি জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, তাহা মানবসাধারণের। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্মে যখন সেই উচ্চতর ধর্মকে আঘাত করিল তখন ধর্ম তাহাকে আঘাত করিল। ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। আজিও ভারতে ব্রাহ্মণপ্রধান বর্ণাশ্রম থাকা সত্ত্বেও শূদ্রের সংস্কারে, নিকৃষ্ট অধিকারীর অজ্ঞানতায়, ব্রাহ্মণসমাজ পর্যন্ত আচ্ছন্ন, আবিষ্ট।

—'ভারতবর্ষ', প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ

কবির 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' কবিতাতেও ('গীতাঞ্জলি', ১০৮-সংখ্যক গান ১৩১৭ আষাঢ) বর্তমান যুগেব এই আসন্ন পরিণামেব চিত্র অঙ্কিত হযেছে। সুতরাং কোনো সময়েই কবির দৃষ্টি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যায় নি। তবু এক সময়ে ব্রাহ্মণ্য আদর্শেব প্রতি তাঁব যে আত্যন্তিক প্রীতি দেখা গিযেছিল তাব কাবণ, সুদূর কালের ভারতকে তিনি এক ভাবের দৃষ্টিতে এক ভাবের আনন্দে পূর্ণ করে দেখেছিলেন এবং সেই ভাবেব অমৃতে তাঁব হৃদয় ভবে উঠেছিল। সেই অমৃতেব আশ্বাসে তিনি যথার্থই বিশ্বাস করেছিলেন যে শাস্ত্রগ্রন্থকারের বিধি-বিধানগুলিব মধ্যেই বুঝি প্রাচীন ভারতেব সেই মহান্ চিত্তভাব নিহিত, সেই বিধানগুলিই বুঝি অতীত ভারতকে এমন গৌরব দান করেছিল। সেই কারণেই তিনি প্রাচীন ভারতেব স্থিতিশীল আদর্শেব পথে বর্তমান যুগের গতিশীল প্রাণের ধারাকে প্রবাহিত করে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং আশা কবেছিলেন—

> তখন স্বভাবতই আমাদেব দেশ ব্রহ্মচর্যে জাগিযা উঠিবে, সামসংগীতধ্বনিতে জাগিয়া উঠিবে, ব্রাহ্মণে, ক্ষত্রিয়ে, বৈশ্যে জাগিযা উঠিবে। যে পাখিরা প্রভাতকালে তপোবনে গাহিত তাহারাই গাহিয উঠিবে।
>
> —'ভারতবর্ষ', ব্রাহ্মণ ১৩০৯ আষাঢ

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে মনুর ব্যবস্থার সঙ্গে কবির এই ভাবেব দৃষ্টির কোনো মিলই ছিল না। মনু তাঁব সংহিতায যে ধর্মকে মুখ্য বলে তুলে ধরেছিলেন তা হল 'সদাচার'।—

> তস্মিন্ দেশে য আচাব পারম্পর্যক্রমাগতঃ।
> বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচাব উচ্যতে॥ ২।১৮

মনুর এই সদাচারকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেন নি। বিশেষতঃ বর্তমান যুগের পক্ষে তা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তাই শেষ জীবনে তার সমালোচনা করে লেখেন—

> সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ, তা কতকগুলি সামাজিক নিযমেব বন্ধন। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ, এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত—তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা, যত অবিচারই থাক্। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচারব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল।
>
> —'কালান্তর', সভ্যতার সংকট ১৩৪৮ বৈশাখ

এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা যে কোন্ আদর্শকে অনুসরণ করে চলত রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে অন্ততঃ সে বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত হয়েছিলেন এবং এ সম্বন্ধে মনুবিহিত শ্লোকটিকেও যথাযথভাবে স্মরণে রেখেছিলেন। তবে শুধু শেষ বয়সেই যে কবি মনুর বিধানের ব্যর্থতা উপলব্ধি করেছিলেন তা নয়। তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে (১৯১০) দেখি নায়ক গোরা উগ্র সংস্কারপন্থী ব্রাহ্ম থেকে দেশপ্রেমের প্রবল প্রেরণায় দেশীয় সমস্ত আচারকেই একদিন নির্বিচারে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্ত আচারের সংকীর্ণতা পেরিয়ে ভারতের চিরন্তন রূপকে প্রত্যক্ষ করেছিল। সুতরাং কবিও ওই সময় থেকেই তাঁর সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন এ কথা বলা যায়। তিনি বুঝেছিলেন, স্বাধীন বুদ্ধিকে প্রথার অধীন করে দিলেই তার মধ্যে মানবতার অপমান সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই অপমানই মানুষকে টেনে নিয়ে যায় পতনের শেষ সীমায়। সেই পতন থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্যেই কবি মনুর বিধান ছেড়ে শেষ পর্যন্ত ভারতেরই শাশ্বত সত্যবাণীকে স্মরণ্ করে বলেছিলেন—

> প্রাচীন ভারত এক দিন যখন বিধাতার কাছে বর চেয়েছিলেন তখন বলেছিলেন, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। ··বুদ্ধ্যা শুভয়া, শুভ বুদ্ধির দ্বারাই মিলতে চেয়েছিলেন, অন্ধ বশ্যতার লম্বা শিকলের দ্বারা নয়, বিচারহীন বিধানের কঠিন কান-মলার দ্বারা নয়।

—'কালান্তর', সমস্যা ১৩৩০ অগ্রহায়ণ

সুতরাং মনুসংহিতার বিধানের চেয়ে মানবতার নীতিই তাঁর কাছে অধিকতর মর্যাদা পেয়েছিল।

৩

মনুসংহিতাকে রবীন্দ্রনাথ যথাসম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখে তার দোষগুণ যাচাই করে নিয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন—

> এত কাল ধরে আমরা অনুশাসনের কাছে, প্রথার কাছে, মানবমনের সর্বোচ্চ অধিকার অর্থাৎ বিচারের অধিকার বিকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে অলস হয়ে বসে আছি।

—'কালান্তর', সত্যের আহ্বান ১৩২৮ কার্তিক

তাই তিনি বিধির বশ্যতার বদলে বুদ্ধিকে দাঁড় করিয়ে খোলা চোখে দেখে মনুর প্রত্যেকটি বিধান বা উক্তির দোষগুণ বিচার করে দেখতে আগ্রহী হয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্যের নানা স্থানেই তার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই তা

স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথমতঃ দেখি তিনি মনুর ব্যবস্থার প্রশংসা করে বলেছেন—

> ভারতবর্ষ কাজ করিতে বসিয়াও মানবসম্বন্ধের মাধুর্যটুকু ভুলিতে পারে না। সেই সম্বন্ধের সমস্ত দায় সে স্বীকার করিয়া বসে। হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গল সম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থরূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে।
>
> — 'আত্মশক্তি', স্বদেশী সমাজ ১৩১১ ভাদ্র

কিন্তু মনুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার ত্রুটিগুলিও কবির দৃষ্টি এড়ায় না। তিনি দেখেন, আত্মীয়তা ও জাতিত্ববন্ধনের বাইরে ভারতীয় মন স্বস্তি পায় না, সাধারণ শিষ্টাচারের সীমা তার জানা নেই।—

> মনুতে পাওয়া যায়, মা মাসি মামা পিসের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করতে হবে, গুরুজনের গুরুত্বের মাত্রা কার কতদূর, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের মধ্যে পরস্পরের ব্যবহার কী রকম হবে, কিন্তু সাধারণভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কী রকম হওয়া উচিত তার বিধান নেই।
>
> —'জাপানযাত্রী', অধ্যায় ৩, ১৩২৩ বৈশাখ ২৪

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে বলা যায়, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সংজ্ঞা অনুযায়ী Human m বা মানবতার আদর্শ প্রাচীন ভারতবর্ষে কখনও দেখা যায় নি। তাই মানবসাধারণের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ মনুসংহিতায় পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারতীয় শাস্ত্রে 'সর্বভূতে'র প্রতি 'আত্মবৎ' ব্যবহারের নির্দেশ পাওয়া যায়। মনুসংহিতার বিধানেও ওই জাতীয় নির্দেশের বিরুদ্ধতা দেখা যায় না। তবে আধুনিক মানবতাবাদ সেই যুগের গ্রন্থে প্রত্যাশিত নয়।

মনুসংহিতাতে স্ত্রীনিন্দাবাচক শ্লোকও প্রচুর। সেগুলি যথারীতি কবির কঠোর সমালোচনা থেকে নিষ্কৃতি পায় না ('সমাজ', হিন্দুবিবাহ ১২৯৪)। আবার মনুই যে বলেছেন—'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ' সেকথাও তিনি বিস্মৃত হন না ('সমাজ', হিন্দুবিবাহ)। আসলে কবি বুঝেছিলেন এক বৃহৎ সমাজের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রেখে সেই যুগের উপযোগী করে মনুর সংহিতাটি রচিত এবং বলা বাহুল্য সে দৃষ্টি স্বভাবতই ছিল কতকাংশে অনুদার। তাই মনুর চোখে নারী শুধু 'প্রজনার্থং মহাভাগাঃ'। কিন্তু আধুনিক যুগের নারীমর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন কবি মন্তব্য করেন—

> আজ এল এমন যুগ যখন মেয়েরা মানবত্বের পূর্ণ মূল্য দাবি করেছে। জননার্থং

মহাভাগা বলে তাদের গণনা করা হবে না। সম্পূর্ণ ব্যক্তিবিশেষ বলেই তারা হবে গণ্য।

—'সমাজ', নারীর মনুষ্যত্ব ১৩৩৫ বৈশাখ

মনুকথিত অর্থহীন আচারগুলিকে আজও যাঁরা আকড়ে থাকতে চান, সেই সকল 'বাহ্য প্রথার পরাসক্ত জীবে'র প্রতি কবির প্রবল ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর মতে 'পরতন্ত্রতার কারখানা-ঘরে' তৈরি এই 'কলের পুতুলরা' মানুষ নামের অযোগ্য এবং এই সব স্থলে মনুর বিধি অলঙ্ঘনীয় নয় ('কালান্তর', সত্যের আহ্বান ১৩২৮ কার্তিক)।

সাধারণভাবে মনুসংহিতার বহু বিধিকে মেনে নিতে না পারলেও তার কতকগুলি নির্দেশ তিনি নিঃসংশয়ে সমগ্র হৃদয় নিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। তাই যে নৈতিক উপদেশে মনু বলেন—'সম্মানকে বিষের মতো জানবে, অপমানই অমৃত' (২।১৬২), সেখানে পাই তাঁর পূর্ণ সমর্থন। আপন সম্মানলাভের প্রাক্‌কালেও তিনি অকুণ্ঠিতভাবে এই শ্লোকের গুরুত্ব স্মরণ করেন।—

অহংটাই পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো চোর। সে স্বয়ং ভগবানের সামগ্রীও নিজের বলিয়া দাবি করতে কুণ্ঠিত হয় না। এইজন্যই তো ঐ দুর্বৃত্তটাকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য এত অনুশাসন।...সম্মান যেখানেই লোভনীয় সেখানেই সাধ্যমত তাহার সংস্রব পরিহার করা ভালো।

—'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ২, ১৩১৮ ফাল্গুন

নৈতিকতার যে উচ্চ আদর্শ থেকে মনু উক্ত উপদেশ দেন সেই আদর্শের প্রেরণাতেই তিনি বলেন—'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা' (৫।৫৬)। মনু জানতেন যে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত জীবধর্মকে নিরন্তর চেষ্টায় অতিক্রম করে মানবধর্মকে অর্জন করতে হয়, তাতেই দেখা দেয় মানবতার মহিমা। তাই যুযুধান সৈন্যদের প্রতিও মনু কৃতাঞ্জলি, আত্মসমর্পণকারী, নিরস্ত্র, ভীত, আহত, শোকার্ত ইত্যাদি অসমকক্ষ শত্রুকে আক্রমণ করতে নিষেধ জানিয়েছেন। মনুর এই বিধিতে (৭।৯১-৯৩) মানবধর্মের যে উৎকর্ষ দেখা গেছে 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে (অধ্যায় ২) কবি তার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

মানবতার এই আদর্শই মনুকে এক দিকে অর্থহীন আচারের বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিত্য সত্যে পৌঁছে দিয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন, পৃথিবীর কোনো বিশেষ জলধারায় এমন কোনো আধিভৌতিক জাদুশক্তি নেই, যাতে স্নান করলে স্নানকারীর অন্তরের সকল পাপ ধুয়ে যায়। তাই তাঁর বাণী—'অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন

শুধ্যতি' (৫।১০৯)। অর্থাৎ জল দিয়ে কেবল দেহেরই শোধন হয়, মনের শোধন হয় সত্যে। আচারদ্রোহী কবি রবীন্দ্রনাথ এই শ্লোকাংশটি তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে বেদ-উপনিষদের সত্যবাণীর সঙ্গেই স্মরণ করেছেন। এইভাবে নির্বাচনী মনোভঙ্গিতে কবি মনুসংহিতার কতকগুলি নিত্য সত্যবাণীকে গ্রহণ করেছেন এবং লৌকিক অর্থহীন আচারগুলিকে বর্জন করেছেন।

কখনও কখনও মনুর সংকীর্ণ উপদেশকে কবি সংশোধন করে দিয়েছেন। তিনি দেখেছেন, মনুর উপদেশ ব্রহ্মের উদার অভিপ্রায়কে অনেক সময়েই লঙ্ঘন করে চলে। তিনি সেটি মেনে নিতে পারেন নি।—

> কোন্ কোন্ মন্দ কাজ করবে না তার বিশেষ উল্লেখ করে সেইগুলিকে ধর্মশাস্ত্র ঈশ্বরের বিশেষ নিষেধরূপে প্রচার করেছেন।···কথাটাকে এইরূপ ক্ষুদ্র ও কৃত্রিম-ভাবে মানতে পারি নে। তিনি কোনো বিশেষ আদেশ জানান নি, কেবল তাঁর একটি আদেশ তিনি ঘোষণা করেছেন— সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপরে তাঁর সেই আদেশ। ···তিনি কেবলমাত্র বলেছেন, প্রকাশিত হও।

—'শান্তিনিকেতন' ১, আদেশ ১৩১৫ চৈত্র

কখনও বা কবি প্রচলিত বর্ণাশ্রমধর্মের উপর একটি বৃহৎ অভিপ্রায় আরোপ করে দিয়ে বলেন—

> প্রাচীন সংহিতাকারগণ আমাদের শিক্ষাকে, আমাদের গার্হস্থ্যকে অনন্তের মধ্যে সেই শেষ পরিণামের অভিমুখ করিতে চাহিয়াছিলেন।

— ধর্ম', ততঃ কিম্ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ

কবি যে মনুসংহিতাকে সর্বদা গুরুগম্ভীর নীতিকথা বা তত্ত্ব-উপদেশের প্রসঙ্গে স্মরণ করেছেন, তা নয়। কখনও কখনও তার মধ্যে তিনি লঘু কৌতুকের সুরও এনে দিয়েছেন। তাই 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে ভূতনাথবাবু দীপ্তি-স্রোতস্বিনীকে বলেন—

> তোমরা কেবল কবিতার মধ্যে দেবী. মন্দিরের মধ্যে আমরা দেবতা। দেবতার ভোগ যাহা কিছু সে আমাদের, আর তোমাদের জন্য কেবল মনুসংহিতা হইতে দুইখানি কিম্বা আড়াইখানি মাত্র মন্ত্র আছে।

—'পঞ্চভূত', নরনারী ১২৯৯ চৈত্র

আবার 'প্রহাসিনী' কাব্যের নারীর কর্তব্য কবিতায় তিনি ছদ্ম গাম্ভীর্যে নারীর বুদ্ধিহীন আচারনিষ্ঠার প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন—

> পুরুষের পক্ষে সব তন্ত্রমন্ত্র মিছে,
> মনু-পরাশরদের সাধ্য নাই টানে তারে পিছে।

বুদ্ধি মেনে চলা তার রোগ,
খাওয়া-ছোঁওয়া সব-তাতে তর্ক করে, বাধে গোলযোগ।

তেমনি একটি আধুনিকা নববধূকে লক্ষ করে তাঁর সস্মিত কৌতুক উচ্ছলিত হয়—

বোঝ আর না-ই বোঝ কাছে রেখো গীতাটি,
মাঝে মাঝে উলটিয়ো মনুসংহিতাটি :
'স্ত্রী স্বামীর ছায়াসম' মনে যেন হোঁশ রয়।

—'প্রহাসিনী', পরিণয়মঙ্গল ১৯৩৫ ফেব্রুআরি

৪

রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত সাহিত্যের নানা স্থানে মনুসংহিতার বহু শ্লোক বিকীর্ণ হয়ে আছে। উপাদান-সংগ্রহ বিভাগটি দেখলে বোঝা যাবে কোন্ শ্লোক কতদিন পর্যন্ত কবির স্মৃতিতে স্পষ্টভাবে জাগরূক ছিল। কবি এই শ্লোকগুলিকে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করে প্রয়োজনমতো তার ব্যঞ্জনাগত তাৎপর্যের তারতম্য ঘটিয়েছেন। কখনও বা এমনভাবে তার ব্যাখ্যা করেছেন যা সংহিতাকারের কল্পনাকে বহু দূরে অতিক্রম করে গেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যাবে। কবি প্রথম জীবনে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

> আমরা বদ্ধ না হলে মুক্ত হতে পাই না।...কঠিনতর অধীনতাই স্বাধীনতা। সর্বং পরবশং দুঃখং, সর্বমাত্মবশং সুখম্। কিন্তু পরের অধীন হওয়াই সহজ, আপনার অধীন হওয়াই শক্ত।

—'বিচিত্র প্রবন্ধ', নানাকথা ১২৯২ জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র

এখানে শ্লোকটির ব্যাখ্যায় কবি যতটা নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করেছেন, ততদূর গভীর অর্থ শ্লোক-রচয়িতার অভিপ্রেত ছিল কি না বলা যায় না। কিছু কাল পরে কবি এই শ্লোকটিকেই ভাষান্তরে নূতন রূপে উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন যে প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ যা করতে বাধ্য হয় সেটিই তার চরম ধর্ম নয়। প্রয়োজনের সংকীর্ণতার বাইরে তার আপন আনন্দময় সত্তা সত্য পরিচয়। সেই সত্যের উপলব্ধিতেই তার পরম সুখ।—

> এইজন্যই শাস্ত্রে বলে— সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।...অর্থাৎ মানুষের সুখ তাহার আপনের মধ্যে—আর দুঃখ তাহার আপন হইতে ভ্রষ্টতায়।

—'সঞ্চয়', ধর্মের অর্থ ১৩১৮

এই জাতীয় আর একটি শ্লোককেও কবি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমতঃ তিনি লিখেছেন—

> ভারতবর্ষে বলে, সন্তোষং হৃদি সংস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।...সুখ যিনি চান তিনি সন্তোষকে গ্রহণ করিবেন, সন্তোষ যিনি চান তিনি সংযম অভ্যাস করিবেন। এ কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, সুখের উপায় বাহিরে নাই, তাহা অন্তরেই আছে, তাহা উপকরণজালের বিপুল জটিলতার মধ্যে নাই, তাহা সংযত চিত্তের নির্মল সরলতার মধ্যে বিরাজমান। চাঞ্চল্য দূর হইলেই সন্তোষের স্তব্ধতার মধ্যে জগতের সমস্ত বৃহৎ আনন্দগুলি আপনি প্রকাশিত হইবে।
>
> —'ধর্ম', ধর্মের সরল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ

সাহিত্যজগতে সৌন্দর্যের পরিমিতিবোধের ব্যাখ্যা করতে গিয়েও কবি এই উদ্ধৃতির শরণ নিয়েছেন।—

> আমাদের শাস্ত্রেও বলে, কেবল ধর্মের জন্য নয়, সুখের জন্যও সংযত হইবে। সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। অর্থাৎ, ইচ্ছার যদি চরিতার্থতা চাও তবে ইচ্ছাকে শাসনে রাখো, যদি সৌন্দর্যভোগ করিতে চাও তবে ভোগলালসাকে দমন করিয়া শুচি হইয়া শান্ত হও।
>
> —'সাহিত্য' সৌন্দর্যবোধ ১৩১৩ পৌষ

'মানুষের ধর্ম' বোঝার উদ্দেশ্যেও দেখি কবি এই উদ্ধৃতটি স্মরণ করেছেন এবং উপনিষদের বৃহৎ অভিপ্রায়ের সঙ্গে মনুর এই শ্লোকের দ্বন্দ্ব দেখে উভয়ের মধ্যে একটি সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধান করে দিয়েছেন। তিনি উপনিষদের 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি' এবং মনুর 'সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ' ইত্যাদি বাণীর মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধতা দেখে মন্তব্য করেছেন—

> তবেই ত দেখছি, সন্তোষে সুখ নেই আবার সন্তোষেই সুখ এই দুটো উলটো কথা সামনে এসে দাঁড়ালো। তার কারণ, মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে। তার যে সত্তা জীবসীমার মধ্যে, সেখানে যেটুকু আবশ্যক সেইটুকুতেই তার সুখ। কিন্তু অন্তরে অন্তরে জীবমানব বিশ্বমানবে প্রসারিত, সেই দিকে সে সুখ চায় না, সে সুখের বেশি চায়, সে ভূমাকে চায়।
>
> —'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১

এইভাবেই কবি একই শ্লোকের মধ্যে প্রযোগবৈচিত্র্যের দ্বারা বিবিধ ব্যঞ্জনার সঞ্চার করেছেন।

মনুর যে শ্লোকটি কবি সর্বাধিক ব্যবহার করেছেন, সেটি হল—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥ ৪।১৭৪

এই শ্লোকটির প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় নিয়ে এবার এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। মহর্ষির 'ব্রাহ্মধর্ম' (২য় খণ্ড) গ্রন্থে সংকলিত এই শ্লোকটির সঙ্গে কবির আবাল্য পরিচয়, এ কথা বলা যায়। ১৩০৮ সালে কবি প্রথম এই শ্লোক ব্যবহার করেন। সেখানে তিনি বলেন যে রাজনৈতিক স্বার্থে, এমন কি দেশপ্রেমের প্রয়োজনেও 'ধর্ম'কে বিসর্জন দেওয়া সমীচীন নয়। তিনি জানেন, ব্যক্তি বা জাতির মনুষ্যত্বকে অধর্ম কখনই ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পারে না। তাই তাঁর দৃঢ়কণ্ঠের ঘোষণা—

> আমরা যদি বাঁধি বোলে না ভুলি, যদি 'প্যাট্রিয়ট'কেই সর্বোচ্চ বলিয়া না মনে করি, যদি সত্যকে ন্যায়কে ধর্মকে ন্যাশনালত্বের অপেক্ষাও বড়ো বলিয়া জানি, তবে আমাদের ভাবিবার বিষয় বিস্তর আছে।··· কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচারেই যে ধ্রুব মৃত্যু তাহা নহে, ধর্মনিয়মের ব্যভিচারেও ধ্রুব বিনাশ। ধর্মনৈতিক নিয়মের অমোঘত্বে যুরোপ শ্রদ্ধা হারাইতেছে দেখিয়া, আমরাও যেন না হারাইয়া বসি। এই ধর্মবাণী সকল দেশের সকল কালের চিরন্তন সত্য, ন্যাশনালত্বের মূলমন্ত্র ইহার নিকট ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক।
>
> —'সমূহ', পরিশিষ্ট. বিরোধমূলক আদর্শ ১৩০৮

ওই একই বক্তব্য উপস্থাপিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালান্তর' গ্রন্থের ছোটো ও বড়ো (১৩২৪ অগ্রহায়ণ) এবং বাতায়নিকের পত্র (১৩২৬ আষাঢ়) প্রবন্ধ দুটিতে এই শ্লোকটি ব্যবহার করেন। বারবার শুধু রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নয়, মূলতঃ ধর্মনীতির প্রসঙ্গেই তিনি এই শ্লোকটির অন্তর্নিহিত সত্যকে ধ্রুব বলে প্রচার করেছেন। 'ধর্ম' গ্রন্থের অন্তর্গত ধর্মের সরল আদর্শ (১৩০৯ মাঘ) এবং প্রার্থনা (১৩১১ আষাঢ়) প্রবন্ধ দুটিতে তিনি ভারতবর্ষের সম্মুখে প্রাচীন যুগের ওই আদর্শটিকেই উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, প্রার্থনা করেছিলেন ভারতবাসী যেন ওই সত্য থেকে বিচ্যুত না হয়। তার কিছু দিন পরে 'শান্তিনিকেতন' পর্যায়ের একটি ভাষণে তিনি উক্ত শ্লোকের অন্তর্নিহিত সত্যকে নিঃসংশয়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন মানুষ ধর্মকে, তার পরম শ্রেয়কে অধর্মের দ্বারা লঙ্ঘন করতে যায়। কিন্তু তার এই ধর্মবিরোধী স্পর্ধা সাময়িকভাবে জয়যুক্ত হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে হার মানতেই হয়। তাই—

> এই কথাটিকেই খুব জোর করে সমস্ত প্রতিকূল সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রচার করেছে— ···অধর্মের দ্বারা লোকে বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হয়, তাতেই সে ইষ্টলাভ করে,

তার দ্বারা সে শত্রুদের জয়ও করে থাকে, কিন্তু একেবারে মূলের থেকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কেননা, সমস্তের মূলে যিনি আছেন…তাঁকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। কেবল তাঁকে ততটুকুই ছাড়িয়ে যাওয়া চলে যাতে ফিরে আবার তাঁকেই নিবিড় করে পাওয়া যায়।

—'শান্তিনিকেতন' ২, চিরনবীনতা

আবার বিশ্বগ্রাসী লোভের কবলে পড়ে মনুষ্যত্ব যে কিভাবে নির্জিত হয়, তা দেখে 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে তিনি মন্তব্য করেছেন—

একলা নিজেকে বা নিজেদেরকে বড়ো করবার চেষ্টায় অন্য সকল প্রাণীরই উন্নতি ঘটতে পারে, তাতে তাদের সত্যদ্রোহ ঘটে না, কিন্তু মানুষের পক্ষে সেইটেই অসত্য, অধর্ম—এইজন্যে সকলপ্রকার সমৃদ্ধির মাঝখানেই তার দ্বারাই মানুষ সমূলেন বিনশ্যতি।

—'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ২

এই সত্য কবির হৃদয়ে যে কত গভীরভাবে প্রোথিতমূল তা ধরা দিয়েছে তাঁর শেষ জীবনের শেষ রাজনৈতিক প্রবন্ধ সভ্যতার সংকটে। ইংরাজ-প্রমুখ ক্ষমতালোভীর সীমাহীন লোভ ও অন্যায়ের প্রতিবাদে বজ্রগম্ভকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে তাঁর অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী।—

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবলপ্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

—'কালান্তর', সভ্যতার সংকট ১৩৪৮ বৈশাখ

যে সত্যবাণীর প্রতি ছিল কবির আবাল্য নিষ্ঠা, জীবনের উপান্তে দাঁড়িয়ে মানুষের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করে তোলবার জন্য তিনি তাকেই আমাদের সামনে উপস্থাপিত করে দিয়ে গেছেন।

দক্ষ-শঙ্খ-বশিষ্ঠ-বিষ্ণু-পরাশর ও আপস্তম্ব সংহিতা

রবীন্দ্রসাহিত্যে মনুসংহিতার তুলনায় অন্যান্য সংহিতার স্থান নিতান্ত নগণ্য। তবু দক্ষসংহিতা থেকে অন্ততঃ আটটি এবং শঙ্খ-বশিষ্ঠ-বিষ্ণু-পরাশর ও আপস্তম্ব সংহিতার প্রত্যেকটি থেকে একটি করে শ্লোক কবি ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই

শ্লোকগুলির প্রয়োগস্থল বিবেচনা করে দেখলেই বোঝা যাবে, সংহিতাগুলির সঙ্গে কবির মনুসংহিতার মতো ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না এবং অধিকাংশ শ্লোকই আপন বক্তব্যকে জোরালো সমর্থনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়োজনে সযত্নে আহৃত। উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে দেখা যায় দক্ষসংহিতার ছয়টি এবং শঙ্খ-বশিষ্ঠ-বিষ্ণু ও পরাশর সংহিতার একটি করে শ্লোক কবি প্রধানতঃ 'সমাজ' গ্রন্থের অন্তর্গত হিন্দুবিবাহ (১২৯৪) ও ভারতবর্ষীয় বিবাহ (১৩৩২) এই দুটি গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্যই সংকলন করেন। সুতরাং রবীন্দ্রমানসের বিচারে এগুলির বিশেষ গুরুত্ব নেই।

তবে এই সংহিতাগুলির সব শ্লোকই যে ওইরূপ প্রয়োজনের তাগিদে নির্বাচিত তা বলা যায় না। প্রথম জীবনে কবি আত্মদানের অধিকার বোঝাতে গিয়ে দক্ষসংহিতার একটি উক্তি (২।৩৫) স্মরণ করে বলেছিলেন—

> আমাদের পুরাণে যে বলে, যে ব্যক্তি ইহজন্মে দান করে নাই সে পরজন্মে দরিদ্র হইয়া জন্মিবে, তাহার অর্থ এইরূপ হইতে পারে···যাহার সমস্ত টাকা কেবল নিজের জন্য···তাহাকে দরিদ্র বলা যায় এই কারণে যে, তাহার এত সামান্য আয় যে তাহাতে কেবল তাহার নিজের পেটটাই ভরে,···তাহার কিছুই বাকী থাকে না।···সুতরাং যখন সে বিদায় হয়, তখন তাহার সেই প্রকাণ্ড শূন্যতা ও হৃদয়ের দুর্ভিক্ষই তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়, আর কিছুই যায় না।
>
> —'আলোচনা', আত্মা : শ্রেষ্ঠ অধিকার ১২৯১ শ্রাবণ

এখানে দেখি প্রসঙ্গক্রমে স্বভাবতঃই দক্ষসংহিতার এই উক্তির কথা কবির স্মরণে এসেছে এবং স্বেচ্ছাক্রমে তিনি তাতে এক গভীর তাৎপর্য আরোপ করেছেন। তবে উক্তিটির মূল উৎস সম্বন্ধে কবি যে কতদূর সচেতন ছিলেন, তা বলা যায় না।

দক্ষসংহিতার আর একটি বাণীও সুগভীর আধ্যাত্মিক অর্থবহরূপে কবির কাছে প্রতিভাত হয়েছিল এবং তিনি উপনিষদের বাণীর সমমর্যাদায় তাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি লেখেন—

> উপনিষদ্ বলেছেন···শুভবুদ্ধির দ্বারা তিনি আমাদের সকলকে এক করে দিন। যে বুদ্ধিতে আমরা সকলে মিলি সেই বুদ্ধিই শুভবুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই আত্মার। যথৈবাত্মা পরস্তদ্বদ্ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা। আপনার মতো করে পরকে দেখার ইচ্ছাকেই বলে শুভ-ইচ্ছা;···পরের মধ্যে আপন চৈতন্যের প্রসারণেই শুভ, কেননা পরম মানবাত্মার মধ্যেই আত্মা সত্য।
>
> —'মানুষের ধর্ম', অধ্যায় ২

উপরের উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় দক্ষসংহিতার শ্লোকটি (৩।২০) কবির চিত্তকে

কতদূর অধিকার করেছিল। এই বাণীর প্রতি কবির যে আন্তরিক সমর্থন ছিল আপস্তম্ব সংহিতার অন্তর্গত এই ভাবের আর একটি শ্লোকের (১০।১১) দ্বারাও তা সপ্রমাণ হয়। শ্লোকটির দ্বিতীয়ার্ধ হল—

আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।

১৩১৩ থেকে ১৩৪৭ সাল পর্যন্ত শ্লোকাংশটি কবির মনকে অধিকার করেছিল এবং ওই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন গ্রন্থে বিবিধ প্রসঙ্গে তিনি এটিকে অন্ততঃ সাতবার ব্যবহার করেন। প্রথমতঃ আধ্যাত্মিকতার প্রসঙ্গে এটি স্মরণ করে বলেন—

যিনি অদ্বৈতং তাঁহার উপাসনা করিব কেমন করিয়া? পরকে আপন করিয়া, অহমিকাকে খর্ব করিয়া, বিরোধের কাঁটা উৎপাটন করিয়া, প্রেমের পথ প্রশস্ত করিয়া।

আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।

সকল প্রাণীকে আত্মবৎ যে দেখে, সেই যথার্থ দেখে।

কারণ, সে জগতের সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে পরম সত্য যে অদ্বৈতং তাহাকেই দেখে।

— ধর্ম, শান্তং শিবমদ্বৈতম্ ১৩১৩ পৌষ

এর পরে 'বিশ্বভারতী' গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে (অধ্যায় ১০, ১৩৩০ পৌষ) কবি এই বাণীর অন্তর্নিহিত বিশ্বজনীন ঐক্যের সত্যকে স্মরণ করেন। 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থের বুদ্ধদেব প্রবন্ধে (১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ) দেখি এই শ্লোকের মহান তাৎপর্যে মুগ্ধ কবি এটিকে ভ্রমক্রমে উপনিষদের অন্তর্গত বলে উল্লেখ করেছেন। 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থের হলকর্ষণ প্রবন্ধেও (১৩৪৬ ভাদ্র) কবি ঐক্যবিদ্যার পরিচায়ক বাণীরূপে এটিকে উদ্ধৃত করেন। আর শেষ জীবনে এই বাণীর প্রতি হৃদয়ের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেন—

আমাদের যা বিশুদ্ধ, যা আমাদের সনাতন আধ্যাত্মিক সম্পদ তাতে মানুষের এবং সর্বজীবের মূল্য ভূরিপরিমাণ স্বীকার করেছে। আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি—এত বড়ো কথা বোধ হয় কোনো শাস্ত্রে নেই। সকলের মধ্যে আত্মার এই সম্বন্ধস্বীকার এবং এই সমগ্রের দৃষ্টিকে আমরা হারিয়েছি।

—'ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ৩, ১৩৪৭ মাঘ

শুধু সাহিত্যরচনার প্রয়োজনে নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও কবি এই মহান্ আদর্শটি যে বরণ করে নিয়েছিলেন তাঁর চিঠিপত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইন্দিরা দেবীকে লেখা এক পত্রে ('চিঠিপত্র' ৫, পত্র-১২, ১৩৩০ ভাদ্র ৩১) তিনি এই বাণীর ব্যাখ্যা করেন এবং আর একটি পত্রে তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন—

যথার্থ পুরাতন ভারত, যে-ভারত চিরনূতন—যে ভারতের বাণী, আত্মবৎ সর্ব-

ভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি—তাকেই আমি চিরদিন ভক্তি করেছি।

—'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-২০ হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত, ১৩৩৮ আষাঢ় ৩

সুতরাং দেখা গেল এই বাণীকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের অন্যতম মূল মন্ত্ররূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

দক্ষ ও আপস্তম্ব সংহিতার যে বাণী দুটি কবিকে সমধিক মুগ্ধ করেছিল, সে দুটিই 'ব্রাহ্মধর্ম' এবং 'নবরত্নমালা'য় সংকলিত আছে। আবার 'শঙ্খসংহিতা'র যে শ্লোকটি কবি ব্যবহার করেছেন (সা ভার্যা যা পতিপ্রাণা···ইত্যাদি ৪।১৫) সেটিও ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে উৎকলিত হয়েছে। সুতরাং মনে হয় এই অর্বাচীন সংহিতাগুলির সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ তো নয়ই, এমন কি প্রত্যক্ষ পরিচয়ও ছিল কি না সন্দেহ।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয় 'সমাজ' গ্রন্থের হিন্দুবিবাহ প্রবন্ধে কবি একটি সংস্কৃত শ্লোকের ভাবার্থ দিয়ে সেটিকে মনুসংহিতার উক্তি বলে উল্লেখ করেছেন।—

মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন, স্ত্রীদের মন্ত্র নাই, ব্রত নাই, উপবাস নাই ; কেবল স্বামীকে শুশ্রূষা করিয়া তাঁহারা স্বর্গে মহিমান্বিতা হন।

— সমাজ', পরিশিষ্ট : হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন

মনুসংহিতায় এই মর্মের কোনো শ্লোক এ পর্যন্ত চোখে পড়ে নি। কিন্তু বিষ্ণুসংহিতায় এই ভাবের একটি শ্লোক পাওয়া যায়।—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে॥ ২৫।১৫

বলা বাহুল্য, বিষ্ণুসংহিতা থেকে আর কোনো উদ্‌ধৃতি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নি। সুতরাং এ কথা বলা বোধ করি অসংগত হবে না যে কবি শুধুমাত্র উদ্‌ধৃত শ্লোকটির সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন, তার মূল উৎস সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না।

নীতিসাহিত্য

প্রাচীন কাল থেকেই নীতিকবিতাব প্রতি ভারতীয মনের একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যায। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে উপনিষদ্, বৌদ্ধ ধম্মপদ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থে ভাবতীয মনেব এই স্বাভাবিক প্রবণতাটি ধবা দিয়েছে। তাই এইসব গ্রন্থে বিবৃত কোনো কোনো উপাখ্যানেব নির্যাস নীতিকথায বিধৃত হযেছে, কখনও বা কতকগুলি নীতিবাক্যই বিভিন্ন উপাখ্যানেব মধ্যে বিস্তৃত উদাহবণ-সহ ব্যাখ্যাত হয়েছে। ভাবতীয ধর্মশাস্ত্রগুলিতেও দেখি, নানাপ্রকাব নীতিকথা সেখানে বিবিধ অনুশাসনেব আকারে আদিষ্ট। পববর্তী কালেব চাণক্যশ্লোক, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এই নীতিকথাবই সংকলন। এইগুলি ছাড সংরুচি, ঘটকর্পর, বেতালভট্ট, কুসুমদেব প্রভৃতি বহু খ্যাত-অখ্যাত কবিদেব নামে যথাক্রমে নীতিবত্ন, নীতিসার, নীতিপ্রদীপ, দৃষ্টান্তশতক প্রভৃতি নীতিকাব্য প্রচলিত।

এই নীতিকাব্যগুলিব বচনাব ইতিহাস সম্বন্ধে বলা যায, এগুলি কোনো কোনো ব্যক্তিবিশেষের নামে প্রচলিত হলেও সেই নামধেয কোনো বিশেষ ব্যক্তিপ্রতিভা সমগ্রভাবে ওইগুলি বচনার দাবী করতে পারেন না। বিজ্ঞ জনচিত্তের অভিজ্ঞতালব্ধ নীতিকথার ধারা এ দেশে দীর্ঘ কাল ধরে চলে এসেছে এবং যুগে যুগে কোনো কোনো কবি এগুলিকে একত্রে সুশৃঙ্খলভাবে গেঁথে তুলেছেন। কিন্তু ইতিহাস-উদাসীন ভারতবর্ষ তাঁদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিনাম মনে বাখে নি। তবে যখনই কোনো বৃহৎ প্রতিভাধব ব্যক্তির আবির্ভাব হযেছে তখন বচযিতা হিসাবে তাঁব নামে এই অজস্র প্রকীর্ণ শ্লোকগুলি আরোপিত হযেছে। সুতরাং 'চাণক্যশ্লোক' যে কোনো একজন চাণক্য পণ্ডিতের রচনা, সে কথা বলাব উপায নেই। তেমনই জনৈক বিষ্ণুশর্মা বা হলাযুধ যে সমগ্র 'পঞ্চতন্ত্র' বা 'ধর্মবিবেক' প্রণযন করেছেন তা নয। ববীন্দ্রনাথেব ভাষায় বলতে হয়—

> পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগব, আবব্য উপন্যাস, ইংলণ্ডের আথাব-কাহিনী, স্ক্যাণ্ডি-নেভিয়ার সাগা সাহিত্য এমনি করিযা জন্মিয়াছে, সেইগুলির মধ্যে লোকমুখের বিক্ষিপ্ত কথা এক জাযগায বড়ো আকারে দানা বাঁধিবার চেষ্টা করিযাছে।
>
> —'সাহিত্য', সাহিত্যসৃষ্টি ১৩১৪ আষাঢ়

সুতরাং এই নীতিসাহিত্যগুলি ভারতীয় জনচিত্তের সৃষ্টি—এগুলি জাতিব সম্পদ্। সেইজন্য এই শ্লোকগুলিতে কোনো বিশেষ ব্যক্তিমনের ছাপ নেই এবং একই শ্লোক

ধম্মপদে এবং মহাভারতে অবিরোধে গৃহীত হয়েছে। এ ছাড়া কতকগুলি শ্লোক আবার পঞ্চতন্ত্র, চাণক্যশ্লোক, হিতোপদেশ প্রভৃতি সব কটি গ্রন্থেই দেখা যায়। তার থেকেও বোঝা যায়, উক্ত গ্রন্থগুলি পৃথক পৃথক্ ব্যক্তির স্বতন্ত্র রচনা নয়। অবশ্য পরবর্তী কালে শার্ঙ্গধর, বল্লভদেব -প্রমুখ অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পূর্বতন নানা গ্রন্থ থেকে এই জাতীয় নীতিকথা চয়ন করে শার্ঙ্গধর পদ্ধতি, সুভাষিতাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ সংকলন করেন।

নীতিকথার প্রতি যে প্রবণতা ভারতীয় মনের বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্রমানসেও তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁর 'কণিকা' কাব্যখানি (১৮৯৯) তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই গ্রন্থে পাশ্চাত্য এপিগ্রামের সামান্য স্পর্শ থাকলেও এটিকে প্রাচীন ভারতীয় নীতি-কথার পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা চলে।

বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় নীতিসাহিত্যগুলির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং এই নীতিকথাগুলি প্রায়শঃ প্রবচনের আকারে তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। কখনও কখনও তিনি তাঁর বক্তব্যকে জোরালো সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে, কখনও বা তাকে মনোরম ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করার ইচ্ছায় এই শ্লোকগুলি ব্যবহার করেন। অবশ্য তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্যে সত্যপঠিত এই শ্লোকগুলির যত পৌনঃপুনিক প্রয়োগ দেখা যায়, পরবর্তী কালের সাহিত্যে তা আর তত বেশি চোখে পড়ে না। তখন তার প্রসঙ্গ বা ভাবনির্যাসটুকুই নানা আকারে উল্লিখিত বা আভাসিত হয়েছে।

এই নীতিসাহিত্যগুলি রবীন্দ্রমানসকে কিভাবে অধিকার করেছিল, এবার সংক্ষেপে একে একে তার পরিচয় নেবার চেষ্টা করা যাক।

চাণক্যশ্লোক

চাণক্যশ্লোকের সঙ্গে কবির আশৈশব পরিচয়। এ বিষয়ে স্বয়ং কবির সাক্ষ্য হল—

> চাকরদের মহলে যে-সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাস-রামায়ণই প্রধান।
>
> —'জীবনস্মৃতি' ১৯১২, শিক্ষারম্ভ

'ছেলেবেলা' গ্রন্থেও (১৯৪০) প্রথম বই পড়ার প্রসঙ্গে তাঁর মনে পড়েছে 'কিছু কিছু চাণক্যের শ্লোক'। আবার শুধু বাংলা অনুবাদই নয়, মূল শ্লোকগুলির সঙ্গেও বাল্যাবধি কবি পরিচিত ছিলেন। কেননা, তাঁদের পরিবারে সংস্কৃত চাণক্যশ্লোকের বিশেষ

চর্চা ছিল। এ বিষয়ে স্বয়ং মহর্ষি লিখেছেন—

> সংস্কৃত ভাষার উপর আমার বালক-কাল্যবধিই অনুরাগ ছিল, চাণক্যের শ্লোক যত্নপূর্বক তখন মুখস্থ করিতাম, কোন একটি ভাল শ্লোক শুনিলে অমনি তাহা শিখিয়া লইতাম।
>
> —'আত্মজীবনী' ১৯৬২, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃ ১০

আর স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুরে শিক্ষা ও তাহার সংস্কার' প্রবন্ধে (প্রদীপ, ১৩০৬ ভাদ্র•) জানিয়েছেন—

> মাতাঠাকুরাণী ত কাজকর্মের অবসরে সারাদিনই একখানি বই হাতে লইয়া থাকিতেন। চাণক্যশ্লোক তাঁহার বিশেষ প্রিয় পাঠ্য ছিল, প্রায়ই বইখানি হাতে লইয়া শ্লোকগুলি আওড়াইতেন।

লেখিকার এই উক্তির ভাষা থেকে মনে হয়, তাঁর মা যে শ্লোকগুলি আওড়াতেন সেগুলি সংস্কৃত শ্লোকই, বাংলা অনুবাদ নয়। রবীন্দ্রনাথও স্বভাবতঃ মাতৃকণ্ঠে উচ্চারিত এই শ্লোকগুলির সঙ্গে বাল্যেই পরিচিত হয়ে ওঠেন। মহর্ষির পুত্রদের কাছেও চাণক্য-শ্লোক সমাদৃত হত। সত্যেন্দ্রনাথ-সংকলিত 'নবরত্নমালা'[১] গ্রন্থে (১৯০৭) চাণক্যের বহু শ্লোক স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া কবিপঠিত হেবরলিনের 'কাব্যসংগ্রহ'[২] গ্রন্থে (১৮৪৭) চাণক্যশতক সংকলিত আছে। কবিব্যবহৃত গ্রন্থটিতে পেন্‌সিলে চিহ্নিত এই শ্লোকগুলি তাঁর সচেতন অধ্যয়নের নিদর্শন বহন করে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বিভিন্ন উপলক্ষে অন্ততঃ বিয়াল্লিশ বার চাণক্যের প্রসঙ্গ বা তাঁর শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে কালপ্রচলিত এই শ্লোকগুলির কিছু কিছু অংশ প্রায় বাংলা প্রবচনের রূপ নিয়েছে এবং শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে তার ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। রবীন্দ্ররচনায় তারই অনিবার্য প্রতিফলন দেখা গেছে। তাই ১২৮৬-৮৭ সালের ভারতীতে প্রকাশিত 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে' তার সূত্রপাত এবং ১৩৪৭ সালের ল্যাবরেটরি গল্প ('তিনসঙ্গী') পর্যন্ত তার স্বচ্ছন্দ ব্যবহার চোখে পড়ে। তবে স্বভাবতঃই তাঁর প্রথম যুগের রচনায় উদ্ধৃতির প্রয়োগ সর্বাধিক। পরে ধীরে ধীরে উদ্ধৃতি বিরল হয়ে এসে তা প্রসঙ্গ উল্লেখে পর্যবসিত হয়েছে।

২

গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ চাণক্যের এই

১ দ্রষ্টব্য. দ্বিতীয় খণ্ড, উপাদান-১, গ্রন্থ বিভাগ. ভূমিকা

২ দ্রষ্টব্য. দ্বিতীয় পর্ব, হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহ অধ্যায়

শ্লোকগুলি ব্যবহার করেছেন এবং বলা বাহুল্য, সর্বদা নীতিউপদেশ বিতরণের কাজেই এগুলি প্রযুক্ত হয় নি। গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব থেকে শুরু করে রাজনীতি, সমাজনীতি সাহিত্যরস এমন কি হাস্যরসের প্রয়োজনেও কবি অবাধে এগুলিকে প্রয়োগ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ একটি সর্বজনপরিচিত শ্লোকাংশ ধরা যাক।—

প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।

এটি সর্বপ্রথম ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনে (১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) কন্যার স্নেহশাসনের অধীন পিতার সকৌতুক অনুযোগরূপে প্রযুক্ত হয়। এর পরে 'বাংলা শব্দতত্ত্বে'র ভূমিকায় (১৯০৯) সংস্কৃতের শাসন থেকে মুক্ত বাংলা ভাষার সাবালকত্ব লাভের প্রসঙ্গে কবি এই শ্লোকটি স্মরণ করেন। এই দুই স্থলে শ্লোকটির অর্থের কোনো তারতম্য ঘটে নি। কিন্তু ওই একই সময়ে প্রদত্ত শান্তিনিকেতন ভাষণে দেখি কবি এই শ্লোকটিকে প্রচলিত অর্থ থেকে বহু ঊর্ধ্বে তুলে নিয়ে তাকে নূতন তাৎপর্যে উদ্‌ভাসিত করে তুলেছেন। সেখানে পিতা হয়ে গেছেন 'পরমপিতা' আর পুত্র হলেন মানবসাধারণ। তাই—

> বাইরের শাসন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পুত্রের সঙ্গে পিতার অন্তরের যোগ কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। যখনই সেই বাইরের শাসনের প্রয়োজন চলে যায় তখনই পিতাপুত্রের মাঝখানের আনন্দসম্বন্ধ একেবারে অব্যাহত হয়ে ওঠে।...তখনই পিতার প্রকাশ পুত্রের কাছে সম্পূর্ণ হয়। তখনই যিনি রুদ্ররূপে আঘাত করেছিলেন তিনিই প্রসন্নতা দ্বারা রক্ষা করেন। ভয় তখন আনন্দে এবং শাসন তখন মুক্তিতে পরিণত হয়।
>
> —'শান্তিনিকেতন' ১, নিয়ম ও মুক্তি ১৩১৫ চৈত্র

সুপরিচিত চাণক্যশ্লোকটির এই ধরনের অর্থ-সম্প্রসারণ বিশেষ অভিনব, সন্দেহ নেই।

'আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ' শ্লোকের অর্থও রবীন্দ্রনাথের হাতে অনুরূপভাবেই সম্প্রসারিত হয়েছে। তাঁর মতে যে মানব-আত্মা কুলের চেয়ে, গ্রামের চেয়ে, দেশের চেয়ে, সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বড়ো 'সেই মানুষের মর্যাদার কোথাও সীমা ছিল না, ব্রহ্মের মধ্যেই তাহার সমাপ্তি' ('ধর্ম', ততঃকিম্ ১৩১৪ অগ্রহায়ণ)। তবে এই অর্থই উক্ত শ্লোকটির অভিপ্রেত অর্থ বলে মনে হয় না।

আধ্যাত্মিক তত্ত্বব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে চাণক্যের নীতিগুলির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ এক দিকে ব্যক্তিমানুষের চরিত্রশক্তিকে উন্নত করার প্রয়াস পেয়েছেন, অন্য দিকে শক্তি-মদমত্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট সমাজকে স্বস্থ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি মনে করেন আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক বিশ্বে শক্তি যে আজও একান্ত হয়ে উঠে আধিপত্য করতে পারে

না, তার কারণ সুষমা তার পথ আগলে আছে। তাই—

> শক্তি যখন অন্ধ অহংকারে (তাকে) অতিক্রম করতে যায়, তখনি তার আত্মঘাত ঘটে।...সেইজন্যে মানুষ বলেছে: অতিদর্পে হতা লঙ্কা। সেইজন্যে ব্যাবিলনের অত্যুদ্ধত সৌধচূড়ার পতনবার্তা এখনো মানুষ স্মরণ করে।

—'কালান্তর', বাতায়নিকের পত্র ১৩২৬ আষাঢ়

'সমূহ' গ্রন্থের অন্তর্গত বঙ্গবিভাগ প্রবন্ধে (১৯০৪) দেখি, বঙ্গবিভাগ এবং শিক্ষাবিধির ব্যাপারে কবি বৃটিশ রাজশক্তিকে অবিশ্বাস করে স্মরণ করেছেন—

বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।

চাণক্যের নীতি-উপদেশের অনুকূলতা করেই যে সর্বত্র কবি সেগুলি উদ্‌ধৃত করেছেন, তা বলা যায় না। পুঁথিগত নীতির চেয়ে জীবননীতির প্রতিই কবি অধিকতর আস্থাশীল। তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই শুষ্ক উপদেশ পালন ও তদনুসারে শিশুদের শিক্ষাদান তিনি অনুমোদন করতে পারেন নি। তাঁর নব্যপন্থী নবীনকিশোর সেই কারণেই উষ্মাসহকারে বলে—

> সন্তানদের মাথার মধ্যে চাণক্যের শ্লোক প্রবেশ করাইয়া সেই মাথাগুলো ইহকাল ও পরকালের মতো ভক্ষ্য পদার্থ করিয়া রাখো।

—'চিঠিপত্র' ১৮৮৭, অধ্যায় ৮

'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে' (নবম পত্র, ১২৮৬ পৌষ) তিনি 'লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ' শ্লোকের প্রবল প্রতিবাদ করেন। ছত্রিশ বৎসর পরেও এই শ্লোক সম্বন্ধে তাঁর মতের কোনো পরিবর্তন দেখা যায় নি। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য হল—

> একদিন নীতিবিৎরা বলিয়াছিল, লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ। বেত বাঁচাইলে ছেলে মাটি করা হয়, এ কথা সুপ্রসিদ্ধ ছিল। অথচ আজ দেখি, শিক্ষার মধ্যে বিশ্বের আনন্দস্বর ক্রমে লাগিতেছে—সেখানে বাঁশের জায়গা ক্রমেই বাঁশি দখল করিল।

—'সাহিত্যের পথে', কবির কৈফিয়ত ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ

তবে স্বভাবতঃই কবির সবচেয়ে বিরাগ ছিল কাপুরুষতার চূড়ান্ত নিদর্শন—'আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি' শ্লোকটির প্রতি। 'বিবিধ প্রসঙ্গে' স্ত্রৈণের (১২৮৮ ভাদ্র) সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে কবি এই শ্লোকাংশটি উদ্‌ধৃত করে বলেছেন, যে ব্যক্তি উক্ত শ্লোকটিকেই সার বলে জেনেছে, সেই স্ত্রৈণ। পরবর্তী কালে কবিকে আর কখনও শ্লোকটির উল্লেখ করতে দেখা যায় নি। তবে বিস্ময়ের বিষয় হল, ওই স্বার্থসংকীর্ণ ভীরুতার নীতিটি প্রাচীন ভারতবর্ষে বহুল-প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতা, ধর্মবিবেক,

গরুড়পুরাণ, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত দেখি। উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে যথাস্থানে এগুলি উল্লিখিত হয়েছে।

যাই হক, এই নীতিগুলিকে কবি সর্বদা নীরস উপদেশরূপেই ব্যবহার করেন নি। কখনও কখনও সেগুলিতে সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে তিনি তার থেকে যথোচিত পরিমাণে কৌতুকরস নিষ্কাশন করে নিয়েছেন। তাই 'তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবদ্ কিঞ্চিন্ন ভাষতে' শ্লোকাংশটি 'সে' গ্রন্থে (১৯৩৭, অধ্যায় ২) তাঁকে কৌতুকরস সৃষ্টির উপকরণ জুগিয়েছে। উক্ত গ্রন্থে 'দাদা' রূপে কবি বলেছেন—

চাণক্যপণ্ডিত শ্রেণীবিশেষের আয়ুবৃদ্ধির জন্য বলেছেন :

তাবচ্চ বাঁচতে মূর্খো যাবৎ ন বক্‌বকায়তে।

তার উত্তরে 'সে' বলে—

নয়া-চাণক্য জগতের হিতের জন্য যে উপদেশ দিয়েছেন সেটাও তোমার জানা দরকার দাদা, ছন্দ মিলিয়েই লেখা :

তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি যখন পণ্ডিত চুপায়তে।

৩

দেখা গেল, আমাদের চিরাভ্যস্ত ব্যবহারজীর্ণ চাণক্যশ্লোকগুলিও প্রয়োগকৌশলের গুণে কবির হাতে কেমন নূতন অর্থে ও অভিনব ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাই বলে নীতিজ্ঞ চাণক্যের কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে তিনি যে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, তা বলা যায় না। তাই দেখি 'পঞ্চভূতে'র অন্যতমা দীপ্তি চাণক্যের প্রতি বক্র কটাক্ষ করে বলে—

পৃথিবীর বড়ো বড়ো খ্যাতির উপরে মাঝে মাঝে অবহেলার আড়াল পড়া উচিত।...মাঝে মাঝে সর্বলোকের নিকট প্রমাণ হওয়া উচিত যে কালিদাস অপেক্ষা চাণক্য বড় কবি।

—'পঞ্চভূত', প্রাঞ্জলতা ১৩০১ চৈত্র

আবার ওই একই সময়ে আমাদের দেশে জাতীয় সাহিত্যের অভাব দেখে কবি মন্তব্য করেছেন—

বিচ্ছিন্ন দেশে বিচ্ছিন্ন কালে গুণজ্ঞ রাজার আশ্রয়ে এক-এক জন সাহিত্যকার আপন কীর্তি স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কালিদাস কেবল বিক্রমাদিত্যের, চাঁদবর্দি কেবল পৃথ্বীরাজের, চাণক্য কেবল চন্দ্রগুপ্তের। তাঁহারা তৎকালীন সমস্ত ভারতবর্ষের নহেন, এমন-কি তৎপ্রদেশেও তাঁহাদের পূর্ববর্তী ও

পরবর্তী কোনো যোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

—'সাহিত্য', বাংলা জাতীয় সাহিত্য ১৩০১ চৈত্র

রবীন্দ্রনাথ এখানে চাণক্যকে কালিদাস প্রভৃতি রাজসভাকবির সমান মর্যাদা দিয়েছেন। তবে এ ক্ষেত্রে বলা বোধ করি অসংগত হবে না যে জনশ্রুতি অনুসারে রাজা চন্দ্রগুপ্তের কূটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী (কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র-রচয়িতা বলে খ্যাত) চাণক্য ঠিক ওই পর্যায়ের কবি নন্। কিন্তু জাতীয় সাহিত্য রচয়িতা হিসাবে চাণক্যকে একান্তভাবে অপাংক্তেয় করে রাখাও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে দেশের সাধারণ লোকের মুখে মুখে যা বহুল-প্রচলিত, চাণক্যশ্লোকে তাই একত্রে সংকলিত। অধুনা-প্রকাশিত Cāṇakya-Nīti-Text-Tradition (Vishveshvaranand Vedic Research Institute, 1963) গ্রন্থে তাই বিভিন্ন স্থলে প্রচলিত 'লঘু চাণক্য', 'বৃদ্ধ চাণক্য' প্রভৃতি বিচিত্র সংকলন স্থান পেয়েছে। সুতরাং চাণক্যশ্লোককে আমাদের প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য বলা চলে।

যাই হক, ১৩০১ সালের চৈত্র মাসে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধে চাণক্য সম্বন্ধে কবির দুটি প্রায় পরস্পরবিরোধী উক্তি পাওয়া গেলেও মোটের উপর চাণক্যকে তিনি নীতিজ্ঞ পণ্ডিতের বেশি মর্যাদা দেন নি। আর শেষ বয়সেও যে চাণক্য সম্বন্ধে তাঁর এই জাতীয় মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয় নি তার 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে (১৯৩৪, প্রথম অধ্যায়) তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে গুপ্ত বিপ্লবী কানাই গুপ্ত বাজে হুজুগ সৃষ্টি করে লোক-ঠকানোর অভিপ্রায়ে 'চাণক্য-জয়ন্তী' করার পরিকল্পনা করেছে।

তবু যে শ্লোকগুলির দ্বারা শিশু কবির সাহিত্যপাঠের সূচনা এবং শেষ জীবন পর্যন্ত যেগুলি তাঁর স্মৃতিতে অম্লানরূপে বিরাজিত, সেই চাণক্যশ্লোকের গুরুত্ব রবীন্দ্র-সাহিত্যে উপেক্ষণীয় নয় বলেই মনে হয়।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো স্বতন্ত্র মন্তব্য দেখা যায় না। কিন্তু এই গ্রন্থ দুটির সম্বন্ধে কবি যে আদৌ উদাসীন ছিলেন না, তাঁর সাহিত্যে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি তার প্রমাণ বহন করে। অবশ্য কবি-কর্তৃক উদ্ধৃত এই শ্লোকগুলির অধিকাংশই চাণক্যশ্লোক বা অন্য কোনো সংকলন গ্রন্থে পাওয়া যায়। সুতরাং শ্লোকগুলি কবি মূলতঃ পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশ থেকে গ্রহণ করেছিলেন কিনা বলা কঠিন। তবে কবিব্যবহৃত কতকগুলি শ্লোক শুধুমাত্র এই গ্রন্থ দুটিতেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যে সেইখানেই গ্রন্থ দুটির স্বাতন্ত্র্য।

পঞ্চতন্ত্রের অন্তর্গত 'বসুধৈব কুটুম্বকং' শ্লোকাংশটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে' (সপ্তম পত্র ১২৮৬ ফাল্গুন) স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়ক তর্কের প্রসঙ্গে কবি বেশ মুন্‌শীয়ানার সঙ্গেই এটি ব্যবহার করেছিলেন।—

> গরিব 'পরপুরুষ' কথাটি কী অপরাধ করেছে, যে, সে বেচারির ওপরে এত নিগ্রহ! পর বলেই কি তার এত দোষ? কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলে মহাত্মা লোকদের 'বসুধৈব কুটুম্বকং'।

এখানে কবি এই উক্তিটিকে পঞ্চতন্ত্রের অন্তর্গত বলে নির্দেশ না করে সাধারণ শাস্ত্রবাক্য বলে উল্লেখ করেছেন। যাই হক, 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থের বেশি দেখা ও কম দেখা (১২৮৮ মাঘ) এবং ধরা কথা (১২৮৮ আশ্বিন) প্রবন্ধ দুটিতে কবি ভালোবাসার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়েও এই উক্তি স্মরণ করেন। আর 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী'তে এই শ্লোকাংশটিকে অর্থান্তরে টেনে নিয়ে গিয়ে সকৌতুকে মন্তব্য করেন—

> অত্যন্ত পরুষভাষী রুক্ষস্বভাব ব্যক্তিও নিজ আচরণের প্রশংসাচ্ছলে বলতে পারেন, 'আমার হৃদয় নিরতিশয় উদার, কারণ নিতান্ত নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিকেও আমি সহজেই শ্যালক সম্ভাষণ করে থাকি এবং সে হিসাবে গণনা করে দেখতে গেলে প্রায় আমার 'বসুধৈব কুটুম্বকং'।
>
> —'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী', ভূমিকা ১৮৯১

কবির পরিণত কালের সাহিত্যে আর এই উদ্‌ধৃতিটি দেখা যায় নি।

পঞ্চতন্ত্রের 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' উদ্‌ধৃতিটিও রবীন্দ্রনাথের নিপুণ প্রয়োগকৌশলের পরিচয় বহন করে। শখের লোকহিতকর কার্যের প্রতি কটাক্ষ করে কবি এই শ্লোকাংশের সহায়তায় মন্তব্য করেছেন—

> 'এই লোকসাধারণের জন্য কিছু করা উচিত' হঠাৎ এই ভাবনা আমাদের মাথায় চাপিয়াছে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। এই কারণে ভাবনার জন্যই ভাবনা হয়।
>
> —'কালান্তর', লোকহিত ১৩২১ ভাদ্র

মহৎ কর্মের প্রেরণারূপেও কবি পুনরায় ওই উক্তিটি স্মরণ করেন।—

> সংস্কৃত শ্লোকে বলে: যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। অর্থাৎ, ভাবনাই হচ্ছে সাধনার সৃষ্টিশক্তির মূলে। নিজের সম্বন্ধে নিজের দেশ সম্বন্ধে বড়ো করে ভাবনা করবার দরকার আছে, নইলে কর্মে জোর পৌঁছয় না।
>
> —'কালান্তর', বৃহত্তর ভারত ১৩৩৪ শ্রাবণ

পঞ্চতন্ত্রের শ্লোকগুলির তাৎপর্য সম্বন্ধেও কবি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং গভীর-

ভাবেই তার নিহিতার্থ অনুধাবন করার প্রয়াস পান। তাই বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ের প্রসঙ্গে তিনি পঞ্চতন্ত্রের একটি উক্তির ব্যাখ্যা করেন।—

> আমাদের দেশের কবি তাই বলিয়াছেন, 'গতানুগতিকো লোকো ন লোকঃ পারমার্থিকঃ' অর্থাৎ লোকে গতানুগতিক হইয়া থাকে, পারমার্থিক লোক দেখা যায় না। গতানুগতিক লোক যে পারমার্থিক নহে এবং পারমার্থিক লোক গতানুগতিক হইয়া থাকিতে পারেন না, কবি এই নিগূঢ় কথাটি অনুভব করিয়াছেন।
>
> —'চারিত্রপূজা', বিদ্যাসাগর চরিত-২, ১৩০৫

এই মন্তব্যের দ্বারা কবিচিত্তে পঞ্চতন্ত্রের শ্লোকের গুরুত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশে যে 'হিতোপদেশ' (আনু. ১০০০-১৩০০) প্রচলিত, সেটি মুখ্যতঃ পঞ্চতন্ত্র থেকেই নেওয়া।[১] তাই এ গ্রন্থের বহু শ্লোকের সঙ্গে পঞ্চতন্ত্রের শ্লোকের মিল দেখি। চাণক্যশ্লোকেরও বহু শ্লোক এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া রবীন্দ্র-উল্লিখিত 'অন্যদা ভূষণং পুংসঃ ক্ষমা লজ্জেব যোষিতঃ' ইত্যাদি শ্লোকটি যে এই গ্রন্থে পাই, সেটি মাঘের শিশুপালবধ কাব্যেও (২।৪৪) দেখা যায়।

এই গ্রন্থের কতগুলি শ্লোক কবি ব্যবহার করেছেন পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগটি দেখলেই তা বোঝা যাবে। হিতোপদেশের শ্লোকগুলিকে কবি সাধারণভাবে প্রচলিত অর্থেই প্রয়োগ করেছেন, তাতে কোনো গভীর তাৎপর্য আরোপ করেন নি। তবে এই প্রসঙ্গে একটি শ্লোকের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেটি হল—

> দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
> ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ ॥

এই শ্লোকের 'দরিদ্রান ভর কৌন্তেয়' অংশটুকু কবি 'ছন্দ' গ্রন্থের ছন্দের হসন্ত হলন্তঃ তৃতীয় পর্যায় প্রবন্ধে (১৩৩৯ কার্তিক) এবং শ্লোকের প্রথম পংক্তিটি হেমন্তবালা দেবীকে লেখা এক পত্রে ('চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১০৬, ১৩৩৯ অগ্রহায়ণ ৭) উদ্ধৃত করেছেন। এই দুই স্থলেই তিনি এটিকে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। হেমন্তবালাকে লিখিত পত্র থেকে আরও জানা যায় যে তিনি এটিকে গীতার অন্তর্গত বলে মনে করতেন। কিন্তু ভগবদ্গীতায় এই শ্লোকটি পাওয়া যায় না।

বররুচি-ঘটকর্পর-বেতালভট্ট

বিক্রমাদিত্যের (ঐতিহাসিকদের মতে সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) রাজসভায় যে নবরত্ন সমাবেশের কাহিনী পাওয়া যায়, বররুচি-ঘটকর্পর-বেতালভট্ট তার তিন রত্ন। কিন্তু

---

১ দ্রষ্টব্য : 'A History of Sanskrit Literature' 1948, by A. B. Keith

এটি একটি জনশ্রুতি মাত্র। এ কাহিনী যে সত্য নয়, সে বিষয়ে ঐতিহাসিক মহলে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। উক্ত তিন কবি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক Keith তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—

> Other minor collections of gnomic stanzas are attributed to Vararuci—which of the many is meant is quite unknown, to Ghaṭakarpara and to Vetāla Bhaṭṭa, under the styles of *Nitiratna*, *Nitisara* and *Nitipradipa* , they contain some excellent stanzas, but their date is quite uncertain
>
> —'A History of Sanskrit Literature' 1928, Ch X, Gnomic Poetry p 231

নীতিরত্ন, নীতিসার ও নীতিপ্রদীপ—এই তিনটি গ্রন্থই হেবরলিনের 'কাব্যসংগ্রহ'[১] গ্রন্থে আছে এবং উক্ত গ্রন্থ থেকেই সম্ভবতঃ এই নীতিশ্লোকগুলির সঙ্গে কবির প্রথম পরিচয়। পরবর্তী কালে তিনি প্রয়োজনমতো এগুলির থেকে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। তবে এই শ্লোকগুলি কবি যে কেবলমাত্র হেবরলিনের গ্রন্থ থেকেই ব্যবহার করেছেন, তা বলা যায় না। কারণ রবীন্দ্রধৃত পাঠ অনেকস্থলেই হেবরলিনের পাঠের সঙ্গে মেলে না। এমন কি, নবরত্নমালা বা সুভাষিত রত্নভাণ্ডাগার প্রভৃতি গ্রন্থে ধৃত শ্লোকের সঙ্গেও তার পাঠভেদ দেখি। বস্তুতঃ রবীন্দ্রধৃত পাঠের উৎস নির্ণয় করা সর্বত্র সম্ভব হয় নি। উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে এ সম্বন্ধে যথাসম্ভব নির্দেশ দেওয়া গেল।

রবীন্দ্রসাহিত্যে ঘটকর্পরের নীতিসার গ্রন্থের অন্ততঃ পাঁচটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দেখা যায়। কিন্তু তার কোনোটিই কবির কাছে বিশেষ গুরুত্ব পায় নি। এ স্থলে সেগুলির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। পক্ষান্তরে রবীন্দ্ররচনায় উদ্ধৃত বররুচির নীতিরত্ন গ্রন্থের দুটি শ্লোকের একটি তার কাছে কিছু পরিমাণ গুরুত্ব পেয়েছে। সেটি এই—

ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥ ২

সাহিত্য ও রসের প্রসঙ্গে কবি ১৯০২ ('বিচিত্র প্রবন্ধ', বাজে কথা) থেকে ১৯৩৯ সাল ('সাহিত্যের স্বরূপ', গদ্যকাব্য) পর্যন্ত অন্ততঃ আটবার বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই শ্লোকের প্রয়োগ করেছেন। তার থেকে বোঝা যায়, এই শ্লোকটি কবির মনকে বিশেষ

১ দ্রষ্টব্য: দ্বিতীয় পর্ব, হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহ অধ্যায়

ভাবেই অধিকার করেছিল এবং তার বক্তব্যের প্রতিও ছিল তাঁর পূর্ণ সমর্থন। ঠিক এই অর্থেই তিনি বিচিত্র প্রবন্ধের অন্তর্গত বাজে কথা প্রবন্ধে (১৩০৯ আশ্বিন) বেতালভট্টের একটি শ্লোক স্মরণ করেছেন। সেটি হল—

সিংহক্ষুণ্ণকরীন্দ্রকুম্ভগলিতং রক্তাক্তমুক্তাফলং
কান্তারে বদরীধিয়া দ্রুতমগাদ্ ভিল্লস্য পত্নী মুদা।
পাণীভ্যাবগুহ্য শুক্লকঠিনং তদ্বীক্ষ্য দূরে জহা-
বস্থানে পততামতীব মহতামেতাদৃশী স্যাদ্‌গতিঃ ॥ ৮

শুধুমাত্র এই শ্লোকটি ছাড়া বেতালভট্টের নীতিপ্রদীপ গ্রন্থ থেকে কবি আর কোন শ্লোক স্মরণ করেন নি।

হলায়ুধ

আনুমানিক ৯০০-১০০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত কবি হলায়ুধের নামে 'ধর্মবিবেক' নামক একটি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থে উক্ত কাব্যটি সংকলিত আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক Keith তাঁর A History of Sanskrit Literature গ্রন্থে এই কাব্যের উল্লেখ করেন নি। সুতরাং মনে হয় হেবরলিনের গ্রন্থ থেকেই উক্ত কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়।

এই কাব্যের শ্লোকগুলি দেখলেই বোঝা যায়, এগুলি নানা নীতিকথার সংকলন মাত্র। এতে কোনো উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা দার্শনিক ব্যাখ্যা নেই। তা ছাড়া এই কাব্যের কিছু শ্লোক মহাভারত, চাণক্যশ্লোক বা পঞ্চতন্ত্র থেকে নেওয়া। ধর্মবিবেক থেকে কবি একটি উদ্ধৃতি তাঁর 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' গ্রন্থে (১৮৮৩, সপ্তম পরিচ্ছেদ) ব্যবহার করেছেন যেটির ভাবাদর্শ অন্যান্য নীতিশ্লোকের থেকে পৃথক্। সেটি হল—

অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরং।

এতে যে রহস্যপ্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছে তাকে ঠিক নীতিপর্যায়ভুক্ত বলা যায় না।

কুসুমদেব

কবি কুসুমদেবের নামে 'দৃষ্টান্তশতক' নামক নীতিগ্রন্থটি প্রচলিত। কিন্তু কবির পরিচয় সম্বন্ধে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব। Keith উক্ত কবি এবং তাঁর কাব্য সম্বন্ধীয় তথ্যের উৎস হিসাবে হেবরলিনের 'কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। মনে হয় রবীন্দ্রনাথও হেবরলিনের গ্রন্থ থেকেই দৃষ্টান্তশতকের শ্লোকগুলির সঙ্গে পরিচিত হন।

তাঁর সাহিত্যে এই শ্লোকগুলির কোনো উদ্‌ধৃতি চোখে পড়ে নি। শুধু একটি পত্রে একটিমাত্র শ্লোকের ভাবার্থটুকু উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন—

মনে আছে সংস্কৃত ভাষার একটি শ্লোকে পড়েছিলুম—চোখে যে কাজল ভূষণ, সেই কাজলই দূষণ মুখের উপরে।

—'চিঠিপত্র' ৯, কিশোরকান্তকে লেখা (মন্তব্য), ১৯৩৮ অক্টোবর ২০

উক্ত শ্লোকের মূল সংস্কৃত পংক্তিটি এই।—

অঞ্জনং দূষণং বক্ত্রে ভূষণং কিল লোচনে ॥ ৮২

রবীন্দ্র-ব্যবহৃত হেবরলিনের গ্রন্থে দৃষ্টান্তশতকের ৮২-সংখ্যক শ্লোকের এই পংক্তির নীচে পেনসিলে একটি পাদরেখা টানা আছে। তার থেকে অনুমান করা চলে যে কবি হেবরলিনের গ্রন্থ থেকে উক্ত শ্লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

অষ্টরত্নং

হেবরলিনের 'কাব্যসংগ্রহে' ধৃত অষ্টরত্ন নামক শ্লোকাষ্টকটির সঙ্গেও কবি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন এবং তার অষ্টম শ্লোকটি তিনি তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন। পরবর্তী 'হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহ' অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

পরিশেষ : যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ' গ্রন্থটি ঠিক নীতিসাহিত্য পর্যায়ের নয়। বস্তুতঃ এটিকে দার্শনিক গ্রন্থের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা চলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের যে একটিমাত্র শ্লোক স্মরণ করেছেন, সেটি নীতিকথার সমগোত্রীয় বলে নীতিসাহিত্যের প্রসঙ্গে সেটির আলোচনা করা হচ্ছে।

এই গ্রন্থের সঙ্গে কবির কতদূর পরিচয় ছিল, তা জানা যায় না। এ গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁর কোনো মন্তব্যও চোখে পড়ে নি। এমন কি যে শ্লোকটি (১৪।১১) তিনি উদ্‌ধৃত করেছেন সেটিও অন্যের দ্বারা উল্লিখিত। যাই হক, এই গ্রন্থের কবি-ব্যবহৃত শ্লোকের সম্পূর্ণ প্রসঙ্গটিই এখানে উদ্‌ধৃত হল।—

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাসাগরের জীবনী সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার আরম্ভে যোগবাশিষ্ঠ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্‌ধৃত করিয়া দিয়াছেন—

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি ॥

তরুলতাও জীবনধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবনধারণ করে; কিন্তু সে-ই প্রকৃতরূপে

জীবিত যে মননের দ্বারা জীবিত থাকে।

মনের জীবন, মননক্রিয়া এবং সেই জীবনেই মনুষ্যত্ব। সাধারণ বাঙালির সহিত বিদ্যাসাগরের যে একটি জাতিগত সুমহান্ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, সে প্রভেদ শাস্ত্রীমহাশয় যোগবাশিষ্ঠের একটি মাত্র শ্লোকের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়াছেন।

—'চারিত্রপূজা', বিদ্যাসাগর-চরিত ২, ১৩০৫

বিদ্যাসাগরের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাঞ্জলি থেকে বোঝা যায় যে, উদ্ধৃত শ্লোকটির অর্থ ও তাৎপর্য কবির হৃদয়ের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিল।

পুরাণ-প্রসঙ্গ

বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগের পরবর্তী কালের ভারতবর্ষ যখন 'অলস কল্পনার বিস্তারে নিরুদ্যম' হয়ে বসেছিল, সেই সময়কার সৃষ্টি পুরাণ। এতে বৈদিক বা বৌদ্ধ ভারতের বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তি অথবা মহাকাব্যে বর্ণিত কর্মোদ্যম কোনোটাই পাই না। কিন্তু পুরাণের কাহিনীগুলি ভাব ও কল্পনার বিস্তারে এবং ঐশ্বর্যে বিচিত্র হয়ে যুগে যুগে ভারতীয় সংস্কৃতিকে নব নব রূপে বিকশিত করে তুলেছে।—

> এই কারণে বৈজ্ঞানিকযুগে মানুষের পৌরাণিক কাহনা আর-কোনো কাজে লাগে না, কেবল কবির ব্যবহারের পক্ষে তাহা পুরাতন হইল না। মানুষের নবীন বিশ্বানুভূতি ঐ কাহিনীর পথ দিয়া আনাগোনা করিয়া ঐখানে আপন চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। অনুভূতির সেই নবীনতা যাহার চিত্তকে উদ্‌বোধিত করে সে ঐ পুরাতন পথটাকে স্বভাবতই ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়।
>
> —'পথের সঞ্চয়', কবি য়েট্‌স্‌ ১৩১৯ ভাদ্র

এখানে পুরাণকাহিনী সম্বন্ধে অনুভূতির যে নবীনতার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ কবিমাত্রের মধ্যেই তা অল্পাধিক পরিমাণে দেখা যায়। প্রাচীন ভারতীয় কবিদের মধ্যে এ বিষয়ে সর্বাগ্রগণ্য হলেন মহাকবি কালিদাস। তাঁর কুমারসম্ভব কাব্যখানি পৌরাণিক কল্পনার আশ্চর্য সুন্দর রূপায়ণ। তবে এ কাব্যের কাহিনী মূলতঃ পুরাণের হরপার্বতীর উপাখ্যানকে অবলম্বন করলেও তাকে বহু দূরে অতিক্রম করে গেছে। আধুনিক কালে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র পৌরাণিক কাহিনীর 'পুরাতন পথে' আপন কল্পনাকে চালিত করে তার থেকে নূতন তাৎপর্য নিষ্কাশন করে নিয়েছেন, কখনও বা তাকে নূতন রূপে সৃষ্টি করে তুলেছেন। যথাস্থানে তার পরিচয় দেওয়া যাবে।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই উত্তরাধিকার ব্যাপকতর হয়ে দেখা গেছে। পুরাণের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা চিত্র বা কোনো কোনো চরিত্র তাঁর কল্পনাকে অধিকার করে তাঁর সাহিত্যে নানা উপলক্ষে আত্মপ্রকাশ করেছে, কখনও বা তাঁকে নূতন সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছে। আবার পুরাণের কল্পনা ও ভাবাদর্শ যুগে যুগে যে কিভাবে বিবর্তিত হয়ে এসেছে তার প্রতিও ইতিহাসসচেতন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। সেই সঙ্গেই দেখি তাঁর সজীব কৌতূহল পুরাণসাহিত্যের উদ্‌ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসটি অনুসন্ধান করে ফিরেছে। তাই তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে—

পৌরাণিক ধর্ম ঐতিহাসিক হিন্দুধর্ম। কালক্রমে হিন্দুর অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। বৈদিক আর্যগণ যে সমাজ, যে রীতি, যে বিশ্বাস, যে মানসিক প্রকৃতি লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, অনার্যদের সংঘর্ষে, মিশ্রণে, বিচিত্র অবস্থান্তরে, স্বভাবের নিয়মে ক্রমশই তাহা রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে। সেই-সকল নব নব অভিব্যক্তি নব নব পুরাণে আপনাকে আকারবদ্ধ করিয়াছে।

—'আধুনিক সাহিত্য', সাকার ও নিরাকার ১৩০৫ আশ্বিন

পুরাণের এই নব নব অভিব্যক্তিকে আশ্রয় করে তাঁর কল্পনা চলেছে নূতন সৃষ্টির পথে।

ভারতীয় পুরাণ তাঁর চিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল দুই ভাবে—এক দিকে পুরাণের দেবদেবীকল্পনা, অন্য দিকে পুরাণবর্ণিত নরনারীর কাহিনীকল্পনা। এই দুই জাতীয় কল্পনাই নানা উপলক্ষে রবীন্দ্রসাহিত্যে স্থান পেয়েছে। কেননা পৌরাণিক কল্পনার অন্তরালে কবি 'বিশ্বানুভূতি'র বিচিত্র রূপ দেখেছিলেন। অবশ্য সেই 'বিশ্বানুভূতি'র মধ্যে গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের চেয়ে তার অবাধ কল্পনার লীলাই তাঁর কবিমানসকে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলেছিল।

রবীন্দ্রমানসে তথা তাঁর সাহিত্যে পুরাণের প্রকৃত স্থান নির্ণয় করে তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিতে গেলে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক এবং তার আলোচনার জন্য প্রাজ্ঞজনোচিত সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সুগভীর মনন-শক্তির প্রয়োজন। পুরাণের এই জাতীয় সবিস্তার আলোচনা বর্তমান নিবন্ধের অভিপ্রায়-বহির্ভূত। অথচ ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে পুরাণের একটি বড়ো স্থান আছে। তাই রবীন্দ্রমানসে ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে পুরাণকে উপেক্ষা করা যায় না। সেইজন্য এখানে রবীন্দ্রনাথের পুরাণপ্রবণতার বিশেষ কয়েক-গুলি দিক্ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। আশা করা যায় তার থেকেই পুরাণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রমনোভাবের গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে আভাসিত হতে পারবে।

২

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে স্পষ্টই দেখা গেছে যে বৈদিক, বৌদ্ধ বা সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচয় যথেষ্ট ছিল। ওই গ্রন্থগুলির বহু শ্লোক তিনি তাঁর সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন। সেই শ্লোকগুলির সঙ্গে কবি মূল গ্রন্থ বা কোনোরকম সংকলন গ্রন্থের সাহায্যে পরিচিত হয়েছিলেন, এ কথা বলা যায়। কিন্তু পুরাণ সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। অষ্টাদশ মহাপুরাণ বা অর্বাচীন উপপুরাণ, এর

কোনোটির সঙ্গেই কবি পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয় না। পুরাণের দুটি মাত্র আংশিক উদ্ধৃতি তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। একটি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের 'ঊর্ধ্বপূর্ণমধঃ পূর্ণঃ' (১।২৫।২৬), অন্যটি দেবী পুরাণের (অধ্যায় ৪৬)—

প্রাবাহো নিবহশ্চৈব উদ্বহঃ সংবহস্তথা।
বিবহঃ প্রবহশ্চৈব পরিবাহস্তথৈব চ।
অন্তরীক্ষ্যে চ বাহ্যে তে পৃথঙ্‌মার্গবিচারিণঃ॥

কিন্তু এই উদ্ধৃতি দুটিও মূল গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত বলে বোধ হয় না। প্রথমটি কেশবচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'ব্রাহ্মধর্ম প্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ' নামক সংকলন গ্রন্থে (১৯০৪) উদ্ধৃত আছে। ঐ গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পড়া বিচিত্র নয় এবং উক্ত গ্রন্থ থেকেই কবি শ্লোকাংশটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, এমন কথা মনে করা যায়। আর বিশেষ পরিভাষা-সৃষ্টির প্রয়োজনে কবি দেবী পুরাণের শ্লোকটি খুঁজে নিয়েছিলেন। অতএব এই গ্রন্থও কবির পরিচিত ও অভ্যস্ত ছিল না এবং শ্লোকটিও স্বতঃই তাঁর লেখনীতে এসে যায় নি। তবে এ সম্পর্কে নিঃসংশয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়।

এই শ্লোক দুটি ছাড়া কবি-ব্যবহৃত আরও কিছু শ্লোক গরুড় পুরাণে দেখা গেছে। কিন্তু এই শ্লোকগুলি পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থেও দেখা যায়, এবং এই নীতি-গ্রন্থগুলির সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। তাই মনে হয় ঐ উদ্ধৃতিগুলির আকর-গ্রন্থ হিসাবে কবি গরুড় পুরাণকে ব্যবহার করেন নি, গরুড় পুরাণের সঙ্গে কবির কোনো পরিচয় ছিল বলেও জানা যায় না। যাই হক, পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে এই শ্লোকগুলি যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পুরাণভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এই শ্লোকগুলির গুরুত্ব নিতান্ত নগণ্য। প্রধানতঃ পুরাণের দেবদেবীকল্পনাই তাঁর চিত্তকে অধিকার করে ছিল। তাঁর সাহিত্যে নানা উপলক্ষে তাঁদের দেখা গেছে। তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে শিব বা রুদ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা নারায়ণ, জগন্নাথ, ইন্দ্র, গণেশ, কার্তিক, কুবের, কন্দর্প, বরুণ, বিশ্বকর্মা, বলরাম, রাহু, কলি, শনি, নারদ, অরুণ-প্রমুখ দেবতা ও দেবকল্প ব্যক্তি এবং দুর্গা বা অন্নপূর্ণা বা পার্বতী, চামুণ্ডা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ষষ্ঠী, উর্বশী প্রভৃতি দেবী ও অপ্সরীর উল্লেখ ও আলোচনা পাওয়া যায়। এঁদের অনেককেই কবি অতিপরিচয়ের ধূলিলিপ্ত ঔদাসীন্য থেকে মুক্ত করে অপরিচিতের নূতন বেশে সাজিয়ে দিয়েছেন। কখনও তার অধুনাবিস্মৃত প্রাক্তন পরিচয়কে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, কখনও বা তার উপর আপন চিত্তভাব আরোপ করে তাকে অনেকাংশে নূতন রূপে উপস্থাপিত করেছেন। পৌরাণিক দেবদেবী ও পুরাণের কাহিনীকল্পনা

রবীন্দ্রসাহিত্যে কিভাবে রূপ লাভ করেছে এখানে সংক্ষেপে তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যাক।

দেবকল্পনা : শিব

পৌরাণিক দেবতাদের মধ্যে তথা রবীন্দ্ররচনায় শিবের স্থান সর্বাগ্রে। কবির সাহিত্যে শিবকল্পনা যেমন বিচিত্র তেমনি ব্যাপক। তবে এ সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে শিবদেবতার উদ্ভবের ইতিহাসটি অনুধাবন করা প্রয়োজন। অনার্য জনসমাজেই শিবের প্রথম উদ্ভব। কালক্রমে আর্য-অনার্য সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তিনি বৈদিক সমাজে গৃহীত হন এবং বৈদিক দেবতা রুদ্রের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশে যান। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত এই বৈদিক রুদ্রের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

> ঋগ্‌বেদে রুদ্র মরুৎগণের অর্থাৎ ঝড়ের পিতা, অথচ রুদ্র অগ্নির রূপবিশেষ তাহাও বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। আর রুদ্ ধাতু অর্থে ক্রন্দন করা বা শব্দ করা, রুদ্র ঝড়ের পিতা শব্দকারী অগ্নিরূপী দেব। এখন আমরা রুদ্রের বৈদিক অর্থ বুঝিলাম রুদ্রের আদি অর্থ বজ্র।
>
> —ঋগ্‌বেদের দেবগণ, ষষ্ঠ প্রস্তাব[১]

এই বৈদিক রুদ্র ক্রমশঃ প্রবল প্রতাপান্বিত শিবের অঙ্গীভূত হয়ে তাঁর বহু বিচিত্র রূপের অন্যতম রূপ বলে স্বীকৃত হলেন। রুদ্র ছাড়াও শিবের বিচিত্র বিভূতি এক একটি বৈশিষ্ট্যসূচক নামের দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে এবং এই পৌরাণিক রূপগুলির অধিকাংশই রবীন্দ্রসাহিত্যে স্থান পেয়েছে। তা ছাড়া রবীন্দ্রকল্পনা শিবকে এমন কতকগুলি নূতন রূপে দেখেছে যা পুরাণে পাওয়া যায় না। শিবের এই বিচিত্র রূপ-গুলির পরিচয় দেবার আগে দেখা যাক আর্যসমাজে শিবদেবতার প্রতিষ্ঠাকে রবীন্দ্রনাথ কী দৃষ্টিতে দেখেছিলেন।

শিবের ঐতিহাসিক পটভূমি

আর্যসমাজে অনার্য শিবের প্রতিষ্ঠা এবং যুগে যুগে তার ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুধাবন করে রবীন্দ্রনাথ তার প্রকৃত ইতিহাসটি উদ্‌ঘাটন করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। কবি লক্ষ করেছিলেন—

> ভারতবর্ষের কটাহে আর্য অনার্য নানা জাতির সম্মিশ্রণ হইয়াছিল। এক-এক সময়ে এক-এক জাতি ফুটিয়া উঠিয়া আপন আপন দেবতাকে জয়ী করিয়াছিল।

১ দ্রষ্টব্য : নিখিল সেন-সম্পাদিত 'প্রবন্ধ সংকলন' ১৯৫৯।

…অনবরত বিপ্লবের সময় হিন্দুর প্রতিভা সমস্ত বিরোধবিপ্লবের মধ্যে আপনার ঐক্যসূত্র বিস্তার করিয়া নানা বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে আর্য-অনার্যের সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিল।

—'সাহিত্য', বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ শ্রাবণ

তার অনিবার্য ফলস্বরূপ শিব ধীরে ধীরে আর্যসমাজভুক্ত হয়ে পড়েন এবং যদিও বৈদিক কালে দেবতন্ত্রে তাঁর তেমন আধিপত্য ছিল না তবু ক্রমশঃ তিনি 'এক সময়ে অধিকাংশ ভারত অধিকার করিয়া লইলেন'। 'মহাদেব', 'মহেশ্বব', 'বিশ্বেশ্বর' প্রভৃতি নামগুলির দ্বারা শিবের এই একাধিপত্যই সূচিত হয়। পূর্বোদ্ধৃত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রবন্ধে দেখি, অন্যান্য দেবতাব তুলনায় শিবেব প্রাধান্যটি কবি কথাসরিৎসাগরের কাহিনী থেকে প্রমাণ করেছেন। কুমাবসম্ভব, কাদম্বরী প্রভৃতি কাব্যেও রবীন্দ্রনাথ শিবেব এই সার্বভৌমত্বের ভাবটি দেখেছিলেন। আব বৈদিক দেবসমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য শিবকে যে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, দক্ষযজ্ঞ কাহিনীব মধ্যে কবি সে ইতিহাসও সংগুপ্ত দেখেছিলেন। পূর্বোক্ত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রবন্ধে কবি প্রমাণসহ এগুলির বিস্তৃত আলোচনা কবেছেন। এব দীর্ঘ কাল পবে পাবস্যভ্রমণের পথে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখে আর্য-অনার্য বিবোধেব স্মৃতিটি তাঁর মনে পড়েছে এবং তিনি মন্তব্য করেছেন—

সেদিনকার দ্বন্দ্বের একটা ইতিহাস আছে পুরাণকথায়, দক্ষযজ্ঞে। একদা বৈদিক হোমের আগুন নিবিয়েছিল শিবেব উপাসক।

—'পাবস্যযাত্রী', অধ্যায ৫, ১৯৩২ এপ্রিল

কিন্তু যিনি এবং যাঁর অনুচরবৃন্দ যজ্ঞ নষ্ট করে বেড়ায় তিনিই পববর্তী কালে 'যজ্ঞেশ্বর' নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

ক্রমশঃ শিবের এই একাধিপত্য হ্রাস পেতে থাকে এবং শিবের স্থান অধিকাব করে নিতে থাকেন শক্তি। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি তাব অন্যতম নিদর্শন। কিন্তু বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রবন্ধে কবি এও দেখিয়েছেন যে শক্তির চণ্ডীমূর্তি 'ক্রমশ মাতা অন্নপূর্ণার রূপে, ভিখারির গৃহলক্ষ্মী রূপে, বিচ্ছেদবিধুর পিতামাতার কন্যারূপে' পরিণত হয়ে প্রেমভক্তির আধার হয়ে ওঠেন। দেবতা তখন নেমে আসেন মর্ত্যের মাটিতে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে পাই সেই চিত্র।—

অন্নদামঙ্গল ও কুমারসম্ভবের আখ্যানে প্রভেদ অল্প ; কিন্তু অন্নদামঙ্গল কুমারসম্ভবের ছাঁচে গড়া হয় নাই। তাহার দেবদেবী বাংলাদেশের গ্রাম্য হরগৌরী।

—'লোকসাহিত্য', গ্রাম্যসাহিত্য ১৩০৫ আশ্বিন

সেই কারণেই কবিকঙ্কণচণ্ডীর মধ্যেও হরপার্বতীর কোন্দল, কোঁচ-নারীদের প্রতি শিবের আসক্তি প্রভৃতি কাহিনী স্থান পেয়েছে এবং এ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ উক্ত প্রবন্ধেই মন্তব্য করেছেন—'শ্রুতি ইহার মূল নহে, লোকের কল্পনাই ইহার মূল, দেবতাকে নিজ পরিমাণে নির্মাণ-চেষ্টাই ইহার প্রধান কারণ'।

এই পুরাণ-কথা উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, গ্রাম্য কবির ছড়াতেও তার স্থান ছিল। এই ছড়াগুলির মধ্যে পৌরাণিক হরগৌরীর স্থান যে কোথায় ছিল তা বিবৃত করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

> হরগৌরীসম্বন্ধীয় গ্রাম্যছড়াগুলি বাস্তব ভাবের। সেই-সকল কাব্যে জামাতার নিন্দা, স্ত্রীপুরুষের কলহ ও গৃহস্থালির বর্ণনা যাহা আছে তাহাতে রাজভাব ও দেবভাব কিছুই নাই, তাহাতে বাংলাদেশের গ্রাম্য কুটিরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত। তাহাতে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আম-বাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই।
>
> —'লোকসাহিত্য', গ্রাম্যসাহিত্য ১৩০৫ আশ্বিন

তবে বাংলাদেশের এই ভাবদৈন্যের দিনে যে শিব 'পানাপুকুরের ঘাটে' নেমে এসে-ছিলেন, জাতীয় চিত্তের জড়ত্বমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার পূর্ব প্রতিষ্ঠা ফিরে পেতে থাকেন। আধুনিক যুগের প্রথম বার্তাবহ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার মধ্যেই তার আভাস দেখা দিতে শুরু করে। তিনি লিখেছেন—

> জগতের অধীশ্বর মহেশ্বর হন।
> জগতের অন্তরাত্মা নিজে নারায়ণ॥
> উভয়ে অভেদ তাঁরা শাস্ত্রে শুনি তাই।
> বাস্তবিক আমাতে সে দেবজ্ঞান নাই॥
> তথাপিও শশিখণ্ড ভূষণ যাঁহার।
> সদাই অচলা ভক্তি তাঁতেই আমার॥
> মহাযোগী জ্যোতির্ময় যোগে অনুরত।
> কাজেই তাঁহার প্রেমে মন হয় রত॥
>
> —'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী' (বসুমতী), মনের প্রতি উপদেশ, পৃ ৪১

এখানে দেখি কবি ঈশ্বর গুপ্ত 'মহেশ্বর'কে 'জগতের অধীশ্বর' রূপেই দেখেছেন এবং তাঁকে 'দেবজ্ঞানে' ভক্তি করতে না পারলেও 'মহাযোগী' শশিভূষণ শিবের কল্পনাসমৃদ্ধ মূর্তিটির প্রতি তাঁর 'অচলা ভক্তি' নিবেদন করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে রবীন্দ্র-

মনোভাবের সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল দেখি। দেবতা শিব তাঁর পূজা পান নি, কিন্তু শিবের বিচিত্র লীলারূপের প্রতি গুপ্ত কবি তাঁর হৃদয়ের অর্ঘ উজাড় করে দিয়েছেন। তবে শিবের বিচিত্র রূপ রবীন্দ্রনাথের হাতে বিচিত্রতর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। শিবের এই বিভিন্ন রূপ রবীন্দ্রকল্পনায় কিভাবে প্রতিভাত হয়েছিল, এবার একে একে তার পরিচয় নেওয়া যাক।

শিব

প্রমথ চৌধুরীকে লেখা এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে জানিয়েছিলেন—

> মনসার ভয়ে চাঁদ সদাগর শিবকে ছেড়ে হার মেনেছিল, আমি কিন্তু শিবকে ছাড়ব না। আমার শিব সকল জগতের।
>
> —চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৮৭, ১৩২৮ কার্তিক ১৮

'শিব' অর্থে মঙ্গল এবং এই মঙ্গলরূপী শিবের সাধনাই কবির আজীবনের সাধনা। এই দিক থেকে কবি নিজেকে শৈব কবি কালিদাসের 'পথের পথিক' ('কালের যাত্রা' ১৩৩৯, কবির দীক্ষা) বলে ঘোষণা করেছেন। তাই রবীন্দ্রসাহিত্যের শিব সর্বতোভাবে পৌরাণিক শিব নন, তিনি অনেকাংশে কালিদাসের কল্যাণভাবনার দ্বারা ভাবিত। তাই কুমারসম্ভবের প্রেমাদর্শে যে মঙ্গলভাবনা অনুস্যূত আছে, যাকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে একাধিকবার কবি ব্যাখ্যা করেছেন ও তার প্রতি সশ্রদ্ধ সমর্থন জানিয়েছেন, ব্যক্তিগতভাবেও তিনি তারই অনুসরণ করেছেন। 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী'তে দেখি নরনারীর প্রেমসম্বন্ধ বিচার করতে বসেও কবি কুমারসম্ভবের হর-পার্বতীর শুভমিলনের কথা ভুলতে পারেন নি।—

> পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ তপস্যায়, নারীর প্রেমে ত্যাগধর্ম সেবাধর্ম সেই তপস্যারই সুরে সুর মেলানো। নারীর প্রেমে আর-এক সুরও বাজতে পারে, মদনধনুর জ্যায়ের টংকার—সে মুক্তির সুর না, সে বন্ধনের সংগীত। তাতে তপস্যা ভাঙে, শিবের ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয়। নারীর প্রেম যেখানে এই বিরোধের সমন্বয় করে দেয়, পুরুষের মুক্তিকে যখন সে [illegible] করে না, তাকে সুন্দর করে তোলে— ভোগবতীর জলে ডুবিয়ে দেয় না, সুরধুনীর জলে স্নান করায়—তখন বৈরাগ্যের সঙ্গে অনুরাগের, হরের সঙ্গে পার্বতীর, শুভপরিণয় সার্থক হয়।
>
> —'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১৩

তাই পরিণত বয়সে 'মহুয়া' (১৩৩৬) প্রেমকাব্যে কবি যে প্রেমের আবাহন করেছিলেন, তাও কালিদাসের কল্যাণভাবনার দ্বারা পরিস্রুত।—

ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু,
রুদ্রবহ্নি হতে লহো জ্বলদর্চি তনু।

—'মহুয়া', উজ্জীবন

কবির কল্পনা অনুযায়ী শিব রুদ্ররূপে অকল্যাণকে ধ্বংস করে প্রেমকে উজ্জীবিত করেছিলেন, যে প্রেম ভোগাতিশায়ী। তাই যোগীশ্বর শিবের অন্তরালে কবি এক প্রেমিকের কল্যাণময় মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং বলেছিলেন—

হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব,
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্মরণবেশে।
বারে বারে পঞ্চশরে
অগ্নিতে দগ্ধ করে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।

ভগ্ন তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী,
আমি সেই কবি।

—'পূরবী', তপোভঙ্গ ১৩৩০ কার্তিক

এই মিলনের ছবি কবি বিশ্বপ্রকৃতিতেও প্রতিফলিত দেখেছিলেন—

পূর্ণ-চাঁদ হাসে আকাশ-কোলে,
আলোক-ছায়া শিব-শিবানী সাগরজলে দোলে।

—'মহুয়া', সাগরিকা ১৯২৭ অকটোবর

এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের শিবকল্পনা দেবতাকে আশ্রয় করে দূরে সরে থাকে নি। তা মানবপ্রকৃতি তথা বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একই মঙ্গলমিলনের সূত্রে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের শিবকল্পনার বৈশিষ্ট্য।

অর্ধনারীশ্বর

হরগৌরীর মিলনের বহু বিচিত্র ছবি রবীন্দ্রসাহিত্যের নানা স্থানেই বিকীর্ণ হয়ে আছে। তার মধ্যে অভেদাঙ্গ অর্ধনারীশ্বর মূর্তির কল্পনা কবিকে মুগ্ধ করেছিল সমধিক। নরনারীর বিশুদ্ধ প্রেমাদর্শের উপরে এই অর্ধনারীশ্বর ভাবনার প্রতিষ্ঠা। তাঁর ধর্ম-উপদেশের মধ্যে প্রথম এই ভাবনা স্পষ্ট রূপ প্রতিগ্রহ করে। তিনি বলেছিলেন—

প্রাচীন সংহিতাকারগণ হিন্দুসমাজে হরগৌরীকে অভেদাঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন —বিশ্বচরাচর যে গ্রহণ ও বর্জন, যে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, যে কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ, যে স্ত্রী ও পুরুষ ভাবের নিয়তসামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সত্য ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, সমাজকে তাঁহারা প্রথম হইতেই শেষ পর্যন্ত সকল দিকে সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যের উপরে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিব ও শক্তির, নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সম্মিলনই সমাজের একমাত্র মঙ্গল এবং শিব ও শক্তির বিরোধই সমাজের সমস্ত অমঙ্গলের কারণ, ইহাই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন।

—'ধর্ম', ততঃ কিম্ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ

এ স্থলে কবি সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে যে অর্ধনারীশ্বর ভাবনার প্রতিষ্ঠা করেছেন, পরবর্তী কালে তিনি তাকে দেশের বৃহত্তর পরিধিতে টেনে নিয়ে গেছেন। প্রবৃত্তিকে উৎসাদিত-করা বৈরাগ্যকে কবি কোনোদিনই সমর্থন করতে পারেন নি। তাই তাঁর 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে ইন্দ্রনাথের উক্তিরূপে কবি লেখেন—

দেশ বৃদ্ধ শিশুদের মা নয়, দেশ অর্ধনারীশ্বর—মেয়ে-পুরুষের মিলনে তার উপলব্ধি। এই মিলনকে নিস্তেজ করো না।

—'চার অধ্যায়' ১৩৪১, প্রথম অধ্যায়

'চিত্রা' কাব্যের সূচনাতে দেখি কবি এই ভাবনাকে মনোজীবনের নিগূঢ় রহস্যের গভীরে নিয়ে গেছেন এবং আপন অন্তরতম জীবনদেবতার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন—

আমার একটি যুগ্মসত্তা আমি অনুভব করেছিলুম যেন যুগ্মনক্ষত্রের মতো, সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত।···তারই সংকল্প পূর্ণ হচ্ছে আমার মধ্য দিয়ে,·· এই সংকল্পসাধনায় এক আমি যন্ত্র এবং দ্বিতীয় আমি যন্ত্রী হতে পারে।···পদে পদে তার সঙ্গে রফা করে তবেই দুয়ের যোগে সৃষ্টি। এ যেন অর্ধনারীশ্বরের মতো ভাবখানা।

—'চিত্রা', সূচনা ১৩৪৯

এখানে অর্ধনারীশ্বর ভাবনার এই প্রয়োগটি যেমন অভিনব তেমনি সার্থক।

এই পৌরাণিক কল্পনাটিকে কবি যে সব সময়েই গুরুতর সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যা কিংবা উচ্চভাবের দার্শনিক তত্ত্বের প্রসঙ্গেই স্মরণ করেন, তা নয়। এই অর্ধনারীশ্বর ভাবনাটি কখনও বা কবির স্মিত কৌতুকের স্পর্শে সরস ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাই একই লেফাফায় প্রেরিত প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীর পত্র পেয়ে তিনি প্রসন্ন কৌতুকের সুরে লেখেন—

অভেদ্য দাম্পত্যে দুইকে এক করে দিয়ে চিঠিতে তুই যে অর্ধনারীশ্বরের অক্ষরমূর্তি

প্রকাশ করেছিস আমি তার তারিফ করচি নে, কিন্তু ডাকটিকিটের হিসাবের খাতায়, তুই যে চারকে দুই করে সেরেছিস এই দুর্দিনে সুগৃহিণীমাত্রেরই পক্ষে সেটা দৃষ্টান্তস্থল।

—'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৫, ইন্দিরা দেবীকে লেখা, ১৩২৬ অগ্রহায়ণ ২১

কখনও বা সাধারণভাবে দুটি বিষয়ের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বোঝাবার উদ্দেশ্যে তিনি 'অর্ধ-নারীশ্বর' এর উপমাটি ব্যবহার করেন। তাই কীর্তন সম্বন্ধে মন্তব্য করে তিনি বলেছেন—

কীর্তনে, বাঙালীর গানে, সংগীত ও কাব্যের যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, বাঙালীর অন্য সাধারণ গানেও…সেই যুগলমিলনের ধারা।

—'সংগীতচিন্তা', আলাপ-আলোচনা[১]. রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার-৩

তবে 'অর্ধনারীশ্বর' কল্পনাটি যে বিশেষ তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে কবির কাছে ধরা দিয়েছিল, তা হল তার সৌন্দর্যমণ্ডিত ঐশ্বর্যের মূর্তি। তাই তাঁর মতে—

আমাদের পুরাণে শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দরিদ্রবেশ আর অন্নপূর্ণায় তাঁর ঐশ্বর্য, বিশ্বে এই দুইয়ের মিলনেই সত্য। শিবের ভক্ত কবি কালিদাসের দোহাই পেড়ে সেই যুগলকেই আমাদের সকল অনুষ্ঠানের নান্দীতে আবাহন করব যাঁরা 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ', যাঁদের মধ্যে অভাব ও অভাবের পূর্ণতার নিত্যলীলা।

—'পথে ও পথের প্রান্তে', অধ্যায় ৪৭, ১৯৩০ ফেব্রুআরি

বলা বাহুল্য 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ' হরপার্বতীকল্পনার মধ্যে অর্ধনারীশ্বর ভাবনার মূল রূপটি নিঃসন্দেহে প্রতিফলিত হয়েছে।

নীলকণ্ঠ

শিবের ঐশ্বর্যমূর্তিকে কবি আবাহন করে নিলেও তাঁর যে রূপের প্রতি তিনি তাঁর অন্তরের অর্ঘ নিবেদন করেছেন তার পরিচয় দিয়ে কবি বলেছেন—

যাকে বিশ্বাস করেছি আদর করেছি সে বিনা কারণে ফণা ধরে উঠেছে তাই বলে মনসার পূজো দিতে ছুটব না। আমি যে শিবের পূজারি তাঁর জটার পাকে পাকে সাপ থাকে বাঁধা, কণ্ঠে মিলিয়ে যায় বিষ।

—'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-২৪৭ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা, ১৯৩৮ ডিসেম্বর ১৬

এখানে কবি যে শিবের পূজারী তিনিই পুরাণবর্ণিত 'নীলকণ্ঠ'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কল্পনা পুরাণের এই বর্ণনাতেই থেমে থাকে নি। তিনি এই নীলকণ্ঠ রূপের মধ্যে

১ শান্তিনিকেতন : ১৯২৬ ডিসেম্বর ৩১। প্রবাসী ১৩৩৪ কার্তিক

জগতের একটি বৃহৎ সত্য নিহিত দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

> সত্যের একটি সুষমা আছে। কিন্তু এই সুষমাটা বৈষম্যকে বাদ দিয়ে নয়—বৈষম্যকে গ্রহণ করে এবং অতিক্রম করে—শিব যেমন সমুদ্রমন্থনের সমস্ত বিসকে পান করে তবে শিব।

— আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৩, ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক

নীলকণ্ঠকে কবি যে একটি বৃহৎ ভাবাদর্শের পরিমণ্ডলে দেবতা বানিয়ে মানুষের নাগালের বাইরে নির্বাসিত করে রেখেছিলেন, তা নয়। সকল মানুষের অন্তরাত্মার মধ্যে তিনি বিষকে নিঃশেষে পরিপাক করা এই নীলকণ্ঠের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই বিশেষ প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন—

> মানুষ আপনার চেয়ে আপনি বড়ো, সেইজন্যে মানুষ মৃত্যুকে দুঃখকে ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করতে পারে। মানুষের সেই বড়োর সঙ্গে মানুষের ছোটোর নিয়ত সংঘাতে যে দুঃখ জন্মাচ্ছে সেই দুঃখ পান করছেন কে ?' সেই বড়ো, সেই শিব।

— খৃষ্ট, খৃষ্টোৎসব ১৯২৪ ডিসেম্বর ২৫

পুরাণের নীলকণ্ঠ দুঃখ বেদনার উর্ধ্বে নির্বিকারস্বরূপে বিরাজমান। কিন্তু উপনিষদের আনন্দমন্ত্রে দীক্ষিত কবির দৃষ্টিতে ইনি আনন্দময়।—

> সর্পের ফণা, হলাহলের নীলদ্যুতি বাহির হইতে দেখিয়া আমরা শিবকে দুঃখী মনে করিতেছি, কিন্তু তাহার জটাজালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন চিরস্রোত অমৃতনিস্যন্দিনী পুণ্য ভাগীরথীর আনন্দ কল্লোল কি শুনা যাইতেছে না ?

তাই—

> যাঁহার প্রাণের মধ্যে অমৃত ও আনন্দের অনন্ত প্রস্রবণ, এত হলাহল এত অমঙ্গল তিনিই যদি ধারণ করিতে না পারিবেন তবে আর কে পারিবে।

— আলোচনা', ধর্ম একটি রূপক ১২৯০ চৈত্র

প্রথম জীবনে কবি শিবের এই যে রূপ দেখেছিলেন তাঁর সেই দৃষ্টি আজীবন অপরিবর্তিত ছিল। তাঁর সাহিত্যের নানা স্থানে সে পরিচয় বিকীর্ণ হয়ে আছে। তাই শেষ জীবনে আনন্দের স্বরূপ বোঝাবার জন্য তিনি এই ভাবাদর্শটি স্মরণ করে বলেন—

> যথার্থ আনন্দই সমস্ত দুঃখকে শিবের বিষপানের মতো অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারে।

—'সাহিত্যের পথে', কবির কৈফিয়ত ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ

মৃত্যুঞ্জয়

দুঃখের বিষকে যিনি অনায়াসে আত্মসাৎ করেন তিনি মৃত্যুকেও জয় করতে পারেন। তিনিই পুরাণের মৃত্যুঞ্জয়। রবীন্দ্রনাথ শিবের এই মৃত্যুজয়ী রূপ দেখে বলেছিলেন—

> মরণের রঙ্গভূমি শ্মশানের মধ্যে তাঁহার বাস, তবু নৃত্য। মৃত্যুস্বরূপিনী কালী তাঁহার বক্ষের উপর সর্বদা বিচরণ করিতেছেন, তবু তাঁহার আনন্দের বিরাম নাই।

—'আলোচনা', ধর্ম . একটি রূপক ১২৯০ চৈত্র

'কালান্তর' গ্রন্থের অন্তর্গত ছোটো ও বড়ো প্রবন্ধেও (১৩২৪ অগ্রহায়ণ) কবি দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি দেখে এই মৃত্যুঞ্জয়ী দেবতার শরণাপন্ন হয়ে বলেছেন, 'দুঃখকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, মৃত্যুকে আমাদের সহায় করিতে হইবে, তবে মৃত্যুঞ্জয় আমাদের সহায় হইবেন'।

রুদ্র

শিবের এই মৃত্যুঞ্জয়ী আনন্দময় রূপের পশ্চাতে কিন্তু আছে তাঁর ভয়ংকর রুদ্র রূপ। তিনি তাঁর ললাটের নেত্রবহ্নিতে সমস্ত পাপ, সমস্ত অকল্যাণকে নিঃশেষে দগ্ধ করেন। তাই শৈব কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে রুদ্রের আবাহন করেছেন এবং বৈশাখের রুদ্র রূপের প্রতি আপন পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়ে হেমন্তবালা দেবীকে এক পত্রে জানিয়েছেন—

> আমার কাব্যে রুদ্রদেবের এত বেশি অবতারণা দেখতে পাও তার কারণ রৌদ্রেই আমার চিত্তের অভিষেক—রুদ্রের তাপতপ্ত ললাটের তৃতীয় নেত্রেরই দীপ্তি বিগলিত করেছে আমার কাব্যধারাকে।

—'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৩৭, ১৯৩৪ এপ্রিল ২

তাই পাপ ও অন্যায়ের বিনাশকর্তারূপে কবি বারে বারেই তাঁর সাহিত্যে রুদ্রকে আহ্বান জানিয়েছেন। বর্তমানের বিকারগ্রস্ত জড় সমাজকে লক্ষ করে তিনি বলেছেন—

> রুদ্রদেব বজ্র হাতে আমাদের অনেক কালের পাপের হিসাব লইতে আসিয়াছেন, ...মিথ্যা লিখিতে পারি...চোখে ধূলা দিতে পারি, এমন কি নিজেকে ফাঁকি দেওয়াও সহজ, কিন্তু তাঁহাকে তো ভুল বুঝাইতে পারিলাম না।

—'সাহিত্য', সাহিত্যপরিষৎ ১৩১৩ চৈত্র

কালান্তরের অন্তর্গত ছোটো ও বড়ো প্রবন্ধে ওই একই প্রয়োজনে তিনি রুদ্রের প্রলয়-রূপকে স্মরণ করেছেন। তবে রুদ্রতাই রুদ্রদেবের চরম প্রকাশ নয়। অনলস কর্মের দ্বারা সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করতে পারলে রুদ্রেরও প্রসাদ পাওয়া সম্ভব। তাই কবির বিশ্বাস যে কর্মের দ্বারাই আমাদের 'অপরাধমোচন হইবে, বাধা জীর্ণ হইবে, দেশের ভবিতব্যতার রুদ্রমুখচ্ছবি প্রতিদিন প্রসন্ন হইয়া আসিবে।' 'কালান্তর' গ্রন্থের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রবন্ধেও তিনি অনুরূপভাবেই আশ্বাস দিয়েছেন যে অনুতপ্ত প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাই রুদ্রের প্রসন্নতা লাভ করা যাবে। রুদ্রের এই প্রসন্নমূর্তি কল্পনার প্রসঙ্গে উপনিষদের 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং'...ইত্যাদি বাণীর (শ্বেতা. ৪।২১) কথা অনিবার্য ভাবেই মনে পড়ে। তাতে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের রুদ্রের সঙ্গে পৌরাণিক রুদ্রের প্রভেদ ঘুচিয়ে উভয়কে একত্রে মিলিয়ে দিয়েছেন।

কবি বহির্বিশ্বের কর্মক্ষেত্রে রুদ্রকে আহ্বান জানালেও মানুষের মানসলোকেই তাঁর প্রকৃত অধিষ্ঠানভূমি বলে মনে করেছেন। তাঁর চোখে তাই মানুষের জড় চেতনার মধ্যে নূতন বোধের আবির্ভাব হয় রুদ্ররূপে।—

> অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে বিরোধ বিক্ষুব্ধ মানবলোকে রুদ্রবেশে কে দেখা দিল? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ, বিপ্লবের আলোড়ন।
>
> —'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৩, ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক

তবে এই রুদ্ররূপের অন্তরালে নিত্যরূপে শিব যে বিরাজিত সে আশ্বাস কবি কখনও ভোলেন নি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস—'এ সমস্তকে অতিক্রম করে যিনি শিবং তিনি আছেন' ('ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ৭, ১৩৩৫ ভাদ্র)।

মহাকাল

এই রুদ্রেরই এক নাম ভৈরব বা কালভৈরব। কখনও বা তিনি মহাকাল। পুরাণের মহাকাল রুদ্ররূপে দেখা দিলেও তাঁর আর একটি তাৎপর্যও আছে। বৃহৎ কালপ্রবাহ, যার আদি অন্ত নেই, তিনিই মহাকাল। তাঁকেই রবীন্দ্রনাথ কখনও বলেন 'কালের অধীশ্বর' কখনও বা 'কালের রাখাল' ('পূরবী', তপোভঙ্গ ১৩৩০ কার্তিক)। আবার তাঁর দৃষ্টিতে এই মহাকাল হলেন নিরপেক্ষ বিচারক; তাঁর হাতেই বিচারের অমোঘ ন্যায়দণ্ড। 'প্রান্তিক' কাব্যের একটি কবিতায় কবির এই দৃষ্টিভঙ্গির অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। 'একালের আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা' ও 'বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ' দেখে তিনি প্রার্থনা জানান—

মহাকালসিংহাসনে-
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী।

—প্রান্তিক', ১৭-সংখ্যক কবিতা, ১৯৩৭ ডিসেম্বর

এই মহাকালেরই বৃহৎ অচঞ্চল রূপটি আবার কবি এক বাদল দিনের বর্ণনায় ধরে দিয়েছেন।—

বাদলার দিন মেঘদূতের দিন নয়, এ যে অচলতার দিন— চঞ্চল কালের প্রবল রূপ দেখছি নে বটে কিন্তু অচঞ্চল দেশের বৃহৎ রূপ দেখা যাচ্ছে—শ্যামাকে দেখলুম না কিন্তু শিবের দর্শন মিলল।

—'পথে ও পথের প্রান্তে' অধ্যায় ৩৮ ১৩৩৬ শ্রাবণ

স্পষ্টতঃই 'চঞ্চল কাল' বলতে তিনি এখানে কালী অর্থাৎ শ্যামাকে বুঝিয়েছেন এবং সমস্ত পরিবর্তনের অতীত যে মহাকাল তাকেই এখানে 'অচঞ্চল দেশ' রূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁর এই ভাবটিই মধ্য পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে একটি কবিতায়।—

কালীরে বক্ষে বক্ষে ধরি শুভ্র মহাকাল,
বাধে না তারে কোনো কলুষ জাল।

—'বিশেষ মোহানা ১৩৩৪ কার্তিক ৭। কালীপূজা

মোহানা কবিতাটি যে তারিখে রচিত হয় সেটি ছিল কালীপূজার দিন। কবি স্বয়ং সে কথা উল্লেখ করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় উপরের পংক্তি দুটি রচনার সময় কালীপূজার তাৎপর্যটুকু তাঁর মনে কী এক অপূর্ব ভাবাদর্শের সঞ্চার করছিল। আর ব উপরে উদ্ধৃত 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থের পত্রাংশটি এবং এই মোহানা কবিতা রচনার কালগত ব্যবধান বেশি নয়। আমাদের পক্ষে লক্ষিতব্য এই যে এ দুটির মধ্যে ভাবগত ব্যবধানও খুবই কম। প্রথমটিতে কালের চঞ্চল রূপটিকেই বড়ো করে দেখানো হয়েছে। সে-রূপের কৃষ্ণত্বও যে কবির মনে জাগ্রত ছিল তা বোঝা যায় 'শ্যামা' শব্দের প্রয়োগের দ্বারা। পক্ষান্তরে 'মহাকালে'র (দেশরূপে বর্ণিত) অচঞ্চলতাই এখানে বর্ণনার বিষয়। আর মোহানা কবিতায় দেখানো হয়েছে খণ্ড কালের কালো কলুষ রূপ এবং মহাকালের নিষ্কলুষ শুভ্র রূপ। অর্থাৎ, কবির দৃষ্টিতে কালী বা শ্যামা হচ্ছেন চঞ্চল ও কলুষিত খণ্ডকালের প্রতীক, আর শিব হচ্ছেন অচঞ্চল শুভ্র অখণ্ড মহাকালের প্রতীক।

ভোলানাথ

শিবের আর এক পরিচয় তিনি ভোলানাথ। তবে তাঁর এই রূপ পুরাণে দেখা যায় নি। এটি বিশেষভাবে বাঙালী কল্পনার সৃষ্টি। রবীন্দ্রসাহিত্যে কিন্তু ভোলানাথের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। কবি তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

> ভোলানাথ, যিনি আমাদের শাস্ত্রে আনন্দময়, তিনি সকল দেবতার মধ্যে এমন খাপছাড়া।…ভোলানাথ, আমি জানি, তুমি অদ্ভুত! জীবনে ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত রূপেই তুমি তোমার ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দাঁড়াইয়াছ। একেবারে হিসাবকিতাব নাস্তানাবুদ করিয়া দিযাছ।

—'বিচিত্র প্রবন্ধ', পাগল ১৩১১ শ্রাবণ

কবি নিজে এই 'ভোলানাথের চেলা' হতে চান, আর এই ভোলা-মন্ত্রেই দেশের তরুণ সম্প্রদাযকে দীক্ষিত করার জন্য আহ্বান জানিযে বলেন—

ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা-বাছা
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

— 'বলাকা', ১-সংখ্যক কবিতা ১৩২১ বৈশাখ

ভোলানাথের নামটি আমাদের সুপরিচিত হলেও কবি তাঁর যে পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নূতন। তবে তাঁর 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যে (১৯২২) এই রূপকল্পনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন—

ওরে মোর শিশু ভোলানাথ,
তুলি দুই হাত
যেখানে করিস পদপাত
বিষম তাণ্ডবে তোর লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সব,
আপন বিভব
আপনি করিস নষ্ট হেলাভরে।
প্রলয়ের ঘূর্ণ-চক্রাকারে
চূর্ণ খেলেনার ধূলি উড়ে দিকে দিকে;
আপন সৃষ্টিকে
ধ্বংস হতে ধ্বংসমাঝে মুক্তি দিস অনর্গল,
খেলারে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা-শৃঙ্খল।

—'শিশু ভোলানাথ', শিশু ভোলানাথ

এখানে মানবশিশুর সঙ্গে দেব-ভোলানাথ অবিরোধে মিলে গেছেন। কবির এই স্নেহরসার্দ্র দেববন্দনা তুলনারহিত।

এই ভোলানাথকেই তিনি আবার 'পাগল' আখ্যা দিয়ে বলেছেন—'পাগল শব্দটা আমাদের কাছে ঘৃণার শব্দ নহে। খেপা নিমাইকে আমরা খেপা বলিয়া ভক্তি করি, আমাদের খেপা-দেবতা মহেশ্বর।' কবি তাঁর এই খেপা দেবতাকে সৃষ্টির আদিতে টেনে নিয়ে গেছেন এবং পূর্বোক্ত প্রবন্ধেই মন্তব্য করেছেন—

> এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা-কিছু অভাবনীয় তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন।...তিনি কেবল নিখিলকে নিয়মের বাহিরের দিকে টানিতেছেন।... আমাদের এই খেপা দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে, তাহা নহে, সৃষ্টির মধ্যে ইঁহার পাগলামি অহরহ লাগিয়াই আছে, আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে, ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান করিতেছে। যখন পরিচয় পাই তখনই রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।
>
> —'বিচিত্র প্রবন্ধ', পাগল ১৩১১ শ্রাবণ

সৃষ্টিতত্ত্বের এই অ-পূর্ব ব্যাখ্যা কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছেই প্রত্যাশিত।

নটরাজ

ভোলানাথের এই খামখেয়ালি লীলাই বৃহত্তর পটভূমিতে সুষম ও সুন্দরতর হয়ে রূপলাভ করেছে নটরাজ কল্পনায়। পৌরাণিক নটরাজ হলেন নৃত্যপর শিব। তাঁর পদপাতে একদিকে সৃষ্টি এবং অন্যদিকে প্রলয়ের ক্রিয়া চলে। জীবজগতের তিনিই অধিপতি। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। 'প্রভাত সংগীত' কাব্যের মহাস্বপ্ন কবিতায় কবি লিখেছিলেন—

> পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন,
> নিদ্রামগ্ন মহাদেব দেখিছেন মহান্ স্বপন।
> বিশাল জগৎ এই প্রকাণ্ড স্বপন সেই,
> হৃদয়সমুদ্রে তাঁর উঠিতেছে বিশ্বের মতন।

ওই কাব্যেরই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কবিতায় তিনি তাঁকে সৃষ্টি ও প্রলয়ের দেবতারূপে কল্পনা করেন। এর কিছুকাল পরে পরিণততর কল্পনায় তিনি লেখেন—

> হায় শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে, সংসারে মহাপুণ্য ও

মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড় হস্তক্ষেপে যে একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালো মন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্তি প্রকাশ করিয়া তোল।

—'বিচিত্র প্রবন্ধ', পাগল ১৩১১ শ্রাবণ

এখানে তিনি নটরাজকে এই জগতের স্রষ্টারূপে, তার প্রাণচাঞ্চল্যের উৎসরূপে দেখেছেন। তবে তাঁর 'নটরাজ' নাট্যকাব্যখানিতেই বোধ হয় তাঁর এই কল্পনা পরম পরিণতি লাভ করেছে। সেখানে তিনি নটরাজকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ামকরূপে দেখেছেন এবং ভেবেছেন এই বৃহৎ বিশ্ব তাঁর নৃত্যের ছন্দেই বাঁধা। তাই তাঁর নটরাজ-বন্দনায় দেখি তিনি বলেছেন—

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ, নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায়
বাঁধন পরায় বাঁধন খোলায় ;···

এবং

নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে বাজিল চন্দ্রভানু।
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়, ··
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ।

—'নটরাজ' ১৩৩৪, নৃত্য

অণু-পরমাণুর মধ্যে যাঁর প্রকাশ, চন্দ্রভানুর মধ্যে—বৃহত্তর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যেও তাঁরই নৃত্যের লীলা। তবে কবির চোখে তা বহির্বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে মানবের অন্তর্জগতেও সমান ক্রিয়াশীল। এই কথাটিই বিশ্লেষিত হয়েছে ঐ নাট্যকাব্যের 'ভূমিকা'য়।—

নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে

পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। তাই কবির ঘোষণা—

আমি নটরাজের চেলা
চিত্তাকাশে দেখছি খেলা,
বাঁধন খোলার শিখছি সাধন
মহাকালের বিপুল নাচে।

—'নটরাজ', মুক্তিতত্ত্ব

সুতরাং দেখা গেল একই শিব মহাদেব, নীলকণ্ঠ, রুদ্র, মহাকাল ও নটরাজের বেশে বিচিত্র রূপে রবীন্দ্রসাহিত্যের নানা স্থানেই আবির্ভূত হয়েছেন। তবে সর্বত্রই এই বিভিন্ন নামগুলি যে বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়েছে, তা বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই তা শিবের সাধারণ প্রতিশব্দ রূপেই ব্যবহৃত। এবার শিব সম্বন্ধে কবির একটি সাধারণ ধারণার পরিচয় দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। জাভার সংস্কৃতির পরিচয় দিয়ে কবি বলেছেন—

শিবমন্দিরই এখানে প্রধান।···শিবকে এ দেশে গুরু, মহাগুরু, বলে অভিহিত করেছে। আমার বিশ্বাস, বুদ্ধের গুরুপদ শিব অধিকার করেছিলেন, মানুষকে তিনি মুক্তির শিক্ষা দেন। এখানকার শিব নটরাজ, তিনি মহাকাল, অর্থাৎ সংসারে যে চলার প্রবাহ, জন্মমৃত্যুর যে ওঠাপড়া, সে তাঁরই নাচের ছন্দে। তিনি ভৈরব, কেননা তাঁর লীলার অঙ্গই হচ্ছে মৃত্যু। আমাদের দেশে এক সময়ে শিবকে দুই ভাগ করে দেখেছিল। এক দিকে তিনি অনন্ত, তিনি সম্পূর্ণ, সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি প্রশান্ত, আর-এক দিকে তাঁরই মধ্যে কালের ধারা তার পরিবর্তনপরম্পরা নিয়ে চলেছে, কিছুই চিরদিন থাকছে না, এইখানে মহাদেবের তাণ্ডবলীলা কালীর মধ্যে রূপ নিয়েছে।

—'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ১৬, ১৯২৭ সেপ্‌টেম্বর ১৯

এই একটিমাত্র উদ্‌ধৃতিতেই রবীন্দ্রনাথের শিবকল্পনার বৈচিত্র্য সংহত আকারে ধরা দিয়েছে এবং তার প্রতি কবির দৃষ্টির বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পেয়েছে।

বিষ্ণু

ভারতীয় পুরাণে সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের দেবতারূপে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের রূপ পরিকল্পিত হয়েছে। মহেশ্বরের পরিচয় পাওয়া গেছে। এবার স্থিতির দেবতা বিষ্ণুর কথা। পৌরাণিক ঐতিহ্যে গুরুত্বের বিচারে মহেশ্বরের পরেই তাঁর স্থান।

বিষ্ণু পুরোপুরি পৌরাণিক দেবতা নন। ঋগ্‌বেদে বিষ্ণুর নাম পাওয়া যায়। তবে রবীন্দ্রসাহিত্যে যে বিষ্ণুকে দেখা গেছে তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী পৌরাণিক বিষ্ণু। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই রূপের যে তাৎপর্য কল্পনা করেছেন, তা পুরাণের কল্পনাকে বহুদূরে অতিক্রম করে গেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিষ্ণুকে স্মরণ করেছেন এবং বিভিন্ন স্থলে তার বিচিত্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রথম জীবনে মানবজাতির ক্রমোন্নতির পন্থা নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে বিক্রমের পথে নয়, সৌন্দর্যচেতনার ক্রমবিকাশের পথেই মানুষের উন্নতি। তাই তাঁর মতে—

> সভ্যতা যখন বহুদূর অগ্রসর হইবে, তখন বর্বরেরা কেবলমাত্র শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতামাত্রের পূজা করিবে না। তখন এই স্নেহপূর্ণ ধৈর্য, এই আত্ম-বিসর্জন, এই মধুর সৌন্দর্য, বিনা উপদ্রবে মনুষ্যহৃদয়ে আপন সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবে। তখন বিষ্ণুদেবের গদার কাজ ফুরাইবে, পদ্ম ফুটিয়া উঠিবে।
>
> —'আলোচনা', বৈষ্ণবকবির গান : সৌন্দর্যের ধৈর্য ১২৯১ কার্তিক

এখানে বিষ্ণুর গদা ও পদ্মকে কবি যথাক্রমে প্রতাপ ও সৌন্দর্যের প্রতীক রূপে কল্পনা করেছেন। পরবর্তী কালে এই সৌন্দর্যকে কবি মঙ্গলের সঙ্গে অন্বিত করে দেখেন। তখন লোকপালক বিষ্ণু হন মঙ্গলের প্রতিমূর্তি আর সৌন্দর্য তাঁর থেকে পৃথক্ হয়ে লক্ষ্মীর রূপ ধারণ করে। তাই সাহিত্যে মঙ্গল ও সৌন্দর্যের সম্মিলন বোঝাবার জন্য তিনি উপমা দিয়ে বলেন—

> মঙ্গলের সঙ্গেই সৌন্দর্যের, বিষ্ণুর সঙ্গেই লক্ষ্মীর মিলন পূর্ণ। সকল সভ্যতার মধ্যে এই ভাবটি প্রচ্ছন্ন আছে।
>
> —'সাহিত্য', সৌন্দর্যবোধ ১৩১৩ পৌষ

মঙ্গল ও সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে কবি বিষ্ণুকে প্রেমেরও অধিদেবতা বলে মনে করেছেন, কেমনা তেনি যে লোকপালক। তাই 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী'তে তিনি মন্তব্য করেন—'বিষ্ণুর প্রকৃতিতে যে প্রেমের শক্তি বিশ্বকে পালন করছে সেই শক্তিই তো লক্ষ্মী, বিষ্ণুর প্রেয়সী' (১৯২৪ সেপ্‌টেম্বর ২৮)। বলা বাহুল্য, কবির এ কল্পনা পুরাণের বিরোধী নয়। প্রেমসৌন্দর্যের দেবতা হলেও গদাধর বিষ্ণু শক্তিহীন নন। তাই কবির দৃষ্টিতে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র সমস্ত অমঙ্গল বিনাশ করতে সদা উদ্যত। তাঁর কাছে এই চক্র সচলতারও প্রতীক। সেইজন্য গান্ধীপ্রবর্তিত ব্যাপক চরকা-আন্দোলনের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি বিষ্ণুচক্রেরই সন্ধান করেছেন।—

> বিষ্ণুর শক্তির যেমন একটা অংশ পদ্ম তেমনি আর-একটা অংশ চক্র। বিষ্ণুর সেই শক্তির নাগাল মানুষ যেই পেলে অমনি সে অচলতা থেকে মুক্ত হল।…এমন

উপদেশ যদি মেনে বসি যে, সুতো কাটার পক্ষে আদিম কালের চরকাই শেষ তা হলে বিষ্ণুর পূর্ণ প্রসন্নতা কখনোই পাব না, সুতরাং লক্ষ্মী বিমুখ হবেন। বিজ্ঞান মর্ত্যলোকে এই বিষ্ণুচক্রের অধিকার বাড়াচ্ছে এ কথা যদি ভুলি, তা হলে পৃথিবীতে অন্য যে-সব মানুষ চক্রীর সম্মান রেখেছে তাদের চক্রান্তে আমাদের মরতে হবে।

—'কালান্তর', চরকা ১৩৩২ ভাদ্র

সুতরাং বিষ্ণুর চক্রকে কবি আধুনিক প্রয়োগবিজ্ঞানের প্রতীকরূপেই দেখেছেন এবং মানুষের জড়ত্ব মোচন করে তাকে সচল করে তোলার জন্যই তিনি সেই চক্রকে আমাদের জীবনে আবাহন করতে চেয়েছেন। এর কিছু দিন পরে কবি এই ভাবটিই পুনর্বার প্রকাশ করে লেখেন—

নিজের যন্ত্রধারী স্বরূপকে মানুষ কতখানি সম্মান করেছে—বিষ্ণুকে বলছে চক্রধারী, কেননা এই চক্র হচ্ছে বস্তুজগতে মানুষের বিজয়রথের বাহন।

—'পথে ও পথের প্রান্তে', অধ্যায় ৪০, ১৩৩৬ শ্রাবণ

প্রসঙ্গতঃ মনে পড়ে হলধর বলরামকেও কবি অনুরূপভাবে যন্ত্রসভ্যতার প্রথম প্রতিনিধি বলে কল্পনা করেছিলেন। এই পৌরাণিক বলরামকে কবি যে কিভাবে আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলিয়ে নিয়েছিলেন পূর্বোদ্ধৃত পত্রেরই একাংশে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—

দেহের সীমা থেকে যে বিজ্ঞান আমাদের মুক্তি দিচ্ছে ···একে নাম দেওয়া যাক বলরামদেবের সভ্যতা। তুমি জান বলরামদেবের একটু মদ খাবারও অভ্যাস আছে, এই সভ্যতাতেও শক্তিমত্ততা নেই তা বলতে পারি নে।

কাজেই যন্ত্রসভ্যতার প্রশংসা করলেও কবি যে তাতে অবিমিশ্র মঙ্গলই দেখেন নি, সে কথাটি এখানে তিনি সুকৌশলে জানিয়ে দিয়েছেন।

যাই হক, এতক্ষণের আলোচনায় বোঝা গেল বিষ্ণুকে কবি কী দৃষ্টিতে দেখেছেন। শিবের মতো বিষ্ণুরও পৃথক্ পৃথক্ নামের বিশেষ বিশেষ তাৎপর্যের প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাই বিষ্ণু তাঁর চোখে কখনও গদাধর কখনও নারায়ণ। গদাধর নামের ব্যাখ্যায় কবি কোনো মৌলিকত্ব দেখান নি, কিন্তু নারায়ণ তাঁর হাতে নূতন রূপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছেন।

পৌরাণিক বিষ্ণু আর নারায়ণ প্রায় সমার্থক। তবে পুরাণে বিষ্ণু সামাজিক দেবতা। অর্থাৎ তিনি স্থিতিকর্তা, লোকপালক, লোকের রক্ষক। আর নারায়ণ তাঁরই অমূর্ত ভাবরূপ। তাই নারায়ণের স্থান শুধু দর্শনশাস্ত্রের ভাবনায়। তবে

ববীন্দ্রনাথের নারায়ণ পৌরাণিক নাবায়ণের থেকে বিশেষ ভাবেই পৃথক। নারায়ণকে কবি 'নরে'র সঙ্গে অন্বিত করে দেখেছেন। তাঁর চোখে মানবেব দেবত্বটুকুর নিষ্কর্ষই হলেন নাবায়ণ। তাঁর নারাযণ তাই 'নবদেবতা'র সঙ্গে এক হয়ে যান। The Religion of Man (1931) গ্রন্থে এ কথাটি সুস্পষ্টরূপে আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যেব অন্যত্রও এ ভাবটি বহুবাব প্রকাশ পেয়েছে। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর ববীন্দ্রভাবনায় নারাযণ প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭২ শ্রাবণ-আশ্বিন) এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা কবেছেন বলে এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা থেকে বিরত থাকা গেল।

ব্রহ্মা

এব পরে আসে ব্রহ্মার কথা। ব্রহ্মা বৈদিক দেবতা। 'ব্রহ্ম' শব্দেব অর্থ, যা বলা হয়। তাই বেদ 'ব্রহ্ম'। ব্রহ্মার চতুর্মুখ থেকে চতুর্বেদের উদ্‌ভবশ তাই বেদ-উচ্চাবণকারীর নাম ব্রহ্মা। বেদ ও পুরাণ দুটিতেই আদি দেবতা হিসাবে ব্রহ্মা উল্লিখিত হয়েছেন। বিষ্ণু এবং শিব পববর্তী কালের। তবু শেষ পর্যন্ত শিবই 'মহা-দেব' 'দেবাদিদেব' ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়ে শ্রেষ্ঠত্বেব মর্যাদা পান। পুবাণে বারে বাবেই দেখি অসুর-পীড়িত দেবগণ ব্রহ্মাব কাছে সাহায্য ভিক্ষা কবলে তিনি আপন অক্ষমতা জানিয়ে তাদেব পাঠিয়ে দেন মহাদেবেব কাছে। এমন কি লোকপালক বিষ্ণুও স্বর্গবাজ্য রক্ষা করতে সক্ষম হন না। এই ভাবেই ক্রমশঃ শিবেব প্রতিপত্তির কাছে ব্রহ্মাপ্রমুখ বহু পৌরাণিক দেবতা পবাজয় স্বীকাব কবেন। ব্রহ্মাব আধিপত্যহ্রাসেব ইতিহাস সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথ অবহিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

> দৈবসংগ্রামে ব্রহ্মা সবপ্রথমেই পুজাগৃহ হইতে দূরে আশ্রয় লইলেন, বিষ্ণু নানা পবিবর্তনের মধ্যে নানা আকাবে নিজেব দাবি বক্ষা কবিতে লাগিলেন এবং মহেশ্বব এক সময়ে অধিকাংশ ভারত অধিকাব করিয়া লইলেন।
>
> — সাহিত্য, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ শ্রাবণ

ব্রহ্মাব আধিপত্যহ্রাসের ইতিহাসটি তিনি উক্ত প্রবন্ধেই কথাসরিৎসাগরেব দুটি উপাখ্যানের সাহায্যে বিবৃত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন প্রথমতঃ ব্রহ্মা শিবের তপস্যা করে তাঁকে নিজ পুত্ররূপে প্রার্থনা করেন এবং 'এই অনুচিত আকাঙ্ক্ষাব জন্য তিনি নিন্দিত ও লোকেব নিকট অপূজ্য' হন। দ্বিতীযতঃ মহাদেবই প্রজাপতি ব্রহ্মা ও প্রকৃতিকে সৃজন করেন। সেই প্রকৃতিপুরুষ থেকেই অখিল প্রজার সৃষ্টি। কিন্তু এতে চরাচরের সৃষ্টিকর্তা বলে ব্রহ্মা দর্পিত হন। তখন কুপিত শিব তাঁব মুণ্ডচ্ছেদ

করেন। এর থেকেই ব্রহ্মার প্রাধান্যচ্ছেদের বিবরণ পাওয়া যায়।

শুধু পুরাণকাহিনীতে নয়, রবীন্দ্রসাহিত্যেও শিবের তুলনায় ব্রহ্মার স্থান নিতান্ত নগণ্য। এমন কি তাঁর দৃষ্টিতে বিষ্ণুর তুলনাতেও ব্রহ্মার গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম বলে প্রতিভাত হয়েছে। তাই কবি বলেন—

ব্রহ্মার সৃষ্টিক্ষেত্র হতে পারে শূন্যে, কিন্তু বিষ্ণুর শক্তি খাটে লোকজগতে।

—'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৪ সেপ্টেম্বর ৩০

এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের মনোজগতে বিষ্ণুর স্থান আছে, কিন্তু ব্রহ্মাকে কবি নিরালম্ব শূন্যতার মধ্যেই পরিত্যাগ করেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্রহ্মা তাই দুএকটি প্রাসঙ্গিক উল্লেখমাত্রেই পর্যবসিত হয়েছেন। তবে শেষ জীবনে কবি ব্রহ্মার চতুর্মুখের যে কৌতুককর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, শুধু তারই জন্যে তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কবি তাঁর 'খাপছাড়া' কাব্যের ভূমিকায় (১৩৪৩ ভাদ্র ৩) লিখেছেন—

শুধাব, বিধির মুখ চারিটা কী কারণে।
একটাতে দর্শন
করে বাণী বর্ষণ,
একটা ধ্বনিত হয় বেদ-উচ্চারণে।
একটাতে কবিতা
রসে হয় দ্রবিতা,
কাজে লাগে মনটারে উচাটনে মারণে।
নিশ্চিত জেনো তবে,
একটাতে হো হো রবে
পাগলামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছ্বাসিয়া।

বলা আবশ্যক যে চতুরাননের প্রতি বররুচির সেই বিখ্যাত—'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ' ইত্যাদি কাতর প্রার্থনাটি পরোক্ষে চতুরাননের রসগ্রাহিতার কথাই ব্যক্ত করে এবং উক্ত শ্লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-পরিচিত কবি সম্ভবতঃ তার প্রেরণাতেই ব্রহ্মার এই রসিক মুখের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যাই হক, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার বৈদিক গাম্ভীর্যকে কবি এখানে হাসির খ্যাপামিতে লঘু করে দিয়েছেন আর সেই সহাস্য উচ্ছ্বাসেই আদি পিতামহ রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকের মনে আপনার স্থান করে নিয়েছেন।

বিশ্বকর্মা

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের পরে এবার বিশ্বকর্মার কথা স্মরণ করা যাক। পুরাণে বিশ্বকর্মার ভূমিকা সামান্য। তিনি দেবতাদের কারিগরমাত্র। ঋগ্‌বেদে দেবতাদের অস্ত্রাদির নির্মাতা যে 'ত্বষ্টা' তিনিই পুরাণের বিশ্বকর্মা।[১] কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিশ্বকর্মার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকর্মাকে বিশ্বের নির্মাতারূপেই দেখেছিলেন। তাঁর বিদ্যাসাগর-চরিত ('চারিত্রপূজা'), মাভৈঃ ও পনের আনা (বিচিত্র প্রবন্ধ), সাহিত্য-পরিষৎ ('সাহিত্য') প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে এই অর্থেই বিশ্বকর্মা অভিধাটি ব্যবহৃত হয়েছিল। অবশ্য 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধে দেখি তিনি প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এক একজন সৃজনশীল বিশ্বকর্মার অস্তিত্ব কল্পনা করেছিলেন।—

> আমাদের মধ্যে যে বিশ্বকর্মা আছেন, যিনি আমাদের অন্তরের নিভৃত সৃজনকক্ষে বসিয়া নানা গঠন, নানা বিন্যাস, নানা প্রয়াস, নানা প্রকাশ-চেষ্টায় সর্বদা নিযুক্ত আছেন, পদ্যে তাঁহারই নিপুণ হস্তের কারুকার্য অধিক।
>
> —'পঞ্চভূত', গদ্য ও পদ্য ১২৯৯ ফাল্গুন

এখানেও বিশ্বকর্মা কারুশিল্পীর অধিক মর্যাদা পান নি।

শান্তিনিকেতনের উপদেশমালায় কিন্তু দেখা গেল, রবীন্দ্রমনে পৌরাণিক বিশ্বকর্মা ঔপনিষদিক বিশ্বকর্মায় রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। এই বিশ্বকর্মা বিশ্ববিধাতা। 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ (শ্বেতা ৪।১৭)। তাঁর কর্ম-নৈপুণ্য বহির্বিশ্বের মতো মানুষের অন্তর্লোকেও সমান সক্রিয়। তাই কবি বলেন—

> বিশ্বকর্মা যে তোমার চৈতন্যাকাশকে এই মুহূর্তে একেবারে অরুণরাগে প্লাবিত করে দিলেন। চেয়ে দেখো তোমারই অন্তরে তরুণ সূর্য সোনার পদ্মের কুঁড়ির মতো মাথা তুলে উঠছে, একটু একটু করে জ্যোতির পাপড়ি চারি দিকে ছড়িয়ে দেবার উপক্রম করছে—তোমারই অন্তরে। এই তো বিশ্বকর্মার আনন্দ।
>
> —'শান্তিনিকেতন' ১, বিমুখতা ১৩১৫ ফাল্গুন ১৮

সৃষ্টিকর্তার এই আনন্দের লীলায় যোগ দিতে পারলেই মানুষের জীবনের সার্থকতা। বিশ্বকর্মার এই ব্যাপক অর্থ উক্ত গ্রন্থেরই ছুটির পর নামক প্রবন্ধেও প্রযুক্ত হতে দেখা গেছে। এর পরে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা এক পত্রে ('চিঠিপত্র' ৯, পত্র-২০, ১৩৩৮ আষাঢ় ৩) কবি উপনিষদের পূর্বোদ্ধৃত উক্তিটি ব্যবহার করেই বিশ্বকর্মার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, এই দেবতার অধিষ্ঠান সকল মানুষের হৃদয়ে, বিশ্বের সকল

১ রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্‌বেদের দেবগণ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য · 'প্রবন্ধ সংকলন'— নিখিল সেন-সম্পাদিত

মানুষের কর্মেই তিনি বিশ্বকর্মা। এখানে এই বিশ্বকর্মা কবির মহামানব-কল্পনার সঙ্গে এক হয়ে গেছে।

উপরে উদ্ধৃত প্রসঙ্গগুলি ছাড়া 'শিক্ষা' (ছাত্রশাসনতন্ত্র), 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' (পত্র ২১), 'খৃস্ট' (খৃস্টোৎসব), 'জাভা-যাত্রীর পত্র' (পত্র ৫), 'আত্মপরিচয়' (অধ্যায় ৪) ও 'সাহিত্যের স্বরূপ' (সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা) গ্রন্থের উল্লিখিত প্রবন্ধগুলিতেও দেখি বিশ্বকর্মা সেখানে ফরমাশের কারিগর না থেকে বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা হয়ে উঠেছেন।

তবে বৈচিত্র্যবিলাসী কবির মন একই কল্পনায় বাঁধা থাকে নি। তাই শ্যামযাত্রার পথে সমুদ্রে কতকগুলি দ্বীপ দেখে তিনি স্নিগ্ধ কৌতুকের সুরে বলেন—

> এই জায়গাটাতে বিশ্বকর্মার মাটির ব্যাগ ছিঁড়ে অনেকগুলো ছোটো ছোটো দ্বীপ সমুদ্রের মধ্যে ছিটকে পড়েছে।
>
> — 'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ২০, ১৯২৭ অকটোবর

কখনও বা বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রসঙ্গে দেব কারিগর বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করেন—

> মানুষের অমরাবতী নির্মাণের বিশ্বকর্মা এই বিজ্ঞান।
>
> —'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ১, ১৩৩৪ শ্রাবণ ১

আর ১৯৩০ সালে দেখি তিনি সচেতনভাবে 'বিশ্বকর্মা'কে উদধৃতি চিহ্ন দিয়ে তাকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। রাশিয়ার উদ্যমী ছাত্রসমাজকে লক্ষ করে তিনি বলেছেন—

> এরা 'বিশ্বকর্মা', অতএব এদের বিশ্বমনা হওয়া চাই। অতএব এদের জন্যেই যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়।
>
> —'রাশিয়ার চিঠি', পত্র ৭, ১৯৩০ অকটোবর ২

এখানে বিশ্বকর্মা শব্দটি তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে একটি নূতন ব্যঞ্জনার সঞ্চার করেছে। এইভাবেই পৌরাণিক বিশ্বকর্মা রবীন্দ্রনাথের হাতে নূতন রূপে নূতন ভাবে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছেন।

ইন্দ্র

রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশ্বকর্মার পরেই দেবরাজ ইন্দ্রের স্থান। বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারে বারেই কবি ইন্দ্রকে স্মরণ করেন। তবে স্বর্গপ্রার্থী তপস্বীর তপোভঙ্গকারী ইন্দ্রই বিশেষভাবে কবির স্মৃতিতে জাগ্রত ছিলেন। তার প্রথম পরিচয় পাই কবির 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী'তে বর্ণিত তাঁর চুরোটপ্রিয় বন্ধুর প্রসঙ্গে। তিনি লিখেছেন—

পুরাণে পড়া যায় ইন্দ্রের একটি প্রধান কাজ হচ্ছে— …যিনি তপস্যা করেন অপ্সরী পাঠিয়ে তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করা। আমার বোধ হয় সেই পরশ্রীকাতর ইন্দ্র আমার বন্ধুর বুদ্ধিবৃত্তিকে সর্বদাই বিক্ষিপ্ত করে রাখবার অভিপ্রায়ে তাঁর কোনো এক সুচতুরা কিন্নরীকে তামাকের থলিরূপে আমার বন্ধুর পকেটের মধ্যে প্রেরণ করেছেন।

—'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী' ১৮৯০ অগস্ট ২৬

এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, যদিও কবি 'দেবতার ঈর্ষা'কে বিশ্বাস করতে চান নি, তবু প্রয়োজনের তাগিদে দেবরাজের উপর সেই ঈর্ষাই আরোপ করে রহস্য করবার সুযোগটি তিনি ছাড়েন না। তাই তাঁর অভিমত—

পৃথিবী যে অমরাবতী নয় সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র এখানকার সমস্ত আসবাবেই ছারপোকার বসতি স্থাপন করিয়েছেন।

—'চিঠিপত্র' ৪, পত্র-৪২, মীরাদেবীকে লেখা ১৩২৮ চৈত্র ১১

'সমূহ' গ্রন্থের একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধেও (পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী ১৩১৪) কবি দেশের হিন্দুমুসলমানের বিরোধকে ইন্দ্রপ্রেরিত তপোভঙ্গকারীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। ওই একই সময়ে সাহিত্যসম্বন্ধীয় আলোচনাতেও ('সাহিত্য', সৌন্দর্য ও সাহিত্য ১৩১৪) কবি এই প্রসঙ্গটি স্মরণ করেন। তবে পরবর্তী কালে সাহিত্যসৃষ্টির রহস্য ও তার সৌন্দর্য বোঝাতে গিয়ে কবি এই প্রসঙ্গটি যে আলোকে ব্যাখ্যা করেন তা যেমনি অভাবিত তেমনি সার্থক।—

ধর্মশাস্ত্রে বলে ইন্দ্রদেব কঠোর সাধনার ফল নষ্ট করবার জন্যেই মধুরকে পাঠিয়ে দেন। আমি দেবতার এই ঈর্ষা, এই প্রবঞ্চনা বিশ্বাস করি নে। সিদ্ধির পরিপূর্ণ অখণ্ড মূর্তিটি যে কি রকম তাই দেখিয়ে দেবার জন্যই ইন্দ্র মধুরকে পাঠিয়ে দেন। মেনকা উর্বশী এরা হল পরিপূর্ণতার অখণ্ড প্রতিমা। সন্ন্যাসীকে মনে করিয়ে দেয় সিদ্ধির ফল জিনিসটা কী রকমের। স্বর্গকামী, তুমি স্বর্গ চাও?…কিন্তু স্বর্গ তো পরিশ্রম করে মিস্ত্রি দিয়ে তৈরি হয় নি। স্বর্গ যে সৃষ্টি। উর্বশীর ওষ্ঠপ্রান্তে যে হাসিটুকু লেগে আছে তার দিকে চেয়ে দেখো, স্বর্গের সহজ সুরটুকুর স্বাদ পাবে।…মেনকার কবরীতে যে পারিজাত ফুলটি রয়েছে তার দিকে চেয়ে দেখো, মুক্তির পূর্ণরূপের মূর্তিটি দেখতে পাবে।

—'সাহিত্যের পথে', সৃষ্টি ১৩৩১ কার্তিক

তপোভঙ্গের এই অভিনব তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো কাছেই প্রত্যাশা করা যায় না। কবি এই নূতন অর্থকে যে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ তিনি

স্বয়ং নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছিলেন—

তপোভঙ্গ-দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী
স্বর্গের চক্রান্ত আমি।

—'পূরবী', তপোভঙ্গ ১৩৩০ কার্তিক

রুদ্র বৈরাগীকে সুন্দরের কাছে সানন্দে পরাভব স্বীকার করাবার জন্যই মহেন্দ্র তাঁকে প্রেরণ করেছেন—এইটিই কবির বক্তব্য।

তপোভঙ্গকারী ইন্দ্র ছাড়া বর্ষণের দেবতা ইন্দ্রকেও কবি কয়েকবার স্মরণ করেছেন। এমন কি ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত-উচ্চৈঃশ্রবাও কবির লক্ষ এড়ায় নি। কখনও কখনও ভাবপ্রকাশের জন্য কিংবা অলংকরণের কাজে তিনি ইন্দ্রের পুরাণবর্ণিত কোনো কোনো প্রসঙ্গ ব্যবহার করেন। তাই দেশের শিক্ষাসমস্যার আলোচনায় তাঁর ঈষৎ শ্লেষাত্মক মন্তব্য শুনি।—

আমাদের দেশে যারা বজ্র হাতে ইন্দ্রপদে বসিয়া আছেন তাঁদের সহস্রচক্ষু, কিন্তু বিদ্যার এই বর্ষণের বেলায় অন্তত তার ৯৯০টা চক্ষু নিদ্রা দেয়।

—'শিক্ষা', শিক্ষার বাহন ১৩২২ পৌষ

আবার বালিকা রাণুর কাছে তিনি স্নেহসিক্ত সুরে মেঘলা আকাশের বর্ণনা দেন—

ইন্দ্রের ঐরাবতের বাচ্চাগুলোর মতো মোটা মোটা কালো মেঘ আকাশময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে।

—'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র ১০

কখনও বা প্রমথ চৌধুরীকে কবি রহস্য করে লেখেন—

মাঝে-মাঝে যখন-তখন তোমার একলার লেখাঙ্কিত উড়ো কাগজ এক এক পসলা বর্ষণ করে দিতে দোষ কি?…ইন্দ্রদেব এ কাজ করে থাকেন।

—'চিঠিপত্র' ৫, পত্র ৯৩, ১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ ৩১

এইভাবেই ইন্দ্রদেব রবীন্দ্ররচনায় স্থানে স্থানে দেখা দিয়েছেন। তবে কবির কাছে দেবরাজের গুরুত্ব যে অপেক্ষাকৃত লঘু হয়ে গেছে সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

গণেশ

পুরাণে দেবতা হিসাবে গণেশের মহিমা বিশেষ স্বীকৃত হয় নি। তবে প্রথম পূজাধিকারীরূপে তিনি গুরুত্বের দাবী রাখেন। রবীন্দ্রসাহিত্যেও উল্লেখের পরিমাণবিচারে গণেশ নগণ্য। কিন্তু ভাবের গুরুত্ববিচারে তাঁকে উপেক্ষা করা যায় না। নূতন নূতন

অর্থে ও তাৎপর্যে গণেশ রবীন্দ্ররচনায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

প্রথম জীবনে কবি গণেশকে পৌরাণিক দেবতা হিসাবেই দেখেছিলেন এবং তাঁর অসংগত মূর্তি কল্পনার সমর্থনে বলেছিলেন যে ভারতীয় মন 'অন্তর্জগৎবিহারী'। তাই তাঁদের মনের সৃষ্টির সঙ্গে তাঁরা বাস্তব সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা করাটা অত্যাবশ্যক বলে মনে করেন না। সেইজন্যই—

> মূষিকবাহন চতুর্ভুজ একদন্ত লম্বোদর গজানন মূর্তি আমাদের নিকট হাস্যজনক নহে, কারণ আমরা সেই মূর্তিকে আমাদের মনের ভাবের মধ্যে দেখি—বাহিরের জগতের সহিত, চারি দিকের সত্যের সহিত তাহার তুলনা করি না। কারণ, বাহিরের জগৎ আমাদের নিকট তেমন প্রবল নহে, ···আমরা যে কোনো একটা উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া নিজের মনের ভাবটাকে জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারি।
>
> —'পঞ্চভূত', সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ ১৩০১

এর পরে কবি গণেশকে তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহার করেছেন। গণেশ তখন জনগণেশ বা জনসাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সে সম্বন্ধে কবির বক্তব্য হল—

> কাব্য-সরস্বতীর সেবক হয়ে গোলেমালে আজ গণপতির দরবারের তকমা পরে বসেছি, তার ফলে কাব্য-সরস্বতী আমাকে প্রায় জবাব দিয়েছেন, আর গণপতির বাহনটি আমার সকল কাজেরই ছিদ্র অন্বেষণ করছেন।
>
> —'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৪ সেপ্টেম্বর ২৪

এখানে কবি তাঁর জনমনোরঞ্জনের সমস্যাটিকে মূষিকবাহন গণেশের প্রসঙ্গে টেনে এনে একটি অপ্রত্যাশিত রসের সঞ্চার করেছেন। সংগীতপ্রসঙ্গেও কবি গণেশ ও তাঁর পত্নী কলাবধূকে বিশেষ মুন্‌শীয়ানার সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। আমাদের দেশে উচ্চাঙ্গ সংগীত যে আজ ধনী বা জনসাধারণ কারোরই পৃষ্ঠপোষণা পাচ্ছে না, তার প্রতি লক্ষ রেখে কবি মন্তব্য করেছেন—

> আমাদের দেশে কলাবধূকে লক্ষ্মীও ত্যাগ করিয়াছেন, গণেশের ঘরেও এখনও তাঁহার স্থান হয় নাই।
>
> —'পথের সঞ্চয়', সংগীত ১৩১৯ অগ্রহায়ণ

কবির এই উক্তিটি গণেশ ও কলাবধূর প্রয়োগকৌশলে কত সহজে সুন্দররূপে অলংকৃত হয়ে উঠেছে। এর পরে 'জাভা-যাত্রীর পত্রে' দেখি কবি মূষিকবাহন গজাননকে এক অভূতপূর্ব তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছেন। আধুনিক মানুষ যে বিজ্ঞানবুদ্ধি তথা কীর্তি-বুদ্ধির দ্বারা সভ্যতার পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে চলেছে তারই প্রতীকরূপে তিনি গণেশকে গ্রহণ করে বলেছেন—

গণেশের হাতির মুণ্ডে মানুষের সিদ্ধির মূর্তি। এই সিদ্ধির দুই দিকে দুই জন্তুর চেহারা, এক দিকে রহস্যসন্ধানকারী সূক্ষ্মঘ্রাণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি খরদন্ত চঞ্চল কৌতূহল, সেটা ইঁদুর, সেইটেই বাহন ; আর-এক দিকে বন্ধনে বশীভূত বন্যশক্তি, যা দুর্গমের উপর দিয়ে বাধা ডিঙিয়ে চলে, সেই হল যান—সিদ্ধির যানবাহন যোগে মানুষ কেবলই এগিয়ে চলছে'। তার ল্যাবরেটরিতে ছিল ইঁদুর, আর তার য়েরোপ্লেনের মোটরে আছে হাতি।

—'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ৩, ১৩৩৪ শ্রাবণ ৩

পৌরাণিক গণেশ এইরূপে নানাভাবেই রবীন্দ্রকল্পনাকে উদ্রিক্ত করেছে এবং তারই সহায়তায় কবির রচনা কখনও ভাবঋদ্ধিতে কখনও বা উপমায় অলঙ্কৃত হয়ে উঠেছে।

কার্তিক

পুরাণে গণেশের পরেই তাঁর সহোদর কার্তিকের স্থান। রবীন্দ্রসাহিত্যে কার্তিকের বিশেষ উল্লেখ চোখে পড়ে নি। তবে এঁর সম্বন্ধে কবি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি পত্র থেকে কার্তিকের প্রতি কবির মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গদ্যকবিতার স্বরূপ নির্ণয়ের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

দেবসেনাপতি কার্তিকেয় যদি কেবল স্বর্গীয় পালোয়ানের আদর্শ হতেন তাহলে শুম্ভনিশুম্ভের চেয়ে উপরে উঠতে পারতেন না ; কিন্তু তাঁর পৌরুষ যখন কমনীয়-তার সঙ্গে মিশ্রিত হয় তখনই তিনি দেবসাহিত্যে গদ্যকাব্যের সিংহাসনের উপযুক্ত হন। দোহাই তোমার, বাংলাদেশের ময়ূরে-চড়া কার্তিকটিকে সম্পূর্ণ ভোলবার চেষ্টা করো।

—'ছন্দ', গদ্যছন্দ, পত্রধারা : তৃতীয় পর্যায়-১, ১৯৩৫ মে ১৭

এই একটিমাত্র উপমার যোগেই রবীন্দ্রভাবনায় কার্তিকের স্বরূপটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তবে এ বিষয়ে কবি আর অধিকদূর অগ্রসর হন নি।

উপরোক্ত দেববৃন্দ ছাড়া জগন্নাথ, কন্দর্প, বরুণ, রাহু, কলি, শনি প্রভৃতি দেবতা এবং নারদ, অরুণ, জহ্নুমুনি, ত্রিশঙ্কু প্রভৃতি দেবকল্প ব্যক্তি নানা প্রয়োজনে বিবিধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যে উল্লিখিত হয়েছেন। তবে ভাব বা অর্থের দিক্ থেকে রবীন্দ্র-রচনায় তাঁদের গুরুত্ব বেশি নয়। তাই তাঁদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা থেকে বিরত থাকা গেল।

দেবীকল্পনা : দুর্গা

পৌরাণিক দেবতাদের মতো পুরাণবর্ণিত দেবীগণও রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এই দেবীদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় শিবের পত্নী শক্তির কথা। শিবের ঐতিহাসিক পটভূমিকার পরিচয় দিতে গিয়ে এই শক্তির উত্থান ও আধিপত্যের কিছু আভাস পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রবন্ধে তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি কথাসরিৎসাগরের কাহিনী বিবৃত করে বলেছেন যে একদা বিষ্ণুর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁর প্রার্থনা অনুযায়ী বিষ্ণুকে নিজের অর্ধাঙ্গ করে নেন। সেই অর্ধাঙ্গই শিবের শক্তিরূপিণী পার্বতী'। সেই সঙ্গেই তিনি দেখিয়েছেন যে মুণ্ডমালী প্রেতেশ্বর যখন কালক্রমে পরম শান্ত যোগী হয়ে বসলেন, তখন তাঁর ভীষণত্ব-টুকু সঞ্চারিত হল এই শক্তির মধ্যে। এই শক্তিই চণ্ডী বা কালী। উক্ত প্রবন্ধেই কবি কুমারসম্ভব কাব্য থেকে প্রমাণ করেছেন যে কালিদাসের কালেও 'কপালাভরণা কালী' মহেশ্বরের পশ্চাতে অনুচরীবৃত্তি করতেন, কিন্তু ক্রমশঃ তিনি করালমূর্তি ধারণ করে শিবকে অতিক্রম করে যান। শক্তি তখন শক্তীশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিচয় বহন করে। পরে বৈষ্ণব প্রভাবে এই চণ্ডীই প্রসন্ন মাতৃমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে কখনও দরিদ্র শিবের গৃহলক্ষ্মীরূপে, কখনও বা হিমালয়ের পিতৃগৃহে প্রত্যাগতা কন্যা পার্বতীরূপে দেখা দিয়েছেন।

রবীন্দ্রসাহিত্যে দেবীর এই সবগুলি রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং শিবের মতোই এক একটি নামের অন্তরালে তাঁর এক একটি রূপের প্রকাশ দেখা যায়। এবার একে একে তাঁদের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

পার্বতী

পর্বতদুহিতা পার্বতীর পিতৃগৃহে আগমনের কল্পনাটি রবীন্দ্রমনকে বিশেষভাবেই অধিকার করে ছিল। একাধিক স্থলেই কবি এটিকে ব্যবহার করেছেন। বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনায় এই কল্পনাটি আরোপ করে তিনি কখনও তাতে সস্নেহ প্রসন্নতার কখনও বা অশ্রুসজল কারুণ্যের স্পর্শ এনে দিয়েছেন। তাই ইছামতী নদীকে দেখে তাঁর মনে হয়—

> আশ্বিন মাসে মেনকার ঘরের মেয়ে পার্বতী যেমন কৈলাসশিখর ছেড়ে একবার তার বাপের বাড়ি দেখেশুনে যায়, ইছামতী তেমনি সম্বৎসর অদর্শন থেকে বর্ষার কয়েকমাস আনন্দহাস্য করতে করতে তার আত্মীয় লোকালয়গুলির

তত্ত্ব নিতে আসে।

—'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-২২০, ১৮৯৫ জুলাই ৯

শারদা

বাংলাদেশের শরৎঋতু আবার তাঁর চোখে গৌরী শারদার সঙ্গে এক হয়ে মিলে যায় তাই কবির লেখনীতে তার বর্ণনা পৌরাণিক কল্পনার প্রতিভাসে অপরূপ হয়ে ধরা দেয়।—

> মাটির কন্যার আগমনীর গান এই তো সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দিভৃঙ্গী শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছুদিন হইল ধরা-জননীর কোলে রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ার গান বাজিতে আর তো দেরি নাই, শ্মশানবাসী পাগলটা এল বলিয়া, তাকে তো ফিরাইয়া দিবার জো নাই—হাসির চন্দ্রকলা তার ললাটে লাগিয়া আছে, কিন্তু তার জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনী।

—'বিচিত্র প্রবন্ধ', শরৎ ১৩২২ ভাদ্র-আশ্বিন

পরবর্তী কালে বালিকা রাণুকে লেখা আশ্বিনের এক পত্রে দেখি তিনি লিখেছেন—

> আমরা তো এই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, স্বর্ণকিরণচ্ছটায় শারদা আমাদের ঘর উজ্জ্বল করে দাঁড়িয়েছেন। গোটাকতক মেঘ দিগন্তের কোণে মাঝে মাঝে জটলা করে, কিন্তু তাদের নন্দী-ভৃঙ্গীর মতো কালো চেহারা নয়।

—'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র ১৯, ১৩২৫ আশ্বিন ৩

এইভাবেই কবি এক দিকে শরৎপ্রকৃতিকে অন্য দিকে পতিগৃহবাসিনী কন্যার জন্য স্নেহকাতর মানবপ্রকৃতিকে দেবী পার্বতীর পৌরাণিক কাহিনীকল্পনার সঙ্গে অবিরোধে মিলিয়ে দেন।

এই শারদীয়া দেবীমূর্তি কখনও কখনও কবির কাছে স্বদেশমাতৃকায় পরিণত হয়ে যান। ১৩১২ সালের ৩০ আশ্বিন তারিখে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে ব্যাপক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বহু স্বদেশী-সংগীত রচনা করেন। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'রবীন্দ্রভাবনায় বিশ্বশক্তির মাতৃরূপ' প্রবন্ধে ('সম্মেলনী', ১৩৭৪ আশ্বিন) দেখিয়েছেন যে বঙ্গভঙ্গের সময়টা ছিল আশ্বিন মাস—মাতৃবন্দনার মাস। সেই জন্য স্বাভাবিকভাবেই কবির দেশজননী সেদিন শারদীয়া মাতৃমূর্তিতে রূপ লাভ করেছিল। নিম্নলিখিত গানটিতে সে-ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

> আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
> তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!…

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরন।

—'গীতবিতান', স্বদেশ ২১

কবিবর্ণিত স্বদেশের এই মাতৃমূর্তি অনিবার্যভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম্' গানের 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী'…ইত্যাদি ভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থের আমার দুর্গোৎসব প্রবন্ধে (১২৮১ কার্তিক) যে কিভাবে দেশজননীকে দেবীমূর্তির সঙ্গে এক করে ফেলেছিলেন তা কারো অজানা নেই। উক্ত প্রবন্ধের আট বৎসর পরে 'আনন্দমঠ' (১২৮৯) উপন্যাসে এই দেবীরই বন্দনা শুনি। তবে বঙ্কিমের উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমকল্পিত মূর্তিটির বস্তুভার বাদ দিয়ে তার ভাবসত্তাটুকুই গ্রহণ করেছিলেন।

অন্নপূর্ণা

দেবী দুর্গা কখনও কখনও কবির কাছে অন্নপূর্ণা মূর্তিতে প্রতিভাত হয়েছেন। অন্নপূর্ণা দেবীর ঐশ্বর্যের মূর্তি। তাই পরিপূর্ণতার প্রতীকরূপে কবি অন্নপূর্ণাকে স্মরণ করেন। তবে মুখ্যতঃ অন্নপূর্ণাকে তাঁর নিজের একটি তত্ত্ব-বিশ্লেষণের সহায়করূপেই কবি ব্যবহার করেছিলেন। বলা বাহুল্য, সে তত্ত্ব পৌরাণিক নয়; তা অনেকাংশেই কবির নিজের ভাবনাপ্রসূত। তাই পশ্চিমী সভ্যতার ভোগবহুলতা দেখে কবি যে বৈরাগ্যের কথা স্মরণ করেছেন তার বর্ণনা করে তিনি বলেছেন—

> আমি বৈরাগ্যের নাম করে শূন্য ঝুলির সমর্থন করি নে।…বাহিরের বৈরাগ্য অন্তরের পূর্ণতার সাক্ষ্য দেয়।…অন্তরে প্রেম বলে সত্যটি যদি থাকে তবে তার সাধনায় ভোগকে হতে হয় সংযত, …এই সাধনার সতীত্ব থাকা চাই। এই সতীত্বের যে বৈরাগ্য অর্থাৎ সংযম সেই হল প্রকৃত বৈরাগ্য। অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন সেই হল প্রকৃত মিলন।

—'শিক্ষা', শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন

'সতীত্ব' শব্দ-প্রয়োগের দ্বারা কবি যে সুকৌশলে পাঠকের মনে শিবের পত্নী 'সতী'র ব্যঞ্জনাটি সঞ্চার করে দিয়েছেন, এই প্রসঙ্গে সেটিও লক্ষণীয়। এর কিছুকাল পরে আর একটি প্রসঙ্গে তিনি তাঁর এই তত্ত্বকেই স্ফুটতর রূপ দিয়ে প্রকাশ করে বলেছেন, সংসারে প্রয়োজনের অন্ত নেই ঠিকই, তবু সেই প্রয়োজনের তাগিদটিই একান্ত সত্য নয়; তার আড়ালে থাকে অপ্রয়োজনের আনন্দ। সুতরাং তাঁর বক্তব্য হল, এই দুটির সামঞ্জস্যেই প্রকাশ পায় সত্য। তাই—

আমাদের পুরাণে শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দরিদ্রবেশ আর অন্নপূর্ণায় তাঁর ঐশ্বর্য, বিশ্বে এই দুইয়ের মিলনেই সত্য।

—'পথে ও পথের প্রান্তে', অধ্যায় ৪৭, ১৯৩০ ফেব্রুআরি

এইভাবেই কবি পুরাণকল্পনার মধ্যে নূতন নূতন তাৎপর্য আরোপ করে তার দ্বারা আপন বক্তব্যকে অলংকৃত করে প্রকাশ করেছেন।

কালী

দেবীর অন্নপূর্ণা মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কালী মূর্তিটিও কবির দৃষ্টি বিশেষভাবেই আকৃষ্ট করেছিল। শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালায় ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে কবি এই কল্পনার শরণ নিয়ে বলেছিলেন—

শক্তির ক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বরের দুই মূর্তি দেখতে পাই, এক হচ্ছে অন্নপূর্ণা মূর্তি—এই মূর্তি ঐশ্বর্যের দ্বারা আমাদের শক্তিকে পরিপুষ্ট করে তোলে। আর-এক হচ্ছে করালী কালী মূর্তি—এই মূর্তি আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তিকে সংহরণ করে নেয়, আমাদের কোনো দিক দিয়ে শক্তির চরমতায় যেতে দেয় না. না টাকায়, না খ্যাতিতে, না অন্য-কোনো বাসনার বিষয়ে।

—'শান্তিনিকেতন' ১, প্রকৃতি ১৩১৫ পৌষ ২৪

এখানে কবি অন্নপূর্ণা বা কালীর পৌরাণিক ভাবকল্পনা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু এই নাম দুটিকে কবি তাঁর আধ্যাত্মিক ধর্মব্যাখ্যায় সার্থকভাবেই প্রয়োগ করেছেন। এর কিছু কাল পরে আধুনিক কালের বাণিজ্য লোভকলঙ্কিত হয়ে যে কিভাবে রক্তক্ষয়ী হানাহানিতে পর্যবসিত হয়েছে তাকে লক্ষ করে কবি পুরাণের এই কল্পনাটি স্মরণ করেন। তিনি বলেন বাণিজ্য এককালে শ্রীসম্পদের বাহক ছিল। কুশ্রী লোভের তাড়নায় আজ তা পঙ্কিল হয়ে উঠেছে। তাই—

অন্নপূর্ণা আজ হয়েছেন কালী, তাঁর অন্নপরিবেষণের হাতা আজ হয়েছে রক্ত-পান করবার খর্পর। তাঁর স্মিতহাস্য আজ অট্টহাস্যে ভীষণ হল।

—'জাপানযাত্রী', অধ্যায় ৪, ১৩২৩ বৈশাখ ২৭

কবির বক্তব্য, এই বাণিজ্য মানুষের মনুষ্যত্বকে আজ আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। যাই হক, কবির এই উপমা-প্রয়োগ ও বক্তব্য-উপস্থাপনের ভঙ্গিটি স্বভাবতঃই বঙ্কিমচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতীতের উজ্জ্বল শারদারূপিণী দেশমাতাকে দুর্দশার দিনে কালীতে পরিণত হতে দেখে বঙ্কিম তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে (১ম খণ্ড, ১১শ পরিচ্ছেদ) সক্ষোভে বলেছিলেন 'মা যা হইয়াছেন'। রবীন্দ্রনাথকেও এক প্রবন্ধে

দেশের প্রসঙ্গে কালীরূপিণী শক্তিকে স্মরণ করতে দেখা যায়। তবে কবি তাঁর কল্পনাকে স্বদেশের সংকীর্ণতা থেকে বিশ্বের পটভূমিতে এনে দেন। সেখানে দেখি তিনি বিশ্বের সর্বত্র যে শক্তিপূজা প্রত্যক্ষ করেন, তা পুরাণবর্ণিত দেবীর পূজা নয়; তা ব্যক্তিমানুষের অহঙ্কৃত শক্তিরই পূজা। তা কেবলই অন্যের অধিকারকে গ্রাস করে আপনার শক্তিকে বাড়াতে চায়। তাই তাঁর খেদোক্তি—

> এইজন্যেই সিদ্ধিলাভের কামনায় এরা অন্যের অর্থ, অন্যের প্রাণ, অন্যের অধিকাবকে বলি দেয়। শক্তিপূজার প্রধান অঙ্গ বলিদান। সেই বলির রক্তে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে।

—'কালান্তর', বাতায়নিকের পত্র-১, ১৩২৬ আষাঢ়

কবিকল্পিত শক্তিপূজা নিঃসন্দেহেই এখানে পুরাণের থেকে দূরে সরে এসেছে। তবে শক্তিপূজার মূল নির্যাসটুকু রক্ষা করেই আধুনিক কবি আধুনিক যুগের উপযোগী করে তাব ভাষ্য রচনা করেছেন। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় যে আধুনিক বেশে সজ্জিত হলেও দেবীশক্তির মৌল ভাবসত্তাটুকু অপরিবর্তিতই থেকে গেছে।

'কালী' শব্দের ভাবগত তাৎপর্যও যে কবিকে কতদূর অধিকার করেছিল এবং তিনি যে কিভাবে তার অর্থ করেছেন, পূর্ববর্তী 'মহাকালে'র আলোচনাতেই তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথ কালীকে যে সর্বত্রই প্রচণ্ডা ও উগ্ররূপেই দেখেন নি তারই একটু আভাস দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাবে। পূর্বে উল্লিখিত রবীন্দ্রভাবনায় বিশ্বশক্তিব মাতৃরূপ প্রবন্ধে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের একটি গান থেকে এই মন্তব্যের সার্থকতা প্রতিপাদন করেন। তিনি নিম্নলিখিত গানটি উদ্ধৃত কবেছেন—

সন্ধ্যা হল গো—ও মা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো।
অতল কালো স্নেহের মাঝে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো॥
ফিরিয়ে নে মা, ফিরিয়ে নে গো—সব যে কোথায় হারিয়েছে গো—
ছড়ানো এই জীবন, তোমার আঁধার-মাঝে হোক-না জড়ো॥
আর আমারে বাইরে তোমার কোথাও যেন না যায় দেখা।
তোমার রাতে মিলাক আমার জীবনসাঁজের রশ্মিরেখা।...

—'গীতবিতান', পূজা ১৬০

এবং মন্তবা করেছেন—

> এখানে 'কালো স্নেহ', 'তোমার আঁধার', 'তোমার রাত' এই কথাগুলির মধ্যে স্নেহময়ী মাতৃরূপা কালীর কল্পনা অনতিপ্রচ্ছন্নরূপেই প্রকাশ পেয়েছে। এই কালী শুধু মাতৃরূপা নয়, মৃত্যুরূপাও বটে। কিন্তু এই মৃত্যুর প্রকৃতি করালী নয়,

শান্তিময়ী! তার আশ্রয়ে জীবনের সব জ্বালা জুড়িয়ে স্নিগ্ধ হয়।

—রবীন্দ্রভাবনায় বিশ্বশক্তির মাতৃরূপ, সম্মেলনী ১৩৭৪ আশ্বিন

এই স্নিগ্ধ কালীরূপার স্নেহচ্ছায়াতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ আশ্রয় নিতে চেয়েছেন।

লক্ষ্মী

শিবের ভার্যা দুর্গা তাঁর রূপবৈচিত্র্যের জন্য রবীন্দ্রসাহিত্যে অনেকখানি স্থান অধিকার করে থাকলেও ভাবের গভীরতার দিক্ থেকে লক্ষ্মীই কবির চিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল বেশি। কবির সারা জীবনের রচনাতে নানাভাবেই তার পরিচয় বিকীর্ণ হয়ে আছে।

পুরাণের লক্ষ্মী শ্রী ও সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী। তাই তাঁর হাতে থাকে ধান্যশীর্ষ। রবীন্দ্রনাথও লক্ষ্মীকে শ্রীসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী রূপেই দেখেছেন এবং বিশেষভাবে নির্দেশ করে দিয়েছেন যে লক্ষ্মীর সম্পদ কুবেরের মতো শুধু সঞ্চিত ঐশ্বর্যের স্তূপ নয়, তাতে আছে কল্যাণের স্পর্শ। তাতেই লক্ষ্মীর সম্পদ্ শ্রীলাভ করেছে ('শিক্ষা', শিক্ষার মিলন)। প্রথম জীবনে কবি এই লক্ষ্মীর আবাহন করেন।—

> লক্ষ্মী, তুমি শ্রী, তুমি সৌন্দর্য, আইস, তুমি আমাদের হৃদয়-কমলাসনে অধিষ্ঠান কর। তুমি যাহার হৃদয়ে বিরাজ কর, তাহার আর দারিদ্র্যভয় নাই, জগতের সর্বত্রই তাহার ঐশ্বর্য। যাহারা লক্ষ্মীছাড়া, তাহারা হৃদয়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ পোষণ করিয়া টাকার থলি ও স্থূল উদর বহন করিয়া বেড়ায়।

—'আলোচনা', সৌন্দর্য ও প্রেম: লক্ষ্মী ১২৯১ আষাঢ়

রবীন্দ্রনাথ এখানে বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মীকে নিখিল মানবের 'হৃদয়শতদলবাসিনী' রূপেই দেখেছেন।

কবি এক দিকে যেমন বৈকুণ্ঠের দেবীকে মর্ত্যহৃদয়ে আহ্বান করেছেন, অন্য দিকে তেমনি মর্ত্যের মানবীর মধ্যে সেই দেবীর প্রতিভাস লক্ষ করেছেন। 'প্রসন্নমূর্তি প্রফুল্লমুখী ধৈর্যময়ী' যে নারী মানবসংসারের রোগশোক ক্ষুধাশ্রান্তিকে আপনার সেবা-কুশল কল্যাণহস্তে অপসারিত করে স্নেহ ও শান্তি বিধান করেন তারই মধ্যে কবি লক্ষ্মীমূর্তির আদর্শ কল্পনা করে নেন। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের অন্তর্গত নরনারী প্রবন্ধে (১২৯৯ চৈত্র) তাঁর এই মনোভাবের প্রথম প্রকাশ দেখা গিয়েছিল। পরবর্তী কালেও দেখি তিনি এই কল্যাণীর উদ্দেশ্যেই অকুণ্ঠভাবে বলেন—

> সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান
> আছে তোমার তরে।

—'কণিকা', কল্যাণী ১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ

অন্যত্রও কবি তাঁর এই ভাবনাকে স্পষ্ট রূপ দিয়ে বলেন—

> লক্ষ্মী সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ভাবকল্পনা আছে তাকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখি নারীর আদর্শে। লক্ষ্মীতে সৌন্দর্য হচ্ছে পরিপূর্ণতার লক্ষণ।...সামঞ্জস্য যখন সম্পূর্ণ হয় তখনই সুন্দরের আবির্ভাব।
>
> —'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৪ সেপ্‌টেম্বর ২৮

এখানে যে সামঞ্জস্যের কথা বলা হয়েছে, তা হল মাধুর্যের সঙ্গে মঙ্গলের সামঞ্জস্য। নারী-প্রকৃতিতে যে সৌন্দর্য দেখা যায় তা এই মঙ্গল ও মাধুর্যের সম্মিলন। আর সেইখানেই কবি লক্ষ্মীর আবির্ভাব কল্পনা করেছেন। নিচের উদ্ধৃতিতে তাঁর এই কল্পনাটি ধরা দিয়েছে। তিনি বলেছেন—

> রমণীর মধ্যে যেখানে আমরা লক্ষ্মীর প্রকাশ দেখিতে পাই সেখানে আমরা এক দিকে দেখি সাজসজ্জা লীলামাধুর্য, আর-এক দিকে দেখি অক্লান্ত কর্মপরতা ও সেবানৈপুণ্য। এই উভয়ের বিচ্ছেদই কুশ্রী।
>
> —'পথের সঞ্চয়', খেলা ও কাজ ১৩১৯ ভাদ্র

নারীর এই দুই রূপের কথা কবির একটি কবিতায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।—

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজনা উর্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রানী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

—'বলাকা', দুই নারী ১৩২১ মাঘ

নারীর লীলারূপের সঙ্গে তার কল্যাণী রূপের সুসমঞ্জস সংগতিতেই—উর্বশীর সঙ্গে লক্ষ্মীর মিলনেই আদর্শ নারীত্বের প্রতিষ্ঠা। এই দুই রূপের সমন্বয় না হয়ে তার লীলাবিলসিত মোহিনী রূপটিই যখন একান্ত হয়ে ওঠে তখন তার মধ্যে কবি উর্বশীকে প্রত্যক্ষ করেন। লক্ষ্মীর তুলনায় কবি উর্বশীর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে।—

> মনে রাখতে হবে উর্বশী কে। সে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী নয়, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নয়; সে

স্বর্গের নর্তকী, দেবলোকের অমৃতপানসভার সখী।…সে যেন চিরযৌবনের পাত্রে রূপের অমৃত—তার সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত নেই। সে অবিমিশ্র মাধুর্য।…অন্তত পৌরাণিক কল্পনায় সেই উর্বশী একদিন সত্য ছিল।…কিন্তু কোথায় গেল সেদিনকার সেই উর্বশী! আজ তার ভাঙাচোরা পরিচয় ছড়িয়ে আছে অনেক মোহিনীর মধ্যে…উর্বশীকে মনে করে যে সৌন্দর্যের কল্পনা কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে, লক্ষ্মীকে অবলম্বন করলে সে আদর্শ অন্যরকম হত, হয়তো তাতে শ্রেয়স্তত্ত্বের উঁচু সুর লাগত।

—চিত্রা' ১৩৪৯, গ্রন্থপরিচয়[১]

কবির চোখে নারীর উর্বশী রূপের মধ্যে কল্যাণের ভূমিকা নেই, তার প্রেমে শ্রেয়োবোধের সম্পূর্ণ অভাব। তাতে শুধু অবিমিশ্র মাধুর্য। কিন্তু তার লক্ষ্মীরূপের মধ্যে মঙ্গলের ব্যঞ্জনা আছে। তাই কবির চোখে এই দুয়ের সমন্বয়েই লক্ষ্মীস্বরূপা নারী-আদর্শের সার্থকতা। এই কথাটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে পূর্বেই তিনি বলেছিলেন—

প্রেমের দুই বিরুদ্ধ পার আছে। এক পারে চোরাবালি আর-এক পারে মঙ্গলের খেত। নারীর প্রেম যেখানে এই বিরোধের সমন্বয় করে দেয়,… পুরুষের মুক্তিকে যখন সে লুপ্ত করে না, তাকে সুন্দর করে তোলে— ভোগবতীর জলে ডুবিয়ে দেয় না, সুরধুনীর জলে স্নান করায়—তখন বৈরাগ্যের সঙ্গে অনুরাগের, হরের সঙ্গে পার্বতীর, শুভপরিণয় সার্থক হয়।

—'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১৩

প্রসঙ্গতঃ বলতে হয় পুরাণের লক্ষ্মী এবং উর্বশী একই উৎস থেকে জাত, উভয়েরই উদ্‌ভব সমুদ্রমন্থনে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'স্বর্গের অপ্‌সরী' ও 'স্বর্গের ঈশ্বরী'কে একই সমুদ্রতল থেকে উঠতে দেখেছেন। কারণ নারীর মোহিনী এবং কল্যাণী রূপ পরস্পর-সম্পৃক্ত এবং নারীর প্রেমে এই দুইয়েরই স্থান আছে। সেইজন্যই কবিকল্পিত নারীর লক্ষ্মী মূর্তিতে এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের সুষ্ঠু সমন্বয় দেখা যায়।

দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পিত একটি তত্ত্বকথাকে পুরাণের সহায়তায় রূপদান করেছেন। কখনও কখনও তিনি পুরাণবর্ণিত ভাবকে নূতন অর্থে সজ্জিত করেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। পুরাণে পাই লক্ষ্মী চঞ্চলা। কবি তিনটি প্রসঙ্গে তার তিন রকম ভাষ্য করেছেন। প্রথমতঃ কবি মন্তব্য করেন—

জগতে লক্ষ্মী যতক্ষণ চঞ্চলা ততক্ষণ তিনি কল্যাণদায়িনী। লক্ষ্মীকে এক জায়গায় চিরকাল বাঁধিতে গেলেই তিনি অলক্ষ্মী হইয়া উঠেন। কারণ, চঞ্চলতার দ্বারাই

১ দ্রষ্টব্য : 'চিত্রা' ১৩৪৯, গ্রন্থপরিচয়. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র ২. ২. ১৯৩৩

লক্ষ্মী বৈষম্যের মধ্যে সাম্যকে আনেন।

—'সঞ্চয়', রূপ ও অরূপ ১৩১৮ পৌষ

এখানে কবির লক্ষ্মী সাম্যবিধানকারিণী। পর বৎসরই কিন্তু কবি লক্ষ্মীর এই সামাজিক রূপকে না মেনে তাকে টেনে এনেছেন মানুষের কর্মশক্তির মধ্যে। তিনি দেখিয়েছেন—

বিঘ্নের কাছে যে মাথা হেঁট করিয়াছে, ভয়ের কাছে যে পাশ কাটাইয়া চলিয়াছে, লক্ষ্মীকে সে পাইল না। এইজন্য আমাদের পুরাণকথায় আছে, চঞ্চলা লক্ষ্মী চঞ্চল সমুদ্র হইতে উঠিয়াছেন, তিনি আমাদের স্থির মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বীরকে তিনি আশ্রয় করিবেন, লক্ষ্মীর এই পণ।

—'পথের সঞ্চয়', জলস্থল ১৩১৯ শ্রাবণ

রবীন্দ্রনাথ এখানে মানুষের উদ্যমকে কর্মশক্তিকে জাগ্রত করে তোলার জন্য লক্ষ্মীর—সম্পদের প্রলোভন দেখিয়েছেন। কিন্তু এর পরেই এই শ্রীসম্পদও অবিচল অবস্থায় যে একটা ভারস্বরূপ হয়ে পড়ে তা দেখিয়ে মন্তব্য করেছেন—

বোঝা অচল হইয়া থাকিতে চায় বলিয়াই মানুষের প্রাণশক্তি তাহাকে সচল করিয়া তোলে। এইজন্যই লক্ষ্মী চঞ্চলা। লক্ষ্মী যদি অচঞ্চল হইতেন তবে মানুষ বাঁচিত না।

—'কালান্তর', লড়াইয়ের মূল ১৩২১ পৌষ

লক্ষ্মীকে উপলক্ষ করে এই তত্ত্বকথার অবতারণা করলেও তাঁর যে রূপটি রবীন্দ্র-মনকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছিল তা হল, সমুদ্রমন্থনজাত লক্ষ্মীর সদ্য-উত্থিত বরতনুর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য। এই রূপচিত্রটি তাই বার বার তাঁর সাহিত্যে দেখা দিয়েছে। 'মালিনী' নাটকে বহুজনসমারূঢ় মালিনীর কল্যাণী রূপের যে চিত্র পাই, তা হল—

সমুদ্রমন্থনে যবে
লক্ষ্মী উঠিলেন তাঁরে ঘেরি কলরবে
মাতিল উন্মাদনৃত্যে ঊর্মিগুলি সবে,
সেই মতো উচ্ছ্বসিত জনপারাবার,
মাঝে তুমি শোকলক্ষ্মী মাতা।

—'মালিনী' ১৯১২, তৃতীয় দৃশ্য

মীরা দেবীকে লেখা একটি পত্র ('চিঠিপত্র' ৪, পত্র-৩৮, ১৯২০) থেকেও এই কল্পনার প্রতি কবির আকর্ষণটি ধরা দেয়। সেখানে প্রসঙ্গক্রমে তিনি লিখেছিলেন—

এ বছরের লক্ষ্মীপূর্ণিমা সমুদ্রের উপরেই দেখা গিয়েছিল। লক্ষ্মী যে সমুদ্রমন্থনে প্রকাশ পেয়েছিলেন।

তাঁর 'শেষের কবিতা' উপন্যাসেও দুর্ঘটনার পটভূমিতে আমরা প্রথম নায়িকার যে চিত্রটি পাই তা হল,—

সদ্য মৃত্যু-আশঙ্কার কালো পটখানা তারা পিছনে, তারই উপরে সে যেন ফুটে উঠল একটি বিদ্যুৎরেখার আঁকা সুস্পষ্ট ছবি—চারি দিকের সমস্ত হতে স্বতন্ত্র। মন্দর-পর্বতের নাড়া-খাওয়া ফেনিয়ে-ওঠা সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী, সমস্ত আন্দোলনের উপরে—মহাসাগরের বুক তখনো ফুলে ফুলে কেঁপে উঠছে।

—'শেষের কবিতা' ১৯২৯, অধ্যায় ২ : সংঘাত

আবার লীলাচাঞ্চল্যের অবসানে অনুভূতির গাঢতায় কবি যে ভাবগভীর প্রেমের উদ্ভব কল্পনা করেছিলের, তার বর্ণনাতেও এই চিত্রটি এসেছিল।—

আপন প্রাণের চরম কথা
বুঝবে যখন, চঞ্চলতা
তখন হবে চুপ।
তখন দুঃখ-সাগরতীরে
লক্ষ্মী উঠে আসবে ধীরে
রূপের কোলে পরম অপরূপ।

—'পূরবী', প্রকাশ ১৯২৪ অক্টোবর

সরস্বতী

পৌরাণিক লক্ষ্মীর সহোদরা সরস্বতী কিন্তু বৈদিক দেবী। বৈদিক সরস্বতীর পরিচয় দিয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন —

প্রাচীনা দেবীদিগের মধ্যে কেবলমাত্র সরস্বতীর পূজাই অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। ঋগ্‌বেদের সরস্বতী দেবী নদীও বটেন, বাগ্‌দেবীও বটেন। সরঃ শব্দ অর্থে জল, সরস্বতী অর্থে জলবতী, ভারতবর্ষে যে সরস্বতী নামক নদী আছে তাহাই প্রথমে পবিত্র নদী বলিয়া উপাসিত হইত। বোধ হয়, সেই নদীতীরে ঋষিগণ যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন, বোধ হয়, সেই নদীতীরে ঋগ্‌বেদের পবিত্র মন্ত্র ও স্তুতি উচ্চারণ হইত, সুতরাং সরস্বতী নদী অচিরে সেই মন্ত্র ও স্তুতির দেবী অর্থাৎ বাগ্‌দেবী হইয়া গেলেন।

—ঋগ্‌বেদের দেবগণ, পঞ্চম প্রস্তাব : সরস্বতী প্রভৃতি দেবীগণ[১]

১ দ্রষ্টব্য : নিখিল সেন -সম্পাদিত 'প্রবন্ধ-সংকলন'

ঋগ্‌বেদের ১ম মণ্ডলের ৩য় সূক্তের ১২শ মন্ত্রে তাই দেখি—

> সরস্বতী প্রবাহিতা হইয়া প্রভূত জল সৃজন করিয়াছেন এবং জ্ঞান উদ্দীপন করিয়াছেন।

বৈদিক সংস্কৃতির উৎসস্বরূপ সরস্বতী নদী রবীন্দ্রকল্পনাকে যে কতদূর অধিকার করেছিল পূর্ববর্তী 'বৈদিক সাহিত্য' অধ্যায়ে তার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পৌরাণিক বাগ্‌দেবীর কল্পনাও যে রবীন্দ্রমানসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, এবার সেই পরিচয় নেওয়া যাক।

লক্ষ্মীকে কবি একাধারে সৌন্দর্য ও কল্যাণের প্রতিমূর্তি বলে মনে করেছিলেন। আর সরস্বতী সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব হল—

> আমাদের শুভ্রবসনা কমলালয়া দেবী সরস্বতী একাধারে Truth এবং Beauty মূর্তিমতী।

—'সাহিত্য', সৌন্দর্যবোধ ১৩১৩ পৌষ

কবি সাহিত্যের মধ্যেই সত্যের অনুভূতি ও সৌন্দর্যের চেতনাকে এক করে মিলিয়ে নিয়েছেন। সাহিত্যের মধ্যে সৌন্দর্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে কবি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীকে স্মরণ করেছেন। পুরাণেও দেখি তাঁরা সহোদরা এবং লোকপালক বিষ্ণুর গৃহে তাঁদের উভয়ের অধিষ্ঠান। শ্রীসম্পদ্ ও কল্যাণের সঙ্গে বিদ্যার কোনো বিরোধ নেই। কারণ ধনের দ্বারাই আসে স্থিতি, আসে শান্তি। আর সেই অবকাশেই জ্ঞানচর্চার প্রসার। তাই রবীন্দ্রদৃষ্টিতেও 'সৌন্দর্যরূপা লক্ষ্মী' এবং 'ভাবরূপা সরস্বতী'র ('পঞ্চভূত', কাব্যের তাৎপর্য) একত্রে মিলেছেন। কি সাহিত্যে কি সংগীতে সর্বত্রই ধনের সঙ্গে গুণ, লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর মিলনই যে সার্থকতা বয়ে আনে কবি সে কথা জানতেন এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গেই তাঁর এ মত ব্যক্ত করেছেন ('পথের সঞ্চয়', সংগীত)।

তবে লোককথায় লক্ষ্মী-সরস্বতীর মধ্যে যে সপত্নী-বিরোধের অবতারণা করা হয় সে সম্বন্ধে কটাক্ষ করতেও কবি ছাড়েন নি। তাই কখনও কখনও তাঁকে ঈষৎ তির্যক ভঙ্গিতে বলতে শোনা যায়—

> জনসমাজে লক্ষ্মীরই চাঞ্চল্য-অপবাদ প্রচার হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সপত্নীর যে নিতান্ত অটল স্বভাব এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় না।

—'সমাজ', পরিশিষ্ট . আদিম আর্য-নিবাস ১২৯৯

তবে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই কবির পক্ষপাতিত্ব ছিল সরস্বতীর প্রতি। তাই যদিও তাঁকে স্বীকার করতে হয়—

সুরের খাদ্যে জানো তো মা বাণী
নরের মেটে না ক্ষুধা।

—'সোনার তরী', পুরস্কার ১৩০০ শ্রাবণ

তবু তিনি বলতে ছাড়েন না—

কবি হন বা কলাবিৎ হন অন্দরে তাঁরা মানেন সরস্বতীকে, সদরে তাঁদের মেনে চলতে হয় লক্ষ্মীকে। সরস্বতী ডাক দেন অমৃতভাণ্ডারে, লক্ষ্মী ডাক দেন অন্নের ভাণ্ডারে। শ্বেতপদ্মের অমরাবতী আর সোনার পদ্মের অলকাপুরী ঠিক পাশাপাশি নেই।

— পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৪ সেপ্টেম্বর ২৭

বলা বাহুল্য, 'অন্ন' হল নিত্যকার প্রয়োজনের সামগ্রী আর 'অমৃত' এই প্রয়োজনকে পার হয়ে চিরন্তন আনন্দের প্রেরণা জোগায়। পরিণত বয়সে কবি আরও স্পষ্ট করে লক্ষ্মীর তুলনায় সরস্বতীর মর্যাদাকে স্বীকার করে বলেছেন -

লক্ষ্মী কৃপণ, কারণ লক্ষ্মীর সঞ্চয় সংখ্যাগণিতের সীমায় আবদ্ধ, ব্যয়ের দ্বারা তার ক্ষয় হতে থাকে। সরস্বতী অকৃপণ, কেননা, সংখ্যার পরিমাপে তাঁর ঐশ্বর্যের পরিমাপ নয়, দানের দ্বারা তার বৃদ্ধিই ঘটে।

—'শিক্ষা', ছাত্রসম্ভাষণ ১৩৪৩ ফাল্গুন

বাণীর বরপুত্র যে লক্ষ্মীর তুলনায় বীণাপাণিকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসন দেবেন, তাতে বিস্ময়ের অবকাশ নেই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় অসংখ্যবার বহু প্রসঙ্গেই সরস্বতীকে স্মরণ করেছেন। তবে দেবীর বীণাপাণি মূর্তির প্রতিই কবির বিশেষ অর্ঘ নিবেদিত হয়েছে। তাই শরৎ আকাশের সৌন্দর্যে তিনি সারদার প্রতিভাস কল্পনা করেন।—

বৃষ্টিতে ধোওয়া রোদ্দুরটি যেন সরস্বতীর বীণার তারগুলো থেকে বেজে-ওঠা গানের মতো সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেচে।

—'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র ৮, ১৩২৫ শ্রাবণ ১৮

রবীন্দ্রমানসের আকাশও সরস্বতীর কল্পনায় এই গানের সুরেই ভরা ছিল। তাঁর সাহিত্যে তারই প্রকাশ দেখা গেছে।

দেখা গেল পুরাণের দেব ও দেবীকল্পনা রবীন্দ্রচিত্তকে গভীরভাবেই অধিকার করেছিল। এই দেবদেবী সম্পর্কে যে লোককথাগুলি প্রচলিত আছে সেগুলিও যে কবির কাছে উপেক্ষিত হয় নি, বরং প্রয়োজনমতো সেগুলি কবিকে যে তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট করে তোলায় সহায়তা করেছিল এবার তারই একটি

দৃষ্টান্ত দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। প্রেমের যথার্থ স্বরূপটি বোঝাতে গিয়ে কবি লিখেছেন—

> অভাবকে অসম্পূর্ণতাকে প্রেম কামনা করে, নইলে তার নিজের সম্পূর্ণতা সফল হবে কিসে ?
>
> দেবতার মনের ভাব ঠিকমতো জানি বলে অভিমান রাখি নে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস—কার্তিকের চেয়ে গণেশের 'পরে দুর্গার স্নেহ বেশি। এমন-কি, লম্বোদরের অতি অযোগ্য ক্ষুদ্র বাহনটার 'পরে কার্তিকের খোশপোশাকি ময়ূর লোভদৃষ্টি দেয় বলে তার পেখমের অপরূপ সৌন্দর্য সত্ত্বেও তার উপরে তিনি বিরক্ত; ওই দীনাত্মা ইঁদুরটা যখন তাঁর ভাণ্ডারে ঢুকে তাঁর ভাঁড়গুলোর গায়ে সিঁধ কাটতে থাকে তখন হেসে তিনি তাকে ক্ষমা করেন। শাস্ত্রনীতিজ্ঞ পুরুষবর নন্দী বলে, 'মা তুমি ওকে শাসন কর না, ও বড়ো প্রশ্রয় পাচ্ছে'। দেবী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলেন, 'আহা, চুরি করে খাওয়াই যে ওর স্বধর্ম, তা ওর দোষ কী! ও যে চোরের দাঁত নিয়েই জন্মেছে, সে কি বৃথা হবে ?'
>
> —'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৪ সেপ্টেম্বর ৩০

এখানে এই রূপকের যোগে কবির তত্ত্বটি যেমন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, দেবীর গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রটি তেমনি একটি স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের সঞ্চার করেছে।

কাহিনীকল্পনা

পুরাণের দেবদেবীর মতো পুরাণের কাহিনীকল্পনাও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল সমধিক। বিভিন্ন স্থলে উপমা ইত্যাদির প্রয়োজনে কবি এই কাহিনীগুলি স্মরণ করেন এবং তার থেকে নূতন তাৎপর্য নিষ্কাশন করেন বা তাতে নূতন ব্যঞ্জনা আরোপ করেন। এই কাহিনীগুলিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় কিভাবে উপস্থাপিত করেছিলেন, দুএকটি দৃষ্টান্ত দিলেই তা বোঝা যাবে।

দক্ষযজ্ঞ

দক্ষযজ্ঞ পুরাণসাহিত্যের একটি প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ কাহিনী। কবি এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে।—

> আমাদের পুরাণে একটি যজ্ঞভঙ্গের ইতিহাস আছে। দক্ষ যখন তাঁহার যজ্ঞে সতী অর্থাৎ সত্যকে অস্বীকার করিয়া মঙ্গলকে অপমানিত করিয়াছিলেন তখনই প্রচণ্ড উপদ্রব উপস্থিত হইয়া তাঁহার যজ্ঞ বিনষ্ট হইয়াছিল। দক্ষ কেবল নিজের

দক্ষতার প্রতি অন্ধ অভিমানবশত জগতে যে যুগে এবং যে ক্ষেত্রেই সত্যকে এবং শিবকে স্বীকার করা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছে সেই কালে এবং সেইখানেই …মহান্ অনর্থ ঘটিয়াছে।

— সমূহ', পরিশিষ্ট : যজ্ঞভঙ্গ ১৩১৪

দক্ষযজ্ঞ কাহিনীর এই তাৎপর্য-ব্যাখ্যা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছেই প্রত্যাশিত।

গঙ্গার মর্ত্যাবতরণ

ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের পৌরাণিক কাহিনীটি ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য অনুধাবন করার আগে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র এই কাহিনীর যে অপূর্ব তাৎপর্য নির্ণয় করেছিলেন, সেটি স্মরণ করতে হয়। তিনি লেখেন—

ভগীরথ গঙ্গা আনিয়াছিলেন, এক দাম্ভিক মত্ত হস্তী তাহার বেগ সংবরণ করিতে গিয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। ইহার অর্থ কি? গঙ্গা প্রেমপ্রবাহস্বরূপ, ইহা জগদীশ্বর-পাদপদ্মনিঃসৃত, ইহা জগতে পবিত্র,—যে ইহাতে অবগাহন করে সেই পুণ্যময় হয়। ইনি মৃত্যুঞ্জয়-জটা-বিহারিণী, যে মৃত্যুকে জয় করিতে পারে, সেও প্রণয়কে মস্তকে ধারণ করে। ··দাম্ভিক হস্তী দম্ভের অবতারস্বরূপ। সে প্রণয়-বেগে ভাসিয়া যায়। প্রণয় প্রথমে একমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সময়ে শতমুখী হয়, প্রণয় স্বভাবসিদ্ধ হইলে শত পাত্রে ন্যস্ত হয়—পরিশেষে সাগর-সংগমে লয়প্রাপ্ত হয়—সংসারস্থ সর্বজীবে বিলীন হয়।

—'মৃণালিনী' ১৮৬৯, তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত কাহিনীর যে গূঢ়ার্থ বিশ্লেষণ করেছেন, তার তুলনা বিরল। রবীন্দ্রনাথও এই কাহিনীটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে স্মরণ করেছেন, তবে তার তাৎপর্য নির্ণয় করেন নি। কেবল পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে দেশের যুবশক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি লেখেন—

তোমরা ভগীরথের ন্যায় তপস্যা করিয়া রুদ্রদেবের জটা হইতে এবার প্রেমের গঙ্গা আনিয়াছ, ইহার প্রবল পুণ্যস্রোতকে ইন্দ্রের ঐরাবতও বাধা দিতে পারিবে না, এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পূর্বপুরুষের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে।

—'সমূহ', সভাপতির অভিভাষণ ১৩১৪

তিনিও গঙ্গার ধারাকে প্রেমের প্রবাহ বলেই মনে করেছেন। তবে তার অর্থ বিশ্লেষণে অধিক অগ্রসর হন নি।

সমুদ্রমন্থন

পুরাণের যে কল্পনাটি রবীন্দ্রমানসকে সবচেয়ে বেশি অধিকার করেছিল, সেটি সমুদ্রমন্থনের কল্পনা। প্রথম থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি যে কতবার এই প্রসঙ্গটি স্মরণ করেছিলেন পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে তার পরিচয় আছে। আব তিনি যে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থে তার প্রযোগ করেছেন তার কিছু নিদর্শন দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। প্রথম বয়সে তিনি লিখেছিলেন—

> প্রেম হৃদয়ের সারভাগ মাত্র। হৃদয় মন্থন করিয়া যে অমৃতটুকু উঠে তাহাই। ইহা দেবতাদিগের ভোগ্য। অসুর আসিয়া খায়, কিন্তু তাহাকে দেবতার ছদ্মবেশে খাইতে হয়। যাহাকে তুমি দেবতা বলিয়া জান তাহাকেই তুমি অমৃত দাও।… কিন্তু এমন মহাদেব সংসারে আছেন, যিনি দেবতা বটেন কিন্তু যাঁহার ভাগ্যে অমৃত জুটে নাই, সংসারের সমস্ত বিষ তাঁহাকে পান করিতে হইয়াছে—আবার এমন রাহুও আছে যে অমৃত খাইয়া থাকে।
>
> —'বিবিধ প্রসঙ্গ', মনের বাগান বাড়ি ১২৮৮ শ্রাবণ

এখানে প্রেমতত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে কবি সমুদ্রমন্থনের রূপকটি আশ্রয় করে তার দ্বারা তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট করার প্রয়াস পেয়েছেন। এর কিছু দিন পরে য়ুরোপযাত্রী কবি জাহাজে সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে তার যে সরস কারণটি আবিষ্কার করেছেন তা হল,—

> দেবাসুরগণ সমুদ্র মন্থন করে সমুদ্রের মধ্যে যা-কিছু ছিল সমস্ত বাহির করেছিলেন। সমুদ্র দেবেরও কিছু করতে পারলেন না, অসুরেরও কিছু করতে পারলেন না, হতভাগ্য দুর্বল মানুষের উপর তার প্রতিশোধ তুলছেন।· সনাতন মন্থনের ঘূর্ণীবেগ যে এখনো সমুদ্রের মধ্যে রয়ে গেছে তা নবজঠরধারীমাত্রেই অনুভব করেন। যাঁরা করেন না তাঁরা বোধ করি দেবতা অথবা অসুর-বংশীয়।
>
> —'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী', ১৮৯০ আগস্ট ২৭।২৮

পরবর্তী জীবনে তিনি এই রূপকটিকে কখনও কঠিন সামাজিক সমস্যার প্রসঙ্গে কখনও বা আত্মশক্তিকে উদ্‌বোধিত করবার প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। তাই বলেন—

> আমাদের বাসনাকে তাহার সহজ সীমার চেয়ে জোর করিয়া টানিয়া বাড়াইতে গেলেই বিপদ ঘটিবে।…দুঃসাহসে ভর করিয়া…আমাদের আরও ইচ্ছার মন্থন-দণ্ডকে ঐদিকেই পাক দিতে গেলে ব্যাধি বিকৃতি ও পাপের বিষ মথিত হইয়া উঠে।
>
> —'পথের সঞ্চয়', দুই ইচ্ছা ১৩১৯ শ্রাবণ

কখনও বা মন্তব্য করেন—

> দেবদানবকে সমুদ্র মন্থন করতে হয়েছিল তবে অমৃত জেগেছিল, যে অমৃত সমস্তের মধ্যে ছড়ানো ছিল। কর্মের মন্থনদণ্ডের নিয়তভাড়নায় তবেই আমাদের সকলের মধ্যে যে শক্তি ছড়িয়ে আছে, তাকে আমরা ব্যক্ত আকারে পাব।
>
> —'পল্লীপ্রকৃতি', কর্মযজ্ঞ ১৩২১ ফাল্গুন

আর শেষ জীবনে আধুনিক সভ্যতার 'দুঃসাধ্য সমস্যা' ও 'বিচ্ছেদ-বিরোধে'র 'নানা কদর্য মূর্তি' প্রত্যক্ষ করে তিনি ভাবীকালের যে 'নিরবচ্ছিন্ন দুর্গতি'র আশঙ্কা করেছেন উক্ত রূপকের সাহায্যেই তা ব্যক্ত হয়েছে। তিনি কল্পনা করেছেন—

> যেন সমস্ত সভ্য জগৎকে এক কল্প থেকে আর-এক কল্পের তটে উৎক্ষিপ্ত করবার জন্যে দেবদৈত্যে মিলে মন্থন শুরু হয়েছে। এবারকারও মন্থনরজ্জু বিষধর সর্প, বহু ফণাধারী লোভের সর্প। সে বিষ উদ্‌গার করছে। আপনার মধ্যে সমস্ত বিষটাকে জীর্ণ করে নেবেন এমন মৃত্যুঞ্জয় শিব পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মর্মস্থানে আসীন আছেন কি না এখানো তার প্রমাণ পাই নি।
>
> — শিক্ষা', ছাত্রসম্ভাষণ ১৩৪৩ ফাল্গুন

উক্ত উপমার নিপুণ প্রয়োগে কবি আধুনিক সভ্যতার সমস্যা ও সে সম্বন্ধে আপন উদ্‌বেগকে যথাযথভাবেই প্রকাশ করেছেন।

এইভাবেই কবি পুরাণের বিভিন্ন কাহিনীকে আপনার প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করবার ক্ষেত্র এটি নয়। তবে পুরাণপ্রসঙ্গ রবীন্দ্রমনকে যে কিভাবে অধিকার করেছিল এবং তা যে কিভাবে তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে উপরের আলোচনা থেকেই তার একটি সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র বোধ করি আভাসিত হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় পর্ব

অশ্বঘোষ, শূদ্রক ও বিশাখদত্ত

রবীন্দ্রসাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারতের যুগের পরেই স্থান পেয়েছে 'কালিদাসের কাল'। এই দুই যুগের মধ্যবর্তী কালের সাহিত্য হিসাবে ধর্মশাস্ত্র এবং কিছু প্রকীর্ণ নীতিশ্লোক তাঁর সাহিত্যে দেখা গেলেও কালিদাসের পূর্ববর্তী অন্য কোনো সংস্কৃত কবির উল্লেখ তিনি করেন নি। তাই এক সময়ে সংস্কৃত কাহিনীকাব্যের ধারা অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি প্রথমেই স্মরণ করেছিলেন রামায়ণ-মহাভারতকে এবং—

> তাহার পর মাঝখানে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ পার হইয়া কাব্যসাহিত্যে একেবারে কালিদাসে আসিয়া ঠেকিতে হয়। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষ চিত্তরঞ্জনের জন্য কী উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। উৎসবে যে মাটির প্রদীপের সুন্দর দীপমালা রচনা হয় পরদিন তাহা কেহ তুলিয়া রাখে না, ভারতবর্ষের আনন্দ-উৎসবে নিশ্চয়ই এমন অনেক মাটির প্রদীপ, অনেক ক্ষণিক সাহিত্য, নিশীথে আপন কর্ম সমাপন করিয়া প্রত্যুষে বিস্মৃতিলোক লাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রথম তৈজস প্রদীপ দেখিলাম কালিদাসের।
>
> —'প্রাচীন সাহিত্য', কাদম্বরীচিত্র ১৩০৬

কবি যখন এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন তখন সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে প্রাচীন মহাকাব্য দুটির পরবর্তী এবং কালিদাসের পূর্ববর্তী কোনো প্রতিভাশালী কবির কথা পণ্ডিতসমাজে বিশেষ জানা ছিল না। তাঁরা মনে করতেন সংস্কৃত সাহিত্যের যে ধারাটি মহাকাব্যের যুগ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছিল, পরবর্তী কালে তার গতি রুদ্ধ হয়ে গিয়ে ক্রমশঃ তা অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। গুপ্তযুগে এই ধারা পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। কিন্তু পরে জানা গেল যে প্রাচীন কাল থেকে সমভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেই সংস্কৃত সাহিত্যের ধারা গুপ্তযুগে গিয়ে পৌঁছেছিল এবং ওই তথাকথিত অনুর্বর যুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষ, মহাকবি ভাস প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা এবং বহুতর অখ্যাতনামা কবি। তাঁদের মধ্যে মৃচ্ছকটিক-রচয়িতা বলে খ্যাত রাজা শূদ্রকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথও যথাসময়ে এঁদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত এবং তাঁদের কাব্যের সঙ্গেও কিছু পরিমাণে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর পরবর্তী কালের সাহিত্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অশ্বঘোষ

প্রথমেই বলা যায় বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষের কথা। খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে তিনি আবির্ভূত হন। 'বুদ্ধচরিত' তাঁর একটি কালজয়ী গ্রন্থ। গ্রন্থটি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলেই বোঝা যাবে একদিকে রামায়ণ এবং অন্যদিকে কালিদাসের কাব্য—এই উভয়ের মধ্যবর্তী 'সুদীর্ঘ বিচ্ছেদে'র মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে 'বুদ্ধচরিত'। রামায়ণ, বুদ্ধচরিত বা বুদ্ধায়ন এবং রঘুবংশ প্রায় একই পর্যায়ের রচনা। তা ছাড়া রামায়ণের বহু শ্লোকের সঙ্গে বুদ্ধচরিতের শ্লোকের সাদৃশ্য আছে এবং কালিদাসের কাব্যের কিছু কিছু অংশেও বুদ্ধচরিতের ছায়াপাত ঘটেছে। এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা বর্তমানে আমাদের অভিপ্রায়বহির্ভূত। তবে এ কথা বলা যায় যে, প্রতিভার দিক্ দিয়ে অশ্বঘোষ 'আদিকবি'র উত্তরাধিকারী এবং কালিদাসের যোগ্য পূর্বসূরী। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কাব্য হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধ কাব্য বলেই হয়তো বুদ্ধচরিত প্রাচীন ভারতের হিন্দু পণ্ডিতসমাজে তার যোগ্য সমাদর পায় নি।

রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে তিনি এই গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করবার নির্দেশ দেন এবং তাঁরই প্রবর্তনায় রথীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের একটি অনুবাদ করেন। এ সম্বন্ধে রথীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন—

> আমার পিতৃদেবের আদেশে ১৯০৫ সালে বুদ্ধচরিত বাংলা ভাষায় তর্জমা করিতে প্রবৃত্ত হই। তখন কেবলমাত্র কাওয়েল সাহেবের সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। সদ্য আবিষ্কৃত এই কাব্যখানি পড়িয়া তিনি প্রচুর আনন্দ পান ও আমার সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও আমাকে তর্জমা করিবার জন্য সেই বইখানি দেন। পিতৃদেবকে নিরুৎসাহিত করিতে ইচ্ছা করিল না—তর্জমা করিতে লাগিয়া গেলাম। প্রথম তিন সর্গ তিনি নিজে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।
>
> —'বুদ্ধচরিত' ১ম খণ্ড ১৩৫১ নিবেদন পৃ ৮

তবে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কবির কোনো স্বতন্ত্র মন্তব্য চোখে পড়ে নি।

অশ্বঘোষের 'শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র' বা 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র' গ্রন্থ[১] সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ অবহিত ছিলেন। উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে জনৈক ডাক্তার রিচার্ডের মতামত আলোচনা করে কবি লেখেন—

> ডাক্তার রিচার্ড্ যে বইটির কথা বলিয়াছেন তাহার মূল গ্রন্থটি সংস্কৃত, অশ্বঘোষের রচনা। এই সংস্কৃত গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে, কেবল চীন ভাষায় ইহার অনুবাদ এখন

১ দ্রষ্টব্য. 'বুদ্ধদেব', বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ ১৩১৮, পৃ ২৫ পাদটীকা

বর্তমান আছে।

—'বুদ্ধদেব', বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ ১৩১৮

এই গ্রন্থের অন্তর্নিহিত ভাব সম্বন্ধেও তাঁকে শ্রদ্ধাবান্ দেখি।—

ডাক্তার রিচার্ড্ অশ্বঘোষের গ্রন্থটির মধ্যে এমন-কিছু দেখিয়াছিলেন যাহা নীতি-উপদেশের অপেক্ষা গভীরতর, পূর্ণতর, যাহা দার্শনিক তত্ত্ব নহে, যাহা আচার-অনুষ্ঠানের পদ্ধতিমাত্র নহে।

—পূর্ববৎ

তবে মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ ডাক্তার রিচার্ডের সমালোচনাটিই শুধু দেখেছিলেন, মূল গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। এই গ্রন্থ দুটি ছাড়া অশ্বঘোষের 'সৌন্দরানন্দ' নামে একটি সম্পূর্ণ কাব্য এবং 'সারিপুত্রপ্রকরণ' নামে একটি খণ্ডিত নাটক পাওয়া গেছে। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে ওইগুলির কোনো উল্লেখ বা মন্তব্য চোখে পড়ে নি।

ভাস

অশ্বঘোষের পরেই মনে আসে মহাকবি ভাসের (আনু খ্রীঃ ৩০০-৩৫০) কথা। কালিদাস-প্রমুখ কবিরা তাঁদের কাব্যে এই পূর্বসূরীর নাম বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছিলেন। বিভিন্ন অলংকারশাস্ত্রেও এই মহাকবির রচনার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃতিরূপে স্থান পেয়েছিল। এইভাবেই ভাস ভারতীয় জনমানসের স্মৃতিতে জাগরূক ছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ দিন তাঁর রচনার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দে আকস্মিকভাবে দক্ষিণ ভারত থেকে ভাসের কিছু পুঁথি আবিষ্কৃত হয় এবং তাই নিয়ে পণ্ডিতসমাজে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। পুঁথিতে স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ প্রভৃতি মোট ১৩টি নাটকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এগুলি থেকে কবি ভাসের ব্যক্তিপরিচয় কিছুই জানা যায় না, তবে ঐতিহাসিকেরা তাঁকে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের কবি বলে মনে করেছেন।

রবীন্দ্রসাহিত্যের কোথাও প্রায় কবি ভাসের উল্লেখ চোখে পড়ে নি। তার কারণ হিসাবে বলা যায় যে ভাসের রচনা যখন আবিষ্কৃত হল, রবীন্দ্রনাথ তখন আর প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে তেমন চর্চা করছিলেন না। এ বিষয়ে তাঁর ঔৎসুক্য তখন হ্রাস পেয়েছিল। তাই মহাকবি ভাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নীরব।

মৃচ্ছকটিক

ভাসের রচনাবলী যতদিন অনাবিষ্কৃত ছিল, ততদিন জনৈক রাজা শূদ্রক-রচিত

মৃচ্ছকটিকের খ্যাতি ছিল অপরিসীম। ঊনবিংশ শতাব্দীর রমেশচন্দ্র দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় -প্রমুখ মনীষিগণ 'মৃচ্ছকটিক' নাটকটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। রবীন্দ্রনাথ ভাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব থাকলেও মৃচ্ছকটিক সম্বন্ধে একাধিক স্থলে মূল্যবান্ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ভাসের 'চারুদত্ত' নামক খণ্ডিত নাটকটি (চার অঙ্ক) আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃচ্ছকটিকের গৌরব হ্রাস পেল, কারণ মৃচ্ছকটিকের কাহিনী অনেকাংশেই ভাসের নাটক থেকে নেওয়া। হয়তো সেইজন্যই কবি কালিদাস তাঁর নাটকে ভাসের উল্লেখ করলেও শূদ্রক বা মৃচ্ছকটিকের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করেছিলেন।

ঐতিহাসিক Keith এর মতে এই নাটকের রচয়িতা 'Cudraka is really clearly mythical' ('The Sanskrit Drama' 1924, ch. V p 130)। তিনি মনে করেন, ভাসের পরবর্তী কোনো অজ্ঞাত অখ্যাত লেখক এটি রচনা করেছিলেন। এই নাটকের রচনাকাল নির্দেশ করতেও তিনি আপনার অক্ষমতা জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর গ্রন্থে মৃচ্ছকটিককে কালিদাসের পূর্বেই স্থান দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আনুমানিক খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীকে এই গ্রন্থের রচনাকাল বলে মনে করা বোধ হয় অসংগত নয়।

এই গ্রন্থের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কখন প্রথম পরিচিত হয়েছিলেন, তা জানবার উপায় নেই। তবে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই নাটকের অনুবাদ করেন তখন নিশ্চয় কবি সেটি দেখে থাকবেন। তাঁর 'সমূহ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'রাজকুটুম্ব' প্রবন্ধে (১৩১০) প্রথম মৃচ্ছকটিকের উল্লেখ দেখা যায়। বৃটিশশাসিত ভারতবাসীর প্রতি শাসকসম্প্রদায়ভুক্ত ইংরাজমাত্রেরই অত্যাচার করবার অব্যাহত অধিকারের বিরুদ্ধে তিনি উক্ত প্রবন্ধে ঈষৎ শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে লিখেছিলেন—

> রাজা এবং রাজকুটুম্ব ঠিক এক নহে, কিন্তু তবু রাজসম্পর্কের গন্ধ থাকিলেও কুটুম্বদের উৎপাত সহ্য করিতেই হয়। মৃচ্ছকটিকের রাজশ্যালকের কথা পাঠকগণ স্মরণ করিবেন।... মৃচ্ছকটিকের সেই রাজশ্যালকটি যতই উপদ্রব করুক-না কেন, প্রজাবর্গের কাছে তাহার সম্মান ছিল না—সকলেই তাহাকে উৎপাত বলিয়াও জানিত, অথচ তাহাকে মনে-মুখে পরিহাস-বিদ্রূপ করিতে ছাড়িত না। এখনকার রাজশ্যালকগণের নিকট হইতে ঠিক সে পরিমাণ হাস্যরস আদায় করা কঠিন।
>
> —সমূহ', রাজকুটুম্ব ১৩১০

এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, কবি নাটকটির সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত ছিলেন। রাজশ্যালক 'শকার' মৃচ্ছকটিকের একটি বিশেষ উপভোগ্য চরিত্র, যা সর্বকালীন। সেই কারণে আর সকলের মতো এটি রবীন্দ্রনাথেরও দৃষ্টি বিশেষভাবেই আকর্ষণ করতে পেরেছিল।

তাঁর আর কোনো গ্রন্থে এই নাটকের কোনো উল্লেখ চোখে পড়ে নি। তবে দীর্ঘ দিন পরে (১৯২৬ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে) দিলীপকুমার রায়ের কাছে 'স্ত্রীপুরুষের মনোমিলনে'র রহস্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি যে পরিপ্রেক্ষিতে মৃচ্ছকটিকের প্রসঙ্গ স্মরণ করেন, তাতে ওই গ্রন্থের উপর তাঁর সবিশেষ অধিকার এবং তাঁর অন্তর্দৃষ্টির আশ্চর্য গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর এই আলোচনার গুরুত্ব সমধিক। সেখানে তিনি বলেছেন, পুরুষের বৃহৎ ও বিচিত্র কর্মোদ্যমের পশ্চাতে থাকে নারীর প্রেরণা। তাই নারীর শুধু সেবাময়ী গৃহধর্মচারিণী হলে চলে না, তার মধ্যে থাকা চাই প্রাণ-সঞ্চারিণী শক্তি যার দ্বারা সে পুরুষের চিত্তকে জাগ্রত করে তার মধ্যে উদ্যম সঞ্চার করবে। পুরুষচিত্তের সর্বাংগীণ সফলতা ও সার্থকতার জন্যই নারীপ্রকৃতি থেকে প্রবাহিত এই জীবনীধারার প্রয়োজন। অথচ প্রাচীন গ্রীস রোম এমনকি ভারতবর্ষও এক সময়ে নারীকে গৃহের আবেষ্টনীতে বদ্ধ করে পুরুষের কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে কবি মন্তব্য করেছেন—

> এই সকল দেশে সমাজে ব্যাপকভাবে স্ত্রীপ্রকৃতি আপন প্রশস্ত স্থান পায় নি বলেই পুরুষ আপন স্বভাবের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনেই এমন একদল মেয়ের জন্যে একটি বিশেষ স্থান প্রস্তুত করেছিল, যারা নহে মাতা, নহে কন্যা, নহে বধূ।…এখনকার কালের পণ্যস্ত্রীদের আদর্শে তখনকার কালের মোহিনীদের বিচার করা ভুল। তারা-যে দেহতৃষ্ণা নিবারণের জন্যই তা নয়, তারা চিত্ততৃষ্ণা নিবারণের জন্যে। · কাপুরুষ নিজের হীন প্রয়োজনেই স্ত্রীলোককে হীন করে ফেলে। যেখানে সেই প্রয়োজনের দাবিই একান্ত নয়, সেখানে পুরুষের পৌরুষই নারীমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখে। মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার কথা চিন্তা করে দেখলেই এ কথা স্পষ্ট হবে। চারুদত্তের মতো শ্রদ্ধার যোগ্য গৃহস্থ পুরুষের পক্ষে বসন্তসেনার সঙ্গ যে হেয়, এমনতর বিচারের আভাসমাত্র এই নাটকে কোথাও নেই। শুধু তাই নয়, বসন্তসেনার যে-চরিত্র বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব নেই বটে, কিন্তু রমণীর দায়িত্ব আছে। তাকে অশ্রদ্ধা করবার জো নেই। স্পষ্টই বোঝা যায় তখন এই রকম নারীরা সতর্কভাবে আপন সম্ভ্রম রক্ষা করবার চেষ্টা করত, নইলে তাদের যেটি আসল কাজ সেটাই ব্যর্থ হত।
>
> —'তীর্থংকর' ১৩৫১, রবীন্দ্রনাথ, পৃ ১২৬-২৭

মৃচ্ছকটিককে অবলম্বন করে মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত যে গূঢ় রহস্য এখানে ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার চিত্র যেভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা যে-কোনো অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীর পক্ষেই শ্লাঘার বিষয় হত সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের

পূর্বে বহু চিন্তাশীল সমালোচক এ গ্রন্থের আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই দৃষ্টি, এই বিচার আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না।

উপরোক্ত দুটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা ছাড়া ১৯৪০ সালের ২৪শে মে তারিখে অমিয়কুমার চক্রবর্তীকে লেখা একটি পত্রে মৃচ্ছকটিক সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। তিনি লিখেছেন—

> তোমার প্রেরিত মৃচ্ছকটিকম্ এই মাত্র পেলুম। এই নাটকে বাস্তবিকতা আছে কিন্তু বিশ্বাসজনক নাট্যিক অভিব্যক্তি এবং বাঁধন নেই। লেখনী চাষ করছে না, আঁচড় কাটছে। যাহোক ভালো করে পড়ে দেখব। এই নাটক অনেক দিন আগে পড়ে দেখেছিলুম, ভালো লেগেছিল কিন্তু মনে হয়েছিল তখনকার পাঠকদের দাবী করবার স্বভাব পাকা নয়, বিষয়বস্তুকে যেমন তেমন ক'রে আলগা ক'রে গড়ে তুললেও লোকের অবকাশরঞ্জন হত।
>
> —প্রবাসী ১৩৪৭ আষাঢ়, পৃ ৩৫২

এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, মৃচ্ছকটিক নাটককে তিনি একটি নক্শার মতো মনে করতেন। তার বিশেষ বিশেষ অংশ, কোনো কোনো চিত্র, চরিত্র বা ঘটনা তাঁর মনোরঞ্জন করেছিল। কিন্তু তাঁর মতে সমগ্র নাটকরূপে মৃচ্ছকটিক একটি সার্থক সৃষ্টি হয়ে ওঠে নি। তাঁর পূর্বকৃত প্রাসঙ্গিক মন্তব্য দুটির থেকেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। সেইজন্য তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সমগ্র মৃচ্ছকটিক নাটকটির সমালোচনায় অগ্রসর হন নি।

বিশাখদত্ত

মৃচ্ছকটিকের পরে স্মরণ করতে হয় বিশাখদত্ত প্রণীত 'মুদ্রারাক্ষস'-এর কথা। রচনাকালের বিচারেও মৃচ্ছকটিকের পরেই এ নাটকের স্থান। এই নাটক সম্বন্ধে ঐতিহাসিক V. A. Smith বলেন—

> Good authorities are now disposed to assign the political drama entitled the 'Signet of the Minister' (Mudrā Rākshasa) to the reign of Chandragupta II, Vikramāditya , and the .. (Mrichchhakatikā)' may be a little earlier
>
> —'Oxford History of India' 1920, Book II ch. 4, p 159

এই নাটক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেন নি। তবে এ নাটকের জ্যোতিরিন্দ্র-কৃত অনুবাদ প্রসঙ্গে তিনি যে মত প্রকাশ করেন তার থেকে এই সম্বন্ধে কবির মনোভাবটি ধরা পড়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে এক পত্রে তিনি লেখেন—

মুদ্রারাক্ষসের শ্লোকগুলি ঠিক কবিত্বরসপূর্ণ নয়।… সংস্কৃত মূলটা আনিয়ে নিয়ে অনুবাদের সাহায্যে সেটা পড়ব বলে অপেক্ষা করে আছি। পূর্বে একবার পড়বার চেষ্টা করে খট্‌মটে বলে ছেড়ে দিয়েছিলুম।

—'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-১

এই পত্রের তারিখ জানা যায় নি। তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উক্ত অনুবাদটি প্রকাশিত হয় ১৩০৭ সালে। পত্রটি ওই সময়ের হওয়া সম্ভব। যাই হক, পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ মূল মুদ্রারাক্ষস পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন কি না জানা যায় না। কারণ এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কবির আর কোনো মন্তব্য এ পর্যন্ত চোখে পড়ে নি।

কালিদাস

রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে লিখেছিলেন—

মনে আছে, বহুকাল হল, রোগশয্যায় কালিদাসের কাব্য আগোগোড়া সমস্ত পড়েছিলুম। যে আনন্দ পেলুম সে তো আবৃত্তির আনন্দ নয়, সৃষ্টির আনন্দ। সেই কাব্যে আমার মন আপন বিশেষ স্বত্ব উপলব্ধি করবার বাধা পেল না। বেশ বুঝলুম, এ-সব কাব্য আমি যেরকম করে পড়লুম দ্বিতীয় আর-কেউ তেমন করে পড়ে নি।

—'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৪ সেপ্টেম্বর ৩০

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে আজ পর্যন্ত কবি কালিদাসের কাব্যপাঠকের অভাব কখনও হয় নি। তাঁর কাব্যের অসংখ্য টীকা-ভাষ্যও তা প্রমাণ করে। তবু কবি রবীন্দ্রনাথ দাবি করলেন যে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে তিনি কালিদাসের কাব্যের অদ্বিতীয় পাঠক। তার কারণ কি ?

ব্যক্তি কালিদাস বা তাঁর আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব। তাঁর নামে প্রচলিত সাতখানি গ্রন্থেই তাঁর যা-কিছু পরিচয়। কবি রবীন্দ্রনাথ তার থেকেই কালিদাসের ব্যক্তিস্বরূপকে, তাঁর যুগকে ও সেই যুগের ভারতবর্ষকে খুঁজে নিয়েছিলেন। আবার কালিদাসের কাব্য বা তাঁর ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি অনবদ্য কবিতাও রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর কোনো সাহিত্যিক কালিদাসের ভাবধারাকে আত্মসাৎ করে এমনভাবে তাকে কাজে লাগাতে পারেন নি।

কালিদাসের কাব্য রবীন্দ্রমানসকে যে কতদূর অধিকার করেছিল তার সর্বাংগীণ আলোচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান নিবন্ধে এই জাতীয় বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই। তা ছাড়া এ সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনাও যথেষ্ট হয়েছে। তাই এই অধ্যায়ে অন্যদের বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় কালিদাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কোন কোন্ দিক্ থেকে বিশিষ্ট তারই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যাক।

২

কবি বলেছেন, 'এক সময়ে' তিনি কালিদাসের সমস্ত কাব্যগুলি আগাগোড়া পড়েছিলেন। কিন্তু ঠিক কোন সময়ে পড়েছিলেন তা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে

বালক-বয়সেই যে কালিদাসের সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় হয়েছিল, 'জীবন-স্মৃতি' গ্রন্থ থেকে তা জানা যায়। গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য ও রামসর্বস্ব পণ্ডিত তাঁকে যথাক্রমে কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা পড়িয়েছিলেন। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে তিনি নিজে বলেছেন, কুমারসম্ভব তাঁকে আগাগোড়া মুখস্থ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভারতীর (১২৮৪ মাঘ) পৃষ্ঠায় কুমারসম্ভব ৩য় সর্গের অনুবাদও দেখা যায়[১]। তাঁর অন্যতম প্রথম পাণ্ডুলিপি 'মালতী পুঁথি'তে উক্ত অনুবাদটুকু এবং শকুন্তলা নাটকের প্রথম অঙ্কের শেষ শ্লোকের (১।৩৬) অনুবাদ পাওয়া গেছে (দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' ১৯৬৫ বিশ্বভারতী, মালতী পুঁথি: পাণ্ডুলিপি-পরিচয় প্রবন্ধ)।

তাঁদের পরিবারেও কালিদাস-চর্চার অনুকূল পরিবেশ ছিল। কবির জন্মের পূর্বেই তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ মেঘদূতের পদ্যানুবাদ (১৮৬০) প্রকাশ করেন। ১৮৬৯ সালে গণেন্দ্রনাথের বিক্রমোর্বশী নাটকের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ সালে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ মেঘদূতের পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তো প্রায় যাবতীয় প্রখ্যাত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ শেষ করে গেছিলেন। এই আবহাওয়াতেই কবির মন পুষ্ট ও পরিণত হয়েছিল। সেই সঙ্গে বাল্যের অধ্যয়ন কালিদাসের প্রতি তাঁর মনে এক সুগভীর শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুরাগের সঞ্চার করেছিল। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির সর্বত্র সেই অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রসাহিত্যের নানা স্থানে কালিদাসের কাব্যের যে উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে তার একটি তালিকা সংকলিত হয়েছে। আবার 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা (১৩০৮) এবং শকুন্তলা (১৩০৯) প্রবন্ধ দুটিতে কালিদাসের অজস্র শ্লোক ও সংলাপের সযত্ন অনুবাদ দেখা যায়। শেষ জীবনে ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়েও নানা পত্রে (প্যারীমোহন সেনকে লেখা ১৯৩১ মার্চ ১৩) ও প্রবন্ধে (ছন্দের মাত্রা: ১, ১৩৩৯, ছন্দের মাত্রা: ২, ১৩৪১) কবি নানা প্রসঙ্গে কুমারসম্ভবের প্রথম এবং মেঘদূতের প্রথম দুটি শ্লোকের একাধিক অনুবাদ করেন। যথাস্থানে এগুলিও উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু বিপুল রবীন্দ্র-সাহিত্যে কালিদাসভাবনার এই প্রত্যক্ষ নিদর্শনগুলি নগণ্য। আসলে কালিদাসের ভাবধারাকে তিনি আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন, তাঁর রচনায় নানা ভাবে নানা ভাষায়

---

১ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ডে (১৩৬৭) উক্ত অনুবাদটি রবীন্দ্র-কৃত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন এটিকে রবীন্দ্র-রচিত বলে তার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ দিয়েছেন তাঁর ভোরের পাখি প্রবন্ধে (দ্রঃ 'শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ' ১৩৬৮ বৈশাখ)।

তার দ্যুতি স্বভাবতঃই বিকীর্ণ হয়ে আছে। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তা প্রত্যক্ষ-গোচর নয়—তা শুধু সহৃদয় সাহিত্যরসিকের অনুভবগম্য মাত্র। এসব ক্ষেত্রে কালিদাসের ভাবধারা স্পষ্ট ভাষায় দানা বেঁধে ওঠে নি বলে এগুলিকে কালিদাসের অনুসরণ বলে নিঃসংশয়ে চেনা যায় নি। যেসব ক্ষেত্রে কালিদাসের কাব্যের প্রত্যক্ষ উপকরণগুলি নিঃসন্দেহে কালিদাসের বলে বোঝা যায়, শুধু সেইগুলি থেকে বর্তমান আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের কালিদাসভাবনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

৩

রবীন্দ্ররচনায় কালিদাসের কাব্যের প্রতি মুগ্ধতা প্রথম ধরা পড়েছে 'বনফুল' কাব্যে (১৮৮০)। এই কাব্যের আখ্যাপত্রে শকুন্তলার 'অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈঃ' শ্লোকাংশটি (২।১১) মুদ্রিত দেখা যায়। কাব্যের নায়িকা কমলাও শকুন্তলার আদর্শেই গড়া। 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে'ও (১৮৮১) দেখি নানা প্রসঙ্গে কবি বারেবারেই কালিদাসকে স্মরণ করেছেন। সুদূর ইংলণ্ডে টর্কী নগরীর ফুলপ্রাচুর্য তাঁকে মদনের ফুলশরের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, টনব্রিজ ওয়েল্‌শের বন্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবি শকুন্তলার স্মৃতি মনে এনে মন্তব্য করেছেন, 'সেখানকার আশ্রমবাসিনী প্রকৃতিকে সাজিয়ে-গুজিয়ে শুদ্ধান্তযোগ্যা করে তোলা হয় নি' (১।১৭), আর 'টার্কিশ বাথ' দিতে-আসা ভৃত্যের পেশল সবল শরীর দেখে তাঁর মনে পড়ে গেছে 'ব্যূঢোরস্কো বৃষস্কন্ধঃ' রঘুরাজ দিলীপের বর্ণনা।[১] এইভাবেই কবির প্রথম জীবনের লেখা আলোচনা (১৮৮৫), সমালোচনা (১৮৮৮), বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৭) প্রভৃতি গ্রন্থে কালিদাসের কাব্যস্মৃতির স্পষ্ট উপকরণ চোখে পড়ে। ছিন্নপত্রাবলীতেও (১৮৮৫-৯৫ সালের মধ্যে লেখা) চোদ্দটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁকে কালিদাসকে স্মরণ করিতে দেখা গেছে। যথা-স্থানে তার আলোচনা করা যাবে।

এই যুগের কাব্য মানসী (১৮৯০), সোনারতরী (১৮৯৪) চৈতালিতে (১৮৯৬) দেখি কালিদাসের কাব্য তাঁকে উপমার উপকরণ জুগিয়েছে, নূতন সৃষ্টিতেও উদ্বুদ্ধ করেছে। মানসী কাব্যের মেঘদূত এবং চৈতালির ঋতুসংহার, কালিদাসের প্রতি, কুমারসম্ভব গান, মানসলোক, কাব্য প্রভৃতি কবিতায় পাই কালিদাসের কাব্যের নূতন ভাষ্য ও তাঁর ব্যক্তিত্বের নব পরিচয়। এই হল রবীন্দ্রসাহিত্যে কালিদাসভাবনার এক দিক্‌। এ ছাড়া আরও একটি দিক্‌ আছে। কালিদাসকে তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ

১ দ্রষ্টব্য. দ্বিতীয় পর্ব, ভাষা, ছন্দ ও অলংকার অধ্যায়

প্রতিনিধি বলা যায়। তাই তাঁর কাব্যে সে-যুগের ভারত তার ভাবাদর্শ ও তাব মহিমা নিয়ে যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে রবীন্দ্রসাহিত্যে তারও প্রতিফলন দেখা গেছে। চৈতালি কাব্যের সভ্যতার প্রতি, বন, তপোবন, প্রাচীন ভারত প্রভৃতি সনেটগুলি তাব নিদর্শন। নৈবেদ্য কাব্যে (১৯০১) দেখি প্রাচীন ভাবতবোধের প্রতি কবির আগ্রহ গভীরতব ও ব্যাপকতব হয়েছে (দ্রষ্টব্য ৫৭, ৬০ ও ৬২-সংখ্যাক সনেট)।

কালিদাসের কাব্যেব ভাব-ভাষা-চিত্রেব সৌন্দর্য বা তাব ভারতবোধ যে কবিকে মুগ্ধ কবেছিল তা নয়। সমগ্রভাবেই কালিদাসেব কাব্যলোক তাঁর মনে এক মোহনীয় সৌন্দর্যেব সঞ্চার করেছিল। কল্পনা-ক্ষণিকাব (১৯০০) স্বপ্ন, সেকাল প্রভৃতি একাধিক কবিতায় তার পরিচয় পাওয়া গেছে। তাই ১৮৯১ সালেব মেঘদূত প্রবন্ধে কবি মন্দাক্রান্তা ছন্দে প্রবাহিত জীবনস্রোত থেকে নির্বাসনের জন্য বেদনাবোধ করে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন—

> মনে হয়, ওই রেবা সিপ্রা নির্বিন্ধ্যা নদীর তীবে, অবন্তী বিদিশার মধ্যে, প্রবেশ কবিবার কোনো পথ যদি থাকিত, তবে এখনকার চারি দিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পওয়া যাইত।
>
> —'প্রাচীন সাহিত্য', মেঘদূত ১২৯৮ অগ্রহায়ণ

সেই পবিত্রাণেব আকাঙ্ক্ষাতেই তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত আকুল আগ্রহে দেখেছেন—

> যত-কিছু ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া রূপ,
> ফিকে-হয়ে-যাওয়া গন্ধ,
> কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান,
> তাপহারা স্মৃতি-বিস্মৃতির ধূপছায়া—
> সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি।
>
> —'শ্যামলী', বিদায়-বরণ ১৯৩৬ জুন

প্রথম জীবনে 'কল্পনা'য় কবি এক মালবিকার 'স্বপ্ন' (১৩০৪) দেখেছিলেন। তাঁব সে স্বপ্ন সেদিন ভেঙে গিয়েছিল। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও দেখি তিনি সেই স্বপ্ন-ভাঙাব বেদনাটুকু বহন কবে চলেছেন। তাঁব আকুল আহ্বানে অর্ধাবগুণ্ঠিতা সেই মালবিকা ইঙ্গিতের আড়াল থেকে আজও ক্ষণকালের জন্য তাঁর হৃদয়প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু সে স্বপ্নও বিলসিত কবে উপভোগ করার অবকাশ কবির নেই। তাঁর মনে পড়ে যায়—

> স্বপ্নের বাঁশিটি আজ ফেলে তব কোলে
> আর বার যেতে হবে চলে

সেথা, যেথা বাস্তবের মিথ্যা বঞ্চনায়
দিন চলে যায়।

—'সানাই', অনসূয়া ১৯৪০ মার্চ

তবু রোমান্টিক কবি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, 'বস্তু হতে সেই মায়া তো সত্যতর' ('মহুয়া', মায়া)। তাই বাস্তবের কঠোরতায় তাঁর মন বাঁধা পড়ে না। অন্তিম রোগশয্যাতেও তিনি ধূপের বিলীয়মান ধোঁয়ার মায়ায় যৌবনের কবিস্বপ্নকেই ফিরে পান।—

স্তব্ধ মোর ধ্যানে
ধীরপদে এল কোন্ মালবিকা
লয়ে দীপশিখা
মহাকালমন্দিরের দ্বারে
যুগান্তের কোন পারে।

—'রোগশয্যায়' ৩৩-সংখ্যক কবিতা ১৯৪০ ডিসেম্বর

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে আর কেউ কালিদাসের কাব্যকে এমনভাবে আত্মসাৎ করে নিতে পারেন নি। 'সেকালে' ফিরতে না পারার বেদনা আর কাউকে এমনভাবে উন্মনা করে তোলে নি।

৪

রবীন্দ্রনাথ প্রয়োজনমতো কালিদাসের কাব্য থেকে উদ্ধৃতি নির্বাচন করে ব্যবহার করেছেন এবং তার দ্বারা আপন রচনাকে অলংকৃত করেছেন, কখনও বা কালিদাসের কাব্যের ভাবানুষঙ্গে কবি তাকে ক্লাসিক মর্যাদায় ভূষিত করার প্রয়াস পেয়েছেন তবে এই জাতীয় উদ্ধৃতি-প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনিই যে পথিকৃৎ এ কথা বলা যায় না। তার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র এ কাজ করেছিলেন। ঔপন্যাসিক স্কটের অনুসরণে বঙ্কিম তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের (১৮৬৬) অধ্যায়শীর্ষে বিভিন্ন মনীষীর সাহিত্য থেকে তাঁর বক্তব্যের ভাবব্যঞ্জক উদ্ধৃতি নির্বাচন করে ব্যবহার করেন। তার মধ্যে কালিদাসের কাব্যের উদ্ধৃতিই সবচেয়ে বেশি। সম্ভবতঃ তাঁরই দৃষ্টান্তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বনফুল' কাব্যের আখ্যাপত্রে শকুন্তলা থেকে শ্লোকাংশটি (২।১১) মুদ্রিত করেছিলেন।

এবার কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের অধ্যায়শীর্ষে বঙ্কিমব্যবহৃত কালিদাসের উদ্ধৃতিগুলির পরিচয় নেওয়া যাক। এই গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে এই এই শ্লোকগুলি পাওয়া যায়।—

প্রথম খণ্ড : প্রথম পরিচ্ছেদ—'দূরাদয়শ্চক্র ·· ··· ··· ·· কলঙ্করেখা' ॥ রঘু. ১৩।১৫
পঞ্চম পরিচ্ছেদ—'—যোগপ্রভাবো··· ···হৈমমিবোপবাগম্' ॥ রঘু. ১৬।৭
নবম পরিচ্ছেদ— 'কম্ব। অলং রুদিতেন···পন্থানমালোকয়'। শকু. ৪র্থ অঙ্ক
দ্বিতীয় খণ্ড : পঞ্চম পরিচ্ছেদ—'শব্দাখ্যেয়ং যদপি···স্পর্শলোভাৎ' ॥ মেঘ. উ. মে. ৪২
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— 'কিমিত্যপাস্যাভবণানি ··কল্পতে' ॥ কুমাব ৫।৪৪
চতুর্থ খণ্ড . ষষ্ঠ পবিচ্ছেদ— 'তদ্গচ্ছ সিদ্ধৈ কুরু দেবকার্যাম্' ॥ কুমার. ৩।১৮
নবম পবিচ্ছেদ—'বপুষা করণোজ্ঝিতেন মেদিনীম্' ॥ বঘু. ৮।৩৮

কপালকুণ্ডলা ছাডা বঙ্কিমচন্দ্রের আব কোনো উপন্যাসেব অধ্যায়শীর্ষে উদ্ধৃতিব প্রযোগ দেখা যায় না। তবে তাঁর একাধিক উপন্যাসেব বহু স্থলে কালিদাসেব কাব্যেব শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হযেছে। এই উদ্ধৃতিগুলি দেখলে বোঝা যায়, ববীন্দ্রনাথেব মতো বঙ্কিমচন্দ্রও কালিদাসেব কাব্যেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, এবং তাঁব বচনায় অনেক সময স্বভাবতঃই কালিদাসেব প্রসঙ্গ এসে গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'সীতাবাম' উপন্যাসেব কথা স্মরণ কবা যাক। সেখানে বমাব রূপমুগ্ধ গঙ্গাবামেব মানসিক অবস্থা বিবৃত কবার জন্য তিনি কুমাবসম্ভবে বর্ণিত মদনদেবেব চিত্রটিব (৩৭০) অবতাবণা কবেছেন।—

* দক্ষিণাপাঙ্গনিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিতসব্যপাদম্।
* * * চক্রীকৃতচাকচাপং প্রহর্তুমভ্যুদ্যতমাত্মযোনিম্ ॥

—'সীতাবাম', দ্বিতীয় খণ্ড পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বলা বাহুল্য, এই উদ্ধৃতিটিব প্রযোগে গঙ্গারামেব প্রকৃত মনোভাবটি সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হযে উঠেছে। 'বাজসিংহ' উপন্যাসেও দেখি (অষ্টম খণ্ড : পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ) মবারকের মৃত্যুতে ধূল্যবলুণ্ঠিতা শাহজাদী জেবউন্নিসাব শোকেব তীব্রতা প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র মদনভস্মেব পরে রতিবিলাপেব চিত্রটি (কুমাব ৪।৪) তুলে ধবেছেন।—

বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণমূর্ধজা।

এই উদ্ধৃতিটুকুব দ্বারাই দর্পিতা বাদশানন্দিনীব মহনীয শোকের চিত্রটি ক্লাসিক গৌবব অর্জন কবেছে।

কখনও কখনও বঙ্কিমচন্দ্র কালিদাসের কোনো কোনো শ্লোক আপ্তবাক্যরূপেও ব্যবহার করেছেন। যেমন সীতাবাম উপন্যাসে সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী শ্রীকে যখন উপদেশ দিয়ে বলেন, 'যার যে ভার সয় না, তাকে সে ভার দিই না' (তৃতীয় খণ্ড : বিংশ পরিচ্ছেদ) তখন তিনি কুমারসম্ভবের সেই সুখ্যাত শ্লোকাংশটি স্মরণ করেন—

পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ ॥ ৫।৪

এইভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনায় কালিদাসের কাব্য থেকে উদ্ধৃতি প্রয়োগ করেছেন। তবে এই উদ্ধৃতিগুলিতে কালিদাসের অভিপ্রায় স্বভাবতঃই যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে, সেইটুকুকেই বঙ্কিমচন্দ্র কাজে লাগিয়েছেন। তার বেশি আর অগ্রসর হন নি। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের যে উদ্ধৃতিগুলি ব্যবহার করেছেন, সেগুলি পরিমাণে যেমন বেশি, প্রয়োগবৈচিত্র্যেও তেমনি অভিনব। কতকগুলি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের মতোই উদ্ধৃতিগুলিকে সাধারণ ও যথাযথ অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর 'চিঠিপত্র' পুস্তকে (১৮৮৭, অধ্যায় ৯) প্রবীণ ষষ্ঠীচরণ নবযুগকে স্বাগত জানিয়ে নবীনকিশোরকে বলে—'যাত্যেকতোহস্তশিখরং পতি-রোষধীনামাবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ' (শকু ৪।২)। তেমনি এক সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষেও দেশের যুগসন্ধির কথা ব্যাখ্যা করে বলেন—

> আজ আমি বাংলাদেশের দুই বিভিন্ন কালের উদয়াস্তসন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, হে ছাত্রগণ, কবির বাণী স্মরণ করিতেছি—
>
> যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্।
> আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ ॥
>
> এখন আমাদের কালের সিতরশ্মি চন্দ্রমা অস্তমিত হইতেছে, তোমাদের কালের তেজ উদভাসিত সূর্যোদয় আসন্ন।
>
> —'সাহিত্য', পরিশিষ্ট সাহিত্যসম্মিলন ১৩১৩ ফাল্গুন

উপরের উদ্ধৃতি দুটিতে দেখা গেল একই শ্লোকাংশকে একই অর্থে কবি প্রয়োজনমতো দুটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া প্রথম জীবনে কদাচিৎ বঙ্কিমের মতো তাঁকেও কালিদাসকথিত কোনো নীতিকথাকে আপ্তবাক্য হিসাবে স্মরণ করতে দেখা গেছে। তাই শকুন্তলা নাটকের শার্ঙ্গরবের উক্তির ('ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলোদ্-গমৈর্নবাম্বুভির্ভূরিবিলম্বিনো ঘনাঃ' ৫।১৩) অনুসরণে তিনি বলেন—

> যে ব্যক্তি স্বভাবত বড়মানুষ সেই ব্যক্তি যে বিনয়ী হইয়া থাকে এ কথা পুরানো হইয়া গিয়াছে। কালিদাস বলিয়াছেন, অনেক জল থাকিলে মেঘ নামিয়া আসে, অনেক ফল ফলিলে গাছ নুইয়া পড়ে।
>
> —'বিবিধ প্রসঙ্গ', কিন্তু-ওয়ালা ১২৮৮ শ্রাবণ

অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে কিন্তু আর তাঁকে এইভাবে উদ্ধৃতির প্রয়োগ করতে

দেখা যায় নি। তখন তিনি সেগুলিকে আত্মস্থ করে নিয়ে কখনও তার শব্দের কখনও বা তার অর্থের ঈষৎ রূপান্তর ঘটিয়ে, কখনও বা অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করে তার দ্বারা নূতন রসের সঞ্চার করেছেন। তাই 'প্রজাপতির নির্বন্ধে' (১৯০৮) পুরুষবেশধারিণী শৈলবালাকে দেখে কালিদাসরসজ্ঞ বৃদ্ধ রসিক যখন বলেন—

ইয়মধিকমনোজ্ঞা চাপ্‌কানেনাপি তন্বী।
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্‌॥

তখন দেখি 'বল্কলেনাপি' (শকু. ১।২০) স্থলে 'চাপ্‌কানেনাপি' দেওয়াতেই সমগ্র শ্লোকটি স্নিগ্ধ কৌতুকরসে আভাসিত হয়ে উঠেছে।

আবার একটি বিশেষ উদ্‌ধৃতিকে বহুবার বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করে কবি অনেক সময় তার থেকে নূতন নূতন তাৎপর্য নিষ্কাশন করে নিয়েছেন, কখনও বা তাতে নূতন তাৎপর্য আরোপ করে দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, শকুন্তলার ভাগ্যনিয়ন্তা দুর্বাসার সেই বিখ্যাত আত্মঘোষণা 'অয়মহং ভোঃ' রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় প্রসঙ্গ। তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে অন্ততঃ আটটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি এই উক্তি স্মরণ করেছেন। তবে সর্বত্র এক অর্থে বা এক জাতীয় প্রসঙ্গে নয়। 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থে দেখি তিনি কল্পনা করেছেন যে 'ভূমিলক্ষ্মী' (১৩২৫ আশ্বিন) স্বয়ং মানুষের কৃষির উদ্যমকে জাগ্রত করে তোলার জন্য যেন অয়মহং ভোঃ বলে আত্মঘোষণা করে মানুষের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন। 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী'তে কবি বিশ্বজগতের সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে অস্মিতাবোধের আনন্দকে দেখেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে তাই, 'বিশ্ব বলছে, ওঁ, বলছে, হাঁ, বলছে অয়মহং ভোঃ, এই-যে আমি' (১৯২৪ অক্টোবর ৭)। 'জাভা-যাত্রীর পত্রে'ও কবি এই কথাই বলেছিলেন—

> শিশু ঊর্ধ্বস্বরে বিশ্বদ্বারে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে তার প্রথমক্রন্দিত নিশ্বাসেই জানায়, 'অয়মহং ভোঃ'! অসীম ভাবীকালের দ্বারে সে অতিথি।
>
> —'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ২, ১৩৩৪ শ্রাবণ ২

এর পরে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা এক পত্রে ('চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৯, ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ ৩১) তিনি জানান যে প্রথম জীবনে তিনি ভাববিলাসের অমর্ত্যলোকে বিহার করতেন। কিন্তু পরবর্তী কালে মর্ত্য মানুষের আহ্বানের প্রবল দাবী তাঁকে ডাক দিয়ে বললে 'অয়মহং ভোঃ'। সেই ডাকে তাঁকে সাড়া দিতে হল।

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের অন্তর্গত আধুনিক কাব্য প্রবন্ধে (১৩৩৯ বৈশাখ) কবি বলেছেন যে সাম্প্রতিক কালের সাহিত্য স্বেচ্ছায় অতিলালিত্যের মাধুর্য বর্জন করে বিষয়গৌরবের সংযত মহিমায় দাঁড়িয়ে থেকে বলতে চায়, 'অয়মহং ভোঃ'। 'মানুষের

ধর্মে' কবি এই উদ্‌ধৃতিটিকে উপনিষদের ঋষির উপলব্ধির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তার দ্বারা আত্মার গভীরতর সত্যকে উদ্‌ঘাটন করার প্রয়াস পান। তিনি বলেন—

> মানবজীবনের যে বিভাগ অহৈতুক অনুরাগের অর্থাৎ আপনার বাহিরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগের, তার পুরস্কার আপনারই মধ্যে। কারণ, সেই যোগের প্রসারেই আত্মার সত্য।
>
> ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়োভবতি
> আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়োভবতি।
>
> জীবলোকে চৈতন্যের নীহারিকা অস্পষ্ট আলোকে ব্যাপ্ত। সেই নীহারিকা মানুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে উজ্জ্বল দীপ্তিতে বললে, 'অয়মহং ভোঃ —এই যে আমি'।
>
> —'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১

তবে চৈতন্যের এই অস্মিতাবোধকে কবি শুধু আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখেন নি। মানুষের সমস্ত সৃষ্টিপ্রেরণার মূলে তাকে প্রত্যক্ষ করে তিনি বলেছিলেন—

> এই আধ্যাত্মিক সাধনার কথাটাকেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনা চলে। জীবনে শূন্যতাবোধ আমাদের ব্যথা দেয়, সত্তাবোধের ম্লানতায় সংসারে এমন-কিছু অভাব ঘটে যাতে আমাদের অনুভূতির সাড়া জাগে না।···বিরহের শূন্যতায় যখন শকুন্তলার মন অবসাদগ্রস্ত তখন তাঁর দ্বারে উঠেছিল ধ্বনি, 'অয়মহং ভোঃ'। এই-যে আমি আছি। সে বাণী পৌঁছাল না তাঁর কানে, তাই তাঁর অন্তরাত্মা জবাব দিল না, 'এই-যে আমিও আছি'। দুঃখের কারণ ঘটল সেইখানে।
>
> —'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব ১৩৪০ ভাদ্র

সুতরাং কবির বক্তব্য হল, মানুষ আপনাকে নিবিড় করে উপলব্ধি করাটাকেই প্রকাশ করে তার শিল্পে ও সাহিত্যে। শেষ জীবনে 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে শিল্পকলার প্রসঙ্গে (রূপশিল্প ১৩৪৬) কবি আর একবার উদ্‌ধৃতিটি স্মরণ করেন। তিনি বলেন, কোনো শিল্পসৃষ্টি যদি দর্শকের 'মনের কাছে আপন একান্ত নিজকীয়তায় বিদ্যমান হয়ে ওঠে শিল্পকলার অভাবনীয় জাদুতে, সে যদি চিত্তদ্বারে আঘাত করে বলতে পারে অয়মহং ভোঃ' তবে সেই খানেই দেখা দেয় তার চরম সার্থকতা।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল একটিমাত্র উদ্‌ধৃতিকে কবি কিভাবে আটটি পৃথক্ পৃথক্ প্রসঙ্গে স্মরণ করেছেন এবং তার সুনিপুণ প্রয়োগে আপন রচনাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্য থেকে গৃহীত উদ্‌ধৃতিগুলিকে কখনও তার কোনো ব্যঞ্জনার সূত্র ধরে, কখনও বা তাতে নূতন তত্ত্ব আরোপ করে

তার ব্যবহারকে সুদূর সম্ভাবনার পথে প্রসৃত করে দিয়েছেন। উদ্ধৃতি-প্রয়োগের এই বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রপূর্বযুগের আর কোনো সাহিত্যিকের রচনাতে দেখা যায় নি।

৫

কালিদাসের কোনো কোনো উক্তি বা মন্তব্যের মতো কালিদাসবর্ণিত কতকগুলি মনোরম চিত্রও রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষে স্মরণ করেছেন। কখনও বা সেগুলিকে উপমার আকারে ব্যবহার করেছেন। এইগুলিতে মূলের ভাষা অনেকাংশে রক্ষিত হওয়ায় তাতে মূলের সৌন্দর্যও কিছুটা সঞ্চারিত হতে পেরেছে। বঙ্কিমচন্দ্রও এ কাজ করেছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে আসার পূর্বে বঙ্কিমের প্রয়াসের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নায়িকা সূর্যমুখীর শয়নগৃহে কুমারসম্ভব, রঘুবংশ ও শকুন্তলা গ্রন্থ তিনটির থেকে গৃহীত তিনটি চিত্র দেখা যায়। প্রথম চিত্রটি মদনভস্মের প্রাক্‌কালের। এই চিত্রের বর্ণনায় বঙ্কিম লিখেছেন—'লতাগৃহদ্বারে নন্দী, বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্র—মুখে এক অঙ্গুলি দিয়া কাননশব্দ নিবারণ করিতেছেন'। এই বর্ণনা হুবহু কুমারসম্ভবের (৩।৪১) অনুরূপ—ভাষাটিও প্রায় তদনুরূপ। ওই চিত্র প্রসঙ্গেই 'বসন্তপুষ্পাভরণময়ী পার্বতী' ও মন্মথের 'এক জানু ভূমিতে রাখিয়া, চারু ধনু চক্রাকার করিয়া' ইত্যাদি বর্ণনাও যথাক্রমে 'বসন্তপুষ্পাভরণং...বহন্তী' ইত্যাদি (কুমার ৩।৫৩) এবং 'চক্রীকৃতচারুচাপং'...ইত্যাদি (কুমার ৩।৭০) শ্লোকদ্বয়ের স্পষ্ট অনুসরণ।

দ্বিতীয় চিত্রটি সমুদ্রপথে রামসীতার লঙ্কা থেকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের চিত্র। চিত্রটি নিঃসন্দেহে রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গের কথা স্মরণ করায়। বিশেষতঃ বঙ্কিমের বর্ণনায় কালিদাসের 'তমালতালীবনরাজিনীলা' সমুদ্রবেলার (১৩।১৫) উল্লেখ আছে। পরিশেষে বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলার যে চিত্রটি অঙ্কন করেছেন সেটি হল—

> শকুন্তলা দুষ্মন্তকে দেখিবার জন্য চরণ হইতে কাল্পনিক কুশাঙ্কুর মুক্ত করিতেছেন—অনসূয়া প্রিয়ংবদা হাসিতেছে—শকুন্তলা ক্রোধে ও লজ্জায় মুখ তুলিতেছেন না—দুষ্মন্তের দিকে চাহিতেও পারিতেছেন না—যাইতেও পারিতেছেন না।
>
> —'বিষবৃক্ষ', চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : স্তিমিত প্রদীপে

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের প্রথম অঙ্কে কালিদাস এই অংশের বর্ণনা করে লিখেছিলেন

> শকু। হলা অনসূএ! অহিণব-কুস-সূই-পরিক্খদং মে চলণং... (ইতি রাজানমবলোকয়ন্তী সব্যাজং বিলম্ব্য সহ সখীভ্যাং নিষ্ক্রান্তা)।

অর্থাৎ ওলো অনসূয়া, নূতন কুশাগ্রে আমার চরণ ক্ষত হয়েছে (এই বলে রাজাকে ছলক্রমে দেখতে দেখতে বিলম্ব করে সখিদ্বয়ের সঙ্গে চলে গেল)।

এখানে বঙ্কিমের বর্ণনার সঙ্গে কালিদাসের তুলনা করলে বলতে হয়, বঙ্কিম আলজ্জিতা শকুন্তলার নব-অনুরাগের যে চিত্রটি এঁকেছেন, কালিদাসের চেয়ে তা অনেকাংশেই স্ফুটতর হয়েছে। তবে বঙ্কিমের প্রয়াস এই পর্যন্তই। তিনি শিল্পীর দৃষ্টিতে চিত্রগুলিকে উপস্থাপিত করেছেন মাত্র, তার তাৎপর্যের রূপান্তর ঘটাবার চেষ্টা করেন নি।

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথও তাই করেছিলেন। তখন তিনি বর্ষাদিনের যে চিত্র এঁকেছিলেন, তা হল—

যক্ষনারী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন,
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ,
অযত্নশিথিল বেশ,
সেদিনও এমনি ঘোর অন্ধকার দিন।

—'মানসী', একাল ও সেকাল ১৮৮৮

এটি মেঘদূতের 'উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং' (উ. মে. ২৫) যক্ষবধূর চিত্র। কখনও কখনও তিনি কালিদাসের কোনো চিত্রের সৌন্দর্যকে বিলসিত করে উপভোগ করবার জন্য দুই একটি মন্তব্যে তাকে সুস্ফুট করে তোলেন। তাই সমবেত রাজন্যবর্গের মাঝে পতিংবরা ইন্দুমতীকে দেখে মুগ্ধ কবি সেই বর্ণনাটির সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে বলেন—

…সুনন্দা এক-এক জনের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আর ইন্দুমতী অনুরাগহীন এক-একটি প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। এই প্রণাম করাটি কেমন সুন্দর! যাকে ত্যাগ করছেন তাকে যে নম্রভাবে সম্মান করে যাচ্ছেন এতে কতটা মানিয়ে যাচ্ছে!… …সকলেই রাজা এবং সকলেই তার চেয়ে বয়সে বড়ো, ইন্দুমতী একটি বালিকা, সে যে তাঁদের একে একে অতিক্রম করে যাচ্ছে এই অবশ্য রূঢ়তাটুকু যদি একটি একটি সুন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেত তা হলে এই দৃশ্যের সৌন্দর্য থাকত না।

—'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-৬২, ১৮৯২ জুন ২৯

এখানে রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিতে এই চিত্রের সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন তাঁর সাহায্য ছাড়া সে সৌন্দর্যের স্ব-রূপ কি সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হতে পারত?

কালিদাসের চিত্রগুলির ভাবসৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তার ভাষাভঙ্গিও যে

অনুসরণ করতেন 'মানসী' কাব্যের মেঘদূত (১৮৯০) কবিতাটি তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই স্বল্পায়তন কবিতাটিতে সমগ্র মেঘদূত কাব্যখানিই যেন সুসংহত আকারে প্রকাশ পেয়েছে। তাতে মূলের ভাষাও অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ আছে। যেমন,—

'বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপদমূলে
উপলব্যথিতগতি'

পংক্তিটি 'রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং' (পূ মে ১৯) শ্লোকাংশের সার্থক অনুসৃতি। তেমনি—

তস্মাদ গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাংসগরতনয়স্বর্গসোপানপঙ্‌ক্তিম।
গৌরীবক্ত্রভ্রূকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্মিহস্তা॥ পূ মে ৫০

শ্লোকটিও এইভাবে রূপ লাভ করেছে—

কোথা কনখল,
যেথা সেই জহ্নুকন্যা যৌবনচঞ্চল,
গৌরীর ভ্রূকুটিভঙ্গী করি অবহেলা
ফেনপরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা
লয়ে ধূর্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল।

প্রায় ওই সময়েই মেঘদূতের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি মেঘদূতের ভাষাতেই ঐ কাব্যের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করেন ('প্রাচীন সাহিত্য', মেঘদূত ১৮৯১)।

অবশ্য শুধু মেঘদূত কাব্য প্রসঙ্গেই নয়, বর্ষার প্রসঙ্গ মাত্রেই কালিদাসের এই কাব্যের ভাব-ভাষা ভঙ্গির সৌন্দর্য নিয়ে কবির অন্তরে জেগে ওঠে। তাই 'সজল মেঘমেদুর পরিপূর্ণ নববর্ষা' দেখে কবির মনে হয়—

> আমাদের গোয়ালঘর গোলাবাড়ির বহু দূরে যে আবর্তচঞ্চলা নর্মদা ভ্রূকুটি রচনা করিয়া চলিয়াছে, যে চিত্রকূটের পাদকুঞ্জ প্রফুল্ল নবনীপে বিকশিত, উদয়নকথা-কোবিদ গ্রামবৃদ্ধের দ্বারের নিকটে যে চৈত্যবট শুককাকলিতে মুখর, তাহাই আমাদের পরিচিত ক্ষুদ্র সংসারকে নিরস্ত করিয়া বিচিত্র সৌন্দর্যের চিরসত্যে উদ্‌ভাসিত হইয়া দেখা দিয়াছে।
>
> — বিচিত্র প্রবন্ধ', নববর্ষা ১৩০৮ শ্রাবণ

বলা বাহুল্য, এই বর্ণনার শেষাংশ মেঘদূতের (পূ. মে. ৩০) অনুসরণেই লেখা। পরবর্তী কালেও বর্ষার প্রসঙ্গে তাঁর মনে অনিবার্যভাবেই মেঘদূতের ছায়াপাত দেখা

গেছে। তাই 'নীলাঞ্জনছায়া' ঘনালে তিনি দেখেছেন 'জম্বুপুঞ্জে শ্যামবনান্ত' (তু : শ্যামজম্বূবনান্তাঃ পূ. মে. ২৩); আর 'বহু যুগের ওপার হতে' কবির মনে যে আষাঢ় আসে তার 'কালো মেঘের ছায়ার সনে' কোনো এক মালবিকার অনিমেষ চাহনিখানি ভেসে আসে।

কালিদাসের চিত্রগুলিকে রবীন্দ্রনাথ যে কিভাবে উপমার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন 'ছিন্নপত্রাবলী'র পত্রে পত্রে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ৭১-সংখ্যক পত্রে দেখি রৌদ্রস্নিগ্ধ বৃহৎ বন্যপ্রকৃতির অচঞ্চল ছবি তাঁর মনে শকুন্তলা নাটকে শিশু ভরতের উপদ্রবসহ্যকারী সিংহশাবকের প্রশান্ত ভাবটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। আবার উড়িষ্যার পথে বিস্তীর্ণ বালির পারে শীর্ণ স্ফটিকস্বচ্ছ জলের ক্ষীণ স্রোতোধারা দেখে কবি মন্তব্য করেছেন—

> কালিদাসের মেঘদূতে বিরহিণীর বর্ণনায় আছে যে, যক্ষপত্নী বিরহশয়নের একটি প্রান্তে লীন হয়ে আছে, যেন পূর্বদিকের শেষ সীমায় কৃষ্ণপক্ষের কৃশতম চাঁদটুকুর মতো। বর্ষাশেষের এই নদীটুকু দেখে বিরহিণীর আর-একটি উপমা যেন দেখা যায়।
>
> —'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-৮১, ১৮৯৩ ফেব্রুআরি ১৪

শুধু সমজাতীয় বস্তুর তুলনাতেই নয়, অনেক সময় অপ্রত্যাশিত উপমার দ্বারাও কবি অভিনব রসের উদ্রেক করেন। উদাহরণস্বরূপ কুমারসম্ভবে বর্ণিত নন্দীর চিত্রটি (৩।৪১) ধরা যাক। এটি কবির একটি বিশেষ প্রিয় চিত্র। তাই কোনো সময় স্থাণু পর্বতের চিত্র দেখে তাঁর মনে হয়, পর্বত যেন 'শিবের প্রহরী নন্দীর ন্যায় তর্জনী দিয়া পথরোধপূর্বক নীরবে নীলাকাশ স্পর্শ' করে দাঁড়িয়ে আছে ('পঞ্চভূত', সৌন্দর্যের সম্বন্ধ ১৩০৪)। কখনও বা বাংলা ভাষায় যতি-সংকেতের গুরুত্ব প্রতিপাদন করতে গিয়ে সহজেই উপমা দেন—

> যতিসংকেতে পূর্বে ছিল একাধিপত্যগর্বিত সীধে দাঁড়ি · যেন তপোবনদ্বারে নন্দীর তর্জনী।
>
> —'বাংলা শব্দতত্ত্ব', চিহ্নবিভ্রাট ১৩৩৯ মাঘ

এই জাতীয় প্রয়োগ তাঁর শেষ জীবনের রচনাতে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা গেছে। তাই পরিণত বয়সে কবির চোখে 'শুক্লানবমীর মায়া' ও 'কোকিলের কাকলি'কে উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকা দীর্ঘ ঋজু শালবৃক্ষগুলি যে রূপ ধরেছে তা হল—

> ও যেন শিবের তপোবন-দ্বারের নন্দী,
> দৃঢ় নির্মম ওর ইঙ্গিত।
>
> —'শেষ সপ্তক' ১৯৩৫, বিশ-সংখ্যক কবিতা

তেমনি মহেশ্বরের জটানিঃস্থত মন্দাকিনীর কথা কল্পনা করে তাঁর মনে হয় তার উজ্জ্বল প্রবাহ যেন কেবলি 'উদ্ধত নন্দীর রুষ্ট তর্জনীরে করে পরিহাস' ('বীথিকা', সন্ন্যাসী ১৯৩২ আগস্ট)। এখানে দেখি একই উপমাকে কবি বিভিন্ন বয়সে বিচিত্র প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তবে এই প্রয়োগের ক্ষেত্রে কবিমনের কোনো ক্রমপরিণতির ছাপ দেখা যায় না। কিন্তু কোনো কোনো স্থলে কবিমনের বিবর্তনটি স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। পূর্বমেঘের—

শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥ ৫৮

শ্লোকাংশটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়। প্রথম জীবনে তিনি এই শ্লোকের অন্তর্গত উপমাটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহার করে লেখেন—

রুদ্র রাগ আলাপিয়া গড়ায়ে পড়িছে হিমরাশ
পর্বতদৈত্যের যেন ঘনীভূত ঘোর অট্টহাস।

—'প্রভাত সংগীত' ১৮৮৩, মহাস্বপ্ন

এখানে তাঁর কল্পনা কালিদাসের কল্পনার পর্যায়ে পৌঁছতে পারে নি। কিন্তু পরে যখন তিনি লিখেছেন—

কালিদাস শংকরের অট্টহাস্যকে কৈলাসশিখরের ভীষণ তুহিনপুঞ্জের সহিত তুলনা করিয়াছেন, মহেশ্বরের শুভ্রদারিদ্র্যও তাঁহার এক নিঃশব্দ অট্টহাস্য।

—'লোকসাহিত্য', গ্রাম্যসাহিত্য ১৩০৫

তখন দেখি তাঁর কল্পনা কালিদাসের কল্পনাকে অতিক্রম করে গেছে।

আবার কালিদাসের উপমার সমস্ত বস্তুভার ত্যাগ করে তার অমূর্ত ভাবটুকুকে কবি যে কিভাবে কাজে লাগিয়েছেন তার একটি নিদর্শন দেওয়া যাক। কুমারসম্ভবে যোগমগ্ন 'নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্' রুদ্রের যে চিত্র (৩।৪৮) আছে, রবীন্দ্রনাথ তার উপমাটুকুকে সমস্ত অনুষঙ্গ থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে তাকে মানবহৃদয়ের গভীরতার অতলে স্থাপন করেছেন। তাই মানবচিত্তের অচঞ্চল নির্লিপ্তিকে লক্ষ করে তিনি বলেছেন—

সেখানে নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপটি জ্বলছে 'মহুত্তরঙ্গ সমুদ্র আপন অতলস্পর্শ গভীরতায় স্থির হয়ে রয়েছে, শোকের ক্রন্দন সেখানে পৌঁছোয় না।

—'শান্তিনিকেতন' ১, দ্রষ্টা ১৩১৫ ফাল্গুন ৬

দেখা গেল, রবীন্দ্রনাথ কত বিচিত্র ভঙ্গিতে কালিদাসের উপমাকে ব্যবহার করে তাঁর রচনাকে অলংকৃত করেছেন। পরবর্তী ভাষা, ছন্দ ও অলংকার অধ্যায়ে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেও কালিদাসের উপমার সার্থক প্রযোগ দেখা গেছে। তাঁর 'সীতারাম' উপন্যাসে দেখি তিনি লিখেছেন—

> খরস্রোতা জলে যথাবিধি স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া শ্রী ও সন্ন্যাসিনী, বিভূতি রুদ্রাক্ষাদি-শোভিতা হইয়া পুনরপি "সঞ্চারিণী দীপশিখা" দ্বয়ের ন্যায় শ্রীক্ষেত্রের পথ আলো করিয়া চলিল।
>
> —'সীতারাম', প্রথম খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

এখানে পতিংবরা ইন্দুমতীর প্রতি প্রযুক্ত উপমাটি (রঘু ৬।৬৭) অতি সহজেই বঙ্কিমের লেখনীমুখে এসে গেছে এবং তার আলোকেই তিনি শ্রী ও জয়ন্তীর রূপকে উদ্‌ভাসিত করে তুলেছেন। কিন্তু বিশেষভাবে উক্ত উপমার নির্বাচন ও ব্যবহার তাঁর বর্ণনায় যে বিশেষ কোনো তাৎপর্য বা ব্যঞ্জনার সঞ্চার করেছে, তা বলা যায় না। এই উপমার ব্যবহার কালিদাসের কাব্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় সূচিত করে মাত্র। সুতরাং কালিদাসের উপমার প্রয়োগে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়াসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো তুলনা চলে না।

৬

কালিদাসের কাব্যের অদ্বিতীয় পাঠক রবীন্দ্রনাথ এক দিকে যেমন তাঁর কাব্যের উপমা অলংকারের রস উপভোগ করেছেন ও তার সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, অন্য দিকে তেমনি তার থেকে তৎকালীন ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেই তথ্যগুলি পর্যালোচনা করলে সেগুলির ঐতিহাসিক যাথার্থ্য ও গুরুত্ব প্রতিপন্ন হবে।

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের যে সুচিন্তিত সমালোচনাটি লেখেন তাতে প্রাচীন ভারতে ধর্ম বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করার উপলক্ষে তিনি কুমারসম্ভবের একটি শ্লোকাংশ স্মরণ করেন।—

> তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং
> কালী কপালাভরণা চকাশে ॥ ৭।৩৯

এর থেকে কবি অনুমান করেছেন যে শিব যখন 'মহেশ্বর' কালিকা তখন অন্যান্য মাতৃকাগণের পশ্চাতে শিবের অনুচরীবৃত্তি করতেন। সুতরাং কালীর করালমূর্তিতে মহাদেবকে ছাড়িয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার ইতিহাসটি নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালের। আর সেই সঙ্গে কবি মন্তব্য করেছেন—

> মেঘদূতে গোপবেশী বিষ্ণুর কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু মেঘের ভ্রমণকালে কোনো

মন্দির উপলক্ষ্য করিয়া বা উপমাচ্ছলে কালিকাদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্পষ্টই দেখা যায়, তৎকালে ভদ্রসমাজের দেবতা ছিলেন মহেশ্বর।

—'সাহিত্য', বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ শ্রাবণ

এখানে কবি যে ইতিহাসদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তা যে-কোনো ঐতিহাসিকের পক্ষেই বিশেষ শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নেই। আবার শকুন্তলা, কুমারসম্ভব বা রঘুবংশ কাব্যে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার যে প্রতিফলন দেখা যায় তার প্রতিও কবি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

ক্ষত্রিয়েরা বিবাহে কড়া নিয়মের শাসন তেমন করে মানেন নি। কিন্তু সেই না-মানাটা সমস্ত সমাজের আদর্শকে-যে পীড়া দিত, তা কালিদাসের কাব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। সমাজনীতি রক্ষার উদ্দেশে ভারতবর্ষের বিবাহ যে সৌজাত্যের প্রতি লক্ষ্য করত, তার সম্বন্ধে কবির বিশেষ বেদনা ছিল সন্দেহ নেই। অথচ বিশ্বের লীলাময়ী প্রাণ-প্রকৃতির মাঝখানে নরনারীর স্বাভাবিক প্রেম-চাঞ্চল্যের সৌন্দর্য-বিকাশও কবির চিত্তকে মুগ্ধ করেছে। কালিদাসের প্রায় সকল বড় কাব্যেরই মধ্যে এই দ্বন্দ্ব।

—'সমাজ', ভারতবর্ষীয় বিবাহ ১৩৩২

এই বলে কবি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করেছেন, কালিদাসের কালের 'ক্ষত্রিয় রাজারা বিবাহে সংযত আর্য আদর্শ লঙ্ঘন করে কামনার অনুসরণে সমাজে অপজনন (degeneracy) ঘটাচ্ছিলেন'।

রঘুবংশ কাব্যে ইন্দুমতীর মৃত্যুতে অজের সেই বিখ্যাত বিলাপোক্তি 'প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ' (৮।৬৭) শ্লোকাংশে কবি তৎকালীন দাম্পত্য জীবনাদর্শের পরিচয় পেয়েছিলেন। তিনি লেখেন—

যে দাম্পত্য সংসার রচনা করত তার রচনাকার্যের জন্য···প্রয়োজন ছিল ললিত-কলার। যেমন-তেমন করে মালা গাঁথলে চলত না, চীনাংশুকের অঞ্চলপ্রান্তে চিত্রবয়ন জানত তরুণীরা, নাচের নিপুণতা ছিল প্রধান শিক্ষা, তার সঙ্গে ছিল বীণা বেণু, ছিল গান। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সেটার মধ্যে আত্মিকতার সৌন্দর্য ছিল।

—'সাহিত্যের পথে', আধুনিক কাব্য ১৩৩৯ বৈশাখ

কালিদাসের রচনায় রবীন্দ্রনাথ ধর্ম ও সমাজের সঙ্গে সঙ্গে সে যুগের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ইতিহাস সংগুপ্ত দেখেছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সময়ে শকহূণরূপী শত্রুদের সঙ্গে ভারতবর্ষের খুব একটা দ্বন্দ্ব চলছিল। কুমারসম্ভবে দেবদৈত্যের সংগ্রামকে

তিনি তারই প্রতিফলন বলে মনে করেন ('প্রাচীন সাহিত্য', কাদম্বরীচিত্র ১৩০৬)। পরবর্তী কালে তিনি কালিদাসের কাব্য থেকে ইতিহাস বিবৃত করে বলেন—

> প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে জীবনযাত্রায় যে-একটি সরলতা ও সংযম ছিল তখন সেটি ভেঙে এসেছিল। রাজারা তখন রাজধর্ম বিস্মৃত হয়ে আত্মসুখপরায়ণ ভোগী হয়ে উঠেছিলেন। এ দিকে শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ তখন বারম্বার দুর্গতিপ্রাপ্ত হচ্ছিল।
>
> —'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬

এই মন্তব্যের লক্ষ্য মুখ্যতঃ রঘুবংশ কাব্য। এই কাব্য পুত্রকামী রাজা দিলীপের কঠোব তপশ্চর্যা দিয়ে শুরু হয়েছে এবং শেষ হয়েছে প্রমোদমত্ত বাজা অগ্নিবর্ণের প্রগল্ভ বিলাসের বর্ণনায়। রবীন্দ্রনাথ এই রঘুবংশ-কীর্তনেব আডালে কালিদাসেব কালেব গুপ্তবংশকে প্রত্যক্ষ কবেছিলেন। কী ভোগবিলাসের আয়োজনে, কী কাব্য-সংগীত-শিল্পকলার আলোচনায়, কালিদাসের সময়েই গুপ্তবংশ গৌরবেব সর্বোচ্চ শিখবে আরোহণ করেছিল। কিন্তু এই স্বর্ণযুগই যে অব্যবহিত বিনাশের ছায়া বহন কবছিল, পরবর্তী কালেব ইতিহাস তাব সাক্ষ্য দেয়। রঘুবংশেব সমারোহপূর্ণ বিনাশ বর্ণনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন সেই ইতিহাসের প্রতি কবি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রয়াস থেকে এ কথাও বোঝা যায়, কালিদাসেব কাব্য থেকে ইতিহাসের তথ্য আহবণ কবলেও তিনি শুধুমাত্র তথ্যপঞ্জী সংকলন কবেন নি; ওই উপকরণগুলিকে অবলম্বন করে তিনি সে যুগেব একটি পবিপূর্ণ চিত্র মনেব মধ্যে অঙ্কন করে নিয়ে তারই রূপকে আপন রচনায় প্রতিফলিত কবেছিলেন। সেইখানেই তিনি সার্থক ইতিহাসবেত্তা।

অবশ্য এ বিষয়েও কবির পূর্বসূরী ছিলেন মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর রচনায় এই জাতীয় নিদর্শন যথেষ্ট। সীতাবাম উপন্যাসে দেখি ললিতগিরি খণ্ডগিরির প্রাচীন ভাস্কর্যে মুগ্ধ লেখক সেই প্রতিমূর্তিগুলিতে কালিদাসবর্ণিত 'তন্বী শ্যামা শিখবদশনা' (উ. মে. ২১) বরবর্ণিনীদের প্রত্যক্ষ করেছেন। আবার উক্ত উপন্যাসেই রাজা সীতারাম যখন 'শ্রী'র মোহে রাজ্য উপেক্ষা করে 'চিত্তবিশ্রামে' আশ্রয় নিয়েছেন, রাজ্যে যখন ঘোর অরাজকতা উপস্থিত, রাজ্যধ্বংস আসন্ন, তখন বঙ্কিমচন্দ্র রঘুবংশের শেষ রাজা অগ্নিবর্ণের ভোগপ্রাচুর্য ও মহাবিনাশের সঙ্গে তার তুলনা করেছেন। এ বিষয়ে জয়ন্তী শ্রীকে বলেছে—

> নগরে শুনিলাম, রাজ্যের নাকি বড গোলযোগ। আর তুমিই নাকি তার কারণ? টোলে টোলে শুনিয়া আসিলাম, ছাত্রেরা সব রঘুর ঊনবিংশের

শ্লোক আওড়াইতেছে।

—'সীতারাম', তৃতীয় খণ্ড : ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এই উক্তি থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সুগভীর ইতিহাসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ইতিহাসবোধ যথেষ্ট প্রখর হলেও তিনি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো কালিদাসের কাব্য থেকে ইতিহাসের তথ্য আহরণ করতে সচেষ্ট হন নি।

৭

কালিদাসের কাব্য থেকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-অলংকরণের নানা উপাদান বা প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের বহুবিধ উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু তার চেয়ে গুরুতর ঋণ হল তিনি তাঁর এই পূর্বসূরীর কাছ থেকে সাহিত্যসৃষ্টির নানা আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন রচনায় কবি নিজেই সে কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন। সেইজন্যই দেখি সাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্বাচন-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> যে কবির সাহস আছে সুন্দরের সমাজে তিনি জাত-বিচার করেন না। তাই কালিদাসের কাব্যে কদম্ববনের একশ্রেণীতে দাঁড়িয়ে শ্যামজম্বুবনান্তও আষাঢ়ের অভ্যর্থনাভার নিল।

—'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যধর্ম ১৩৩৪ শ্রাবণ

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ নিজেও তা করেন নি। তাই গ্রাম্য ছড়ার সঙ্গে মেঘদূতকে স্মরণ করে কবি লেখেন—

> ও পারেতে কালো রঙ, বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্।
>
> এমন দিনে এমন অবস্থায় মন-কেমন না করিয়া থাকিতে পারে না।… বহুপূর্বে উজ্জয়িনী-রাজসভার মহাকবিও বলিয়া গিয়াছেন—
>
> মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
> … … . কিংপুনর্দূরসংস্থে॥
>
> কালিদাস যে কথাটি ঈষৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র এই ছড়ায় সেই কথাটা বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে।

—'লোকসাহিত্য', ছেলেভুলানো ছড়া ১৩০১

এখানে কবির নির্মোহ মন মেঘদূতের তুলনায় হৃদয়ভাবে গভীরতর ছড়াটিকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় নি।

সাহিত্যের মতো নাট্যাদর্শেও তিনি কোনো কোনো বিষয়ে কালিদাসের অনুসরণ করেছেন। তাঁর মতে অভিনয় ব্যাপারটি প্রাণবান্ ও গতিশীল। সে ক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চে

একটি স্থাণু চিত্রপট অকারণে দর্শকের মনকে সংকীর্ণ করে দেয়। সুতরাং প্রয়োজন চিত্রপটের নয়—চিত্তপটের, সেইখানেই নাট্যকার ছবি ফোটাবেন। শকুন্তলা নাটকে কবি সেইটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।—

> যখন দুষ্মন্ত ও সারথি একই স্থানে স্থির দাঁড়াইয়া বর্ণনা ও অভিনয়ের দ্বারা রথ-বেগের আলোচনা করেন, সেখানে দর্শক এই অতি সামান্য কথাটুকু অনায়াসেই ধরিয়া লন যে, মঞ্চ ছোটো, কিন্তু কাব্য ছোটো নয়।
>
> — বিচিত্র প্রবন্ধ', রঙ্গমঞ্চ ১৩০৯ পৌষ

তেমনি দুষ্মন্ত যখন গাছের আড়াল থেকে তিন সখির রহস্যালাপ শোনেন, তখন কালিদাস রঙ্গমঞ্চে একটি আস্ত গাছের গুঁড়ি আনার প্রয়োজন বোধ করেন না এবং কবি তার সমর্থনে বলেন যে দর্শক সে অভাবটুকু অনায়াসেই আপন সজাগ কল্পনাশক্তি দিয়ে পূরণ করে নেয়। জাভাতেও অভিনয় দেখতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, ওড়ার দৃশ্যে অভিনেতা পাখা ব্যবহার না করে নাচের ভঙ্গিতে ওড়ার ভাব দেখান। এই প্রসঙ্গেও তিনি শকুন্তলা নাটকের কথা স্মরণ করেছেন।—

> এর থেকে মনে পড়ে গেল শকুন্তলা নাটকে কবির নির্দেশবাক্য—রথবেগং নাটয়তি। বোঝা যাচ্ছে, রথবেগটা নাচের দ্বারাই প্রকাশ হত, রথের দ্বারা নয়।
>
> —'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ১৪, ১৯২৭ সেপ্টেম্বর ১৭

পরবর্তী কালে 'তপতী' নাটকের ভূমিকাতেও (১৩৩৬ ভাদ্র) কবি নিঃসংশয় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে 'ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষিকে' তিনি প্রশ্রয় দিতে পারেন না। 'কারণ বাস্তবসত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।'

সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা, ছন্দ বা অলংকারের আলোচনাতেও রবীন্দ্রনাথ বারে বারে কালিদাসকে স্মরণ করেছেন। পরবর্তী ষোড়শ অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। যাই হক, এগুলি থেকে বোঝা যায় কালিদাসের কাব্য রবীন্দ্রমনকে কতদূর অধিকার করেছিল। তবে পৃথক্ পৃথক ভাবে ইতিহাসের তথ্য, সাহিত্যের তত্ত্ব বা উপমা-অলংকারের সৌন্দর্যই যে তাঁকে কালিদাসের অনুরাগী করে তুলেছিল তা বলা যায় না। কবির নিজের ভাষাতেই বলা চলে—

> কালিদাসের উপমা ভালো বা ভাষা সরস, বা কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের বর্ণনা সুন্দর, বা অভিজ্ঞান-শকুন্তলের চতুর্থ সর্গে করুণরস প্রচুর আছে, এ আলোচনা যথেষ্ট নহে। কিন্তু কালিদাসের সমস্ত কাব্যে মানব-হৃদয়ের একটা বিশেষ রূপ বাঁধা পড়িয়াছে।
>
> —'সাহিত্য', সাহিত্যসৃষ্টি ১৩১৪ আষাঢ়

সেই কারণে কালিদাসের কাব্য সমগ্রভাবেই কবিচিত্তকে মুগ্ধ করেছিল।

৮

কালিদাসের কাব্য রবীন্দ্রনাথকে শুধু আকৃষ্টই করে নি, তা তাঁর অন্তরে নূতন সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। এই সত্য অনুভব করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে কালিদাসের কাব্য পড়ে তিনি শুধু 'আবৃত্তির আনন্দ' পান না, পান 'সৃষ্টির আনন্দ'। সত্যই কুমারসম্ভব, শকুন্তলা বিশেষতঃ মেঘদূত রবীন্দ্রনাথের হাতে যেভাবে নবরূপ লাভ করেছে তাতে তা নূতন সৃষ্টির মর্যাদা পেয়েছে। বলা বাহুল্য, কালিদাসও এ কাজ করেছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এ সম্বন্ধে মধুসূদন লিখেছেন—

মেনকা অপ্সরারূপী ব্যাসের ভারতী
প্রসবি ত্যজিলা ব্যস্তে, ভারত-কাননে
শকুন্তলা সুন্দরীরে, তুমি, মহামতি,
কণ্বরূপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে
কালিদাস।

— চতুর্দশপদী কবিতাবলী' ১৮৬৫, শকুন্তলা

মহাভারতের অনতিস্ফুট শকুন্তলার আখ্যান কালিদাসের লেখনীতে স্ফুটতর হয়ে উঠেছে। দুর্বাসার শাপই এ কাহিনীর স্বাদ বদলে দিয়েছে। তবে কালিদাস একটি বহিরঙ্গ ঘটনার সাহায্যে যা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তার অন্তর্লীন ভাবের মধ্যে একটি নূতন ভাব আরোপ করে তার তাৎপর্যকে গভীরতর এবং অধিকতর ব্যঞ্জনাবহ করে তোলেন। তাই শকুন্তলা। ঋষিশাপ ও কুমারসম্ভবে দেবরোষের নবব্যাখ্যার শোনা যায়—

> কোনো-একটি সংকীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহংকারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এই হচ্ছে পাপ।

—'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬

তেমনই—

> কুমারসম্ভবে শুনি দৈত্যরা স্বর্গকে অধিকার করেছে। তার মানে, যে-আনন্দ ছিল মুক্ত তাকে তারা বন্দী করতে চেয়েছিল। তখন সেটা হয়ে গেল ভোগ—

ভোগে ক্লান্তি, ভোগে ম্লানতা, ভোগ নিজেকে নিঃশেষ করে দেউলে হয়ে যায়।

—'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-৬২, হেমন্তবালাদেবীকে লেখা ১৯৩১ নভেম্বর ২৪

এখানে রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলা বা কুমারসম্ভবকে অবলম্বন করে কালিদাসের মতো কোনো নূতন নাটক বা কাব্য রচনা করেন নি। তবে তিনি তাঁর 'আপন মনের মাধুরী' মিশিয়ে উক্ত গ্রন্থ দুটির যে ভাষ্য করেছেন সেগুলিকে এক একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি রূপে গণ্য করা চলে।

মেঘদূতকে উপলক্ষ করেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সবচেয়ে সার্থক হয়েছে। 'মানসী' কাব্যের অন্তর্গত তাঁর বিখ্যাত মেঘদূত কবিতাটিতে (১৮৯০) তার সূচনা দেখা গিয়েছিল। প্রায় ওই সময়েই প্রমথ চৌধুরীকে কবি এক পত্রে জানান, 'ক্ষুদ্র আত্মকোটরের মধ্যে অবরুদ্ধ বন্দীদিগকে সৌন্দর্যের স্বাধীনতাক্ষেত্রে মুক্তি' দেওয়াই মেঘদূতের উদ্দেশ্য ('চিঠিপত্র' ৫, পত্র ৪)। আবার এই একই সময়ে মেঘদূতের সমালোচনা করতে গিয়েও তিনি বিরহী যক্ষের নির্বাসনদুঃখকে যেভাবে মানবের চিরন্তন বিরহের প্রসঙ্গে টেনে এনে তাকে অসীমের সুরে বেঁধে দিয়েছেন তা শুধু তাঁর মতো কবির পক্ষেই সম্ভব। সেখানে তিনি বলেছেন—

> আমাদের এই সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্তমান হইতে যখন কাব্যবর্ণিত সেই অতীত ভূখণ্ডের তটের দিকে চাহিয়া দেখি তখন মনে হয়, সেই সিপ্রাতীরের যূথীবনে যে পুষ্পলাবী রমণীরা ফুল তুলিত, অবন্তীর নগরচত্বরে যে বৃদ্ধগণ উদয়নের গল্প বলিত, তাহাদের এবং আমাদের মধ্যে যেন সংযোগ থাকা উচিত ছিল। আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য আছে, অথচ কালের নিষ্ঠুর ব্যবধান। কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানসসরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়। মাঝখানে একেবারে অনন্ত, কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে।

—'প্রাচীন সাহিত্য', মেঘদূত ১২৯৮ অগ্রহায়ণ

দীর্ঘকাল পরে 'লিপিকা'র (১৯২২) মেঘদূত কথিকাটিতেও মানুষের এই অন্তহীন বিরহভাবনার কথা পাই। শেষ সপ্তকের (১৯৩৫) একটি কবিতাতে দেখি এই ভাবনাই মেঘদূতের অনুষঙ্গবর্জিত ভাবনির্যাসরূপে ধরা দিয়েছে।—

কেউ চেনা নয়
সব মানুষই অজানা।
চলেছে আপনার রহস্যে
আপনি একাকী।
সেখানে তার দোসর নেই।

—'শেষ সপ্তক', বারো-সংখ্যক কবিতা

'শ্যামলী' কাব্যের অকাল ঘুম কবিতাটিতেও (১৯৩৬) এই ভাবের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। একই চিন্তার এই পৌনঃপুনিক প্রয়োগ দেখে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর একটি প্রিয় ভাবনাকে মেঘদূতে আরোপ করে দিয়ে তার অন্তর্নিহিত ভাবকে নূতন রূপে সৃষ্টি করে নিয়েছেন।

'শেষ সপ্তক'-এর আটত্রিশ সংখ্যক কবিতায় দেখি যক্ষের বিরহকে কবি আর-এক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, মিলনের নিভৃত বাসকক্ষে বন্দী যক্ষের প্রেম বিরহে মুক্তি পেয়ে যেন সার্থক হয়ে উঠেছে। তাই মেঘদূতে প্রকৃতপক্ষে কান্না নেই, আছে উল্লাস। 'পথে ও পথের প্রান্তে' গ্রন্থেও (পত্র ৩৮, ১৩৩৬ শ্রাবণ) কবি বলেছেন যে বিরহের অবকাশে যক্ষের প্রেম অভিসারের পথে নেমে আনন্দে এগিয়ে গেছে পূর্ণতার দিকে। আর ব্যথার যথার্থ রূপ ধরা দিয়েছে অলকাপুরীর নিশ্চল ঐশ্বর্যে বদ্ধ প্রতীক্ষারত যক্ষবধূর মধ্যে। তবে এর পরে কবি বৈষ্ণবদর্শন অনুযায়ী এক ব্যাখ্যায় যক্ষবধূর ব্যথাকে মুছে দিয়েছেন এবং এই পত্রের সমগ্র ভাবটিকে 'পুনশ্চ' কাব্যের একটি কবিতায় রূপ দিয়ে শেষে বলেছেন—

সেও তো নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ,
সে যে বাজায় বাঁশি, প্রতীক্ষার বাঁশি,—
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলছে একই তালে।

—'পুনশ্চ', বিচ্ছেদ ১৩৩৯ ভাদ্র

কিন্তু শেষ জীবনে 'সানাই' কাব্যের যক্ষ কবিতায় (১৩৪৫) কবি অলকাপুরীর এই আনন্দশতদলটিকে পাঠকহৃদয়ের কান্নার সরোবরে চিরদিনের মতো দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। কোনো তাত্ত্বিক সান্ত্বনায় তার বেদনাকে লঘু করে দেন নি।

দেখা গেল, শকুন্তলা কুমারসম্ভব বা মেঘদূতকে ব্যাখ্যা করার ছলে কবি নূতন তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন। কখনও কখনও আবার কালিদাসের কাব্যে বর্ণিত কোনো ঘটনায়

সূত্রমাত্র অবলম্বন করে তিনি নূতন কবিতা রচনা করেন। যেমন 'কল্পনা' কাব্যের মদনভস্মের পরে কবিতাটি। কুমারসম্ভবে বর্ণিত মদনভস্মের ভাবটুকুমাত্র এই কবিতায় গৃহীত হয়েছে। কিন্তু কালিদাস মদনকে ভস্ম করেও ফের শরীরীরূপেই তার পুনরুজ্জীবনের আশ্বাস ঘোষণা করেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ 'অতনু'র তনুহীন রূপকে অক্ষুন্ন রেখেও তার নবজীবনলাভের গোপন খবরটুকু প্রকাশ করেছেন। কবির মতে এই বিশ্বে মদনের অবিসংবাদিত অধিকার থাকলেও ভস্মের পূর্বে তার পরিধি অনেক সংকীর্ণ ছিল। কিন্তু ভস্মের পরে এই অঙ্গধারী দেবতা অনঙ্গরূপে নিখিল বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছেন। সেইজন্যই কবি অনুভব করেছেন—

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত
নয়ন কার নীরব নীল গগনে!
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত,
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে!
পরশ কার পুষ্পবাসে পরান মন উল্লাসি
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে!
পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!

—'কল্পনা', মদনভস্মের পর ১৩০৪ জ্যৈষ্ঠ

রবীন্দ্রকল্পিত অনঙ্গের এই ভাবরূপ দেখে বলতে হয়, 'মহাকবির কল্পনাতেও ছিল না তার ছবি'। এটি সম্পূর্ণভাবেই রবীন্দ্রমনের সৃষ্টি।

৯

কালিদাসের কাব্য আজীবন বিভিন্ন দিক্ থেকে রবীন্দ্রমনকে আকৃষ্ট করেছে। কারণ কালিদাসের কাব্যগুলিতে কবি 'মানবহৃদয়ের একটা বিশেষ রূপ'কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই 'বিশেষ রূপ'টি যে কালিদাসের বিশেষ জীবনবোধের প্রতিফলন তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং কালিদাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই অনুরাগের অর্থ হল কালিদাসের জীবনদর্শনের প্রতি তাঁর অনুরাগ। অতএব কালিদাসের জীবনদৃষ্টির পরিচয় নিলেই রবীন্দ্রচিত্তে কালিদাসের ভাবধারার সম্যক্ স্বরূপটি বোঝা যাবে। কালিদাসের কাব্য-আলোচনার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে বলেছিলেন—

কালিদাস একান্তই সৌন্দর্যসম্ভোগের কবি, এ মত লোকের মধ্যে প্রচলিত।…ইহা হইতে বুঝা যাইবে, জনসাধারণের প্রতি আর যে-কোনো বিষয়ে আস্থা স্থাপন

করা যাক, সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে সেই অন্ধের উপরে অন্ধ নির্ভর করা চলে না।

—'প্রাচীন সাহিত্য', কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ১৩০৮ পৌষ

এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, কালিদাসের জীবনদৃষ্টি সম্বন্ধে কবির ধারণা ছিল স্বতন্ত্র। তাঁর মতে কালিদাস যে সৌন্দর্যের উপাসক সে সৌন্দর্য সম্ভোগ-বিলাসের দ্বারা আকীর্ণ নয়।—

> সেই সৌন্দর্য, শ্রী হ্রী এবং কল্যাণে উদ্‌ভাসমান, তাহা গভীরতার দিকে নিতান্ত একাগ্র এবং ব্যাপ্তির দিকে বিশ্বের আশ্রয়স্থল। তাহা ত্যাগের দ্বারা পরিপূর্ণ, দুঃখের দ্বারা চরিতার্থ এবং ধর্মের দ্বারা ধ্রুব। সেই সৌন্দর্যে নরনারীর দুর্নিবার দুরন্ত প্রেমের প্রলয়বেগ আপনাকে সংযত করিয়া মঙ্গলমহাসমুদ্রের মধ্যে পরমস্তব্ধতা লাভ করিয়াছে।

—পূর্ববৎ

মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা গ্রন্থে কালিদাসের এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর সম্ভোগমত্ত যক্ষ তাই ভর্তৃশাপে অভিশপ্ত, কন্দর্পসহায় পার্বতী প্রত্যাখ্যাত এবং আত্মবিস্মৃত শকুন্তলা ঋষিশাপগ্রস্ত। কিন্তু যে তপঃপূত প্রেম তাপসী উমার সঙ্গে মহেশ্বরের মিলন ঘটিয়েছে, অপমানিতা শকুন্তলার মধ্যে মঙ্গলদৃষ্টি জাগ্রত করে তুলে দুষ্মন্তের সব অপরাধ মার্জনা করে দিয়েছে, সেই প্রেমের মধ্যে যে সৌন্দর্যের বিকাশ হয়েছে, কালিদাস তারই জয়গান গেয়েছেন। কালিদাসের প্রথম বয়সে রচিত 'ঋতুসংহার' কাব্যেও এই একই মঙ্গল-ভাবনার প্রতি রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ঋতুসংহারের বর্ষাবর্ণনায় শেষ আশীর্বাণী হল—

জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণহেতু—
দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি ॥২৮

এ সম্বন্ধে কবি মন্তব্য করেছেন 'বর্ষাকাল তোমাকে তোমার বাঞ্ছিত হিত অর্পণ করুক'। কেননা 'বর্ষাকাল ত সুখের জন্য নহে, ইহা মঙ্গলের জন্য। বর্ষাকালে উপভোগের বাসনা হয় না' ('বিবিধ প্রসঙ্গ', বসন্ত ও বর্ষা ১২৮৮ ভাদ্র)। এই মঙ্গলবোধ থেকেই কালিদাস মেঘদূত কাব্যে বসন্তবাতাসের পরিবর্তে যে বর্ষার মেঘকে দৌত্যে বরণ করেছিলেন সে তথ্যটুকুও রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করে দিয়েছেন।

কালিদাসের এই মঙ্গলাদর্শের রূপটি কবি যে এমনভাবে চিনে নিতে পেরেছিলেন তার কারণ তাঁর জীবনদৃষ্টিও কালিদাসের সমধর্মী। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

শিবমন্ত্র দিই আমিও।

... ...

কালিদাস ছিলেন শৈব।
সেই পথের পথিক কবিরা।

—'কালের যাত্রা' ১৩৩২, কবির দীক্ষা

কবিধর্মের দিক্ থেকে অন্ততঃ সব কবিরই যে কালিদাসের মতো শৈব হওয়াই শ্রেয়ঃ সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয়। আর তিনি নিজে আজীবন যে শিবমন্ত্রেরই উপাসনা করেছেন, তাঁর সাহিত্যে তার অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

কালিদাসের এই শিব বা মঙ্গলের আদর্শকে কবি তাঁর তপোবন-আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা বিশেষভাবে তপোবনেই বিকশিত হয়ে উঠেছিল। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের কাব্যে তাই তপোবন এত অপরিহার্যরূপে দেখা দিয়েছে। তাঁর রঘুবংশ কাব্যের যবনিকা প্রথম উন্মোচিত হয়েছে তপোবনের শান্ত সুন্দর পবিত্র পরিবেশে। অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকেও দেখি ভোগলালসানিষ্ঠুর রাজপ্রাসাদকে ধিক্কার দিয়ে তপোবনের প্রশান্ত মহিমা দেখা দিয়েছে। আর কুমারসম্ভবে নন্দীর শাসনে সংযত তপোবন যোগীশ্বরের ধ্যানে সমাহিত হয়ে বিরাজ করেছে। তবে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন, যে তপোবনে দুষ্মন্ত-শকুন্তলা গান্ধর্বমতে পরিণীত হয়েছে, যে তপোবনে বসন্তপুষ্পাভরণা পার্বতী মহেশ্বরকে রূপমুগ্ধ করতে গেছে, সে তপোবন স্বভাবের সারল্যে সুন্দর হলেও তার সৌন্দর্য স্বভাবের চাপল্যেই অরক্ষিত থেকেছে। তাই বিপরীত ঘটনার আঘাতে তা সহজে ভেঙে পড়েছে। সে তপোবন প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা বা পার্বতীকে স্থান দিতে পারে নি। কিন্তু যে তপোবনে বিবহতপঃক্লিষ্টা ভরতজননী শকুন্তলা, পঞ্চাগ্নিতপা উমা বা পুত্রার্থী রাজদম্পতি দিলীপ-সুদক্ষিণা দেখা দিয়েছে সেই তপোবন ত্যাগ-কঠিন তপশ্চর্যায় সুরক্ষিত। রবীন্দ্রনাথের মতে প্রথম তপোবনটি মর্ত্যলোকের আর দ্বিতীয়টি অমৃতলোকের। দুঃখের তপস্যাতেই মর্ত্য এসে স্বর্গের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়, তখন কোনো আঘাতেই তার আর বিচলিত হয়ে ভ্রষ্ট হয়ে পড়বার ভয় থাকে না। এর থেকে বোঝা যায়, কালিদাসের কাব্যে তপোবনের গুরুত্ব কত বেশি! সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—

> এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মূর্তিমান করতে পেরেছে!

—'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬

রবীন্দ্রনাথ নিজেও আজীবন এই তপোবনের আদর্শে মুগ্ধ ছিলেন। বারো বৎসর বয়সে রচিত তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতাতে তিনি লিখেছিলেন—

নিরঞ্জন তপোবনে বিরাজে সন্তোষ।
পবিত্র ধর্মের দ্বারে সন্তোষ আসন।

—'অভিলাষ' ১৮৭৪

এই পংক্তি দুটিতে তপোবনের প্রতি বালক কবির শ্রদ্ধাটি ধরা দিয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত কবিতাতেও (প্রকৃতির খেদ ১৮৭৫) তিনি তপোবন সম্বন্ধে বলেছেন—

দেখ্ দেখি তপোবনে,
ঋষিরা স্বাধীন মনে,
কেমন ঈশ্বর ধ্যানে রয়েছে ব্যাপৃত ॥[১]

তপোবনের প্রতি কবির প্রথম বয়সের এই অনুরাগ অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে গভীরতর হয়ে সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেছিল। তখন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তপোবনবিহিত সংযম-সাধনার পথই মানুষের কল্যাণের পথ। তাই কবির সিদ্ধান্ত হল—'কঠিন তপস্যার ভিতর দিয়ে ছাড়া কোনো মহৎ ফললাভের কোনো সম্ভাবনা নেই' ('শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন)। শেষ বয়সে 'মানুষের ধর্ম' পর্যায়ে পৌঁছেও সে আদর্শ তিনি ভুলতে পারেন নি। মানুষের জীবনসাধনায় এই তপশ্চর্যার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেছেন—

> কালিদাস রঘুবংশের যে পতনের ছবি দিয়েছেন সে কি মানুষের জীবনে পশুপ্রবেশের ফলেই না।

—'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ৩

অর্থাৎ যে সংযমে তপস্যায় তপোবনে রঘুবংশের মহিমময় সূচনা দেখা দিয়েছিল, সেই রঘুবংশধরই শেষ পর্যন্ত তপঃভ্রষ্ট ও তপোবন-বিচ্যুত হয়ে মদিরায় ও ইন্দ্রিয়মত্ততায় প্রমোদভবনের মধ্যে আপনার বিনাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

এই তপোবনকে রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর সাহিত্যে শ্রদ্ধা জানিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, তাকে কর্মময় বাস্তব জীবনেও রূপদান করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর সেই তপোবনের কল্পনা যে বিশেষভাবে কালিদাসের কাছ থেকে নেওয়া কবি সুস্পষ্ট ভাষাতে সে স্বীকৃতি জানিয়েছেন।—

> কালিদাসের বহুকাল পরে জন্মেছি, কিন্তু এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে।··· কাব্যচর্চার মাঝখানে কখন এক সময়ে সেই তপোবনের আহ্বান আমার মনে এসে পৌঁচেছিল। ভাববিলীন তপোবন আমার কাছ থেকে রূপ নিতে চেয়েছিল

১ প্রবোধচন্দ্র সেন-লিখিত ভোরের পাখি প্রবন্ধ : বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬৮ কার্তিক-পৌষ

আধুনিককালের কোনো একটি অনুকূল ক্ষেত্রে।

—'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', অধ্যায় ১, ১৩৪৩ আষাঢ়

'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে'র প্রতিষ্ঠাই (১৯০১) কবির সেই ইচ্ছাকে রূপ দিয়েছিল, যার পরিণতি বিশ্বভারতী। জীবনের শেষ পর্যন্ত কালিদাসের এই তপোবনকে কবি যে কতদূর একান্ত রূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তিনি নিজেই তার পরিচয় দিয়ে লিখেছেন—

আমি আশ্রমের আদর্শ-রূপে বার বার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পাই নি। সে পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই।

—'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ

বলা বাহুল্য, সে কাব্য প্রধানতঃ কালিদাসের কাব্য।

কালিদাসের এই ভোগবিমুখ তপোবনের আদর্শ—এই ত্যাগশুদ্ধ প্রেমের শিবমন্ত্র কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো দৃষ্টিতে এমন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রপূর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবও এর ব্যতিক্রম নয়। বঙ্কিম কালিদাসের কাব্যে ভারতীয় ভাবধারার প্রকাশ দেখেছিলেন। কিন্তু যে দৃষ্টির বিচারে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগের এবং ভোগ-বিরতির কবি বলা যাইতে পারে' ('প্রাচীন সাহিত্য', কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা) বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সে দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে দেখি যথার্থ প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করে হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রনাথকে এক পত্রে লেখেন—

কামাতুরের···চিত্তচাঞ্চল্যকেই আর্যকবিরা মদনশরজ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে বৃত্তির কল্পিত অবতার বসন্তসহায় হইয়া, মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন, যাঁহার প্রসাদে কবির বর্ণনায় মৃগেরা মৃগীদিগের গাত্রে গাত্রকণ্ডূয়ন করিতেছে, করিগণ করিণীদিগকে পদ্মমৃণাল ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে এই রূপজ মোহমাত্র।···ইহা সর্বজীবমুগ্ধকারী। কালিদাস, বাইরণ, জয়দেব ইহার কবি।· কিন্তু ইহা প্রণয় নহে। প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক।

—'বিষবৃক্ষ' ১২৭৯, দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : বিষবৃক্ষের ফল

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিচারে কালিদাসকে খণ্ডিত করে দেখা হয়েছে। কুমারসম্ভবে অকালবসন্ত-সমাগমের চাঞ্চল্যটুকুই এখানে বর্ণিত। কিন্তু তপঃক্লিষ্টা পার্বতীর যে কামনামুক্ত রূপ দয়িতকে মোহে মুগ্ধ না করে তাকে চরিতার্থ করে দেয়, সে ভাবটি এখানে উপেক্ষিত হয়েছে।

অবশ্য এমন কথা উঠতে পারে যে উপন্যাসে বর্ণিত পাত্রের উক্তি বা মন্তব্যের সঙ্গে

লেখকের ভাবনার যোগ না থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু উক্ত উপন্যাসের প্রায় সমসময়ে রচিত একটি প্রবন্ধেও কালিদাস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ওই জাতীয় মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে তার সাহিত্যের ধারা মেলাতে গিয়ে বঙ্কিম বলেছেন, যে যুগে 'দেশের ধনবৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি ও সভ্যতাবৃদ্ধি' হয়েছিল সেই সময়ের সাহিত্য ধর্মানুকারী। এই ধর্মানুসরণ তখন এত প্রবল হয়েছিল যে তার মোহে মানুষের বিচারশক্তি পর্যন্ত বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।—

> এই ধর্মমোহের ফল পুরাণ। কিন্তু যেমন এক দিকে ধর্মের স্রোতঃ বহিতে লাগিল, তেমনি আর এক দিকে বিলাসিতার স্রোতঃ বহিতে লাগিল। তাহার ফল কালিদাসের কাব্য নাটকাদি।
>
> — বিবিধ প্রবন্ধ ১ম খণ্ড, বিদ্যাপতি ও জয়দেব ১২৮০ পৌষ

সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র কালিদাসকে বিলাসসম্ভোগের কবি বলেই মনে করতেন।

কালিদাসের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের থেকে যে কতদূর পৃথক্ ছিলেন আর একটি দৃষ্টান্ত থেকে তা বোঝা যাবে। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা প্রবন্ধে বঙ্কিম উক্ত তিন নায়িকার চরিত্র বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার এবং পরিণীতা শকুন্তলা অনেকাংশেই দেসদিমোনার অনুরূপ। তবে তাঁর বিচারে শকুন্তলা অধিকতর লজ্জাশীলা হলেও ফর্দিনান্দের সঙ্গে প্রথম প্রণয়ালাপে মিরন্দা যে 'মহান চিত্তভাবে পরিপুত' হয়েছে শকুন্তলায় তার অভাব আছে। তাই শকুন্তলার প্রণয় সম্ভাষণে সামান্য চাতুরী ও লুকোচুরি আছে, কিন্তু তত গৌরব নেই। অবশ্য তার কারণরূপে তিনি বলেছেন যে 'দুষ্মন্তের চরিত্র-গৌরবে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে'। তাই মিরন্দার মতো সে পূর্ণগৌরবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে নি। আর দেসদিমোনার সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না, সে সকল দেসদিমোনায় অত্যন্ত পরিস্ফুট। দেসদিমোনার হৃদয় আমাদিগের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত, শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত। সুতরাং দেসদিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জ্বল বলিয়া দেসদিমোনার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারে না।
>
> — বিবিধ প্রবন্ধ' ১, শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা ১২৮২ বৈশাখ

এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, নাট্যকারসুলভ মনোভঙ্গির অধিকারী বঙ্কিম নায়িকা-

হৃদয়ের প্রস্ফুট ভাবব্যক্তিকেই অধিকতর মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলা চরিত্রের সমালোচনা করে দেখিয়েছেন যে লজ্জানতা অস্ফুটবাক্ শকুন্তলাচরিত্র সৌন্দর্যে কারো অপেক্ষা হীন নয়। তিনি বলেছেন, পতিপরিত্যক্তা শকুন্তলার হৃদয়ের বৃহৎ শূন্যতা প্রকাশের জন্যই এই স্তব্ধ গভীর নীরবতার প্রয়োজন। তাই—

> কালিদাস শকুন্তলার বিরহদুঃখের প্রত্যক্ষ অবতারণা করেন নাই। কবি নীরব থাকিয়া শকুন্তলার চারি দিকের নীরবতা ও শূন্যতা আমাদের চিত্তের মধ্যে ঘনীভূত করিয়া দিয়াছেন। বিশ্ববিরহিত শকুন্তলার নিয়মসংযত ধৈর্যগম্ভীর অপরিমেয় দুঃখ আমাদের মানস নেত্রের সম্মুখে ধ্যানাসনে বিরাজমান। এই ধ্যানমগ্ন দুঃখের সম্মুখে কবি একাকী দাঁড়াইয়া আপন ওষ্ঠাধরের উপর তর্জনী স্থাপন করিয়াছেন।
>
> —'প্রাচীন সাহিত্য', শকুন্তলা ১৩০৯ আশ্বিন

সমগ্র টেম্পেস্ট্ নাটককে অভিজ্ঞান-শকুন্তলের সঙ্গে তুলনা করেও রবীন্দ্রনাথ তাকে শকুন্তলার ঊর্ধ্বে স্থান দিতে পারেন নি। যে ভারতীয় মঙ্গলাদর্শ শকুন্তলার মূল কথা তার প্রতিই রবীন্দ্রহৃদয়ের আন্তরিক সমর্থন ছিল। সেইজন্যই—যে 'টেম্পেস্ট্ নাটকে মানুষ আপনাকে বিশ্বের মধ্যে মঙ্গলভাবে প্রীতিযোগে প্রসারিত করিয়া বড়ো হইয়া উঠে নাই, বিশ্বকে খর্ব করিয়া, দমন করিয়া, আপনি অধিপতি হইতে চাহিয়াছে', সেই ভাবধারার প্রতি কবি তাঁর বিমুখতা ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি দেখেছেন, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মঙ্গল সম্বন্ধের যোগেই শকুন্তলার মধুর চরিত্রখানি বিকশিত হয়ে উঠেছে। তা শকুন্তলার যৌবনলীলায় মাধুর্য দিয়েছে, মঙ্গল-আশীর্বাদের সঙ্গে আপন কল্যাণমর্মর মিশ্রিত করেছে, বিচ্ছেদকালে মূক ব্যাকুলতার সঙ্গে সকরুণভাবে বিদায় দিয়েছে। তাই কবি অনুভব করেছেন—

> সকলের চেয়ে নিস্তব্ধভাবে কবির তপোবন এই কাব্যের মধ্যে কাজ করিয়াছে। সে কাজ টেম্পেস্টের এরিয়েলের ন্যায় শাসনবদ্ধ দাসত্বের বাহ্য কাজ নহে, তাহা সৌন্দর্যের কাজ, প্রীতির কাজ, আত্মীয়তার কাজ, অভ্যন্তরের নিগূঢ় কাজ।

অতএব তিনি দেখেছেন—

> টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি। টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি। টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান। টেম্পেস্টের মিরান্দা সরল মাধুর্যে গঠিত, কিন্তু সে সরলতার প্রতিষ্ঠা অজ্ঞতা অনভিজ্ঞতার উপরে, শকুন্তলার সরলতা অপরাধে দুঃখে অভিজ্ঞতায় ধৈর্যে ও ক্ষমায় পরিপক্ব, গম্ভীর ও স্থায়ী।
>
> —'প্রাচীন সাহিত্য', শকুন্তলা ১৩০৯ আশ্বিন

সুতরাং তাঁর চোখে টেম্পেস্টের তুলনায় শকুন্তলার ভাবাদর্শ অনেক বড়ো।

এর থেকে বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্যটি কোথায়। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র যে-যুগে জন্মেছিলেন সে-যুগে পাশ্চাত্যানুকরণের প্রবল মোহ সমগ্র বাঙালির জাতীয় চিত্তকে গ্রাস করে চলছিল। সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় ভাবাদর্শকে পরিপূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং সে কথা স্বীকার করে বলেছেন—

> শকুন্তলার কবি যে টেম্পেস্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এস্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম।

কিন্তু ভারতসংস্কৃতির সার্থক উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের প্রতি তাঁর হৃদয়ের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে মন্তব্য করেছেন—

> শকুন্তলার মতো এমন প্রশান্তগম্ভীর, এমন সংযতসম্পূর্ণ নাটক শেক্স্পীয়রের নাট্যাবলীর মধ্যে একখানিও নাই।

এইখানেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বসূরীর থেকে স্বতন্ত্র।

দেখা গেল, রবীন্দ্র-সাহিত্য তার আদি যুগ থেকে শেষ পর্যন্ত কালিদাসের কাব্যের ভাবে-ভাবনায়, আদর্শকল্পনায় কখনও বা তার ইঙ্গিত ব্যঞ্জনায় পরিকীর্ণ হয়ে আছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সজীব চিত্ত প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সব রকম ভাবধারাকেই অন্তরে গ্রহণ করতে উন্মুখ ছিল। বিশেষতঃ প্রাচ্যসংস্কৃতির বৈদিক, বৈষ্ণব প্রভৃতি ভাবধারাকে তিনি যেন আপনার অজ্ঞাতসারেই আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। তবু কালিদাসের কল্পনা ও জীবনদর্শন যেভাবে তাঁর আত্মস্থ হয়ে গিয়েছিল, তার সঙ্গে অন্য কারো তুলনা চলে না। সে হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে কালিদাসের সঙ্গে প্রায় একাত্ম বলা চলে। সুতরাং কালিদাসকে না বুঝলে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা যে অসম্পূর্ণ থেকে যায় এ কথা অত্যুক্তি নয়।

বাণভট্ট, ভর্তৃহরি ও অমরু

বাণভট্ট

'কাদম্বরী' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রিয় সংস্কৃত কাব্য এবং মনে হয় কাদম্বরী-প্রণেতা হিসাবেই কবি বাণভট্টের (আনু. খ্রীঃ ৬০০-৬৫০) সঙ্গে তাঁর পরিচয়। কারণ রবীন্দ্র-সাহিত্যে একাধিকবার কাদম্বরীর উল্লেখ পাই, কিন্তু হর্ষচরিতের উল্লেখ একবারও চোখে পড়ে নি।

কাদম্বরীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং তিনি যে এই গ্রন্থটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধিগত করে নিয়েছিলেন, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কবির ব্যবহৃত ও তাঁর নাম স্বাক্ষরিত দুই খণ্ড 'কাদম্বরী কথা' (পূর্বভাগ ও উত্তর ভাগ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত ১৮৮৫) বর্তমানে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে। ওই গ্রন্থের খণ্ড দুটির মলাটের ভিতরের পাতায় কবি ওই গ্রন্থের কিছু নির্বাচিত শব্দ, তার পত্রসংখ্যা এবং তার ইংরেজি ও বাংলা প্রতিশব্দ স্বহস্তে লিখে রেখেছেন। গ্রন্থের মধ্যেও বহু স্থান পেনসিলে চিহ্নিত ও লিখিত হয়ে এই গ্রন্থ পাঠে কবির সবিশেষ মনোযোগের পরিচয় দেয়।

কাদম্বরীর সঙ্গে কবির পরিচয়ের প্রথম নিদর্শন পাই প্রমথ চৌধুরীকে লেখা কবির এক পত্রে।—

> কাদম্বরী অল্প অল্প করে এগচ্চে। শ দুয়েক পাতা হয়েচে—আরও ততগুলো পাতা বাকি আছে।
>
> —'চিঠিপত্র' ৫ (১৩৫২), পত্র-১২ক, [১৮৯৩] শ্রাবণ ৮ পৃ ১৬৬ (খ)

এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় কবি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে গ্রন্থটি পাঠ করে-ছিলেন। এ ছাড়া তাঁর পরবর্তী কালের নানা রচনায় কাদম্বরীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। নানা প্রসঙ্গে নানা ভাবে তিনি কাদম্বরীকে স্মরণ করেন। এই কাব্যে বর্ণিত মানবেতর জীবের প্রতি করুণ সহানুভূতি, মূক প্রকৃতির সঙ্গে জীব ও মানবের হৃদ্য প্রীতির সম্পর্ক, প্রাচীন তপোবনের চিত্র ও তার শিক্ষাদর্শ—এ সবই কবির মনকে বিশেষভাবে অধিকার করেছিল। আবার এই গ্রন্থে ভারত-ইতিহাসের যে পরোক্ষ উপকরণ সংগুপ্ত আছে তার প্রতিও তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে কাদম্বরীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগের প্রধান কারণ হল তার আঙ্গিক অর্থাৎ তার চিত্রধর্মিতা, তার অলংকারের ঐশ্বর্য এবং সর্বোপরি

তার রাজকীয় গরিমাময় ভাষা। এবার সংক্ষেপে একে একে এগুলির পরিচয় নেওয়া যাক।

২

প্রথম জীবনে একটি মুরগির প্রাণসংহার উপলক্ষে ইন্দিরা দেবীকে লেখা এক পত্রে কবিকে কাদম্বরীর প্রসঙ্গ স্মরণ করতে দেখা গেছে। ওই দিনই তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ তাঁকে পশুপ্রীতি নামক একটি স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে কবি লিখেছেন—

কাদম্বরীর সেই মৃগয়া-বর্ণনা থেকে অনেকটা আমি [বলুকে] তর্জমা করতে বলে দিয়েছি। পাখিরাও যে কতটা আমাদেরই মতো—একটা জায়গা আছে যেখানে তাতে আমাতে প্রভেদ নেই—পাখির সন্তানবাৎসল্য প্রাণের মমতা ঠিক আমাদেরই মতো—এইটে বাণভট্ট আপন করুণ কল্পনাশক্তির দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করেছেন—সেই touch of nature makes the whole world kin!

—'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১১৭, ১৮৯০ মার্চ ২২

এই উদ্‌ধৃতির ভাষা থেকে বোঝা যায়, বাণভট্টের 'করুণ কল্পনাশক্তি'কে অনুভব করে কত আন্তরিকতার সঙ্গে কবি তাকে সমর্থন করেছেন। আবার কবিকর্তৃক পরিমার্জিত ও প্রকাশিত বলেন্দ্রনাথের উক্ত প্রবন্ধটিতে (সাধনা ১৩০০ চৈত্র) কবির এই মনোভাবের সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। উক্ত প্রবন্ধে তিনি কবির নির্দেশমতো মৃগয়াদৃশ্যের অনুবাদ যুক্ত করে সে সম্বন্ধে লেখেন—

পক্ষিকুলের অন্তরের মধ্যে তিনি কেমন প্রবেশ করিয়াছেন। কেমন সহৃদয়তার সহিত সুন্দররূপে তিনি দেখাইয়াছেন যে, আমাদের সন্তান আমাদের নিকট যেমন প্রাণাধিক প্রিয়, পাখীর সন্তানও পাখীর কাছে ঠিক সেইরূপ। কবি যখন দেখাইয়া দেন, আমাদের জননীর বাৎসল্য, পিতার স্নেহ, জীবনের মমতা, ঐ ভাষাহীন পাখীর নীড়ের মধ্যেও আছে, তখন সেই "Touch of nature makes the whole world kin."

—'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী' ১৩৬৪ সাহিত্যপরিষৎ, চিত্র ও কাব্য পশুপ্রীতি

কবি স্বয়ং কাদম্বরী কাব্যের চিত্রধর্মিতার পরিচয় দিতে গিয়ে এই মৃগয়াদৃশ্যের উল্লেখ না করে পারেন নি। শবরহস্তে নিপীড়িত পাখিগুলির অসহায়ত্বের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন—

ইহার মধ্যে কেবল বর্ণবিন্যাস নহে, তাহার সঙ্গে করুণা মাখানো রহিয়াছে, অথচ

কবি তাহা স্পষ্টত হাহুতাশ করিয়া বর্ণনা করেন নাই। বর্ণনার মধ্যে কেবল তুলনাগুলির সৌকুমার্যে তাহা আপনি ফুটিয়া উঠিযাছে।

—'প্রাচীন সাহিত্য', কাদম্বরী চিত্র ১৩০৬ মাঘ

জীবপ্রকৃতির প্রতি কালিদাস-ভবভূতির সহানুভূতিতে যিনি উচ্ছ্বসিত, দুর্বল পক্ষিকুলের প্রতি বাণভট্টের এই সমবেদনায় তিনি যে অভিভূত হবেন তার আব বিচিত্র কি। মানবেতর জীবের প্রতি বাণভট্টেব সহজাত করুণা কবি অন্যত্রও লক্ষ করেছেন। কালিকাপূজার বীভৎস ও রুধিরাক্ত আচাব-অনুষ্ঠানের প্রতি বাণভট্টেব বিতৃষ্ণা দেখে কবি মন্তব্য করেছেন—

এক সময এই দেবীপূজা যে ভদ্রসমাজের বহির্ভূত ছিল তাহা কাদম্বরীতে দেখা যায। মহাশ্বেতাকে শিবমন্দিরেই দেখি, কিন্তু কবি ঘৃণাব সহিত অনার্য শবরেব পূজা-পদ্ধতিব যে বর্ণনা কবিযাছেন তাহাতে বুঝা যায়, পশুরুধিবেব দ্বাবা দেবতার্চন ও মাংসদ্বাবা বলিকর্ম তখন ভদ্রমণ্ডলীব কাছে নিন্দিত ছিল।

— সাহিত্য' বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ শ্রাবণ

এখানে বাণভট্টের সহজ করুণা ও রুচিবোধেব সঙ্গে সঙ্গে ওই যুগের সামাজিক রীতি-নীতির চিত্রটিও কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেই যুগে কালিকাদেবীর পূজা-প্রতিষ্ঠা ও আধিপত্যস্থাপন যে অনার্যদেব মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, সেই ঐতিহাসিক তথ্যেব সূত্রটুকুর প্রতিও কবি ইঙ্গিত করেছেন। এই অনুসন্ধান তাঁব অসাধাবণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও এই গ্রন্থেব উপর তাঁর বিশেষ অধিকারেব পবিচয দেয।

৩

কাদম্বরী কাব্যে বর্ণিত তপোবনাশ্রমের চিত্রটিও এ কাব্যের প্রতি কবিব আকর্ষণেব অন্যতম প্রধান কারণ। প্রথম জীবনে সৌন্দর্যসন্ধানী কবি কাদম্বরীর তপোবন-বর্ণনা থেকে তাব অপূর্ব চিত্রসৌন্দর্য উপভোগ কবেছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁব মন্তব্য হল—

দিনশেষে তপোবনের রক্তচক্ষু ধেনুটি যেমন গোষ্ঠে ফিবিযা আসে, কপিলবর্ণা সন্ধ্যা তেমনি তপোবনে অবতীর্ণা। কপিলা ধেনুব সহিত সন্ধ্যাব রঙেব তুলনা করিতে গিযা সন্ধ্যার সমস্ত শান্তি এবং শ্রান্তি এবং ধূসরচ্ছাযা কবি মুহূর্তেই মনেব মধ্যে ঘনাইযা তুলিযাছেন।

—'প্রাচীন সাহিত্য', কাদম্বরী চিত্র ১৩০৬ মাঘ

এখানে কবি গোষ্ঠে-ফেরা তপোবনধেনুর সঙ্গে পাটলচ্ছবি গোধূলির উপমার আশ্চর্য ভাবব্যক্তির প্রশংসা করেছেন। পরবর্তী কালে তপোবনের এই সৌন্দর্য উপভোগের

সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তার অন্তর্নিহিত ভাবসত্যেরও অনুসন্ধান করতে দেখা গেছে। তাঁর বিখ্যাত তপোবন প্রবন্ধে বাল্মীকি-কালিদাস-ভবভূতির সঙ্গে সঙ্গে বাণভট্ট-বর্ণিত তপোবনকে স্মরণ করে তিনি বলেন—

> কাদম্বরীতে তপোবনের বর্ণনায় কবি লিখছেন—সেখানে বাতাসে লতাগুলি মাথা নত করে প্রণাম করছে, গাছগুলি ফুল ছড়িয়ে পূজা করছে, কুটিরের অঙ্গনে শ্যামাক ধান শুকোবার জন্যে মেলে দেওয়া আছে, সেখানে আমলক লবলী লবঙ্গ কদলী বদরী প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করা হয়েছে, বটুদের অধ্যয়নে বনভূমি মুখরিত, বাচাল শুকেরা অনবরত-শ্রবণের দ্বারা অভ্যস্ত আহুতিমন্ত্র উচ্চারণ করছে, অরণ্যকুক্কুটেরা বৈশ্বদেববলিপিণ্ড আহার করছে, নিকটে জলাশয় থেকে কলহংস-শাবকেরা এসে নীবারবলি খেয়ে যাচ্ছে হরিণীরা জিহ্বাপল্লব দিয়ে মুনিবালকদের লেহন করছে।
>
> এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে তরুলতা জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ দূর করে তপোবন প্রকাশ পাচ্ছে, এই পুরানো কথাই আমাদের দেশে বরাবর চলে এসেছে।
>
> — শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ

এই শান্তরসাস্পদ তপোবনের বর্ণনার মধ্যে কবি যে সত্য অনুস্যূত দেখেছিলেন তা হল চেতন অচেতন সকলের সঙ্গেই মানুষের আত্মীয়বন্ধনের উদার সত্য। তাই বিশ্ব-প্রকৃতির যোগে আশ্রম-বালকেরা যে সত্যশিক্ষা পেত তাকে কবি আদর্শ শিক্ষা বলে মনে করতেন। তার শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তিনি এই আদর্শই অনুসরণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। পরিণত বয়সেও তাঁর এই মনোভাব অপরিবর্তিত ছিল। শেষ বয়সে তিনি লেখেন—

> মনে পড়ছে কাদম্বরীতে একটি বর্ণনা তপোবনে আসছে সন্ধ্যা, গোষ্ঠে-ফিরে-আসা পাটল হোমধেনুটির মতো। শুনে মনে জাগে, সেখানে গোরু-চরানো, গোদোহন, সমিধ-কুশ-আহরণ, অতিথিপরিচর্যা, যজ্ঞবেদীরচনা আশ্রম-বালক-বালিকাদের দিনকৃত্য। এই-সব কর্মযোগের দ্বারা তপোবনের সঙ্গে নিরন্তর মিলে যায় তাদের নিত্যপ্রবাহিত জীবনের ধারা। আমাদের আশ্রমে সতত-উদ্যমশীল এই কর্মসহযোগিতা কামনা করছি।
>
> — শিক্ষা', আশ্রমের শিক্ষা ১৩৪৩ আষাঢ়

'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' গ্রন্থের (১৩৪৮) প্রথম অধ্যায়ে এই প্রবন্ধটিই ঈষৎ পরিবর্তিত ভাষায় সংকলিত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় কাদম্বরীতে বর্ণিত

তপোবনের শোভার সঙ্গে সঙ্গে তার কর্মময় শিক্ষার রূপটিও কবি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

৪

কাদম্বরী কাব্যের বিষয়বস্তুর চেয়ে তার প্রকাশভঙ্গির সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল বেশি। প্রথম জীবনে কাব্যের পরিচয় প্রসঙ্গে কবি বলেছিলেন—

রাজসভার সংস্কৃত কাব্যগুলিও ঘটনাবিন্যাসের জন্য তত অধিক ব্যগ্র হয় না; তাহার বাগ্‌বিস্তার উপমাকৌশল বর্ণনানৈপুণ্য রাজসভাকে প্রত্যেক পদক্ষেপে চমৎকৃত করিতে থাকে।

—'প্রাচীন সাহিত্য', কাদম্বরী চিত্র ১৩০৬ মাঘ

কবির মতে এ বিষয়ে 'কাদম্বরী সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে'। অপূর্ব বর্ণনা-নৈপুণ্যে কাদম্বরীকার এই গ্রন্থে একের পর এক চিত্র সাজিয়ে গেছেন। তাতে কাহিনীর গতি ব্যাহত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ এই চিত্রগুলি এত মনোরম যে কাহিনীর জন্য রসিক পাঠক কিছুমাত্র ব্যস্ততা অনুভব করে না। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই অপূর্ব চিত্রগুলির কয়েকটির সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করেছেন। কাদম্বরীর প্রথম চিত্রটির বর্ণনা দিয়ে কবি বলেছেন—

তখন ভগবান মরীচিমালী অধিক দূরে উঠেন নাই; নূতন পদ্মগুলির পত্রপুট একটু খুলিয়া গিয়াছে, আর তাঁহার পাটল আভাটি কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত হইয়াছে।

এই বলিয়া বর্ণনা আরম্ভ হইল। এই বর্ণনার আর-কোনো উদ্দেশ্য নাই, কেবল শ্রোতার চক্ষে একটি কোমল রঙ মাখাইয়া দেওয়া এবং তাহার সর্বাঙ্গে একটি স্নিগ্ধ সুগন্ধ ব্যজন বুলাইয়া দেওয়া।…সকালের বর্ণনায়…কেবলমাত্র তুলনাচ্ছলে উন্মুক্তপ্রায় নবপদ্মপুটের সুকোমল আভাসটুকুর বিকাশ করিয়া মায়াবী চিত্রকর সমস্ত প্রভাতকে সৌকুমার্যে এবং সুস্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন।… এমন বর্ণসৌন্দর্যবিকাশের ক্ষমতা সংস্কৃত কোনো কবি দেখাইতে পারেন নাই।… রঙ ফলাইতে কবির কী আনন্দ! যেন শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। সে রঙ শুধু চিত্রপটের রঙ নহে, তাহাতে কবিত্বের রঙ, ভাবের রঙ আছে। অর্থাৎ কোন্ জিনিসের কী রঙ শুধু সেই বর্ণনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে হৃদয়ের অংশ আছে।

কবির মতে সেই কারণেই বাণভট্টের চিত্রগুলি এমন হৃদয়গ্রাহী। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ব্যাধহস্তে পতিত সুকুমার শুকশিশুগুলির করুণ চিত্র স্মরণ করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে। তেমনি হোমধেনুর সঙ্গে সন্ধ্যার উপমার

যে আশ্চর্য সৌন্দর্য তিনি বর্ণনা করেছেন, তার দ্বারাও কবির মন্তব্য সমর্থিত হয়। এই জাতীয় চিত্র এ গ্রন্থে অজস্র। তাই এ সম্বন্ধে কবির শেষ সিদ্ধান্ত হল—'সংস্কৃত কবিদের মধ্যে চিত্রাঙ্কনে বাণভট্টের সমতুল্য কেহ নাই, এ কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি'।

বাণভট্ট ভাষার তুলিকায় এ কাব্যের চিত্রগুলি এঁকেছেন এবং তাঁর ভাষার স্বর-বৈচিত্র্যে, ধ্বনিগাম্ভীর্যে ও ভাবের বিশাল বিস্তারে রাজকীয় গরিমায় কাদম্বরী কাব্যের চিত্রগুলি জেগে উঠেছে। সংস্কৃত ভাষা স্বভাবতঃই মহিমময়।—

> সেই স্বভাববিপুল ভাষা কাদম্বরীতে পূর্ণবর্ষার নদীর মতো আবর্তে তরঙ্গে গর্জনে আলোকচ্ছটায় বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে।
>
> —'প্রাচীন সাহিত্য', কাদম্বরী চিত্র ১৩০৬ মাঘ

এই ভাষা সর্বতোভাবে এই গ্রন্থের উপযোগী সন্দেহ নেই। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তার উপযোগিতার প্রশ্ন সংশয়াতীত নয়। তাই এই জাতীয় ভাষার ভূয়সী প্রশংসা করেও কবি বলতে বাধ্য হয়েছেন—

> দুর্ভাগ্যক্রমে সংস্কৃত গদ্য সর্বদা-ব্যবহারের জন্য নিযুক্ত ছিল না, মেদস্ফীত বিলাসীর ন্যায় তাহার সমাসবহুল বিপুলায়তন দেখিয়া সহজেই বোধ হয় সর্বদা চলা-ফেরার জন্য সে হয় নাই, বড়ো বড়ো টীকাকার ভাষ্যকার পণ্ডিত বাহকগণ তাহাকে কাঁধে করিয়া না চলিলে তাহার চলা অসাধ্য।
>
> —পূর্ববৎ

এই ধরণের গ্রন্থ যে আজকের যুগে অচল, সে সত্য কবি অস্বীকার করেন না। তাই তাঁকে লিখতে হয়—'বাংলার সকল গল্পই যদি বাসবদত্তা-কাদম্বরীর ছাঁচে ঢালা হত, তা হলে জাতে ঠেলার ভয় দেখিয়ে গল্প পড়াতে হত' ('বিচিত্র প্রবন্ধ', সোনার কাঠি ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ)। তাঁর 'শেষরক্ষা' নাটকের (১৩৩৫) ইন্দুমতীও দেখি কাদম্বরীর প্রতি সকৌতুক কটাক্ষে মন্তব্য করেছে—'বিনোদবিহারী নামটা বাণভট্টের কাদম্বরীতেই চলে, আঠারো-গণ্ডি সমাসের মধ্যে' (চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)। আর শেষ জীবনে 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের সাহিত্যবিচার প্রবন্ধে (১৩৩৬ কার্তিক) কবি কাদম্বরীর নজির তুলে আধুনিক যুগে ওই জাতীয় গ্রন্থরচনার অনুপযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এ সম্বন্ধে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা দুটি পত্রে। প্রথম পত্রে তিনি বলেছেন—

> সংস্কৃত সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষার একটি প্রধান সম্পদ্ ধ্বনিগৌরব। সেই কারণে কোনো কৌশলী লেখক যদি পাঠকের কান অভিভূত করে ধ্বনিমন্ত্রিত শব্দ বিস্তার

করে চলে তবে অনেক ক্ষেত্রে তার অপরিমিতি নিয়ে পাঠক নালিশ উপস্থিত করে না। তার একটি দৃষ্টান্ত কাদম্বরী। শূদ্রক রাজার অত্যুক্তিবহুল বর্ণনা চললো··· বাণীর প্রগল্‌ভতায় বীণাপাণি হার মেনে চুপ করে গেলেন।···বন্যা বইল বর্ণনার, তটের রেখা লুপ্ত হয়ে গেল, পাঠক বললে, বেশ লাগছে। এই বেশ লাগা পরিমাণ মানে না। এমন স্থলে রচনার সমগ্রতাটা বাহন হয়ে দাসত্ব করে তার উপকরণের, সে আপন পূর্ণতার মাহাত্ম্যকে অকাতরে চাপা পড়তে দেয় আপন স্তূপাকার দ্রব্যসম্ভারের তলায়। ·সংস্কৃত সাহিত্যে অভিমানী কোনো দুঃসাহসিক আজ কাদম্বীর অনুসরণে বাংলায় গল্প লেখবার চেষ্টা করবেই না।—তার কারণ ওর মধ্যে শিল্পের সদাচার নেই।

—'সংগীতচিন্তা', সুর ও সংগতি : পত্র-৮, ১৯৩৫ মে ১৫

কাদম্বরী সম্বন্ধে তাঁর এই জাতীয় মনোভাব তাঁকে বিশেষ বিচলিত করেছিল। তাই পরের দিন পত্র লিখতে গিয়ে পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে কবি লেখেন—

সংস্কৃত সাহিত্যে কাদম্বরী আমার অত্যন্ত প্রিয় জিনিস—ওর বহুল নৈহারিকতার মধ্যে মধ্যে রসের জ্যোতিষ্ক নিবিড় হয়ে ফুটে উঠেছে। মনে আছে বহুকাল পূর্বে একদা আমার শ্রোত্রী সখীদের পড়ে শুনিয়েছি এবং থেকে থেকে চমকে উঠেছি আনন্দে। সেইজন্যই আমার বড়ো দুঃখের নালিশ এই যে, এর মধ্যে আর্টের সংগতি রইল না কেন?

তবু আধুনিক কালের ব্যাবহারিক জগতেও কাদম্বরীর প্রয়োজন যে একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায় নি, তার প্রতি রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কবি দেখেছেন, এ কাব্যের শব্দসম্পদ্ অতুলনীয়। তাই তিনি সেই 'বড়ো সুনিপুণ, বড়ো সুশ্রাব্য, কৌশলে মাধুর্যে গাম্ভীর্যে ধ্বনিতে ও প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্যমাণ' ভাষার শব্দসম্পদ্‌কে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ করে তোলার কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন। বাংলা পরিভাষা রচনার প্রয়োজনেও কবি কাদম্বরীর শব্দভাণ্ডারের শরণ নিয়েছিলেন। পরবর্তী ভাষা, ছন্দ ও অলংকার অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

পরিশেষে এ কথা বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরী কাব্যকে একটি চিত্রশালার সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য হল, এই কাব্যের চিত্রগুলি 'প্রচুর কারুকার্য-বিশিষ্ট বহুবিস্তৃত ভাষার সোনার ফ্রেম-দেওয়া—ফ্রেম-সমেত সেই ছবিগুলির সৌন্দর্য-আস্বাদনে যে বঞ্চিত সে দুর্ভাগ্য'। কিন্তু আধুনিক ব্যস্ততার কালে মূল কাদম্বরী পাঠের সৌভাগ্য থেকে অধিকাংশ পাঠককেই বঞ্চিত থাকতে হয়। তবে এ কথা বোধ করি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কাদম্বরী চিত্র প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মূল গ্রন্থের

চিত্রগুলির যে প্রতিভাস এঁকেছেন, তার ভাষার সৌন্দর্যকে যেভাবে প্রতিফলিত করেছেন, তার উপভোগে যে বঞ্চিত সে-ই প্রকৃত দুর্ভাগ্য।

ভর্তৃহরি

গীতিকবিতা তথা নীতিকবিতা—এই উভয় দিকেই সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ এবং এই দুই ক্ষেত্রে ভর্তৃহরির (আনু খ্রীঃ ৬৫০) শতকগুলি বিশেষ উচ্চমানের অধিকারী, সন্দেহ নেই। কবি ভর্তৃহরির শতকগুলি তিনভাগে বিভক্ত—শৃঙ্গারশতক, বৈরাগ্য-শতক ও নীতিশতক। তবে পণ্ডিতেরা মনে করেন বৈরাগ্য ও নীতিশতকের সব শ্লোক ভর্তৃহরির রচিত নয়, তাতে অন্যান্য কবির রচনাও সংকলিত আছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় 'শকুন্তলা' নাটকের 'ভবন্তি নম্রাস্তরব.' ইত্যাদি শ্লোকটি (৫।১৩) নীতিশতকের পরোপকার পদ্ধতির (১১শ শ্লোক) মধ্যে স্থান পেয়েছে। তবে শৃঙ্গারশতকের কথা স্বতন্ত্র। ঐতিহাসিক Keith মনে করেন এটি কোনো একজন মাত্র কবিরই রচনা। কারণ এতে যে বিশেষ জীবনদর্শন প্রকাশ পেয়েছে তা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সূচক। অবশ্য ভারতীয় ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত বা নূতন কথা এতে নেই। তবু—

> Some weight must certainly be allowed to the fact that the Indian tradition is consistent, and that it cannot be explained as in the case of the Cānakya Nitica.tra by the fame of a name, for Bhartrhari stands isolated.
>
> —'A History of Sanskrit Literature' 1948 ch VIII p 177

ভর্তৃহরির শতকগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবেই পরিচিত ছিলেন। কবিপঠিত হেবর‍লিনের 'কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থে এই শতকগুলি পেন্‌সিলে নানাভাবে চিহ্নিত আছে। তবে এই চিহ্নগুলি সবই কবিকৃত কি না সে বিষয়ে নিঃসংশয়ে কিছু বলার উপায় নেই।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিভিন্ন প্রসঙ্গে একাধিকবার ভর্তৃহরির নীতিশতক বিশেষতঃ বৈরাগ্যশতক থেকে শ্লোক উদ্‌ধৃত হয়েছে। কিন্তু শৃঙ্গারশতক থেকে কোনো শ্লোক কবি ব্যবহার করেন নি। পরবর্তী অমরুশতক-এর আলোচনাপ্রসঙ্গে এর কারণ নির্ণয় করার চেষ্টা করা যাবে।

নীতিশতক থেকে রবীন্দ্রনাথ পূর্বোদ্‌ধৃত 'ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ' ইত্যাদি শ্লোকের ভাবটি তাঁর একটি রচনায় ('বিবিধ প্রসঙ্গ', কিস্তি- ওয়ালা ১২৮৮ শ্রাবণ) ব্যবহার করেন। তবে শকুন্তলা বা নীতিশতক কোন্ গ্রন্থ থেকে কবি শ্লোকটি স্মরণ

করেন তা জানবার উপায় নেই।

বৈরাগ্যশতক থেকে কবি তিনটি শ্লোক ব্যবহার করেন। এই তিনটি ছাড়া আর একটি শ্লোকের (নিত্যবস্তুবিচার-৭৩) শেষ পঙ্‌ক্তির ভাবার্থ ('সন্দীপ্তে ভবনে তু কূপখননং প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ) কবির একটি প্রবন্ধে উল্লিখিত হতে দেখা গেছে ('কালান্তর', লোকহিত ১।২১ ভাদ্র)। তবে ঐ মর্মে প্রচলিত আর একটি শ্লোকের সঙ্গে কবির পরিচয়েরও প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং এটিও কোন্ আকর গ্রন্থ থেকে কবি সংগ্রহ করেছিলেন তা বলা কঠিন। পরবর্তী হেরবলিনের কাব্যসংগ্রহ অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অন্য শ্লোক তিনটি যে বিশেষভাবেই তাঁর স্মৃতিকে অধিকার করেছিল, শ্লোকগুলির পৌনঃপুনিক উদ্ধৃতি থেকে তা বোঝা যায়। তবে এগুলির বক্তব্যের প্রতি যে কবির সমর্থন সর্বদা পাওয়া যায় তা নয়। প্রথমতঃ ধরা যাক 'বৈরাগ্যমেবাভয়ং' ইত্যাদি শ্লোকখণ্ডের কথা (ভোগৈশ্বর্যবর্ণন-২৮)। এ সম্বন্ধে কবি লেখেন—

> মানুষের লোকালয় মানুষের বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই লোকালয়ের দাবি মিটিয়ে সময় পাওয়া যায় না, বিশ্বের নিমন্ত্রণ আর রাখতেই পারি নে। বিশ্বকে মানুষ যে পরিমাণে যতখানি বাদ দিয়ে চলে তার লোকালয়ের তাপ এবং কলুষ সেই পরিমাণে ততখানি বেড়ে ওঠে। সেইজন্যই ক্ষণে ক্ষণে মানুষের একেবারে উলটো দিকে টান আসে। সে বলে, 'বৈরাগ্যমেবাভয়ং'—বৈরাগ্যের কোনো বালাই নেই। সে বলে বসে, সংসার কারাগার, মুক্তি খুঁজতে, শান্তি খুঁজতে সে বনে পর্বতে সমুদ্রতীরে ছুটে যায়। মানুষ সংসারের সঙ্গে বিশ্বের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে বলেই বড়ো করে প্রাণের নিঃশ্বাস নেবার জন্যে তাকে সংসার ছেড়ে বিশ্বের দিকে যেতে হয়। এতবড়ো অদ্ভুত কথা তাই মানুষকে বলতে হয়েছে—মানুষের মুক্তির রাস্তা মানুষের কাছ থেকে দূরে।
>
> —'জাপানযাত্রী', অধ্যায় ১০, ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ

এখানে কবি বৈরাগ্যের ব্যাখ্যা করে বলেছেন বিশ্বের সঙ্গে মানুষের বিরোধের নিরসন ঘটাতে না পেরে মানুষ ভেবেছে লোকালয় ত্যাগ করলেই বুঝি সে সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু কবি জানেন যে তা সম্ভব নয়। তাই গীতার নিষ্কাম কর্মবাদের সহায়তায় এই বৈরাগ্যবাদের নিষ্ফলতা সপ্রমাণ করেছেন। তিনি বলেন, মানুষ যখন সকাম কর্ম করে তখন সে কামনার অধীনে চাকরি করে মাত্র। তাই—

> কাজ তার নিজের ভিতর থেকে নিজে যখন কিছুই রস জোগায় না, সম্পূর্ণ বাইরে থেকেই যখন আপন দাম নেয়, তখনই মানুষকে সে অপমান করে।

সেই অপমান থেকে বাঁচবার জন্যই—

বিদ্রোহী মানুষ বলে বসে, বৈরাগ্যমেবাভয়ম্। অর্থাৎ, এতই কম খাব, কম পরব, রৌদ্রবৃষ্টি এমন করে সহ্য করতে শিখব, দাসত্বে প্রবৃত্ত করবার জন্যে প্রকৃতি আমাদের জন্যে যতরকম কানমলার ব্যবস্থা করেছে সেগুলোকে এতটা এড়িয়ে চলব যে, কর্মের দায় অত্যন্ত হালকা হয়ে যাবে। কিন্তু, প্রকৃতির কাজে শুধু কানমলার তাড়া নেই, সেইসঙ্গে রসের জোগান আছে। সেই লোভের দিক থেকে আমাদের মনে জন্মায় ভোগের ইচ্ছা। বিদ্রোহী মানুষ বলে, ওই ভোগের ইচ্ছাটা প্রকৃতির চাতুরী, ওইটেই মোহ, ওটাকে তাড়াও, বলো, বৈরাগ্যমেবাভয়ম্—মানব না দুঃখ, চাইব না সুখ।

দুচারজন মানুষ এমনতরো স্পর্ধা করে ঘরবাড়ি ছেড়ে বনে জঙ্গলে ফলমূল খেয়ে কাটাতে পারে, কিন্তু সব মানুষই যদি এই পন্থা নেয় তাহলে বৈরাগ্য নিয়েই পরস্পর লড়াই বেধে যাবে।

—'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ৫ ১৯২৭ জুলাই ২৮

এর কিছু দিন পরে আর-এক পত্রে কবি আমাদের দেশে এই বৈরাগ্য যে কী আকারে দেখা দিয়েছে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেন—

শক্তিসঞ্চয় যেখানে অল্প সেখানে আপনিই বৈরাগ্য এসে পড়ে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, নীতির ক্ষেত্রে যখন আত্মশক্তির ক্লান্তি আসে তখন বৈরাগ্য দেখা দেয়, সেই বৈরাগ্যের অযত্নের ক্ষেত্রেই ঋষিবাক্য, বেদবাক্য, গুরুবাক্য, মহাত্মাদের অনুশাসন, আগাছার জঙ্গলের মতো জেগে ওঠে—নিত্যপ্রয়াসসাধ্য জ্ঞানসাধনার পথ রুদ্ধ করে ফেলে। বৈরাগ্যের দেশে শিল্পকলাতেও মানুষ অন্ধ পুনরাবৃত্তির প্রদক্ষিণ-পথে চলে, এগোয় না, কেবলই ঘোরে। নিজের শক্তি সম্বন্ধে বৈরাগ্য, নিজের 'পরে দাবি যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া। দাবি স্বীকার করায় দুঃখ আছে, বিপদ আছে, অতএব—বৈরাগ্যমেবাভয়ম্। অর্থাৎ, বৈনাশ্যমেবাভয়ম্।

—জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ৯ ১৯২৭ আগস্ট ৩০

এই উক্তির মধ্যে বৈরাগ্য সম্বন্ধে কবির চরম মতটি প্রকাশ পেয়েছে।

বৈরাগ্যের প্রতি এই বিমুখতা বৈরাগ্যশতকের আর-একটি শ্লোককে অবলম্বন করে কবি স্পষ্টতর রূপে ব্যক্ত করেছেন। ঐহিক জগতের তুচ্ছতা প্রতিপন্ন করে ভর্তৃহরি ক্ষমতালোভীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন 'মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ' (অবধূতচর্যা-৯৬)। রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করতে পারেন নি। জীবনরসিক কবির মতে—

আমরা যাকে ভালোবাসি, অন্য লোকের কাছে সে একটি দৃশ্যমান আকারবিশিষ্ট মানুষ মাত্র—কিন্তু আমার কাছে সে একটি অপরূপ ভাবের জ্যোতিতে দীপ্যমান, আমার কাছে সে অসীম অনন্ত।…পৃথিবীর সৌন্দর্য যে দেখতে পায় না পৃথিবী তার কাছে: মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ। কিন্তু সেই জলরেখাবলয়িত মৃৎপিণ্ডই আমার কাছে পৃথিবী।

—'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১৫৯, ১৮৯৪ অক্টোবর ৫

কবি বলতে চান, স্থূল দৃষ্টিতে যা দেখা যায়, ভাবের দৃষ্টিতে দেখা যায় তার থেকে অনেক বেশি। সেই 'বেশি' দেখাই প্রত্যক্ষ করা—সেইটিই প্রকৃত সত্য দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিই গভীরতর ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়ে কবির হাতে আধ্যাত্মিকতার স্তরে উন্নীত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যথার্থই অনুভব করেছেন—

এই সীমার মধ্যেই, এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই, অনন্তের যে প্রকাশ তাহাই আমার কাছে অসীম বিস্ময়াবহ।…এই জগৎ তাহার অণুতে পরমাণুতে, তাহার প্রত্যেক ধূলিকণায় আশ্চর্য। আমাদের পিতামহগণ যে অগ্নিবায়ু-সূর্যচন্দ্র-মেঘবিদ্যুৎকে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা যে সমস্ত জীবন এই অচিন্তনীয় বিশ্বমহিমার মধ্য দিয়া সজীব ভক্তি ও বিস্ময় লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন…ইহা আমার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে। সূর্যকে যাহারা অগ্নিপিণ্ড বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায় তাহারা যেন জানে যে, অগ্নি কাহাকে বলে! পৃথিবীকে যাহারা 'জলরেখাবলয়িত' মাটির গোলা বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহারা যেন মনে করে যে, জলকে জল বলিলেই সমস্ত জল বোঝা গেল এবং মাটিকে মাটি বলিলেই সে মাটি হইয়া যায়!

—'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ১, ১৩১১

কবির এই অনুভূতিই শেষ পর্যন্ত অখণ্ড অনন্ত সত্তার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। তখন তিনি সুস্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন—

যখন দেখি শীতকালের পদ্মার নিস্তরঙ্গ নীলকান্ত জলস্রোত পীতাভ বালুতটের নিঃশব্দ নির্জনতার মধ্য দিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতেছে—তখন কী বলিব, এ কী হইতেছে।…সেই বচনের অতীত পরম পদার্থকে, সেই অপরূপ রূপকে, সেই ধ্বনিহীন সংগীতকে, এই জলের ধারা কেমন করিয়া এত গভীরভাবে ব্যক্ত করিতেছে। এ তো কেবলমাত্র জল ও মাটি—মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ—কিন্তু, যাহা প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে তাহা কী? তাহাই আনন্দরূপমমৃতম্, তাহাই আনন্দের অমৃতরূপ।

—'ধর্ম', দুঃখ ১৩১৪ ফাল্গুন

দেখা গেল, ভর্তৃহরি যে কথা বলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা সমর্থন তো করেনই নি বরং ঐ শ্লোকাংশটুকুকে উপলক্ষ করে তিনি তাঁর কবিহৃদয়ের এক নিগূঢ় অনুভূতির কথাই ব্যক্ত করেছেন, শেষ পর্যন্ত যা তাঁকে পরম সত্তার এক আশ্চর্য উপলব্ধিতে পৌঁছে দিয়েছে।

সুতরাং সাধারণ প্রচলিত অর্থে রবীন্দ্রনাথ জীবনবিমুখ বৈরাগী ছিলেন না। এই পৃথিবী, এই বিশ্বপ্রকৃতি, সব কিছুর প্রতি ছিল তাঁর পরম অনুরাগের, হৃদ্য প্রীতির সম্বন্ধ। তবু সব কিছুর ঊর্ধ্বে তাঁর মন ছিল নির্মোহ ও অনাসক্ত। স্বেচ্ছাবৃত মায়ায় তিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই জীবনের রূপ রস গন্ধ উপভোগ করেছেন, কিন্তু তাতে বদ্ধ হন নি। তাই ভর্তৃহরির বৈরাগ্যশতক (যতিনৃপতি সংবাদ ৬৬) যখন বলে—

প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘাস্ততঃ কিং
ন্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্।
সম্পাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈস্ততঃ কিং
কল্পস্থিতাস্তনুভৃতাং তনবস্ততঃ কিম্ ॥

তখন সেখানে পাই কবির পূর্ণ সমর্থন। এই শ্লোকটি কবির মনকে যে কতদূর অধিকার করেছিল এবং কতবার কত বিভিন্ন প্রসঙ্গে কবি এটি স্মরণ করেছিলেন, পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। কবি প্রথমে তার অনুবাদ ও তার ভাষ্য করেছিলেন এই ভাবে।—

> সকলকাম্যফলপ্রদ লক্ষ্মীকেই নাহয় লাভ করিলে, তাহাতেই বা কী, শত্রুদের মাথার উপরেই নাহয় পা রাখিলে, তাহাতেই বা কী, নাহয় বিভবের বলে বহু সুহৃদ্ সংগ্রহ করিলে, তাহাতেই বা কী, দেহধারীদের দেহগুলিকে না হয় কল্পকাল বাঁচাইয়া রাখিলে, তাহাতেই বা কী।
>
> অর্থাৎ, এই-সমস্ত কামনার বিষয়ের দ্বারা মানুষকে খাটো করিয়া দেখিলে চলিবে না, মানুষ ইহার চেয়েও বড়ো। মানুষের সেই যে সকলের চেয়ে বড়ো সত্য, যাহা অনাদি হইতে অনন্তের অভিমুখ, তাহাকে মনে রাখিলে তবেই তাহার জীবনকে সজ্ঞানভাবে সম্পূর্ণতার পথে চালনা করিবার উপায় করা যাইতে পারে। কিন্তু মানুষকে যদি সংসারের জীব বলিয়াই মানি, তবে তাহাকে সংসারের প্রয়োজনের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া, ছোটো করিয়া ছাঁটিয়া কাটিয়া লই।
>
> —'ধর্ম', ততঃ কিম্ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ

এখানে মানুষের আত্মাকে তিনি সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন, উপকরণের বহুলতার দ্বারা তাকে আচ্ছন্ন করেন নি। তাই ঐশ্বর্যমদমত্ত আধুনিক সভ্যতা মনুষ্যত্বের মর্যাদা না

দেওয়ায় তার পরিণাম চিন্তা করে কবি শঙ্কিত হন। পাশ্চাত্যের বস্তুগত সভ্যতার মধ্যে কবি ঐশ্বর্যের বহুলত্ব দেখেছেন, কিন্তু তাতে কল্যাণের শ্রী দেখেন নি। তাই তাঁকে বলতে হয়েছিল—

> আরো চাই—এ বাণীতে তো সৃষ্টির সুর লাগে না। তাই সেদিন এই ভ্রুকুটিকুটিল অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের সামনে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিক্কারের সঙ্গে বলেছে : ততঃ কিম্!
>
> —'কালান্তর', শিক্ষার মিলন ১৩২৮

সাহিত্যসৃষ্টির প্রসঙ্গেও কবি এই শ্লোকাংশটি স্মরণ করেন। আধুনিক নামধারী যে সাহিত্য বলছে 'আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ' তাকে কবি সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি দেখেছেন 'মত্ততার আত্মবিস্মৃতিতে' উল্লাস জাগতে পারে, তার অক্লান্ত উত্তেজনায়—মাধুর্যহীন রূঢ়তায় একরকম শক্তির বিকাশ হতে পারে। 'এই পালোয়ানির মাতামাতিকে বাহাদুরি' দিলেও কবির মনে প্রশ্ন জাগে—'কিন্তু ততঃ কিম্! এ পৌরুষ চিৎপুর রাস্তার, অমরপুরীর সাহিত্যকলার নয়' ('সাহিত্যের পথে', সাহিত্যধর্ম ১৩৩৪ শ্রাবণ)।

উপরের উদ্ধৃতিগুলির থেকে বোঝা গেল, জীবনের প্রতি যে উদাসীন বৈরাগ্যে ভর্তৃহরি বলেছেন, 'বৈরাগ্যমেবাভয়ম্' তাকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেন নি। কিন্তু ঐহিক জীবনের তুচ্ছ উপকরণের মোহে মানুষ যখন জীবনের বৃহত্তর সত্যকে ভুলে যায়, বিষয়কামনার অধীন হয়ে আত্মার স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়, তখন ভর্তৃহরির সুরে সুর মিলিয়েই কবি তাকে ধিক্কার দেন। কবি জীবনকে, তার ভোগরসকে অস্বীকার করেন না। কিন্তু সেইটিকেই একান্ত করে তুলতে তিনি কুণ্ঠিত। তিনি বলতে চান—'সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অনুরাগকেই বীর্যবান ও বিশুদ্ধ করে' ('আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৫, ১৩৩৮ পৌষ)। কবির শেষ বয়সের এই জীবনদর্শনটিকে বিশেষভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বলা যায়। প্রথম জীবনে মহাভারত এবং কালিদাসের কাব্যে রবীন্দ্রনাথ এই দৃষ্টিভঙ্গিই লক্ষ করেছিলেন।—

> মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম এবং বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনি কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগের ও ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে।
>
> —'প্রাচীন সাহিত্য', কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ১৩০৮

পরবর্তী কালে এই মনোভাবের থেকে কবি পূর্বোদ্ধৃত 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে (অধ্যায় ৫)

বলেছিলেন—

> ভর্তৃহরির কাব্যে দেখি ভোগের মানুষ আপন সুর পেয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গেই কাব্যের গভীরের মধ্যে বসে আছে ত্যাগের মানুষ আপন একতারা নিয়ে—এই দুই সুরের সমবায়েই রসের ওজন ঠিক থাকে, কাব্যেও, মানবজীবনেও।

ব্যক্তিগতভাবেও এই মনোভাবকে কবি যে কতদূর সমর্থন করতেন তাঁর রচনায় তার পরিচয় পাই। তাই তিনি ভর্তৃহরিকে স্মরণ করে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায়ের প্রতি তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।—

> একই কালে ভোগের দ্বারা এবং ত্যাগের দ্বারা সর্বত্র আপন অধিকার প্রসারিত করবার শক্তি নিয়েই সে এসেছিল। তার অনুরাগ ছিল আনন্দ ছিল নানা দিকে ব্যাপক কিন্তু তার আসক্তি ছিল না। মনে আছে আমি তাকে একদিন বলেছিলেম, তুমি কবি ভর্তৃহরি, এই পৃথিবীতে তুমি রাজা এবং তুমি সন্ন্যাসী।
>
> —'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', অধ্যায় ৩, ১৩৪০ আশ্বিন

কবি ভর্তৃহরির ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব। তবে কিংবদন্তী অনুসারে এই ভর্তৃহরি ছিলেন একাধারে রাজা এবং সন্ন্যাসী। তাঁর কাব্যে শৃঙ্গারশতকের পাশে বৈরাগ্যশতক থাকার জন্যই বোধ হয় এই কিংবদন্তীর উদ্ভব। জীবনরসিক রবীন্দ্রনাথের অন্তরেও ছিল এই বৈরাগ্যের সুর। তাঁর 'শারদোৎসব' নাটকের (১৩১৫) রাজা বিজয়াদিত্য তাই সন্ন্যাসী। তারও পূর্বে 'কথা' কাব্যের অন্তর্গত প্রতিনিধি কবিতায় (১৩০৪ কার্তিক) তিনি ভারত-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক শিবাজিকে বৈরাগীর শিষ্যরূপেই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এই দিক্ থেকে দেখতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয় তিনি ভারতীয় কবি ভর্তৃহরির সার্থক উত্তরসূরী।

অমরু

ভর্তৃহরির মতোই কবি অমরুর (আনু. খ্রীঃ ৬৫০-৭০০) পরিচয় আজও অজ্ঞাত রহস্যে আবৃত। তাঁর নামে প্রচলিত কাব্যশতকটির যে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় তার শ্লোকসংখ্যাও বিভিন্ন। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার মতো উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

এই কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় হেবরলিনের 'কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থ থেকে। এই কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অমরুশতকের উল্লেখ করে বলেছিলেন—

সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।

—'জীবনস্মৃতি' ১৯১২, আমেদাবাদ

সুতরাং এই শ্লোকগুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় দীর্ঘকালের। কিন্তু তাঁর সাহিত্যে এই-গুলির বিশেষ উদ্‌ধৃতি চোখে পড়ে না। শুধু 'চিরকুমার সভা'য় (১৯২৮) বৃদ্ধ রসিকের মুখে এই কাব্যের দুটি শ্লোক (৩৪ এবং ৬০-সংখ্যক) ও তার অনুবাদ দেখা গেছে। পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে এ দুটি উদ্‌ধৃত হল।

রবীন্দ্রসাহিত্যে অমরুশতকের শ্লোকের এই উদ্‌ধৃতি-বিরলতার কারণ সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কিছু বলা না গেলেও এ বিষয়ে কিছু অনুমান করা চলে। ঐতিহাসিক Keith তাঁর গ্রন্থে অমরুর মূল্যনির্ণয় করে লিখেছেন—

The Cataka is essentially a collection of pictures of love, and it differs from the work of Bhartrhari in that, while Bhartrhari deals rather with general aspects of love and women as factors in life, Amaru paints the relation of lovers, and takes no thought of other aspects of life

—'A History of Sanskrit Literature' ch. VIII p 184

সুতরাং অমরুশতককে প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্গারশতক বলা চলে।

এই শৃঙ্গার বা মধুর রস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণার পরিচয় নিতে গেলে দেখা যায়, প্রথম জীবনেই কবি লিখেছেন—

ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

— মানসী', নিষ্ফল কামনা ১৮৮০ অগ্রহায়ণ

এবং তাঁর মানসীর প্রেম সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যাশা হল—

তোমার প্রেমের ছায়া আমারে ছাড়ায়ে
পড়িবে জগতে।
মধুর আঁখির আলো পড়িবে সতত
সংসারের পথে।
দূরে যাবে ভয় লাজ, সাধিব আপন কাজ
শত গুণ বলে—

বাড়িবে আমার প্রেম পেয়ে তব প্রেম,
দিব তা সকলে।
—'মানসী', সংশয়ের আবেগ ১৮৮৭ অগ্রহায়ণ

শেষ বয়সেও তিনি 'যে প্রেম সম্মুখ পানে চলিতে চালাতে নাহি জানে' ('বলাকা', শা-জাহান ১৩২১ কার্তিক) তাকে ধিক্কার দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে অমরুর এই সংকীর্ণ দেহসম্বন্ধ প্রেমকে স্বীকার করা কঠিন। সম্ভবতঃ সেই কারণেই তাঁর সাহিত্যে এগুলির স্থান এত সংকীর্ণ। শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের 'মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর' ধ্বনিই বোধ হয় অমরুশতকের প্রতি তাঁর আকর্ষণের প্রধানতম কারণ। এ কাব্যের বিষয়বস্তু বা ভাবের রস তাঁকে মুগ্ধ করে নি। এই কারণেই ভর্তৃহরির শৃঙ্গারশতকের কোনো উদ্ধৃতি বা উল্লেখ রবীন্দ্রসাহিত্যে দেখা যায় নি এবং সেইজন্যই অমরুশতক তাঁর সাহিত্যে অবহেলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতায় কিন্তু অমরুর ছায়াপাত ঘটেছে বলে মনে হয়। এই কাব্যের ১২-সংখ্যক শ্লোকে আছে—

কথমপি সখি ক্রীড়াকোপাদ্ ব্রজেতি ময়োদিতে
কঠিনহৃদয়স্ত্যক্ত্বা শয্যাং বলাদ্গত এব সঃ।
ইতি সরভসং ধ্বস্তপ্রেম্নি ব্যপেতঘৃণে জনে
পুনরপি হতব্রীড়ং চেতঃ প্রয়াতি করোমি কিম্ ॥

সখি, কোপচ্ছলে তাকে 'যাও' বলতেই কঠিনহৃদয় সে (ব্যক্তি) শয্যা ত্যাগ করে জোর করেই চলে গেল। এইভাবে যে আমার প্রেমকে ধ্বস্ত করে দিলে আমার লজ্জাহীন চিত্ত ঘৃণা দূর করে পুনরায় তারই প্রতি ধাবিত হচ্ছে; বল কি করি?

আর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দেখি—

সে আসি কহিল, 'প্রিয়ে, মুখ তুলে চাও।'
দূষিয়া তাহারে রুষিয়া কহিনু 'যাও'!
সখী ওলো সখী, সত্য করিয়া বলি,
তবু সে গেল না চলি।
দাঁড়ালো সমুখে, কহিনু তাহারে, 'সরো!'
ধরিল দু হাত, কহিনু, 'আহা কী কর!'
সখী ওলো সখী, মিছে না কহিব তোরে,
তবু ছাড়িল না মোরে।
... ...

আপন মালাটি আমারে পরায়ে দিল—
কহিনু তাহারে, 'মালায় কী কাজ ছিল।'
সখী ওলো সখী, নাহি তার লাজ ভয়,
মিছে তারে অনুনয়
আমার মালাটি চলিল গলায় লয়ে,
চাহি তার পানে রহিনু অবাক হয়ে।
সখী ওলো সখী, ভাসিতেছি আঁখিনীরে—
কেন সে এল না ফিরে।

— কল্পনা', স্পর্ধা ১৩০৪ জ্যৈষ্ঠ

এই কবিতার প্রথম দুই ও শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে অমরুর অনুসরণ স্পষ্ট। তবে অমরুর স্থূল ভাবটি রবীন্দ্র অনুভূতির সূক্ষ্মতায় বহু ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। অমরুর হঠকারী নায়ক নায়িকাকে লজ্জাহীনা করে তুলেছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নায়ক ব্রীডানতা নায়িকার গোপন ইচ্ছার মর্যাদা রেখে 'আপন মালাটি' তার গলায় দিয়ে তার মালাটি নিজে নিয়ে অবেই চলে গেছে। তখন নায়িকার সাশ্রু বিলাপ সার্থক হয়েছে—'কেন সে এল না ফিরে'।

আবার অমরুশতকের ২৪ সংখ্যক শ্লোকে মানিনীর উক্তি দেখি—

ভ্রূভঙ্গে রচিতেঽপি দৃষ্টিরধিকং সোৎকণ্ঠমুদ্বীক্ষতে
কার্কশ্যং গমিতেঽপি চেতসি তনূ রোমাঞ্চমালম্বতে।
রুদ্ধায়ামপি বাচি সস্মিতমিদং দগ্ধাননং জায়তে
দৃষ্টে নির্বহণং ভবিষ্যতি কথং মানস্য তস্মিন্‌জনে॥

(ক্রোধে) ভ্রূকুটি করলেও দৃষ্টি যেন অধিকতর উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাকে দেখে, চিত্ত কঠিন হলেও দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, কথা বন্ধ করলেও পোড়া মুখ সস্মিত হয়ে ওঠে—চোখের সামনে থাকলে তার উপরে কি করে মান করা যায়।

আর রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে (১৩১৬, দ্বিতীয় অঙ্ক, ৩) দেখি পতির আগমন আশায় উৎফুল্ল বিভার বর্ণনা করে বৃদ্ধ বসন্ত রায় সকৌতুকে গেয়েছেন—

পারিবে কি লুকাবি লাজে
চপলা সে বাঁধা পড়ে না যে।
রুধিয়া অধর দ্বারে
ঝাঁপিতে চাহিলি তারে,
অমনি সে ছুটে এল নয়নমাঝে।

অমরুর শ্লোক এবং এই গানের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ পৃথক্। কিন্তু ভাবপ্রকাশের ভঙ্গিতে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যটি স্পষ্ট। এই গান রচনা করার সময় অমরুশতকের সঙ্গে পরিচিত কবির মনে উক্ত শ্লোকের ভাবটি জাগ্রত ছিল—এ অনুমান অসংগত নয়।

যাই হক, অমরুশতকের শ্লোকের এই জাতীয় পরোক্ষ প্রভাব ছাড়া সাধারণভাবে উক্ত কাব্যের দুএকটি উল্লেখ চোখে পড়ে। 'গল্পগুচ্ছে'র একটি গল্পে (হালদারগোষ্ঠী ১৩২১ বৈশাখ) নায়ক বনোয়ারিলালের সংস্কৃতচর্চার শখ বর্ণনা করে কবি অমরুশতকের উল্লেখ করেন এবং গল্পের শেষে গৃহত্যাগ করবার সময় তন্বী বধূকে পৃথুলা গৃহিণীতে পরিণত হতে দেখে বনোয়ারির হয়ে লেখকই মন্তব্য করেন—

আর কেন, এখন অমরুশতকের কবিতাগুলাও বনোয়ারির অন্য সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে বিসর্জন দেওয়াই ভালো।

আর একটি গল্পেও দেখি প্রসঙ্গক্রমে কবি লিখেছেন—

কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁর (পণ্ডিতমশায়ের) স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে—কিন্তু তিনি নাতনিতে পরিবৃত।…তাঁর অমরুশতক আর্যাসপ্তশতী হংসদূত পদাঙ্কদূতের শ্লোকের ধারা ঝুড়িগুলির চার দিকে গিরিনদীর ফেনোচ্ছল প্রবাহের মতো এই মেয়েগুলিকে ঘিরে ঘিরে সহাস্যে ধ্বনিত হয়ে উঠছে।

—'গল্পগুচ্ছ', পাত্র ও পাত্রী ১৩২৪ পৌষ

এর দীর্ঘ দিন পরে শেষ জীবনের একটি কবিতায় দেখি আধুনিক নায়ক অজিতকুমার তার আপন ঘরণীর মধ্যে সহসা 'ক্লাসিক যুগের চারুপ্রভা'কে আবিষ্কার করে বলেছে—

এ তো নয় আমার আটপহুরে চারু।
ঠিক এমন করেই দেখা দিত অন্যযুগের অবন্তিকা— …
অমরুশতকের চৌপদীতে
—শিখরিণীতে হোক, স্রগ্ধরাতে হোক—
ওকে তো ঠিক মানাতো।

—'শ্যামলী', সম্ভাষণ ১৯৩৬ মে

এই জাতীয় কয়েকটি প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ছাড়া সমগ্রভাবে অমরুশতক সম্বন্ধে কবির কোনো স্বতন্ত্র মন্তব্য চোখে পড়ে নি।

ভবভূতি

কবি ভবভূতি তাঁর সমসাময়িক কালে (আনু. খ্রীঃ ৭০০-৭৫০) রসজ্ঞ পাঠকের সহৃদয় সমর্থন না পেয়ে সাভিমানে গর্বোক্তি করেছিলেন—

উৎপৎস্যতে কোঽপি মম সমানধর্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।

—'মালতীমাধব', প্রস্তাবনা

জীবিতকালে কবির এ মনঃক্ষোভ দূর হয়েছিল কি না জানি না, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত বাংলাদেশ কান্যকুব্জের কবিকে উজ্জয়িনীর কবির চেয়ে কম সমাদর করে নি। সেদিন কালিদাসের পাশেই ছিল ভবভূতির স্থান এবং তাঁর গ্রন্থাবলী তখন ব্যাপকভাবেই পঠিত ও আলোচিত হত। এমন কি, সে যুগে এমন বাঙালি সাহিত্যিক কমই ছিলেন যিনি কোনো না কোনো ভাবে ভবভূতির প্রতিভাকে স্বীকার করেন নি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩ মার্চ) গ্রন্থে প্রথম ভবভূতিকে স্মরণ করেন। তাঁর 'সীতার বনবাস' (১৮৬০ এপ্রিল) উত্তররামচরিতের অনুসরণে লেখা। এ ছাড়া তাঁর সম্পাদনায় উত্তরচরিতের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয় (১৮৭০ আগস্ট)। অবশ্য তার ভূমিকায় তিনি সর্বাংশে ভবভূতির প্রতি অনুকূল মনোভাব প্রকাশ করেন নি। কবি মধুসূদন তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র (১৮৬১ জানুআরি) চতুর্থ সর্গে পূর্বসূরীদের প্রণাম নিবেদন করতে গিয়ে ভবভূতিকে সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করেন। উক্ত সর্গে সীতার বনবাসসুখ বর্ণনায় উত্তরচরিতের ছায়াপাতকে অস্বীকার করা যায় না। তবে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে (১৮৬৫) শিশুপালবধ ও কিরাতার্জুনীয়মের উপর সনেট রচনা করলেও ভবভূতি বা তাঁর কোনো নাটককে তিনি স্মরণ করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের (১৮৬৬) কপালকুণ্ডলা নামটি গ্রহণ করেন মালতীমাধব থেকে। এ ছাড়া বিদ্যাসাগর-কৃত ভবভূতির প্রতিকূল সমালোচনার উত্তরে তিনি উত্তরচরিত নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে (১২৭৯ জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন) ভবভূতি-প্রতিভার মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ ও তার সমর্থন করেন। এর পরে রবীন্দ্র-সম্পাদিত সাধনা পত্রিকায় রমেশচন্দ্র দত্তের কবি ভবভূতি (১২৯৯ মাঘ) এবং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উত্তরচরিত (১৩০০ আষাঢ়) নামক প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হয়। ১৩০২ সালে ভূদেব মুখোপাধ্যায় উত্তরচরিতের এক

সমালোচনা প্রকাশ করেন। আর সাহিত্য পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কালিদাস ও ভবভূতি ধারাবাহিকভাবে (১৩১৭-১৮) প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর 'সীতা' নাটক (১৩০৯) মুখ্যতঃ উত্তররামচরিতের অনুসরণেই লেখা হয়েছিল।

ভবভূতির গ্রন্থের আলোচনা ও অনুসরণই শুধু নয়, তাঁর নাটকের অনুবাদও এ যুগে দেখা গিয়েছিল। ১৮৫৯ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং ১৮৬৭ সালে রামনারায়ণ তর্করত্ন মালতীমাধবের অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৩০৭ সালে রবীন্দ্র-অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৃত উত্তরচরিত ও মালতীমাধব দুটি নাটকেরই অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৩০৮ সালে তাঁর অনূদিত ভবভূতির স্বল্পখ্যাত নাটক মহাবীর-চরিত প্রকাশিত হয়। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও উত্তরচরিতের কিছু শ্লোক অনুবাদ করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রপূর্ব বা তাঁর সমসাময়িক মনীষিবৃন্দ ভবভূতিকে উপেক্ষা তো করেনই নি, বরং সাদরে অভিনন্দিত করেছিলেন। কিন্তু বিস্ময় এবং পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ করতে হয় যে রবীন্দ্রনাথ কখনও ভবভূতি প্রতিভার সামগ্রিক আলোচনায় অগ্রসর হন নি বা তাঁর সম্বন্ধে কোনো স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করেন নি।

২

ভবভূতি সম্বন্ধে কোনো আলোচনা না করলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব বা একান্ত উদাসীন ছিলেন না। রবীন্দ্রসাহিত্যে যেখানে যেখানে ভবভূতির প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে সেগুলি অনুধাবন করলেই তাঁর সম্বন্ধে কবির মনোভাব আভাসিত হয়ে উঠিবে। প্রথম জীবনে তিনি একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

> এক মহাকাব্যের মধ্যে সংক্ষেপে অপরিস্ফুট ভাবে অনেক গীতিকাব্য খণ্ডকাব্য থাকে, অনেক কবি সেইগুলিকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। শকুন্তলা উত্তররামচরিত প্রভৃতি তাহার উদাহরণস্থল।
>
> —সমালোচনা', কাব্যের অবস্থা-পরিবর্তন ১২৮৮ শ্রাবণ

কবি এখানে উত্তররামচরিতকে শকুন্তলার পাশেই স্থান দিয়েছেন। 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত গ্রাম্যসাহিত্য প্রবন্ধেও (১৩০৫) দেখি তিনি ভবভূতিকে কালিদাসাদি প্রথম শ্রেণীর কবি বলে গণ্য করেছেন। এর পরে ১৩০৯ সালে শকুন্তলা নাটকের সমালোচনা উপলক্ষে উক্ত নাটকের ভাবধারার সাদৃশ্যসূত্রে তাঁকে উত্তররামচরিতের প্রসঙ্গ স্মরণ করতে দেখা গেছে। তিনি লিখেছেন—

উত্তররামচরিতেও প্রকৃতির সহিত মানুষের আত্মীয়বৎ সৌহার্দ্য এইরূপ ব্যক্ত

হইয়াছে। রাজপ্রাসাদে থাকিয়াও সীতার প্রাণ সেই অরণ্যের জন্য কাঁদিতেছে। সেখানে নদী তমসা ও বসন্তবনলক্ষ্মী তাঁহার প্রিয়সখী, সেখানে ময়ূর ও করিশিশু তাঁহার কৃতকপুত্র, তরুলতা তাঁহার পরিজনবর্গ।

—'প্রাচীন সাহিত্য', শকুন্তলা ১৩০৯ আশ্বিন

এর থেকে বোঝা যায় প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে বাল্মীকি, কালিদাস ও ভবভূতি একই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাই পরবর্তী কালে তপোবন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বাল্মীকি ও কালিদাসের সঙ্গে ভবভূতি অনিবার্যভাবেই তাঁর স্মৃতিপথে উদিত হয়েছেন।—

উত্তরচরিতে রাম ও সীতার যে প্রেম সেই প্রেম আনন্দের প্রাচুর্যবেগে চারি দিকের জল স্থল আকাশের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই রাম দ্বিতীয়বার গোদাবরীর গিরিতট দেখে বলে উঠেছিলেন 'যত্র দ্রুমা অপি মৃগা অপি বন্ধবো মে', তাই সীতাবিচ্ছেদকালে তিনি তাঁদের পূর্বনিবাসভূমি দেখে আক্ষেপ করেছিলেন যে. 'মৈথিলী তাঁর করকমলবিকীর্ণ জল নীবার ও তৃণ দিয়ে যে-সকল গাছ পাখি ও হরিণদের পালন করেছিলেন তাদের দেখে আমার হৃদয় পাষাণ গলার মতো গলে যাচ্ছে'।

—'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ

ভবভূতির বর্ণনাকে কবি এখানে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন তাতে দেখি অনুভূতির গভীরতায় ও প্রকাশভঙ্গিতে তা বাল্মীকি-কালিদাসের রচনার চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নয়। শেষ বয়সেও দেখি নারীপ্রগতির প্রসঙ্গে কালিদাসের সঙ্গে সঙ্গে ভবভূতিকে কবি সকৌতুকে স্মরণ করেছেন।—

হায় কালিদাস, হায় ভবভূতি,
এই গতি আর এই সব জুতি
তোমাদের গজগামিনীর দিনে
কবিকল্পনা নেয় নি তো চিনে।

—'প্রহাসিনী', নারীপ্রগতি ১৩৪১

রবীন্দ্রনাথ ভবভূতিকে শুধু প্রথম শ্রেণীর কবিমর্যাদা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, তাঁর রচনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করে অধিগত করে নিয়েছিলেন। পূর্বোদ্‌ধৃত তপোবন প্রবন্ধে সে পরিচয় পাওয়া গেছে। তা ছাড়া মালতীমাধব নাটক থেকে তিনি প্রাচীন ভারতসভ্যতার ঐতিহাসিক উপকরণও সংগ্রহ করেন।—

মালতীমাধবেরও করালাদেবীর পূজোপচারে যে নৃশংস বীভৎসতা দেখা যায়

তাহা কখনোই আর্যসমাজের ভদ্রমণ্ডলীর অনুমোদিত ছিল বলিয়া মনে করিতে পারি না।

—'সাহিত্য', বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ শ্রাবণ

আবার 'জীবনস্মৃতি' (১৩১৯) লিখতে বসেও অতীতের স্মৃতিচিত্রপ্রসঙ্গে উত্তর-রামচরিতের প্রথম অঙ্কে রামসীতার অতীত জীবনের চিত্রদর্শনের কথা তাঁকে মনে করতে দেখি। আর শেষ বয়সে হেমন্তবালা দেবীকে তিনি এক পত্রে জানান—

ভবভূতির উত্তরচরিতে তপোবনের আহার্যের উল্লেখ আছে।

—'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-৮৯, ১৯৩২ আগস্ট ৪

ভবভূতির গ্রন্থগুলিকে কবি শুধু নিরপেক্ষভাবে পাঠ করেন নি, সজাগ সমালোচকের দৃষ্টিতে তার দোষগুণও যাচাই করে নিয়েছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি পত্রে (১৩৩৯ কার্তিক ১২) তার প্রমাণ পাই। তিনি লিখেছিলেন, ভালোত্বের একরঙা পটভূমিতে আঁকা সাধুচরিত্র পাঠকমনে একঘেয়েমির অসাড়তা এনে দেয়। পক্ষান্তরে ভালো এবং মন্দ এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষে চারিত্রশক্তির তেজ বিকশিত হয়ে ওঠে। তাই 'বাল্মীকি রামচন্দ্রকে ভূমিকাপত্তন-স্বরূপে খাড়া করেছিলেন তার অসবর্ণতায় লক্ষ্মণের চরিত্রকে উজ্জ্বল করে আঁকবার জন্যেই'। অবশ্য বাল্মীকির সেই গূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নি, মূঢ় জনসাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট হয়েছিল মোটা রেখায় আঁকা রামচন্দ্রের অতিসাধু চরিত্রেরই প্রতি। কিন্তু—

ভবভূতি তা করেন নি। তিনি রামচন্দ্রের চরিত্রকে অশ্রদ্ধেয় করবার জন্যেই কবিজনোচিত কৌশলে 'উত্তররামচরিত' রচনা করেছিলেন। তিনি সীতাকে দাঁড় করিয়েছেন রামভদ্রের প্রতি প্রবল গঞ্জনারূপে।

—'ছন্দ', গদ্যকবিতার রূপ ও বিকাশ-৫

উত্তরচরিতের এই অভিনব ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বা পরে আর কেউ করেছেন বলে জানি না। যাই হক, চরিত্রচিত্রণে বাল্মীকির তুলনায় ভবভূতি কবির হাতে যে মর্যাদা লাভ করেছেন সেইটুকুর জন্যই তিনি স্রষ্টা হিসাবে অমরত্বের দাবী করতে পারেন। 'যোগাযোগ' উপন্যাসে (১৩৩৬) দেখি নারীমর্যাদায় সচেতন নায়িকা কুমুদিনী রঘুবংশের 'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ' ইন্দুমতী এবং সাবিত্রীর সঙ্গে স্মরণ করেছে ভবভূতির সীতাকে (পরিচ্ছেদ ২৬), বাল্মীকির সীতাকে নয়। ভবভূতি-অঙ্কিত তেজস্বিনী সীতার প্রতি কবির অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা এখানে ধরা দিয়েছে। তবে সমগ্র গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য এর চেয়ে বেশি অগ্রসর হয় নি।

৩

ভবভূতির রচনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত কবি মালতীমাধব ও উত্তরচরিত থেকে প্রয়োজনমতো উদ্‌ধৃতি নিয়ে তাঁর সাহিত্যে প্রয়োগ করেছেন। মালতীমাধবের বহুশ্রুত ও বহুব্যবহৃত শ্লোকাংশ 'কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী' রবীন্দ্রনাথেরও বিশেষ প্রিয়। তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গে এটি দশবার ব্যবহৃত হয়েছে। ১২৯৮ সালে 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী' গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে বসে তিনি ভবভূতির ঐ দম্ভোক্তির নজির তুলে ভাবীকালের পাঠকদের সহৃদয়তা প্রার্থনা করেছিলেন। ১৩০১ সালে তিনি ভবভূতির অনুসরণে জানিয়েছিলেন—

> স্বার্থও নহে, খ্যাতিও নহে প্রকৃত সাহিত্যের ধ্রুব লক্ষ্যস্থল কেবল নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথিবী।
>
> —সাহিত্য', বাংলা জাতীয় সাহিত্য

আবার 'জীবনস্মৃতি'তে (১৩১৯) বালক ছাত্রের হৃংকম্প বর্ণনা করে যেখানে তিনি লেখেন—

> ভবভূতির সমানধর্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিতেও পারে কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই গলিতে মাস্টারমহাশয়ের সমানধর্মা দ্বিতীয় আর-কাহারও অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।
>
> —'জীবনস্মৃতি' নানা বিদ্যার আয়োজন

সেখানে ঐ শ্লোকটিই কৌতুকে সম্পৃক্ত হয়ে একটি বিশেষ রসের সঞ্চার করে। এ ছাড়া 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের কৌতুকহাস্য (১৩০১) প্রবন্ধে, প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত এক পত্রে ('চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৩৭) এবং 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী'তেও (১৯২৫ ফেব্রুআরি ১৫) তিনি একই উদ্‌ধৃতির সাহায্যে কৌতুক সৃষ্টি করেছেন। 'পঞ্চভূত' এর অন্তর্গত গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধে (১২৯৯ ফাল্গুন) এবং ১৯৩৬ অক্টোবর ২৬ তারিখে বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীকে লেখা এক পত্রেও ('চিঠিপত্র' ৯, পত্র-৯) তিনি এই শ্লোকাংশটি স্মরণ করেন। 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের পরিশিষ্টের অন্তর্গত নানানবিধি প্রবন্ধেও (১৩৭৪ আষাঢ়) তাঁকে এটি উদ্‌ধৃত করতে দেখা গেছে। এ ছাড়া 'গল্পগুচ্ছ'-এর অন্তর্গত ঠাকুরদা গল্প (১৩০২) এই শ্লোকের একটি অনুবাদ দেখা যায়। মালতীমাধব থেকে আর কোনো শ্লোক কবি সম্ভবতঃ ব্যবহার করেন নি।

উত্তরচরিত থেকে রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ পাঁচটি শ্লোক ব্যবহার করেছেন। 'তপোবন' প্রবন্ধে কবিকর্তৃক উদ্‌ধৃত ও অনূদিত দুটি শ্লোকের পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'তে (পত্র-৪৫, ১৩২৮ পৌষ ২২) বালিকা রানুর কাছে অতীত

সুখস্মৃতির রোমন্থন করে রামের কথার প্রতিধ্বনিতে লিখেছিলেন—'তে হি নো দিবসা গতাঃ' (১।১৯)। 'পরিশেষ' কাব্যে 'তে হি নো দিবসাঃ' নামে একটি কবিতাও (১৯২৭ অক্টোবর) দেখা যায়। এটি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর দুটি প্রিয় শ্লোকাংশ হল—'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা' (১।৩৫) এবং 'স তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়োজনঃ' (২।১৯)। ভাবাবেগের তুঙ্গে উঠে মানুষ যখন বচনের মধ্য দিয়ে অনির্বচনীয় অনুভূতিকে প্রকাশ করতে চায় তখন সে যে প্রকাশভঙ্গির আশ্রয় নেয়, ভবভূতির এই শ্লোক দুটি তার নিদর্শন। এই ভাবের ভাষা কবির মর্ম স্পর্শ করেছিল। তাই প্রথম জীবনেই তিনি লিখেছিলেন—

> কবিরা জানিতেন, হৃদয়ের মধ্যে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে শব্দ স্পর্শ দ্রাণ সমস্ত একাকার হইয়া যায়।·যেখানে গভীর সেখানে সমস্তই একাকার। সেখানে হাসিও যা কান্নাও তা, সেখানে সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা।
>
> —'আলোচনা' ডুব দেওয়া* তুলনায় অরুচি ১২৯১ বৈশাখ

এর কিছুদিন পরে কবি তাঁর অস্পষ্ট কাব্যভাষার জন্য জবাবদিহি করতে গিয়ে বাস্তববাদী সমালোচকদের বলেছিলেন, সহৃদয়হৃদয়সংবেদ্য কাব্য গভীর ভাবের কথাকে সর্বত্র সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম। কারণ 'ভাবের আবেগে ভাষায় একপ্রকার বিহ্বলতা জন্মে'। এই প্রসঙ্গে তিনি চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-জ্ঞানদাস-বলরামদাসের পদাবলীর গভীর ভাব ও তথাকথিত অস্পষ্ট ভাষার বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেইসূত্রে ভবভূতিকে স্মরণ করে লিখেছেন—

> সীতার স্পর্শসুখে-আকুল রাম বলিয়াছেন : সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা। কী জানি ইহা সুখ না দুঃখ। এমন ছাড়া ছাড়া মতো, ধুয়ার মতো কথা কহিবার তাৎপর্য কী?··ভবভূতি ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের আবেগ প্রকাশ করিতে গিয়াই বলিয়াছেন 'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা'। নহিলে স্পষ্ট কথায় সুখকে সুখ বলাই ভালো তাহার আর সন্দেহ নাই।
>
> —'সাহিত্য', সংযোজন কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ১২৯৩

কবি রবীন্দ্রনাথের প্রাণের তন্ত্রীও এই সুরেই বাঁধা। এ ক্ষেত্রে ভবভূতি তাঁর যথার্থ আত্মীয়। তাই তাঁর কবিতাতে দেখি—

সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাই তো আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।

এ প্রেম আমার সুখ নহে, দুখ নহে।

—'মানসী' পূর্বকালে ১৮৮৯

তার বহুকাল পরে জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে ঐ একই বাণী।—

দিনান্ত-বেলায় শেষের ফসল দিলেম তরী-'পরে
যা-কিছু নিয়ে চলি শেষ সঞ্চয়
সুখ নয় সে, দুঃখ সে নয়, নয় সে কামনা।

—'গীতবিতান', প্রেম ২৩৫

এই অনুভূতিতেই তাঁর 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের (১৯৩৪) নায়ক অতীন্দ্রের কাছে নায়িকা এলা হয়ে উঠেছে 'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা' (দ্বিতীয় অধ্যায়)।

তবে এই অনুভূতিকে কবি শুধু মানবিক প্রেমের গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখতে নারাজ। বৃহৎ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যে তাঁর গভীরতর প্রেমের টান। তাই ১৮৯৪ জুন ২৬ তারিখে লেখা এক পত্রে ('ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১২২) দেখি, নির্জন পদ্মাতীরে আষাঢ় দিনের ঘন মেঘের গভীরতায় যে অন্তর্গূঢ় ভাবটি নিবিড় হয়ে ওঠে, কবির অনুভূতিতে তাও 'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা'।

'স তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়োজনঃ' শ্লোকটিতেও পাই এই ভাবের কথা। পূর্বোদ্ধৃত কাব্য: স্পষ্ট ও অস্পষ্ট প্রবন্ধে তিনি শ্লোকটি ব্যবহার করেছিলেন। পরে এই মর্মেই পুনরায় লেখেন—

যে-সকল কথা সর্বাপেক্ষা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করে অথচ যাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা সর্বাপেক্ষা শক্ত তাহা লইয়াই মানবের প্রধান ব্যাকুলতা। কাব্যে আমরা আপনাকে জানি। অতএব যদি কোনো কবিতায় আমরা কেবলমাত্র এইটুকু জানি যে, ফুল আমরা ভালোবাসি, আকাশের তারা আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে, যে আমার প্রিয়জন সে আমার না-জানি কী তথাপি তাহাকে অসম্মান করা যায় না।

—'সাহিত্য, সংযোজন কাব্য ১২৯৮ চৈত্র

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ ভবভূতির কাব্য থেকে আর এই জাতীয় শ্লোক উদ্‌ধৃত করেন নি। কিন্তু ১৯৪০ সালের পরিণতমনা কবি, যিনি জীবনের সমস্ত তিক্ততাকে নিঃশব্দে পরিপাক করে নিয়ে বলেছিলেন—

এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম-রোমান্টিক।

—'সানাই', অনসূয়া

তাঁর কবিহৃদয় থেকে এ ভাব কি কোনোদিন নির্বাসিত হতে পেরেছিল?

ভবভূতির রচনার মধ্যে 'উত্তররামচরিত' ও 'মালতীমাধব' নাটক দুটিই প্রধান। তাঁর সম্বন্ধে যত আলোচনা ও নিন্দাপ্রশংসা, তা এই দুটিকে অবলম্বন করেই। তাঁর 'মহাবীরচরিত' পাঠকসমাজে তেমনি সুপরিচিত নয়। রবীন্দ্রনাথও এই গ্রন্থের কোনো উল্লেখ করেন নি। এগুলি ছাড়া রবীন্দ্রপঠিত হেবরলিনের 'কাব্যসংগ্রহে' ভবভূতি-রচিত 'গুণরত্নম্' নামে একটি কাব্য সংকলিত আছে। কিন্তু Keith, Macdonell -প্রমুখ কোনো ঐতিহাসিকই ঐ নামে ভবভূতির কোনো গ্রন্থের উল্লেখ করেন নি। যাই হক, এই কাব্য থেকেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় দুটি শ্লোকাংশ ব্যবহার করেছেন। 'যা দ্বয়লোকসাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী' (১০ম শ্লোক) 'শান্তিনিকেতন' প্রথম খণ্ডের মরণ প্রবন্ধে (১৩১৫ ফাল্গুন ১৯) এবং 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ' (১২শ শ্লোক) 'ধর্ম' গ্রন্থের ততঃ কিম্ প্রবন্ধে (১৩১৩ অগ্রহায়ণ) উৎকলিত হয়েছে। অবশ্য দ্বিতীয় শ্লোকটি 'হিতোপদেশ' 'শার্ঙ্গধর পদ্ধতি' প্রভৃতি একাধিক গ্রন্থেই দেখা যায়।

৪

ভবভূতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা বা উদধৃতির সীমা এই পর্যন্ত। কিন্তু বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে তার পরিমাণ কতটুকু! সুতরাং স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, যে কবির প্রতিভাকে তিনি কালিদাসের সমশ্রেণীয় বলে মনে করতেন তাঁর সম্বন্ধে কেন তিনি কোনো সামগ্রিক আলোচনা করেন নি।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, রবীন্দ্র-সম্পাদিত সাধনা পত্রিকার ১২৯৯ মাঘ সংখ্যায় রমেশচন্দ্র দত্তের এবং ১৩০০ আষাঢ় সংখ্যায় বলেন্দ্রনাথের ভবভূতি সম্বন্ধীয় লেখা দুটি প্রকাশিত হয়। রমেশচন্দ্র প্রধানতঃ ঐতিহাসিক দিক্ থেকে আলোচনা করেন আর বলেন্দ্রনাথ করেন তার কাব্যালোচনা। বলেন্দ্রনাথের লেখাগুলি আবার রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে, উপদেশে ও তাঁর স্বহস্তকৃত পরিমার্জনায় সংস্কৃত হয়েই প্রকাশিত হত। তার প্রমাণ এই। ১৩০৬ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যা প্রদীপে রবীন্দ্রনাথ 'বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত রচনা'র বিবরণ দেবার উপলক্ষে একটি রচনা নিজে সম্পূর্ণ করে প্রকাশ করেন এবং এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন—

> বলেন্দ্রনাথ কোনো রচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাহার বিষয়প্রসঙ্গ লইয়া আমার সহিত আলোচনা করিতেন।[১]

১ দ্রষ্টব্য : 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী' ১৩৬৪ (সাহিত্য-পরিষৎ), ভূমিকা ॥৵০

সুতরাং এ অনুমান বোধ করি অসংগত নয় যে ভবভূতি সম্বন্ধেও তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং তাঁর প্রবন্ধে কবির মত বা মন্তব্য অনেকাংশেই ধরা দিয়েছে। তাই এ বিষয়ে আর নূতন কিছু বলার প্রেরণা কবি অনুভব করেন নি। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্‌ধৃত করলেই এ কথার যাথার্থ্য বোঝা যাবে।—

> কালিদাস যেখানে…খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্য উদ্রেকে প্রিয়জনকে স্মরণ করাইয়া দেন, ভবভূতি সেখানে অন্তরের অন্তরে ডুবিয়া মানবহৃদয়ের গভীর বেদনা অনুভব করেন এবং সেই বেদনার মধ্য হইতে প্রিয়জনকে যেন মন্থন করিয়া তুলেন; সেই জন্য প্রিয়জন তাহার নিকট এমন কি-জানি-কি এবং প্রিয়স্পর্শে তিনি একেবারে আকুল হইয়া উঠেন—নিশ্চয় করিতে পারেন না—সুখ না দুঃখ।
>
> —'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী', চিত্র ও কাব্য : উত্তরচরিত

বলেন্দ্রনাথের এই মন্তব্যে রবীন্দ্ররচিত 'কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট' এবং 'কাব্য' এই প্রবন্ধ দুটির ('সাহিত্য', সংযোজন) পূর্বোদ্‌ধৃত অংশের সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়।

ভবভূতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বাক্‌পরিমিতির কারণ হিসাবে এ কথাও মনে হয় যে, কবিধর্মে কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ পরস্পরের আত্মীয়, ভবভূতির প্রকৃতি তার থেকে স্বতন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন—

> কালিদাস, একটি একটি করিয়া বাঁছিয়া বাছিয়া সুন্দর সামগ্রীগুলি একত্রিত করেন, …এজন্য তাঁহার কৃত বর্ণনা, যেমন স্বভাবের অবিকল অনুরূপ, তেমনি মাধুর্যপরিপূর্ণ হয়, …ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রীসকল একত্রিত করেন না,…দুই চারিটা স্থূল কথায় একটা চিত্র সমাপ্ত করেন।…কিন্তু সেই দুই চারিটা কথায় এমন একটু রস ঢালিয়া দেন যে, তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্জ্বল, কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখনও বীভৎস হইয়া পড়ে। মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।
>
> —'বিবিধ প্রবন্ধ' ১ম, উত্তরচরিত ১২৭৯ জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন

বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিচার যথার্থ হলে সন্দেহ থাকে না যে, আজন্ম সুন্দরের উপাসক রবীন্দ্রনাথ জীবনদৃষ্টির দিক্ দিয়ে কালিদাসেরই সমধর্মী। সেইজন্যই মনে হয় হৃদয়াবেগের গভীরতায় ভবভূতি যেখানে মর্মস্পর্শী, কবি সেখানে তাঁকে সসম্মান আনন্দের সঙ্গে অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন। কিন্তু সমগ্রভাবে ভবভূতি তাঁর কবিহৃদয়ের সমর্থন লাভ করতে পারেন নি। তাই প্রসঙ্গক্রমে ভবভূতির উল্লেখ ও আংশিক আলোচনাতেই তিনি থেমে গেছেন, তাঁর প্রাতিভার সর্বাংগীণ মূল্যনির্ণয়ে অগ্রসর হন নি।

পরিশেষে একথা বলতে পারি, কবি তাঁর অসামান্য দরদ নিয়ে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' ঊর্মিলার অব্যক্ত বেদনাকে ভাষা দিয়েছিলেন। শুধু বাল্মীকি নন, ভবভূতিও ঊর্মিলার প্রতি উপেক্ষার জন্য তাঁর অনুযোগ থেকে নিষ্কৃতি পান নি।—

> ভবভূতির কাব্যেও তাহার সেই ছবিটুকুই মুহূর্তের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। সীতা কেবল সস্নেহকৌতুকে একটিবারমাত্র তাহার উপরে তর্জনী রাখিয়া দেবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস, ইনি কে?' লক্ষ্মণ লজ্জিত হাস্যে মনে-মনে কহিলেন, 'ওহো, ঊর্মিলার কথা আর্যা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।' এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ লজ্জায় সে ছবি ঢাকিয়া ফেলিলেন, তাহার পর রামচন্দ্রের এত বিচিত্র সুখদুঃখ-চিত্রশ্রেণীর মধ্যে আর একটিবারও কাহারও কৌতূহল-অঙ্গুলি এই ছবিটির উপরে পড়িল না। সে তো কেবল বধূ ঊর্মিলা মাত্র।
>
> —'প্রাচীন সাহিত্য', কাব্যের উপেক্ষিতা ১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ

ভবভূতির কাব্যে উপেক্ষিতা ঊর্মিলার প্রতি কবির সমবেদনা উচ্ছ্বসিত, কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভবভূতি নিজেই একজন উপেক্ষিত কবি। কালিদাসের কবিত্বে মুগ্ধ ও তাঁর কাব্যরসে আকণ্ঠনিমজ্জিত কবি, প্রায় সমশ্রেণীর কবি ভবভূতির প্রতি তার শতাংশের একাংশ মনোযোগ দিতেও যেন কুণ্ঠিত হয়েছেন। যে সহানুভূতিতে তিনি বাণভট্টকে সম্মানিত করেছেন, সেটুকু থেকেও ভবভূতি বঞ্চিত। অথচ রবীন্দ্রসাহিত্যে কালিদাসের পাশেই যদি ভবভূতির স্থান হত তবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উভয়ই সমৃদ্ধ হত, সন্দেহ নেই।

শংকরাচার্য, সোমদেব ও বিহ্লণ

শংকরাচার্য

মনীষী শংকরাচার্য (আনু. খ্রীঃ ৭৮৮-৮৩০) প্রাচীন ভারতের এক বিস্ময়কর প্রতিভা। উপনিষদ্, গীতা ও বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যায় রয়েছে তাঁর অসাধারণ মনীষার স্বাক্ষর। ভারতের চার প্রান্তের চারটি মঠ কর্মবীর শংকরের অক্ষয় কীর্তিরূপে বিরাজিত। কিন্তু তাঁর আর এক বিশেষ পরিচয় তিনি কবি। তাঁর আনন্দলহরী (নামান্তরে সৌন্দর্যলহরী) কাব্যখানি প্রথম শ্রেণীর কবিকল্পনায় সমুজ্জ্বল। এ ছাড়া তাঁর নামে প্রচলিত মোহমুদ্গর, যতিপঞ্চক, আত্মবোধ প্রভৃতির শ্লোকগুলি মূলতঃ নীতি-উপদেশ হলেও শব্দে ছন্দে ভাষার ভঙ্গিতে তা শিল্প হয়ে উঠেছে।

শংকরাচার্যের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দীর্ঘ দিনের। সম্ভবতঃ হেবর-লিনের 'কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থ থেকেই কবি প্রথম শংকরাচার্যের কাব্যপাঠের সুযোগ পান। ওই গ্রন্থে শংকরের মোহমুদ্গর, আত্মবোধ, যতিপঞ্চক, আনন্দলহরী ইত্যাদি কাব্য সংকলিত আছে। সুতরাং মনে হয়, শংকরাচার্যের রচনার সঙ্গে বাল্যকালেই তাঁর পরিচয় হয়েছিল।

দার্শনিক শংকরাচার্যের 'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' ইত্যাদি মায়াবাদ ভারতবর্ষে সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথও যে এই মতবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাঁর সাহিত্যে তার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। ১২৯১ সালের বৈশাখ সংখ্যা ভারতীতে প্রকাশিত ডুব দেওয়া প্রবন্ধের অন্তর্গত জগৎ মিথ্যা ও জগৎ সত্য প্রসঙ্গ দুটির আলোচনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

> যাঁহারা বলেন জগৎ মিথ্যা, তাঁহাদের কথা এক হিসাবে সত্য, এক হিসাবে সত্য নয়।
>
> —'আলোচনা', ডুব দেওয়া : জগৎ মিথ্যা

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সহজেই ধরা পড়ে যে আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে জগৎ যেভাবে প্রতিভাত হয়, প্রকৃত জগৎ তা নয়। কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান সীমিত এবং জগৎ নিছক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে পারে না। তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ মিথ্যা। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও কবির মনে হয়েছে, 'সত্য যাহা তাহা অদৃশ্য, তাহা কখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহা একটা ভাব মাত্র। কিন্তু ভাব আমাদের নিকট নানারূপে প্রকাশ পায়, ভাষা আকারে, অক্ষর আকারে, বিবিধ বস্তুর বিচিত্র বিন্যাস আকারে।

তেমনি প্রকৃত জগৎ যাহা তাহা অদৃশ্য, তাহা কেবল একটি ভাব মাত্র'। তবে সেই সত্য ভাব আমাদের ইন্দ্রিয়বোধে ধরা দিচ্ছে না। কারণ—

> জগতের বর্ণপরিচয় আমাদের কিছুই হয় নাই। জগতের প্রত্যেক অক্ষর আঁচড়ের আকারে, সুতরাং মিথ্যা আকারে আমাদের চোখে পড়িতেছে।
>
> —'আলোচনা', ডুব দেওয়া : জগৎ সত্য

সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে মিথ্যা বলে প্রতীয়মান হলেও জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা না হতে পারে।

এখানে কবি শংকরাচার্যের 'জগৎ মিথ্যা'কে আপন মত অনুযায়ী যাচাই করবার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী কালের 'সঞ্চয়' গ্রন্থের অন্তর্গত রূপ ও অরূপ প্রবন্ধে (১৩১৮) দেখা যায়, জগৎ বলে আমরা যাকে জানি তার মধ্যে যে একটা মায়ার ভাব আছে তাকে বিজ্ঞান তথা তত্ত্বজ্ঞান উভয় দিক থেকেই কবি মেনে নিয়েছেন।

এই জগৎকে মায়াময় বলে স্বীকার করলেও জীবনবাদী কবি তাকে মিথ্যা বা ফাঁকি বলে মনে করতে পারেন না। বস্তুতঃ শংকরাচার্যের অভিপ্রায়ও তা নয়। অদ্বৈতবাদী শংকর বলতে চেয়েছিলেন, ব্রহ্মের সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন যে জগৎ তা-ই মিথ্যা। কারণ তাঁর জগৎ ব্রহ্মেরই মধ্যে ওতপ্রোত। কিন্তু পরবর্তী কালে শংকরাচার্যের এই সুসমঞ্জস মতবাদের বিকৃতি ঘটে। বৌদ্ধ নির্বাণের যেমন অর্থ দাঁড়িয়েছিল সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত করে প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া, এই মায়াবাদের অর্থও তেমনি জগৎকে, জাগতিক সমস্ত কিছুকে বাদ দিয়ে এক নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যানে বিলীন হওয়ার সাধনায় পরিণত হয়েছিল। ইতিহাস-সচেতন রবীন্দ্রনাথ এটি লক্ষ করেছিলেন।—

> সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত করে, সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে, তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায়, এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়ালো সেই দিন থেকে উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শংকরাচার্যের শূন্য-স্বরূপ ব্রহ্ম-রূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন।
>
> —'শান্তিনিকেতন' ২য়, সামঞ্জস্য

কবি কিন্তু এই অবাস্তব সাধনার ব্যর্থতাটি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর সিদ্ধান্ত হল—

> কেবলমাত্র কঠোর চিন্তার জোরে মানুষ নিজের বাসনা ও প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে, জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডকে বাদ দিয়ে, শরীরের প্রাণক্রিয়াকে অবরুদ্ধ করে, একটি গুণলেশ-হীন অবচ্ছিন্ন (abstract) সত্তার ধ্যানে নিযুক্ত থাকতেও পারে, কিন্তু দেহমন-

> হৃদয়বিশিষ্ট সমগ্র মানুষের পক্ষে এরকম অবস্থায় অবস্থিতি করা অসম্ভব এবং সে তার পক্ষে কথনোই প্রার্থনীয় হতে পারে না।

—'শান্তিনিকেতন' ২য়, সামঞ্জস্য

তাই নির্গুণ ব্রহ্মের শুষ্ক সাধনা পরবর্তী কালে বিগলিত হল ভক্তিরসে। অন্যত্রও তিনি এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন এইভাবে।—

> শংকরাচার্যের ছাত্রগণ যখন বিদ্যাকেই প্রধান করিয়া তুলিয়া জগৎকে মিথ্যা ও কর্মকে বন্ধন বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছিলেন তখন সাধারণে মায়াকেই, শান্তস্বরূপের শক্তিকেই, মহামায়া বলিয়া শক্তীশ্বরের ঊর্ধ্বে দাঁড় করাইবার জন্য খেপিয়া উঠিয়াছিল।

—'সাহিত্য', বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯

কিন্তু মায়াকে এমন প্রবল বেগে মায়াধিপতির চেয়ে বড়ো করে তোলার প্রতিক্রিয়ায় দেশে দেখা দিয়েছিল 'ভক্তির মাৎসর্য'। তাই এ বিষয়ে কবির শেষ কথা হল—

> মায়াকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিলে তাহা ভয়ংকরী, ব্রহ্মকে মায়া হইতে স্বতন্ত্র করিলে ব্রহ্ম অনধিগম্য—ব্রহ্মের সহিত মায়াকে সম্মিলিত করিয়া দেখিলেই প্রেমের পরিতৃপ্তি।

—পূর্ববৎ

সত্যকে পূর্ণ করে দেখতেন বলেই কবি মায়াকে একান্ত বলে ধরেন নি। তিনি বলেছেন, জগতের দুই রূপ—প্রকাশের রূপ ও প্রলয়ের রূপ। এই প্রকাশের পথ মৃত্যু বা প্রলয়ের মধ্য দিয়েই। যে বলে 'জগৎ বিনাশেরই প্রতিরূপ, সমস্তই মায়া, যা-কিছু দেখছি এ-সমস্তই 'না' ;...এই প্রকাশের রূপকেই সে কালো করে, ভয়ংকর করে দেখে'। তাই মোহমুদ্গরকে ধিক্কার দিয়ে তিনি বলেন—

> দেওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে একটি আনন্দময় সম্বন্ধ আছে যে-সম্বন্ধ থাকার দরুন মানুষ দুঃসাহসের পথে যাত্রা করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জয়লাভ করে, ভীতু মানুষ তাকে দেখতে পায় না। তাই বলে—
>
> মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
> ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।

—'জাপানযাত্রী', অধ্যায় ৭, ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ ৫

তার বহু পূর্বেই 'সোনার তরী' কাব্যের অন্তর্গত মায়াবাদ প্রভৃতি একই পর্যায়ের আটটি সনেটে (১৩০০ অগ্রহায়ণ) কবি জীবন ও কর্মকে এড়িয়ে বা ফাঁকি দিয়ে মুক্তি-সন্ধানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। আর এই একই মনোভাব

থেকে তিনি 'নৈবেদ্য' কাব্যের (১৯০১) একটি সনেটে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছিলেন—

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।...
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

—'নৈবেদ্য', ৩০-সংখ্যক সনেট

কবির এই মনোভাব তাঁর সারা জীবনের সাহিত্যরচনাতেই কখনও স্পষ্টরূপে ব্যক্ত কখনও বা অস্পষ্টরূপে আভাসিত হয়ে থেকেছে। আর শেষ জীবনের একটি কবিতায় ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক সুরে তিনি বলেছেন—

মনেতে লাগিল বৈরাগ্যের ছোঁওয়া,
সকলি দেখিনু ধোঁওয়া।
ভাবিলাম এই ভাগ্যের তরী
বুঝি তার হাল নেই,
এলোমেলো স্রোতে আজ আছে কাল নেই।
নলিনীর দলে জলের বিন্দু
চপলম্ অতিশয়,
এই কথা জেনে সওয়ালেই ক্ষতি সয়।

—'পরিশেষ', পুনশ্চ ১৩৩৮

কিন্তু বৈরাগ্যের এই ঝুটো ভেক তাঁর সইল না। তাঁকে বলতে হল 'অতএব জেনো সন্ন্যাসী হব নাকো' এবং তার শেষ পরিণতি—

দুয়ার ঠেলিয়া চক্ষু মেলিয়া
দেখি যদি কোনো মিত্রম্
কবি তবে কবে, 'এই সংসার
অতীব বটে বিচিত্রম্।'

—পূর্ববৎ

রবীন্দ্রনাথ শংকরাচার্যের মায়াবাদকে যে দৃষ্টিতে দেখেছেন এখানে তাৎপর্যসহ সেই-গুলিকে যথাসাধ্য সংকলন করবার চেষ্টা করা গেল। কিন্তু তার যাথার্থ্য বিচার এখানে করা হয় নি ; সে কার্যের জন্য যোগ্যতর অধিকারী প্রয়োজন।

২

মোহমুদ্গরের জীবনদর্শনকে অস্বীকার করলেও এ কাব্যটি কবির মনকে যে অধিকার করেছিল তাঁর রচনায় তার প্রমাণ দেখা যায়। নানা প্রসঙ্গে তাঁর রচনায় রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের একাধিক শ্লোক স্মরণ করেছেন। ইংরেজিশিক্ষা-প্রসঙ্গে বিদেশী ভাষার কষ্টকল্পিত বাংলা অর্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—

সচরাচর যে অর্থটা বাহির হয় তৎসম্বন্ধে শংকরাচার্যের এই বচনটি খাটে—

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্ ॥

অর্থকে অনর্থ বলিয়া জানিয়ো, তাহাতে সুখও নাই এবং সত্যও নাই।

—'শিক্ষা', শিক্ষার হেরফের ১২৯৯ পৌষ

এখানে শ্লোকটির সামান্য অর্থান্তর ঘটিয়ে কবি সুকৌশলে তার দ্বারা আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। আবার য়ুরোপীয় বিজ্ঞাননিষ্ঠা যে কাঁচি-ছাঁটা নিয়মের প্রবর্তন করে চলেছে সে সম্বন্ধে কটাক্ষ করতে গিয়েও তিনি ঐ শ্লোকটি স্মরণ করেছেন।—

এদের এই নির্মানুষিক সুব্যবস্থায় নিজেদের মুনাফা হয়, অন্যদের উপকারও হতে পারে, কিন্তু নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।

—'কালান্তর', শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন

মোহমুদ্গরের শ্লোকগুলি তাঁর মনকে যে কতদূর অধিকার করে ছিল এবং তা তাঁর কতদূর অভ্যস্ত ছিল তার পরিচয় পাই যখন দেখি পারস্যযাত্রী কবি ব্যোমযানে আকাশপথে চলতে চলতে নিচে নির্জীব ধূলিপটে পৃথিবীর সর্বরিক্ত শূন্যমূর্তি দেখে ও পৃথিবীর নশ্বরতার কথা ভেবে বলেন—

আমার মনের মধ্যে তখন শংকরাচার্যের মোহমুদ্গরের শ্লোক গুঞ্জরিত।··· যেন ভাবী যুগাবসানের প্রতিবিম্ব পিছন ফিরে বর্তমানের উপর এসে পড়েছে। যে ছবিটা দেখলেম সে একটা বিপুল রিক্ততা, কালের সমস্ত দলিল অবলুপ্ত।

—'পারস্যযাত্রী', অধ্যায় ১, ১৯৩২ এপ্রিল ১১

মোহমুদ্গরের শ্লোকগুলি যে তাঁকে মুগ্ধ করেছিল তার কারণ ওই শ্লোকগুলির গুঞ্জরন-ধ্বনির মধ্যেই নিহিত। ১৩০১ সালের মাঘ সংখ্যা সাধনায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে কবি লিখেছিলেন—

সংস্কৃত ভাষায় এমন অনেক শ্লোক পাওয়া যায়, যাহা কেবলমাত্র উপদেশ অথবা নীতিকথা, যাহাকে কাব্যশ্রেণীতে ভুক্ত করা যাইতে পারে না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সংহতিগুণে এবং সংস্কৃত শ্লোকের ধ্বনিমাধুর্যে তাহা পাঠকের চিত্তে সহজে

মুদ্রিত হইয়া যায় এবং সেই শব্দ ও ছন্দের ঔদার্য শুষ্ক বিষয়ের প্রতিও সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য অর্পণ করিয়া থাকে।

—'ছন্দ', সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দ

এই প্রসঙ্গে কবি যতিপঞ্চকের একটি শ্লোক উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন। মোহমুদ্‌গরও এই পর্যায়ের কাব্য। পরবর্তী হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহ অধ্যায়ে এ কাব্যের ছন্দোঝংকারের প্রতি কবির বিশেষ আকর্ষণের প্রমাণ পাওয়া যাবে। শুধু ছন্দ নয় শংকরের কাব্যের তথা বেদান্তভাষ্যের শব্দযোজনা এবং ভাষাভঙ্গিও তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। পরবর্তী ভাষা, ছন্দ ও অলংকার অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যাবে। এ স্থলে এটুকু বলা যায়, শংকরের ভাষ্য বা নীতিশ্লোকগুলির আদর্শ সম্বন্ধে কবির মনোভাব যেমনই হক, তার প্রকাশভঙ্গির সৌন্দর্য সম্বন্ধে তিনি নিঃসংশয়।

৩

পূর্বেই বলা হয়েছে, দার্শনিক ও নীতিউপদেষ্টা শংকরের মতবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল ছিল না। কিন্তু 'আনন্দলহরী'র (মতান্তরে সৌন্দর্যলহরী) কবি শংকরের অনুভূতিলব্ধ বাণীর প্রতি ছিল তাঁর আত্মার স্বীকৃতি। হৃদয়ভাবের ক্ষেত্রে এই দুই কবির অনুভূতি যেন পরস্পরের সমর্থন খুঁজে পেয়েছে। একটি পত্রে কবি তাঁর এই মনোভাব ব্যক্ত করেছেন।—

সৌন্দর্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা এক-প্লেট গোলাপ-ফুল আমার কাছে সেই ভূমানন্দের মাত্রা যার সম্বন্ধে উপনিষদে আছে: এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।... সেদিন শংকরাচার্যের আনন্দলহরী বলে একটা কাব্যগ্রন্থ পড়ছিলুম, তাতে সে সমস্ত জগৎসংসারকে স্ত্রীমূর্তিতে দেখছে— চন্দ্র সূর্য আকাশ পৃথিবী সমস্তই স্ত্রীসৌন্দর্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে—অবশেষে সমস্ত বর্ণনা সমস্ত কবিতাকে একটা স্তবে একটা ধর্মোচ্ছ্বাসে পরিণত করে তুলেছে। ...সৌন্দর্য যখন একেবারে সাক্ষাৎভাবে আত্মাকে স্পর্শ করতে থাকে তখনই তার ঠিক মানেটি বোঝা যায়। আমি যখন একলা থাকি তখন প্রতিদিনই তার সুস্পষ্ট স্পর্শ অনুভব করি।

—'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১১৭, ১৮৯৫ মার্চ ৭

প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বব্যাপী বৃহৎ স্ত্রীসৌন্দর্যের প্রতি আনন্দলহরীর কবির মুগ্ধ ও অভিভূত হৃদয়ের স্তব শুনেছিলেন। পরবর্তী কালের একটি প্রবন্ধে দেখি কবি

ওই কাব্যে 'বিশ্বের মর্মগত নারীশক্তি'কে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সেই শক্তিকে আনন্দের উৎস বলে মনে করেছেন। তাই তাঁর মন্তব্য—

> বিশ্বগত আনন্দকে আনন্দলহরীর কবি নারীভাবে দেখেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে মানবসমাজে এই আনন্দশক্তির বিশেষ প্রকাশ নারীপ্রকৃতিতে। এই প্রকাশকে আমরা বলি মাধুর্য। মাধুর্য বলতে কেউ যেন লালিত্য না বোঝেন। তার সঙ্গে ধৈর্যত্যাগসংযমযুক্ত চারিত্রবল, সহজ বুদ্ধি, সহজ নৈপুণ্য, চিন্তার ব্যবহারে ভাবে ও ভঙ্গীতে শ্রী, প্রভৃতি নানা গুণের মিশোল আছে, কিন্তু এর গূঢ় কেন্দ্রস্থলে আছে আনন্দ যা আলোর মতো স্বভাবতই আপনাকে নিয়ত বিকীর্ণ করে, দান করে।
>
> —'সমাজ', ভাবতবর্ষীয় বিবাহ ১৩৩২

কবির ব্যক্তিগত অনুভূতিও যে এই পথেই বিবর্তিত হয়েছে তাব সুস্পষ্ট নিদর্শন তাঁর অন্তিম জীবনের নারীবন্দনায়।—

> বিশ্বের পালনী শক্তি নিজ বীর্যে বহ চুপে চুপে
> মাধুরীর রূপে।
> ভ্রষ্ট যেই, ভগ্ন যেই, বিরূপ বিকৃত,
> তারি লাগি সুন্দরের হাতের অমৃত।
>
> —'আবোগ্য', ২৩-সংখ্যক কবিতা ১৯৪১ জানুআরি ১৩

আনন্দলহরীর কবির সঙ্গে তাঁর সাধর্ম্য এই সূত্রেই। এ কাব্যের বিষয়বস্তু ছাড়া তার প্রসাধননৈপুণ্যও কবিকে মুগ্ধ কবেছিল।—

> শংকরাচার্যের নামে যে সৌন্দর্যলহবী কাব্য প্রচলিত তার ভাবের প্রকাশ লজিকের পক্ষ থেকে অসংযত, অথচ প্রাণবান্ গতিমান্ রূপসৃষ্টির পক্ষ থেকে তার কলাকৌশল দেখতে পাই।—
>
> বহন্তী সিন্দুরং প্রবলকবরীভারতিমির-
> দ্বিষাং বৃন্দৈর্বন্দীকৃতমিব নবীনার্ককিরণম্।
> তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদনসৌন্দর্যলহরী-
> পরীবাহস্রোতঃ সরণিরিব সীমন্তসরণিঃ॥
>
> …সৌন্দর্য লহরীতে যে নারীরূপের কথা পাই সে সাধারণ নারী নয়, সে বিশ্ব-সৌন্দর্যের প্রতিমা। নিয়ত বয়ে চলেছে তার সৌন্দর্যের প্রবাহ, পিছনে তার ঘনকবরীপুঞ্জে রাত্রি, সম্মুখে তার সীমন্তরেখার সিন্দুররাগে তরুণসূর্যকিরণ, এই অল্পকথায় ভাবের যে স্তবকগুলি সংবদ্ধ তাতে কবিহৃদয়ের আনন্দ দিয়ে আঁকা

একটি ছবি দেখতে পাচ্ছি, সেই ছবিটি বিশ্বপ্রকৃতির নারীরূপ।

—'ছন্দ', গদ্যছন্দ ১৩৪১ বৈশাখ

এখানে কবির বক্তব্য হল, এই শ্লোকে যে ছবি ফুটেছে তার পশ্চাতে আছে ছন্দ—শুধু ভাষার ছন্দ নয়, ভাবেরও ছন্দ। অনেক 'না-বলা-বাণী' এই ভাবের ছন্দে আভাসিত হয়ে উঠে রচয়িতার অব্যক্ত ভাবকে রূপ দিয়েছে। সে রূপ যে কত আশ্চর্য-ভাবে সার্থক তা সহৃদয় কবি রবীন্দ্রনাথের উক্ত মন্তব্যেই প্রকাশ পেয়েছে। আর এই কবিত্বের ক্ষেত্রেই কবি শংকরের সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের সাধর্ম্য।

সোমদেব

কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ সোমদেবের (আনু. খ্রীঃ. ১০৬৩-১০৮১) নামে 'কথাসরিৎসাগর' নামক গ্রন্থটি প্রচলিত। এই বৃহৎ গ্রন্থটি কবি ঠিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধিগত করে নিয়েছিলেন কি না তা বলা না গেলেও এই গ্রন্থের সঙ্গে যে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল, তার প্রমাণ আছে।

'সাহিত্য' গ্রন্থের সাহিত্যসৃষ্টি প্রবন্ধে (১৩১৪ আষাঢ) কবি কথাসরিৎসাগরের উদ্‌ভব প্রসঙ্গে বলেছেন, যেসব কাহিনীর বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত টুকরো হাওয়ায় হাওয়ায় দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় এই গ্রন্থে সেইগুলিই সংহত ও শৃঙ্খলিত হয়ে একত্রে গাঁথা হয়েছে। সেই হিসাবে এই গ্রন্থ জাতীয় সাহিত্যের বৃহৎ মর্যাদার অধিকারী। অবশ্য তার পূর্বেই দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে কবি এই গ্রন্থ থেকে ইতিহাসের প্রমাণ হিসাবে কিছু উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। নিম্নে তার দুটি নিদর্শন দেওয়া গেল।

কবির ভাষায় 'বৌদ্ধযুগে'র পরবর্তী ভারতবর্ষ 'আধ্যাত্মিক অরাজকতা'র যুগ। সেই সময়ে আর্য-অনার্য জাতির মধ্যে সংমিশ্রণ চলছিল। সেই 'অনবরত বিপ্লবের সময় হিন্দুর প্রতিভা সমস্ত বিরোধবিপ্লবের মধ্যে আর্য-অনার্যের সমন্বয়-স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিল'। সেই সময়কার ইতিহাস কবি খুঁজে নিয়েছিলেন কথাসরিৎসাগরের মধ্য থেকে।—

> কথাসরিৎসাগরে আছে, একদা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু হিমাদ্রিপাদমূলে কঠোর-তপস্যা সহকারে ধূর্জটির আরাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শিব তুষ্ট হইয়া বর দিতে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মা শিবকেই নিজের পুত্ররূপে লাভ করিবার প্রার্থনা করিলেন। এই অনুচিত আকাঙ্ক্ষার জন্য তিনি নিন্দিত ও লোকের নিকট অপূজ্য হইলেন। বিষ্ণু এই বর চাহিলেন, যেন আমি তোমারই সেবাপর হইতে পারি। শিব

তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুকে নিজের অর্ধাঙ্গ করিয়া লইলেন। সেই অর্ধাঙ্গই শিবের শক্তিরূপিণী পার্বতী।

এক-এক সময়ে এক-এক দেবতা বড়ো হইয়া অন্যান্য দেবতাকে কিরূপে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই গল্পেই তাহা বুঝা যায়। ব্রহ্মা, যিনি চারি বেদের চতুর্মুখ বিগ্রহস্বরূপ, তিনি বেদবিদ্রোহী বৌদ্ধযুগে অধঃকৃত হইয়াছিলেন। বিষ্ণু, যিনি বেদে ব্রাহ্মণদের দেবতা ছিলেন, তিনিও এক সময়ে হীনবল হইয়া এই শ্মশানচারী কপালমালী দিগম্বরের পশ্চাতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

—'সাহিত্য', বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯

আবার যে অদ্ভুতাচারী অনার্যদেবতা আর্য দেবসমাজে বলপূর্বক প্রবেশ করেন, তাঁর ক্রিয়াকলাপের সন্তোষজনক কৈফিয়তও কবি এই গ্রন্থ থেকে খুঁজে নিয়েছিলেন।—

কথাসরিৎসাগরেই আছে, একদা পার্বতী শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নরকপালে এবং শ্মশানে তোমার এমন প্রীতি কেন?' এ প্রশ্ন তখনকার আর্যমণ্ডলীর প্রশ্ন। ·· মহেশ্বর উত্তর করিলেন, 'কল্পাবসানে যখন জগৎ জলময় ছিল তখন আমি উরু ভেদ করিয়া একবিন্দু রক্তপাত করি। সেই রক্ত হইতে অণ্ড জন্মে, সেই অণ্ড হইতে ব্রহ্মার জন্ম হয়। তৎপরে আমি বিশ্বসৃজনের উদ্দেশে প্রকৃতিকে সৃজন করি। সেই প্রকৃতিপুরুষ হইতে অন্যান্য প্রজাপতি ও সেই প্রজাপতিগণ হইতে অখিল প্রজার সৃষ্টি হয়। তখন, আমিই চরাচরের সৃজনকর্তা বলিয়া ব্রহ্মার মনে দর্প হইয়াছিল। সেই দর্প সহ্য করিতে না পারিয়া আমি ব্রহ্মার মুণ্ডচ্ছেদ করি—সেই অবধি আমার এই মহাব্রত, সেই অবধিই আমি কপালপাণি ও শ্মশানপ্রিয়।

এই গল্পের দ্বারা এক দিকে ব্রহ্মার পূর্বতন প্রাধান্যচ্ছেদন ও ধূর্জটির আর্যরীতিবহির্ভূত অদ্ভুত আচারেরও ব্যাখ্যা হইল।

—পূর্ববৎ

কথাসরিৎসাগর থেকে যে কাহিনী দুটি রবীন্দ্রনাথ বিবৃত করেছেন সে দুটি মূল গ্রন্থের যথাক্রমে আদিতরঙ্গ ২৭ এবং ২৯-৩২ এবং দ্বিতীয় তরঙ্গ ৯-১৪ সংখ্যক শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ। এর দ্বারা কবির সঙ্গে মূল গ্রন্থের পরিচয়টি সূচিত হচ্ছে। আবার কথাসরিৎসাগরের উক্ত কাহিনী দুটির থেকে তিনি ভারতের সামাজিক ইতিহাসের যে লুপ্ত সূত্রটি আবিষ্কার করেন ও তার নিগূঢ় তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন, তা শুধু তাঁর মতো অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীর পক্ষেই সম্ভব।

বিহ্লণ

'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত'-রচয়িতা বিহ্লণের (আনু. খ্রীঃ ১০৭৬-১১২৭) বিশেষ খ্যাতি তাঁর 'চৌরপঞ্চাশিকা' (বা চৌরীসুরতপঞ্চাশিকা) নামক কাব্যখানির জন্য।[১] এই কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দীর্ঘদিনের, কারণ হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহে এই কাব্যখানি স্থান পেয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে তা পেন্‌সিলে চিহ্নিত আছে। তবে এ গ্রন্থ সম্বন্ধে কবির কোনো স্বতন্ত্র মন্তব্য পাওয়া যায় না।

'সাহিত্য' গ্রন্থের আলস্য ও সাহিত্য প্রবন্ধে (১২৯৪ শ্রাবণ) কবি পরোক্ষে এই কাব্যের দশম শ্লোকটি স্মরণ করেছেন। বিকৃত 'আলস্যের সাহিত্য' হিসাবে তিনি ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যটির উদাহরণ দিয়েছেন এবং হৃদয়ের আবেগ কল্পনার তেজ হারিয়ে কিভাবে কেবল বঙ্কিম কথা-কৌশলে পরিণত হয়, তা দেখাতে গিয়ে উদ্ধৃত করেছেন—

অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা।

.. ..

এখনো সে মোর মনে আছয়ে সর্বথা,
একরাতি মোর দোষে না কহিল কথা।
বিস্তর যতনে নারি কথা কহাইতে
ছলে হাঁচিলাম 'জীব' বাক্য বলাইতে।
আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল
জানায়ে পরিল কানে কনককুণ্ডল।

—বিদ্যাসুন্দর

এ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য হল—

এইরূপ অত্যদ্ভুত মানসিক ব্যায়ামচর্চার মধ্যে শৈশবকল্পনার আত্মবিস্মৃত সরলতাও নাই এবং পরিণত কল্পনার সুবিচারসংগত সংযমও নাই।...বদ্ধ মলিন জলে যেমন দূষিতবাষ্পস্ফীত গাঢ় বুদ্‌বুদ্‌শ্রেণী ভাসিয়া উঠে তেমনি আমাদের এই বিলাস-কলুষিত অলস বঙ্গসমাজের মধ্য হইতে ক্ষুদ্রতা ও ইন্দ্রিয়বিকারে পরিপূর্ণ হইয়া

---

১ দ্রষ্টব্য : A History of Sanskrit Literature (1948, p 188) by A. B. Keith

অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর ভাসিয়া উঠিয়াছিল।

—'সাহিত্য', আলস্য ও সাহিত্য

এখানে বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে কবি যে ধিক্কার দিয়েছেন তা 'চৌরপঞ্চাশিকার'ও প্রাপ্য। কেননা উদ্ধৃত বিদ্যাসুন্দরের পঙ্‌ক্তিগুলি চৌরপঞ্চাশিকার ১০ম শ্লোকেরই অনুবাদ। এ স্থলে একটি বিষয় লক্ষণীয়। হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহে উক্ত শ্লোকের যে পাঠ আছে, রবীন্দ্র-উদ্ধৃত শ্লোকটির প্রথম পঙ্‌ক্তির পাঠ তার থেকে স্বতন্ত্র।[১]

চৌরপঞ্চাশিকা কাব্যখানি কোনো কোনো অংশে ভাষার প্রগল্‌ভ চাতুর্যে কৃত্রিম হয়ে উঠলেও সমগ্রভাবে তা একটি উৎকৃষ্ট কাব্য হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য। Keith তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যান্য সংস্কৃত কাব্যের তুলনায় এই কাব্যটিকে যথেষ্ট উচ্চস্থান দিয়েছেন। সমগ্র কাব্যখানির প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবও যে বিশেষ অনুকূল ছিল 'কল্পনা' কাব্যের অন্তর্গত চৌরপঞ্চাশিকার কবিতাটি তার প্রমাণ। কালিদাসের কাব্যরসে মুগ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেঘদূত ('মানসী', 'চৈতালি'), কুমারসম্ভব ('চৈতালি'), ঋতুসংহার ('চৈতালি') প্রভৃতি কবিতায় ওই কাব্যগুলির প্রশস্তি রচনা করেছিলেন। একমাত্র চৌরপঞ্চাশিকা ছাড়া আর কোনো সংস্কৃত কাব্য কবির হাতে ততদূর সম্মান লাভ করে নি, এমন কি জয়দেবের গীতগোবিন্দও নয়।

চৌরপঞ্চাশিকার প্রতি তাঁর আকর্ষণের অন্যতম কারণ বোধ হয় তার ছন্দোমাধুর্য। কাব্যখানি আগাগোড়া বসন্ততিলক ছন্দে গাঁথা। মৃদঙ্গগম্ভীর মন্দাক্রান্তাবাহিত মেঘদূত যে কারণে তাঁর অন্তরে একটি স্থায়ী আসন অধিকার করতে পেরেছিল, সেই কারণেই এ কাব্য বসন্ততিলকের মনোরম ছন্দোঝংকারে তাঁর হৃদয়কে আকৃষ্ট করেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'চৌরপঞ্চাশিকা' কবিতায় তাই 'সোনার ছন্দপিঞ্জরে' বন্দী পঞ্চাশজোড়া শুকসারীর মধুর শ্লোকঝংকারের প্রতি কবির মুগ্ধ হৃদয়ের অভিনন্দনা প্রকাশ পেয়েছে।—

ওগো সুন্দর চোর,
এক সুরে বাঁধা পঞ্চাশ গাথা
শুনে মনে হয় মোর—
রাজভবনের গোপনে পালিত,
রাজবালিকার সোহাগে লালিত,
তব বুকে বসি শিখেছিল গীত

১ দ্রষ্টব্য : হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহ অধ্যায়

ওগো সুন্দর চোর,
পোষা শুক সারী মধুরকণ্ঠ
যেন পঞ্চাশ-জোড়।

ওগো সুন্দর চোর
তোমারি রচিত সোনার ছন্দ-
পিঞ্জরে তারা ভোর।

—'কল্পনা', চৌরপঞ্চাশিকা ১৩০৪ জ্যৈষ্ঠ

ভারবি-মাঘ-শ্রীহর্ষ

সংস্কৃত সাহিত্যের আর তিনজন প্রসিদ্ধ কবি হলেন কিরাতার্জুনীয়ম্-রচয়িতা ভারবি (আনু. খ্রীঃ ষষ্ঠ শতক), শিশুপালবধ-এর কবি মাঘ (আনু. খ্রীঃ সপ্তম শতকের শেষার্ধ) ও নৈষধচরিত বা নৈষধীয় কাব্য-প্রণেতা শ্রীহর্ষ (আনু. খ্রীঃ দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)। রবীন্দ্রসাহিত্যে এঁদের রচনা থেকে কোনো উদ্‌ধৃতি বা সে সম্বন্ধে কোনো আলোচনা চোখে পড়ে নি। তবে প্রসঙ্গক্রমে তাঁদের সম্বন্ধে যে দুএকটি পরোক্ষ বা অকিঞ্চিৎকর উল্লেখ চোখে পড়েছে, সম্পূর্ণতার খাতিরে এ স্থলে তারও একটু পরিচয় দেওয়া গেল। 'গল্পগুচ্ছে'র অন্তর্গত বোষ্টমী গল্পের (১৩২১ আষাঢ়) এক স্থানে আছে—

> আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিতে হয়, কপালক্রমে সেগুলি হিতকথা নয়, মনোহারী তো নহেই।

কবির এই উক্তিতে ভারবির 'হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ' এই বাণীর প্রতিধ্বনি শোনা যায়। আর ছন্দ-বিশেষের গতিভঙ্গির উপমাপ্রসঙ্গে তিনি কবি মাঘকে[১] এবং নৈষধচরিত কাব্যের নায়িকাদের কথা স্মরণ করেছেন।—

> এই তিনমাত্রার এবং জোড়-বিজোড় মাত্রার ছন্দে পদক্ষেপ মাঘনৈষধের নায়িকাদের মতো মরালগমনে, ডাইনে-বাঁয়ে ঝোঁকে ঝোঁকে হেলতে দুলতে।

—'ছন্দ', গদ্যছন্দ ১৩৪১ বৈশাখ

মনে হয় যে-কোনো কারণেই হক, এই তিন কবির কাব্যসৃষ্টি রবীন্দ্রচিত্তে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

১ দ্রষ্টব্য : প্রথম পর্ব, নীতিসাহিত্য : হিতোপদেশ।

জয়দেব

বাঙালি কবি জয়দেবের (আনু. খ্রীঃ ১১৫০-১২০০) সংস্কৃত কাব্য 'গীতগোবিন্দ'-এর খ্যাতি প্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। হরিস্মরণেচ্ছু ভক্ত তথা বিলাসকলাকুতূহলী রসজ্ঞ পাঠক, উভয়ের প্রতি লক্ষ রেখে কবি এই কাব্যখানি রচনা করেন। তাই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছিল এ গ্রন্থের সাদর স্বীকৃতি। কিন্তু আধুনিক কালের বিশেষ ধর্মসংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী পাঠক সরস কাব্য হিসাবে এই গ্রন্থের মর্যাদা দিলেও তার গূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ স্বীকার করতে নারাজ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়।

সাহিত্যসাধক-চরিতমালায় ('বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' ১৩৪৯ বংশপরিচয় পৃ ৮) বঙ্কিমচন্দ্রের চরিতকার বলেছেন যে বাল্যকালে "গীতগোবিন্দের 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে' কবিতাটি তিনি প্রায়ই আওড়াইতেন"। দীর্ঘ দিন পরে ১৮৮২ সালে প্রকাশিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে (১ম খণ্ড ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, ৩য় খণ্ড সপ্তম পরিচ্ছেদ) তাঁর এই কাব্যপ্রীতির সুস্পষ্ট পরিচয় ধরা দিয়েছে। তিনি জয়দেবকে যে কী দৃষ্টিতে দেখতেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ উপলক্ষে তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে মন্তব্য করেন—

> এই প্রাচীন দেশে, দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী।…
> জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।
>
> —মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গদর্শন ১২৮০ ভাদ্র

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রও এ কাব্যে হরিস্মরণের গভীরতার চেয়ে বিলাসকলার লীলাই প্রত্যক্ষ করেছিলেন।—

> জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাসপূর্ণ। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ জয়দেব।
>
> — বিবিধ প্রবন্ধ', বিদ্যাপতি ও জয়দেব ১২৮০ পৌষ

পরবর্তী কালের বুদ্ধিজীবী সমালোচক প্রমথ চৌধুরী জয়দেবকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হিসাবে গণ্য করেছেন এবং স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন—

> আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে এ কাব্যে আধ্যাত্মিকতার কোনো পরিচয় নাই।
>
> —'প্রবন্ধসংগ্রহ' ১ম খণ্ড, জয়দেব ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ

রবীন্দ্র-ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—

এই গীতগোবিন্দে গীত থাকিতে পারে, কিন্তু গোবিন্দ আছেন কি না আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে।

—চিত্র ও কাব্য : জয়দেব ১৩০০ ফাল্গুন[১]

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষ সমালোচকবৃন্দ এই গ্রন্থকে নিছক প্রণয়কাব্য হিসাবে দেখেছেন এবং সেই নিরিখে তার মূল্য নির্ণয় করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বসূরীর এই গ্রন্থকে কি দৃষ্টিতে দেখেছিলেন সেটুকুই বর্তমানে আমাদের আলোচ্য।

জয়দেব সম্বন্ধে কবির মনোভাব অনুধাবন করতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে, এ সম্বন্ধে তিনি কোনো স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করেন নি। অথচ জয়দেব সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্যের যে কিছু মাত্র অভাব ছিল না তার প্রমাণ ১৮৯০ সালে তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন—

জয়দেব সম্বন্ধে কি রকম? কিছু লিখ্‌লে কি? জয়দেবকে কি ভাবে আলোচনা করবে আমি বুঝ্‌তে পারচি নে। তার কবিতা সম্বন্ধে কি বলতে চাও?

—'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-২, ১৮৯০ জুন ৩

পরের পত্রেই তিনি লিখছেন—'তোমার জয়দেব প্রবন্ধটা পড়বার প্রত্যাশায় রইলুম' ('চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৩, ১৮৯০ জুন ২১)। সুতরাং মনে হয় প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধটি তিনি নিশ্চয় পড়েছিলেন। আবার বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি রবীন্দ্র-সম্পাদিত সাধনায় প্রকাশিত হয়েছিল। অতএব অনুমান করা চলে যে, এই প্রবন্ধের বক্তব্য তাঁর সমর্থন পেয়েছিল। কারণ জয়দেব সম্বন্ধে যদি তাঁর কোনো নূতন বিশেষ মন্তব্য থাকত তাহলে তিনি তা প্রকাশ করতেন। তবু তাঁর মতের কিছু বৈশিষ্ট্য নিশ্চয় ছিল এবং বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রসঙ্গতঃ জয়দেব বা গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে যত মন্তব্য পাওয়া যায় তার থেকে এ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবের মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া অসম্ভব নয়।

২

গীতগোবিন্দ কাব্যের সঙ্গে কবির প্রথম পরিচয় হয়েছিল নিতান্ত বাল্যকালে। সে সম্বন্ধে কবি নিজেই বলেছেন—

একবার বাল্যকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির

১ দ্রষ্টব্য : 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী' ১৩৬৪, সাহিত্যপরিষৎ সংস্করণ

মধ্যে একখানি অতি পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম।··· সেই গীতগোবিন্দখানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না।··· জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম।

—'জীবনস্মৃতি', পিতৃদেব

শৈশবেই গীতগোবিন্দ কবিকে যে কিভাবে মুগ্ধ করেছিল, উপরের উদ্ধৃতিটিতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে সে মুগ্ধতা যে তাব পারমার্থিক তত্ত্ব আবিষ্কারে নয় বরং কাব্যরসের বিশেষতঃ ধ্বনিবসের অস্পষ্ট উপলব্ধিতে, তাঁর নানা উক্তি থেকে সে কথা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। জয়দেবের কাব্যকে কবি যে জীবনরসপূর্ণ পার্থিব কাব্য হিসাবে দেখেছেন তারও পরিচয় আছে। কোনো এক বসন্তদিনে তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবত বন্ধ করতে অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন—

শাস্ত্র যদি নেহাত পড়তে হবে
গীত-গোবিন্দ খোলা হোক-না তবে।
শপথ মম, বোলো না এই ভবে
জীবনখানা শুধুই স্বপ্নবৎ।

—'ক্ষণিকা' ১৯০০, যুগল

আবার 'গল্পগুচ্ছ'-এর অন্তর্গত ত্যাগ গল্পের (১২৯৯) প্রথম পরিচ্ছেদে কবি যে প্রসঙ্গে জয়দেবকে স্মরণ করেছেন, তাতেও এ কাব্যেব বিলাসকলার দিক্‌টিই প্রাধান্য পেয়েছে।

গীতগোবিন্দ গ্রন্থকে রবীন্দ্রনাথ কোথাও আধ্যাত্মিক মর্যাদা দেন নি। কিন্তু তার 'মধুরকোমলকান্ত পদাবলী'কে তিনি প্রথম শ্রেণীর গীতিকাব্যের সম্মান দিতে কুণ্ঠিত নন। তাঁর 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের (১৯১৬) সন্দীপ তাই বিমলাকে বলেছে—

যে বিধাতা আপনাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি যে গীতিকবি, জয়দেব তাঁরই পায়ের কাছে বসে 'ললিতলবঙ্গলতা'য় হাত পাকিয়েছেন।

—'ঘরে-বাইরে', সন্দীপের আত্মকথা

'চিরকুমার সভা' (১৯২৬) ও 'শেষ রক্ষা' (১৯২৮) নাটক দুটিতে লীলাবিলসিত প্রেমের অনুপ্রাসমধুর বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ জয়দেবকে স্মরণ করেছেন। তবে প্রণয়কলার কাব্য হিসাবে গীতগোবিন্দকে তিনি যত না স্মরণ করেছেন, তার চেয়ে বেশি স্মরণ

করেছেন তাকে বর্ষার কাব্য হিসাবে। তার মূলে আছে এ কাব্যের প্রথম শ্লোকের প্রথম পদটি।—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ।

রবীন্দ্রনাথের মনে সমস্ত বর্ষাকাব্যের স্মৃতির সঙ্গে এটি একই সূত্রে গাঁথা হয়ে ছিল। তাই মেঘদূত লিখতে বসে তাঁর মনে হয়েছে—

জয়দেব কবি, আর এক বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমালবিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুব অম্বর।

—'মানসী', মেঘদূত ১২৯২ জ্যৈষ্ঠ

১২৯৯ সালে দেখি সেই অনুভূতিরই স্ফুটতর প্রকাশ।—

আষাঢ় হতেছে শেষ, মিশায়ে মল্লার দেশ
রচি "ভবাবাদরে"র সুর
খুলিয়া প্রথম পাতা, গীতগোবিন্দের গাথা
গাহি "মেঘে অম্বর মেদুর"।

—'সোনার তরী', বর্ষা-যাপন

নিছক কাব্যের প্রয়োজনেই যে তিনি এই ভাবটি স্মরণ করেছেন তা নয়। ব্যক্তিগত চিঠিপত্রেও বর্ষার দিনে অনিবার্যভাবেই তাঁর মনে এসেছে ওই শ্লোক। জগদীশচন্দ্র বসুকে ('চিঠিপত্র' ৬, পত্র-২১, ১৯০২ জুন ২০) ও হেমন্তবালা দেবীকে ('চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৯৮, ১৯৩৬ মে ১৩) লেখা পত্র দুটি তার প্রমাণ। 'পারস্যযাত্রী' গ্রন্থে (অধ্যায় ৯) দেখি কির্মিনশার পথে যেতে প্রথম বর্ষণ দেখে তাঁর ওই শ্লোকটিই মনে পড়েছে। আর ১৩৪১ সালে এই শ্লোকটিব সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে কবি বলেছেন—

> আকাশ কালো মেঘে স্নিগ্ধ, বনভূমি তমালগাছে শ্যামবর্ণ, ব্যাপারটা এর বেশি কিছুই নয়, খবরটা একবারের বেশি দুবার বললে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিই। কবি বরাবরকার মতো বলতে থাকলেন
>
> মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ।
>
> কবি মনের মেঘলা দিনের সংবেগ চড়ে বসল ছন্দ-পক্ষিরাজের পিঠে, চলল চিরকালের মনোহরণ করতে।

—'ছন্দ', গদ্যছন্দ ১৩৪১ বৈশাখ

কবির মতে এই শ্লোকের মনোহারিত্ব অনেকাংশেই নির্ভর করছে তার ভাবগম্ভীর

শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের উপর। কিন্তু শুধু ছন্দ নয়, নরেন্দ্র দেবকে লেখা পত্রে (১৩৩৬ আশ্বিন ২৯) তিনি জানিয়েছিলেন—

> শ্লোকটিতে তিনি (জয়দেব) সংস্কৃতশব্দপুঞ্জে ধ্বনির মৃদঙ্গ বাজিয়ে মেঘলা রাত্রির সংগীতটিকে ঘনিয়ে তুলেছেন।
>
> —'রূপান্তর' ১৯৬৫, গ্রন্থ-পরিচয়, পৃ ২১৬

তাই ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে শব্দঝংকারও এই শ্লোকটিকে ভাবে ও রূপে সার্থক করে তুলে সুদূর জয়দেবের কালকে পেরিয়ে আধুনিক যুগের রসিক সমাজের দরবারে পৌঁছে দিতে পেরেছে।

৩

গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটিই শুধু নয়, সমগ্র গীতগোবিন্দ কাব্যখানিই আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পেরেছিল প্রধানতঃ তার সুনির্বাচিত শব্দ ও ছন্দ-প্রয়োগের নৈপুণ্যে। বালক রবীন্দ্রনাথও এই গুণেই এ কাব্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কবি নিজেই তার পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

> জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মধ্যে যে জিনিসটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্য নহে। আমার মনে আছে 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং'—এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত—ছন্দের ঝংকারের মুখে 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং' এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। গদ্যরীতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত—সেইটেই আমার বড়ো আনন্দের কাজ ছিল।
>
> —'জীবনস্মৃতি', পিতৃদেব

ছেলেবেলায় জয়দেবের ছন্দকে কবি নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার ও আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে বাংলায় নূতন ছন্দ উদ্‌ভাবন করতে বসে জয়দেবের কাছ থেকেই তিনি ঋণ গ্রহণ করেছিলেন সবচেয়ে বেশি। গীতগোবিন্দের সুরঝংকৃত ভাষাও তাঁকে মুগ্ধ করেছিল সমধিক এবং এই বিষয়েও তিনি জয়দেবের কাছে ঋণী। তবে ভাষা ও ছন্দের এই ঋণ সুসমঞ্জসরূপে তাঁর সৃষ্টির অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। তাই তা তাঁর কাব্যের লাবণ্যই বাড়িয়েছে, তাকে আচ্ছন্ন করে নি। উদাহরণস্বরূপ 'কল্পনা' কাব্যের অন্তর্গত মদনভস্মের পরে কবিতাটি (১৩০৪) ধরা যাক।—

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছে এ কি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে ওঠে নিশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

ভাববস্তু তথা প্রসাধনকলার প্রয়োজনে এই কবিতায় কবি একই সঙ্গে কালিদাস ও জয়দেবের দ্বারস্থ হয়েছেন। মদনভস্মের ভাবটি নিয়েছেন কুমারসম্ভব থেকে, আর পাঁচ-মাত্রার কলাবৃত্ত ছন্দটি জয়দেবের 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি'...ইত্যাদির হুবহু অনুস্মৃতি। এ ছাড়া জয়দেবের আদর্শেই এর অনুপ্রাসমধুর ধ্বনিগুলি বিন্যস্ত। তবু ভস্মীভূত মদনের যে অভিনব পরিণতিটি ছন্দে ভাষায় ঝংকৃত হয়ে এক বিশেষ ভাবরসে ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছে, তার স্বাদ সম্পূর্ণ নূতন এবং তা একান্তভাবে রবীন্দ্রপ্রতিভারই সৃষ্টি।

ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জয়দেবের কাছে কতদূর ঋণী, পরবর্তী ভাষা, ছন্দ ও অলংকার অধ্যায়ে তার বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। যাই হক, জয়দেব সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় যে নিছক ভাষা বা ছন্দ নয়, কিন্তু ভাষা-ছন্দে প্রসাধিত জয়দেবের কাব্য যখন সার্থক কবিত্বে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে তখন সমগ্রভাবে তার রসকে কবি উপভোগ করেছিলেন।

৪

জয়দেবের 'মধুরকোমলকান্ত পদাবলী' অ-পূর্ব হলেও কবির মতে 'ইংরেজি অলংকারে যে শ্রেণীর কবিতাকে lyrics বলে' গীতগোবিন্দ তা নয়। কারণ মৃত সংস্কৃত ভাষায় মানুষের হৃদয়ের কথা সম্পূর্ণ করে বলা যায় না। তাই তাঁর মন্তব্য—

> বাঙালি জয়দেব সংস্কৃত ভাষাতেও গান রচনা করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু বাঙালি বৈষ্ণব কবিদের বাংলা পদাবলীর সহিত তাহার তুলনা হয় না।
>
> —'প্রাচীন সাহিত্য', কাদম্বরী চিত্র ১৩০৬ মাঘ

অবশ্য পূর্বের এক প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন, সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিসংগীত সুরের অভাব পূর্ণ করে।—

> বাঙালি জয়দেবের গীতগোবিন্দ আধুনিক এবং তাহাকে একহিসাবে গান না বলিলেও চলে। কারণ, তাহার ভাষালালিত্য ও ছন্দোবিন্যাস এমন সম্পূর্ণ যে তাহা সুরের অপেক্ষা রাখে না; বরং আমার বিশ্বাস সুরসংযোগে তাহার স্বাভাবিক শব্দনিহিত সংগীতের লাঘব করে।
>
> —'ছন্দ', বাংলা শব্দ ও ছন্দ ১২৯৯ শ্রাবণ

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ জয়দেবকে মুখ্যতঃ কাব্যের বহিরঙ্গের প্রসাধনেই কুশলী হিসাবে দেখেছেন, তাঁর পদঝংকারে আনন্দও পেয়েছেন। কিন্তু জয়দেবের ললিতকোমল ভাষা-বিন্যাস তাঁকে বেশি দিন মুগ্ধ রাখতে পারে নি। তার পরিচয় পাই আর এক প্রবন্ধে।—

> জয়দেবের 'ললিতলবঙ্গলতা' ভালো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন-মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়। 'ললিতলবঙ্গলতা'র পার্শ্বে কুমারসম্ভবের একটা শ্লোক ধরিয়া দেখা যাক—
>
> আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
> বাসো বসানা অরুণার্করাগম্।
> পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
> সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।
>
> ছন্দ আলুলায়িত নহে, কথাগুলি যুক্তাক্ষরবহুল, তবু ভ্রম হয়, এই শ্লোক ললিতলবঙ্গলতার অপেক্ষা কানেও মিষ্ট শুনাইতেছে।··· মন নিজের সৃজনশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ পূরণ করিয়া দিতেছে।···পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা,··· ছন্দকে যে দোলা দিয়াছে, তাহা জয়দেবী লয়ের মতো অতিপ্রত্যক্ষ নহে—তাহা নিগূঢ়। ···এই শ্লোকের মধ্যে যে-একটি ভাবের সৌন্দর্য তাহাও আমাদের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অশ্রুতিগম্য একটি সংগীত রচনা করে, সে সংগীত সমস্ত শব্দসংগীতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।
>
> —'বিচিত্র প্রবন্ধ', কেকাধ্বনি ১৩০৮ ভাদ্র

দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও কবির এই মনোভাবের পরিবর্তন হয় নি।

> 'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন' মধুর হতে পারে, কিন্তু 'বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী' মনোহর। একটা কানের, আর-একটা মনের।
>
> —'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব ১৩৪০ ভাদ্র

সুতরাং জয়দেবের পদবিন্যাসে লালিত্য থাকলেও তার মধ্যে এমন কোনো গভীর আবেদন নেই যা চৈতন্যকে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলতে পারে। কবি তাই লঘু কৌতুকের সুরে এই 'চোখ ভোলানো দুর্বল ললিতকলার বিরুদ্ধে স্থূলতম প্রোটেস্ট' জানিয়েছেন।—

> বাঁশিওলা চুপ রাও
> টান মেরে উপ্‌ড়াও
> ধরা হতে ললিতলবঙ্গলতা।
>
> —'সে' ১৯৩৭, অধ্যায় ১২

তবে জয়দেবের বাণীহীন ভাবালালিত্যের প্রতি কটাক্ষ করলেও তাঁর ছন্দকে তিনি মেনেছেন আজীবন। 'সে' উক্ত ছন্দান্বিত 'প্রোটেস্ট' শুনে পরিহাস করে বলেছিল 'জয়দেবের ভূত এখনো কাঁধে বসে ছন্দের সার্কাস করছে, কানের দখল ছাড়ে নি'। পরিহাসের সুরটুকু বাদ দিয়ে 'সে'র এই মন্তব্যটি রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে অল্পাধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পরবর্তী ভাষা, ছন্দ ও অলংকার অধ্যায়ে এ কথার সত্যতা সপ্রমাণ করা যাবে।

হেবরলিনের 'কাব্যসংগ্রহ'

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের যেসব উদ্ধৃতি বা ভাব রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন, তা অধিকাংশ স্থলে মূল গ্রন্থ থেকে গৃহীত নয়। অনেকক্ষেত্রেই তা কোনো-না-কোনো সংকলন গ্রন্থ থেকে নেওয়া। বেদ-উপনিষদ, রামায়ণ-মহাভারত, মনুসংহিতা ইত্যাদির অধিকাংশ শ্লোকের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় যেমন মহর্ষি-সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ থেকে, বৌদ্ধ পালি শ্লোকের সঙ্গে পরিচয় 'হস্তসার' বা 'রত্নমালা' গ্রন্থের সহায়তায়, বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় অক্ষয়কুমার সরকার ও সারদাচরণ মিত্র-সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' থেকে, তেমনি অধিকাংশ সংস্কৃত কাব্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ডাঃ হেববলিন-সংকলিত 'কাব্যসংগ্রহ' (১৮৪৭) গ্রন্থ থেকে।[১]

১৮৭৮ সালে প্রথমবার বিলাতযাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যখন আমেদাবাদে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে ছিলেন তখনই এ গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। এ সম্বন্ধে স্বয়ং কবিই লিখেছেন—

> লাইব্রেরিতে আর-একখানি বই ছিল, সেটি ডাক্তার হেবর্লিন কর্তৃক সংকলিত শ্রীরামপুরের ছাপা পুরাতন সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহগ্রন্থ। এই সংস্কৃত কবিতাগুলি বুঝিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।
>
> —'জীবনস্মৃতি', আমেদাবাদ

উক্ত মন্তব্যে এই গ্রন্থের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগটি ব্যক্ত হয়েছে। কবি-ব্যবহৃত হেবরলিনের 'কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থটি বর্তমানে বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্রভবনে' রক্ষিত আছে। সেই সংস্করণটির আখ্যাপত্রের বিবরণ হল—

> কাব্যসংগ্রহঃ/ অর্থাৎ/ কালিদাসাদিমহাকবিগণ/ বিরচিত ত্রিপঞ্চাশৎ/ উত্তমসম্পূর্ণ-কাব্যানি/ শ্রী ডাক্তর যোহন হেবরলিন কর্তৃক/ সমাহৃতমুদ্রিতানি/ শ্রীরামপুরীয়-চন্দ্রোদয় যন্ত্রে/১৮৪৭

হেবরলিনের 'কাব্যসংগ্রহ'-এর আরও দুটি সংস্করণ (১৮৬০ সালে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী প্রেসে মুদ্রিত এবং ১৮৭৩।৭৪ সালে কলিকাতার সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর

---

১. A. B. Keithও তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে মোহমুদ্গর, আনন্দলহরী, দৃষ্টান্তশতক প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের আধারস্থল হিসাবে হেবরলিনের 'কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন।

প্রেসে মুদ্রিত ও দুই খণ্ডে প্রকাশিত) পাওয়া যায়। তবে রবীন্দ্রনাথ সেগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কি না জানা যায় নি।

রবীন্দ্রপঠিত সংস্করণটি পাতায় পাতায় পেন্‌সিলে কদাচিৎ কালিতে নানা প্রকারে চিহ্নিত। তবে এই গ্রন্থ প্রকাশের তারিখ ১৮৪৭ সাল অর্থাৎ কবির জন্মের চৌদ্দ বছর পূর্বে এবং এটি কবির হাতে আসে ১৮৭৮ সালে আমেদাবাদে সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরিতে। কবির বয়স তখন সতেরো। সুতরাং এই বিশেষ গ্রন্থটির সব চিহ্নই যে রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত এমন কথা জোর করে বলা চলে না। এগুলির কিছু নবরত্নমালা-সংকলক সত্যেন্দ্রনাথের কৃত হতে পারে। তা ছাড়া কিছু চিহ্ন দ্বিজেন্দ্রনাথ বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এমন কি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হওয়াও বিচিত্র নয়। তবু তার মধ্যেও বেশির ভাগ যে রবীন্দ্রচিহ্নিত তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়।

২

রবীন্দ্র-ব্যবহৃত 'কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থটির ১৬১ পৃষ্ঠায় ভর্তৃহরির নীতিশতকের অন্তর্গত এই দশম শ্লোকটি পাই।—

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎপথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥

এই শ্লোকের পাশে মার্জিনে পেন্‌সিলে কাত করে লেখা আছে—

নীতিজ্ঞ করুক নিন্দা, অথবা স্তবন,
লক্ষ্মী গৃহে আসুন বা ছাড়ুন ভবন
অদ্য মৃত্যু হোক কিম্বা হোক্ যুগান্তরে,
ন্যায় পথ হতে ধীর কিছুতে না সরে॥

লেখাটির হস্তাক্ষর রবীন্দ্রনাথের বলেই মনে হয়। অনুবাদটি 'র' স্বাক্ষরে নবরত্নমালায় সংকলিত আছে। ১৩৪৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসীতে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংস্কৃত শ্লোকদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ' শিরোনামে এই অনুবাদ প্রকাশ করেন। 'রূপান্তর' (১৯৬৫) নামক রবীন্দ্রকৃত অনুবাদ-সংকলন গ্রন্থেও দুটি পাঠান্তরসহ অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং এটি যে রবীন্দ্রকৃত তাতে সন্দেহ নেই। তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলবার হল, এই অনুবাদের যে তিনটি পাঠ রূপান্তরে ধৃত হয়েছে তার চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে 'কিছুতে' স্থলে 'এক পা' আছে। কেবল

হেবরলিনের উক্ত সংস্করণের পৃষ্ঠাতেই লিখিত আছে 'কিছুতে'।

ভর্তৃহরির শৃঙ্গারশতকের প্রথম শ্লোকের পাশেও কবিকৃত একটি অনুবাদ লিখিত আছে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটিকেও রবীন্দ্রনাথের বলেই তাঁর প্রবন্ধে মত প্রকাশ করেছেন এবং সেই হিসাবে এটি 'রূপান্তর' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থে সংকলিত মোট তিপ্পান্নখানি কাব্যের মধ্যে আটত্রিশটি কাব্যের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় পেন্‌সিলের কোনো-না-কোনো রকম চিহ্ন দেখা যায়। কবি তাঁর রচনায় এই আটত্রিশটি কাব্যের প্রায় একুশটি কাব্য থেকে উদ্ধৃতি বা ভাব সংকলন করেছেন। এর দ্বারা কবিকর্তৃক এই কাব্যগুলির সযত্ন অনুশীলন সূচিত হয়। বর্তমান গ্রন্থের উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে কাব্যসংগ্রহে প্রাপ্ত শ্লোকগুলি 'হে' অক্ষরে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই গ্রন্থের চিহ্নগুলি কবির মনোভাব অনুযায়ী কিছু অনুকূলতাসূচক, কিছু বা প্রতিকূলতাজ্ঞাপক। রবীন্দ্রনাথের মনোজীবনের সঙ্গে কিছু পরিমাণে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই কাছেই ধরা পড়বে যে এই অনুকূল বা প্রতিকূল চিহ্নগুলি তাঁর চরিত্রসংগতই হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ হলায়ুধের 'ধর্মবিবেক' কাব্যের ৩১৭ সংখ্যক শ্লোকটি ধরা যাক।—

দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥

হেবরলিনের গ্রন্থের ৫০৯ পৃষ্ঠায় এই শ্লোকের প্রথম পঙ্‌ক্তির পাশে মার্জিনে পেনসিলে একটি ঢ্যারা চিহ্ন '×' আছে। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, শ্লোকটির প্রথম পঙ্‌ক্তি কবির মনের সায় পায় না, অর্থাৎ দেব-দ্বিজ মন্ত্র তীর্থ-দৈবজ্ঞে কবির আস্থা নেই। কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির ভাবনার অনুরূপ সিদ্ধিলাভ তাঁর সমর্থন পেয়েছে। তাই বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি এই পঙ্‌ক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন। উপাদান সংগ্রহ বিভাগে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। ওই গ্রন্থের ১৬৭ পৃষ্ঠার আরও একটি শ্লোকের পাশে একটি বৃহৎ ঢ্যারা চিহ্ন '×' কবির এই মনোভাবকেই সমর্থন করেছে।—

নৈবাকৃতিঃ ফলতি নৈব কুলং ন শীলং
বিদ্যাপি নৈব ন চ যত্নকৃতাপি সেবা।
ভাগ্যানি পূর্বতপসা কিল সঞ্চিতানি
কালে ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষাঃ॥

—ভর্তৃহরি : 'নীতিশতক' ৪৫

যে কবি ১৮৭৮ সালে ('মালতী পুঁথি', পৃ ৫৬) লিখেছিলেন—

পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যুঝিব—যুঝিব দিনরাত—
কালের প্রস্তরপটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম—
অবশ নিদ্রায় পড়ি করিব না এ শরীর পাত—
মানুষ জন্মেছি যবে করিব কর্মেরি অনুষ্ঠান—

—'রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা' ১৯৬৫, পৃ ৮৩

তিনি যে দৈব বা ভাগ্যের প্রতি অন্ধ নির্ভরশীলতাকে একেবারেই প্রশ্রয় দেবেন না বরং ঘোরতরভাবে অস্বীকার করতে চাইবেন, সেটাই স্বাভাবিক। সুতরাং এই জাতীয় শ্লোকের প্রতি বিরাগ তাঁর চরিত্রসংগত। তাই এই চিহ্নগুলিকে কবির মনোভাবজ্ঞাপক বলে গণ্য করা চলে।

এই গ্রন্থের অন্তর্গত শংকরাচার্যের 'মোহমুদ্গর' কাব্যের প্রথম শ্লোকের উপর পেন্‌সিলে লঘু বা গুরু ধ্বনি অনুযায়ী যথাক্রমে ১ বা ২ ইত্যাদি লেখা আছে। মনে হয় কবি এইভাবে ওই শ্লোকের মাত্রা নিরূপণ করে ছন্দ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। শৈশবেই যিনি নিছক ছন্দোঝংকারে আকৃষ্ট হয়ে 'গীতগোবিন্দ' পাঠ করেন, তিনি যে মোহমুদগরের পজ্‌ঝটিকা ছন্দের ঝংকারে মুগ্ধ হয়ে তার মাত্রা নিরূপণে চেষ্টিত হবেন তাতে বিস্ময়ের কারণ নেই।

শব্দ সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতার নিদর্শনও আছে এই গ্রন্থে। 'অষ্টরত্নং' নামক শ্লোকসংগ্রহের 'আশাবধিং কো গতঃ' ইত্যাদি ৮ সংখ্যক শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়। তিনি তাঁর রচনায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে একাধিকবার এই শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। যথাস্থানে তা উল্লিখিত হয়েছে। এই শ্লোকের প্রথম পঙ্‌ক্তি হল—

নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো।

কবি বইয়ের মার্জিনে এই পঙ্‌ক্তির অন্তর্গত 'বষ্টি' শব্দের ব্যুৎপত্তি ও এ ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে মন্তব্য করেছেন। যিনি আরও অল্প বয়সে 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে'র মৈথিল শব্দগুলির ব্যাকরণসম্বন্ধীয় বৈশিষ্ট্য খাতায় নোট করে নিয়ে এই কৃত্রিম ব্রজবুলি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন, যিনি ভারতী পত্রিকায় 'নিছনি' ও 'পৈঁছ' শব্দ নিয়ে গবেষণা করতে বসেছিলেন, 'বষ্টি' শব্দ সম্বন্ধে তাঁর এই কৌতূহল অপ্রত্যাশিত নয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি সামান্য তথ্যের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে পরে ব্যঞ্জনবর্ণ না থাকলে শব্দান্তের 'ম্‌' 'ং' তে পরিণত হয় না। কিন্তু হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখি। যেমন পূর্বোদ্ধৃত 'লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং' পঙ্‌ক্তিতে 'যথেষ্টম্‌' স্থলে 'যথেষ্টং'

পাই। সংস্কৃত উদ্ধৃতিতে পদান্তে 'ং' রক্ষা করা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ দিনের অভ্যাস। হেবরলিনের গ্রন্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই হয়তো অলক্ষ্যে কবিকে এইভাবে লিখতে প্রণোদিত করেছে। অবশ্য মহর্ষি-সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থেও সংস্কৃত শ্লোকে পদান্তের এই 'ং' অব্যাহত দেখি।

৩

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে মাঝে মাঝে অল্পখ্যাত কবির কাব্য থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। যত দূর মনে হয় এই শ্লোকগুলির সঙ্গে কবির পরিচয় প্রধানতঃ হেবরলিনের গ্রন্থের মধ্যস্থতায়। বররুচির 'নীতিরত্ন', ঘটকর্পরের 'নীতিসার', বেতালভট্টের 'নীতিপ্রদীপ', হলায়ুধের 'ধর্মবিবেক', কুসুমদেবের 'দৃষ্টান্তশতক' ইত্যাদি গ্রন্থ তার উদাহরণ। আবার হেবরলিন তাঁর গ্রন্থে ভবভূতি-লিখিত 'গুণবত্নং' নামে একটি কাব্য সংকলন করেছেন। কিন্তু Macdonell, Keith প্রভৃতি কেউই তাঁদের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থের উল্লেখ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ওই কাব্য থেকে তাঁর সাহিত্যে উদ্ধৃতি প্রয়োগ করেছেন। যথাস্থানে তা উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং এই অনুমান বোধ করি অসংগত হবে না যে কবি ওই শ্লোকগুলি সংগ্রহ করেছেন হেবরলিনের গ্রন্থ থেকেই।

এ ছাড়া কতকগুলি গ্রন্থ আছে যেগুলির সঙ্গে কবির পরিচয় কেবলমাত্র হেবরলিনের গ্রন্থ থেকে নয়। তবু তিনি যে কাব্যসংগ্রহে ধৃত পাঠের সঙ্গেই আবাল্য পরিচিত ছিলেন এবং পরবর্তী কালেও বাল্যের সেই স্মৃতির অনুসরণ করেছেন তার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৮৯২ ফেব্রুআরি ১২ তারিখে লেখা এক পত্রে দেখি উড়িষ্যার পথে যেতে কবির মনে পড়েছে —

> মেঘদূতে যাকে নগনদী বলে লেখা আছে, অর্থাৎ পাহাড়ে নদী,··· সেরকম নদী এখানে অনেক।

—'ছিন্নপত্রাবলী,' পত্র - ৮১

বর্তমানে প্রচলিত মেঘদূতগুলির ২৩-সংখ্যক শ্লোকে কিন্তু সাধারণতঃ 'নগনদী' স্থলে 'বননদী' পাওয়া যায়। মল্লিনাথ বা বল্লভদেবের টীকাতেও 'বননদী' পাঠ পাই। একমাত্র উইলসন সাহেব 'নগনদী' পাঠ সংগত বলে মনে করেছেন। তবে হেবরলিন নগনদী পাঠই রেখেছেন এবং এই গ্রন্থে অভ্যস্ত কবি তাই 'নগনদী'ই লিখেছেন। আবার ঋতুসংহার গ্রন্থের বর্ষাবর্ণনার প্রথম শ্লোকের 'সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ' যে রবীন্দ্রনাথের একটি অতিপ্রিয় ও বহুব্যবহৃত শ্লোকাংশ, রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুরাগী

পাঠকমাত্রেই সে কথা জানেন। কিন্তু প্রচলিত প্রায় সমস্ত ঋতুসংহারেই দেখি 'সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতির্'। শুধু হেবরলিনের গ্রন্থেই কবিধৃত পাঠটি দেখা যায়। তেমনি 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থের বসন্ত ও বর্ষা প্রবন্ধে কবি ঋতুসংহারের বসন্তবর্ণনার শেষ শ্লোক হিসাবে উদ্‌ধৃত করেছেন—

মলয়পবনবিদ্ধঃ কোকিলেনাভিবম্যো।
সুরভিমধুনিষেকাল্লব্ধগন্ধপ্রবন্ধঃ।
বিবিধমধুপযূথৈর্বেষ্ট্যমানঃ সমস্তাদ্
ভবতু তব বসন্তঃ শ্রেষ্ঠকালঃ সুখায় ॥

কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত ঋতুসংহারের বসন্তবর্ণনা ২৫টি শ্লোকেই সমাপ্ত। এই ২৬-সংখ্যক শ্লোকটির অস্তিত্ব এখনও পর্যন্ত কোনো গ্রন্থে চোখে পড়ে নি, অথচ হেবরলিনে এটি পাই। সুতরাং স্পষ্টতঃই কবি হেবরলিন থেকে এই শ্লোকটি নিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে 'কালান্তর' গ্রন্থের অন্তর্গত লোকহিত প্রবন্ধে কবি একটি সংস্কৃত শ্লোকের ভাব উল্লেখ করেছিলেন—'ঘরে আগুন লাগলে কূপ খুঁড়তে যাওয়া বৃথা'। প্রশ্ন জাগে কোন্ মূল শ্লোক থেকে এই ভাবটি নেওয়া। এই অর্থে প্রচলিত একটি শ্লোকাংশ হল—

ন কূপখননং যুক্তং প্রদীপ্তে বহ্নিনা গৃহে।

আবার ভর্তৃহরির 'বৈরাগ্যশতকে'র ৭৩-সংখ্যক শ্লোকের শেষ পঙ্‌ক্তি হল—

সন্দীপ্তে ভবনে তু কূপখননং প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ।

হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহে ভর্তৃহরির এই শ্লোকটি পাই এবং উদ্‌ধৃত পঙ্‌ক্তিটির তলায় পেন্‌সিলে একটি মোটা রেখা টানা দেখি। কিন্তু কবি যে এই শ্লোকাংশটি মনে রেখেই এর ভাবটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন, এ কথা জোর করে বলা যায় না। কারণ সত্যেন্দ্রনাথ-সংকলিত 'নবরত্নমালা'য় পূর্বোদ্‌ধৃত 'ন কূপখননং'...ইত্যাদি শ্লোকটি পাওয়া যায়। সুতরাং এ কথা মানতে হয়, দুটি শ্লোকের সঙ্গেই কবি পরিচিত ছিলেন এবং কোন্ শ্লোক স্মরণ করে কবি প্রাসঙ্গিক উক্তিটি করেছিলেন তা নিঃসংশয়ে জানবার উপায় নেই।

হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহের অন্তর্গত কাব্যগুলিই যে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র অবলম্বন ছিল এবং মূল গ্রন্থের বদলে তিনি সর্বদাই ওগুলি ব্যবহার করতেন তা নয়। কবি বিহ্লণ-রচিত 'চৌরপঞ্চাশিকা'র বিদ্যায়াঃ রূপগুণবর্ণনম্-এর ১০ম শ্লোকের প্রথম পঙ্‌ক্তি হল—

অদ্যাপি তন্মুখশশী পরিবর্ততে মে।

এই পদটির একটি প্রচলিত পাঠান্তর হল—

অদ্যাপি তন্মনসি সম্পরিবর্ততে মে।

A. B. Keith তাঁর A History of Sanskrit Literature গ্রন্থে এই দ্বিতীয় পাঠটি গ্রহণ করেছেন। এই পাঠে শ্লোকের অর্থটিও অধিকতর সংগত ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথও এ ক্ষেত্রে হেবরলিনকে অনুসরণ না করে দ্বিতীয় পাঠটিই ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহার করেছেন—'অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ততে মে'। তেমনি কবির আর একটি প্রিয় শ্লোক হল—

ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥

হেবরলিনে ধৃত এই শ্লোকটির পাঠান্তর হল প্রথম পঙক্তিতে 'ইতরতাপশতানি' স্থলে 'ইতরপাপফলানি' এবং তৃতীয় পঙক্তিতে 'রসস্য' স্থলে 'কবিত্ব'। এখানেও রবীন্দ্রধৃত পাঠটিই অধিকতর সংগত বলে কবি এই পাঠ ছেড়ে অন্ধভাবে হেবরলিনের অনুসরণ করেন নি।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে এটুকু বোঝা যায়, সংস্কৃত সাহিত্যের উপাদানের উৎস হিসাবে হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহ রবীন্দ্রনাথের প্রধান অবলম্বন হলেও একমাত্র অবলম্বন ছিল না।

ভাষা, ছন্দ ও অলংকার

প্রবাসের এক 'বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনী'তে আহূত হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

> জন্মলাভের দ্বারা আমরা একটা প্রকাশলাভ করি।… কিন্তু, জলস্থল-আকাশ-আলোকের সম্বন্ধসূত্রে বিশ্বলোকে আমাদের যে প্রকাশ সেই তো আমাদের একমাত্র প্রকাশ নয়। আমরা মানুষের চিত্তলোকেও জন্মগ্রহণ করেছি। সেই সর্বজনীন চিত্তলোকের সঙ্গে সম্বন্ধযোগে ব্যক্তিগত চিত্তের পূর্ণতা দ্বারা আমাদের চিন্ময় প্রকাশ পূর্ণ হয়। এই চিন্ময় প্রকাশের বাহন হচ্ছে ভাষা। ভাষা না থাকলে পরস্পরের সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্বন্ধ অত্যন্ত সংকীর্ণ হত।… ভাষা আত্মীয়তার আধার, তা মানুষের জৈব-প্রকৃতির চেয়ে অন্তরতর।

—'সাহিত্যের পথে' সভাপতির অভিভাষণ ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ

মানুষকে মানুষের সঙ্গে মেলাবার উদ্দেশ্যে যে ভাষার সৃষ্টি, এক দিকে দৈনন্দিন প্রয়োজনে তার অনাদৃত ব্যবহার। তার মূল্য ক্ষণিক। আর-এক দিকে এই ভাষার আশ্রয়েই গড়ে ওঠে সাহিত্য যা মানুষের মনকে সকল কালের সকল দেশের মানব-মনের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। তার মধ্যে প্রতিফলিত হয় দেশের চিত্তশক্তি, তার সাংস্কৃতিক আদর্শ। সেই সাহিত্য মানুষের নিত্যকালের সম্পদ্।

সাহিত্যের ভাষা কিন্তু মুখের ভাষা বা জ্ঞানের ভাষা থেকে অনেকাংশে স্বতন্ত্র। যে মানসজগৎ হৃদয়ভাবের উপকরণে সাহিত্যিকের অন্তরের মধ্যে সৃষ্ট হয়ে ওঠে তাকে সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তার দ্বারা যে মানবহৃদয়ের অনির্দিষ্ট অরূপ ভাবগুলিকে উদ্রিক্ত করে তুলতে হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাই বলতে হয়—

> অপরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করিতে হয়।… ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে, চিত্র এবং সংগীত। কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়।…উপমা-তুলনা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়। …এ ছাড়া ছন্দে শব্দে বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যকে সংগীতের আশ্রয় তো গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোনোমতে বলিবার জো নাই এই সংগীত দিয়াই তাহা বলা চলে।

—'সাহিত্য', সাহিত্যের তাৎপর্য ১৩১০ অগ্রহায়ণ

সুতরাং সাহিত্যে ভাবপ্রকাশের জন্য ভাষার শব্দসম্পদ্ বিশেষ প্রয়োজনীয় হলেও তার

সঙ্গেই প্রয়োজন উপমা-অলংকারের, প্রয়োজন ছন্দের। অলংকার ও ছন্দের দ্বারাই সাহিত্যে চিত্র ও সংগীতময়তা প্রকাশ পায়।

সাহিত্যে ভাবসৃষ্টির দিক্ থেকে রবীন্দ্রনাথ ভারতসংস্কৃতির কাছে যেমন ঋণী, ভাষা-ছন্দ-অলংকারের প্রয়োগেও কবি তার কাছে কম ঋণী নন। সংস্কৃত সাহিত্যের কাছে তাঁর এই ঋণের পরিমাণ যে কত এখানে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাচ্ছে।

ভাষা

ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ তার প্রকৃতির যে পরিচয় দিয়েছেন তা হল,—'ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা' ('স্বদেশ', ভারতবর্ষের ইতিহাস)। তাঁর মতে সে ঐক্য সংস্কৃতিগত ঐক্য এবং সেই ঐক্যের একটি প্রধান সূত্র পাওয়া যায় একটিমাত্র ভাষার দৌত্য থেকে। সে-ভাষা সংস্কৃত ভাষা। সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

> আমার বিশ্বাস এক সময়ে ভারতবর্ষে একটি উদ্‌বোধনের বিশেষ যুগ এসেছিল যখন ভরতরাজবংশকে স্মৃতির কেন্দ্রস্থলে রেখে ভারতের আর্যজাতীয়েরা নিজের ঐক্য-উপলব্ধির সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেই যুগেই বেদ পুরাণ দর্শনশাস্ত্র, লোকপ্রচলিত কথা ও কাহিনী, সংগ্রহ করবার উদ্যোগ এ দেশে জেগে উঠেছিল।… কিন্তু স্বাজাতিক ঐক্য সুদৃঢ় হয়ে গড়ে উঠতে পারে নি। বহুধাবিভক্ত ভারত ছোটো ছোটো রাজ্যে উপরাজ্যে পরস্পর কেবলই কাড়াকাড়ি হানাহানি করেছে।…এই শোচনীয় আত্মবিচ্ছেদ ও বহির্বিপ্লবের সময়ে ভারতবর্ষে একটিমাত্র ঐক্যের মহাকর্ষশক্তি ছিল, সে তার সংস্কৃতভাষা। এই ভাষাই ধর্মে কর্মে কাব্য-ইতিহাস-পুরাণ-চর্চায় তার সভ্যতাকে রেখেছিল বাঁধ বেঁধে। এই ভাষাই পিতৃপুরুষের চিত্তশক্তি দিয়ে সমস্ত দেশের দেহে ব্যাপ্ত করেছিল ঐক্যবোধের নাড়ির জাল।
>
> —'বাংলাভাষা-পরিচয়' ১৯৩৮, অধ্যায় ৭

ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব বিবেচনায় উদ্‌ধৃতিটি দীর্ঘ হল। এই উদ্‌ধৃতি থেকে সংস্কৃত ভাষার প্রতি কবির সুগভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং সাহিত্যরচনায় শব্দসম্পদের জন্য তিনি যে সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ হবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, তাঁর পূর্বগামী অনেকেই সংস্কৃত ভাষাভাণ্ডার থেকে রত্ন আহরণ করে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই পথকে প্রশস্ততর করেছেন। বাংলা ভাষার পক্ষে এখন আর সংস্কৃতনিরপেক্ষ হবার উপায় নেই। এ সম্বন্ধে কবির উক্তি হল—

> এ কথা স্বীকার করতেই হবে, সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা অচল। কী জ্ঞানের কী ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ-বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে।…খাঁটি বাংলা ছিল আদিম কালের, সে বাংলা নিয়ে এখনকার কাজ ষোল-আনা চলা অসম্ভব।

—'বাংলাভাষা-পরিচয়' ১৯৩৮, অধ্যায় ১০

সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে কবি যে সচেতনভাবেই শব্দ সংগ্রহ করতেন তার স্পষ্ট প্রমাণ দুর্লক্ষ্য নয়। 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের এক স্থানে তিনি লিখেছেন—

> একদিন রিপোর্ট কথাটার বাংলা করবার প্রয়োজন হয়েছিল।…হঠাৎ মনে পড়ল কাদম্বরীতে আছে 'প্রতিবেদন'—আর ভাবনা রইল না।

—'বাংলা শব্দতত্ত্ব', শব্দচয়ন ১৩৩৬ ফাল্গুন

এই জাতীয় শব্দজিজ্ঞাসা যে প্রথম বয়স থেকেই তাঁর মনে প্রবল ছিল প্রমথ চৌধুরীকে লেখা এক পত্র থেকে তা বোঝা যায়। তিনি লিখেছিলেন—

> গৃহ অর্থে "কক্ষ" শব্দের ব্যবহার আমি কাদম্বরীতে অনেক জায়গায় পেয়েছি এবং আরো দুই একটা সংস্কৃত বইয়ে পাওয়া গেছে।

—'চিঠিপত্র' ৫ (১৩৫২), পত্র-১২ক, [১৮৯৩] শ্রাবণ ৮ পৃ ১৬৬ (খ)

এই অনুসন্ধিৎসার বশেই তিনি প্রমথ চৌধুরীকে আর একটি পত্রে লেখেন—

> বাৎস্যায়ন থেকে যে বর্ণনা তুলে দিয়েছ তার মধ্যে "পতৎগ্রহ" কথাটির মানে লিখেচ পিকদানি।…অর্থটা কি তোমার আন্দাজ, না ওটা পাকা কথা?

—'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৭০, ১৩২৫ ভাদ্র ১

বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে' পাই 'ভূমৌ পতৎগ্রহঃ' (প্রথম অধিকরণ ৪।৯)। প্রমথ চৌধুরী উক্ত গ্রন্থ অবলম্বন করে তাঁর এক প্রবন্ধে বিলাসী নাগরিকদের গৃহসজ্জার বর্ণনা দিয়ে লিখেছিলেন—'ঘরের মেজের দিকে দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই চোখে পড়ে পতৎগ্রহ, অর্থাৎ পিকদানি' ('প্রবন্ধ সংগ্রহ' ১ম খণ্ড ১৯৫৭, বই পড়া)। প্রমথ চৌধুরী-ব্যবহৃত এই বিশেষ শব্দটিকে উপলক্ষ করেই শব্দসচেতন কবিমনের সজীব কৌতূহল উক্ত পত্রে ধরা দিয়েছে। আবার পরের পত্রেই দেখি তিনি লিখেছেন—

> তুমি লিখেচ Mystic কথার প্রতিশব্দরূপে অতিবাদী শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। উপনিষদের একটা জায়গায় আমি যে "অতিবাদী" শব্দের ব্যবহার দেখেচি, সে হচ্ছে এই—

প্রাণোহ্যেষয়ঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্
বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।

(অর্থাৎ) "এই যে প্রাণ সর্বভূতস্থ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে ইহাই জানিয়া জ্ঞানী অতিবাদী হন না"। এখানে অতিবাদী বলতে নিশ্চয়ই বোঝাচ্ছে, সত্যকে অতিক্রম করে' যে কথা কয়। তুমি কি অন্য অর্থে অতিবাদী দেখেচ ?

—'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৭১, ১৩২৫ কার্তিক ৮

এই প্রসঙ্গে 'ক্ষণিকা' কাব্যের (১৯০০) অন্তর্গত অতিবাদ কবিতাটি মনে পড়ে। উক্ত কবিতায় 'অতিবাদ'-এর অর্থ হচ্ছে—

জগৎ যেন ঝোঁকের মাথায়
সকল কথাই বাড়িয়ে বলে।

এখানে অতিবাদ শব্দের তিনি যে অর্থ করেছেন তার দীর্ঘ দিন পরে প্রমথ চৌধুরীর লেখায় ঐ শব্দের নূতন অর্থ দেখে এ বিষয়ে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনে জিজ্ঞাসা জেগেছে। বলা বাহুল্য, এ জিজ্ঞাসা তাঁর স্বভাবসংগতই হয়েছে।

বাংলার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্ণয় করবার জন্যও তিনি সংস্কৃতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, তবে নির্বিচারে তা গ্রহণ করেন নি। যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গেই তিনি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে যথাযথ শব্দ সন্ধান করে তাকে গ্রহণ করেছিলেন। তাই দেখি ইংরেজি মিটিয়রলজি ও সেই সংক্রান্ত শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি 'শকুন্তলা' নাটকের কথা স্মরণ করেন। ঐ নাটকের সপ্তম অঙ্কের ৬ষ্ঠ শ্লোকে ইন্দ্রসারথি মাতলি দুষ্মন্তকে নিয়ে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণ করবার সময়ে বলেছেন—

"গগনবর্তিনী মন্দাকিনী যেখানে বহমানা, চতুর্বিভক্তরশ্মি জ্যোতিষ্কলোক যেখানে বর্তমান, বামনবেশধারী হরির দ্বিতীয় চরণপাতে পবিত্র এই স্থান ধূলিশূন্য প্রবহবায়ুর মার্গ"। দেখা যাইতেছে, প্রাচীনকালে 'প্রবহ' প্রভৃতি বায়ুর নাম তৎকালীন একটি কাল্পনিক বিশ্বতত্ত্বের মধ্যে প্রচলিত ছিল—সেগুলি একটি বিশেষ শাস্ত্রের পারিভাষিক প্রয়োগ। দেবীপুরাণে দেখা যায় :

প্রাবাহো নিবহশ্চৈব উদ্বহঃ সংবহস্তথা।
বিবহঃ প্রবহশ্চৈব পরিবাহস্তথৈব চ।
অন্তরীক্ষে চ বাহ্যে তে পৃথঙ্ মার্গবিচারিণঃ॥

এই সকল বায়ুর নাম কি আধুনিক মিটিয়রলজির পরিভাষার মধ্যে স্থান পাইতে পারে। বিশেষ শাস্ত্রের বিশেষ মত ও সংজ্ঞার দ্বারা তাহার পরিভাষাগুলির অর্থ

সীমাবদ্ধ, তাহাদিগকে নির্বিচারে অন্যত্র প্রয়োগ করা যায় না।

—'শব্দতত্ত্ব' (প. ব. স.), বিবিধ ১৩০৫-১৩১২ পৃ ১০৫-১০৬

এখানে কবিকে পরিভাষার জন্য 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটক এবং 'দেবীপুরাণে'র শরণ নিতে দেখা গেল। এ ছাড়া ইংরেজি শব্দের বাংলা পরিভাষার জন্য তিনি যে কিভাবে সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তার আর একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখা যেতে পারে। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত দুই খণ্ড 'কাদম্বরী কথা'র যে বিশেষ সংস্করণ কবি ব্যবহার করতেন, তার মলাটের ভিতরের পাতায় কবির স্বহস্তকৃত দুটি শব্দ তালিকা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ তার থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল। গ্রন্থটির পূর্বভাগে আছে—

সমাবেদন	announcement
অসমর্থিত	unexpected
সম্ভূতি	possibility
সুখাসঙ্গলুব্ধ	easeloving
প্রোঞ্ছিত	মোছা ...ইত্যাদি

আবার উত্তর ভাগেও আছে—

ঢৌকন চলা (ঢোকা) ইতো ঢৌকস্ব (এদিকে এস) —ইত্যাদি।

এ ছাড়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (রবীন্দ্র-সংখ্যা, ১৩৬৮॥ সংখ্যা ৩-৪) 'রবীন্দ্রনাথকৃত ইংরাজি শব্দের বঙ্গানুবাদ' প্রবন্ধে বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস একটি সুদীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। এবং ওই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন যে পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩৩৬, ৪র্থ সংখ্যা) কতকগুলি ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ প্রকাশ করেন। এগুলি পরে 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' (১৩৪২) গ্রন্থে পুনঃপ্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থের শেষে 'পরিভাষা সংগ্রহ' নামে আরও একটি তালিকা আছে। এ ছাড়া সুপ্রকাশ রায়ের 'পরিভাষা কোষে' এবং বুদ্ধদেব বসু ও সমীরকান্ত গুপ্ত-সংকলিত এবং বিশ্বভারতী পত্রিকায় (১৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কৃত আরও দুটি তালিকা দেখা যায়।

শুধুমাত্র পরিভাষার প্রয়োজনেই তিনি যে সংস্কৃত কাব্য থেকে শব্দ চয়ন করেছেন তা নয়। সংস্কৃত ভাষার সুমিত ও সুরঝংকৃত পদবিন্যাসে মুগ্ধ হয়ে তিনি প্রয়োজনমতো সেগুলিকে আপন সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন এবং তার দ্বারা তাঁর রচনাকে একটি 'ধ্রুব' বা ক্লাসিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। কুমারসম্ভবের 'মন্দাকিনীনির্ঝরশীকর' এবং 'কম্পিতদেবদারু' (১।১৫) ইত্যাদি সুনিপুণ শব্দ-

প্রয়োগ তাঁর শিশুমনে যে কতদূর আন্দোলন সৃষ্টি করত 'জীবনস্মৃতি'তে কবি নিজেই তা বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী কালেও যে কালিদাসের এই সুষম পদবিন্যাস তাঁর মনকে অধিকার করে রেখেছিল তাঁর রচনার ইতস্তত: তার বহু নিদর্শন দেখা যায়। তাই 'রঘুবংশ' কাব্যে রাজা দিলীপের যে 'ব্যূঢোরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ' বর্ণনা আছে টার্কিশ বাথ্-দিতে-আসা ভৃত্যের পেশল সবল শরীর দেখে য়ুরোপযাত্রী তরুণ কবির সে কথা মনে পড়ে যায় ('য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', প্রথম পত্র ১২৮৬ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)। দীর্ঘ কাল পরে বাঁশরী নাটকেও (১৩৪০) রাজা সোমশংকরের বর্ণনায় পাই এই 'রাঘুবংশিক চেহারা'। আবার এই বর্ণনাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রসঙ্গে স্মরণ করে কবি যে কিভাবে তাঁর রচনায় ক্লাসিক গৌরব সঞ্চার করেন, নিচের উদ্‌ধৃতি থেকে (তা) বোঝা যাবে। মহাভারতের যুগ বর্ণনা করে তিনি লেখেন—

> তখনকার সমাজ ভালোয় মন্দয় আলোকে-অন্ধকারে জীবনলক্ষণাক্রান্ত ছিল, · এবং সেই বিপ্লবসংক্ষুব্ধ বিচিত্র মানববৃত্তির সংঘাত-দ্বারা সর্বদা জাগ্রত শক্তিপূর্ণ সমাজের মধ্যে আমাদের প্রাচীন ব্যূঢোরস্ক শালপ্রাংশু সভ্যতা উন্নতমস্তকে বিহার করত।
>
> — য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী', ভূমিকা ১২৯৮ বৈশা।

এইভাবে কখনও সচেতনভাবে কখনও বা স্বভাবতঃই তিনি কালিদাসের পদবিন্যাস ব্যবহার করেছেন। সেইজন্য ইন্দিরা দেবীকে লেখা কবির পত্রে ('চিঠিপত্র' ৫, পত্র-২১, ১৯২৬ জুলাই ৩১) দেখি সমুদ্রযাত্রা করবার সময় তাঁর চোখে পড়ে 'বোম্বাইয়ের তালীবনরাজিনীলা বেলাভূমি', সুদূর মস্কৌ-এর উপনগরীতে বসে আকাশের স্তরে স্তরে ঘনায়িত মেঘে তিনি লক্ষ করেন 'অবৃষ্টিসংরম্ভ' সমারোহ ('রাশিয়ার চিঠি', অধ্যায় ২, ১৯৩০ সেপ্টেম্বর ১৯), আর তুষারমৌলী হিমালয় তাঁর চোখে সর্বদাই 'দেবতাত্মা নগাধিরাজ'-এর মহিমায় অভ্রভেদী হয়ে বিরাজ করে ('জীবনস্মৃতি' ১৩১৯, হিমালয় যাত্রা)।

কালিদাসের কাব্য ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যের বহু কাব্য থেকেই কবি উপযুক্ত পদ নির্বাচন করে ফিরেছেন। তাঁর রচনায় প্রায়ই তার নিদর্শন দেখা যায়। আপন কনিষ্ঠা কন্যার বর্ণনা করে তিনি লেখেন—

> সব-সুদ্ধ ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি নলিনীদলগত শিশিরবিন্দুর মতো বৃহৎ পৃথিবীটার উপর টলমল করছে।
>
> —'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১৩৩, ১৮৯৪ জুলাই ১৬

এই বর্ণনা থেকে শংকরাচার্যের 'নলিনীদলগতজলমতিতরলং' ইত্যাদি শ্লোকটি (মোহমুদ্গর, শ্লোক ৫) অনিবার্যভাবে মনে পড়ে। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের ভদ্রতার আদর্শ প্রবন্ধে (১৩০২ আষাঢ) 'ধনজনযৌবনের সুখশয্যা,' মোহমুদ্গরেরই 'মা কুরু ধনজনযৌবন গর্বম্' ইত্যাদি (শ্লোক ৪) স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার 'মহুয়া' কাব্যের সাগরিকা কবিতায় যে 'ললিতগীতকলিত-কল্লোল'-এর কথা পাই তা বোধ হয় জয়দেবের 'ললিতকলিত বনমাল'কে স্মরণ করেই লেখা। এই কাব্যের 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং' ইত্যাদি কাব্যভাষা শৈশব থেকেই কবির মনকে যে কতদূর অধিকার করে ছিল পরিণত বয়সে 'জীবনস্মৃতি'তে কবি সে পরিচয় দিয়ে গেছেন। ওই কাব্যের সুনির্বাচিত শব্দঝংকারের স্মৃতিতেই তিনি লেখেন—

> জয়দেব সম্পূর্ণ তো বুঝিই নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে যাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্ত গীতগোবিন্দ একখানি খাতায় নকল করিয়া লইয়াছিলাম।
>
> —'জীবনস্মৃতি', পিতৃদেব

গীতগোবিন্দের কাব্যভাষা কবির এমনই অধিগত হয়ে গিয়েছিল যে বহু কাল পরে দেখি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গেও তা স্বভাবতঃই কবির লেখনীমুখে এসে গিয়েছে। তিনি লিখেছেন—

> চিত্রকলা বাংলাদেশে সর্বপ্রথমে অনুকরণের জাল ছিন্ন করে ভারতীয় স্বরূপের বিশিষ্টতালাভের সন্ধানে বিদেশীয় চরণচারণচক্রবর্তীদের তীব্র বিদ্রূপের বিরুদ্ধে জয়ী হল।
>
> —'কালান্তর', মহাজাতি-সদন ১৩৪৬ আশ্বিন

এখানে জয়দেবের 'কান-ভরাট-করা' শব্দ 'চরণচারণচক্রবর্তী' প্রয়োগের কৌশলে সুমধুর ঝংকারের বদলে তীব্র বিদ্রূপই বর্ষণ করেছে।

গীতগোবিন্দের মতো অমরুশতকও কবিকে একই কারণে আকৃষ্ট করেছিল। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখেছেন—

> সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছন্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহ্নে অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।
>
> —'জীবনস্মৃতি', আমেদাবাদ

সুতরাং অমরুশতকের কাব্যভাব নয়, তার শব্দের ধ্বনিগৌরবই তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। অন্যত্রও তিনি এ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন—

> সংস্কৃত ভাষায় এমন অনেক শ্লোক পাওয়া যায়, যাহা কেবলমাত্র উপদেশ অথবা

নীতিকথা, যাহাকে কাব্যশ্রেণীতে ভুক্ত করা যাইতে পারে না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সংহতিগুণে এবং সংস্কৃত শ্লোকের ধ্বনিমাধুর্যে তাহা পাঠকের চিত্তে সহজে মুদ্রিত হইয়া যায় এবং সেই শব্দ ও ছন্দের ঔদার্য শুষ্ক বিষয়ের প্রতিও সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য অর্পণ করিয়া থাকে।...যতিপঞ্চকের নিম্নলিখিত শ্লোকে বিশেষ কোনো কাব্যরস আছে তাহা বলিতে পারি না।—

পঞ্চাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ
পতিং পশূনাং হৃদি ভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥

তথাপি ইহাতে যে শব্দযোজনার নিবিড়তা ও ছন্দের উত্থানপতন আছে তাহাতে আমাদের চিত্ত গুণী-হস্তের মৃদঙ্গের ন্যায় প্রহত হইতে থাকে।

—'ছন্দ', সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দ ১৩০১ মাঘ

'যুক্ত অক্ষরের ঝংকার', 'হ্রস্বদীর্ঘস্বরের তরঙ্গলীলা' এবং 'ঘনসন্নিবিষ্ট বিশেষণ-বিন্যাসে'র গুণেই যে যতিপঞ্চক রবীন্দ্রহৃদয়ে মুদ্রিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। গীতগোবিন্দ বিশেষতঃ অমরুশতক ও মোহমুদগর সম্বন্ধেও সেই কথা। এ স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে শংকরের বেদান্তভাষ্যের মতো কঠিন জ্ঞানগম্য বিষয়ের প্রকাশভঙ্গিতেও কবি প্রভূত নৈপুণ্য লক্ষ করেছিলেন।—

জ্ঞানের বিষয়কে প্রাঞ্জল ও যথার্থ করে ব্যক্ত করতে হলেও প্রকাশের উপাদানকে আঁট করে তাকে ঠিকমতো শ্রেণীবদ্ধ করা চাই। শংকরের বেদান্তভাষ্য তার একটি নিদর্শন। প্রত্যেক শব্দই সার্থক, তার কোনো অংশেই বাহুল্য নেই, তাই তত্ত্বব্যাখ্যা সম্বন্ধে তা এমন সুস্পষ্ট। কিন্তু এই শব্দযোজনার সংযমটি যৌক্তিকতার সংযম, আর্থিক যাথাতথ্যের সংযম, শব্দগুলি লজিক-সংগত পঙ্‌ক্তিবন্ধনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

—'ছন্দ', গদ্যছন্দ ১৩৪১ বৈশাখ

দেখা গেল, সংস্কৃত পদবিন্যাসের ধ্বনিগৌরব ও সংহতির গুণে কবি মুগ্ধ ছিলেন। তবে 'মধুরকোমলকান্ত পদাবলী'র বাণীহীন নিছক শব্দলালিত্য যে তাঁর মনোরঞ্জন করতে পারে নি, তা পূর্ববর্তী 'জয়দেব' অধ্যায়েই দেখা গেছে। এই জাতীয় 'অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ডে'র তুলনায় কালিদাসের কোমলে কঠোরে সংমিশ্রিত ধ্বনিতরঙ্গই তাঁর প্রশস্তি লাভ করেছিল ('বিচিত্র প্রবন্ধ', কেকাধ্বনি ১৩০৮ ভাদ্র, 'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব ১৩৪০ ভাদ্র)।

রচনায় ক্লাসিক গৌরব সঞ্চার করার জন্য যেমন কবি গাম্ভীর্যপূর্ণ সংস্কৃত ধ্বনি-গুলিকে কাজে লাগিয়েছিলেন, স্থলবিশেষে সাধারণ প্রাকৃত বাংলার সঙ্গে তৎসম শব্দ-সংবলিত পদ ব্যবহার করে এই অসংগত মিশ্রণের সাহায্যে একটি নূতন রসসৃষ্টি করবারও প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনে লেখা য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে দেখি তিনি লিখেছেন—

> তখন ভগবান মরীচিমালী তাঁহার সহস্ররশ্মিসংযমনপুরঃসর অস্তাচলচূড়াবলম্বী কনকজলধরপটল-শয়নে বিশ্রান্ত মস্তক বিন্যাস-পূর্বক অরুণবর্ণ নিদ্রাতুর লোচন মুদ্রিত করিলেন; বিহগকুল স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাবর্তন করিল; গাভীবৃন্দ হাম্বারব করিতে করিতে গোপালের অনুবর্তন করিয়া গোষ্ঠাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। আমরা লন্ডনের অভিমুখে যাত্রা করলেম।

—'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', ষষ্ঠ পত্র ১২৮৬ অগ্রহায়ণ

আবার সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথাগত উপমা বা ধরাবাঁধা প্রকশভঙ্গির প্রতি কটাক্ষ করে উক্ত গ্রন্থের টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌শ্‌-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লেখেন—

> আমরা এখেনে এসে কল্পনা করলেম—উৎসটা না জানি কী সুন্দর দৃশ্য হবে—চার দিকে পাহাড় পর্বত গাছপালা থাকবে, 'সারসমরালকুলকূজিত কনককমলকুমুদ-কহ্লারবিকসিত সরোবর' 'কোকিলকূজন' 'মলয়বীজন' 'ভ্রমরগুঞ্জন' দেখতে ও শুনতে পাব, ও অবশেষে এই মনোরম স্থানে বসন্তসখা পঞ্চশরের প্রহার খেয়ে ও এক ঘটি জল খেয়ে বাড়ি ফিরে আসব! ও হরি! গিয়ে দেখি······—একটি গজেন্দ্র-গমনা বিম্বোষ্ঠী কম্বুকণ্ঠী শুকচঞ্চুনাসা কেশরীমধ্যা কোকিলভাষিনী মধুরহাসিনী বিলাসিনী ষোড়শী নলিনীপত্রের ঠোঙা হাতে করে দাঁড়িয়ে নেই ('ঠোঙা' কথাটা বড়ো গ্রাম্য হয়ে পড়ল, ওর সংস্কৃতটা কী?)—একটা গাউন-জুতো-পরা বুড়ি এক এক পেনি নিয়ে কাঁচের গেলাসে করে বিতরণ করছে।

—'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', একাদশ পত্র ১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ

আসলে এই জাতীয় সাহিত্যিক বুলির প্রতি কবির আন্তরিক বিরাগ ছিল। তাই এখানে কবি সকৌতুকে এই জাতীয় বাগাড়ম্বরের নিরর্থকতা প্রতিপাদন করেছেন। আর পরিণত বয়সে এই ধরণের প্রকাশভঙ্গির সাহিত্যমূল্য যে অকিঞ্চিৎকর সেটি দেখাবার জন্য তিনি বলেন—

> যে সাধু সাহিত্য আমাদের দেশে একদা প্রচলিত ছিল তাতে ব্যক্তির বর্ণনা ছিল শিষ্টসাহিত্য-প্রথাসম্মত, শ্রেণীগত। তখন ছিল কুমুদকহ্লারশোভিত সরোবর, যূথীজাতিমল্লিকামালতীবিকশিত বসন্তঋতু। তখনকার সকল সুন্দরীরই গমন

গজেন্দ্রগমন, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিম্ব দাড়িম্ব সুমেরুর বাঁধা ছাঁদে। শ্রেণীর কুহেলিকার মধ্যে ব্যক্তি অদৃশ্য।...এই ঝাপসা দৃষ্টিই সাহিত্যরচনায় ও অনুভূতিতে সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু। কেননা সাহিত্যে রসরূপের সৃষ্টি। সৃষ্টিমাত্রের আসল হচ্ছে প্রকাশ।

—'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যবিচার ১৩৩৬ কার্তিক

এর থেকে বোঝা যায় সাহিত্যসৃষ্টিতে সংস্কৃত ভাষাভঙ্গি যখন প্রকাশের সহায়ক হয়েছে, কবি তখনই তাকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তার অনর্থক প্রয়োগের দ্বারা তাঁর সৃষ্টিকে ভারাক্রান্ত করে তোলেন নি।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয় শুধু সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যই নয় বৈদিক সাহিত্যের প্রকাশ-ভঙ্গিও তিনি গ্রহণ করেছেন। অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'উপনিষদের পট-ভূমিকায় রবীন্দ্রমানস' গ্রন্থে তার নিদর্শন দেখিয়েছেন। তবে এই বিষয়ের সূক্ষ্ম ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা বর্তমানে আমাদের অভিপ্রায়-বহির্ভূত।

যাই হক, উপরের আলোচনা থেকে এটুকু বোঝা গেছে সংস্কৃত ভাষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ ছিল অকৃত্রিম এবং তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন—

ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃতভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব। ..সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে, তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।

—'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', অধ্যায় ৩, ১৩৪০ আশ্বিন

সেই কারণেই ভারতের মানসিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য যে সংস্কৃত ভাষায় বিধৃত হয়ে আছে, তার ধারাকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার মধ্যে প্রবাহিত করে দিয়ে অতীতের সংস্কৃতির সঙ্গে বর্তমান কালের একটি অখণ্ড যোগসূত্র রচনা করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয় নি।

ছন্দ

সংস্কৃত ভাষায় ছন্দ শব্দের একটা অর্থ হচ্ছে কাব্যের মাত্রা, আর-একটা অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা। মাত্রা আকারে কবির সৃষ্টি-ইচ্ছা কাব্যকে বিচিত্র রূপ দিতে থাকে।

—'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', পরিশিষ্ট ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১২

কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যসৃষ্টির ইচ্ছাকে বিচিত্র রূপ দিয়েছেন তাঁর ছন্দের মধ্যে

বৈচিত্র্য সঞ্চার করে এবং সে বৈচিত্র্যের জন্য তিনি অনেকাংশেই সংস্কৃত ছন্দের কাছে ঋণী। সংস্কৃত ছন্দ তাঁর রচনাকে কিভাবে সমৃদ্ধ করেছে এখানে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করবার চেষ্টা করা যাক।

শৈশব থেকেই সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনি কবির চিত্তকে যে বিশেষভাবে অধিকার করেছিল কবি স্বয়ং তার পরিচয় দিয়ে লিখেছেন—

> আমার নিতান্ত শিশুকালে মুলাজোড়ে গঙ্গার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদূত আওড়াইতেছিলেন, তাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না—তাঁহার আনন্দ-আবেগপূর্ণ ছন্দ উচ্চারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।
>
> —'জীবনস্মৃতি', পিতৃদেব

বাল্যকালেই তিনি ফোর্ট উইলিয়মের প্রকাশিত একখণ্ড গীতগোবিন্দ হাতে পেয়েছিলেন। সে সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

> গদ্যবাতিতে সেই বইখানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার করিয়া লইতে হইত—সেইটেই আমার বড়ো আনন্দের কাজ ছিল। যেদিন আমি 'অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণং'—এই পদটি ঠিকমত যতি রাখিয়া পড়িতে পারিলাম, সেদিন কতই খুশি হইয়াছিলাম।
>
> —পূর্ববৎ

আর একটু বড়ো বয়সে কালিদাসের কাব্যের শব্দ ও ছন্দোঝংকার যে কিভাবে তাঁর মনকে অধিকার করেছিল 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে কবি তারও পরিচয় দিয়েছেন। ১৮৭৮ সালে বিলাতযাত্রার পূর্বে আমেদাবাদে তিনি হেবরলিনের 'কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থে সংকলিত অমরুশতকের মৃদঙ্গঘাতগম্ভীর শ্লোকগুলির প্রতি যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তার পশ্চাতে যে উক্ত গ্রন্থের শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের গাম্ভীর্যপূর্ণ ধ্বনিসমাবেশের প্রভাব ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সংস্কৃত ছন্দের প্রতি তাঁর বাল্যের এই আকর্ষণ পরিণত বয়সেও হ্রাস পায় নি। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের ক্ষিতির মুখে তাই শুনি—

> ছোটো ছেলেরা ছড়া ভালোবাসে তাহার ভাবমাধুর্যের জন্য নহে, কেবল তাহার ছন্দোবদ্ধ ধ্বনির জন্য।... বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও অনেক সময়ে মানুষের মধ্যে দুই-একটা গোপন ছায়াময় স্থানে বালক-অংশ থাকিয়া যায়, ধ্বনিপ্রিয়তা ছন্দপ্রিয়তা সেই গুপ্ত বালকের স্বভাব।
>
> —'পঞ্চভূত', গদ্য ও পদ্য ১২৯৯ ফাল্গুন

সেই স্বভাবেরই ক্রিয়ায় কবির মনে নূতন ছন্দসৃষ্টির প্রেরণা জেগেছে এবং সেই প্রেরণাতেই তিনি সংস্কৃত ছন্দকে নূতন দৃষ্টিতে দেখেছেন। সতেরো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ যে হেবরলিনের 'কাব্য-সংগ্রহ' গ্রন্থটি পাঠ করেন তারই পৃষ্ঠায় কবির সংস্কৃত ছন্দচর্চার প্রথম স্বাক্ষর দেখা যায়। উক্ত গ্রন্থের কবি-ব্যবহৃত বিশেষ খণ্ডটিতে মোহমুদ্গরের 'মূঢ় জহীহি' ইত্যাদি প্রথম শ্লোক এবং 'মা কুরু ধনজনযৌবন' ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লোকে লঘু ধ্বনির উপরে ১ এবং গুরুধ্বনির উপরে ২ ইত্যাদি নির্দেশক চিহ্ন দেখা যায়। সম্ভবতঃ কবি এইভাবে পজ্ঝটিকা ছন্দের মাত্রানিরূপণ করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

তাঁদের পরিবারেও সংস্কৃত ছন্দের বিশেষ চর্চা ছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথমবার বিলাতে ছিলেন, তখন তাঁর বড়োদাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ শিখরিণী ছন্দে তাঁকে একটি সরস ব্যঙ্গ কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন। কবি তাঁর 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে' সে-কবিতাটি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেন—

> এ কবিতাটি যদি সংস্কৃত ছন্দে না পড়তে পারো, তা হলে এর মস্তক ভক্ষণ করা হবে। অতএব, নিতান্ত অক্ষম হলে বরঞ্চ একজন ভট্টাচার্যের কাছে পড়িয়ে নিয়ো, তা যদি না পারো তবে এ কবিতাটি তুমি না হয় পোড়ো না।
>
> —'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', পঞ্চম পত্র ১২৮৬ আশ্বিন

এর থেকে বোঝা যায় শিখরিণী ছন্দের সঙ্গেও কবির বিশেষ পরিচয় ছিল। পরবর্তী কালে তিনি পরীক্ষামূলকভাবে এই ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করেন।—

কেবলি অহরহ মনে মনে
নীরবে তোমা সনে
যা খুশি কহি কত,
বিরহব্যথা মম নিজে নিজে
তোমারি মুরতি যে
গড়িছে অবিরত।

—'ছন্দ', ছন্দের প্রকৃতি ১৩৪১ বৈশাখ

ওই প্রবন্ধেই কবি সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দেরও বাংলা নমুনা রচনা করেন।—

দিন যবে হয় গত
না-বলা কথা যত
খেলার ভেলা-মতো
হেলা ভরে

লীলা তার করে সারা
যে-পথে ঠাঁই-হারা
রাতের যত তারা
যায় সবে ॥

—'ছন্দ', ছন্দের প্রকৃতি ১৩৪১ বৈশাখ

এ ছাড়া মালিনী, শার্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি সুবিদিত ছন্দগুলির প্রতিও কবির যে বিশেষ আকর্ষণ ছিল, তাঁর রচনা থেকে তারও পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গতঃ বলতে হয়, রবীন্দ্র পূর্ব যুগে যাঁরা বাংলা ছন্দকে সংস্কৃত ছন্দের সম্পদে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন তাঁরা সকলেই নিছক অনুকরণের পথে চলেছিলেন। অর্থাৎ, তাঁরা সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে বাংলায় লঘুগুরু মাত্রাভেদকে স্বীকার করে এক একটি কৃত্রিম ছন্দ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু লঘুগুরুর উচ্চারণভেদ বাংলা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলে তাঁদের কৃত ছন্দ বাংলা ছন্দ হয় নি। দ্বিজেন্দ্রনাথ সংস্কৃতের লঘু-গুরু মাত্রাকে সমান করে গুণে নিয়ে তার মোট মাত্রাসংখ্যা অনুযায়ী বাংলায় তাকে রূপান্তরিত করেন। কিন্তু তাতে সংস্কৃত লঘুগুরু বিন্যাসজাত ধ্বনিতরঙ্গ না থাকায় তাতে মূল ছন্দের শ্রুতিরূপটি বজায় থাকে নি। পূর্বোদ্ধৃত শিখরিণী ও মন্দাক্রান্তার রূপান্তর দুটিতে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথের আদর্শই অনুসরণ করেছেন। তবে দ্বিজেন্দ্র-নাথ করেছেন মিশ্র কলাবৃত্ত রীতিতে আর রবীন্দ্রনাথ অমিশ্র কলাবৃত্তে। অবশ্য এই জাতীয় রূপান্তরের ব্যর্থতাটি রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই এ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য হল—

> সংস্কৃত ভাষায় নূতন ছন্দ বানানো সহজ নয়, পুরানো ছন্দ রক্ষা করাও কঠিন। যথানিয়মে দীর্ঘহ্রস্ব স্বরের পর্যায় বেঁধে তার সংগীত। বাংলায় সেই দীর্ঘধ্বনিগুলিকে দুইমাত্রায় বিশ্লিষ্ট করে একটা ছন্দ দাঁড় করানো যেতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে মূলের মর্যাদা থাকবে না। মন্দাক্রান্তার বাংলা রূপান্তর দেখলেই তা বোঝা যাবে।

—'ছন্দ', ছন্দের মাত্রা . প্রথম পর্যায় ১৩৩৯ কার্তিক

এই প্রবন্ধেও তিনি পূর্বোক্ত আদর্শে মেঘদূতের প্রথম দুটি শ্লোকের রূপান্তর করেছেন। তাতে দ্বিজেন্দ্রনাথের মতো মন্দাক্রান্তার মোট মাত্রাসংখ্যা অক্ষুণ্ণ থাকলেও তার ধ্বনি-তরঙ্গটি থাকে নি। পরবর্তী কালে ছন্দোবিলাসী কবি সত্যেন্দ্রনাথ সংস্কৃত দীর্ঘস্বরের স্থলে বাংলায় রুদ্ধদল (closed syllable) ব্যবহার করে সংস্কৃতের লঘুগুরু ধ্বনি-বিন্যাসটি যথাসম্ভব রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন। তবু তাতে সংস্কৃত দীর্ঘস্বরের উদাত্ত গাম্ভীর্যটি ধরা দেয় নি। তাই কবি পরীক্ষামূলকভাবে শিখরিণী ও মন্দাক্রান্তা

ছন্দের আর কয়েকটি রূপান্তর করবার চেষ্টা করলেও এ সম্বন্ধে তাঁর যে সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন তা হল—'নূতন ছন্দ বাংলায় সৃষ্টি করবার শখ যাঁদের প্রবল, এই পথে তাঁরা অনেক নূতনত্বের সন্ধান পাবেন'। কিন্তু তাতে ছন্দের নির্মাণকৌশলটুকুই পাওয়া যাবে, তার প্রাণের সন্ধান পাওয়া যাবে না। কাজেই সংস্কৃত ছন্দ রূপান্তর করার কাজে তিনি আর বেশি দূর অগ্রসর হন নি।

তবে রূপান্তর না করে এবং সংস্কৃত হ্রস্বদীর্ঘ ধ্বনির ভেদকে স্বীকার করে তিনি বাংলায় সংস্কৃত ছন্দকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন দুইভাবে। প্রথমতঃ তিনি এই কৃত্রিম ছন্দকে ব্যঙ্গ রচনার কাজে লাগিয়েছেন। পূর্বোল্লিখিত শিখরিণী ছন্দের 'বিলাতে পালাতে' ইত্যাদি কবিতাটিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই এ কাজ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনাতেও এই জাতীয় কিছু নমুনা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ এ কাজ বেশি না করলেও তার কয়েকটি নিদর্শন তাঁর সাহিত্যে দেখা গেছে। যেমন—

দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন,
ধর হুইস্কি সোডা আর মুর্গি-মটন।
যাও ঠাকুর চৈতন চুট্কি নিয়া
এসো দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা॥

—'চিরকুমার সভা', তৃতীয় পরিচ্ছেদ ১৩০৭

কিন্তু সংস্কৃত ছন্দের এই জাতীয় ব্যবহারের পরিমাণও স্বল্প, তার মূল্যও অধিক নয়। এ বিষয়ে যেখানে তিনি সার্থক তা হল তাঁর গান। সংস্কৃত দীর্ঘস্বরের আয়ত উচ্চারণ বাক্‌রীতির পক্ষে কৃত্রিম শোনালেও গানের ক্ষেত্রে সুরের দীর্ঘ তানে তা সংগতভাবেই মিলে যায়। তাই জয়দেবের অনুসরণে তিনি সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত বা প্রত্নকলাবৃত্ত রীতিতে বাংলা গান রচনা করেছেন। এই রীতিতে তিনি জয়দেবের মতোই প্রধানতঃ চার এবং কদাচিৎ পাঁচকলা মাত্রা ব্যবহার করেন। তাঁর নিম্নলিখিত বিখ্যাত গান দুটি যথাক্রমে এই চার ও পাঁচ কলার পর্বে লেখা।—

পতন-অভ্যুদয় | বন্ধুর | পন্থা | যুগ যুগ | ধাবিত | যাত্রী।
হে চির | সারথি | তব রথ | চক্রে | মুখরিত | পথ দিন | রাত্রি।

—'গীতবিতান', স্বদেশ ১৪

এবং

শুভ্র নব | শঙ্খ তব | গগন ভরি | বাজে,
ধ্বনিল শুভ | জাগরণ | গীত।

—'গীতবিতান', পূজা ২৬৭

এই জাতীয় পর্ববিভাগ সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতার নিদর্শন পাই দিলীপকুমারকে লেখা কবির এক পত্রে। সেখানে তিনি লিখেছেন—

> ছন্দ জিনিসটাই হচ্ছে আবৃত্তিকে বিরামের বিশেষ বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা।
>
> ললিত ল | বঙ্গ ল | তা পরি | শীলন
>
> প্রত্যেক চার মাত্রার পরে বিরাম।
>
> বদসি যদি | কিঞ্চিদপি
>
> পাঁচ পাঁচ মাত্রার শেষে বিরাম। তুমি যদি লেখ 'বদসি যদ্যপি' তাহলে এই ছন্দে যতির যে পঞ্চায়তী বিধান আছে, তা রক্ষা হবে না।

— ছন্দ', পত্রধারা দ্বিতীয় পর্যায়, পত্র-১, ১৩৩৮ শ্রাবণ ৯

আবার জয়দেবের অনুসরণে রবি শুধু চার ও পাঁচ কলার পর্ব রচনা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। ছয় এমন কি সাতকলা পর্বেও প্রত্নরীতিতে গান রচনা করে তিনি এ ছন্দের আশ্চর্য শক্তির পরিচয় দেন। যেমন ষট্‌কল পর্বের—

আত্ম-অবিশ্বাস তার | নাশ কঠিন | ঘাতে,
পুঞ্জিত অব | সাদ ভার | হান অশনি | পাতে।

— গীতবিতান', স্বদেশ ১৬

ইত্যাদি গানটির এই পর্ববিভাগই যে এই ছন্দে এমন গাম্ভীর্য ও মাধুর্যের সমন্বয় করেছে তাতে সন্দেহ নেই। সপ্তকল পর্বের বিরল ছুএকটি নিদর্শনেও ছুর্লভ শক্তির প্রকাশ দেখা গেছে।—

সকল যোগী | সকল ত্যাগী | এস ছুঃসহ | ছুঃখভাগী—
এস ছুর্জয় | শক্তি সম্পদ | মুক্তবন্ধ সমাজ হে।

—'গীতবিতান স্বদেশ ১৭

রবীন্দ্ররচিত প্রত্নরীতির গানগুলি যে নিছক দীর্ঘস্বরের উদাত্ত বিস্তারেই সার্থক হয়েছিল, তা নয়। 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটির সম্বন্ধে দিলীপকুমার রায়কে কবি লিখেছিলেন—

> সকল প্রদেশের কাছে যথাসম্ভব সুগম করবার জন্যে যথাসাধ্য সংস্কৃত শব্দ লাগিয়ে ওটাকে আমাদের পাড়া থেকে জয়দেবীয় পল্লীতে চালান করে দেওয়া হয়েছে।

—'ছন্দ', পত্রধারা দ্বিতীয় পর্যায়, পত্র-৪, ১৯৩৬ জুলাই ৬

অবশ্য শুধুমাত্র সর্বভারতীয় জনচিত্তকে আকর্ষণ করবার জন্যই নয়, সাধারণভাবে প্রত্নরীতির গানে তিনি সংস্কৃত ধ্বনিসংগীতটি বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করতেন। না

হলে সংস্কৃত ছন্দের স্বাদটিই যে নষ্ট হয়। তাই কবি নরেন্দ্র দেবকে লিখিত এক পত্রে (১৩৩৬ আশ্বিন ২৯) রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন—

> সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিগাম্ভীর্যই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসাধনকলার প্রধান অঙ্গ, সেটাকে যদি বাদ দাও তবে ইন্দ্রধনু থেকে রঙের ছটাকেই বাদ দেওয়া হয়।…জয়দেবের 'মেঘৈর্মেদুর' শ্লোকটিতে তিনি সংস্কৃতশব্দপুঞ্জে ধ্বনির মৃদঙ্গ বাজিয়ে মেঘলা রাত্রির সংগীতটিকে ঘনিয়ে তুলেছেন।…জয়দেবের ঐ শ্লোকের প্রথম দুটি লাইন সাদা বাংলায় লিখলুম—
>
> মেঘলা গগন, তমাল-কানন সবুজ ছায়া মেলে,
> আঁধার রাতে লও গো সাথে তরাস-পাওয়া ছেলে।
>
> একটা কিছু হল বটে, কিন্তু জয়দেবের সুরই যদি না রইল তবে গীতগোবিন্দের নাম রক্ষা হবে কী করে। যে সুরটা সংস্কৃত ভাষারই সুর। এই জন্যে সংস্কৃত শব্দকেই আসরে নামানো চাই।…আমি হলে ছন্দাভাস দেওয়া গদ্যে সংস্কৃতধ্বনি-সম্পদ রেখে মেঘদূতের তর্জমা করতুম।
>
> —'রূপান্তর' ১৯৬৫ গ্রন্থপরিচয়, পৃ ২১৬-২১৭

গীতগোবিন্দ বা মেঘদূতের সংস্কৃত ধ্বনিসম্পদ্‌কে তিনি শুধু প্রত্নরীতির গানেই ব্যবহার করেন নি। দীর্ঘহ্রস্ব স্বরের ভেদবিহীন খাঁটি বাংলা ছন্দে যে একটা একঘেয়ে সমতলতা আছে, সেটি দূর করে ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করার জন্যও কবি সংস্কৃত ধ্বনির সাহায্য নিয়েছিলেন। তারই ফলে দেখা দেয়—'গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন রসে'র মতো ধ্বনিগম্ভীর পঙ্‌ক্তি। এ বিষয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর পূর্বসূরী ছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথের হাতেই তার ব্যাপক ও বহুল প্রয়োগ।

প্রত্নকলাবৃত্তে রবীন্দ্রনাথ খাঁটি সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত রীতিটি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক কলাবৃত্তে তিনি সংস্কৃত পদ্ধতির হ্রস্ব দীর্ঘ ধ্বনিভেদকে স্বীকার না করে শুধু রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রিকতাটি গ্রহণ করেছিলেন। 'মানসী' (১৮৯০) কাব্যে কবি প্রথম এই 'সংস্কৃত-ভাঙা-ছন্দ'-এর প্রচলন করে। কলাবৃত্ত রীতির এই বৈশিষ্ট্যটি তিনি জয়দেবেও লক্ষ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি জে. ডি. এণ্ডারসনকে লেখা এক পত্রে (১৩২১ আষাঢ় ১৮) বলেছিলেন—

> সংস্কৃত ভাষায় অসমান স্বর ও ব্যঞ্জনগুলিকে কৌশলে মিলাইয়া সমান মাত্রায় ভাগ করিতে হয়, তাহাতে ধ্বনির বৈচিত্র্য ও গাম্ভীর্য ঘটে। যথা—
>
> বদসি যদি | কিঞ্চিদপি | দন্তরুচি | -কৌমুদী |
> হরতি দর | -তিমিরমতি | -ঘোরম্‌ |

ইহা পাঁচমাত্রা অর্থাৎ বিষমমাত্রার ছন্দ। বাঙালি জয়দেব তাঁহার গানে সংস্কৃত-ভাষার যুক্তবর্ণের বেণী যথাসম্ভব এলাইয়া দিতে ভালোবাসিতেন।

—'ছন্দ', বাংলা ছন্দ দ্বিতীয় পর্যায়

এই সংস্কৃত-ভাঙা নব্য কলাবৃত্ত রীতিতেও কবি প্রত্নকলাবৃত্তের মতো চার, পাঁচ, ছয় ও সাত কলার পর্বসমাবেশ ঘটিয়েছেন। একে একে সেগুলির দৃষ্টান্ত দেওয়া হল।—

চতুষ্কল পর্ব :

আসে কোন তরুণ অশান্ত,
উড়ে বসনাঞ্চলপ্রান্ত—
আলোকের নৃত্যে বনান্ত
মুখরিত অধীর আনন্দে।

—'গীতবিতান', প্রকৃতি ১০৬

পঞ্চকল পর্ব

কী কথা উঠে মর্মরিয়া বকুলতরুপল্লবে,
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা।
ঊর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন বল্লভে,
নির্ঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা।

— কল্পনা', মদনভস্মের পর

ষট্‌কল পর্ব :

এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুম রঞ্জিত,
ফেনহিল্লোল কলকল্লোলে দুলিছে।

— কল্পনা দুঃসময়

সপ্তকল পর্ব

জীবনমরণের বাজায়ে খঞ্জনি
নাচিয়া ফাল্গুন গাহিছে।
অধীরা হল ধরা মাটির বন্দিনী
বাতাসে উড়ে যেতে চাহিছে।

—'পরিশেষ', সংযোজন . জীবনমরণ

এইভাবেই কবি প্রচলিত পর্বসমাবেশের মধ্যে বৈচিত্র্যসঞ্চারের প্রয়াস পান।

ছন্দের মধ্যে এই জাতীয় বৈচিত্র্যসৃষ্টির ব্যাপারে গীতগোবিন্দের কাছে রবীন্দ্রনাথের ঋণ সবচেয়ে বেশি। কবি তাঁর রচনার নানা স্থানেই সে কথার উল্লেখ করেছেন। তাই সমমাত্রা ও বিষমমাত্রা ছন্দের উদাহরণ হিসাবে তিনি যথাক্রমে 'হরিরিহ বিহরতি' (গীত. ১।৩) এবং 'অহহ কলয়ামি' (গীত. ১৩।৫) ইত্যাদি শ্লোক

দুটি স্মরণ করেন ('ছন্দ', ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র)। আবার যতিকে কেবলমাত্র বিরতির কাজে না লাগিয়ে তার দ্বারা ছন্দের ওজনপূর্তি সংস্কৃত ছন্দে বিরলদৃষ্ট হলেও গীতগোবিন্দের 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি'-ইত্যাদি গীতে (১৯।১) কবি তা আবিষ্কার করেছেন ('ছন্দ', ছন্দের প্রকৃতি)। এ ছাড়া গদ্যকাব্যের 'আবাঁধা ছন্দ'-প্রসঙ্গে কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে এক পত্রে লেখেন—

বড়ো ওজনের সংস্কৃত ছন্দে এই আপাতপ্রতীয়মান মুক্তগতি দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—

মেঘৈর্মেদুর | মম্বরং বনভুবঃ | শ্যামাস্তমা | লদ্রুমৈঃ

এই ছন্দ সমান ভাগ মানে না, কিন্তু সমগ্রের ওজন মেনে চলে।

—'ছন্দ', পত্রধারা : তৃতীয় পর্যায়, পত্র-২, ১৯৩৫ মে ২২

এখানে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে এই পঙ্‌ক্তিতে উনিশ অক্ষরের মধ্যে দুটি যতিবিভাগ (১২ + ৭) দেখে কবি একে 'অসমান মাত্রাভাগের ছন্দ' নামে অভিহিত করেছেন। এবং এই আদর্শে তিনি তাঁর কবিতাতেও একই পঙ্‌ক্তিতে বিভিন্ন আয়তনের পদসমাবেশ ঘটিয়েছেন। 'মানসী' কাব্যের বিরহানন্দ কবিতায় (১৮৮৭) প্রথম এই জাতীয় পদসমাবেশ দেখা গেছে।—

ছিলাম নিশিদিন | আশাহীন | প্রবাসী
বিরহতপোবনে | আনমনে | উদাসী,
আঁধারে আলো মিশে | দিশে দিশে | খেলিত
অটবী বায়ুবশে | উঠিত সে | উছাসি।

পরবর্তী কালে 'কাহিনী' কাব্যের অন্তর্গত গানভঙ্গ (১৮৯৩), 'বীথিকা' কাব্যের নব পরিচয় (১৯৩৪) প্রভৃতি নানা কবিতায় তার উদাহরণ পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, অসমান মাপের এই পর্বসমাবেশ যে বিশেষভাবে গীতগোবিন্দের ঐ শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ থেকেই কবি গ্রহণ করেছিলেন, সে কথা বলা যায় না। শিখরিণী, মালিনী, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি ছন্দেও তিনি এই অসমান পর্বসমাবেশ লক্ষ করেছিলেন। এমন কি প্রাকৃত 'দণ্ডকল' ছন্দের অনুসরণে তিনি এই অসমান ভাগের একটি দৃষ্টান্ত পর্যন্ত রচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন—

এই ছন্দ সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'দ্বাত্রিংশন্মাত্রাঃ পাদে সুপ্রসিদ্ধাঃ'। এই ছন্দকে বাংলায় ভাঙতে গেলে এইরকম দাঁড়ায়।

কুঞ্জপথে জ্যোৎস্নারাতে
চলিয়াছে সখীসাথে

মল্লিকা-কলিকার
মাল্য হাতে।

—'ছন্দ', ছন্দের মাত্রা : দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ

অবশ্য তাঁর পূর্বে দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে (১৮৭৫) এই জাতীয় প্রয়োগ দেখা গেছে।

পরিণত বয়সে কবি যখন গদ্যছন্দ রচনায় ব্রতী, তখনও দেখি তার মূল প্রেরণাটি তিনি সংস্কৃত সাহিত্য থেকেই আহরণ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

> গদ্যসাহিত্যে এই যে বিচিত্রমাত্রার ছন্দ মাঝে-মাঝে উচ্ছ্বসিত হয়, সংস্কৃত বিশেষত প্রাকৃত আর্যা প্রভৃতি ছন্দে তার তুলনা মেলে। সে-সকল ছন্দে সমান পদক্ষেপের নৃত্য নেই, বিচিত্র পরিমাণ ধ্বনিপুঞ্জ কানকে আঘাত করতে থাকে। যজুর্বেদের গদ্যমন্ত্রের ছন্দকে ছন্দ বলেই গণ্য করা হয়েছে। তার থেকে দেখা যায় প্রাচীনকালেও ছন্দের মূলতত্ত্বটি গদ্যে পদ্যে উভয়ত্রই স্বীকৃত। অর্থাৎ যে পদবিভাগ বাণীকে কেবল অর্থ দেবার জন্যে নয়, তাকে গতি দেবার জন্যে, তা সমমাত্রার না হলেও তাতে ছন্দের স্বভাব থেকে যায়।

—'ছন্দ' গদ্যছন্দ ১৩৪১ বৈশাখ

শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত এক ভাষণেও কবি যজুর্বেদীয় মন্ত্রের উদাত্ত ধ্বনি স্মরণ করেছেন।—

> আমরা সবাই জানি যে, মন্ত্রের লক্ষ্য হল শব্দের অর্থকে ধ্বনির ভিতর দিয়ে মনের গভীরে নিয়ে যাওয়া। সেখানে সে যে কেবল অর্থবান্ তা নয়, ধ্বনিমান্ও বটে। নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, এই গদ্যমন্ত্রের সার্থকতা অনেকে মনের ভিতর অনুভব করেছেন কারণ তার ধ্বনি থামলেও অনুরণন থামে না।

—'ছন্দ', গদ্যকবিতার গতিক্রম (ভাষণ). ১৯৩৯ আগস্ট ২৯

ওই একই ভাষণে তিনি বলেছেন, অলংকরণের বহিবাবরণ থেকে মুক্ত হলে কাব্য সহজে প্রকাশিত হয়ে ওঠে। এ বিষয়েও তিনি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সহজ গদ্যে লেখা ছান্দোগ্য উপনিষদের জাবাল সত্যকামের কাহিনীটি স্মরণ করে তিনি বলেছেন—

> কাব্যবিচারক একে বাহিরের দিকে তাকিয়ে কাব্যের পর্যায়ে স্থান দিতে অসম্মত হতে পারেন ; কারণ এ তো অনুষ্টুপ্, ত্রিষ্টুপ্ বা মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত হয়নি। আমি বলি হয়নি বলেই শ্রেষ্ঠ কাব্য হতে পেরেছে, অপর কোনো আকস্মিক কারণে নয়। এই সত্যকামের গল্পটি যদি ছন্দে বেঁধে রচনা করা হত,

তবে হালকা হয়ে যেত।

— ছন্দ', গদ্যকবিতার গতিক্রম (ভাষণ), ১৯৩৯ আগস্ট ২৯

শুধু বেদ-উপনিষদের মন্ত্র বা গদ্যের মধ্যেই কবি যে গদ্যছন্দ দেখেছেন তা নয়, কোনো কোনো সংস্কৃত বা প্রাকৃত ছন্দেও তিনি তার পূর্বাভাস লক্ষ করেছেন। তাই 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় আর্যা প্রভৃতি ছন্দে ধ্বনিবিভাগ যতটা স্বাধীতা পেয়েছে আধুনিক বাংলায় ততটা সাহসও পায় নি'।—এই বলে তিনি প্রাকৃতপৈঙ্গল (১।১৬৬) থেকে মালা ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন।—

বরিস জল ভমই ঘণ গঅণ
সিঅল পবণ মণহরণ
কণঅ-পিঅরি ণচই বিজুরি ফুল্লিআ ণীবা।
পত্থর-বিত্থর-হিঅলা
পিঅলা ণিঅলংণ আবেই॥

— ছন্দ', গদ্যছন্দ-৫, ১৩৪১ বৈশাখ

এই উদ্ধৃতির দ্বারা পিঙ্গলাচার্য-কৃত ছন্দগ্রন্থ প্রাকৃতপৈঙ্গলের সঙ্গে কবির পরিচয়টিও সূচিত হয়। পরিণত বয়সে ছন্দ আলোচনা করতে বসে এই গ্রন্থটি তিনি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছিলেন ও প্রয়োজনমতো তার সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। এই গ্রন্থ থেকে তিনি গগনাঙ্গ, দণ্ডকল, মালা প্রভৃতি ছন্দের উদাহরণ সংকলন করেন। আর ছন্দোবিতর্কের ক্ষেত্রে তিনি এই গ্রন্থকে যে কতদূর সমর্থন করতেন, তার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দিয়ে কবি লিখেছেন—

বিশেষজাতীয় ছন্দে এইরূপ পদ ও মাত্রা গণনাতেও আমি পিঙ্গলাচার্যের অনুবর্তী।

— ছন্দ', ছন্দের মাত্রা. দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ

সংস্কৃত ছন্দের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দকে যথাসম্ভব সমৃদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তবে শুধু ছন্দের রীতিনীতি নয়. তার ঝংকারমধুর নামগুলিও তাঁর কল্পনাকে অধিকার করে ছিল। তাই অর্থের প্রসার ঘটিয়ে তিনি সেগুলিকে সাহিত্যিক ব্যঞ্জনার কাজে লাগান। তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন স্থলেই তার নিদর্শন দেখা যায়। তাই কখনও কবি কল্পনা করেন—

জীবন-তরী বহে যেত মন্দাক্রান্তা তালে
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।

—'ক্ষণিকা', সেকাল

কখনও বা 'মেঘে মেঘে তড়িৎশিখার ভুজঙ্গপ্রয়াতে'র সঙ্গে তাল রেখে ধ্বনিত হয় তাঁর তিমিররাতের বর্ষাসংগীত ('গীতবিতান', প্রকৃতি ১০৫)। আর কদাচিৎ শীতের রাতে তাঁর 'কাযা'র জবানীতে তিনি রহস্যভরে নিজেকেই শোনান—

"বুঝচ না কি, এটা তোমার রাত্রিকালের উপযোগী মন্দাক্রান্তা ছন্দের যতি-ভঙ্গের লক্ষণ,—এ সময়ে মস্তিষ্কের মধ্যে শার্দূলবিক্রীড়িতের অবতারণা করা কি প্রকৃতিস্থ লোকের কর্ম"।—কাযার এই অভিযোগ শুনে তার প্রতি অনুরক্ত আমার মন বলে উঠছে, "ঠিক ঠিক"।

—'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র-৫৯, ১৩৩০ ফাল্গুন ৫

অলংকার

ছন্দের মতোই অলংকার সাহিত্যের আর একটি মুখ্য উপকরণ। অনির্দিষ্ট ও অরূপ ভাব যখন ভাষায় ব্যক্ত হযে উঠতে পারে না, তখন অলংকারের সাহায্যেই তা কখনো রূপ নেয, কখনও বা ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। সংস্কৃত ভাষায় এই অলংকারের অর্থ অতি ব্যাপক। সাহিত্যতত্ত্বকেই সেখানে নাম দেওযা হয়েছে অলংকারশাস্ত্র। এই অলংকারের ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

যাকে সীমায বাঁধতে পারি তার সংজ্ঞানির্ণয চলে, কিন্তু যা সীমার বাইরে, যাকে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া যায না, তাকে বুদ্ধি দিয়ে পাই না, বোধের মধ্যে পাই। ·যে প্রেমে, যে ধ্যানে, যে দর্শনে কেবলমাত্র এই বোধের ক্ষুধা মেটে তাই স্থান পায সাহিত্যে রূপকলায। ··এর থেকেই বোঝা যাবে, সাহিত্যতত্ত্বকে অলংকারশাস্ত্র কেন বলা হয়। সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব, যাকে প্রকাশ করতে গেলেই অলংকার আপনি আসে, তর্কে যার প্রকাশ নেই, সেই হল সাহিত্যের। অলংকার জিনিসটাই চরমের প্রতিরূপ। ··ভৃত্যকে দেখি প্রয়োজনের বাধা সীমানায়, বাঁধা বেতনেই তার মূল্য শোধ হয়। বন্ধুকে দেখি অসীমে, তাই আপনি জেগে ওঠে ভাষায় অলংকার, কণ্ঠের সুরে অলংকার, হাসিতে অলংকার, ব্যবহারে অলংকার। সাহিত্যে এই বন্ধুর কথা অলংকৃত বাণীতে। সেই বাণীর সংকেত-ঝংকারে বাজতে থাকে, 'অলম্'—অর্থাৎ বাস্, আর কাজ নেই। এই অলংকৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য।

— সাহিত্যের পথে', সাহিত্যধর্ম ১৩৩৪ শ্রাবণ

আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে এই সাহিত্যিক অলংকারের সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্' (১।৩)। এই সংজ্ঞাটির মূলগত

তাৎপর্য কবির হৃদয়কে বিশেষভাবেই আকৃষ্ট করেছিল। পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগটি দেখলে বোঝা যাবে সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনার প্রসঙ্গে এই সংজ্ঞাটি কত অনিবার্যভাবে তাঁর স্মরণে এসেছে। এই উক্তির মধ্যে তিনি একটি গভীর সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা অনুভব করে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন—

> আমাদের অলংকারশাস্ত্রে রসাত্মক বাক্য বলিয়া কাব্যের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক সংজ্ঞা আর কোথাও দেখি নাই।

—'সাহিত্য', ঐতিহাসিক উপন্যাস ১৩০৫ আশ্বিন

কবির এই বক্তব্যই সমর্থিত ও স্পষ্টতররূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে এর কিছু দিন পরে লেখা তাঁর আর একটি প্রবন্ধে।—

> আমাদের দেশে বলিয়াছেন: বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। রসাত্মক বাক্যই কাব্য। বস্তুত কাব্যের সংজ্ঞা আর-কিছুই হইতে পারে না। রস জিনিসটা কী? না, যাহা হৃদয়ের কাছে কোনো-না-কোনো ভাবে প্রকাশ পায় তাহাই রস, শুদ্ধ জ্ঞানের কাছে যাহা প্রকাশ পায় তাহা রস নহে। কিন্তু সকল রসই কি সাহিত্যের বিষয়? তাহা তো দেখিতে পাই না।...যে রস উদ্‌বৃত্ত থাকে না সে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল হয় না।...রসের সচ্ছলতায় সাহিত্য হয় না, রসের উচ্ছলতায় সাহিত্যের সৃষ্টি।

—'সাহিত্য', সংযোজন: সাহিত্যসম্মিলন ১৩১৩ ফাল্গুন

আবার দীর্ঘ কাল পরে সাহিত্যতত্ত্ব প্রসঙ্গে যখন তিনি বলেন, 'যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী' (সাহিত্যের পথে', অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা পত্র) এবং 'নিবিড় বোধের দ্বারাই প্রমাণ হয় সুন্দরের', ('সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব ১৩৪০ ভাদ্র) তখনও তিনি সাহিত্যদর্পণের ঐ উক্তিতেই আপন বক্তব্যের সমর্থন খোঁজেন। সাহিত্যের মধ্যে অস্মিতাবোধের গভীর তত্ত্বটিও ঐ উক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করে কবি অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে এক পত্রে লেখেন—

> সৌন্দর্যপ্রকাশই সাহিত্যের বা আর্টের মুখ্য লক্ষ্য নয়। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে অলংকারশাস্ত্রে চরম কথা বলা হয়েছে: বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। মানুষ নানারকম আস্বাদনেই আপনাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে বাধাহীন লীলার ক্ষেত্রে। এই বৃহৎ বিচিত্র লীলাজগতের সৃষ্টি সাহিত্য।

—'সাহিত্যের পথে', ১৩৪৩ আশ্বিন ৮

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে সাহিত্যের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা আছে বিস্তর। তার টীকা

ভাষ্যেরও অন্ত নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিতে দেখে উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁর পূর্বে আর কেউ তেমন করেছেন বলে মনে হয় না। তবে শুধু গুরুগম্ভীর তত্ত্ব আলোচনা করেই কবি এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষ করেন নি। তাঁর 'বাঁশরি' নাটকের নায়িকা এই সংজ্ঞার অপূর্ণতা মোচন করে রহস্যচ্ছলে বলে—

> যখন কলেজে পড়া মুখস্থ করতে তখন শিখেছিলে রসাত্মক বাক্যই কাব্য, এখন সাবালক হয়েছ তবু ঐ কথাটা পুরিয়ে নিতে পারলে না যে, সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হলেই তাকে বলে সাহিত্য।

— বাঁশরি' ১৯৩৩ প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য

আর হেমন্তবালা দেবীকে লেখা এক পত্রে কবি সাহিত্যতত্ত্বের এই শুষ্ক সংজ্ঞাটিকেই সরস মন্তব্যরূপে পরিবেশন করে বলেন—

> সৌম্য তোমার রচিত পৈষ্টকী সাহিত্য সযত্নে রক্ষা করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেচেন—শাস্ত্র অনুসারে তোমার এই লেখাগুলিকে কাব্য বলা যেতে পারে কেননা সাহিত্যদর্পণ বলেচেন বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।

—'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৬৩ ১৯৩৪ জানুআরি ২৭

সাহিত্যদর্পণের উক্ত বিশেষ সংজ্ঞাটি কবির সমর্থন পেলেও সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের সমস্ত বিধিকেই কবি নির্বিচারে মেনে নেন নি। কারণ তিনি জানতেন, সাহিত্যিকের স্বাধীন সৃষ্টি-ইচ্ছাকে কোনো কৃত্রিম নিয়মের বন্ধনে বাঁধা যায় না। তাই সাহিত্যে বিধি-বহির্ভূত রসসৃষ্টিকে মর্যাদা দিয়ে তিনি লেখেন—

> আমাদের অলংকারশাস্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে, কিন্তু ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে যে রসটি পাওয়া যায়, তাহা শাস্ত্রোক্ত কোনো রসের অন্তর্গত নহে।···সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তিসংগতিহীন।

—'লোকসাহিত্য', ছেলেভুলানো ছড়া ২, ভূমিকা ১৩০১ মাঘ

ঠিক এই অর্থেই অলংকারশাস্ত্রে 'ইতিহাস রসে'র অভাব অনুভব করে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—

> আমাদের অলংকারে নয়টি মূলরসের নামোল্লেখ আছে। কিন্তু অনেকগুলি অনির্বচনীয় মিশ্ররস আছে, অলংকারশাস্ত্রে তাহার নামকরণের চেষ্টা হয় নাই। সেই-সমস্ত অনির্দিষ্ট রসের মধ্যে একটিকে ঐতিহাসিক রস নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই রস মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ।

—'সাহিত্য', ঐতিহাসিক উপন্যাস ১৩০৫ আশ্বিন

কবির মতে ইতিহাসের সংস্রবে কাব্যে যে 'বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকু'র সঞ্চার হয়, তার রসটিই ইতিহাস রস। এই রসের সঙ্গে ঐতিহাসিক সত্যের সম্বন্ধও অনিবার্য নয়। তা বিশেষভাবে সাহিত্যিক অলংকারেরই রস। কিন্তু সেটি অলংকারশাস্ত্রের নবরসের অন্তর্গত নয়। তবু কবি তাকে বাদ দিতে পারেন নি। কারণ তাঁর কাছে আধুনিক সাহিত্যের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় রসের মধ্যেই ওটি পরিগণিত হবার যোগ্য।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র সম্বন্ধে কবির আলোচনা ও মন্তব্য এর বেশি অগ্রসর হয় নি। তবে সাধারণ অর্থে অলংকার বলতে ভাষার যে বিশেষ প্রসাধনকে বোঝায়, যার সাহায্যে ভাবের ভাষা সুব্যক্ত রূপ লাভ করে, সে সম্বন্ধে কবির সচেতনতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে অলংকারের প্রয়োগ বিশেষ ব্যাপক এবং তার প্রয়োগনৈপুণ্যে কবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। কালিদাসের কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত কবিচিত্তে সেগুলি যে গভীর ছাপ রেখেছিল এবং তাঁর নিজের রচনায় সেগুলি কখনো সচেতনভাবে কখনও বা তাঁর অগোচরে দেখা দিয়েছিল, তারও নিদর্শন দুর্লক্ষ্য নয়। দুএকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। এক স্থানে উপমাসিদ্ধ কবি কালিদাসের একটি উপমার সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> বসন্তপুষ্পাভরণা গৌরী যখন পদ্মবীজমালা হস্তে মহাদেবের তপোবনে প্রবেশ করিতেছেন তখন কালিদাস তাঁহাকে 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' বলিয়াছেন।… এরূপ বিসদৃশ উপমা-প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে, দক্ষিণবায়ুতে বসন্তকালের পল্লবে-ভরা লতার আন্দোলন আমরা অনেকবার দেখিয়াছি ; তাহার সেই সৌন্দর্যভঙ্গী আমাদের নিকট সুপরিচিত ; সেই উপমাটি প্রয়োগ করিবামাত্র আমাদের বহুকালের সঞ্চিত পরিচিত একটি সৌন্দর্যভাবে ভূষিত হইয়া এক কথায় গৌরী আমাদের হৃদয়ে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠেন।
>
> —'আধুনিক সাহিত্য', সঞ্জীবচন্দ্র ১৩০১ পৌষ

এখানে সহৃদয় পাঠকরূপে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের একটি অনুপম উপমার (কুমারসম্ভব ৩।৫৪) সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন মাত্র। তবে তাঁর 'চেতন মনের ছায়াতলে' এর যে ভাবটি সংগুপ্ত থেকে গিয়েছিল, দীর্ঘদিন পরে 'মহুয়া' কাব্যের নাম্নী কবিতা-গুচ্ছের অন্তর্গত মুরতি কবিতায় (১৩৩৫) সেটি দেখা দিয়েছে।—

লতা যেন নারী হয়ে দিল চক্ষু ভরি।

কখনও কখনও তিনি সচেতনভাবেই কালিদাসের উপমার অনুসরণ করেন। 'লোক-

সাহিত্যে'র অন্তর্গত গ্রাম্যসাহিত্য প্রবন্ধে তিনি লৌকিক শিবের বর্ণনা দিয়ে মন্তব্য করেছেন—

শিবের দারিদ্র্য ওটা নিতান্তই পোশাকি দারিদ্র্য, তাহা কেবল ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ সকলের উপরে টেক্কা দিবার জন্য, কেবল লক্ষ্মীর জননী অন্নপূর্ণার সহিত একটা অপরূপ কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে। কালিদাস শংকরের অট্টহাস্যকে কৈলাস-শিখরের ভীষণ তুহিনপুঞ্জের সহিত তুলনা করিয়াছেন, মহেশ্বরের শুভ্রদারিদ্র্যও তাঁহার এক নিঃশব্দ অট্টহাস্য।

—'লোকসাহিত্য', গ্রাম্যসাহিত্য ১৩০৫

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ এখানে কালিদাসের অনুসরণ করেও তাঁকে অতিক্রম করে গেছেন। আবার রবীন্দ্র-প্রযুক্ত কোনো কোনো উপমার সঙ্গে কালিদাসের উপমার মিল দেখা যায়। কবি-রচিত একটি প্রবন্ধে দেখি তিনি বলেছেন—

তখনো গুরু শিষ্যকে মুখে-মুখেই শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্র তাহা খাতায় নহে, মনের মধ্যেই লিখিয়া লইত। এমনি করিয়া এক দীপশিখা হইতে আর-এক দীপশিখা জ্বলিত।

—শিক্ষা', আবরণ ১৩১৩ ভাদ্র

এর কিছুদিন পরে আর-এক স্থানে পাই—

পুঁথি পড়া বিদেশী পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের গ্রন্থের শুষ্কপত্র হইতে আমরা এই ধর্মের (বৌদ্ধধর্ম) পরিচয় গ্রহণ করি। এই ধর্মের রসধারা সেই পণ্ডিতদের চিত্ত স্তরে স্তরে অভিষিক্ত নহে। এক প্রদীপের শিখা হইতে আর এক প্রদীপ যেমন করিয়া শিখা গ্রহণ করে তেমন করিয়া তাঁহারা এই ধর্মকে সমগ্রভাবে লাভ করেন নাই।

—'বুদ্ধদেব' বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ ১৩১৮

প্রদীপশিখার এই উপমাপ্রসঙ্গে রঘুবংশের কুমার অজের বর্ণনাটি (৫।৩৭) মনে পড়ে।—

রূপং তদোজস্বি তদেব বীর্যং
তদেব নৈসর্গিকমুন্নতত্বম্।
ন কারণাৎ স্বাদ্বিভিদে কুমারঃ
প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ॥

অবশ্য রঘুবংশের এই বিশেষ শ্লোকটির কথা স্মরণ করেই যে রবীন্দ্রনাথ উক্ত উপমাটি ব্যবহার করেছিলেন, এমন কথা মনে করবার কারণ নেই। এই সাদৃশ্যটি আকস্মিক হওয়া বিচিত্র নয়।

যাই হক, এইভাবে সন্ধান করলে রবীন্দ্র-প্রযুক্ত বহু অলংকারের সঙ্গেই কালিদাস-

ব্যবহৃত অলংকারের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'ত্রয়ী' গ্রন্থে (১৩৬৪) এই জাতীয় অনেকগুলি সাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে তাদের কোন্‌টি সচেতনভাবে নির্বাচিত, কোন্‌টি তাঁর অবচেতন মনে বিধৃত এবং কোন্‌টি তাঁর সহৃদয় কবিমানসে স্বতঃই উদিত, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করার উপায় নেই। এবার বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আহৃত উপাদানের উপমায় সমৃদ্ধ একটি রচনাংশ উদ্‌ধৃত করে এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। আমেরিকার এক তুষারশুভ্র প্রভাতের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> সকালে চোখ মেলিয়াই দেখিলাম, বরফে সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে।...গাছে একটিও পাতা নাই, শুক্রম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ডালগুলির উপরের চূড়ায় তাহার আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন। বরফ উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাহার পদসঞ্চার কিছুমাত্র শোনা যায় না। বর্ষা আসে বৃষ্টির শব্দে ডালপালার মর্মরে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া দিয়া, রাজবত্তুন্নন্দধ্বনিঃ—কিন্তু আমরা সকলেই যখন ঘুমাইতেছিলাম, আকাশের তোরণদ্বার তখন নীরবে খুলিয়াছে।...মাতলি তাহার মত্ত ঘোড়াকে বিদ্যুতের কশাঘাতে হাঁকাইয়া আনিতেছে না, ইনি নামিতেছেন ইহার সাদা পাখা মেলিয়া দিয়া—অতি কোমল তাহার সঞ্চার, অতি অবাধ তাহার গতি।...অভ্রকার প্রভাতের এই অতলস্পর্শ শুভ্রতার মধ্যে আমি আমার অন্তরাত্মাকে অবগাহন করাইতেছি। ঊর্ধ্বে শুভ্র, অধোতে শুভ্র, সম্মুখে শুভ্র, পশ্চাতে শুভ্র, আরম্ভে শুভ্র, অন্তে শুভ্র—শিব এব কেবলম—সমস্ত দেহমনকে শুভ্রের মধ্যে নিঃশেষে নিবিষ্ট করিয়া দিয়া নমস্কার—নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ। আজ গাছপালা তাহার সমস্ত আভরণ খসাইয়া ফেলিয়াছে। বনশ্রী যেন তাহার সমস্ত বাণী নিঃশেষ করিয়া দিয়া নিজের মনে কেবল ওঙ্কারমন্ত্রটি নীরবে জপ করিতেছে। আমার মনে হইতেছে যেন তাপসিনী গৌরী তাঁহার বসন্তপুষ্পাভরণ ত্যাগ করিয়া শুভ্রবেশে শিবের শুভ্রমূর্তি ধ্যান করিতেছেন। যে কামনা আগুন লাগায়, যে কামনা বিচ্ছেদ ঘটায়, তাহাকে তিনি ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছেন। সেই অগ্নিদগ্ধ কামনার সমস্ত কালিমা একটু একটু করিয়া ঐ তো বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, যতদূর দেখা যায় একেবারে সাদায় সাদা হইয়া গেল, শিবের সহিত মিলনে কোথাও আর বাধা রহিল না। এবার যে শুভপরিণয় আসন্ন, আকাশে সপ্তর্ষি-মণ্ডলের পুণ্য-আলোকে যাহার বার্তা লিখিত আছে এই তপস্যার গভীরতার মধ্যে তাহার নিগূঢ় আয়োজন চলিতেছে।

—'পথের সঞ্চয়', আমেরিকার চিঠি ১৩১৯ অগ্রহায়ণ

উদধৃতিটি দীর্ঘ হল সন্দেহ নেই। কিন্তু দেখা গেল এই একটিমাত্র উদ্ধৃতিতেই কবি যজুর্বেদ, ঈশোপনিষদ্, ঋতুসংহার, কুমারসম্ভব এবং পুরাণকাহিনীর স্মৃতিকে ব্যবহার করে সুকৌশলে তাঁর বর্ণনাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। বিশেষতঃ কুমারসম্ভবের চিত্র-সৌন্দর্য ও তার মঙ্গলভাবনাটি সুদূর বিদেশের একটি অপূর্ব দৃশ্যের সঙ্গে উপমিত হয়ে সমস্ত বর্ণনাটিকেই এক অপরূপ কল্যাণের মহিমায় উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

এই জাতীয় উপমাপ্রয়োগ রবীন্দ্রসাহিত্যে অপ্রতুল নয় এবং এইভাবেই তিনি সংস্কৃত কাব্যকাহিনীর উপকরণে আপন রচনাকে প্রসাধিত ও অলংকৃত করেছেন।

পরিশেষ

সাহিত্যিক অলংকারের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হলেও রবীন্দ্র-ব্যবহৃত চিত্রকলার অলংকরণের কথাটি বলা এ স্থলে বোধ হয় অসংগত হবে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'ছবির অঙ্গ' প্রবন্ধে (১৩২২ আষাঢ) এক স্থানে লিখেছেন—

> শাস্ত্রে বলে, ছবির ছয় অঙ্গ। রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ।

মূল সংস্কৃত পংক্তিটি হল—'রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনং সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ'। এটি বাৎস্যায়ন রচিত 'কামসূত্রে'র পণ্ডিত যশোধর কৃত টীকার (১।৩) অন্তর্গত। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শ্লোকটির নিপুণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তবে শ্লোকটির মূল উৎসের সঙ্গে সম্ভবতঃ কবির পরিচয় ছিল না। কারণ ঐ প্রবন্ধেই তিনি লিখেছেন—'আমার পাশে এক গুণী বসিয়া আছেন. তাঁরই কাছ হইতে এই শ্লোকটি পাইয়াছি'। তবে শ্লোকটির ব্যাখ্যা পড়লে বোঝা যায়, সে ভাষ্য স্বয়ং কবিরই রচনা। আর এই শ্লোকটি যে দীর্ঘদিন তাঁর স্মৃতিতে জাগরূক ছিল তাও বোঝা যায় যখন দেখি ওই প্রবন্ধের বহুকাল পরে হেমন্তবালা দেবীকে কবি এক পত্রে লিখেছেন—

> এই লীলাসমুদ্রেই আরম্ভ হয়েছে আমার জীবনের আদি মহাযুগ—এইখানেই ধ্বনি এবং নৃত্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ।

—'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৯, ১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ ৩১

তৃতীয় পর্ব

বৈষ্ণব পদাবলী

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লেখা এক পত্রে (১৩২৮ কার্তিক -৪) রবীন্দ্রনাথ আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন—

> বৈষ্ণব সাহিত্য ও উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোজেনে এবং অক্সিজেনে যেমন মেশে তেমনি করিয়াই মিশিয়াছে।
>
> —'বিশ্বভারতী পত্রিকা', ১৮৮০ শক, বৈশাখ-আষাঢ়

উপনিষদের প্রতি আকর্ষণকে তাঁর পারিবারিক উত্তরাধিকার বলা চলে। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী একান্তভাবেই তাঁর নিজের আবিষ্কার। কিশোর কবির সহজাত সন্ধানতাই তাঁকে দাদাদের অবজ্ঞাত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ'-এর অন্তর্গত বৈষ্ণব পদাবলীর অনাস্বাদিতপূর্ব রসের সন্ধান দিয়েছিল। এ ছাড়া তাঁদের পারিবারিক বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীও হয়তো এ বিষয়ে তাঁকে কিছুটা উৎসাহ দিয়ে থাকতে পারেন। ভানুসিংহের ছদ্মবেশে কবির পদাবলী রচনার পশ্চাতেও আছে এঁরই পরোক্ষ প্রভাব।

বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে কবির যোগ যেমন বিচিত্র তেমনই ব্যাপক। রবীন্দ্রনাথের নিজের সাক্ষ্য অনুযায়ী বিচার করে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেছেন যে, আনুমানিক ১২৮২ সালে তের বছর বয়সে তিনি সর্বপ্রথম পদাবলীর সংস্পর্শে আসেন,[১] আর জীবনের শেষ পর্যন্ত কত প্রসঙ্গেই না তিনি পদাবলীকে স্মরণ করেছেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত হয় তাঁর ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪)। ব্রজবুলির প্রতি আকর্ষণ ও দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হবার উৎসাহই যে কবিকে এই কাব্য লিখতে প্রণোদিত করেছিল, 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকমাত্রেরই কাছে তা সুপরিচিত। ব্রজবুলিতে এমন পদরচনা তাঁর পূর্বে আর দেখা যায় নি। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে লেখা হলেও তার ভাষা বাংলা এবং নায়িকা 'Mrs. Radha'। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' উপন্যাসে (১৮৬৯) এবং বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (১২৭৯ ফাল্গুন) ব্রজবুলিতে লেখা তাঁর একাধিক পদ দেখা যায়।

বৈষ্ণব কবিতার অনুকরণে পদ রচনা করেই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহায়তায় তিনি 'পদরত্নাবলী' (১২৯২) সংকলন করেছিলেন। তাঁর পূর্বে

১ দ্রষ্টব্য. রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান'

১২৭৯ সালে জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'বিদ্যাপতির পদাবলী' এবং ১২৮১-১২৮৩ সালের মধ্যে অক্ষয়কুমার সরকার ও সারদাচরণ মিত্রের যুগ্ম প্রচেষ্টায় 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। দুটি গ্রন্থই কবি দেখেছিলেন। কিন্তু কোনোটিই সংকলনের দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বলে বিবেচিত না হওয়ায় তিনি স্বয়ং এই পদসমুদ্র থেকে রত্ন আহরণে অগ্রসর হন। পরবর্তী কালে যেসব পদ তিনি তাঁর সাহিত্যে উদধৃত করেছেন তার অধিকাংশই এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু এই গ্রন্থ-বহির্ভূত যথেষ্ট পদও তিনি ব্যবহার করেছেন যাতে বোঝা যায় তাঁর পদাবলীচর্চা এই পদগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'তে দেখি পদাবলীর রসাস্বাদনকে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি তার সৃষ্টিকার্যে প্রয়োগ করেছেন। তারপর সেই রসকে সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করবার উদ্দেশ্যে করেছেন 'পদরত্নাবলী' সংকলন। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। উৎকৃষ্ট পদের সৌন্দর্য কোথায়, কোন ব্যঞ্জনায় কোন ধ্বনিতে তা প্রকাশিত, রসগ্রাহী আলোচনার দ্বারা সেটি উদ্‌ঘাটিত করে তিনি পাঠক-সাধারণকে সেই ভালো লাগায় প্রণোদিত করতে ব্রতী হয়েছেন। আজ আমরা পদাবলীর যে মাধুর্যে বিমোহিত হই, সে মন্ত্রটুকুও রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-পরিবেশিত। তবে এ বিষয়েও পথপ্রদর্শক হিসাবে স্মরণ করতে হয় বঙ্কিমচন্দ্রকে। তাঁর 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধটি ১২৮০ সালের পৌষ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বিদ্যাপতি (১২৮০ চৈত্র) জ্ঞানদাস (১২৮০ মাঘ) এবং বলরামদাস (১২৮০ চৈত্র) নামক প্রবন্ধ তিনটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

> জয়দেব ভোগ, বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা।

পরিশেষে তিনি মন্তব্য করেন—

> যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না।
>
> বিবিধ প্রবন্ধ ১ম খণ্ড, বিদ্যাপতি ও জয়দেব

বঙ্কিমপ্রদত্ত এই সূত্রটি ধরেই যেন রবীন্দ্রনাথ ১২৮৮ সালে লিখলেন—

> বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি।
>
> —'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

এই সময়েই কবি বসন্ত রায় নামে এক প্রায়-অজ্ঞাত পদকর্তার কবিত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাঁকে বিদ্যাপতির চেয়ে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেন (১২৮৯ শ্রাবণ)। কিন্তু কবির প্রথম বয়সের এই জাতীয় আবেগসমুখ মন্তব্যগুলি তর্কাতীত নয়। কেননা ১২৯৮ সালে বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি-পদের মাধুর্য-বিশ্লেষণ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির কবিত্ব ও তাঁর অসাধারণ রচনানৈপুণ্যের যে পরিচয় দিয়েছেন ('আধুনিক সাহিত্য', বিদ্যাপতির রাধিকা), তার থেকে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে কবির যথার্থ মনোভাবটি ধরা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ শুধু বৈষ্ণব কবিতার সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। বৈষ্ণব পদকে উপলক্ষ করে তিনি তার যে সমালোচনা লেখেন, স্বতন্ত্র সৃষ্টিরূপে তাও সার্থক হয়ে ওঠে। ১২৯১ সালের কার্তিক সংখ্যা নবজীবনে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি জ্ঞানদাসের একটি পদকে যেভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেন, তার থেকেই এ কথা সমর্থিত হবে—

> বৈষ্ণব জ্ঞানদাসের একটি গান পাইয়াছি. তাহাই ভাল করিয়া বুঝিতে গিয়া আমার এত কথা মনে পড়িল।—
>
> মুরলী করাও উপদেশ।
> যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ।
> কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতিঅনুপাম।
> কোন রন্ধ্রে রাধা ব'লে ডাকে আমার নাম॥
>
> . . . . . .
>
> জ্ঞানদাস কহে হাসি।
> "রাধে মোর" বোল বাজিবেক বাঁশি॥
>
> সৌন্দর্য-স্বরূপের হাতে সমস্ত জগৎই একটি বাঁশী।…সে বাঁশীর স্বর কি বলিতেছে! জ্ঞানদাস হাসিয়া বুঝাইলেন, সে কেবল বলিতেছে "রাধে, তুমি আমার"—আর কিছুই না। আমরা শুনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দর্য অব্যক্ত কণ্ঠে আমাদেরই নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—"তুমি আমার, তুমি আমার কাছে আইস।" এই জন্য, আমাদের চারিদিকে যখন সৌন্দর্য বিকশিত হইয়া উঠে তখন আমরা যেন একজন-কাহার বিরহে কাতর হই।…এই জন্য সংসারে থাকিয়া আমরা যেন চিরবিরহে কাল কাটাই।
>
> —'আলোচনা', বৈষ্ণব কবির গান : জ্ঞানদাসের গান ও বাঁশীর স্বর

এখানে কবি রাধাকৃষ্ণের কাহিনী ও তার প্রচলিত অর্থকে যে বৃহৎ তাৎপর্যে মণ্ডিত

করে তার থেকে যে সুগভীর ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করেছেন তাতে তাঁর এই আলোচনাটি নূতন সৃষ্টির মর্যাদা পেয়েছে।

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ যে বৈষ্ণব পদাবলীর রসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন, উপরের আলোচনাতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওই সময়ের 'ভারতী' পত্রিকার পাতায় পাতায় তার প্রমাণ আছে। শুধু প্রবন্ধ রচনায় নয়, তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রেও আছে তার স্বাক্ষর। ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে লেখা তাঁর চিঠিগুলি সংকলিত হয়েছে 'ছিন্নপত্রাবলী'তে। ওই গ্রন্থে বারটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি বৈষ্ণব পদকে স্মরণ করেছেন। কোনো পত্রে বলেছেন—

> এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাই নে, এক বৈষ্ণব কবিদের ছোটো ছোটো পদ ছাড়া।
>
> —'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-৪২, ১৮৯২ এপ্রিল ৮

আবার কখনও দুঃখ জানাচ্ছেন—

> প্রতিবার আমার বৈষ্ণবকবি এবং সংস্কৃত বই আনি, এবার আনি নি, সেই জন্যে ঐ দুটোরই আবশ্যক বেশি অনুভব হচ্ছে।
>
> —'ছিন্নপত্রাবলী' পত্র ৮৬, ১৮৯৩ মার্চ ৩

কখনও ঝড়বাদলের অভিসারে শ্রীরাধা কৃষ্ণের কাছে 'কী মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হতেন' সকৌতুকে তা স্মরণ করছেন কিংবা বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পদ সুরে গুন্‌গুন্ করে অবসর বিনোদন করছেন আর কখনও বা 'পদরত্নাবলী'র পাতা ওলটাতে ওলটাতে বৈষ্ণব পদের মোহমন্ত্র পরিবেশন করবার জন্যে প্রবন্ধ লেখার পরিকল্পনা করছেন। অবশ্য এই সময়ে তাঁর বাস ছিল পদ্মাবক্ষে, প্রকৃতির উন্মুক্ত লীলানিকেতনে এবং কবির উপরে এই প্রকৃতির প্রভাব প্রতিফলিত হত বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যস্থতায়। কবি স্বয়ং সে কথা স্বীকার করেছেন।—

> প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণবকবির ছন্দোঝংকার এনে দেয়—তার প্রধান কারণ, এই-সমস্ত সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়। এই সৌন্দর্যের মধ্যে বৈষ্ণবকবিদের সেই অনন্ত-বৃন্দাবন রয়ে গেছে। বৈষ্ণবকবিতার যথার্থ মর্মের ভিতরে যে প্রবেশ করেছে সে সমস্ত প্রকৃতির ভিতর সেই বৈষ্ণব-কবিতার ধ্বনি শুনতে পায়।
>
> —'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১৪৭ ১৮৯৪ আগস্ট ২৪

সুতরাং এই নিভৃত অবকাশে তিনি বৈষ্ণব পদের চর্চা করেছেন নিরঙ্কুশভাবেই। এই পর্বে লেখা তাঁর কবিতাতেও তার প্রমাণ মেলে।—

বর্ষা আসে ঘন রোলে, যত্নে টেনে লই কোলে
গোবিন্দদাসের পদাবলী।

এবং

আষাঢ় হতেছে শেষ, মিশায়ে মল্লার দেশ
রচি 'ভরা বাদরে'র সুর।

আবার কখনও বা

'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন'
সেই গান মনে পড়ে যায়।
'পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে'
মনসুখে নিদ্রায় মগন—
সেই ছবি জাগে মনে পুরাতন বৃন্দাবনে
রাধিকার নির্জন স্বপন।

'সোনার তরী', বর্ষ-যাপন ১৩০০ জ্যৈষ্ঠ

পরবর্তী কালে অবশ্য তাঁর উপরে বৈষ্ণব পদাবলীর এই একাধিপত্য হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু তাঁর মনঃপ্রকৃতির উপরে তার ক্রিয়া কখনও একেবারে লোপ পায় নি। বরং সে ক্রিয়া সূক্ষ্মতরভাবে তাঁর চিত্তসংস্কারকে আশ্রয় করে অলক্ষিতে তাঁর বাণীকে নূতন ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর শেষ জীবনের কাব্যে দেখি তারই অভ্রান্ত পরিচয়।—

সঘন নিশীথে গর্জিছে দেয়া,
ঝিমিঝিমি বারি বর্ষে—
মনে মনে ভাবি, কোন পালঙ্কে
কে নিদ্রা দেয় হর্ষে।
গিরির শিখরে ডাকিছে ময়ূর
কবিকাব্যের রঙ্গে—
স্বপ্নপুলকে কে জাগে চমকি
বিগলিতচীর-অঙ্গে।

—'সানাই', মানসী ১৯৪০ মে

২

নিছক সাহিত্যরস আস্বাদনের জন্যই বৈষ্ণব পদাবলীর সৃষ্টি নয়। তার পিছনে আছে বৈষ্ণব ভক্তের বহুযুগসঞ্চিত ধর্মসংস্কার। এই ভক্তির সংগতিসূত্রে পদাবলীর বিশেষ

রসের উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথও এ বিষয়ে অসচেতন ছিলেন না। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র ভূমিকায় (১৯৩৯) তিনি সে কথা স্পষ্ট করেই বলেছেন। তবে কি জন্য তাঁর বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রবেশ? এর উত্তর পাই হেমন্তবালা দেবীকে লেখা তাঁর এক পত্রে।—

> প্রথম বয়সে বৈষ্ণবসাহিত্যে আমি ছিলুম নিমগ্ন, সেটা যৌবনচাঞ্চল্যের আন্দোলন বশত নয়, কিছু উত্তেজনা ছিল না এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তার আন্তরিক রসমাধুর্যের গভীরতায় আমি প্রবেশ করেছি। চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্য-ভাগবত পড়েছি বারবার। পদকর্তাদের সঙ্গে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অসীমের আনন্দ এবং আহ্বান যে বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যে ও মানবপ্রকৃতির বিচিত্র মধুরতায় আমাদের অন্তরবাসিনী রাধিকাকে কুলত্যাগিনী করে উতলা করচে প্রতিনিয়ত, তার তত্ত্ব আমাকে বিস্মিত করেচে। কিন্তু আমার কাছে এই তত্ত্ব ছিল নিখিল দেশকালের—কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ পাত্রে কতকগুলি বিশেষ আখ্যায়িকায় আবদ্ধ করে এ'কে আমি সংকীর্ণ ও অবিশ্বাস্য করে তুলতে পারি নি।
>
> — 'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৯৯ ১৯৩৬ খৃঃ

এর থেকে বোঝা যায়, কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মগণ্ডির খুঁটিতে তাঁর মন বাঁধা পড়ে নি। তাঁর ধর্ম মহামানবধর্ম, তাঁর সাধনা মনুষ্যত্বের সাধনা। সুতরাং বৈষ্ণবীয় বিশেষ 'রাগানুগা' ভজনপদ্ধতি তাঁর কাছে নিষ্ফল। এ ছাড়া উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত মহর্ষিপুত্র রবীন্দ্রনাথের সাধনমন্ত্র—'শান্ত উপাসীত'। তাঁর প্রার্থনা—

> সেই ভালো হবে
> উদভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
> নাহি চাহি নাথ।
> দাও ভক্তি শান্তিরস।
>
> — 'নৈবেদ্য', ৪৫-সংখ্যক সনেট

বৈষ্ণবীয় রসসম্ভোগের সাধনাকে তিনি আধ্যাত্মিক বিলাস বলে মনে করেছেন, যে বিলাসে বিকারের সম্ভাবনাই ষোলো আনা। তাঁর 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে এই রসের রাক্ষসীর সর্বনাশা নেশার ছবি আছে। সুতরাং ধর্মতত্ত্ব বা সাধনা হিসাবে নয়, সাহিত্য হিসাবেই তাঁর কাছে বৈষ্ণব পদাবলীর মূল্য। তাঁর 'হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ' কবিচিত্ত ধর্মতত্ত্বের নীর বাদ দিয়ে ভাবরসের ক্ষীরটুকু ছেঁকে নিয়েছে। সেই ভাবের রসেই বৈষ্ণবের আপাতদূষণীয় সমাজবিগর্হিত প্রেম মহান্ হয়ে উঠেছে এবং সেই প্রেমগৌরবকে নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিয়েছেন কবি।—

বৈষ্ণব কাব্যশাস্ত্রে পরকীয়া অনুরক্তির বিশেষ গৌরব বর্ণিত হইয়াছে। সে গৌরব সমাজনীতির হিসাবে নহে, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাহা নিছক প্রেমের হিসাবে। ইহাতে যে আত্মবিস্মৃতি, বিশ্ববিস্মৃতি, নিন্দা ভয় লজ্জা শাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য, কঠিন কুলাচার লোকাচারের প্রতি অচেতনতা প্রকাশ পায় তদ্দ্বারা প্রেমের প্রচণ্ড বল, দুর্বোধ রহস্য, তাহার বন্ধনবিহীনতা, সমাজ-সংসার স্থান-কাল-পাত্র এবং যুক্তিতর্ক-কার্যকারণের অতীত একটা বিরাট ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই কারণে যাহা বিশ্বসমাজে সর্বত্রই এক বাক্যে নিন্দিত সেই অভ্রভেদী কলঙ্কচূড়ার উপরে বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের বর্ণিত প্রেমকে স্থাপন করিয়া তাহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন।

—'লোকসাহিত্য', গ্রাম্যসাহিত্য ১৩০৫

কিন্তু কাব্য হিসাবে এই 'সর্বনাশী' প্রেমের যত গৌরবই থাক তার সমাজবিধ্বংসী রূপটিকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। তাই তাঁর অশেষ কাব্যমাধুর্য সত্ত্বেও তাঁকে বলতে হয়েছিল—

আমাদের দেশে হরগৌরী-কথায় স্ত্রী পুরুষ এবং রাধাকৃষ্ণ-কথায় নায়কনায়িকার সম্বন্ধ নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রসর সংকীর্ণ, তাহাতে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের খাদ্য পাওয়া যায় না। তাহাতে বৃহদ্‌বৃত্তির অবতারণা হয় নাই। তাহাতে বীরত্ব, মহত্ত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগস্বীকারের আদর্শ নাই। রামসীতার দাম্পত্য আমাদের দেশ-প্রচলিত হরগৌরীর দাম্পত্য অপেক্ষা বহুতর গুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত এবং বিশুদ্ধ। বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ-কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য।

—'লোকসাহিত্য' গ্রাম্যসাহিত্য ১৩০৫

রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর রসবিচারে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি যে পরিণত বয়সেও পরিবর্তিত হয় নি, তা বোঝা যায় ১৯৩৮ সালে লেখা তাঁর এক প্রবন্ধে।—

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গানে এরা সেই প্রেমের কল্পনাকে মনের মধ্যে ঢেউ লাগিয়েছে যে প্রেম সমাজ-বন্ধনে বন্দী নয়, যে প্রেম শ্রেয়োবুদ্ধি বিচারের বাইরে। একমাত্র কাহিনী ছিল রামায়ণ-মহাভারতকে অবলম্বন করে যা মানবচরিত্রের নতোন্নতকে নিয়ে হিমালয়ের মতো ছিল দিক থেকে দিগন্তরে প্রসারিত। কিন্তু তার অভ্রভেদী মহত্ত্বের কঠিন মূর্তি সমতল বাংলার রসাতিশয্যের সঙ্গে মেলে না।

—'বাংলাভাষা-পরিচয়', অধ্যায় ১১

এই উদ্ধৃতিটির ভাষা থেকে বোঝা যায়, এই 'সমাজ-বন্ধন'-হীন প্রেম তাঁর কবি-কল্পনায় 'ঢেউ লাগালে'ও তার 'রসাতিশয্য'কে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। তাই বৈষ্ণব পদাবলীর রসমাধুর্যে মগ্ন থাকলেও কবি তার বাস্তব দিক, তার অদর্শচ্যুত বিকৃতির দিকটি সমাজনীতি হিসাবে মেনে নিতে পারেন নি। সেইজন্যই রামসীতার আদর্শের তুলনায় রাধাকৃষ্ণের আদর্শকে কঠোর ভাষাতেই নিন্দা করেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেমের স্বরূপবিচারে এই সমাজবিগর্হিত পরকীয়া প্রেমেরও যে গুরুত্ব আছে তাও কবি অনুভব করেছিলেন। তাঁর সেই ব্যাখ্যা যেমন অপূর্ব তেমনি সুভাবিত। দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে (১৯২৬ এপ্রিল ৪) তিনি বলেন—

> পরকীয়া সাধনকে তো আমি নিন্দা করি না,—তার মানেই হচ্ছে পরকীয়া নারী অর্থাৎ বাধা না মানলেই আমার মনে হয় তার শক্তি এত প্রবল, তার প্রেমের এত দাম। এইজন্যে বিবাহ যখন সবার স্বামীর শাসনের থেকে মুক্তি পাবে তখন সকল বিবাহেই পরকীয়া সাধন প্রচলিত হবে, যখন স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য আছে বলেই তার মূল্য পুরুষের কাছে বেশি হবে। বিবাহে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এই পরকীয়া সাধনের যুগ এসেছে বলেই আশা করি। যদি এসে থাকে তবে মুশকিল কারণ আমরা যেন সেই সাধনার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হই।
>
> —'তীর্থংকর' ১৩৫০ পৃ ১২৯

কবির বিচারে পরকীয়া সাধনের তত্ত্ব এখানে ব্যক্তিগত তথা সামাজিক উভয় দিক থেকেই অনুকূল এমন কি একান্তভাবে বরণীয় হয়ে উঠেছে। তবে এর ব্যাখ্যা বৈষ্ণবের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ না হলেও যে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এটি প্রয়োগ করেছেন সেটি নিঃসন্দেহে বৈষ্ণব কল্পনাকে ছাড়িয়ে গেছে।

যাই হক, বৈষ্ণব ধর্মের এই তাত্ত্বিক জটিলতার ঊর্ধ্বে রবীন্দ্রনাথ এক বৃহৎ সত্যকে দেখেছিলেন। সে সত্য তার সর্বজনীন প্রেমের সত্য। তার মধ্যে কবি বৈষ্ণব ধর্মের রসনির্যাসটি খুঁজে পেয়েছিলেন। তার Sadhana গ্রন্থে এই সত্যের উল্লেখ আছে সংশয়াতীত ভাষায়।—

> The Vaishnava religion has boldly declared that God has bound himself to love and in that consists the greatest glory of human existence.
>
> – 'Sadhana' 1961, Realisation in Love p 115

ভগবানের সঙ্গে ভক্তের এই যে প্রীতিমধুর সম্পর্ক, এই হল বৈষ্ণব ধর্মের মর্মবাণী।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু দেবতাকে ঘরে টেনে এনেই তৃপ্ত হন না, ঘরের প্রিয়জনের মধ্যেও দেখতে চান দেবতার ছবি। তাই তাঁর অতৃপ্ত হৃদয়ের প্রশ্ন—

.. .. .. এত প্রেমকথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে।

—'সোনার তরী', বৈষ্ণবকবিতা ১২৯৯ আষাঢ়

শেষে বৈষ্ণবের হয়ে তিনি নিজেই এ প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়েছেন—

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

কিন্তু বৈষ্ণবের দেবতা তাদের কাছে পুত্ররূপে, সখারূপে, প্রিয়রূপে ধরা দিলেও কোনো মর্ত্য প্রিয়কে তাঁরা দেবতার আসনে বসাতে পারেন না। কারণ 'কৃষ্ণরতি' ছাড়া পার্থিব প্রেমের কোনো মূল্য তাঁদের কাছে নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দেবতা সে মানবে বিরাজিত। তাঁর চোখে ভগবদ্‌প্রেম আর মানবপ্রেম দুটি মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। তাই প্রিয়জনে তাঁর দেবতা [illegible] উঠেছেন। এটি বাঙালির মানসপ্রকৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য। বাংলা ছড়ায় রবীন্দ্রনাথ বাঙালিমনের এই বিশেষত্বটিকে লক্ষ করে মন্তব্য করেছেন—

যেখানে মানুষের গভীর স্নেহ, অকৃত্রিম প্রীতি, সেইখানেই তাহার দেবপূজা। যেখানে আমরা মানুষকে ভালোবাসি সেইখানেই আমরা দেবতাকে উপলব্ধি করি। সেইজন্য ছড়ার মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়—নিজের পুত্রের সহিত দেবকীর পুত্রকে অনেক স্থলেই মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। অন্য দেশে মনুষ্যে দেবতায় এরূপ মিলাইয়া দেওয়া দেবাপমান বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু আমার বিবেচনায় মনুষ্যের উচ্চতম মধুরতম গভীরতম জীবন্ত সম্বন্ধ-সকল হইতে দেবতাকে সুদূরে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে মনুষ্যত্বকেও অপমান করা হয়, এবং দেবত্বকেও আদর করা হয় না।

—'লোকসাহিত্য', ছেলেভুলানো ছড়া ১৩০১

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছিলেন তাঁর সেই ধারণা আজীবন অপরিবর্তিত ছিল। তাই ১৯৩৬ সালে তিনি লিখেছেন—

সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে
কবির চোখের কাছে
কোন্ একটি মেয়ে ছিল,
ভালোবাসার কুঁড়ি-ধরা তার মন।
মুখচোরা সেই মেয়ে,
চোখে কাজল পরা,
ঘাটের থেকে নীল শাড়ি
'নিঙাড়ি নিঙাড়ি' চলা।

—'শ্যামলী', স্বপ্ন

চৈতন্যপূর্ব যুগে যখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব বিধিবদ্ধ হয়ে যায় নি, তখন হয়তো এ সন্দেহের পশ্চাতে কিছু সত্য ছিল, যেমন চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির রাধার পিছনে রজকিনী রামী বা শিবসিংহপত্নী লছিমা দেবীর ছায়া থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগে এ কল্পনা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় হৃদয়স্পর্শী করে বলেন—

বৈষ্ণবধর্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে।

—'পঞ্চভূত', মনুষ্য ১৩০০

তখন বলতেই হয় এ অপূর্ব অনুভূতি কবির নিজেরই সৃষ্টি।

৩

পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি কবির প্রত্যক্ষ আকর্ষণ কিছুটা কমে গেলেও একেবারে লোপ পায় নি। তার প্রমাণ, তাঁর সাহিত্যে উদধৃতিরূপে ক্ষণে ক্ষণে তার আত্মপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের আগে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে (১৮৬৬) আত্মমন্দিরে অধ্যায়ে 'জনম অবধি হম' ইত্যাদি পদটি এবং 'কমলাকান্তের দপ্তরে' (১৮৭৬) একটি গীত অধ্যায়ে 'এসো এসো বধু এসো' পদটি উদধৃত করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের হাতেই এই জাতীয় উদধৃতির সর্বাধিক ও যথার্থ প্রয়োগ। আর উক্ত দুটি পদই (বিশেষতঃ প্রথম পদটি) রবীন্দ্র-

সাহিত্যে বারংবার দেখা দিয়েছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি কবির আকর্ষণের কারণ তার কাব্যরস। তাই যে কোনো সূত্রে সাহিত্যরসের প্রসঙ্গ এলে অনিবার্যভাবেই তাঁর মনে পড়ে যায় বৈষ্ণব পদাবলীর কথা। বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তা রক্ষা করে কেমনভাবে বাক্যকে কাব্য করে তোলা যায় তা দেখাতে গিয়ে কবি স্মরণ করেছেন বলরাম দাসের পদ।—

আধ চরণে আধ চলনি,
আধ মধুর হাস!

'আধ চরণে আধ চলনি' বলিলে ভাবুকের মনে যে একপ্রকার চলন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, ভাষা ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিলে সেরূপ সম্ভবে না।

—'সাহিত্য', কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ১৩০০ চৈত্র

তেমনই জ্ঞানদাসের 'হাসি-মিশা বাঁশি বায়' পদ বাক্যার্থের সত্যতা তথ্যগতের সত্যতার সবটুকু ঘাটতি পূরণ করে দেয়। আবার নিতান্ত সুস্পষ্ট গদ্যভঙ্গির পংক্তি —

শিশুকাল হৈতে বঁধুর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা।

শোনামাত্র কোন্ অনির্দেশ্য বেদনা আমাদের হৃদয়কে ব্যাকুল করে তোলে।

১৩৪৩ সালে প্রকাশিত 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থেও দেখি রসের প্রসঙ্গে তাঁর বৈষ্ণব পদাবলীর কথাই মনে হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন, ভাষাকে অভিধা নির্দিষ্ট অর্থের তথ্যসীমা ছাড়িয়ে অসীমতার ব্যঞ্জনায় নিয়ে যেতে পারলে তবেই তা হবে কাব্য। জ্ঞানদাস বলেছেন —

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল,
যৌবনের বনে মন পথ হারাইল।

কিন্তু 'রূপের পাথার' বা 'যৌবনের বনে'র অস্তিত্ব তো বস্তুজগতে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই সেখানে কবির উপদেশ—

নির্দিষ্ট শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ যে তথ্যের জাল ফেঁদে বসে আছে, ছলে বলে কৌশলে তারই মধ্যে ছিদ্র করে নানা ফাঁকে নানা আড়ালে সত্যকে দেখাতে হবে।

—'সাহিত্যের পথে', তথ্য ও সত্য ১৩১১ ভাদ্র

আর সেই সত্যই হবে রসের সত্য।

'সাহিত্যের স্বরূপ' গ্রন্থের (১৩৫০) প্রবন্ধগুলি তাঁর পরিণত বিচারের ফল। কিন্তু এখানেও রসের অত্যুক্তি ও অনির্বচনীয়তার উদাহরণ হিসাবে ডাক পড়েছে বৈষ্ণব পদাবলীর। কারণ কবির মনের মাপকাঠি অনুযায়ী রসসাহিত্যের দরবারে

প্রথম সারির প্রথমেই বৈষ্ণব পদাবলীর স্থান।

শুধু ভাব নয়, এর ভাষাও কবিকে মুগ্ধ করেছে। বৈষ্ণব পদের প্রতি তাঁর প্রথম মুগ্ধতার পশ্চাতে দুর্বোধ মৈথিল ভাষার দান কম নয়। পরিণত বয়সে তিনি এই বিশেষ ভাষার যাদুগিরি প্রকাশ করে বলেছেন—

> বৈষ্ণবপদাবলীতে যে মিশ্রিত ভাষা চলে গেছে সেটা যে কেবলমাত্র হিন্দি ভাষার অপভ্রংশ তা নয়, সেটাকে পদকর্তারা ইচ্ছা করেই রক্ষা করেছেন, কেননা অনুভূতির অসাধারণতা ব্যক্ত করবার পক্ষে সাধারণ ভাষা সহজ নয়।
>
> —'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যের তাৎপর্য ১৯৩৪

ব্রজবুলি ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর অধ্যবসায়ের কথা তিনি নিজেই লিখে গেছেন। দুরূহ শব্দ ও ব্যাকরণের বিশেষত্বগুলি নোট করে রেখে এবং তার প্রয়োগ দেখে দেখে তিনি এ ভাষা আয়ত্ত করেন। ভারতী পত্রিকা যখন পদাবলী সাহিত্যের আলোচনায় মুখরিত তখনই দেখি 'পঁহু' এবং 'নিছনি' শব্দদুটির ব্যুৎপত্তি ও অর্থ নিয়ে কবি রীতিমতো গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখছেন। ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর এই ঔৎসুক্যের ফল 'শব্দতত্ত্ব', 'বাংলাভাষা-পরিচয়' প্রভৃতি গ্রন্থ। 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে দেখি সম্বন্ধে কার প্রবন্ধে (১৩০৫ শ্রাবণ) তিনি পদাবলীতে ব্যবহৃত 'যাকর', 'তাকর' ইত্যাদি শব্দ স্মরণ করেছেন। 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের (১৯০৯) অন্তর্গত বাংলা নির্দেশক প্রবন্ধে (১৩১৮ আশ্বিন) তাঁর মনে পড়েছে বৈষ্ণব পদে পড়া 'লাগ্' শব্দের ব্যবহার। আবার লাবণ্যকে 'লাবণি' বলে গোবিন্দদাস ব্যাকরণ লঙ্ঘন করলেও তাতে কাব্য-অঙ্গের যে লাবণ্য রক্ষিত হয়েছে সেটুকু কবি স্বীকার না করেই পারেন না। এই ভাষা-প্রসঙ্গে মনে পড়ে ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> সংস্কৃত ভাষায় অনুভব বলতে যা বুঝি তার খাঁটি বাংলা প্রতিশব্দ একদিন ছিল। এত বড়ো একটা চলতি ব্যবহারের কথা হারালো কোন্ ভাগ্যদোষে বলতে পারি নে। এমন দিন ছিল যখন লাজবাসা ভয়বাসা বলতে বোঝাত লজ্জা অনুভব করা, ভয় অনুভব করা।
>
> —পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী, ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১৩

বৈষ্ণব পদাবলীতেও কবি এই বাস শব্দের প্রয়োগ দেখেছিলেন। তাঁর বাল্যপঠিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে'র একাধিক পদে এর ব্যবহার দেখা যায়। চণ্ডীদাসের 'পিরীতি পসার, লইয়া ব্যাভার' ইত্যাদি পদের মধ্যে দেখি—

> সে শ্যাম নাগর, গুণের সাগর,
> কেমনে বাসিব পর?

কবি নিজেও প্রথম জীবনে বাস্ শব্দ ব্যবহার করেন। তাঁর 'ছবি ও গান' কাব্যের (১৮৮৪) একটি কবিতায় পাই—

আ মরি জননী তোর কে,
বল্ রে কোথায় তোর ঘর।
তরাসে চাহিস কেন রে,
আমারে বাসিস কেন পর ?

—'ছবি ও গান', একাকিনী

ভাবার পরেই মনে আসে অলংকারের প্রযোগ। সে ক্ষেত্রেও বৈষ্ণব কবির অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব। ১৩০১ সালে উপমার সৌন্দর্য বোঝাতে কালিদাসের সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করেছেন বৈষ্ণব কবিকে।—

সঙ্গিনীপরিবৃতা সুন্দরী রাধিকা যখন দৃষ্টিপথে প্রবেশ করিলেন তখন গোবিন্দদাস তাঁহাকে মোহিনী পঞ্চম রাগিণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। · এরূপ বিসদৃশ উপমা-প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে, আমরা জানি রাগিণী আমাদের মনে কী-একটি বর্ণনাতীত সৌন্দর্যের ব্যাকুলতা সঞ্চার করে, এইজন্য পঞ্চম রাগিণীর সহিত রাধিকার তুলনা করিবামাত্র আমাদের মনে যে-একটি অনির্দেশ্য অথচ চিরপরিচিত মধুর ভাবের উদ্রেক হয় তাহা কোনো বর্ণনাবাহুল্যের দ্বারা হইত না।

—'আধুনিক সাহিত্য', সঞ্জীবচন্দ্র ১৩০১ পৌষ

১৩১০ সালে সাহিত্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়েও সার্থক উপমার উদাহরণ হিসাবে তিনি বৈষ্ণব পদেরই শরণ নেন।—

উপমা-তুলনা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়। 'দেখিবারে আঁখি-পাখি ধায়' এই এক কথায় বলরামদাস কী না বলিয়াছেন ? ব্যাকুল দৃষ্টির ব্যাকুলতা কেবলমাত্র বর্ণনায় কেমন করিয়া ব্যক্ত হইবে ? দৃষ্টি পাখির মতো উড়িয়া ছুটিয়াছে, এই ছবিটুকুতে প্রকাশ করিবার বহুতর ব্যাকুলতা মুহূর্তে শান্তি লাভ করিয়াছে।

—'সাহিত্য', সাহিত্যের তাৎপর্য

১৯৩৪ সালে পরিণত বয়সেও দেখি তিনি বলরামদাসের এই অপূর্ব কবিত্বময় পঙ্‌ক্তিটি ভুলতে পারেন নি। সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি এটি উদ্ধৃত করেছেন। সেই সঙ্গে নিম্নলিখিত বিদ্যাপতির একটি পদের অলংকারের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করেছেন। 'যব গোধূলি সময় বেলি' ইত্যাদি পদ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য হল—

গোধূলিবেলার অন্ধকারে রূপসী মন্দির থেকে বাইরে এল, এ ঘটনাটা বাহ্য ঘটনা

এবং অত্যন্ত সাধারণ। কবি বললেন, নববর্ষার মেঘে বিদ্যুতের রেখা যেন ছন্দ প্রসারিত করে দিয়ে গেল। এই উপমার যোগে বাহিরের ঘটনা আপন চিহ্ন এঁকে দিয়ে গেল। আমাদের অন্তরে মন একে সৃষ্টির বিষয় করে তুলে আপন করে নিলে।

—'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যের তাৎপর্য

অর্থাৎ কবির মতে এই একটি মাত্র উপমার সহায়তাতেই এ পদের ভাবটি আমাদের অন্তরের রসলোকে গিয়ে উত্তীর্ণ হলো।

বৈষ্ণব পদের অলংকার যেমন কবির প্রিয় এবং সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনায় বা অন্যান্য উপলক্ষে তিনি যেমন বহু বার সেগুলিকে স্মরণ করেছেন, বৈষ্ণব পদের বিষয়-বস্তু ও ভাবধারা তেমনি তাঁর স্বকৃত রচনায় অলংকারের উপকরণ জুগিয়েছে। এ জাতীয় অলংকার কখনও বা তাঁর মনে স্বতঃই এসে গেছে, কখনও বা তিনি সচেতনভাবে তার প্রয়োগ করে পাঠকমনের যুগসঞ্চিত চিত্ত-সংস্কারে ঘা দিয়েছেন, যাতে সহজেই তার থেকে রস উচ্ছলিত হয়ে ওঠে। তাঁর প্রথম জীবনের তুলনায় শেষ জীবনের কাব্যে এই জাতীয় প্রয়োগ সমধিক। দুএকটি দৃষ্টান্ত দিলেই এ কথার সত্যতা বোঝা যাবে। এক স্থানে তিনি লিখেছেন—

যেমন তরো এই সাগরে নিত্য সোনায় নীলে
রূপহারানো রাধাশ্যামের দোলন দোঁহায় মিলে।

—'পরিশেষ', তে হি নো দিবসাঃ, ১৯২৭ অক্টোবর

এখানে গোধূলি বেলার এক অজানা সাগরের রূপ তাঁর মনে 'রাধাশ্যামে'র চিত্রটি জাগিয়ে তুলেছে। আবার অন্যত্র দেখি কোনো এক শ্যামলা কন্যাকে দেখে তাঁর মনে হয়েছে—

ক্লান্ত-অশ্রু রাধিকার বিরহের স্মৃতির গভীরে
স্বপ্নময়ী যে যমুনা বহে ধীরে
শান্তধারা
কলশব্দহারা
তাহারি বিষাদ কেন
অতল গাম্ভীর্য লয়ে তোমার মাঝারে হেরি যেন।

—'বীথিকা', শ্যামলা ১৯৩২ জুলাই

তবে ভাষা এবং অলংকারের চেয়ে কবিকে বেশী মুগ্ধ করেছিল পদাবলীর ছন্দোবৈচিত্র্য। 'মানসী' কাব্যের (১৮৯০) ভূমিকাতে কবি বলেছিলেন—

আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে

পেয়েছি। 'মানসী'তেই ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।

এই নতুন শিল্পী তাঁর শিল্পাদর্শ গ্রহণ করলেন বৈষ্ণব পদাবলী থেকে। বাংলা ছন্দের প্রাচীন আদর্শ ছিল সাধু জাতের অক্ষর-গোণা ছন্দ। আর রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে আনলেন এক নতুন জাতের 'সংস্কৃত-ভাঙা-ছন্দ'। এতে রুদ্ধদলে (closed syllable) দুই মাত্রা ধরে বাংলা উচ্চারণবৈশিষ্ট্য রক্ষা করেই ছন্দের বৈচিত্র্য দেখা দিল। কবি লক্ষ করেছিলেন—

> পয়ার ছন্দের একেশ্বরত্ব ছাড়িয়ে গিয়ে বিচিত্র হয়েছে ছন্দ বৈষ্ণব পদাবলীতে।··· এই পদগুলিতে বিচিত্র হৃদয়াবেগের সংঘাত লেগেছে। দোলায়িত হয়েছে সেই আবেগ তিনমাত্রার ছন্দে।
>
> — বাংলাভাষা-পরিচয়' ১৯৩৮, অধ্যায় ১১

এখানে তাঁর মন্তব্যকে প্রয়োগ করতে হবে দুই দিকেই। হৃদয়াবেগের সংঘাত যেমন ছন্দকে বিচিত্র করেছে, এবং ছন্দতরঙ্গও তেমনই হৃদয়ের উত্থান-পতনকে সার্থকভাবে স্পন্দিত করে তুলেছে। সেদিকে লক্ষ রেখেই কবি বৈষ্ণব পদের ছন্দ সার্থকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন—

> "কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।" শ্যামের নাম রাধা শুনেছে। ঘটনাটা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যে একটা অদৃশ্য আবেগ জন্মাল তার আর শেষ নেই। আসল ব্যাপারটাই হল তাই। সেই জন্যে কবি ছন্দের ঝংকারের মধ্যে এই কথাটাকে দুলিয়ে দিলেন। যতক্ষণ ছন্দ থাকবে ততক্ষণ এই দোলা আর থামবে না। ওদের অন্তরের স্পন্দন আর কোনো দিনই শান্ত হবে না।
>
> —'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র

এই স্পন্দনের যোগেই সাধারণ শব্দের অর্থও অসাধারণ হয়ে উঠে অপরূপ কাব্যে পরিণত হয়। তাই কবির মতে সার্থক কাব্যের মূলে ছন্দের দান কম নয়।—

> (কাব্যের) বিষয়টা কবির মনে বাঁধা, কিন্তু কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়কে অতিক্রম করা, সেই বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্ছে অনির্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্য থেকে সেই অনির্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে।
>
> রজনী শাঙনঘন, ঘন দেয়া-গরজন,
> রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
> পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
> নিন্দ যাই মনের হরিষে।

বাদলার রাত্রে একটি মেয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমচ্ছে বিষয়টা এইমাত্র, কিন্তু ছন্দ এই বিষয়টিকে আমাদের মনে কাঁপিয়ে তুলতেই এই মেয়ের ঘুমোনো ব্যাপারটি যেন নিত্যকালকে আশ্রয় করে একটি পরম ব্যাপার হয়ে উঠল।

—'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ' গ্রন্থের আটটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে অজস্র উদ্‌ধৃতিতে বৈষ্ণব পদাবলীর ছন্দোমাধুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। আবার বাংলা ছন্দের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত হিসাবেও তিনি পদাবলী থেকে উদ্‌ধৃতি দিয়েছেন। বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদাবলীর দান স্মরণ করে তিনি বলেছিলেন—

বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলা সাহিত্যে ছন্দের প্রথম ঢেউ ওঠে।

—পূর্ববৎ

এই ঢেউ ক'জন বাঙালি অনুভব করেছিলেন জানি না। তবে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে এই ঢেউ যে দোলা জাগিয়েছিল, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীই তার একমাত্র ফল নয়। মানসী কাব্যের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত বাংলা কাব্যই সেই তরঙ্গাভিঘাতে উত্তাল হয়ে উঠেছে।

বৈষ্ণব কবিতার ভাব-ভাষা-ছন্দ-অলংকার ছাড়া আর একটি বৈশিষ্ট্য কবিকে মুগ্ধ করেছিল। সে হল তার সুর। পূর্বে বৈষ্ণব পদ সর্বদাই সুরসংযোগে গীত হত। তাকে বলা হত কীর্তন। এই কীর্তন গানে কবি বাঙালি প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্যটি লক্ষ করেছিলেন। ১৯৩৬ সালের ২৯ জুলাই তারিখে দিলীপকুমার রায়কে এক পত্রে ('তীর্থংকর' ১৩৫১, রবীন্দ্রনাথের পত্রমর্মর পৃ ২১২) তিনি লিখেছিলেন—

কীর্তনসংগীত আমি অনেক কাল থেকেই ভালোবাসি। ওর মধ্যে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি আছে সে আর কোনো সংগীতে এমন সহজভাবে আছে বলে আমি জানি নে। সাহিত্যের ভূমিতে ওর উৎপত্তি, তার মধ্যেই ওর শিকড়, কিন্তু ও শাখায় প্রশাখায় ফলে ফুলে পল্লবে সংগীতের আকাশে স্বকীয় মহিমা অধিকার করেছে। কীর্তনসংগীতে বাঙালির এই অনন্যতন্ত্র প্রতিভায় আমি গৌরব অনুভব করি।·· কখনো কখনো কীর্তনে ভৈরোঁ প্রভৃতি ভোরাই সুরেরও আভাস লাগে, কিন্তু···রাগরাগিণীর রূপের প্রতি তার মন নেই, ভাবের রসের প্রতিই তার ঝোঁক। আমি কল্পনা করতে পারি নে হিন্দুস্থানি গাইয়ে কীর্তন গাইছে, এখানে বাঙালীর কণ্ঠ ও ভাবার্দ্রতার দরকার করে।

—'সংগীতচিন্তা', বিবিধ প্রসঙ্গ : পত্র-৪, ১৯৩৬ জুলাই ২৯

পূর্বেই দেখা গেছে, কবি বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের জটিলতা বাদ দিয়ে পদাবলীর কাব্যরসটিই

উপভোগ করেন। তাই কীর্তনগানেও তিনি স্বভাবতঃই রাগরাগিণীর রূপের চেয়ে 'ভাবপ্রকাশের নিবিড় ও গভীর নাট্যশক্তি'র প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন যে 'কীর্তনে সুরে, বাক্যে অর্ধনারীশ্বর যোগ হয়েছে', সুর ভাবরসকে আচ্ছন্ন করে দেয় নি বরং তাকে প্রকাশ করেছে। তাই ১৯২৫ সালের ২৯ মার্চ তারিখে দিলীপকুমারের সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি কীর্তনের এই বৈশিষ্ট্যের কথাটি উল্লেখ করেন।—

> কীর্তনে…কারুনিয়মের জটিলতাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও কীর্তনের মুখ্য আবেদনটি হচ্ছে তার কাব্যগত ভাবের, সুর তারই সহায় মাত্র।
>
> —'সংগীতচিন্তা', আলাপ-আলোচনা : ১

তবে এটিই কীর্তনগানের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়।—

> কীর্তনের আরও একটি বিশিষ্টতা আছে। সেটাও ঐতিহাসিক কারণেই। বাংলায় একদিন বৈষ্ণবভাবের প্রাবল্যে ধর্মসাধনায় বা ধর্মরসম্ভোগে একটা ডিমোক্রাসির যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। সে প্রকাশ সভার আসরে নয়, রাস্তায় ঘাটে। বাংলার কীর্তনে সেই জনসাধারণের ভাবোচ্ছ্বাস গলায় মেলাবার খুব একটা প্রশস্ত জায়গা হল।
>
> —'সংগীতচিন্তা', আলাপ-আলোচনা : ৩, ১৯২৬ ডিসেম্বর ৩১

কীর্তনগানে একীকরণের এই বিশিষ্ট শক্তি ও জনসাধারণের মধ্যে তার ব্যাপক প্রভাবের কথা রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গেই বারংবার স্মরণ করেছেন। পরবর্তী মধ্যযুগের সাধক অধ্যায়ের প্রথম পর্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

৪

বৈষ্ণব পদগুলির ভাব-ভাষা-ছন্দ-অলংকার-সুর প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেই কবি ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি একই পদকে তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনে একাধিক বার স্মরণ করেছেন। কিন্তু সর্বত্র এক অর্থে নয়। প্রত্যেকবারই তার অর্থ দিয়েছেন বদলে। একই পদকে জীবনের কোন্ পর্যায়ে কোন্ বিশেষ অর্থে স্মরণ করেছেন তা অনুধাবন করলে রবীন্দ্রমানসের একটি নূতন পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ হল বিদ্যাপতির 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' ইত্যাদি পদটি। নয়টি বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি এই পদ স্মরণ করেছেন। পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ বিভাগটি দেখলে বোঝা যাবে যে কত দীর্ঘ দিন এটি তাঁর মনকে অধিকার করে ছিল। কবির মনে বিশেষভাবে বর্ষা ঋতুর সঙ্গে এ পদ অচ্ছেদ্যভাবে

জড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর প্রথম জীবনে লেখা একটি প্রবন্ধে ('বিবিধ প্রসঙ্গ', সমাপন ১২৮৯ বৈশাখ) দেখি ঘনঘোর বর্ষার মেঘ ও শ্রাবণের বর্ষণের সঙ্গে তাঁর মনে পড়ছে বিদ্যাপতির গান। ১৩১৩ সালে তিনি লেখেন—

> বর্ষার চারি দিকে কত গানের বর্ষা, কাব্যের বর্ষা, কত মেঘদূত, কত বিদ্যাপতি বিস্তীর্ণ হইয়া আছে।
>
> —'সাহিত্য', বিশ্বসাহিত্য

তাঁর শেষ বয়সেও এই স্মৃতি অম্লান ছিল।—

প্রবল বরিষনে
নদীপারের নীলিমা ছায়
পাণ্ডু আবরণে।
কর্মদিন হারালো সীমা,
হারালো পরিমাণ,
বিনা কারণে ব্যথিত হিয়া
উঠিল গাহি গুঞ্জরিয়া
বিদ্যাপতি-রচিত সেই
ভরা-বাদর গান।

— 'বীথিকা', ছায়াছবি ১৩৪২ আষাঢ়

আবার কখনও কখনও এই পদটিকে তিনি আপন সুরের ছাঁচে ঢালাই করে নিজের বলে বানিয়ে নেন। 'জীবনস্মৃতি', গঙ্গাতীর , 'ছেলেবেলা', গঙ্গার ধার), কখনও বা এর থেকে বিরহীর তপ্ত শ্বাসে শ্বসিত সাহিত্যরস ভোগ করেন ('সাহিত্য', সাহিত্য-সৃষ্টি , কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট)। সেই সঙ্গে কোনও সময়ে 'মত্ত দাদুরি'র রব যে কেমন করে বর্ষানিশীথিনীর নিগূঢ় ও অব্যক্ত সৌন্দর্যকে ব্যক্ত করে তোলে তার ব্যাখ্যাও এসে যায় ('বিচিত্র প্রবন্ধ', কেকাধ্বনি)। আবার শ্রীশবাবুর বিরহে কাতর হয়ে লঘু কৌতুকে যেমন তিনি এই পদটি স্মরণ করেন ('ছিন্নপত্রাবলী', পরিশিষ্ট : পত্র-৮, ১৮৮৭ জুলাই ২৭), তেমনি 'শান্তিনিকেতন' (২য়) গ্রন্থের শ্রাবণ-সন্ধ্যা প্রবন্ধে এই পদকে তিনি অধ্যাত্মলোকে উত্তরণ করিয়ে দেন। বিদ্যাপতি 'হরি বিনে' শ্রীরাধার যে বিরহ তার কথা ভেবেই আক্ষেপ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই বিরহকে সীমা ও অসীম—জীবাত্মা ও পরমাত্মার চিরন্তন বিরহপ্রসঙ্গে টেনে নিয়ে গেছেন।—

> বিরহসন্ধ্যার অন্ধকারকে যদি শুধু এই বলে কাঁদতে হত যে 'কেমন করে তোর

দিনরাত্রি কাটবে', তা হলে সমস্ত রস শুকিয়ে যেত এবং আশার অঙ্কুর পর্যন্ত বাঁচত না। কিন্তু, শুধু 'কেমন করে কাটবে' নয় তো, কেমন করে কাটবে হরি বিনে দিনরাতিয়া। চিরদিনরাত্রি যাকে নিয়ে কেটে যাবে এমন একটি চিরজীবনের ধন কেউ আছে—তাকে না পেয়েছি নাই পেয়েছি, তবু সে আছে, সে আছে—বিরহের সমস্ত বক্ষ ভরে দিয়ে সে আছে।

—'শান্তিনিকেতন' ২, শ্রাবণসন্ধ্যা

কবি হতাশার বেদনায় এ পদকে শেষ হতে দেন নি। এর থেকেই তিনি খুঁজে নিয়েছেন চিরমিলনের আশ্বাস। তাঁর ঘরে-বাইরে উপন্যাসের (১৯১৬) নিখিলেশ এই কথাটিই বলেছিল, 'বিরহে যে-মন্দির শূন্য হয় সে-মন্দিরের শূন্যতার মধ্যেও বাঁশি বাজে'। কবি সেই বাঁশিই শোনাতে চান। এই প্রসঙ্গে মনে হয় কবির উপলব্ধির সঙ্গে এখানে মিল হয়েছে উপনিষদের 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং' ইত্যাদি বাণীর। যে হরি বিশ্বের আকাশ ব্যাপ্ত করে কবির মনের আকাশ জুড়ে বসেছেন তাঁর মধ্যে বৈষ্ণবের হরির সঙ্গে উপনিষদের ঈশাও কি সমভাবেই যোগ না?

কবির আর একটি প্রিয় পদ 'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়'। পদাবলী-বিশেষজ্ঞের মতে এর রচয়িতা 'কবিবল্লভ'। রবীন্দ্রনাথ 'পদরত্নাবলী'তে (১২৯২) এটি কবিবল্লভের ভণিতায় উল্লেখ করেও পাদটীকায় (পৃ ১০৮) মন্তব্য করেছেন, 'এই কবিতা সাধারণতঃ বিদ্যাপতির বলিয়া পরিচিত'। কবি নিজেও যে এই পদটিকে বিদ্যাপতির বলেই মনে করতেন, তাঁর একাধিক উদ্ধৃতিতে তার প্রমাণ পাই। ১২৮৮ সালের ফাল্গুন মাসে তিনি এই পদপ্রসঙ্গে বলেছিলেন—

বিদ্যাপতির সমস্ত পদাবলীতে একটি মাত্র কবিতা আছে, চণ্ডীদাসের কবিতার সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে।

—'সমালোচনা' চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

পরের বছর শ্রাবণ মাসে লেখা এক প্রবন্ধে ('সমালোচনা', বসন্ত রায়) দেখি পদকর্তা বসন্তরায়ের সঙ্গে তুলনাপ্রসঙ্গে তিনি এই পদকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীতে ফেলেছেন। এ সম্বন্ধে এটুকুই বলা যায় যে, এ বিচার সুবিচার নয়, না বিদ্যাপতির পক্ষে, না কবির নিজের বিচারবুদ্ধির পক্ষে। তাঁর পরবর্তী কালের সাহিত্যে এই পদপ্রসঙ্গে লিখিত উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাণীই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

'বাংলা শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের ভাষার খেয়াল প্রবন্ধে দেখি এই পদটির শব্দপ্রয়োগের অভিনবত্বে কবি মুগ্ধ। কবির মতে এই পদে ব্যবহৃত ভাষাই পদটিকে রসোত্তীর্ণ করেছে। এই পদের অনির্বচনীয় ভাবমাধুর্যও কবিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

১২৯১ সালে প্রথম তিনি এ পদটির 'জনম অবধি হম' ইত্যাদি অংশটির ব্যাখ্যা করে লেখেন—

একটা মানুষ যত বড়ই হউক-না কেন, তাহাকে দেখিতে কিছু বেশীক্ষণ লাগে না—কিন্তু আজন্ম কাল দেখিয়াও যখন দেখা ফুরায় না তখন সে না-জানি কত বড় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, অনুরাগের প্রভাবে প্রেমিক একজন মানুষের অন্তরস্থিত অসীমের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, সেখানে সে মানুষের আর অন্ত পাওয়া যায় না।

তাই যেন প্রেমিকের সেই দেখা আর ফুরায় না। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার—

তাহার এত বেশি তৃপ্তি বর্তমান যে, সে-তৃপ্তিকে সে সর্বতোভাবে অধিকার করিতে পারে না ও তাহা সুমধুর অতৃপ্তিরূপে চতুর্দিক পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকে।

—'আলোচনা', ডুব দেওয়া : ডুবিবার স্থান

কবির প্রথম বয়সের এই উপলব্ধি পুনর্বার দেখা গেল পরিণত বয়সের পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারীতে।—

প্রেমিক বললে, 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।' অর্থাৎ, বললে লক্ষযুগের পাওয়া অল্পকালের মধ্যেই পেয়েছি আবার সেই সঙ্গেই লক্ষযুগের না-পাওয়াও লেগেই রইল।

— পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৫ ফেব্রুআরি ৯

এ ছাড়া ১৩১৩, ১৩৩১ ও ১৩৪৮ সালে লেখা যথাক্রমে সাহিত্য সম্মিলন ('সাহিত্য'), তথ্য ও সত্য ('সাহিত্যের পথে') এবং সাহিত্যে চিত্রবিভাগ ('সাহিত্যের স্বরূপ') প্রবন্ধত্রয়ে সাহিত্যরসের প্রসঙ্গে এই পদটিই কবির স্মরণে আসে। কবির বক্তব্য হল, 'অনুরাগবীক্ষণে' অত্যুক্তি থাকবেই। সে নিয়ে লজিকের তর্ক করা বৃথা। এই অত্যুক্তি কাব্যানুরাগীর পক্ষে অতিরিক্ত নয়, রসের বিচারে তা অতি প্রয়োজনীয় উক্তি।

১৩৪০ সালে তত্ত্বের দিক থেকে কবি এই পদের অর্থকে আরো একটু দূরে টেনে নিয়ে গিয়েছেন।—

সাধারণত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে আমরা পরিমাণ রক্ষা করেই চলি। কিন্তু যাকে ভালোবাসি, অর্থাৎ যার সঙ্গে আমার ব্যক্তিপুরুষের পরম সম্বন্ধ, তার সম্বন্ধে পরিমাণ থাকে না। তার সম্বন্ধে অনায়াসেই বলতে পারি—

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু, নয়ন ন তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন ন গেল॥

তথ্যের দিক থেকে এতবড়ো অদ্ভুত অত্যুক্তি আর-কিছু হতে পারে না—কিন্তু

ব্যক্তিপুরুষের অনুভূতির মধ্যে ক্ষণকালের সীমায় সংহত হতে পারে চিরকাল।

—'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব

১৩৪১ সালে লেখা সাহিত্যে আধুনিকতা ('সাহিত্যের স্বরূপ') প্রবন্ধে কবি সম্পূর্ণ নূতন অর্থে এ পদ প্রয়োগ করলেন। তিনি বললেন, যে নব্যতা শুধুই পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, ক্ষণিকতাই তার লক্ষণ, প্রকৃত নবীনের মধ্যে চিরন্তনের সুর থাকে, যে নবীনতাকে দেখে বলা যায় না যে 'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল' তাকে নবীন বলে ভাববার কারণ নেই। এখানে রবীন্দ্রনাথ যে প্রসঙ্গে এ পদটি ব্যবহার করেছেন তাতে তাঁর চিন্তার বিশেষ অভিনবত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, বৈষ্ণব পদ সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতি বিশেষ সম্প্রদায়গত আধ্যাত্মিকতার পরিমণ্ডল বহির্ভূত, তা মানবহৃদয়ের তপ্ত অনুভূতিতেই সঞ্জীবিত। সব কিছুতে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আরোপ যে কত অনাবশ্যক ও হাস্যকর সেটিও কবি দেখিয়েছেন 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের অন্তর্গত কাব্যের তাৎপর্য প্রবন্ধে (১৩০১ অগ্রহায়ণ)। সেখানে ব্যোম 'কচ ও দেবযানী'র মতো একটি কাব্যের তাৎপর্য নির্ণয় করতে বসে 'জনম অবধি হম' ইত্যাদি পদটির তুলনা এনে এক উৎকট আধ্যাত্মিকতায় পৌঁছেছে। অরসিকের হাতে কাব্যের অপমৃত্যু যে কেমন করে হয় এটি তারই নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একদা-প্রিয় পদকর্তা বসন্ত রায়কে পরবর্তী কালে আর তেমন করে স্মরণ করেন নি। তবে বসন্ত রায়ের 'নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি' পদাংশটি তাঁর মনে কিছু স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১২৮৯ সালে তিনি প্রথম এই পদের ব্যাখ্যা করেন।—

নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি !··· প্রেমের সময়গণনা যুগ যুগান্তর লইয়া নহে। প্রেম নিমিখ লইয়া বাঁচিয়া থাকে, এই নিমিত্ত প্রেমের সর্বদাই ভয়—পাছে নিমিখ হারাইয়া যায়। এক নিমিখে মাত্র আমি যে একটি চাহনি দেখিয়াছিলাম তাহাই হৃদয়ের মধ্যে লালন করিয়া আমি শতেক যুগ বাঁচিয়া থাকিতে পারি; আবার হয়ত আমি শতেক যুগ অপেক্ষা করিয়া আছি, কখন আমার একটি নিমেষ আসিবে, একটি মাত্র চাহনি দেখিব! দৈবাৎ সেই একটি মুহূর্ত হারাইলে আমার অতীত কালের শতেক যুগ ব্যর্থ হইল, আমার ভবিষ্যৎ কালের শতেক যুগ হয়ত নিষ্ফল হইবে।···প্রেমের স্ফূর্তিও একটি মাহেন্দ্রক্ষণ একটি শুভ মুহূর্তের উপরে নির্ভর করে।···এই নিমিত্তই রাধা যখন ভাগ্যক্রমে প্রেমের শুভমুহূর্ত পাইয়াছেন তখন তাঁহার প্রতিক্ষণে ভয় হয় পাছে এক নিমিখ হারাইয়া যায়, পাছে সেই এক নিমিখ

হারাইয়া গেলে শতেক যুগ হারাইয়া যায়। পাছে শতেক যুগের সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া সেই নিমিখের হারানো বস্তুটুকু আর খুঁজিয়া না পাওয়া যায়।

— সমালোচনা', বসন্ত রায়

উক্ত পদের রবীন্দ্রকৃত ব্যাখ্যাটি পড়লে বোঝা যায়, এই বিশ্লেষণের সাহিত্যমূল্য প্রকৃত পদটির মূল্যকে ছাপিয়ে গেছে। পরবর্তী কালে লেখা এক পত্রে দেখি তিনি এই পদকে রাধাপ্রেমের ব্যক্তিগত সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বপ্রেমের উপলব্ধিতে টেনে নিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, বৃহৎ কালপ্রবাহে মানুষের জীবনের স্থিতি মুহূর্তকালের বেশি নয়। তাই—

নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি। বাস্তবিক মানুষের এক নিমেষের মধ্যে শত যুগের সংযোগ বিয়োগ ঘটাতে পারে। সেই জন্যে নিমেষগুলোকে দুর্মূল্য বলে বোধ হয়।

— ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১৩০, ১৮৯৪ জুলাই ১০

আবার ১৩৩২ সালে তিনি এই পদকে ব্যক্তিপ্রেম বা বিশ্বপ্রেমকে পেরিয়ে নিয়ে গেছেন অসীমের দিকে। তবে সে উপলব্ধির জন্যও আছে প্রেমের অপেক্ষা।—

নিমেষই বলো আর লক্ষ যুগই বলো, দুয়ের মধ্যেই অসীম সমানভাবেই আছে, শুধু কেবল উপলব্ধির অপেক্ষা। এইজন্যই কবি প্রেমের ভাষায় অর্থাৎ নিবিড় সত্য-উপলব্ধির ভাষায় বলেছেন, "নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি'।

— পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী, পরিশিষ্ট ১৯২৫ ফেব্রুয়ারি ১২

এমন করে একই পদকে অর্থ থেকে অর্থান্তরে টেনে নিয়ে গিয়ে তার থেকে নব নব রস নিষ্কাশন ও আস্বাদন করা রবীন্দ্রনাথের মতো কবির পক্ষেই সম্ভব।

শুধু সাহিত্যপ্রসঙ্গ নয়, রাজনীতি-সমাজনীতির মতো জটিল কুটিল আলোচনাতেও পদাবলীর উদধৃতি দিয়ে তিনি আপন কার্যসাধন করে নেন। ১৩০৫ সালে দেশী ইংরেজভক্তদের উপর ব্যঙ্গকশার আঘাত দিয়ে তিনি লেখেন—

সাহেব, তোমারই জন্য দেশের লোকের কাছে গাল খাইলাম।

ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।
(অতএব কিঞ্চিৎ সুবিধা চাই)।

—'সমূহ', পরিশিষ্ট আলট্রা-কন্‌সার্ভেটিভ

১৩০৮ সালে ব্যাধি ও প্রতিকার শীর্ষক প্রবন্ধে ('সমাজ', পরিশিষ্ট) তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মোহে আত্মবিস্মৃত জনসম্প্রদায়কে স্বস্থ করতে চেয়ে উক্ত উদধৃতিটিই প্রয়োগ করেন। ১৩১১ সালে সমাজনীতির প্রসঙ্গেও ('আত্মশক্তি', সংযোজন : 'স্বদেশী

সমাজ' প্রবন্ধপাঠ) ঐ উদ্ধৃতির যোগে তিনি বলেছেন যে, বাইরে থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তার প্রয়োগ করতে হবে ঘরে। তবেই হবে সমাজের উন্নতি। আবার 'কালান্তরে'র মতো রাজনৈতিক সমস্যামূলক গ্রন্থেও বৈষ্ণব পদাবলী এসে গেছে সহজেই। রায়তের দুর্দশা সেখানে রাধিকার দুর্দশার সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে ('কালান্তর', রায়তের কথা ১৩৩৩ আষাঢ়)।

আসলে মনে হয়, একদা বাংলাদেশে কানু ছাড়া গীত ছিল না। কানুর সেই মধ্যযুগীয় একাধিপত্য আজ না থাকলেও সে সংস্কার জড়িয়ে গেছে বাঙালীর অস্থি-মজ্জায়। তাই রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ বাঙালি পাঠকের মনে সাড়া জাগায় সহজেই। সর্বত্র না হলেও কবি এ সুবিধাটুকুর সদ্ব্যবহার করেছেন অনেক ক্ষেত্রেই। তাই দেখি তাঁর নাটক ও উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা প্রায়ই পদাবলীর উদ্ধৃতি ব্যবহার করে এবং সে প্রয়োগ আমাদের হৃদয়গত সংস্কারে ঘা দিয়ে একটা নতুন স্বাদের সঞ্চার করে।

কবিব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলি লক্ষ করলে আরও একটি বিষয় চোখে পড়ে। কবি নিজেই স্বীকার করেছেন যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি তাঁর আকর্ষণের প্রথম কারণ ছিল বিদ্যাপতির ব্রজবুলি ভাষা। কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে তিনি সহজ কথার কবি চণ্ডীদাসের বাংলা পদকে বিদ্যাপতির কৃত্রিম (!) ব্রজবুলির তুলনায় শ্রেষ্ঠতর বলে মনে করেছেন। এমন কি, বসন্ত রায়ের পদ বাংলা মিশ্রিত ব্রজবুলি না হয়ে ব্রজবুলি মিশ্রিত বাংলা হওয়ায় বিদ্যাপতির তুলনায় তাঁকেও শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন এবং ব্রজবুলির 'বৃন্দাবনী চাপকানে' কেবল টানাবোনা কৃত্রিম কল্পনা লক্ষ করেছেন। কৌতুকের বিষয় হল কবির এই মন্তব্যের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারের মিল হয় নি। তাঁর রচনায় সর্বাধিক ব্যবহৃত পদগুলি বিদ্যাপতির এবং ভাষাও ব্রজবুলি। এ ছাড়া 'ছবি ও গান' গ্রন্থের (১৮৮৪) প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে কবি জানিয়েছিলেন যে, তিনটি পদ ছাড়া 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'র সব পদই ১২৮৯ সালে লেখা এবং বলা বাহুল্য যে এই পদগুলির ভাষা ব্রজবুলি। অথচ ব্রজবুলির বিরুদ্ধে তাঁর ওকালতি শুরু হয়ে গিয়েছিল ১২৮৮ সালের ফাল্গুন মাসেই। কথায় ও কাজে তাঁর এই অসংগতির কারণ কি ?

এক সময়ে অলংকৃত অত্যুক্তিকে সমর্থন করে কবি বলেছিলেন—

কখন হৃদয় হয় সহসা উতলা—
তখন সাজিয়ে বলা
আসে অগত্যাই।

—'সানাই', অত্যুক্তি ১৯৩৯ মে

এখানে কবির বক্তব্য হল, হৃদয়ের আবেগে কথা যখন স্বতঃই অলংকারে সেজে ওঠে

তখন তাকে কৃত্রিম বলা যায় না, কেননা 'ঢেউ এর মুখে মোতির ঝিনুকে'র মতো সে সহজেই ভেসে আসে। ব্রজবুলির রসসম্পৃক্ত অলংকরণও সেই কারণেই তাঁর মন ভুলিয়েছে যদিও তাঁর সচেতন বিচারবুদ্ধি তা মানতে চায় নি। তাই তাঁর সতর্ক বিচারের পাহারা এড়িয়ে ব্রজবুলির পদগুলি ছন্দে ও ভাষাভঙ্গির প্রসাধনে তাঁর হৃদয় জয় করে নিয়েছে।

বৈষ্ণব পদাবলী কবির মনে যে কত গভীর ও স্থায়ী ছাপ রেখেছিল উপরের আলোচনাই তার প্রমাণ। তাঁর কৈশোরের মুগ্ধতা রূপ ধরেছে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে, পদাবলীর সংকলনে ও বৈষ্ণব পদের মাধুর্য বিশ্লেষণে। পরিণত বয়সে তাঁর সাহিত্যে তারা দেখা দিয়েছে উদ্ধৃতি রূপে এবং কবি তাতে নূতন ভাব আরোপ করে, তার থেকে নূতন ব্যঞ্জনা নিষ্কাশন করে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' তাকে নূতন রূপ দান করেছেন। তাঁর সেই জাদুস্পর্শে পদাবলীসাহিত্য এমন এক অপূর্ব রসরূপ নিয়ে আমাদের কাছে দেখা দেয় যার ছবি হয়তো বৈষ্ণব পদকর্তাদের কল্পনাতেও ছিল না। আর তখন কবি তাকে আপন সাহিত্য সমৃদ্ধ করার কাজে লাগিয়ে দেন। এ বিষয়ে তার কৈফিয়ৎ হল—

অনুকরণই চুরি, স্বীকরণ চুরি নয়।

— সাহিত্যের পথে', সাহিত্যসম্মিলন ১৩৩৩ বৈশাখ

ভানুসিংহের পদাবলীতে পাই এই অনুকরণ। কবির নিজের মনের মাপকাঠিতে তা চৌর্যাপরাধ, কারণ তার ভাবের মধ্যে 'মেকি' ছিল। কবি স্বয়ং এজন্য লজ্জিত। কিন্তু পরবর্তী কালে 'স্বীকরণ' শক্তিতে যখন তিনি 'ভাবচুরি' করেছেন তখন তার থেকে আর চোরাই মাল বার করা যায় না। কারণ স্রষ্টা যে, সে উপকরণ যে ভাবেই হক, সংগ্রহ করে—

কিন্তু এই উপকরণ তাকে তৈরি করে না। এই উপকরণগুলি ব্যবহারের দ্বারা সে আপনাকে স্রষ্টারূপে প্রকাশ করে।

—'সাহিত্যের স্বরূপ', সাহিত্যের ঐতিহাসিকতা ১৯৪১ মে

স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের মানসগঠনের যে উপাদান বৈষ্ণব পদাবলী থেকে নেওয়া তার স্থূল প্রত্যক্ষ অংশটুকুই আলোচনা করা গেল। বৈষ্ণব কবিতার যে রসবৈশিষ্ট্য কবির ভাবসত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গেছে, তার আলোচনা এখানে শুধু যে অবান্তর তা নয়, বিশ্লেষণের দ্বারা তাকে পৃথক্ করে দেখাবার প্রয়াসও বৃথা।

মধ্যযুগের সাধক

প্রথম পর্যায়

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে পরিণততম জীবনদর্শন প্রকাশ করেছেন তাতে দেখি—

> মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎমানুষ হয়ে উঠছে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎমানুষের সাধনা। এই বৃহৎমানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।
>
> —'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১

ভারতবর্ষের মানুষ যুগ যুগ ধরে যে 'বৃহৎমানুষে'র সন্ধান করে এসেছে তাকে তারা কখনও দেখেছে অভিজাত শাস্ত্রগ্রন্থের সূক্ষ্ম তত্ত্বে, কখনও পেয়েছে তথাকথিত অন্ত্যজ হীন সম্প্রদায়ের সাধকের সত্যানুভূতিতে। তাই কবি যে-বাণী শুনেছেন বেদ-উপনিষদ্-গীতায়, তারই প্রতিধ্বনি শুনেছেন নিরক্ষর আউল-বাউলের গানে।—

> মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ। সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা বেদে আছে: আবিরাবীর্ম এধি। পরম মানবের বিরাটরূপে যাঁর স্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।
>
> —'মানুষের ধর্ম', অধ্যায় ১

সত্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথের কাছে নিম্নশ্রেণীর বাউল সাধকেরাও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মতোই সম্মানীয়। এই শ্রদ্ধা নিয়েই তিনি দেখেছিলেন মুসলমান জোলা কবীরকে[১] (আনু. ১৪৪০-১৫১৮), চর্মকার রবিদাসকে, নানককে (আনু. ১৪৬৯-১৫৩৯), দাদূকে (আনু. ১৫৪৪-১৬০৩), রজ্জবকে (আনু ১৫৫০-১৬২০)। এঁদের বাণীকে কবি তথাকথিত শাস্ত্রবাণীর চেয়ে হীন বলে মনে করেন নি। সেইজন্যই যে গুরু রামানন্দ (আনু. ১৪০০-১৪৭০) বা যে শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩) 'ভেদচিহ্নের-তিলক-পরা সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে' নেমে এসে আচণ্ডাল জনসাধারণকে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন, তাঁদের প্রতি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে কবির অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার স্বীকৃতি। এই 'মুক্ত প্রাণের বার্তাবহ'দের লক্ষ করেই কবি হেমন্তবালা দেবীকে লিখেছিলেন—

> ভারতের মধ্যযুগে এই যে সব বড়ো বড়ো সাধকদের আবির্ভাব হয়েছিল এঁরা সমাজ ও শাস্ত্রের প্রাচীর তোলা দুর্গের বাইরে বাস করতেন বলেই এঁদের

১ মতান্তরে (১৩০০-১৪২০)

প্রতিভার স্বচ্ছতায় আধ্যাত্মিক সত্যের প্রকাশ এমন বিশুদ্ধ ও সার্বভৌমিক হয়েছিল। এই সকল ধর্মসাধকদের প্রায় সকলেরই উৎপত্তি অন্ত্যজ জাতির থেকে। সমাজ তাঁদের বাইরে বসিয়ে রেখেছিল,—সেই অনাদর অবজ্ঞাতেই তাঁদের মুক্তির সহায়তা করেছিল।

—চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৮০, ১৯৩৫ জুলাই ১৭

সমাজের নীচের তলার এইসব সাধকদের কাছে শাস্ত্রবাণী ও আচারের পথ একেবারেই সুগম ছিল না। কিন্তু কবি বুঝেছিলেন যে, বাইরের পূজামন্দিরের দ্বার এঁদের কাছে বন্ধ ছিল বলেই অন্তরের মিলনমন্দিরের চাবি তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁরা বাহ্যিক আচারের বেড়া ভেদ করে কথা কয়েছিলেন মানুষের অন্তরাত্মার কাছে। শাস্ত্রবাক্যের বা 'সুনির্দিষ্ট মতের ফ্রেম-দিয়ে বাঁধানো' ঈশ্বরের ধারণা তাঁদের ছিল না। তাঁদের ঈশ্বর 'কোনো একটি পুণ্যাভিমানী দলবিশেষের সরকারী ঈশ্বর নন, তিনি প্রাণেশ্বর'।[1] এই প্রাণেশ্বরকে তাঁরা পেয়েছিলেন 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। তাঁদের সহজ অনুভূতিতেই তিনি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন। সেই পরম পাওয়ার অহেতুক আনন্দেই তাঁদের কণ্ঠে বেজে উঠেছিল ভগবানের বন্দনা গান। তিনি প্রত্যক্ষ সত্যরূপে তাঁদের জীবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে সহজ সুন্দররূপে কাব্যে প্রকাশ পেয়েছিলেন। মধ্যযুগের সন্তদের সঙ্গে সহজ অনুভূতির কবি রবীন্দ্রনাথের এইখানেই সাধর্ম্য।

কবি রবীন্দ্রনাথ এই সন্তদের যে কী দৃষ্টিতে দেখেছিলেন এবং তাঁদের বাণীসাধনা তাঁকে কতদূর স্পর্শ ও কী পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করেছিল, এখানে তারই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যাক।

২

মধ্যযুগীন সাধকদের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গেই কবির আবাল্য পরিচয়। প্রথম বয়সে যখন তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর মাধুর্যরসে নিমজ্জিত, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনায় ব্যাপৃত এবং 'পদরত্নাবলী' সংকলনে ব্যস্ত, তখনই চৈতন্য-জীবনীগ্রন্থগুলি সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। এ সম্বন্ধে কাদম্বিনী দেবীকে তিনি এক পত্রে লেখেন—

বৈষ্ণবকাব্য এবং চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি কাব্য অবলম্বন করে চৈতন্যের জীবনী আমি অনেকবয়স পর্যন্ত বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করেছি।

—'চিঠিপত্র' ৭, পত্র-১৫, ১৯১০ জুলাই ৪

১ দ্রষ্টব্য: ক্ষিতিমোহন সেন-রচিত 'দাদূ' গ্রন্থের (১৩৪২) রবীন্দ্র-কৃত ভূমিকা ১৩৩২ ভাদ্র, পৃ ৬

পরিণত বয়সেও এই প্রসঙ্গ স্মরণ করে তাঁকে লিখতে দেখি—

> প্রথম বয়সে বৈষ্ণবসাহিত্যে আমি ছিলুম নিমগ্ন,…চৈতন্যমঙ্গল চৈতন্যভাগবত পড়েছি বারবার। পদকর্তাদের সঙ্গে ছিল আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়।
>
> —'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৯৯ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩৬ মে ১৫

শ্রীচৈতন্যের জীবনকথা ও ধর্মাদর্শ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল সমধিক। তাঁর প্রথম যুগের সাহিত্যে তাই মানবপ্রেমিক চৈতন্যদেব দেখা দিয়েছেন বারে বারে। তাঁর প্রথম জীবনের রচনায় তিনি লিখেছিলেন—

> আমাদের বাঙালির মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘা-কাঠার মধ্যেই বাস করিতেন না, তিনি তো সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন।
>
> —'চিঠিপত্র' ১২৯২ অধ্যায় ৬

কবি দেখেছিলেন, শ্রীচৈতন্য আপনাকে পরিচিতের সংকীর্ণ সীমায় বেঁধে রাখেন নি। তিনি তাঁর হৃদয়কে উন্মুক্ত করে সমস্ত বিশ্বভুবনে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন। তারই ফলে তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত হয়েছিল এক মহামিলনের সংগীত। সে সংগীত সব মানবের প্রেমে পূর্ণ, তা 'বিজন কক্ষে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া একটিমাত্র বিরহিণীর বৈঠকি কান্না নয়, প্রেমে আকুল হইয়া নীলাকাশের তলে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিশ্বজগতের ক্রন্দনধ্বনি' ('চিঠিপত্র', অধ্যায় ৬)। এই সংগীতই কীর্তন-সংগীত। প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্যের সর্বজনীন প্রেমের শক্তি দেশের বৃহৎ জনসাধারণের চিত্তকে যে এক করে মিলিয়ে দিয়েছিল, সেই সম্মিলিত জনচিত্তের আবেগই যেন কীর্তন-সংগীত রূপে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। চৈতন্যদেবের একক প্রয়াসেই এই অসাধ্য সাধন হয়েছিল। এই দিকে দৃষ্টি রেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাংলাদেশের গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এককণ্ঠবিহারী বৈঠকি সুরগুলো কোথায় ভাসিয়া গেল? তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গহিল্লোল সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগরাগিণী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, একজনকে ছাড়িয়া সহস্র জনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া এক নূতন কীর্তন উঠিল। যেমন ভাব তেমনি তাহার কণ্ঠস্বর—অশ্রুজলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করিবার জন্য ক্রন্দনধ্বনি।
>
> —'চিঠিপত্র', অধ্যায় ৬

চৈতন্যপ্রবাহিত এই অ-পূর্ব ভাববন্যার পরিচয় দিয়ে কবি আরও বলেছেন—

আসল কথা, বাংলায় সেই একদিন সমস্ত একাকার হইবার জো হইযাছিল। তাই কতকগুলো লোক খেপিয়া চৈতন্যকে কলসীর কানা ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল। কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। কলসীর কানা ভাসিযা গেল। দেখিতে দেখিতে এমনি একাকার হইল যে, জাতি রহিল না, কুল রহিল না, হিন্দু-মুসলমানেও প্রভেদ রহিল না।

—'চিঠিপত্র' অধ্যায় ৬

এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, উক্ত ঘটনাটি চৈতন্যশিষ্য নিত্যানন্দ সম্পর্কেই শোনা যায়, চৈতন্য সম্বন্ধে নয়। কিন্তু পূর্বেই দেখা গেছে, চৈতন্যের জীবনী সম্বন্ধে কবি অনবহিত ছিলেন না। তাই এ কথা বলা যায় যে এ স্থলে প্রেমধর্মের অন্তর্নিহিত ভাবসত্যটিই কবির লক্ষ্য, তথ্যের সত্যতা তার উপলক্ষ মাত্র। সুতরাং কবির এই ত্রুটির গুরুত্ব সামান্যই।

চৈতন্যের এই প্রেমধর্ম যে নিছক ভাবপ্লাবন মাত্র ছিল না, তাঁর সংগঠনী মন যে এই ধর্মাদর্শকে কত প্রবল আগ্রহে স্থূল বাসনার ঊর্ধ্বে বিশুদ্ধ রাখতে চেয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তাও লক্ষ করেছিলেন। তাই বঙ্গব্যবচ্ছেদের সময় অন্যাযকারী দেশবাসীর বিরুদ্ধে স্বদেশ প্রেমের উদ্দীপনা জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রাক্তন আদর্শকে স্মরণ করে বলেছেন -

স্বদেশের লোক আমাদের যজ্ঞের পবিত্র হুতাশনে পাপ-পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া আমাদের হোমকে নষ্ট করিতেছে, তাহাদিগকে আমরা কেন সমস্ত মনের সহিত ভৎসনা করিবার, তিরস্কার করিবার শক্তি অনুভব করিতেছি না।...চৈতন্যদেব একদিন বাংলাদেশে প্রেমের ধর্ম প্রচার করিযাছিলেন। কাম-জিনিসটা অতি সহজেই প্রেমের ছদ্মবেশ ধারিয়া দলে ভিড়িয়া পড়ে, সেইজন্য চৈতন্য যে কিরূপ একান্ত সতর্ক ছিলেন তাহা তাঁহার অনুগত শিষ্য হরিদাসের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহারে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় চৈতন্যের মনে যে প্রেমধর্মের আদর্শ ছিল তাহা কত উচ্চ, তাহা কিরূপ নিষ্কলঙ্ক।...নিজের দলের লোকের প্রতি দুর্বল মমতাকে তিনি মনে স্থান দেন নাই—ধর্মের উজ্জ্বলতাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার প্রতিই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

—'সমূহ', পরিশিষ্ট. দেশহিত ১৩১৫

স্বদেশের হিতসাধনের পশ্চাতে কবি এমনই এক উচ্চ ও সংযত আদর্শকে জাগ্রত রাখতে চেয়েছিলেন। পূর্বের বৈষ্ণব পদাবলী অধ্যায়ে বলা হয়েছে, চৈতন্য-প্রবর্তিত রসসম্ভোগের সাধনাকে কবি আধ্যাত্মিক বিলাস বলে মনে করতেন। কিন্তু মনে

রাখতে হবে যে, পরবর্তী কালের বিকৃত সাধনপদ্ধতিই কবির এতদূর বিরাগের কারণ। না হলে প্রেম-ধর্মের নিষ্কলঙ্ক উচ্চ আদর্শনিষ্ঠা ও তার সর্বজনীন আবেদন কবি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করেছেন।

৩

প্রথম জীবনে চৈতন্য ব্যতীত মধ্যযুগের অন্যান্য সন্তদের সঙ্গে কবির পরিচয় কতদূর ছিল তা জানা যায় না। অবশ্য বাল্যকাল থেকেই শিখ ধর্ম ও গুরু নানকের সম্বন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর পিতার কাছ থেকে। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে (হিমালয়যাত্রা) তিনি শিখ ধর্ম ও তার উপাসনার প্রতি তাঁর পিতার সোৎসাহ সহযোগিতার উল্লেখ করেছেন। কবি স্বয়ং পরবর্তী কালে নানা প্রসঙ্গে নানকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাঁর জীবনকথাও তিনি বিবৃত করেছেন ('ইতিহাস', পরিশিষ্ট: কাজের লোক কে?)। এ সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। অন্যান্য সন্তদের বাণীর সঙ্গে কবির প্রথম পরিচয়ের কাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। কবি এক সময়ে লিখেছিলেন—

> আমি হিন্দি জানি না, কিন্তু আমাদের আশ্রমের একটি বন্ধুর কাছ থেকে প্রথমে আমি প্রাচীন হিন্দি সাহিত্যের আশ্চর্য রত্নসমূহের কিছু কিছু পরিচয় লাভ করেছি।
>
> —'সাহিত্যের পথে', সভাপতির অভিভাষণ ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ

উক্ত আশ্রমিক বন্ধু সম্ভবতঃ 'ভারতীয় মধ্যযুগের কবিস্মৃতিভাণ্ডার সুহৃদ্' ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী। তিনিই প্রথম মধ্যযুগীয় সন্তদের বাণী ও সাধনার পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে গবেষণায় রত হন এবং কবির কাছ থেকে উৎসাহ ও সানন্দ সহায়তা লাভ করেন। কবির এই সহযোগিতার কথা তিনি বারংবার স্বীকার করেছেন। কিন্তু ক্ষিতিমোহনের সঙ্গে পরিচয়ের (১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ) পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সন্তদের সঙ্গে যে একেবারে পরিচিত ছিলেন না তা নয়। ১৯২৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখে তিনি 'ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সংঘের সভাপতির অভিভাষণে' বলেন—

> শৈশবে মনে পড়ে একজন ভক্ত হিন্দু গায়কের মুখে কবীরের এই গানটি শুনি:
>
> পানীমে মীন পিয়াসী রে
> মুকো শুনত শুনত লাগে হাঁসী রে।
> পূরণ ব্রহ্ম সকল ঘট বরতে
> ক্যা মথুরা ক্যা কাশীরে।
>
> —'প্রবাসী', ১৩৩২ মাঘ

১২৯৯ সালে লেখা এক প্রবন্ধে তাঁর শৈশবাভ্যস্ত এই বাণীটিই উদ্ধৃত দেখি—

এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও। আমরা আছি যেন—

পানীমে মীন পিয়াসী
শুনত শুনত লাগে হাসি।

—'শিক্ষা', শিক্ষার হেরফের, ১২৯৯ পৌষ

অবশ্য সাধারণ একটি প্রবচন হিসাবেই এখানে কবীরের বাণীটি ব্যবহৃত হয়েছে। তার কোনো বিশেষ গুরুত্ব এখানে দেখা যায় না। কিন্তু কবীর-প্রমুখ সন্তদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে আদৌ উদাসীন ছিলেন না, বরং তাঁদের সাধনার গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর এক প্রবন্ধে।—

ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনীমাত্র। সেই ইতিহাস পড়িলে মনে হয়, ভারতবর্ষ তখন ছিল না, কেবল মোগল পাঠানের গর্জনমুখর বাত্যাবর্ত শুষ্কপত্রের ধ্বজা তুলিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পশ্চিম হইতে পূর্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

কিন্তু বিদেশ যখন ছিল দেশ তখনো ছিল, নাহিলে এই সমস্ত উপদ্রবের মধ্যে কবীর নানক চৈতন্য তুকারাম ইহাদিগকে জন্ম দিল কে? তখন যে কেবল দিল্লি এবং আগ্রা ছিল তাহা নহে, কাশী এবং নবদ্বীপও ছিল।

—'স্বদেশ', ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৩০৯ ভাদ্র

কবি অনুভব করতে পেরেছিলেন যে বিদেশীর হাতের সমস্ত অত্যাচার-লাঞ্ছনার মধ্যে ভারতের বৈশিষ্ট্যটি ধরে রেখেছিলেন এই মধ্যযুগের সন্তরাই। এই সন্তদের মধ্যে আবার কবীরের বাণীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। তার প্রমাণ ১৯১৪ সালে Evelyn Underhill-এর সহায়তায় তিনি One Hundred Poems of Kabir নামে কবীরের এক শতটি দোঁহার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। কবীরের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ আকর্ষণের কারণটি কবীরের বাণী ও সাধনার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত। ঐতিহাসিক V. A. Smith কবীরের মনোভাব বিশ্লেষণ করে বলেন—

He condemned the worship of idols and the institution of caste. Both Musalmāns and Hindus are included among his followers, who are known as Kabīrpanthīs, or 'travellers on

the way of Kabīr', who claimed to be 'at once the child of Āllāh and of Rām.'

—'Oxford History of India' 1920, Book VI, ch 3 p. 260

এই উদার অসাম্প্রদায়িক মতবাদের প্রথম প্রচারক গুরু রামানন্দ। কিন্তু তাঁর কোনো লিখিত বাণী পাওয়া যায় না। তাঁর শিষ্যরাই তাঁর বাণী। এই রামানন্দ-শিষ্য কবীরের বাণী তাই রবীন্দ্রনাথের এত প্রিয়। সেইজন্যই তিনি ১৩১৯ সালে ভারতের ইতিহাসে সন্তদের স্থান নির্ণয় করে তাঁদের মধ্যে কবীরের গুরুত্বের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন—

সমাজের একান্ত আত্ম-সংকোচনের অচৈতন্যের মধ্যেও তাহার আত্মপ্রসারণের উদ্‌বোধনচেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে যুঝিয়াছে, ভারতবর্ষের মধ্যযুগে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। নানক কবীর প্রভৃতি গুরুগণ সেই চেষ্টাকেই আকার দিয়াছেন। কবীরের রচনা ও জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত বাহ্য আবর্জনাকে ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ সামগ্রীকেই ভারতবর্ষের সত্যসাধনা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার পন্থীকে বিশেষরূপে ভারতপন্থী বলা হইয়াছে। বিপুল বিক্ষিপ্ততা ও অসংলগ্নতার মধ্যে ভারত যে কোন্ নিভৃতে সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহা যেন ধ্যানযোগে তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন।

— ইতিহাস', ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ১৩১৯ বৈশাখ

আবার শেষ জীবনে কবি তাঁর চরম উপলব্ধির বাণীটি শুনেছিলেন কবীরের দোঁহাতেই—

The poet saint Kabir has also the same message when he sings :

By saying that Supreme Reality only dwells in the inner realm of spirit, we shame the outer world of matter , and also when we say that he is only in the outside, we do not speak the truth.

According to these singers, truth is in unity, and therefore freedom is in its realization.

—'The Religion of Man' 1931, ch. XIII : Spiritual Freedom

কবীর ছাড়া দাদূ, রজ্জব প্রভৃতি সাধকদের বাণীর সঙ্গেও যে কবির পরিচয় হয়েছিল,

তার নিদর্শন উদ্‌ধৃতিরূপে ছড়িয়ে আছে তাঁর সাহিত্যে। মধ্যযুগের এক ভক্ত শিষ্য নাভা-রচিত 'ভক্তমাল' গ্রন্থের[১] সঙ্গেও কবির পরিচয় ছিল। 'কাহিনী' কাব্যের (১৯০০) অপমানবর, স্বামীলাভ ও স্পর্শমণি কবিতায় যথাক্রমে মুসলমান জোলা কবীর, রামভক্ত তুলসীদাস ও বৈষ্ণব সনাতন গোস্বামীর যে কাহিনী বিবৃত হয়েছে তা ভক্তমাল থেকেই নেওয়া। 'পুনশ্চ' কাব্যের (১৯৩২) শুচি ও স্নানসমাপন কবিতা দুটি গুরু রামানন্দের এবং প্রেমের সোনা কবিতা চর্মকার রবিদাসের কাহিনী নিয়ে রচিত। ওই কাব্যের অন্তর্গত প্রথম পূজা ও মুক্তি কবিতাতেও কৃত্রিম আচার-ধর্মের বিরুদ্ধে মধ্যযুগীয় সাধক প্রবর্তিত মানবতার জয়ধ্বনিই উচ্চারিত হয়েছে। অচলায়তন নাটকটিতেও (১৯১২) কবি শুষ্ক বিধির কৃত্রিম প্রাচীর ধূলিসাৎ করে অন্তেবাসী শোণপাংশু ও দর্ভকদের মিলিয়ে দিয়েছিলেন তথাকথিত উচ্চবর্ণের 'শুদ্ধ' মানুষের সঙ্গে। এই অনুভূতিরই প্রতিধ্বনি রূপ পেয়েছে তাঁর পরবর্তী কালের রচিত 'পত্রপুট' কাব্যের পনেরো-সংখ্যক কবিতাটিতে (১৩৪৩ বৈশাখ), যেখানে তিনি নির্দ্বিধায় আপনাকে 'ব্রাত্য' ও 'মন্ত্রহীন' বলে ঘোষণা করেছেন।

৪

মধ্যযুগীয় সাধকদের বাণীকে কবি যে এমন একান্তভাবে অন্তরে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন তার কারণ এঁদের সাধনার পশ্চাতে কবি ভারতসংস্কৃতির মূল ধারার প্রবাহ অব্যাহত দেখেছিলেন। সেই মূল ধারা ঐক্যের ধারা। ক্ষিতিমোহনের 'দাদূ' গ্রন্থের (১৩৪২) ভূমিকায় কবি সেই কথাটিই ব্যক্ত করেছেন।—

> সেই জন্যেই যাঁরা যথার্থ ভারতের শ্রেষ্ঠপুরুষ তাঁরা মানুষের আত্মায় আত্মায় সেতু নির্মাণ করতে চেয়েছেন। যেহেতু বাহিরের আচার ভারতে নানা আকারে ভেদকেই পাকা করে রেখেছে এইজন্যেই ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধনা হচ্ছে বাহ্য আচারকে অতিক্রম করে অন্তরের সত্যকে স্বীকার করা।
>
> —'দাদূ', ভূমিকা ১৩৪২ ভাদ্র পৃ ৮

ভারতের অন্তরতর এই সত্য বাণী বহন করে এক এক দূতরূপে সন্তদের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁদের এই আবির্ভাব আকস্মিক নয়। ভারত ইতিহাসের চিত্তপ্রবাহের

১ 'এই ভক্তমালে কৃষ্ণ ও রামপন্থী শাস্ত্রানুমোদিত আচারশীল ভক্তদের কথাই বেশী। তাই নানক, দাদূ, রজ্জব প্রভৃতির নাম তাহাতে নাই। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবুদ্ধিহীন সাধকদের বিবরণ নাভার ভক্তমালে মিলে না।

—ক্ষিতিমোহন সেন-রচিত 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' ১৯৩০, পৃ ৫৩

পথ ধরেই পরম্পরাক্রমে তাঁদের অনিবার্য আবির্ভাব। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহজাত ইতিহাসবোধের দ্বারা সে সত্য অনুধাবন করেছিলেন। তিনি জানতেন যে রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনের ইতিহাস ভারতের ইতিহাস নয়। আন্তরিক সাধনার ইতিহাসই ভারতের যথার্থ ইতিহাস এবং সে সাধনা ঐক্যের সাধনা। তাই বেদমন্ত্র-রচয়িতা আর্যের ভারতে আগমনের অব্যবহিত পরেই শোনা গেছে আর্য-অনার্যের মিলনসংগীত। পরবর্তী যুগের করুণাজলদগম্ভীর বৌদ্ধ ত্রিশরণ মন্ত্র সমগ্র পূর্ব এশিয়াকে একাত্ম করে তুলেছিল। বৌদ্ধদের বর্ণ ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ উদারতাকে রবীন্দ্রনাথ যে কতদূর সমর্থন করতেন তার সুস্পষ্ট পরিচয় ধরা দিয়েছে 'নটীর পূজা' নাটকে (১৯২৬)। বৌদ্ধদের মধ্যে যে সর্ব মানবের সমন্বয়, সামাজিক ঐক্যবন্ধন ও অসমতা দূরীকরণের প্রয়াস দেখা যায়, সেটিই কবি লক্ষ করেছিলেন মধ্যযুগের সন্তদের মধ্যে। আবার বৌদ্ধপ্রাবল্যের পর খণ্ড খণ্ড ধর্মসম্প্রদায়ের বিরোধবিচ্ছিন্নতাকে অখণ্ড অদ্বৈততত্ত্বের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টায় শংকরাচার্য এই ভারতীয় প্রতিভারই পরিচয় দিয়েছিলেন।—

> অবশেষে দার্শনিকজ্ঞানপ্রধান সাধনা যখন ভারতবর্ষের জ্ঞানী অজ্ঞানী অধিকারী অনধিকারীকে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল তখন চৈতন্য নানক দাদূ কবীর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জাতির অনৈক্য শাস্ত্রের অনৈক্যকে ভক্তির পরম ঐক্যে এক করিবার অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারাই ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান-প্রকৃতির মাঝখানে ধর্মসেতু নির্মাণ করিতেছিলেন।
>
> —'রাজাপ্রজা', পথ ও পাথেয় ১৩১৫

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের মতে কবীর, দাদূ, রজ্জব, প্রভৃতি সন্তগণ জন্মতঃ মুসলমান হলেও হিন্দুভাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। অন্য দিকে চৈতন্যশিষ্য যবন হরিদাসের কথা তো আমাদের কাছে সুপরিচিত। প্রকৃতপক্ষে এঁরা সকল সম্প্রদায়ের অতীত এক বৃহৎ সত্যের সাধনায় মগ্ন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগে রাজা রামমোহনের সাধনার মধ্যে সেই সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। রামমোহনের অগ্রপথিক দাদূ বলেছিলেন—

সব ঘট একৈ আত্মা, ক্যা হিন্দু-মুসলমান।

আর রজ্জব বলেছিলেন—

হাথ জোড়ু গুরু সূঁ হো মিলৈ হিন্দু-মুসলমান।
সাধন মাহি জোগ নহি জৈ, ক্যা সাধন পরমাণ ॥

'গুরুর কাছে আমি করজোড় করছি যেন হিন্দু মুসলমান মিলে যায়। ঐতিহাসিক

সাধনায় এদের যদি যুক্ত করতে না পারি তা হলে সাধনার প্রমাণ হবে কিসে?' রবীন্দ্রনাথ সন্তদের এই বাণীসাধনার পরিচয় দিয়ে মন্তব্য করেছেন—

> এই ভারতপথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায়, ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তিলাভের সাধনায়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনসাধনায় নয়। · সেই পথের পথিক আধুনিক কালে রামমোহন রায়। তিনিও প্রয়োজনের দিক থেকে নয়, মানবাত্মার গভীরে যে মিলনের ধর্ম আছে সেই নিত্য আদর্শের দিক থেকে উদার প্রশস্ত পন্থায় সকলকেই আহ্বান করেছেন, যে পন্থায় হিন্দু মুসলমান খৃস্টান সকলেই অবিরোধে মিলতে পারে।
>
> —'ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ১, ১৩৪০ পৌষ

এই ভারতপথিক সন্তের দল যে 'হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতম মিলনক্ষেত্রে এক মহেশ্বরের পূজা বহন' করে চলেছিলেন সেই মিলনের ইতিহাস দীর্ঘ দিন অব্যক্ত ছিল। রামমোহন তাঁর আপন চিত্তশক্তির প্রেরণায় স্বভাবতই এই পথে চলেছিলেন, ইতিহাস অনুসরণ করে নয়। কিন্তু ইতিহাস সচেতন রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এটি ধরা পড়েছিল। তিনি দেখেছিলেন, মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের প্রথম অভিঘাতের পর—

> হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মাঝখানে এমন একটি সংযোগস্থল সৃষ্ট হইতেছিল যেখানে উভয় সমাজের সীমারেখা মিলিয়া আসিতেছিল, নানকপন্থী কবীরপন্থী ও নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবসমাজ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে নানা স্থানে ধর্ম ও আচার লইয়া যে সকল ভাঙাগড়া চলিতেছে শিক্ষিত-সম্প্রদায় তাহার কোনো খবর রাখেন না।
>
> —'আত্মশক্তি', স্বদেশীসমাজ ১৩১১ ভাদ্র

বৈষ্ণব ও কবীরপন্থীরা যে মিলনের প্রয়াস করতেন তার পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। শিখগুরু নানকও যে উদার পথে এক বৃহৎ মুক্তির মধ্যে সর্ব মানবকে আহ্বান করেছিলেন সেটিও রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন। তাই তিনি মন্তব্য করেন—

> বাবা নানক যে স্বাধীনতা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নহে, যে দেবপূজা কেবল দেশবিশেষের, জাতিবিশেষের কল্পনা ও অভ্যাসের দ্বারা সীমাবদ্ধ, পৃথিবীর সকল মানুষের চিত্ত যাহার মধ্যে অধিকার পায় না…এই সকল সংকীর্ণ পৌরাণিক ধর্মের বন্ধন হইতে তাঁহার হৃদয় মুক্তিলাভ করিয়াছিল এবং সেই মুক্তি তিনি সকলের কাছে প্রচার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।
>
> —ইতিহাস', শিবাজী ও গুরু গোবিন্দসিংহ

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রচারিত এই মানবতার ধর্ম পরবর্তী কালেও যথেষ্ট সজীব ছিল এবং জনসমাজের মধ্যে প্রবাহিত এই সাধনধারার মধ্যে থেকে গিয়েছিল এই যুগের ভারতের প্রাণবান্ ইতিহাস। কিন্তু সে ইতিহাস সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত হয় নি। তাই ক্ষিতিমোহন সেনের 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছেন যে, ভারতীয় চিত্তপ্রবাহের—'প্রাগ্রসর যাত্রার সম্পূর্ণ একটি ইতিহাস পাবার অপেক্ষা রয়ে গেল, না পেলে ভারতবর্ষের ধ্রুব স্বরূপটির পরিচয় ভারতবর্ষের লোকের কাছে অসম্পূর্ণ, এমন কি ভ্রমসংকুল হয়ে থেকে যাবে' (ভূমিকা, ১৩৩৬ পৌষ, পৃ ১৵)। এই উক্তি থেকে বোঝা যায় ভারতসংস্কৃতির ইতিহাসে মধ্যযুগীয় সন্তদের স্থান কত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই কারণেই এঁদের বাণী ও সাধনার প্রতি কবির এমন সুগভীর অনুরাগ।

৫

মধ্যযুগের সাধকরা যখন ভারতে আবির্ভূত হন, তখন রাষ্ট্রনৈতিক ভাঙাগড়ায় দেশে কেবলই বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছিল, ধর্মবিরোধের তীব্রতাও ছিল প্রবল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন—

> সেই বড়ো কৃপণ সময়েই তাঁরা মানুষের ভেদের চেয়ে ঐক্যকে সত্য করে দেখেছিলেন। কেননা, তাঁরা সকলেই ছিলেন কবি, কেউ পণ্ডিত ছিলেন না। শব্দের জালে তাঁদের মন জড়িয়ে যায় নি, তর্কের খুঁটিনাটির মধ্যে উঞ্ছবৃত্তি করতে তাঁরা বিরত ছিলেন।
>
> —'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি', ১৯২৫ ফেব্রুয়ারি ১২

দর্শনশাস্ত্রে বর্ণিত জটিল তত্ত্বও এই সন্তদের সহজ অনুভূতির আলোকে সহজ হয়ে গিয়েছিল। সেটি উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালায় 'বিশ্ব-আমি'র সঙ্গে 'ব্যক্তি-আমি'র রহস্যময় সম্বন্ধ বিশ্লেষণের উপলক্ষে বলেছেন—

> সাধক-কবি কবীর দুটিমাত্র ছত্রে আমি-রহস্যের এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন—
>
> যব হম রহল রহা নহিঁ কোঈ,
> হমরে মাহ রহল সব কোঈ।
>
> অর্থাৎ, আমির মধ্যে কিছুই নেই, কিন্তু আমার মধ্যে সমস্তই আছে। অর্থাৎ, এই আমি এক দিকে সমস্ত হতে পৃথক হয়ে অন্য দিকে সমস্তকেই আমার করে নিচ্ছে।
>
> —'শান্তিনিকেতন' ২, জাগরণ

এই সহজ ভাবের সাধক, যাঁরা শাস্ত্রের কূট তর্কজালে বা অর্থহীন প্রথার বন্ধনে বাঁধা পড়েন নি, তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক ভাবের মিল ছিল। তাই 'মানুষের ধর্ম' ব্যাখ্যা করতে বসেও কবি এঁদের বাণী স্মরণ করেছেন।—

কবি রজ্জবের একটি বাণী পেয়েছি। তিনি বলেছেন—

সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ, না মিলৈ সো ঝূঁঠ।
জন রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ॥

সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলল না তা মিথ্যে; রজ্জব বলছে, এই কথাই খাঁটি—এতে তুমি খুশিই হও আর রাগই কর।

ভাষা থেকে বোঝা যাচ্ছে, রজ্জব বুঝেছেন, এ কথায় রাগ করবার লোকই সমাজে বিস্তর। তাদের মত ও প্রথার সঙ্গে বিশ্বসত্যের মিল হচ্ছে না, তবু তারা তাকে সত্য নাম দিয়ে জটিলতায় জড়িয়ে থাকে—মিল নেই বলেই এই নিয়ে তাদের উত্তেজনা উগ্রতা এত বেশি।

—'মানুষের ধর্ম', অধ্যায় ৩

রবীন্দ্রনাথ নিজেও সমাজের সমর্থনের দিকে দৃষ্টি না রেখে সারা জীবন সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেছেন এবং অনেকের বিরাগভাজন হয়েছেন। তবু তার থেকে বিরত থাকেন নি। সেইজন্য পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ব্যক্তিগত ধর্মসাধনার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ব্রাহ্মণ গুরু রামানন্দকে, যিনি শিষ্যদের কাছ থেকে চলে গিয়ে আলিঙ্গন করেছিলেন নাভা চণ্ডালকে, মুসলমান জোলা কবীরকে, রবিদাস চামারকে। সেদিন সমাজে তিনি জাতিচ্যুত হয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে, 'তিনি একলাই সেদিন সকলের চেয়ে বড়ো জাতিতে উঠেছিলেন যে জাতি নিখিল মানুষের।' তিনি বৃহৎ সত্যের শক্তিতে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্কারগত মিথ্যাকে সবলে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও সমাজের সর্বস্তরের সর্বমানবের মধ্যে আপন আরাধ্য দেবতাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর মনোভাবের সমর্থন পেয়েছিলেন এই সন্তদের বাণীতে।—

Rajjab, a poet-saint of medieval India, says of Man :

God-man (*nara narayana*) is thy definition, it is not a delusion but truth. In thee the infinite seeks the finite, the perfect knowledge seeks love, and when the form and the Formless (the individual and the universal) are united, love is fulfilled in devotion.

Ravidas, another poet of the same age, sings :

Thou seest me, O Divine Man (*narahari*) and I see thee, and our love becomes mutual,

—'The Religion of Man', ch. VII : The Man of my heart.

কবির ব্যক্তিগত অনুভূতিও এই পথেই অগ্রসর হয়েছে। মানুষের আপন সত্তার মধ্যেই বিশ্বসত্তার প্রকাশ দেখেছেন তিনি। আর এই বিশ্বসত্তা বা ভাগবতসত্তাকে মানুষের অন্তরে উপলব্ধি করে 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে তার নাম দিয়েছেন 'মানবব্রহ্ম'। কবি-কথিত এই 'মানবব্রহ্ম'ই রজ্জবের 'নরনারায়ণ', রবিদাসের 'নরহরি'। এই নরনারায়ণের উপলব্ধিকে হৃদয়ে পোষণ করে জীবনসাধনার যে পথ, কবীর-রবিদাস-রজ্জবের মতো রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সেই পথেরই পথিক।[১] তাই এই সাধকদের বাণীর প্রতি কবির এমন সশ্রদ্ধ ও সানুরাগ সমর্থন।

৬

পূর্বেই দেখা গেছে, এই মধ্যযুগীয় সাধকদল তাঁদের অন্তরের মধ্যে 'যে ভগবানের স্পর্শ পেয়েছিলেন, তিনি শাস্ত্রে বর্ণিত কেউ নন, তিনি মনে প্রাণে হৃদয়ে আবিষ্কৃত অদ্বৈত পরমানন্দরূপ'। এই প্রাণের দেবতার অর্চনা তো বাহ্য উপচার দিয়ে হয় না। রবীন্দ্রনাথ তা লক্ষ করেই ক্ষিতিমোহনের 'দাদূ' গ্রন্থের (১৩৪২) ভূমিকায় (পৃ ৪) লিখেছেন—

> সেইজন্যই মন্ত্র পড়ে তাঁর পূজা হল না, গান দিয়ে তাঁর আবাহন হল। তিনি প্রত্যক্ষ সত্যরূপে জীবনে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে সহজ-সুন্দররূপে কাব্যে প্রকাশ পেলেন।

সাধারণতঃ ধর্মশাস্ত্রে যেসব স্তোত্র পাওয়া যায় সেগুলি সাহিত্যের অন্দরমহলে প্রবেশ করার ছাড়পত্র পায় না। তার কারণ ওইগুলিতে বিশ্বদেবতার সঙ্গে মানুষের সহজ সম্বন্ধটি নেই, নানা মন্ত্রতন্ত্র ও আচারের প্রাচীর খাড়া হয়ে থেকে সে সম্বন্ধকে অবারিত করে তোলে নি। তা আনুষ্ঠানিক শ্লোকরচনাতেই থেমে গেছে। কিন্তু এই সব নিয়মের বাঁধনছেঁড়া সাধকদের কাছে ভগবান সহজ আনন্দরূপে ধরা দিয়েছেন। তাই এঁদের বাণীতে যে রসটি নিবিড় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তা হল ভগবানের প্রতি প্রেমের রস। এক পরম পাওয়ার অহেতুক আনন্দই উচ্ছ্বসিত হয়েছে তাঁদের গানে।

১ রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তা ও ব্যাখ্যা বিস্তৃততরভাবে আলোচিত হয়েছে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন-রচিত রবীন্দ্রভাবনায় নারায়ণ শীর্ষক প্রবন্ধে।

তাঁদের এই পাওয়ার অনুভূতিটি নবীন বলেই তাঁদের বাণী এমন কাব্য হয়ে উঠেছে। সে সত্য উপলব্ধি করেই কবি দেখিয়েছেন, যে অন্ত্যজ জাতিরা সমাজের শ্রদ্ধা ও উচ্চশিক্ষা থেকে যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত ছিল 'তাঁরা কেবল জ্ঞানে নয়, চরিত্রে নয়, কাব্যরচনায় অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিলেন' ('সমাজ', নারীর মনুষ্যত্ব)। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহৃদয় হৃদয়ের কষ্টিপাথরে এঁদের কাব্যের মূল্য যাচাই করে তাঁদের বাণীকে সাহিত্যের অমরাবতীতে স্থান দেন। ক্ষিতিমোহনের পূর্বোক্ত 'দাদূ' গ্রন্থের (১৩৪২) ভূমিকায় (পৃ ১) তাই তিনি বলেছেন—

> আমার অপরিচিত হিন্দীসাহিত্যের মহলে কাব্যের বিশুদ্ধ রূপটি যখন খুঁজছিলুম, এমন সময় একদিন ক্ষিতিমোহন সেন মশায়ের মুখ থেকে বঘেলখণ্ডের কবি জ্ঞানদাসের দুই একটি হিন্দী পদ আমার কানে এল। আমি ব'লে উঠলুম, এই ত পাওয়া গেল। খাঁটি জিনিষ, একেবারে চরম জিনিস, এর উপরে আর তান চলে না।

কবির Creative Unity গ্রন্থের (1922) অন্তর্গত An Indian Folk Religion প্রবন্ধে এই হিন্দী কবি জ্ঞানদাসের অপূর্ব ভাবময় পদের অনেকগুলিই উদ্ধৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> Let me quote here some poems from a medieval poet of Western India—Jnāndās—whose works are nearly forgotten, and have become scarce from the very exquisiteness of their excellence.…
>
> What hast thou come to beg from the beggar,
> O King of Kings?
> My kingdom is poor for want of him, my
> dear one, and I wait for him in sorrow.
> How long will you keep him waiting, O wretch
> who has waited for you for ages in silence
> and stillness?
> Open your gate, and make this very
> moment fit for the union.
>
> It is the song of man's pride in the value given to him by Supreme Love and realised by his own love.

—'Creative Unity', An Indian Folk Religion-II

বৈষ্ণবের শ্রীরাধা যে ভাব থেকে বলেছিলেন 'তোমারি গরবে গরবিনী হাম' এই গানে সেই ভাবটিই ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের একটি গানেও জ্ঞানদাসের এই বাণীর আশ্চর্য প্রতিধ্বনি শোনা যায়।—

তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে,
প্রভু, নিত্য আছ জাগি।
তাই তো, প্রভু, যেথায় এল নেমে
তোমারি প্রেম ভক্তপ্রাণের প্রেমে
মূর্তি তোমার যুগলসম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে॥

—'গীতবিতান', পৃষ্ঠা-২৯৪

জ্ঞানদাসের গান কবিকে যে কতদূর আকৃষ্ট করেছিল এবং তা তাঁর অনুভূতিকে যে কত স্পষ্টরূপে প্রকাশ করতে পেরেছিল, তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধের উপসংহারেই তার প্রমাণ মেলে। ওই প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে তিনি লিখেছেন—

I can think of nothing better than to conclude my paper with a poem of Jnāndās, in which the aspiration of all simple spirits has found a devout expression—

Descend at whiles from thy high audience hall,
Come down amid joys and sorrows.
Hide in all forms and delights, in love,
And in my heart sing thy songs,—
O my Lover, my Beloved, my Best in all the world.

দেশের বৃহৎ জনসাধারণ যে ধর্মকে আশ্রয় করে আছে, তাকে প্রকাশ করবার জন্যে কবি জ্ঞানদাসের গানই নির্বাচন করে নিয়েছেন। তার থেকেই এ গানের গুরুত্বটি বোঝা যাবে। তা ছাড়া এর ভাবের সঙ্গে রবীন্দ্ররচিত গানের ভাবের মিল পাওয়া যায়। বিশেষতঃ এর শেষ পঙ্‌ক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে'·· ইত্যাদি পঙ্‌ক্তির সাদৃশ্যটি লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানদাসের গানের ভাবগভীরতায় যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন, তার প্রকাশ-ভঙ্গির সৌন্দর্যও তেমনি তাঁর মনোহরণ করেছিল। তাতে সাহিত্যিক অলংকরণ না

থাকলেও ভাবোপযোগী ভাষায় তা ব্যক্ত। তাই জ্ঞানদাসের একটি পদের অনুবাদ উদ্ধৃত করে তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

অসীম ক্ষুধায় অসীম তৃষায়
রহ প্রভু অসীম ভাষায়—
(তাই দীননাথ) আমি ক্ষুধিত, আমি তৃষিত,
তাই তো আমি দীন।

আমার জন্যে তাঁরই যে তৃষা তাই তাঁর জন্যে আমার তৃষার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর অসীম তৃষাকে তিনি অসীম ভাষায় প্রকাশ করছেন। সেই ভাষাই তো ঊষার আলোকে, নিশীথের নক্ষত্রে, বসন্তের সৌরভে, শরতের স্বর্ণকিরণে। জগতে এই ভাষার তো আর কোনোই কাজ নেই। সে তো কেবলই হৃদয়ের প্রতি হৃদয়সমুদ্রের ডাক। সে কবি বলরাম দাসের ভাষায় বলছে—

তোমায় হিয়ার ভিতর হৈতে
কে কৈল বাহির।

তুমি আমার হৃদয়ের ভিতরেই ছিলে, কিন্তু বিচ্ছেদ হয়েছে। অনন্তের মধ্যে এই-যে বিরহবেদনা সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে রচনা করে তুলছে, কবি জ্ঞানদাস তাঁর ভগবানকে বলছেন, এই বেদনা তোমাতে আমাতে ভাগ করে ভোগ করব—এ বেদনা যেমন তোমার তেমনি আমার।

—'শান্তিনিকেতন' ২, আত্মবোধ

বৈষ্ণব পদের সাহিত্যমূল্য সম্বন্ধে কবির উচ্ছ্বসিত সমর্থন সুবিদিত। পূর্বের অধ্যায়ে তা আলোচিত হয়েছে। এখানে দেখি সেই প্রথম শ্রেণীর পদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক পঙ্‌ক্তিতে হিন্দী কবি জ্ঞানদাসের গানকে স্থান দিয়েছেন। রবীন্দ্রমানসে জ্ঞানদাসের গান তাই উপেক্ষণীয় নয়। তবে মধ্যযুগের অন্যান্য সন্তদের বাণী এবং তাঁদের সহজ ভাবের তত্ত্ব কবিকে আকৃষ্ট করলেও তাদের প্রকাশসৌন্দর্য সর্বত্র যে তাঁকে সমভাবে আকৃষ্ট করেছিল, সে কথা বলা যায় না। সন্তদের বাণী সম্বন্ধে সে জাতীয় কোনো অনুকূল মন্তব্য এ পর্যন্ত চোখে পড়ে নি।

মধ্যযুগীয় সাধকদের বাণী সর্বসাধারণের হৃদয়কে যে এত সহজে স্পর্শ করতে পেরেছিল, তার কারণ তার ভাষা সযত্ন অনুশীলিত বিদগ্ধজনের ভাষা নয়, তা সর্বজন-বোধ্য চলিত ভাষা। সে 'ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত'।—

বুদ্ধ সেইজন্য পালি ভাষায় ধর্মপ্রচার করিয়াছেন, চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাঁহার

প্রেমাবেগ সর্বসাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন।

—'শিক্ষা', শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি

তুলসীদাস, কবীর, দাদূ, রজ্জব প্রভৃতি সাধকরাও সহজবোধ্য হিন্দী ভাষায় তাঁদের বাণী বিতরণ করেন। এঁদের ভাষার এই বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছিল। তার মধ্যে তুলসীদাসের রচনার সঙ্গে কবির পরিচয় বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল। তাই 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের বাংলা বহুবচন প্রবন্ধে তিনি অন্যান্য প্রাকৃত রচনার সঙ্গে তুলসীদাসের রচনায় ষষ্ঠী বিভক্তির প্রয়োগবৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন।

মধ্যযুগীয় সন্তদের জীবনসাধনার আলোচনা থেকে বোঝা গেল, ভারতের ঐক্য-সাধক ঋষির দল যে সাধনার ধারা প্রবর্তন করেছিলেন এই অবিদ্বান্ অন্ত্যজজাতীয় সন্তদের মধ্য দিয়ে সেই বিশেষ ধারাটি অবাধে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল। সাম্প্রদায়িক প্রথার কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আপন অনুভূতির আবেগে তাঁরা গান গেয়েছিলেন। সে গান বিশ্বজনীনভাব গান, তার সুর সহজ আন্তরিকভাব সুর। তাঁর ধর্ম শাস্ত্রীয় বাহ্যরূপের বাধা ভেদ করে এক পরম সত্যকেই প্রকাশ করেছিল। সেইজন্যই এই সন্তরা হিন্দু-মুসলমানে ভেদ ঘটান নি। তাঁদের মধ্যে জন্মসূত্রে কেউ ছিলেন হিন্দু কেউ বা মুসলমান। কিন্তু কোরানে পুরাণে বিবাদ বাধিয়ে তাঁরা সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন নি। এই সমন্বয়ের সাধকদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> যে সব উদার চিত্তে হিন্দুমুসলমানের বিরুদ্ধ ধারা মিলিত হতে পেরেছে, সেইসব চিত্তে সেই ধর্মসংগমে ভারতবর্ষের যথার্থ মানসতীর্থ স্থাপিত হয়েছে। সেইসব তীর্থ দেশের সীমায় বদ্ধ নয়, তা অন্তহীন কালে প্রতিষ্ঠিত। রামানন্দ, কবীর, দাদূ, রবিদাস, নানক প্রভৃতির চরিত্রে এইসব তীর্থ চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল। এঁদের মধ্যে সকল বিরোধ সকল বৈচিত্র্য একের জয়বার্তা মিলিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে।

—মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন-সম্পাদিত 'হারামণি' ১৩৪২, আশীর্বাদ

এই উদার ঐক্যবাণীর প্রতি কবির শ্রদ্ধা যে কত আন্তরিক, তিনি যে এই আদর্শে মনেপ্রাণে বিশ্বাসী তার পরিচয় পাই তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে (১৯১০)। এই একই অনুভূতিতে গোরা 'সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ' হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিল—

> আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে,

কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।

—'গোরা', অধ্যায় ৭৬

ব্যক্তিগত জীবনেও কবি যে একান্ত শ্রদ্ধায় এই আদর্শকে বরণ করে নিয়েছিলেন সে পরিচয় আছে তাঁর সারা জীবনের সাধনায়। শেষ জীবনেও তিনি এই ভারতীয় মিলনমন্ত্রের জয়বার্তা ঘোষণা করে বলেছেন—

এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলবার দিন এসেছে যে, যে আতিথ্যভ্রষ্ট আসন কৃপণঘরের রুদ্ধ কোণের জন্যে সে আসন নয়, যে আসনে সর্বজন অবাধে স্থান পেতে পারে সেই উদার আসনই চিরন্তন ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত, লক্ষ লক্ষ আচারবাদী তাকে যদি সংকুচিত করে, খণ্ড খণ্ড করে, সমস্ত পৃথিবীর কাছে স্বদেশকে ধিককৃত করে ভারত-সভ্যতার প্রতিবাদ করে তবু বলব এ কথা সত্য।

—'ভারতপথিক রামমোহন রায়'-১, ১৩৪০ পৌষ ১৪

ভারতসভ্যতার অন্তর্নিহিত এই সত্যের সার্থক বাণীবহ রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন সেই আগামী কালের স্বপ্ন দেখে গেছেন 'যে কালে ভারতের মহা ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু মুসলমান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়'। সেই সঙ্গেই মধ্যযুগের মিলনসাধক এই মন্ত্রদের প্রতি অর্পিত করে দিয়েছেন তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার স্বীকৃতি।

মধ্যযুগের সাধক

দ্বিতীয় পর্যায়

বাংলা দেশের বাইরে রামানন্দ-প্রমুখ সাধকদলের সাধনপদ্ধতি এবং বাংলায় চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব সাধনা যে যুগে বহমান ছিল, সেই সময়েই বাংলা দেশে সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছিল বাউল সম্প্রদায়ের সাধনধারা। লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত এই বাউল গান দীর্ঘদিন ধরে অন্তঃসলিলা হয়ে সমাজের অতি নিম্নস্তর দিয়ে বয়ে চলেছিল। শিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায় তার বিশেষ সন্ধান জানতেন না, তাঁদের কাছে তার কোনো মর্যাদাও ছিল না। তাই সাহিত্যে এই সাধনসংগীতগুলির স্থান হয় নি।

রবীন্দ্রনাথই প্রথম সাধারণের অবজ্ঞাত এই গানগুলিকে সংগ্রহ করে শিক্ষিত জনসমাজে প্রচার করেন। ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজনে তিনি এগুলি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে তিনি এই গানগুলির কাব্যমূল্য বিচার করে, তার ভাবের মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করে, তাকে আপন অন্তরে গ্রহণ করেন। তাঁর হৃদয়ে উপনিষদ্ ও সন্তদের বাণীর পাশেই স্থান পেয়েছে প্রায়-নিরক্ষর বাউলের বাণী। তাই রবীন্দ্রসংস্কৃতির পরিচয় নিতে গেলে বাউল গানকে উপেক্ষা করা চলে না।

এবার বাউলদের ধর্মমতের স্বরূপ ও তার বিবর্তনধারার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যাক। ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় -সম্পাদিত এবং রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা-সংবলিত 'বঙ্গবীণা' গ্রন্থে বাউলদের পরিচয় আছে এইভাবে।—

> ইহারা অহেতুক প্রেমের সাধনা করেন, ইঁহাদের মতে প্রেম নিষ্প্রয়োজন অর্থাৎ কামনাশূন্য না হইলে কামপূর্ণ প্রেমের দ্বারা মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই।
>
> বাউলেরা বলেন, সত্যকে লাভ করিতে হইবে এবং সেই সত্যস্বরূপ যিনি, তিনি মানুষের অন্তর্যামী। এই-যে মানব-দেহ তাহাই দেব-মন্দির, এবং সেই মন্দিরেই বাস করেন মানুষের 'মনের মানুষ'। এমন কি সমস্ত জীবই তাঁহার অবতার।
>
> —'বঙ্গবীণা' ১৯৩৪, কবিপরিচয় : বাউল, পৃ ৪৪৭

এই বাউলের সম্বন্ধেই ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন—

> বাউলেরা জাতিপঙ্‌ক্তি, তীর্থ-প্রতিমা, শাস্ত্রবিধি, ভেখ-আচরণ মানেন না।

মানবতত্ত্বই তাঁদের সার। মানবের মধ্যেই সর্ববিশ্বচরাচর, সেখানেই সাধনা। তাঁদের সাধনার মূল তত্ত্ব হল প্রেম।

—'বাংলার সাধনা' ১৯৬৫, বাংলার বাউল পৃ ৫৪

আর রবীন্দ্রনাথ এই বাউলদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

wandering village singers, belonging to a popular sect of Bengal, called Bauls, who have no images, temples, scriptures, or ceremonials, who declare in their songs the divinity of Man, and express for him an intense feeling of love. Coming from men who are unsophisticated, living a simple life in obscurity, it gives us a clue to the inner meaning of all religions. For it suggests that these religions are never about a God of cosmic force, but rather about the God of human personality.

— The Religion of Man ' 1931 Man's Universe.

এই বাউলেরা কবীর দাদূ নানক প্রভৃতি সন্তদের মতোই ছিলেন মুক্তিপথের সাধক। তাঁরা একদিকে খুঁজেছেন সামাজিক মুক্তি—কৃত্রিম লোকাচার ও বর্ণবৈষম্যের অনাচার আবর্জনা থেকে মুক্তি, অন্য দিকে খুঁজেছেন ধর্মের জটিলতা ও শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানের আড়ম্বর থেকে মুক্তি। তাই সন্তদের বাণীর সঙ্গে বাউল-বাণীর মিল দেখি। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাধক কবীরের একটি বাণী স্মরণ করা যাক।—

মো কো কঁহা ঢুঁড়ো বন্দে
মৈঁ তো তেরে পাসমে
না মৈঁ দেবল না মৈঁ মসজিদ
না কাবে কৈলাস মে ॥

ভগবান বলেন, আমাকে কেন বৃথা বাহিরে খুঁজিয়া মরিস? আমি তো তোর পাশেই আছি। আমি না থাকি দেবালয়ে, না থাকি মসজিদে, না থাকি কাবায়, না কৈলাসে আমার স্থান।[1]

মদন বাউলের নিম্নলিখিত গানটিতেও কবীরের বাণীর প্রতিধ্বনি শোনা যায়।—

তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে
তোমার ডাক শুনে সাঁই

১ দ্রষ্টব্য অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন-প্রণীত ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা' (১৩৫৬) মিলিত সাধনা, পৃ ২১-২২

চলতে না পাই
রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মোরশেদে ॥

কিন্তু সন্ত ও বাউলের সাধনধারার মিল থাকলেও বাউলেরা তাঁদের ধর্মসাধনা ও মতবাদ যে সন্তদের কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন তা নয়। এ সাধনা বিশেষভাবে বাংলা দেশের নিজের। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন যে বৌদ্ধ সহজযান সাধনার প্রতিফলন দেখা যায় বাংলা চর্যাগীতিতে বর্ণিত সাধনধারায় এবং—

> এই সাধনার ধারা যে মধ্যযুগে অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হইয়াছিল, বৈষ্ণব সহজিয়াদের অনুরূপ ধর্মমত তাহা প্রতিপন্ন করে। এই সহজিয়াদের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন—বাউল সম্প্রদায়। ইহা এখন একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই এবং ইহাদের অনেক গানের মধ্য দিয়া আমরা সহজিয়া মতের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই
>
> — বাংলাদেশের ইতিহাস ১ম খণ্ড ১৩৭৩, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রমেশচন্দ্র আরও দেখিয়াছেন যে চর্যগীতিকার সরহপাদের দোহাকোষে ষড়্‌দর্শনের অসারতা এবং জাতিভেদের তীব্র ও বিস্তৃত প্রতিবাদ আছে। বাউল গানে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়।—

তাই তো বাউল হৈল ভাই
এখন বেদের ভেদ বিভেদের
আর তো দাবি-দাওয়া নাই

সুতরাং বাউল মতবাদের অন্যতম প্রাচীন রূপ যে এই চর্যাগীতিগুলি, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায় থেকে উদ্‌ভূত বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকদের ধর্মমতের সঙ্গেও বাউল সম্প্রদায়ের মতবাদের সাদৃশ্য আছে। তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ হল, সহজিয়া বৈষ্ণবেরা রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের মধ্য দিয়ে পরমাত্মার উপলব্ধি করেন। কিন্তু বাউলের কাছে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গটি তত প্রত্যক্ষ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে যে পরমাত্মা আছেন, সেই মানবদেবতাই তাঁদের উপাস্য। তবে বাউলের গানে বৈষ্ণবের রাধা-কৃষ্ণ বা গৌরের প্রসঙ্গ অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। রমেশচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত The History of Bengal (vol. I, Hindu Period) 1943, গ্রন্থের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে লেখক ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি বলেছেন যে সহজযানের ধর্মমতটি সহজিয়া বৈষ্ণবদের চেয়ে বাউলদের মধ্যেই বিশেষভাবে অবিকৃত আছে। কারণ,—

...they have not allowed themselves to be influenced by Vaishnavism. Rādhā and Kṛishna have no meaning to them.

—'The History of Bengal', Religious life in Bengal

কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'লালন গীতিকা' গ্রন্থে (১৯৫৮) 'বৈষ্ণব ভাবাপন্ন গান' নামক একটি স্বতন্ত্র বিভাগে লালন ফকির-রচিত চুয়াত্তরটি গান সংকলিত আছে। অন্যান্য বাউলের গানেও রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ প্রচুর। সুতরাং বাউল গানে বৈষ্ণব ভাবধারার নিদর্শন নেই, এ কথা সত্য নয়।

বাউলের ধর্মমতের প্রসঙ্গে অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য স্মরণ করতে হয়। তিনি তাঁর 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ১৯৫৭) বলেছেন যে মধ্যযুগের উত্তরপশ্চিম-ভারতীয় সন্তদের সঙ্গে বাংলার বাউল ধর্মের দর্শন ও সাধন বিষয়ে কোনো মিল নেই। 'তবে আচারব্যবহার, প্রথা ও কতকগুলি বিশ্বাসে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল আছে'। সপ্তম অধ্যায়, পৃ ৫১৭)। এই বলে তিনি এই গৌণ মিলগুলির উল্লেখ করেছেন। যেমন, এঁরা উভয়েই গুরুবাদী, সাধারণের দুর্বোধ্য সাংকেতিক ও হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষায় এঁদের সাধনসংগীতগুলি লেখা। তা ছাড়া এঁরা ধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অনাস্থাশীল এবং মানুষের মধ্যে পরমাত্মার অনুসন্ধানী।

উপেন্দ্রনাথের এই মন্তব্য সম্পর্কে বলবার কথা হল, তিনি যে সাদৃশ্যকে গৌণ বলে নির্দেশ করেছেন, সেই জাতিধর্মনির্বিশেষ মানবতার ধর্মই কিন্তু এই ধর্মগীতিগুলির মুখ্য কথা এবং এই উদারতার জন্যই এগুলির আবেদন এমন সর্বজনীন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথও সন্ত এবং বাউলদের বাণী ও সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই ঔদার্য অন্তর্লীন দেখে মধ্যযুগের সাধকরূপে তাঁদের একত্রে স্মরণ করেছেন।

এই বাউল গানের ধারা কিন্তু মধ্যযুগেই অবসিত হয়ে যায় নি, তা আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এসেছিল। প্রাচীন ধারাটিই বরং অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ছিল। আধুনিক কালেই তার সুস্পষ্ট ও পরিণত রূপটি পাওয়া যায়। এ তথ্যও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। কবি এ সম্বন্ধে কতদূর সচেতন ছিলেন, যথাস্থানে তার আলোচনা করা যাবে। এখন বাউলের সঙ্গে কবির পরিচয়ের বিবরণটি সংক্ষেপে ও ধারাবাহিকভাবে বিবৃত করার চেষ্টা করা যাক।

বাউল গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরের যে গভীর যোগ ছিল, কবি নিজেই তাঁর পরিণত বয়সের লেখা বাউল-গান প্রবন্ধে (প্রবাসী ১৩৩৪ চৈত্র, পরে ১৩৪০ সালে কবির অনুমতিক্রমে মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন-সম্পাদিত 'হারামণি' গ্রন্থের আশীর্বাদ নামে গৃহীত) সে কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন—

> আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল-দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোনো এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে।
>
> —'সংগীতচিন্তা', পরিশিষ্ট ১ বাউল গান

বাউল গানের ভাব ও সুর কোন সময়ে যে তাঁর মনে সহজভাবে মিশে গিয়েছে। তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে বাউলদের সঙ্গে কবির পরিচয় যে দীর্ঘ দিনের তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাল্যে পৌষ উৎসব উপলক্ষে বোলপুর আশ্রমে এসে তিনি যে মেলায় সমাগত বাউলদের গানের সঙ্গে পরিচিত ও তার প্রতি আগ্রহান্বিত হবেন, সেইটিই প্রত্যাশিত। বাউল গানের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ প্রথমে ধরা দেয় ভারতী পত্রিকায় (১২৯০ বৈশাখ) প্রকাশিত বাউলের গান শীর্ষক প্রবন্ধে। সেখানে তিনি 'বাউলের গাথা' গ্রন্থের সমালোচনা করে বলেন, লোকসাহিত্যের মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতা সহজেই প্রকাশ পায়, আধুনিক শিক্ষিতব্যক্তির মার্জিত রচনায় তা অনেক সময়েই পাওয়া যায় না। তাই—

> আমাদের ভাব, আমাদের ভাষা আমরা যদি আয়ত্ত করিতে চাই, তবে বাঙ্গালী যেখানে হৃদয়ের কথা বলিয়াছে, সেইখানে সন্ধান করিতে হয়।

তারই পন্থা নির্দেশ করে দিয়ে তিনি বলেছেন—

> বাঙ্গালা ভাব ও ভাবের ভাষা যতই সংগ্রহ করা যাইবে ততই যে আমাদের সাহিত্যের উপকার হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই সঙ্গীত-সঙ্গ্রহের প্রকাশক বঙ্গসাহিত্যানুরাগী সকলেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।
>
> —'সংগীতচিন্তা', বাউলের গান : প্রথম খণ্ড ১২৯০ বৈশাখ

সুতরাং এক দিকে কবি ভাষা ও সুরের 'অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস' বাউল গানকে কবিত্বের মাপকাঠিতে যাচাই করে তার চিরন্তন মূল্য স্বীকার করেছেন, অন্য দিকে এই এই গানগুলির ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধেও সচেতন হয়েছেন। তাই পাঠক-সাধারণের কাছে তাঁর আবেদন—

> গ্রাম্য গাথা ও প্রচলিত গীতসমূহ···সকলে মিলিয়া যদি সংগ্রহ করেন, তবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বিস্তর উপকার হয়।
>
> —বাউলের গান : দ্বিতীয় খণ্ড ১২৯১ আশ্বিন

সেই সঙ্গে তিনি তাঁর নিজের সংগৃহীত তিনটি গানও এই প্রবন্ধের শেষে যোগ করে দেন।

এই পর্যায়ে বাউল গানের কবিত্ব ও তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকলেও তার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য অনুধাবনে কবির বিশেষ ঔৎসুক্য দেখা যায় না। পূর্বোক্ত বাউলের গান প্রবন্ধে তিনি যেভাবে এগুলির আলোচনা করেছেন তার থেকেই এ মন্তব্য সমর্থিত হয়। তবে সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের জটিলতার মধ্যে না গিয়েও তিনি গানগুলির সহজ অথচ ব্যঞ্জনাবহ প্রেমসাধনাটি সঠিকভাবেই অনুধাবন করে তাকে অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করেছিলেন। তাই তিনি আত্মত্যাগী বাউল সাধকের বাণী উদ্ধৃত করে দেন—

> সে প্রেম করতে গেলে মরতে হয়
> আত্মসুখীর মিছে সে প্রেমের আশয়।

কিংবা —

> যে যে আমি মরেছে, তার সাধন হয়েছে।
> কোটি জন্মের পুণ্যের ফল তার উদয় হয়েছে।

এই বাণীর ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'আত্মহত্যা না করিলে প্রেম করা হয় না'। অহং-এর বিনাশেই প্রকৃত প্রেম পাওয়া সম্ভব। এই ভাবটি কবির যে বিশেষ প্রিয় তা তাঁর শেষ জীবনের একটি প্রবন্ধ থেকে বোঝা যায়। সেখানে তিনি বলেছেন যে একবার এক অখ্যাত গ্রামে তিনি যাত্রাগান শুনতে গিয়েছিলেন।—

> এই পালার একটি বিশেষ অংশ আজও আমার মনে আছে। কথাটা এই, যাত্রী প্রবেশ করতে চলেছে বৃন্দাবনে, পাহারাওয়ালা আটক করলে তার পথ, বললে, 'তুমি চোর, ভিতরে তোমাকে যেতে দেওয়া হবে না'। যাত্রী বললে, 'সে কী কথা, কোথায় দেখলে আমার চোরাই মাল'? দ্বারী বললে, 'ঐ-যে তোমার কাপড়ের নিচে লুকোনো, ঐ-যে তোমার আপনি, ওটা বোলো আনা আমার রাজার পাওনা,

ফাঁকি দিয়ে রেখেছ নিজেরই জিম্মায়'। এই বলতে বলতে মহা ঢাক ঢোল বেজে উঠল, চলল পরচুলো ঝাঁকানি দিয়ে ঘন ঘন নাচ। যেন ঐখানটা পাঠের প্রধান অংশ, অধ্যাপকমশায় পেন্‌সিলের মোটা দাগ ডবল করে টেনে দিলেন।

—'শিক্ষা', শিক্ষার বিকিরণ ১৯৩৩ ফেব্রুআরি

এর পূর্বে Indian Philosophical Congress-এ প্রদত্ত তাঁর Philosophy of our People ভাষণে (১৯২৫ ডিসেম্বর ১৮) তাঁকে এই প্রসঙ্গটি স্মরণ করতে দেখা গিয়েছিল। পরে বিদেশে হিবার্ট বক্তৃতা দিতে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ হুবহু এই কাহিনীটিই ভাষণে ('The Religion of Man' 1931, Spiritual Freedom[১]) ব্যক্ত করেন। এর থেকেও কবিচিত্তে এই বিষয়টির গুরুত্বের পরিমাণ বোঝা যায়। তবে এই বাউল গানগুলির যে ভাবটি তাঁকে সর্বাধিক মুগ্ধ করেছিল, তা হল তার বিশ্বপ্রেমের বাণী।—

Universal Love প্রভৃতি বড় বড় কথা বিদেশীদের মুখ হইতে বড়ই ভাল শুনায়, কিন্তু ভিখারীরা আমাদের দ্বারে দ্বারে সেই কথা গাহিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের কানে পৌঁছায় না কেন ?—

আয় রে আয়, জগাই মাধাই আয়।
হরি সংকীর্তনে নাচবি যদি আয়।
ওরে মার খেয়েছি, নাহয় আরো খাব—
ওরে তবু হরির নামটি দিব আয়।
ওরে মেরেছে কলসীর কানা,
তাই বলে কি প্রেম দিব না— আয়!

—'সংগীতচিন্তা', বাউলের গান ১২৯১ বৈশাখ

গানটির সবজনীন আবেদন তাঁর মনকেও যে বিশেষভাবেই নাড়া দিয়েছিল, তা বোঝা যায় বালক পত্রিকায় (১২৯২) প্রকাশিত তাঁর এক পত্র-প্রবন্ধে। সেখানে নবীনকিশোর প্রবীণ ষষ্ঠীচরণকে পূর্বোক্ত গানটি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করে বলেছে --

আপন-আপন বাঁশবাগানের পার্শ্বস্থ ভদ্রাসনবাটীর মনসা সিজের বেড়া ডিঙাইয়া পৃথিবীর মাঝখানে আসিতে কে আহ্বান করিল এবং সে আহ্বানে সকলে সাড়া দিল কী করিয়া ? একদিন তো বাংলাদেশে ইহাও সম্ভব হইয়াছিল।

—'চিঠিপত্র,' অধ্যায় ৬

বাউল সম্প্রদায়ের যে সর্বব্যাপী আহ্বানের গান দেশের জনসাধারণকে এমনভাবে

১ এই প্রবন্ধটি Philosophy of our People ভাষণেরই অংশবিশেষ মাত্র

জাগিয়ে তুলেছিল, সেই দিকে কবির দৃষ্টি বিশেষভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর নিজের রচিত বাউল গানগুলিই তার প্রমাণ। ১৩১২ সালের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা ভাণ্ডার পত্রিকায় রবীন্দ্ররচিত যে স্বদেশী গানগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে ছ'টি গানের নাম ছিল 'বাউল'। পরে তখনকার সমস্ত স্বদেশী গানগুলিই একত্রে 'বাউল' গ্রন্থে (১৩১২) প্রকাশিত হয়। অবশ্য 'বাউল' গ্রন্থের সব গানই বাউল সুরে বাঁধা নয়। তবে 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ', 'এবার তোর মরা গাঙে' বা 'আমার সোনার বাঙ্‌লা' প্রভৃতি গানগুলি বাউল সুরেই রচিত। কোন্ কোন্ মূল বাউল গানের সুরে কবি উক্ত গানগুলি রচনা করেছিলেন, শান্তিদেব ঘোষ তার 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থের (১৩৫৬) গান রচনার বিভিন্ন পদ্ধতি অধ্যায়ে তা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, 'হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই' ইত্যাদি গানের সুরে 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ' ইত্যাদি গানটি রচিত।

'মন মাঝি, সামাল সামাল, ডুবল তরী,
ভব নদীর তুফান ভারী'

ইত্যাদি গানটির সুর ভেঙে 'এবার তোর মরা গাঙে' গানের সুর দেন।[১] আর 'আমার সোনার বাঙ্‌লা' গানটি তিনি রচনা করেন গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে' গানের সঙ্গে মিলিয়ে। 'খেয়া' গ্রন্থের 'আমার নাই বা হল পারে যাওয়া' গানটিও (১৩১২ ভাদ্র ২৭) বাউল সুরেই রচিত। সুতরাং স্বদেশী গানগুলিতে দেশী সুর বিশেষতঃ বাউল সুর দেওয়ার পশ্চাতে দেশপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে বাউল গানের প্রতি কবির বিশেষ অনুরাগটিও ধরা দিয়েছে।

এর পরে ১৩১৪ সালের প্রবাসীতে প্রকাশিত 'গোরা' উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদে বিখ্যাত ফকির লালন শাহের একটি গান উদ্ধৃত দেখি।—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

লালনের গানের সঙ্গে কবির পরিচয় দীর্ঘ দিনের। শিলাইদহ রবীন্দ্রনাথের কর্মকেন্দ্র, আর কাছে কুষ্ঠিয়া বিশিষ্ট বাউল লালন ফকিরের সাধনকেন্দ্র। কাজেই লালনের কিছু কিছু গান তাঁর কানে আসে এবং সম্ভবতঃ লালনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ও ঘটে। কারণ লালন ১৭৭৪ সালে জন্মগ্রহণ করলেও মারা যান ১৮৯০ সালে। আর কবি যে ১৮৮৩ সাল থেকেই বাউল গান সম্বন্ধে বিশেষ উৎসুক হয়েছিলেন পূর্বেই তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সুতরাং লালনের সঙ্গে যে

১ এই 'গান দুটি চুঁচুড়ার নৌকার মাঝিদের কাছ থেকে স্বর্গীয়া সরলা দেবী সংগ্রহ করেছিলেন'।

তাঁর পরিচয় হয়েছিল, সে কথা মনে করা অস্বাভাবিক নয়। এ ছাড়া তিনি লালন্ শাহের গান সংগ্রহ করেন এবং প্রবাসীতে (১৩২২ সালের আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যা) তাঁর কুড়িটি গান প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ লালনের মোট ২৯৭টি গান সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁদের পরিবারেও সরলা দেবী লালনের কতকগুলি গান ভারতী পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন ('বঙ্গবীণা' ১৯৩৪, কবি-পরিচয়. লালন, পৃ ৪৯৫)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'লালন গীতিকা' গ্রন্থের (১৯৫৮) ভূমিকা (পৃ।৶৶॥০) থেকে জানা যায় যে মতিলাল দাশ লালনের মোট ৩৭১টি গান সংগ্রহ করেন। তবে রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের মধ্যে মতিলাল দাশের সংগ্রহ ব্যতীত ৮৮টি নূতন গান[১] পাওয়া গেছে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে 'গোরা' উপন্যাসের উল্লিখিত গানটি মতিলাল বা রবীন্দ্রনাথ কারো সংগ্রহেই পাওয়া যায় না। গানটি উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে (১৯৫৭) ৮৭ সংখ্যক গান রূপে সংকলিত হয়েছে। এই গানটি কবির যে বিশেষ প্রিয় ছিল তাঁর রচনায় এর পৌনঃপুনিক ব্যবহার থেকে তা বোঝা যায়। প্রবাসীতে (১৩১৯ বৈশাখ) প্রকাশিত তাঁর গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনাটিতে দেখি ভাবের সঙ্গে সুরের আনবচন। সম্বন্ধ। প্রসঙ্গে তিনি এই গানটিই স্মরণ করেছেন।—

একদিন বোলপুরের রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া যাইতেছিল—

> খাঁচার মাঝে অচিন পাখি কমনে আসে যায়,
> ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

দেখিলাম বাউলের গানও ঠিক ঐ একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বদ্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়, মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায় কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখির নিঃশব্দ যাওয়া আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে।

— জীবনস্মৃতি, গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ

কবির পরবর্তী কালের বহু রচনাতেই লালন শাহের একাধিক গান উদ্ধৃত হয়েছে এবং এই বাউল সাধকের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধাও প্রকাশ পেয়েছে। যথাস্থানে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

রবীন্দ্রনাথের লোক সংগীত সংগ্রহের উদযোগ শুধু লালন ফকিরের গান সংগ্রহেই

১ লালন-গীতিকা'য় রবীন্দ্র সংগৃহীত একটি গান দুবার ছাপা হওয়ায় ভ্রান্তিবশতঃ সেখানে রবীন্দ্রনাথের নূতন গান রূপে ৮৯টি গান উল্লিখিত হয়েছে।

থেমে থাকে নি। ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে 'হারামণি' নামে যে বিভাগটি লোকগীতি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয় তাতে রবীন্দ্র-সংগৃহীত গগন হরকরার এই গানটি প্রকাশিত হয়।—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।

গগন হরকরার বেশ কয়েকটি গান কবি সংগ্রহ করেছিলেন। তবে উল্লিখিত গানটি যে প্রধানতঃ কবিকে মুগ্ধ করেছিল তাঁর রচনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গগন হরকরার পরিচয় দিয়ে কবি লেখেন—

> The name of the poet who wrote the song was Gagan. He was almost illiterate ;···He was a village postman, earning about ten shillings a month, and he died before he had completed his teens The sentiment, to which he gave such intensity of expression, is common to most of the songs of his sect And it is a sect, almost exclusively confined to that lower floor of society, where the light of modern education hardly finds an entrance.

—'Creative Unity' 1959, An Indian Folk Religion, p 79.

এতক্ষণ পর্যন্ত দেখা গেছে যে রবীন্দ্রনাথ বাউলের গান সংগ্রহ করেছেন, প্রয়োজনমতো আপন রচনায় তা উদ্ধৃত করেছেন এবং স্বয়ং বাউল সুরে গান রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাউল সম্প্রদায়ের ভাবধারার প্রতি তাঁর আকর্ষণ যে গভীর হয়ে উঠেছিল পরবর্তী কবিকৃতিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য বাউলের সহজ সরল জীবনাদর্শের ভাবমূর্তি রূপে 'ধনঞ্জয় বৈরাগী'র চরিত্রটি সৃষ্টি করার পূর্বেই কবি বাউল ভাবের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯০৯ সালে 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে তার প্রথম আবির্ভাব। 'প্রায়শ্চিত্ত'-এর নবরূপ 'পরিত্রাণ' (১৯২৯) নাটকেও ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রটি অপরিবর্তিত দেখি। ১৯২২ সালে 'মুক্তধারা' নাটকেও[১] ধনঞ্জয় বৈরাগীকে পাওয়া যায়। তবে 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'মুক্তধারা' নাটক দুটির ধনঞ্জয় বৈরাগী পুরোপুরি এক

১ এ সম্বন্ধে কবি নিজেই তাঁর 'মুক্তধারা' নাটকে পাদটীকায় লিখেছিলেন 'এই নাটকের পাত্র ধনঞ্জয় ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা অংশ 'প্রায়শ্চিত্ত' নামক আমার একটি নাটক হইতে লওয়া। সেই নাটক এখন হইতে পনেরো বছরেরও পূর্বে লিখিত'।

নয়। উভয়ের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্যও যথেষ্ট। যাই হক, নাটক দুটির রচনাকালের ব্যবধান থেকেও বোঝা যায়, ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভাবটি কত দীর্ঘদিন তাঁর মনকে অধিকার করে ছিল।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয় যে ১৩১৭ সালে (আশ্বিন) শান্তিনিকেতনে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের যে অভিনয় হয় কবি স্বয়ং তাতে ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। আবার তাঁর 'ফাল্গুনী' নাটকে (১৩৩১) যে অন্ধ বাউলের চরিত্রটি আছে, ১৩৩৪ সালে তাঁর শেষ 'ফাল্গুনী' অভিনয়ে তিনি সেই চরিত্রেই রূপ দান করেন। কবির এই অভিনয় সম্বন্ধে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—

> রবীন্দ্রনাথ নিজে 'প্রায়শ্চিত্তে' ধনঞ্জয় বৈরাগীর ও 'ফাল্গুনী'তে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় নৃত্য করেন, সে-রীতি তাঁহার নিজস্ব।
>
> — 'রবীন্দ্রজীবনী' ৩য় খণ্ড ১৩৫৯, পৃ ২২

বলা বাহুল্য, এ বাউলের সঙ্গে সাধারণ বাউল সম্প্রদায়ের কোনো যোগ নেই। এঁরা বিশেষভাবে 'রবি বাউলে'র আত্মীয়। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

১৯২৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর (১৩৩২) কলকাতায় The Indian Philosophical Congress-এর প্রথম অধিবেশনে সভাপতিরূপে কবি একটি ভাষণ দেন। তার বিষয় ছিল Philosophy of our People। এই ভাষণে কবি কোনো শাস্ত্রসম্মত ধর্মমতের কথা না বলে বাংলার বাউলের দর্শন ব্যাখ্যা করেন। কেননা দেশের বৃহৎ জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে এরাই সহজ সাধনার বাণী বয়ে নিয়ে যায়। সুধীজন-অধ্যুষিত এই দর্শন-মহাসভাতে তিনি বাউলের বাণী ও দর্শনকে যেভাবে উপস্থাপিত করেন, তার থেকেও বোঝা যায়, বাউল গানকে তিনি কতদূর গুরুত্ব দিতেন। এই ভাষণেই তিনি প্রথম মদন বাউলের—'ওরে নিঠুর গরজী' ইত্যাদি গানটি উদ্ধৃত করেন।

১৯৩০ সালে অক্সফোর্ডে হিবার্ট লেকচার দিতে গিয়েও দেখি তিনি অসংকোচে বিশ্ববাসীর সামনে বাউলের বাণীকে তুলে ধরেছেন। আবার এই বক্তৃতাটি যখন 'The Religion of Man' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তখন বিদেশী পাঠকের কাছে বাউলের পরিচয়কে বিশদ করে বোঝাবার জন্যই তিনি এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে (Appendix I) ক্ষিতিমোহন সেন-লিখিত The Baul Singers of Bengal নামক প্রবন্ধটি সংকলন করে দেন। কলকাতায় প্রদত্ত তাঁর কমলা বক্তৃতাও ('মানুষের ধর্ম', ১৯৩৩) বাউলদের কথাতে পূর্ণ। বাউল গানকে এতদূর মর্যাদা

দেওয়ার কারণ হল, কবি এই গানগুলির মধ্যে ভারত ইতিহাসের মৌল অভিপ্রায়টির সার্থক প্রকাশ দেখেছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

> আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত, প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল-সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি,—এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই।…এই মিলনে গান জেগেছে,…এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাধে নি।
>
> —'সংগীতচিন্তা', বাউল গান ১৩৩৪ চৈত্র

বাউলের এই মিলন সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তার কবিত্বও যে কবিকে শেষ জীবন পর্যন্ত মুগ্ধ করেছিল নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লেখা একটি পত্রে (১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ ৩) তার প্রমাণ দেখি। উক্ত পত্রে তিনি লিখেছেন—

> বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি। নিঃসংশয়ে জানি বাউল গানে একটি অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে, যা চিরকেলে আধুনিক।…ওর মধ্যে যে একটি আশ্চর্য কবিত্ব আছে, ইতিপূর্বে তার এমন দুর্যোগ ঘটে নি, যাতে একেবারে তার সুর কেটে যায়, তাল কেটে যায়।
>
> —'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ' ১৯৫৮, পরিশিষ্ট : রবীন্দ্রপত্রমালা, পত্র-৪

এখানে বাউল গানের প্রতি কবির আজীবন-পোষিত শ্রদ্ধাই নূতন করে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সুতরাং বাউল গানের প্রতি কবির আকর্ষণ কখনও শিথিল হয় নি, বরং জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। মধ্যযুগের সন্তদের বাণীর মতোই বাউল গানের সঙ্গে কবির পরিচয় যে মূলতঃ ক্ষিতিমোহন সেনের প্রবর্তনায় এ কথা মনে করার কারণ নেই। কেননা বাল্যকাল থেকেই তিনি বাউল গানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং ১৩১৫ সালে ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে যোগ দেবার পূর্ব থেকেই রবীন্দ্রনাথ লালন-প্রমুখ বাউলের গান সংগ্রহ করেন ও নিজে বাউল সুরে গান রচনা করেন। তবে ক্ষিতিমোহনের কাছ থেকে কবি যে বহু নূতন বাউল গানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

৩

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাউল গানের এই দীর্ঘ দিনের যোগাযোগ এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে তার গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেখে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে বাউল গানের প্রতি কবির এত

আকর্ষণের কারণ কি।

পূর্বের বৈষ্ণব পদাবলী অধ্যায়ে দেখা গেছে, অনুভূতির গভীরতা ও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য, কবিকে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর সাহিত্যে তার প্রতিফলনও দেখা গেছে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব বা তার ভক্তি-বিহ্বল উচ্ছ্বাস তাঁর মনে স্থান পায় নি। মধ্যযুগের সন্তদের সম্বন্ধে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনোভাব এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এঁদের ধর্মতত্ত্বটিই কবিকে মুগ্ধ করেছিল বেশি। তাঁদের উদার মানবধর্ম ও সরল সাধনপন্থাও কবির চিত্তে যে কত গভীর ছাপ ফেলেছিল, তাঁর সাহিত্য থেকে তা পূর্বেই দেখানো হয়েছে। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ এঁদের কবিত্বের প্রশংসা করলেও তিনি তাঁদের কাব্যের দ্বারা যে বিশেষ প্রভাবিত হন নি, সেটিও তাঁর রচনা থেকে বোঝা যায়। এমন কি এই সন্তদের বাণী তাঁর রচনায় যে বিশেষ ব্যবহৃত হয় নি, পরবর্তী উপাদান-সংগ্রহ অংশটি দেখলে তা বোঝা যাবে। কিন্তু বাউলদের বাণী ও সাধনা দুই-ই যে তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, তাঁর সাহিত্যে সে পরিচয় স্পষ্ট। কবি দেখেছিলেন সন্তদের মতোই বাউলদের সাধনা সহজ মুক্তিপথের সাধনা। তাদের স্বতঃউৎসারিত গান তাই বন্ধনমুক্ত প্রাণের গান। সে গান প্রথাগত ভাষা-ছন্দ অলংকারের বন্ধন থেকেও মুক্ত। চণ্ডীদাস-প্রমুখ বৈষ্ণব কবির পদাবলীর মতোই তা সহজ কবিত্বের রসে ভরা। অবশ্য এঁদের ধর্মতত্ত্বে নানা রহস্যময় ক্রিয়াকলাপ আছে এবং তার ভাষাটিও অনেক সময়ে ঠিক সরল সুখবহ না, বরং কখনও কখনও তা নিগূঢ় সংকেতবাণী। যথা —

> এঁদের গানের মধ্যে দেহতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, প্রেমভক্তিভজন প্রণালী প্রভৃতির কথাই অধিক। কিন্তু অনেক গানে উদারের সহজ অনুভূতি ও সহজ সত্য এবং শাশ্বত মানবধর্মের অনুপম উপলব্ধির কথা অসাধারণ উচ্চ কবিত্বময় ভাষায় প্রকাশ পাইতে দেখা যায়।

—'বঙ্গবাণী' ১৩৩৪ কবি পরিচয়: বাউল, পৃ ৪৫০

সম্ভবত তাই যে বাউল গানগুলির মধ্যে তাত্ত্বিক জটিলতা অধিক, সেগুলিকে বাদ দিয়ে সহজ ভাবের কবিত্বময় গানগুলি নির্বাচন করে নিয়েছেন এবং তার রস উপভোগ করেছেন। সুতরাং ধর্ম দর্শন ও সাহিত্যরসের বিচারে বৈষ্ণব বা সন্তদের তুলনায় বাউলের গান তাঁকে মুগ্ধ করেছিল বেশি। কবি তাঁর An Indian Folk Religion নামক প্রবন্ধে এই তিন সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে লিখেছেন যে তারা—'carries the same message: God's love finding its finality in man's love.' তবে এই

ভাবটি সন্তদের বাণীতে রূপলাভ করলেও প্রকাশবৈশিষ্ট্যে তা কবিকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। বৈষ্ণব পদেও—

> This idea has been expressed in rich elaboration of symbols verging upon realism. But for these Bauls this idea is direct and simple, full of the dignified beauty of truth, which shuns all tinsels of ornament.
>
> —'Creative Unity' 1930, An Indian Folk Religion, p 81

প্রকৃত পক্ষে সহজ ভাবের এই বাউল গানের ভাষা সম্বন্ধে বলা চলে—

> পণ্ডিতে দেয় নাই মেজে—
> প্রাণের ভাষাই ওর খনি।
>
> —'সানাই', নামকরণ ১৯৪০ মে

বাউলদের ব্যবহৃত চলতি ভাষার বিশেষ উপযোগিতাও কবির দৃষ্টি এড়ায় নি। লালন ফকিরের একটি গানে চলতি ভাষার এই শক্তি দেখিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন—

> যে-বাংলা বাঙালির দিনরাত্রির ভাষা তার একটি মস্ত গুণ এ-ভাষা প্রাণবান্। এইজন্যে সংস্কৃত বল, পারসি বল, ইংরেজি বল সব শব্দকেই প্রাণের প্রয়োজনে আত্মসাৎ করতে পারে…। বাবা হেডপণ্ডিত মশায়ের কাছে পড়ে নি তাঁদের একটা লেখা তুলে দিই।
>
> চক্ষু আঁধার দিলের ধোঁকায়
> কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
> কী রঙ্গ সাঁই দেখছে সদাই
> বসে নিগম ঠাঁই।…
>
> প্রাকৃত-বাংলাকে গুরুচণ্ডালি দোষ স্পর্শই করে না। সাধু ছাঁদের ভাষাতেই শব্দের মিশোল সয় না।
>
> —'ছন্দ', ছন্দের প্রকৃতি ১৩৪১ বৈশাখ

বাউল গানের ভাষার বিচিত্র শব্দগ্রহণক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে এ ভাষার রহস্যময়তাও কবির চিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্মরণ করা যাক—

> খাঁচার মধ্যে অচিন্ পাখি কমনে আসে যায়।
> ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

গানটির ভাবের মতোই রহস্য অথচ কবিত্বে ভরা এই ভাষা যে কবিকে মুগ্ধ

করেছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ ছাড়া এই প্রবন্ধেরই পূর্বোদ্ধৃত একাধিক গানে এই জাতীয় ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভাষার মধ্যে এই জাতীয় রহস্যময়তা সঞ্চার করার জন্য অলংকারের প্রয়োজন। বাউল গানে তাও অপ্রতুল নয়। বাউলদের ব্যবহৃত অলংকারগুলির বৈশিষ্ট্যও কবিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাই সাহিত্যে উপমার উপযোগিতা বোঝাতে গিয়ে কবি বাউল গানকে স্মরণ করে বলেছেন—

> যেমন আছে শব্দের বাছাই তেমনি আছে ভাবপ্রকাশের বাছাইয়ের কাজ। বাউল বলতে চেয়েছে, চার দিকে অচিন্তনীয় অপরিসীম রহস্য, তারই মধ্যে চলেছে জীবনযাত্রা। সে বললে—
>
> পরাণ আমার সোতের দীয়া
> (আমায় ভাসাইলা কোন্ ঘাটে)।
> আগে আন্ধার, পাছে আন্ধার, আন্ধার নিসুইৎ-ঢালা।
> আন্ধারমাঝে কেবল বাজে লহরবেদি মালা।
> তার শব্দে কেবল চলে নিকুইৎ রাতের পার,
> সাথের সাথি চলে বাতি, নাই গো কূলকিনারা।
>
> নানা রহস্যে একলা-জীবনের গতি, যেন চার দিকের নিস্তব্ধ অন্ধকারে স্রোতে-ভাসানো প্রদীপের মতো—এমন সহজ উপমা মিলবে কোথায়। একটা শব্দ-বাছাই লক্ষ্য করা যাক: লহরবেদি মালা। ঊর্মি নয়, তরঙ্গ নয়, ঢেউ নয়, শব্দ জাগাচ্ছে জলে ছোটো ছোটো চাঞ্চল্য, ইংরেজিতে যাকে বলে ripples।
>
> —'বাংলাভাষা-পরিচয়' ১৯৩৮, অধ্যায় ১১

কবির এই মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যায়, গানটির প্রকাশভঙ্গি তাঁকে কতদূর মুগ্ধ করেছিল। যাই হক, সাধারণতঃ বাউল কবিরা অধিকাংশ স্থলেই প্রথাগত অলংকারের পরিবর্তে লোকজীবনসম্ভব সহজ উপমা ব্যবহার করেছেন। পূর্বের উদ্ধৃতিগুলির থেকেও তার প্রমাণ মিলবে।

ছন্দের দিক থেকেও বাউল কবিরা প্রথাগত ছন্দোবন্ধনের সীমা অতিক্রম করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ তা বিশেষভাবেই লক্ষ করেন এবং বাউল পদের ছন্দকে 'চলতি ভাষার ছন্দ'-এর আদর্শ হিসাবে দেখে মন্তব্য করেন—

> প্রাকৃত-বাংলার দুয়োরানীকে যারা সুয়োরানীর অপ্রতিহতপ্রভাবে সাহিত্যের গোয়ালঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে সেই 'অশিক্ষিত' লাঞ্ছনাধারীর দল যথার্থ বাংলাভাষার সম্পদ নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায় না। তাদের

প্রাণের গভীর কথা তাদের প্রাণের সহজ ভাষায় উদ্‌ধৃত করে দিই।—

আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
সে কি আর জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।
কাছে রয়, ডাকে তারে
উচ্চস্বরে
কোন পাগেলা,
ওরে যে যা বোঝে তাই সে বুঝে
থাকে ভোলা।

এই ছন্দের ভঙ্গি একঘেয়ে নয়। ছোটো বড়ো নানাভাগে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধু-প্রসাধনে মেজে-ঘষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো। এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব এই আমার বিশ্বাস।

'ছন্দ', ছন্দের প্রকৃতি ১৩৪১ বৈশাখ

কবির নিজের কবিতায় এই চলতি ছন্দের অজস্র ব্যবহার বাউল-ব্যবহৃত এই ছন্দো-গুলির প্রতি তাঁর আন্তরিক আকর্ষণের পরিচয় বহন করে। তাই এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

আবার বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা-ছন্দ অলংকারের সঙ্গে সঙ্গে তার বিশেষ কীর্তন গানের সুর যেমন কবির চিত্তকে বিশেষভাবে অধিকার করেছিল, বাউল সুর সম্বন্ধেও সেই কথা। এই বাউলগীতির সুরের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন—

একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের সংগীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে অথচ সেই সুরগুলা স্বাধীন। অনেক কীর্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁষিয়া গিয়াও তাহাকে স্পর্শ করে না। বাউলের সুর যে একঘরে, রাগরাগিণী যতই চোখ রাঙাক সে কিসের কেয়ার করে। এই সুরগুলিকে কোনো রাগ-কৌলীন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে, তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না—স্পষ্ট বোঝা যায় এ আমাদের দেশেরই সুর, বিলিতি সুর নয়।

—'সংগীতচিন্তা', সংগীতের মুক্তি ১৩২৪ ভাদ্র

১৩৩১ সালের এক ভাষণেও কবি বাউল গানের প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে এ গান

কীর্তনের মতোই একসময়ে 'বাংলার হৃদয়ের অন্তঃপুরে' প্রবেশ করে 'এ দেশকে প্লাবিত করে দিয়েছিল' ('সংগীতচিন্তা', অভিভাষণ ২ : ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ)। এ ছাড়া কবি তাঁর অতি প্রিয় গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে' গানটি বিশ্লেষণ করে এক সময়ে বলেছিলেন—

...the best part of a song is missed when the tune is absent ; for thereby its movement and its colour are lost.

—'Creative Unity' (1759), An Indian Folk Religion

এই উক্তির কিছুদিন পরে উক্ত গানটির সম্বন্ধেই তিনি অন্যত্র বলেছেন—

কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

—'সংগীতচিন্তা', বাউল-গান : ১৩০৬ চৈত্র

এই উদ্ধৃতিগুলি থেকে বোঝা যায় বাউলগীতির সুরের সৌন্দর্যও এই গানগুলির প্রতি কবির আকর্ষণের অন্যতম কারণ।

বাউল পদাবলীর রূপ ও রসের মাধুর্য কবিকে যেমন মুগ্ধ করেছিল, তার ভাবধারাও তাঁকে তেমনই অনুপ্রাণিত করেছিল। এবার রবীন্দ্রমনে এই বাউল ভাবের অধিকার কতদূর তার পরিচয় নেওয়া যাক।

৪

জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হলে কবি একদা রঙ্গচ্ছলে বলেছিলেন—

বিদেশমুখো মন যে আমার কোন্ বাউলের চেলা,
গ্রাম-ছাড়ানো পথের বাঁশি সর্বদা দেয় ঠেলা।

—'ছড়ার ছবি', প্রবাসী ১৩৪৪ আষাঢ়

এখানে নিজেকে ঘর-ছাড়া 'বাউলের চেলা' বলে অভিহিত করলেও মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের তথাকথিত বাউল সম্প্রদায়ের কেউ নন। শেষ জীবনে নন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লেখা একটি পত্রে (১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ ৩) দেখি কবি লিখেছেন—

আমার অনেক গান বাউলের ছাঁচের কিন্তু জাল করতে চেষ্টাও করি নি। সেগুলো স্পষ্টতঃ রবীন্দ্র-বাউলের রচনা।

—'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ' ১৯৫৮, পরিশিষ্ট : রবীন্দ্রপত্রমালা; পত্র-৪

অর্থাৎ কবি তাঁর অনেক গানে বাউলের কাছ থেকে প্রেরণা পেলেও তার আদর্শ ও তার লক্ষ্যটি তাঁর নিজের। তাতে রবীন্দ্রমনের ছাপ স্পষ্ট।

কবি যে এমন স্পষ্ট করে 'রবীন্দ্র-বাউলে'র স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তার কারণ হল, কবি-সম্পাদিত 'বাংলাকাব্য-পরিচয়' নামক গ্রন্থে (১৩৪৫) ধৃত বাউল গানগুলি রবীন্দ্রনাথেরই রচনা বলে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তারই উত্তরে কবি পূর্বোক্ত পত্রে লেখেন—

> নিঃসংশয়ে জানি বাউল গানে একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে, যা চিরকেলে আধুনিক। হাল আমলের কলেজে পাস করা সেটা জাল করতে পারে না, সে তাদের ক্ষমতার অতীত। ইংরেজি পড়া বাউলের গান আছে, দেখেছি তা, তা অস্পৃশ্য। কাব্যপরিচয়ে যে বাউল গানগুলো আছে, সে আমার মাথায় কিম্বা কলমে আসত না, লোক ঠকাতে গেলে নিশ্চিত ধরা পড়তুম।
>
> কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ' ১৩৫৮, পরিশিষ্ট রবীন্দ্রপত্রমালা, পত্র-৪

এই পত্রের কয়েক মাস পরেই কবি একটি প্রবন্ধে দেখালেন যে কাব্যপরিচয়ে উদ্ধৃত হয়। কৈবর্তের গানটি খাঁটি বাউল গান না। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন—

> এগুলো যে সমস্তই প্রাচীন তা নয়। লক্ষণ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, এদের অনেক আছে যারা আমাদের সমান বয়সেরই আধুনিক, এমন কি ছন্দে মিলে ভাষায় আমাদেরই অনুকরণ সন্দেহ করি। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই—
>
> [illegible] নদীর পাকে
> ডাক যে শোনা যায়।
> জল না পাড়ি, থামতে নারি,
> [illegible] ধারা নয়।
> ধারার চলে তরী চলে,
> ভাবের চোটে মন যে টলে,
> টানাটানি ঘুচাও জগার
> হল বিষম দায়।
>
> এর মিল, এর মাজাঘষা ছাঁদ ও শব্দবিন্যাস আধুনিক।
>
> —'বাংলাভাষা-পরিচয়', অধ্যায় ১১, ১৩৪৫ কার্তিক

উক্ত প্রবন্ধেই 'পরাণ আমার স্রোতের দীয়া' ইত্যাদি পূর্বোদ্ধৃত গানটির সম্বন্ধে তিনি পুনরায় মন্তব্য করেছেন—

> অন্ধকারের তলায় তলায় রাত্রির ধারা চলেছে, এ ভাবটা মনে হয় যেন আধুনিক কবির ছোঁয়াচ-লাগা। রাত্রি স্তব্ধ হয়ে আছে, এইটেই সাধারণত মুখে আসে।

তার প্রহরগুলি নিঃশব্দ নির্লক্ষ্য স্রোতের মতো বয়ে চলেছে, এ উপমাটায় হালের টাঁকশালের ছাপ লেগেছে বলেই মনে হয়।

—'বাংলাভাষা-পরিচয়', অধ্যায় ১১, ১৩৪৫ কার্তিক

কবির আশ্চর্য স্বচ্ছ দৃষ্টিতে এই গান দুটির কৃত্রিমতা ধরা পড়েছিল। এমন কি তিনি বুঝেছিলেন যে এই গান দুটি রবীন্দ্রপ্রভাব বর্জিত নয়। যাই হক, কবির সম্বন্ধে এই 'নকল বাউলে'র অভিযোগ ওঠবার আগেই কবি নিজে এই বাউল গানের কৃত্রিমতা সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় দেন। ১৩৩৪ সালেই তিনি লেখেন—

অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অমূল্যতা চলে গেছে, তা চলতি হাটের শস্তা দামের জিনিস হয়ে পথে পথে বিকোচ্ছে। তার উপায় নেই, খাঁটি জিনিসের পরিমাণ বেশি হওয়া অসম্ভব,—খাঁটির জন্য অপেক্ষা করতে ও তাকে গভীর করে চিনতে যে ধৈর্যের প্রয়োজন তা নেই। [illegible]। এইজন্যে কৃত্রিম নকলের প্রচুরতা চলতে থাকে।

—নানাচিন্তা বাউল-গান

খাঁটি বাউল গানকে 'গভীর করে চিনতে যে ধৈর্যের প্রয়োজন' রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তা যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল, তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। [illegible] তিনি এই 'কৃত্রিম নকলের' উল্লেখ করেছেন তার থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্র-বাউলের গান [illegible] বাউল গানের নকল অনুকরণ। এক্ষেত্রে মনে হতে পারে, তাহলে প্রথম জীবনে রচিত স্বদেশী গীতিগুচ্ছকে 'বাউল' সংজ্ঞায় অভিহিত করার কারণ কি, আর শেষ জীবনে কেনই বা তিনি নিজেকে 'বাউলের চেলা' বলে আখ্যাত করেছেন।

১৩১২ সালে রবীন্দ্রনাথ 'বাউল' নাম দিয়ে যে স্বদেশী গানগুলি রচনা করেন তার অধিকাংশই বাউল সুরে গাঁথা হলেও সব কটির সম্বন্ধে তা বলা যায় না। তবু সমস্ত গানগুলিকেই 'বাউল' নামে চিহ্নিত করার কারণ হল, কবি দেখেছিলেন এই বাউল সম্প্রদায়ের বৈরাগীরাই জনসাধারণের দ্বারে দ্বারে ঘুরে সহজ ভাবের গানে অশিক্ষিত জনচিত্তেও উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা ও ধর্মভাব পরিবেশন করে চলে। সেই হিসাবে তারাই জনসাধারণের স্বাভাবিক ধর্মনায়ক এবং জনমনের উপর তাদের প্রভাবও যথেষ্ট। এই প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের একটি মন্তব্য স্মরণ করতে হয়। বাউল গান সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

বৃহত্তর সমাজ-জীবনের মধ্য হইতে যেভাবে লোক-সাহিত্যের জন্ম হয়, ইহার সংগীতগুলি সেইভাবে জন্মগ্রহণ করে না—বরং ব্যক্তিমনের আধ্যাত্মিক চৈতন্য-

বোধ হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এই আধ্যাত্মিক বোধও সাধনা দ্বারা লাভ করিতে হয়।

— বাংলার 'লোকসাহিত্য' ১৯৫৭, ভূমিকা. ধর্মসংগীত ও লোকসাহিত্য

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের এই মন্তব্যের যাথার্থ্য স্বীকার করেও বলতে হয় বাউলদের সহজ তত্ত্বকথা সর্বসাধারণের কাছে সম্পূর্ণ অবোধ্য নয় এবং দেশের বৃহত্তর জনমনকে তারা কতকাংশে অন্ততঃ প্রভাবিত করতে পারে।

ভারতীয় দার্শনিক সংঘের সভাপতির অভিভাষণে (১৩৩২) রবীন্দ্রনাথও এই বিষয়টি উল্লেখ করেন। তাই মনে হয় সমগ্র দেশবাসীকে জাতীয় চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করে তোলার জন্যই তিনি বাউল বা লৌকিক সুরে গানগুলি রচনা করেছিলেন। আর সেই কারণেই স্বদেশী গানগুলোকে 'বাউল' গানের পর্যায়ভুক্ত করে দেন। তাঁর 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের বাউল ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্রে ও গানে এই ভাবাদর্শই প্রকাশ পেয়েছে। এই ধনঞ্জয় একাধারে ধর্মনায়ক ও লোকনায়ক। তিনি ধর্মের ভিত্তিতে দেশের জনসাধারণকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এ বাউল বিশেষভাবে রবীন্দ্র বাউলের আদর্শ ও পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়া।

রবীন্দ্র বাউলের গানের ভাবের সঙ্গেও বাউল সম্প্রদায়ের ভাবধারার নিবিড় যোগ দেখা যায়। বাউল সাধকের 'মনের মানুষ' রবীন্দ্রকল্পনাকে গভীরভাবেই অধিকার করেছিল। 'সে যে মনের মানুষ, কেন তারে বসিয়ে রাখিস নয়নদ্বারে' বা 'আমার মন, যখন জাগলি না রে, তোর মনের মানুষ এল দ্বারে' প্রভৃতি গানগুলিতে ('গীতবিতান', পূজা, ৫৪৮ ও ৫৫০-সংখ্যক গান) 'মনের মানুষে'র প্রতি কবির বাউলসুলভ ঐকান্তিক আকুতিই প্রকাশ পেয়েছে। আবার গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে' গানের উত্তর পাই রবীন্দ্র-বাউলের গানে—

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তায় সকল খানে॥

—'গীতবিতান', পূজা, ৫৪৯-সংখ্যক গান

রবীন্দ্র-ভাবধারার সঙ্গে বাউল সাধকদের গানের আরও অনেক সাদৃশ্য দেখানো যেতে পারে। তবে স্বভাবতঃই কতকগুলি গানের মধ্যে এই সাদৃশ্য স্পষ্ট, কতকগুলির মধ্যে তা তত প্রত্যক্ষ নয়। আর এই সাদৃশ্যগুলি যে সর্বত্রই আকস্মিক তা নাও হতে পারে। পরপৃষ্ঠায় তার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

১। হৃদয়-কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি',
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, উপায় কি করি।

—বিশা ভুঁইমালী

জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস-সরোবরে—
সূর্যতারা ভিড় করে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে
কৌতূহলের ভরে।

—রবীন্দ্রনাথ ('বলাকা', ৩৩-সংখ্যক কবিতা)

২। ধন্য আমি শূন্যকুম্ভ পূর্ণকুম্ভ নই।
তাইতে তোমার জলের খেলায়
(তোমার) বুকের তলে রই।

—বাউল গঙ্গারাম

জানি জানি, তুমি আমার চাও না পূজার মালা
ওগো খেলার সাথি
তোমার আলোর আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি॥

—রবীন্দ্রনাথ ('পূরবী', খেলা)

৩। যদি আমায় ছাড়া ওগো রসিক
তোমার প্রেমের লীলা চলে,
তবে এখান থেকেই দাও গো বিদায়,
আমি রব না তা বলে।

—ক্ষিতিমোহন সেন-কৃত 'বাংলার সাধনা', বাংলার বাউল

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নিচে—
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে॥

—রবীন্দ্রনাথ ('গীতবিতান', পূজা-২৯৪)

আশা করি এই দৃষ্টান্তগুলির থেকেই বাউল ভাবের সঙ্গে রবীন্দ্র-বাউলের অন্তরের যোগটি আভাসিত হয়ে উঠেছে। কখনও কখনও আবার কবি বাউলের তত্ত্বকে অবলম্বন করে নূতন সৃষ্টির প্রেরণাও পান। উদাহরণস্বরূপ কবির বিশেষ প্রিয় লালন ফকিরের

'অচিন্ পাখি'র উল্লেখ করা যেতে পারে। এই 'অচিন্ পাখি'র ব্যঞ্জনাকে কবি তাঁর অধরা প্রিয়ার মধ্যে সঞ্চার করে দিয়ে লিখেছেন—

অচিন্ পাখি তুমি
মিলনের খাঁচায় থাক,
নানা সাজের খাঁচা।
সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখির পাখায়,
স্থকিত ওড়ার মধ্যে।

—'শেষ সপ্তক', তেরো-সংখ্যক কবিতা

এই উদ্ধৃতির থেকে বোঝা যায় বাউলের ভাবকে আত্মসাৎ করে রবীন্দ্রনাথ তাকে আপন প্রতিভার স্পর্শে কেমন করে উন্নত করে দিয়েছেন। আর এইখানেই সাধারণ বাউলের থেকে রবীন্দ্র-বাউলের স্বাতন্ত্র্য।

৫

বাউল গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানের যে ভাবগত মিল দেখা যায় তা কিছু পরিমাণে প্রভাবজাত হলেও তার মুখ্য কারণ হল উভয়ের জীবনদর্শনের মধ্যে একটা নিগূ ঐক্য ছিল। সেইজন্যই ভারতীয় দার্শনিক সংঘের অধিবেশনে (১৩৩২) তাঁ এত গভীরভাবে বাউল দর্শনের আলোচনা করেন। তাঁর The Religion of Man এবং 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থেও বাউল দর্শনের প্রসঙ্গ বারে বারে আলোচি হয়েছে।

কবির জীবনে উপনিষদের প্রেরণা ছিল সবচেয়ে গভীর। বাউল গানে কবি তারই প্রতিধ্বনি শুনেছিলেন। তাই লালন ফকিরের 'খাঁচার ভিতর অচিন্ পাখি' গানটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন—

> এই গ্রাম্য কবি দেখি উপনিষদের ঋষির সঙ্গে একমত ; আমাদের কাব্য ও মন ভূমাকে ধরিতে যাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, তবু সেই প্রাচীন ঋষিগণের মত এই গ্রাম্য কবি অসীমের অভিসার হইতে নিরস্ত নন, বরং এই দুঃসাহসিক ব্রতে সার্থক হইবার একটা পন্থা আছে তাহার ইঙ্গিত করিতেছেন।

—'ভারতীয় দার্শনিক সংঘে সভাপতির অভিভাষণ', প্রবাসী ১৩৩২ মাঘ

আলোচ্য গানটির ভাবের সঙ্গে কবি শেলীর বিখ্যাত Hymn to Intellectual Beauty কবিতার সাদৃশ্য লক্ষ করেছিলেন। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ গগনের 'আমি কোথায় পাব তারে' গানটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

এই কথাটিই উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে : তং বেদ্যং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যু পরিব্যথাঃ। যাঁকে জানবার সেই পুরুষকেই জানো, নইলে যে মরণ-বেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটিই শুনলুম তার গেঁয়ো সুরে, সহজ ভাষায়। · 'অন্তরতর 'যদয়মাত্মা' উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' বলে শুনলুম, আমার মনে বড বিস্ময় লেগেছিল।

—'সংগীতচিন্তা', বাউল-গান ১৩৩৪ চৈত্র

শুধু উপনিষদের বাণীর প্রতিধ্বনি হিসাবে নয, ব্যক্তিগতভাবেও এই 'মনের মানুষ' যে কবির কল্পনাকে অধিকার করেছিল তাঁর আর একটি প্রবন্ধে তা ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন—

It means that, for me, the supreme truth of all existence is in the revelation of the Infinite in my own humanity 'The Man of my Heart', to the Baul, is like a divine instrument perfectly tuned. He gives expression to infinite truth in the music of life.

—'Creative Unity An Indian Folk Religion

বাউলধর্মের গভীরতম বাণীটি তার নিগূঢ় ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রমনে যে কিভাবে বিকাশিত হয়ে উঠেছিল, এখানে তা ধরা দিয়েছে। পরবর্তী কালে 'মানুষের ধর্ম' ব্যাখ্যা করতে গিয়েও কবি এই ভাবটির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। সেখানে তিনি বলেন—

আপনারই পরমকে না দেখে মানুষ বাইরের দিকে সার্থকতা খুঁজে বেড়ায়। (কিন্তু) মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ। মানুষের যত কিছু দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে। সেই বাহিরে বিক্ষিপ্ত আপন হারা মানুষের বিলাপ-গান একদিন শুনেছিলেম পথিক ভিখারির মুখে—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

সেই নিরক্ষর গাঁয়ের লোকের মুখেই শুনেছিলেম—

তোরই ভিতর অতল সাগর।

সেই পাগলই গেয়েছিল—

মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।

সেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা বেদে আছে : আবিরাবীর্ম এধি। পরম মানবের বিরাট-রূপে যাঁর স্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তাঁর প্রকাশ সার্থক হোক।

—'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১

উদ্‌ধৃতিটি দীর্ঘ হল। তবে এর থেকেই রবীন্দ্রমনে 'মনের মানুষ' ভাবনার গভীরতাটি ধরা পড়বে। সেই সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে এ ভাব রবীন্দ্রচিত্তে সম্পূর্ণ নূতন নয়। যিনি বাউলের 'মনের মানুষ' তিনিই কবির সর্বজনীন সর্বকালীন 'মানবব্রহ্ম' বা 'মহামানব'। সুতরাং কবি বাউলের এই কল্পনায় আপন মনোভাবের সমর্থন পেয়েই এত উচ্ছ্বসিত হয়ে তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। এই ভাব বাইরে থেকে আরোপিত হলে কবির ব্যাখ্যা এত সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারত না।

'মনের মানুষ' ছাড়া আরও কয়েকটি তত্ত্বে বাউলের সঙ্গে রবীন্দ্রভাবনার মিল পাওয়া যায়। পূর্বেই দেখা গেছে বাউলের কাছে তার 'মনের মানুষ' যেমন লীলাসঙ্গী রবীন্দ্রনাথের কাছেও তিনি তেমনি 'খেলার সাথি'। মুক্তিতত্ত্বের দিক থেকে উভয়ের ভাবনার মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। ভারতীয় দার্শনিক সংঘের অভিভা কবি মদন বাউলের—

নিঠুর গরজী, তুই কি মানস মুকুল ভাজবি আগুনে
তুই ফুল ফুটাবি বাস ছুটাবি সবুর বিহনে।

গানটি উদ্‌ধৃত করে মন্তব্য করেছেন—

কবি জানেন জোর করিয়া মুক্তিলাভের কোনো বাহ্য উপায় নাই। অন্তরে সাধনপ্রক্রিয়ায় নিজেদের উৎসর্গ করিয়া হারাইতে পারিলেই তবে মুক্তির দিকে যাওয়া যায়।

এই গানটির শেষে 'সহজ ধারা আপন হারা তার বাণী শোনে' ইত্যাদি ছত্রেও কবির এই ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়। আবার বিশা ভুঁঞিমালীর—'হৃদয়-কমল চলতেছে ফুটে তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা মুক্তি কোথাও নাই' গানটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে উক্ত ভাষণেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

এই গানে কবি অনন্তের সহিত সান্ত জীবাত্মার চিরন্তন মিলনবন্ধনের কথা গাহিয়াছেন, এ বন্ধন হইতে মুক্তি নাই, কারণ এই পরস্পর সম্বন্ধেই সত্য পূর্ণ হয়, কারণ প্রেমই পরমতত্ত্ব, নিরপেক্ষ স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বন্ধ্যাতা ও শূন্যতামাত্র।

কিন্তু এই ভাষণের বহু পূর্বেই কবির নিজের একটি গানে যে মুক্তিতত্ত্বের কথা ব্যক্ত হয়েছে তা হল—

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে।
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন 'পরে
বাঁধা সবার কাছে।

—'গীতাঞ্জলি', ১১৯-সংখ্যক গান, ১৩১৭

অর্থাৎ কবির মতে জগৎ ও জীবনকে কৃত্রিম বন্ধন বলে মনে করে তার থেকে মুক্তি পেতে চাওয়া নিরর্থক। এই ভাবটির সঙ্গে বাউল ভাবের মিল বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। এই জাতীয় ভাবগতসাদৃশ্য যে কত গভীর ও নিগূঢ় হতে পারে তার আর একটি উদাহরণ দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নটীর পূজা' নাটিকার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন—

বুদ্ধদেবকে নটী যে অর্ঘ্য দান করতে চেয়েছিল সে তার নৃত্য। অন্য সাধকেরা তাকে দিয়েছিল যা ছিল তাদেরই অন্তরতর ন তা, নটী দিয়েছে তার সমস্ত জীবনের অভিব্যক্ত সত্যকে। মৃত্যু দিয়ে সেই সত্যের চরম মূল্য প্রমাণ করেছে। এই ত্যকে পরিপূর্ণ করে জাগিয়ে তুলেছিল তার প্রাণমনের মধ্যে তার প্রাণের ান।

—'আত্মপরিচয়' অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ

আর প্রায় নিরক্ষর বাউলের গানে শোনা যায় এই গভীর জীবনদর্শনের বাণী।—

যদি করিস মানা, ওগো বন্ধু, মানি এমন সাধ্য নাই।
কোনো ফুলের নামাজ রংবাহারে,
কারও গন্ধে নামাজ অন্ধকারে
বীণার নামাজ তারে তারে, আমার নামাজ কণ্ঠে গাই।

মদন বাউলের এই গানে 'নটীর পূজা'র মূল অভিপ্রায়টি এত সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়েছে যে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের নটী এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে সহজেই বলতে পারত— 'আমার পূজা নৃত্যে পাই'।

সুতরাং দেখা গেল আবাল্যপরিচিত বাউল গানের সঙ্গে কবির যোগ প্রথম জীবনে তার বাণীর সশ্রদ্ধ উদ্ধৃতিতে, তার বাউল সুর গ্রহণে, কখনও বা তার বাণীর সমর্থনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তা গভীর হয়ে ক্রমশঃ তাঁর সমগ্র সত্তাকে অধিকার করে ছিল। তাই গীতসাধক বাউল যেমন বলে—

'আমার নামাজ কণ্ঠে গাই', রবীন্দ্রনাথও তেমনি লেখেন—

সেই সুরে আমার মন বললে
সংগীতময় ধরার ধূলি।

এই গীতসাধনার সূত্রেই বাউলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পথ এক হয়ে মিলেছে। তাই পরিণত বয়সে কবি তার প্রতি জানিয়েছেন তাঁর পরম শ্রদ্ধাঞ্জলি।—

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দিরদ্বারে
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।
ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তাঁর আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে
সহজ ভক্তির আলোকে।...
কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে[1]
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।
কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।...
মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারে এসে আমার পূজা
বেরিয়ে চলে গেল দিগন্তের দিকে—
সকল বেড়ার বাইরে,
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে
মানবলোকে,

১ পদ্মার তীরবাসী যে সাধকের কথা বলা হয়েছে, সেই সাধক স্বয়ং লালন ফকির হওয়া অসম্ভব নয়।

আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

—'পত্রপুট', পনেরো-সংখ্যক কবিতা ১৩৪৩ বৈশাখ

প্রথম জীবনে যে সাধনার প্রতি ছিল তাঁব সশ্রদ্ধ সমর্থন, শেষ জীবনে তাকেই তিনি একান্তভাবে বরণ কবে নিলেন।

উপসংহার

আধুনিক বাঙালি জাতির অন্যতম স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ এ কথা অত্যুক্তি নয়। অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি তাঁর প্রতিভার অমৃতস্পর্শে মৃতপ্রায় বাঙালি জাতিকে যেভাবে সঞ্জীবিত করেছেন, তার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নূতন প্রেরণার বেগ সঞ্চার করে যেভাবে তাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন, তাতে বলতে হয় বাঙালির মনোজীবন তাঁর হাতেই গড়ে উঠেছে। বস্তুতঃ তাঁর প্রয়াসেই বাঙালির জাতীয় চিত্ত জাগ্রত হয়ে উঠে সর্বপ্রথম আপন পরিপূর্ণ সত্তাকে নিঃসংশয়ে অনুভব করতে পেরেছিল, এ কথা বলা চলে।

রবীন্দ্রনাথ যে বাঙালিজাতির মনোজীবনকে গড়ে তুলেছিলেন তার অর্থ হল তিনি সমগ্র বাঙালিকে বৃহৎ জাতীয় চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করে তাকে এক অখণ্ড ঐ[illegible] সম্মিলিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন—

> বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ রাঢ় বারেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়, অন্তরের ভাগও ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজের মি[illegible] ছিল না। [illegible]
>
> —'বাংলাভাষা-পরিচয়' ১৯৩৮, অ[illegible]

বাংলা দেশের এই চিত্র বিশেষভাবে মধ্যযুগের এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে বিচ্ছিন্ন এই দেশ তখন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও ছিল বহুধা বিভক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম তাঁর বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে বিক্ষিপ্তচিত্ত বাঙালির মনে জাতীয়তা চেতনার উন্মেষ ঘটাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথের সাধনাতেই এই খণ্ড ছিন্ন বাংলাদেশ তার জাতীয় জীবনের অখণ্ডতাকে নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করে। বস্তুতঃ কবির রাখিসংগীত 'বাংলার মাটি বাংলার জল' এর মধ্য দিয়েই বাংলার অভ্যুদয় ঘটেছিল, এবং বাংলার কবি বাংলা ভাষায় খাঁটি বাংলা সুরে সমস্ত বাঙালির কণ্ঠে এক গান জাগিয়ে সত্যসত্যই 'বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন'-কে এক করে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের যে স্বদেশী গানগুলির ভিতর দিয়ে বাঙালি-সাধারণ দেশকে এমনভাবে অনুভব করতে পেরেছিল তার অনেকগুলির সুরই বাংলার দেশী বাউল গানের সুর এই লৌকিক সুরের স্পর্শেই সর্বশ্রেণীর বাঙালিচিত্ত এত সহজে সাড়া দিয়েছিল সুরের সঙ্গে সঙ্গে বাউল গানের ভাবধারাকেও কবি সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এই লোকগীতির মধ্যে বিশ্বজনীনতার উপাদান দেখে কবি

তার রসধারাকে সর্বসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধেও সেই কথা। পদাবলীর সাহিত্যরসকেও তিনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গণ্ডির বাইরে শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী নির্ধন-নির্বিশেষে সকলের রস-উপভোগের সাধারণ সম্পদরূপে গড়ে তোলেন। এইভাবেই তিনি সাধু ও লৌকিক সংস্কৃতির ভেদরেখাকে মুছে ফেলে দেশকে এক বৃহৎ জাতীয়তার চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ করেন এবং তাঁর এই প্রয়াসের ফলে সাহিত্যে সংগীতে শিল্পে শিক্ষায় বঙ্গসংস্কৃতি এক অখণ্ড ঐক্যে সংগঠিত হয়ে ওঠে।

২

বঙ্গসংস্কৃতিকে ঐক্যবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ তাকে ভারতসংস্কৃতির সঙ্গে সমন্বিত করে দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। বাংলা দেশ সেই সময়ে বৃহৎ ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মস্বাতন্ত্র্যের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন এক দিকে বঙ্গের সংস্কৃতিকে ভারতবর্ষের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন, অন্য দিকে ভারতের চিত্তসম্পদকে বাংলা সাহিত্যের সামগ্রী করে তোলার জন্য চেষ্টিত হয়েছিলেন। তারই ফলে বাংলাদেশ ভারতীয়দের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে এবং বাঙালিরা আপনাদের ভারতীয় বলে অনুভব করতে শেখে। এইভাবেই কবি ভারত ও বাংলার মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র রচনা করে বাঙালির অন্তরে ভারতবোধের প্রেরণা সঞ্চার করে দিয়েছিলেন।

প্রাচীন কালে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের আত্মার যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। জয়দেব-প্রমুখ বাঙালি কবির রচিত সংস্কৃত কাব্যগুলিই তার প্রমাণ। এই জাতীয় কাব্য তখন সর্বভারতীয়তার পরিধিতে উত্তীর্ণ হয়ে সমাদৃত হত। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলাদেশ কতকগুলি রাজনৈতিক কারণে এই সর্বভারতীয়তার বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যগুলি তার নিদর্শন। এ যুগে শ্রীচৈতন্য-প্রমুখ দুএকজনের মধ্যেই শুধু ভারতীয়তার চেতনা কিছু পরিমাণে দেখা গিয়েছিল। তবে বৈষ্ণব পদাবলী ও চরিত সাহিত্যগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাইরে প্রসার লাভ করে নি। এ যুগে রামায়ণ মহাভারতকে অবলম্বন করে যে গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল মানবচরিত্রের নতোন্নত মহিমা ও মনুষ্যত্বের বীর্যে সেগুলির দ্বারা প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে উজ্জ্বল করে তোলা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু বাঙালি কৃত্তিবাস কাশীদাসের হাতে পড়ে সেগুলির সমুন্নত ভাবাদর্শ যে অনেকাংশেই খর্ব হয়ে গিয়েছিল, সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

আধুনিক যুগে সর্বভারতীয়তার যে চেতনা দেখা যায়, রাজা রামমোহন রায় তার পথিকৃৎ। তাঁর প্রবর্তিত পথেই পরবর্তী কালে দেবেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ-প্রমুখ বহু বাঙালি মনীষী ভারতীয় ভাবধারাকে বিভিন্ন দিক্ থেকে বাঙালির চিত্তক্ষেত্রে প্রবাহিত করে দেবার প্রয়াস পান এবং অনেকাংশে সফলও হন। তাঁদের এই প্রয়াসের উত্তরসূরীরূপেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। তবে তাঁর একক প্রয়াস তাঁর পূর্বসূরীদের সম্মিলিত প্রয়াসকে বহুলাংশে অতিক্রম করে গিয়েছিল। কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের মননে ও সাহিত্যেই বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের সন্তসাধক পর্যন্ত ভারতীয় সাধনধারার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পাওয়া যায়। তাই দেখি বৈদিক যুগের ভাবধারা সর্বপ্রথম রবীন্দ্রসাহিত্যেই যেন বিশেষভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। নবীন বিশ্বকে দেখে বৈদিক ঋষির চোখে যে বিস্ময় ফুটেছিল বহু শতাব্দী পার হয়ে তা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকে আশ্রয় করেছে, আর ঋগ্বেদের উদাত্ত মন্ত্রধ্বনি ও সামসংগীতের সুর রবীন্দ্র-সংগীতের মধ্যে অনুরণিত হয়ে উঠেছে। উপনিষদের নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্ব রবীন্দ্র অনুভূতিতে নূতনতর অর্থ ও তাৎপর্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে। গৌতম বুদ্ধ ও রাজা অশোকের মৈত্রী-করুণার বাণীও রবীন্দ্রসাহিত্যের যোগেই আমাদের কাছে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারতের সুমহান জীবনসত্য রবীন্দ্রলেখনী দ্বারাই আজ তার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। পুরাণের বিচিত্র কাহিনী ও দেবতা, বিশেষতঃ শিব রবীন্দ্রকল্পনায় যোগীশ্বররূপে, নটরাজরূপে—উন্নততর মহিমায় গৌরবান্বিত হয়ে উঠেছেন। আবার কালিদাসের শিল্পসুষমা ও জীবনাদর্শ ভারতীয় সংস্কৃতির যে আদর্শকে প্রকাশ করেছে তাকেও তিনিই আধুনিক বাঙালির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। মধ্যযুগের কবীর-নানক-দাদূ প্রভৃতি সন্তদের বাণীও তাঁর সংবেদনশীল মনে প্রতিধ্বনিত হয়ে সর্বসাধারণের কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'বস্তুতঃ ভারতবর্ষের সমস্ত যুগের সমস্ত সাধনার তত্ত্ব রস ও রূপ একাধারে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ও সুসংহত হয়ে পুনর্বিকাশ লাভ করেছে।' অতএব বলা যায়, ভারতবর্ষ তার গৌরবময় ঐতিহ্য নিয়ে তাঁর ধ্যানে ও মননে বিশেষ উজ্জ্বলরূপেই বিরাজিত ছিল।

প্রাচীন ভারতের প্রতি কবির এই আগ্রহ শুধুমাত্র অতীত চারণেই আবদ্ধ থাকে নি। বর্তমানের দুঃখদুর্দশাগ্রস্ত ভারতকে, তার 'মূঢ় ম্লান মূক-মুখ' ও 'শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন-বুক' ভারতবাসীকে তিনি অতীত গৌরব স্মরণ করাতে চেয়েছেন। কেননা তাঁর বিশ্বাস ঐতিহ্য-বিচ্যুত ভারত অতীতের আদর্শ থেকে বল ও প্রেরণা আহরণ করেই তার ভাবী কালকে উজ্জ্বল সম্ভাবনায় পূর্ণ করে তুলতে পারবে। কবির একান্ত

সনেটে এই মনোভাব সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে তিনি 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' ইত্যাদি বেদমন্ত্রটি স্মরণ করে বলেছেন—

> আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
> সে মহা আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্তবাণী
> সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়
> পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
> অনন্ত অমৃতবার্তা।
> রে মৃত ভারত,
> শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।

—'নৈবেদ্য,' ৬০-সংখ্যক কবিতা

এ থেকে বোঝা যায়, ভারতের অন্তরাত্মা কবির স্বচ্ছ দৃষ্টিতে আপন স্বরূপেই উদ্ভাসিত হয়েছিল এবং তারই পটভূমিতে ভারতের অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই তিনেরই রূপ যেন প্রত্যক্ষবৎ প্রতিফলিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর 'The Discovery of India' গ্রন্থের কথা। এই গ্রন্থে তিনি ভারতের প্রতিবিম্বকেই আবিষ্কার করেছিলেন। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথ ভারতের সমগ্র রূপটাকে ওইভাবে বিশ্লেষণ না করেও তার অন্তর্নিহিত মূল ভাবটুকু যথার্থই দর্শন করেছিলেন। ভারতের আত্মা তার সাধনা ও তার সংকল্প নিয়ে তার কাছে পরিপূর্ণরূপেই ধরা দিয়েছিল।

৩

অতীত ভারতের যে আদর্শ কবিকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিল এবং যে আদর্শকে তিনি ভাবীকালের ভারতের সামনে উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, সেটি হল বিশ্ববাসী সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার, তাদের সকলকে চরম শ্রেয়ের পথে প্রবর্তিত করার আদর্শ। এই আদর্শকে স্মরণ করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> 'সংগচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্'—এক হয়ে চলব, এক হয়ে বলব, সকলের মনকে এক বলে জানব। এই মন্ত্রের সাধনা ভারতবর্ষে যেমন অত্যন্ত দুরূহ এমন আর কোনো দেশেই নয়। যতই দুরূহ হোক, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ছাড়া রক্ষা পাবার অন্য কোনো পথ নেই।

—'চারিত্রপূজা', ভারতপথিক রামমোহন রায়-১, ১৩৪০ পৌষ ১৪

এই আন্তরিক একতার সাধনাই ভারত-আত্মার চিরন্তন সাধনা। এই ঐক্য কোনো

কৃত্রিম বন্ধন নয়, তা সহজ সম্মিলন মাত্র, এবং এই মিলনব্রতের মূল মন্ত্র হল প্রেম। একমাত্র প্রেমের প্রেরণাতেই বৃহৎ বিশ্বের বিচিত্র মানুষ তাদের সমস্ত বিচ্ছিন্নতার দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে অবিরোধে একত্রে মিলতে পারে। ভারতসংস্কৃতির সমগ্র ইতিহাস এই প্রেমবিস্তারেরই জয়গাথা। তাই বিখ্যাত গায়ত্রী মন্ত্রে দেখি বৈদিক ঋষি তাঁর চৈতন্যকে শুধুমাত্র ভূলোকে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে ভুবর্লোক ও স্বর্লোকের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিতে চেয়েছেন। তাঁদের কণ্ঠেই প্রার্থনা শোনা গেছে 'স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু'—তিনি আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত করুন। বলা বাহুল্য কোনো সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের উদ্দেশ্যে নয়, বিশ্ববাসী সকলের মঙ্গলের জন্যই ঋষির এই প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছিল। প্রেমমৈত্রীর এই মন্ত্র গভীরতর সত্যরূপে স্বীকৃত হয়েছে ভগবান বুদ্ধের বাণীতে। প্রীতিকে মৈত্রীকে সর্বজীবের মধ্যে বাধাহীন করে বিস্তার করে দেবার জন্যই বুদ্ধের উপদেশ—

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে।
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং॥

অর্থাৎ 'অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোল। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়—মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালোবাসেন সেইরকম ভালোবাসা।' ('শান্তিনিকেতন' ১, ব্রহ্মবিহার)। পরবর্তী কালে ত্যাগব্রতী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রেমধর্ম বিস্তারের আগ্রহে বিশেষতঃ সম্রাট অশোকের ধর্মবিজয়ে বুদ্ধের এই বাণীকেই জয়যুক্ত হতে দেখা গিয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও যে আদর্শ কীর্তিত হয়েছে, তা হল—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥

সর্বভূতের মধ্যে আপনাকে এবং সর্বভূতকে আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করার এই বাণীতে অপরিমাণ মৈত্রীর ইঙ্গিতটিই প্রচ্ছন্ন দেখি। অন্যান্য ভারতীয় সংহিতা বা নীতিশাস্ত্রেও তার প্রতিধ্বনি শুনি—'আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি'। এ ছাড়া গীতার 'নিষ্কাম কর্মবাদ' তত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে গীতাকার যে 'চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্‌' বা লোককল্যাণের আগ্রহের কথা বলেছেন, তার মূলেও তো আছে সর্বভূতের প্রতি নিষ্কাম প্রীতি। রামায়ণ-মহাভারতেও দেখি আর্য-অনার্য এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ ও সর্বোপরি তার মিলনের ইতিহাসটি সেখানে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। মধ্যযুগের সন্ত-সাধকদের বাণীতে ভারতের এই মিলনসাধনা স্ফুটতর রূপ লাভ করেছে। সন্ত কবীরের কাছে বিশ্বমিলনবোধের এই মহাপথ 'ভারতপথ' রূপে প্রতিভাত হয়েছিল

এবং নিজেকে তিনি 'ভারতপথিক' রূপে অভিহিত করেছিলেন। আর দাদূ তাঁর সাধনপথের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন—

ভাই রে, ঐসা পংথ হমারা
দ্বৈপখরহিত পংথ গহি পূরা অবরণ এক অধারা ॥

'ভাই রে, আমার পথ এই রকম, সে দুইপক্ষরহিত, বর্ণহীন, সে এক।' রজ্জবের মুখেও শোনা গেছে—

বুংদ বুংদ মিলি রস সিংধ হৈ, জুদা জুদা মরু ভায়।

সর্বমানবের মিলনেই এই রসসিন্ধুর সৃষ্টি। মানবতাবোধের উদার তীর্থেই তাঁরা উচ্চ নীচ স্বধর্মী বিধর্মী -নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে মেলাতে চেয়েছিলেন। এইভাবেই ভারত সংস্কৃতির মৌল অভিপ্রায়টি ইতিহাসের পর্বে পর্বে সার্থকতার পথে অগ্রসর হয়ে চলছিল। রবীন্দ্রনাথ এ সত্য অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি লেখেন—

> বৈদিক সময় হইতে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া শাস্ত্র এবং সংস্কার, আচার এবং অনুশাসন হিন্দুদিগের জন্য এক বিরাট বিস্তৃত আবাসভবন নির্মাণ করিয়াছে। তাহার সকল কক্ষগুলি সমান নহে,—মাঝে মাঝে দেয়াল উঠিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মধ্যে যাতায়াতের পথ বন্ধ হইয়াছে কিন্তু তথাপি এই বিপুলতার মধ্যে একটা বৃহৎ ঐক্য আছে।
>
> — সমাজ, হিন্দুর ঐক্য ১৩০৫

এই ঐক্য হল একান্ত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি বৃহৎ সমন্বয়ের সাধনা এবং প্রেমের প্রসারতা তার প্রধান দিশা। এই সাধনার ফলেই ভারত একদিন সমগ্র বিশ্বকে আপন হৃদয়ে আহ্বান জানিয়ে বলতে পেরেছিল, 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'। আর ভারত সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত এই বিশ্বমুখীনতার প্রবণতাটি হৃদয়ঙ্গম করে এবং ভারতের চিত্তক্ষেত্রে এক বিরাট ঐক্য উপলব্ধির বিপুল সম্ভাবনা দেখে আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।

—'গীতাঞ্জলি', ১০৬-সংখ্যক কবিতা ১৩১৭ আষাঢ়

ভারত-ভাগ্য-বিধাতার কণ্ঠে কবি বিশ্ববাসীর যে অশ্রুত মিলনমন্ত্র ধ্বনিত হতে শুনেছিলেন, তাঁর সারা জীবনের বাণী সাধনায় তিনি তাকেই রূপদান করার প্রয়াস

পান। তার ফলে তাঁর রচনায় এক বিরাট অখণ্ড অথচ বিচিত্র মহাভারত রূপ লাভ করে। সেই সঙ্গে তিনি নিজেকে যে 'মহা-ভারতের অধিবাসী' বলে দাবী করেছেন, যে মহাভারতের কোথাও কোনো 'ভৌগোলিক সীমানা নেই', বাঙালিকে ভারত-বাসীকে বিশ্ববাসীকে তিনি সেই মহা-ভারতের অধিবাসী হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন ('চিঠিপত্র' ৯, পত্র-২০)। এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, ভারতসংস্কৃতির রসে জারিতমনা কবি তাঁর জীবনসাধনায় যে সত্য-উপলব্ধিকে একান্তভাবে বরণ করতে চেয়েছিলেন তা হল—

আজ দিনান্তের অন্ধকারে
এজন্মের যত ভাবনা যত বেদনা
নিবিড় চেতনায় সম্মিলিত হয়ে
সন্ধ্যাবেলার একলা তারার মতো
জীবনের শেষবাণীতে হোক উদ্‌ভাসিত—
"ভালোবাসি"।

—'শেষ সপ্তক' ১৯৩৫, চল্লিশ-সংখ্যক কবিতা

এর কিছু কাল পরেই কবি তাঁর জীবনসাধনার চরম অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে বললেন—

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে ··
··সৃষ্টির শেষ রহস্য, ভালোবাসার অমৃত।

—'পত্রপুট', পনেরো-সংখ্যক কবিতা ১৩৪৩ বৈশাখ

এই অমৃতের আশায় এত আশ্বাসে কবির উদার জীবনের পথপরিক্রমা। প্রথম জীবনে কবি যে সুগভীর জীবনপ্রীতিতে বলেছিলেন—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই।

—'কড়ি ও কোমল' ১৮৮৬, প্রাণ

তার মূলে ছিল 'মানবে'র প্রতি তাঁর অমৃতময় ভালোবাসা। আর এই সুধাভরা প্রীতির প্রেরণাতেই পরবর্তী কালে কবি বিশ্ববাসী সকলকে ভারতের চিত্তক্ষেত্রে আহ্বান জানিয়েছেন এবং ভারতের ভাবময় আত্মাকে চিরন্তন বিশ্ববোধের সঙ্গে অন্বিত করে দেবার প্রয়াস পেয়েছেন।

এই স্থলে মনে রাখতে হবে, ভারতসংস্কৃতিকে কবি যে বিশ্বসংস্কৃতির পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন তার মূলে আছে ভারতীয় বিশ্বমানবতার প্রেরণা। এই বিশ্বমানবতা পাশ্চাত্ত্য মানবতাবোধের (humanism) থেকে কিন্তু বিশেষভাবেই পৃথক্। পাশ্চাত্ত্য মানবতাবোধ মানুষের সচেতন জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা থেকে উদ্ভূত। কিন্তু ভারতীয় বিশ্বমানবতা তার বোধের গভীরে নিহিত এবং তা তার অন্তরের সহজ অনুভূতি থেকে স্বতঃই উৎসারিত। 'সর্বভূতাত্মা'-কে আপনার মধ্যে অনুভব করা তার স্বাভাবিক প্রেরণা। এই ভারতীয় মানবতার মন্ত্র পাথেয় করেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপরিক্রমা করেছেন। সুতরাং বলা যায়, ভারতসংস্কৃতির সুমহান উত্তরাধিকার তাঁর মধ্যেই সার্থক হয়েছে এবং সেই অর্থে রবীন্দ্রসংস্কৃতি ভারতসংস্কৃতির সঙ্গে এক হয়ে মিলে গেছে।

প্রসঙ্গতঃ বলতে হয় যে, বাংলা দেশকে প্রাদেশিকতার ঊর্ধ্বে উত্তরণ করিয়ে দেবার প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই দেখা গিয়েছিল এবং তাকে স্মরণ করেই কবি বলেছেন—

> একদিন চৈতন্য আমাদের বৈষ্ণব করেছিলেন, সেই বৈষ্ণবের জাত নেই কুল নেই—আর একদিন রামমোহন রায় আমাদের ব্রহ্মজ্ঞানকে উদ্বোধিত করেছেন—সেই ব্রহ্মজ্ঞানের কোন জাত নেই দেশ নেই।

—'চিঠিপত্র' ৮ পত্র-২০ রথীন্দ্রনাথকে লেখা ১৯১৬ অক্টোবর ২৮

সেই প্রেরণার উত্তরসাধকরূপেই রবীন্দ্রনাথ 'বাংলাদেশের কোণে একটা বিশ্বপৃথিবীর হাওয়া' অনুভব করেছিলেন এবং একান্তমনে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—

> বাংলা দেশের চিত্তসর্বদান সর্বদেশে প্রসারিত হোক, বাংলা দেশের বাণী সর্বজাতি সর্বমানবের বাণী হোক।

—পূর্ববৎ

কবির এই প্রার্থনা ব্যর্থ হয় নি। তাঁর একক প্রয়াসেই বাংলা দেশ ভারতসংস্কৃতিকে আপন হৃদয়ে গ্রহণ করে বিশ্বের সঙ্গে অন্বিত হতে পেরেছে। তাই রঘুরাজদের প্রশস্তি কীর্তন করে উপমাসিদ্ধ কবি কালিদাস যে কথা বলেছিলেন—

সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ।

—সহস্রগুণ করে ফিরিয়ে দেবার জন্যই রবির রসগ্রহণ, ভারতের কবি 'রবি' সম্বন্ধেও সে কথা আশ্চর্যভাবে সত্য হয়েছে। অসাধারণ সংবেদনশীল মন নিয়ে তিনি ভারতসংস্কৃতি থেকে যা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর দান তাকে হাজারগুণে ছাপিয়ে গেছে। আর এই দানই তার ভারতসংস্কৃতিকে একান্তভাবে আত্মস্থ করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিণতি।

দ্বিতীয় খণ্ড

উপাদান-সংগ্রহ বিভাগ

ভারতীয় সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে রবীন্দ্রসংস্কৃতি যে রূপ পরিগ্রহ করেছে, এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি তারই পরিচয়। আর রবীন্দ্রসংস্কৃতি ভারতসংস্কৃতির যে মৌল উপাদানগুলিকে আশ্রয় করেছে, দ্বিতীয় খণ্ডটি মূল উৎসসহ সেই উপাদানের সংকলন। এই দ্বিতীয় খণ্ডকে তাই উপাদান-সংগ্রহ বিভাগ বলা হয়েছে।

উপাদান-সংগ্রহ বিভাগের উপাদানগুলি প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্য থেকে সংগৃহীত। কেননা মননমূলক প্রবন্ধেই লেখকের মানসপ্রবণতাটি সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয়। তবে প্রয়োজনমতো 'চণ্ডালিকা', 'নটীর পূজা', 'চিরকুমার সভা' প্রভৃতি অন্যবিধ গ্রন্থ অথবা গল্প, কবিতা ইত্যাদি থেকেও উপাদান সংকলন করা হয়েছে। এই সংকলনে কোনো বিশেষ গ্রন্থের বিশেষ শ্লোক রবীন্দ্রনাথের কোন্ কোন্ গ্রন্থে কতবার ব্যবহৃত হয়েছে কালক্রম-অনুযায়ী তারই তালিকা দেওয়া হয়েছে। উক্ত তালিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলির সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশের তারিখটিই যথাসম্ভব অনুসন্ধান করে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। যেখানে তা পাওয়া সম্ভব হয় নি, সেখানে গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের তারিখটিই গৃহীত হয়েছে। পত্রগুলিতে পত্ররচনার তারিখ দেওয়া হয়েছে, পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ নয়। তারিখের ক্ষেত্রে সর্বদা-ব্যবহৃত ইংরেজি খ্রীস্টাব্দ ও মাসের উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে ইংরেজি তারিখ পাওয়া যায় নি, সেখানে বাংলা তারিখ ও তার সম্ভাব্য ইংরেজি তারিখ দুটিই উল্লিখিত হয়েছে। এই তালিকায় রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র পুস্তকগুলির যথাসম্ভব শেষ সংস্করণ ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। সেই জন্যই বিখ্যাত ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা প্রবন্ধটি 'পরিচয়' বা 'সমাজ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত না করে 'ইতিহাস' গ্রন্থভুক্ত রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত রচনাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রচনাবলীতে (শতবার্ষিক সংস্করণ) পাওয়া যাবে। তবে স্বতন্ত্র গ্রন্থের কয়েকটি রচনা, যেমন 'সঞ্চয়' গ্রন্থের ধর্মশিক্ষা, 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের আচার ও সংস্কৃতি, ভাষার খেয়াল প্রভৃতি উক্ত রচনাবলীতে পাওয়া যায় না। এসব ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র গ্রন্থ থেকেই ওইগুলি গৃহীত হল। এ ছাড়া রচনাবলীতে কয়েকটি প্রবন্ধকে বিষয়গত সমতারক্ষার প্রয়োজনে এক গ্রন্থ থেকে অন্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যেমন তপোবন প্রবন্ধটিকে 'শান্তিনিকেতন' ১ম খণ্ড গ্রন্থ থেকে 'শিক্ষা' গ্রন্থে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এ স্থলে কিন্তু সুপরিচিত তপোবন প্রবন্ধের উৎস হিসাবে 'শান্তিনিকেতন' ১ম খণ্ড গ্রন্থটিই

উল্লিখিত হয়েছে। সেই কারণেই শিক্ষার মিলন প্রবন্ধটি 'শিক্ষা' গ্রন্থের পরিবর্তে 'কালান্তর' গ্রন্থের অন্তর্গতরূপে উল্লিখিত হয়েছে। কোনো প্রবন্ধে কোনো বিশেষ শ্লোক একাধিকবার উল্লিখিত হলে এই সংকলনে উক্ত প্রবন্ধের পাশে দু বার, তিন বার, পাঁচ বার ইত্যাদি লিখে উল্লেখের সংখ্যা নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে। আশা করি তার দ্বারা রবীন্দ্রমনে সেই বিশেষ শ্লোকের গুরুত্ব বোঝার সহায়তা হবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় যে-সকল উপাদান ব্যবহার করেছেন, সেগুলি যে সব সময় মূল গ্রন্থ থেকেই নিয়েছেন তা বলা যায় না। তাঁদের পরিবারে যেসব সংকলন গ্রন্থ প্রচলিত ছিল অথবা যে গ্রন্থগুলি রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্যবহার করতেন, যেমন মহর্ষি-সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্ম', সত্যেন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'নবরত্নমালা', হেবরলিন-সমাহৃত 'কাব্য-সংগ্রহঃ', ধর্মাধার মহাস্থবির-সম্পাদিত 'হস্তসার', সমণ পুণ্ণানন্দ সামী-সংকলিত 'রত্নমালা', রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'উপনিষৎ সংগ্রহ' 'পদরত্নাবলী' ও 'বাংলাকাব্য-পরিচয়', অক্ষয়কুমার সরকার-সংগৃহীত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' প্রভৃতি সংকলন গ্রন্থে কবিব্যবহৃত বহু উপকরণই পাওয়া গেছে। উপাদান-সংগ্রহের তালিকায় উক্ত উপাদান বা শ্লোকের পাশে পাশে আকর গ্রন্থগুলির নামও সংক্ষেপে উল্লিখিত হল। এর দ্বারা তাঁর পারিবারিক চিন্তাধারা এবং তাঁর নিজের মৌলিকতা বোঝা সহজ হবে।

রবীন্দ্ররচনায় ব্যবহৃত শ্লোকগুলিকে আবার প্রকৃতি-অনুযায়ী পূর্ণ উদ্‌ধৃতি, আংশিক উদ্‌ধৃতি, প্রত্যক্ষ উল্লেখ, পরোক্ষ উল্লেখ এবং অনুবাদ—এই পাঁচটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে সাজানো হয়েছে। পরোক্ষ উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা যায়, যেখানে যেখানে এই উল্লেখগুলিকে ভাষায় বা ভাবে কোনো বিশেষ গ্রন্থের বিশেষ শ্লোকের অন্তর্গত বলে নিঃসংশয়ে চেনা গেছে, শুধুমাত্র সেইগুলিকেই এ স্থানে সংকলন করা হয়েছে।

বেদ-উপনিষদ্‌, মনুসংহিতা প্রভৃতি কোনো কোনো গ্রন্থোক্ত শ্লোকের এবং কতকগুলি প্রকীর্ণ শ্লোকের কবিকৃত এমন কিছু অনুবাদ পাওয়া যায় যা তাঁর রচিত সাহিত্যে স্থান পায় নি। ওই শ্লোকের সবগুলি কবির স্বেচ্ছায় অনূদিত নয়, কোনো বিশেষ প্রয়োজনে বা কারও অনুরোধক্রমে অনূদিত। সুতরাং রবীন্দ্রমানসের সংস্পর্শে এলেও সেগুলি রবীন্দ্রসংস্কৃতির অঙ্গ রূপে স্বীকার্য নয়, বর্তমান নিবন্ধের পক্ষেও তা অনাবশ্যক। তাই সেগুলিকে এই গ্রন্থে স্থান দেওয়া হল না। রবীন্দ্ররচনায় প্রাপ্ত শ্লোকের অনুবাদই শুধু সংকলিত হল। অন্যান্য অনুবাদের প্রসঙ্গ প্রয়োজনমতো যথাস্থানে উল্লিখিত হল মাত্র। বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত 'রূপান্তর' গ্রন্থের গ্রন্থপরিচয়ে এইসব অনুবাদের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আছে।

সংকলন-প্রণালীর প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। এই নিবন্ধের প্রথম

খণ্ডের প্রথম পর্বের অন্তর্গত সাহিত্যগুলি কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয় ; সেগুলি সমগ্রভাবে ভারতীয় জনমানসের সৃষ্টি। সুতরাং একই শ্লোক বিভিন্ন গ্রন্থে একাধিকবার উল্লিখিত হতে দেখা যায়। সেই কারণে উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে একই শ্লোক এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে তার উল্লেখের দীর্ঘ তালিকা বিভিন্ন গ্রন্থের প্রসঙ্গে বারংবার উদ্‌ধৃত না করে এই সংকলনের বিন্যাস-অনুযায়ী প্রথম যে গ্রন্থে শ্লোকটি দেখা গেছে সেই স্থানে শ্লোকটির পূর্ণ রূপ ও তার তালিকা দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে ওই শ্লোকের প্রসঙ্গে প্রথম গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যাটিই উদ্‌ধৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ঋগ্‌বেদের 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়াঃ' ইত্যাদি শ্লোকটি (১৷১৬৪৷২০) ধরা যাক। এই শ্লোকটি অথর্ববেদ (৯৷৯৷২০), শ্বেতাশ্বতর (৪৷৬) ও মুণ্ডকোপনিষদে (৩৷১৷১) দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে ঋগ্‌বেদের প্রসঙ্গে শ্লোকটির পূর্ণ পরিচয় দিয়ে তার পাদটীকায় উক্ত শ্লোক অন্য যে যে গ্রন্থে পাওয়া গেছে শ্লোকসংখ্যাসহ তারও তালিকা দেওয়া হয়েছে। পরে অথর্ববেদ, শ্বেতাশ্বতর ও মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত শ্লোকের প্রসঙ্গে ঋগ্‌বেদের শ্লোকসংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে। অনুরূপভাবেই প্রাচীন ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের 'আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি' ইত্যাদি যে শ্লোকটি যথাক্রমে মহাভারত, মনুসংহিতা, চাণক্যশ্লোক, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, গরুড়পুরাণ, ধর্মবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা গেছে, শুধুমাত্র মহাভারতের প্রসঙ্গে সেই শ্লোকটির পূর্ণ বিবরণ দিয়ে পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে মহাভারতের শ্লোকসংখ্যাই উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পর্বে আলোচিত গ্রন্থগুলিতেও কখনও কখনও একই শ্লোক একাধিক গ্রন্থে পাওয়া যায়, এ স্থলে সেগুলিও এই পদ্ধতিতেই বিন্যস্ত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, পাদটীকায় প্রদত্ত শ্লোকগুলির সব কটিতে সংকলিত শ্লোকের পূর্ণ রূপ পাওয়া যায় না, বিশেষ বিশেষ অংশমাত্র দেখা যায়। প্রয়োজন -মতো যথাস্থানে এগুলি নির্দেশ করা হলেও সর্বত্র তা করা সম্ভব হয় নি। এ ক্ষেত্রে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বেদ-উপনিষদ্ থেকে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে মহাভারত, গীতা, বিভিন্ন সংহিতা ও নানা তন্ত্র গ্রন্থ থেকে শ্লোক সংগ্রহ করেছেন। তবে তিনি এই শ্লোকগুলিকে যথাযথভাবে সংকলন করেন নি। তিনি এই 'বচনসকলকে স্বস্থান হইতে ছিন্ন করিয়া আপনার মনোমতভাবে পুনর্গ্রথিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন (সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী-সম্পাদিত 'ব্রাহ্মধর্ম' ১৯৩৭, প্রথম পরিশিষ্ট)। সুতরাং এই গ্রন্থের অনেক শ্লোক বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে গৃহীত নানা বিচ্ছিন্ন মন্ত্রাংশের সমাবেশ। আবাল্য 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে অভ্যস্ত রবীন্দ্রনাথ অনেক সময়ে এই গ্রন্থে মন্ত্রগুলি যেভাবে গ্রথিত আছে, সেইভাবেই মন্ত্রগুলিকে

ব্যবহার করেছেন। তাই যেখানে ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে কোনো শ্লোকের অংশবিশেষ মাত্র পাওয়া যায় সেখানে এই সংকলনে শ্লোকের পূর্ণ রূপটির পাশে ব্রা. অক্ষর না বসিয়ে প্রয়োজন অনুসারে আংশিক উদ্‌ধৃতির পাশে ব্রা. লিখিত হল। নবরত্নমালা ইত্যাদি রবীন্দ্র-ব্যবহৃত অন্য সংকলন গ্রন্থগুলির ক্ষেত্রেও আবশ্যকমতো এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

রবীন্দ্র ব্যবহৃত শ্লোকের উৎস-নির্ণয় প্রসঙ্গে বলা যায়, বেদ উপনিষদ্ গীতা প্রভৃতি প্রামাণ্য শাস্ত্র গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা বিভিন্ন সংস্করণেও বিশেষ পরিবর্তিত হয় না। তবে অথর্ব বেদ, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থের কয়েকটি সংস্করণে শ্লোকসংখ্যার ভেদ দেখা গেছে। তেমনি রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণে পাঠভেদ প্রচুর, তার শ্লোকসংখ্যাও অভিন্ন নয়। সুতরাং বর্তমান গ্রন্থে ধৃত উপাদান-গুলির যে শ্লোকসংখ্যা দেওয়া আছে, তা যে সংস্করণ থেকে গৃহীত পরবর্তী উৎস-নির্দেশে তার তালিকা দেওয়া হল। আবার সংস্কৃত শ্লোকাংশগুলির প্রসঙ্গে সমগ্র শ্লোকটিই উৎকলিত হয়েছে। কিন্তু বৈষ্ণব বা বাউলের সুদীর্ঘ পদগুলি সমগ্রভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সে ক্ষেত্রে পদগুলির প্রথম পঙ্‌ক্তিমাত্র উদ্‌ধৃত করা হল। আশা করি এর দ্বারা গানগুলির পরিচয় বোঝা সহজ হবে, কেননা এগুলির কোনো বিশেষ প্রামাণ্য গীতসংখ্যা প্রচলিত নেই।

উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রথমে এক একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা যুক্ত করে সংকলিত উপাদান সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পরিস্ফুট করতে সচেষ্ট হয়েছি। বোধ করি তাতে সংকলিত উপাদান অথবা সংকলন পদ্ধতির তাৎপর্যগ্রহণে সহায়তা হবে। যেসব ক্ষেত্রে উক্তপ্রকার বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় নেই, সেসব ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকাও যুক্ত হয় নি। এ ছাড়া ক্ষীণ স্মৃতিবশত যে শ্লোকগুলির যথাযথ উৎস কবি নির্দেশ করতে পারেন নি, সেগুলিও যথাস্থানে উল্লিখিত হল। বিভিন্ন সংস্করণের সঙ্গে রবীন্দ্র-উদ্‌ধৃত শ্লোকের পাঠভেদও প্রয়োজন মতো নির্দেশ করা হয়েছে। রবীন্দ্র-গৃহীত পাঠগুলি অবশ্য সর্বত্র ভুল না হতে পারে। কবি কোন্ সংস্করণ ব্যবহার করতেন তা না জানা পর্যন্ত এ সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কোনো মত প্রকাশ করতে সাহসী হই নি।

এবার এই সংকলন বিভাগে ব্যবহৃত শব্দ-সংকেতগুলির পূর্ণ পরিচয় দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। প্রথমে রবীন্দ্র-ব্যবহৃত সংকলন গ্রন্থগুলির এবং পরে অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থগুলির শব্দ-সংকেতের বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল।

শব্দ-সংকেত

রবীন্দ্র-ব্যবহৃত সংকলন গ্রন্থ

উপ.	উপনিষৎ-সংগ্রহ
কা.	বাংলাকাব্য-পরিচয়
নব.	নবরত্নমালা
পদ.	পদরত্নাবলী
বঙ্গ	বঙ্গবীণা
ব্রা.	ব্রাহ্মধর্ম
রত্ন.	রত্নমালা
হস্ত.	হস্তসার
হারা.	হারামণি
হে.	হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহ

অন্যান্য মূল সংস্কৃত গ্রন্থ

অথর্ব	অথর্ববেদ
ঈশা	ঈশোপনিষদ্
ঋ	ঋগ্বেদ
ঐত	ঐতরেয়োপনিষদ
ঐ. ব্রা	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
কঠ	কঠোপনিষদ্
কেন	কেনোপনিষদ
গরুড	গরুড পুরাণ
চাণক্য	চাণক্যশ্লোক
ছান্দো	ছান্দোগ্য উপনিষদ্
ছান্দো. ব্রা.	ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ
তৈত্তি	তৈত্তিরীয় উপনিষদ্
তৈ. আ.	তৈত্তিরীয় আরণ্যক
তৈ. ব্রা	তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ
তৈ. স	তৈত্তিরীয় সংহিতা
ধর্ম	ধর্মবিবেক
প. কা.	পঞ্চতন্ত্র : কাকোলূকীয়ম্
প. মি.	পঞ্চতন্ত্র : মিত্রভেদ
প. অপ	পঞ্চতন্ত্র : অপরীক্ষিতকারকম্
প. মি. স	পঞ্চতন্ত্র : মিত্র সম্প্রাপ্তি
বৃহ	বৃহদারণ্যক উপনিষদ্
মনু	মনুসংহিতা
মহা	মহাভারত
মহানা	মহানারায়ণোপনিষদ্
মাণ্ডুক্য	মাণ্ডূক্য উপনিষদ্
মুণ্ডক	মুণ্ডকোপনিষদ্
মৈ. স	মৈত্রায়ণী সংহিতা
য. তৈ. কা.	কৃষ্ণযজুর্বেদ, তৈত্তিরীয় সংহিতা, কাণ্বশাখা
য. বা. কাণ্ব	শুক্লযজুর্বেদ বাজসনেয়ী সংহিতা, কাণ্বশাখা
য. বা. মা	শুক্লযজুর্বেদ, বাজসনেয়ী সংহিতা, মাধ্যন্দিনী শাখা

যোগ ··· যোগবাশিষ্ঠ

শ. ব্রা. ··· শতপথ ব্রাহ্মণ

শার্ঙ্গ ·· শার্ঙ্গধর পদ্ধতি

শ্বেতা ··· শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্

সাম ··· সামবেদ

সুভা ·· সুভাষিতাবলী (বল্লভদেব)

হি. কথা ··· হিতোপদেশ : কথামুখ

হি. বি. ··· হিতোপদেশ : বিগ্রহ

হি মি. ··· হিতোপদেশ : মিত্রলাভ

হি. স. ··· হিতোপদেশ : সন্ধি

বৈদিক সাহিত্য

সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক

বৈদিক সাহিত্য বলতে সাধারণভাবে আমরা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্‌কে বুঝি। দেবতার স্তুতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা সংহিতার বিষয়। সংহিতার বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও যজ্ঞীয় ক্রিয়াকর্মের বিশদ বিবরণ ব্রাহ্মণগুলির উপজীব্য। ব্রাহ্মণের অন্ত্য ভাগ আরণ্যক ও উপনিষদ। আরণ্যকে সংহিতার জ্ঞানগত উক্তির সঙ্গে মিশেছে ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকর্মের বিধি। আর বেদান্ত বা উপনিষদ হল বৈদিক সাহিত্যের সার যার উপজীব্য 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। এ স্থলে রবীন্দ্র ব্যবহৃত বৈদিক সংহিতার মন্ত্রগুলি সংকলিত হল। সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের মন্ত্রগুলিও দেওয়া হল। কেননা রবীন্দ্রসাহিত্যে সেগুলির উপাদান স্বল্প। রবীন্দ্ররচনায় উপনিষদের উপকরণ সব চেয়ে বেশি বলে সেগুলিকে পৃথক করে রাখা হয়েছে।

বেদের রচনাকাল নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। তবে ঋগ্‌বেদ যে প্রাচীনতম এবং অথর্ববেদ সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন এ কথা সর্ববাদিসম্মত। এখানেও ঋক, যজুঃ ও অথর্বকে কালক্রম অনুযায়ী সাজানো হল। এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে ব্যবহৃত বৈদিক মন্ত্রগুলির অধিকাংশই মহর্ষি সংকলিত ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে পাওয়া যায়। যথাস্থানে সে মন্ত্রগুলি এ অক্ষরে চিহ্নিত করা হল। কবির শেষ জীবনের রচনায় প্রাপ্ত শ্লোকের বেশির ভাগই ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর প্রবর্তনায় উৎকলিত। এই শ্লোকের অনেকগুলি আবার ক্ষিতিমোহনের বিভিন্ন রচনায় উৎসসহ উদ্ধৃত আছে। কিন্তু তাঁর উল্লিখিত মন্ত্রসংখ্যা (বিশেষতঃ অথর্ববেদের মন্ত্রসংখ্যা) বেদের প্রচলিত সংস্করণগুলিতে পাওয়া যায় নি। সম্ভবত, বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে রক্ষিত ম্যাক্সমূলর সম্পাদিত অথর্ববেদের যে সংস্করণটি ক্ষিতিমোহন ব্যবহার করতেন তার মন্ত্রসংখ্যাই তিনি তাঁর রচনায় উল্লেখ করেছেন। তবে বর্তমানে অতি জীর্ণ সেই সংস্করণটি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় না। এই তালিকায় বৈদিক সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের শ্লোকসংখ্যা উৎস নির্দেশে উল্লিখিত সংস্করণ অনুযায়ী দেওয়া হল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে সামবেদ, তৈত্তিরীয় সংহিতা, শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতার কাণ্ব শাখা এবং শতপথ ব্রাহ্মণ এই মূল গ্রন্থগুলি দেখার সুযোগ হয় নি। এই সব গ্রন্থের অন্তর্গত শ্লোকগুলির উৎস Maurice Bloomfield সংকলিত A Vedic Concordance নামক গ্রন্থ (Vol X, 1906) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

মূল বৈদিক সংহিতাগুলিতে শান্তিবচনের উল্লেখ দেখা যায় না। এগুলি নিঃসন্দেহে পরবর্তী কালের যোজনা। তবে মহর্ষি তাঁর 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে শান্তিবচন সংকলন করেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই শান্তিবচনের ব্যবহার দেখা গেছে। সেই কারণেই এ স্থলে বিভিন্ন সংহিতার সঙ্গে প্রচলিত শান্তিবচনগুলিও সংকলন করে তার তালিকা দেওয়া হল।

এই সংকলনে উদ্ধৃত শ্লোকগুলির পাশে পাশে যে সংখ্যাগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি যথাক্রমে মূল গ্রন্থের বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগ ও শ্লোকের সংখ্যা-অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। এ স্থলে সেই বিভাগগুলির পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হল।—

ঋগ্‌বেদ ..	মণ্ডল, সূক্ত, ঋক
যজুর্বেদ, বাজসনেয়ী সংহিতা, মাধ্যন্দিনী শাখা	অধ্যায়, মন্ত্র
অথর্ববেদ	কাণ্ড, সূক্ত, মন্ত্র
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	পঞ্চিকা, অধ্যায়, খণ্ড
ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ	অধ্যায়, খণ্ড, মন্ত্র
তৈত্তিরীয় আরণ্যক	প্রপাঠক, অনুবাক, মন্ত্র

ঋগ্‌বেদ

যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন।
স ধীনাং যোগমিন্বতি॥ ১।১৮।৭

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'আত্মপরিচয়, অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ। ১৯৪০

তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ১।২২।২০ ব্রা. ধ.

আংশিক উদ্ধৃতি দিবীব চক্ষুরাততম্

'শান্তিনিকেতন' ২, আত্মবোধ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্॥ ১।৫০।১

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'তপতী' ১৯২৯, ৪-ধ্রুবতীর্থ। মার্তণ্ডমন্দির

অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ
সূরায় বিশ্বচক্ষসে॥ ১।৫০।২

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'তপতী' ১৯২৯, ৪-ধ্রুবতীর্থ। মার্তণ্ডমন্দির

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টু বাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥ ১।৮৯।৮

আংশিক উদ্ধৃতি ভদ্রং কর্ণেভিঃ ...পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ [1]

'শিক্ষা', জাতীয় বিদ্যালয় ১৩১৩ ভাদ্র। ১৯০৬

মধু বাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ॥
মধু নক্তমুতোষসো, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্নো বনস্পতিঃ, মধুমান অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥[2] ১।৯০।৬-৮

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'চারিত্র পূজা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-২, ১৩১১ মাঘ। ১৯০৫

শান্তিনিকেতন' ২, মাতৃশ্রাদ্ধ

আংশিক উদ্ধৃতি মধু বাতা ঋতায়তে...মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ

'ধর্ম', বর্ষশেষ ১৩০৮ চৈত্র। ১৯০২

'শান্তিনিকেতন'১, বৈরাগ্য ১৩১৫ ফাল্গুন ১৫। ১৯০৯

মধু দ্যৌঃ, মধু নক্তম্, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ

'শান্তিনিকেতন' ১, ছুটির পর

মধু বাতা ঋতায়তে

'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ১২,১৯২৭ সেপ্টেম্বর ৮

মধুমৎ পার্থিবং রজঃ

'প্রহাসিনী', মধুসন্ধায়ী -৩, ১৯৪০ মার্চ

পরোক্ষ উল্লেখ 'পত্রপুট', ৫-সংখ্যক কবিতা ১৯৩৫ অকটোবর

'আরোগ্য', ১-সংখ্যক কবিতা ১৯৪১ ফেব্রুআরি

অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য
নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ।

১ সাম ১৮৭৪, য. বা. মা. ২৫।২১, অথর্ব. শান্তিপাঠ, তৈ. আ. ১।১।১, মুণ্ডক. শান্তিপাঠ, মাণ্ডুক্য. শান্তিপাঠ, প্রশ্ন. শান্তিপাঠ।

২ য. বা. মা. ১৩।২৭-২৯, তৈ. সং ৪।২।৯।৩, তৈ. আ. ১০।১০।২, শ. ব্রা. ১৪।৯।৩।১১-১৩, বৃহ. ৬।৩।৬, বৃহ ৬।৪।২৫।

তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তা-
মদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ১।১১৫।৬

আংশিক উদ্ধৃতি অস্যা দেবা নিবধ্যাৎ
'তপতী' ১৯২৯, ৪ ধ্রুবতীর্থ। মার্তণ্ডমন্দির

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
-নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ১।১৬৪।২০ ব্রা. নব

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'বিচিত্র প্রবন্ধ', মন্দির ১৩১০ পৌষ। ১৯০৩

আংশিক উদ্ধৃতি দ্বা সুপর্ণা সযুজা পরিষস্বজাতে
'শান্তিনিকেতন' ১, প্রেমের অধিকার ১৩১৫ পৌষ ১৭। ১৯০৯

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
'শান্তিনিকেতন' ২, সংহিত ১৩১৬ চৈত্র ২৩। ১৯১০

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'জাপানযাত্রী', অধ্যায় ২, ১৩২৩ বৈশাখ ২০। ১৯১৬
'The Religion of Man', 1931, The Artist

পরোক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ১, [illegible] ১৩১৫ ফাল্গুন ২০। [illegible]

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরা সুব।
[illegible] ৫।৮২।৫ [illegible]

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম', প্রথম কার্যপ্রণালী ১৩০৯। ১৯০২
'শান্তিনিকেতন' ২, দ্বিধা (দুবার) ১৯১০ অক্টোবর

আংশিক উদ্ধৃতি বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব
'শান্তিনিকেতন' ২ আত্মবোধ (দুবার) ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১
'শান্তিনিকেতন' ২, পাপের মার্জনা ১৩২১ ভাদ্র ৯। ১৯১৪

বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব
'শান্তিনিকেতন' ১, পাপ ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ২৫
'পথের সঞ্চয়', আমেরিকার চিঠি ১৩১৯ ফাল্গুন। ১৯১৩
'শান্তিনিকেতন' ২, পাপের মার্জনা (তিন বার) ১৩২১ ভাদ্র ৯
১৯১৪

১ অথর্ব ৯।৯।২০, শ্বেতা ৪।৬, মুণ্ডক ৩।১।১

২ য বা সা. ৩০।৩, তৈ. ব্রা. ২।৪।৬।৩, তৈ আ ১০।১০।২।

যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব

'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম', প্রথম কার্যপ্রণালী ১৩০৯ কার্তিক। ১৯০২

'শান্তিনিকেতন' ১, নিয়ম ও মুক্তি ১৩১৫ চৈত্র ৩০। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, দ্বিধা (দু বার) ১৯১০ অক্টোবর

'সাহিত্যের পথে', পঞ্চাশোর্ধ্বম ১৩৩৬ ফাল্গুন। ১৯৩০

'খৃস্ট', খৃস্ট ১৯৩৬ ডিসেম্বর

যদ্ ভদ্রং তন্ন

'শান্তিনিকেতন' ২, পাপের মার্জনা ১৩২১ ভাদ্র ৯। ১৯১৪

অভ্রাতৃব্যো অনাত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি।

যুধেদাপিত্বমিচ্ছসে ॥[১] ৮।২১।১৩

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ। ১৯৪০

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যং নমোভিঃ ব্রা

বিশ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ

আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥[২] ১০।১৩।১

আংশিক উদ্ধৃতি শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য দিব্যানি তস্থুঃ। ব্রা. শব

'ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ৯, ১৩০৩ আশ্বিন (?) । ১৮৯৬

'শান্তিনিকেতন' ১, নবযুগের উৎসব (৬ বার) ১৯০৯ এপ্রিল

'শান্তিনিকেতন' ২, অমৃতের পুত্র (পাঁচ বার) ১৩২১ মাঘ। ১৯১৫

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ

'শান্তিনিকেতন' ১, নবযুগের উৎসব ১৯০৯ এপ্রিল

'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ৯, ১৩৩০ পৌষ। ১৯২৩

শৃণ্বন্তু বিশ্বে

'শান্তিনিকেতন' ১, নবযুগের উৎসব ১৯০৯ এপ্রিল

'ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ৬, ১৩৩৮ মাঘ। ১৯৩২

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ৩

১ সাম ৩৯৯, ১৩৮৯, অথর্ব ২০।১১৪।১

২ য বা মা. ১১।৫, অথর্ব ১৮।৩।৩৯, তৈ. সং. ৪।১।১।২, শ্বেতা ২।৫

'চারিত্রপূজা', ভারতপথিক রামমোহন রায় ১৩৪০ পৌষ। ১৯৩৩

অমৃতস্য পুত্রাঃ

'শান্তিনিকেতন' ২, জাগরণ ১৯১১ জানুআরি

'সঞ্চয়', নামকরণ ১৩১৮ চৈত্র। ১৯১২

'শান্তিনিকেতন' ২, সৃষ্টির অধিকার ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪

'জাপানযাত্রী' ১৯১৯, অধ্যায় ১০

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-২৯ হেমন্তবালাদেবীকে লেখা ১৯৩১ জুলাই

পরোক্ষ উল্লেখ 'বিচিত্র প্রবন্ধ', লাইব্রেরি ১২৯২ পৌষ। ১৮৮৫

'শান্তিনিকেতন' ২, চিরনবীনতা

'খৃস্ট', যিশুচরিত ১৯১০ ডিসেম্বর

'শান্তিনিকেতন' ২, আবো ১৩২১ পৌষ ৭। ১৯১৪

'শান্তিনিকেতন' ২, মাধুর্যের পরিচয় ১৩২১ মাঘ ১১। ১৯১৫

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১

আপো অস্মান মাতরঃ শুংধয়ন্তু[১]
ঘৃতেন নো ঘৃতপ্বঃ পুনন্তু।
বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবী-
রুদিদাভ্যঃ শুচিরা পূত এমি॥ ১০।১৭।১০

আংশিক উদ্‌ধৃতি আপো অস্মান মাতরঃ শুদ্ধযন্তু[২]

'পল্লীপ্রকৃতি', জলোৎসর্গ ১৩৪৩ ভাদ্র। ১৯৩৬

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'পল্লীপ্রকৃতি', জলোৎসর্গ ১৩৪৩ ভাদ্র। ১৯৩৬

অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ
পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্।
জ্যোক পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম্
অনুমতে মৃডয়া নঃ স্বস্তি॥ ১০।৫৯।৬

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ। ১৯৪০

পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥[৩] ১০।৯০।২

---

১ য. বা. মা ৪।২, য তৈ কা. ১।২।১।১, অথব ৬।৫১।২

২ রবীন্দ্রনাথ 'শুংধয়ন্তু' স্থলে লিখেছেন 'শুদ্ধযন্তু'।

৩ সাম ৬১৯, য. বা মা. ৩১।২, অথর্ব ১৯।৬।৪, তৈ. আ. ৩।১২।১, শ্বেতা ৩।১৫

আংশিক উদ্‌ধৃতি পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্‌

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১

এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।

পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥[১] ১০।৯০।৩

আংশিক উদ্‌ধৃতি পাদোঽস্য বিশ্বা · দিবি

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১

ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১

ত্রিপাদস্যামৃতং

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ৩

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদবাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।

ঊরূ তদস্য যদ্‌বৈশ্যঃ পদ্‌ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥[২] ১০।৯০।১২

পরোক্ষ উল্লেখ 'পরিচয়', হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ১৩১৮ অগ্রহায়ণ। ১৯১১

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব

উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।

যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥[৩] ১০।১২১।২ নব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি আত্মদা বলদা

'শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

'শান্তিনিকেতন' ২, একটি মন্ত্র (দু বার) ১৩২০ মাঘ ১৫। ১৯১৪

আত্মদা

'শান্তিনিকেতন' ২ দুর্লভ ১৯১০ অকটোবর

'শান্তিনিকেতন' ২ একটি মন্ত্র ১৩২০ মাঘ ১৫। ১৯১৪

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

আংশিক উদ্‌ধৃতি যস্য ছায়ামৃতং···বিধেম

১ য বা. মা. ৩১।৩, অথর্ব ১৯।৬।৩ (পাঠ ঈষৎ পরিবর্তিত), তৈ. আ. ৩।১২।১

২ য. বা. মা. ৩১।১১, অথর্ব ১৯।৬।৬, তৈ আ. ৩।১২।৫

৩. য. বা. মা ২৫।১৩, অথর্ব ৪।২।১, ১৩।৩।২৪ (অথর্বের পাঠ ঈষৎ পরিবর্তিত), তৈ. সং. ৪।১।৮।৪, ৭।৫।১৭।১

'ধর্ম', দুঃখ ১৩১৪ ফাল্গুন। ১৯০৮

যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ

'শান্তিনিকেতন' ১ বর্ষশেষ ১৩১৫ চৈত্র ৩১। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৯১০ জানুআরি

'চিঠিপত্র' ২, পত্র-৭ রথীন্দ্রনাথকে লেখা ১৯১২

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম[১]

'কালান্তর', বাতায়নিকের পত্র, পরিচ্ছেদ-৩, ১৩২৬ আষাঢ়। ১৯১৯

'চিঠিপত্র' ৯,পত্র-২ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৩৩৭ চৈত্র ২৯। ১৯৩১

'The Religion of Man' 1931, Spiritual Union

'শিক্ষা', বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ : ভাষণ ১৯৩২ ডিসেম্বর

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্॥
ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম।
অমন্তবো মাং ত উপ ক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥ ১০।১২৫।৩-৫

পূর্ণ অনুবাদ 'বাংলাভাষা-পরিচয়' ১৯৩৮, অধ্যায় ১

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেন
অথা কো বেদ যত আবভূব॥ ১০।১২৯।৬

আংশিক উদ্ধৃতি অথ কো বেদ যত আবভূব

'বিবিধ প্রসঙ্গ', প্রকৃতি পুরুষ ১২৮৮ চৈত্র। ১৮৮২

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
ৎসো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥[২] ১০।১২৯।৭

---

১ ঋ ১০। ১২১।১-৯, অথর্ব. ৪।২।১-৮, শ্বেতা ৪।১৩

২ তৈ ব্রা. ২।৮।৯।৬

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'বিবিধ প্রসঙ্গ', প্রকৃতি পুরুষ ১২৮৮ চৈত্র। ১৮৮২

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।

দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে ॥[১] ১০।১৯১।২

আংশিক উদ্‌ধৃতি সং গচ্ছধ্বং…জানতাম্

'চারিত্রপূজা', ভারতপথিক রামমোহন রায় ১৩৪০ পৌষ ১৪ । ১৯৩৩

শান্তিবচন

ওঁ বাঙ্‌মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা…আবিরাবীর্ম এধি, বেদস্য

ম আনীস্থঃ…ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি…

অবতু মাম্, অবতু বক্তারম্, অবতু বক্তারম্ ॥[২]

আংশিক উদ্‌ধৃতি আবিরাবীর্ম এধি। ব্রা.

'ধর্ম', নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ। ১৯০২

'ধর্ম', ধর্মের সরল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ। ১৯০৩

'চারিত্রপূজা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-১, ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ ৩। ১৯০৪

'ধর্ম', প্রার্থনা (দু বার) ১৩১১ আষাঢ। ১৯০৪

'ধর্ম', দুঃখ (দু বার) ১৩১৪ ফাল্গুন। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ১, প্রার্থনা (দু বার) ১৩১৫ পৌষ ৩। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ২, আত্মবোধ (নয় বার) ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

'পথের সঞ্চয়', সীমার সার্থকতা ১৩১৯ আশ্বিন। ১৯১২

'সাহিত্যের পথে', কবির কৈফিয়ত ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ। ১৯১৫

'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ৭, ১৩৩০ বৈশাখ। ১৯২৩

'ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ৭, ১৩৩৫ ভাদ্র। ১৯২৮

'রাশিয়ার চিঠি', পরিশিষ্ট : পল্লীসেবা ১৩৩৭

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১

শুক্ল যজুর্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতা, মাধ্যন্দিনী শাখা

আপো অস্মান্ মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু… ॥ ৪।২ দ্র. ঋ. ১০।১৭।১০

তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং… ॥ ৬।৫ দ্র. ঋ. ১।২২।২০

১ অথর্ব ৬।৬৪।১ (ঈষৎ পরিবর্তিত), তৈ. ব্রা. ২।৪।৪।৪

২ ঐত. শান্তিপাঠ

যুজে বা ব্রহ্ম পূর্ব্যং… ॥ ১১।৫ দ্র. ঋ. ১০।১৩।১
মধু বাতা ঋতায়তে… ॥ ১৩।২৭-২৯ দ্র. ঋ. ১।৯০।৬-৮
নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥[১] ১৬।৪১ ব্রা.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'ধর্ম', প্রাচীন ভারতের একঃ ১৩০৮ ফাল্গুন। ১৯০২
'শান্তিনিকেতন' ২, দ্বিধা[২] (দু বার) ১৯১০ অক্টোবর

আংশিক উদ্ধৃতি নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ
নমঃ শিবায় চ শিবতবায় চ
'শান্তিনিকেতন', ছোটো ও বড়ো[২] ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪
নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ
'শান্তিনিকেতন' ১, দুঃখ[২] ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ২৬। ১৯০৮
'শান্তিনিকেতন' ১, ভয় ও আনন্দ[২] ১৩১৫ চৈত্র ২৯। ১৯০৯
নমঃ শিবায় চ শিবতবায় চ
'শান্তিনিকেতন' ২, দ্বিধা (দু বার) ১৯১০ অকটোবর
'পথের সঞ্চয়', আমেরিকার চিঠি ১৩১৯ ফাল্গুন। ১৯১৩
য আত্মদা বলদা ॥ ২৫।১৩ দ্র. ঋ. ১০।১২১।২
ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ॥ ২৫।২১ দ্র. ঋ. ১।৮৯।৮
বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি… ॥ ৩০।৩ দ্র. ঋ.৫।৮২।৫
পুরুষ এবেদং ভাব্যম্[৩] … ॥ ৩১।২ দ্র. ঋ. ১০।৯০।২
এতাবানস্য মহিমাতো ॥ ৩১।৩ দ্র. ঋ. ১০।৯০।৩
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ… ॥ ৩১।১১ দ্র. ঋ. ১০।৯০।১২
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥[৪] ৩১।১৮ ব্রা. নব.

১ তৈ. স. ৪।৫।৮।১, মৈ. সং ২।৯।৭, ২।১২৬।৪; য. বা কাণ্ব ১৭।৬।৫
২ এই প্রবন্ধ চারটিতে কবি 'শম্ভবায়' স্থলে 'সম্ভবায়' লিখেছেন।
৩ ঋগ্‌বেদে 'ভাব্যম্' স্থলে পাই 'ভব্যম্'।
৪ তৈ. আ. ৩।১২।৭, ৩।১৩।১, শ্বেতা. ৩।৮

আংশিক উদ্ধৃতি বেদাহমেতং তমসঃ পরস্তাৎ

'ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ৯, ১৩০৩ (আশ্বিন ?)। ১৮৯৬

'ধর্ম', প্রাচীন ভারতের একঃ ১৩০৮ ফাল্গুন। ১৯০২

'ধর্ম', ধর্মপ্রচার ১৩১০ ফাল্গুন। ১৯০৪

'ধর্ম', উৎসবের দিন ১৩১১ মাঘ। ১৯০৫

'শান্তিনিকেতন' ১, নবযুগের উৎসব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, ছোটো ও বড়ো (দু বার) ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪

'ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ৮, ১৩২২ কার্তিক। ১৯১৫

'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১৯, ১৩৪৭ শ্রাবণ। ১৯৪০

তমেব বিদিত্বাতি অয়নায়

'কালান্তর', স্বাধিকারপ্রমত্ত' ১৩২৪ মাঘ। ১৯১৮

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়

'চিঠিপত্র' ৬, পরিশিষ্ট ২, আচার্য জগদীশের জয়বার্তা ১৩০৮ আষাঢ়। ১৯০১

'শান্তিনিকেতন' ১, দ্রষ্টা ১৩১৫ ফাল্গুন ৬। ১৯০৯

'পথের সঞ্চয়', যাত্রার পূর্বপত্র ১৩১৯ আষাঢ়। ১৯১২

'কালান্তর', হিন্দু মুসলমান (কালিদাস নাগকে লেখা পত্র) ১৩২৯ শ্রাবণ। ১৯২২

অতিমৃত্যুমেতি

'শান্তিনিকেতন' ১, ফল ১৩১৫ ফাল্গুন ২০। ১৯০৯

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং

'শান্তিনিকেতন' ২, ছোটো ও বড়ো ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪

'শান্তিনিকেতন' ২, অমৃতের পুত্র ১৩২১ মাঘ ১০। ১৯১৫

মহান্তং পুরুষং তমসঃ পরস্তাৎ

'বুদ্ধদেব', বুদ্ধদেব ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ ৪। ১৯৩৫

মহান্তং পুরুষং

'শান্তিনিকেতন' ১, নবযুগের উৎসব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯

তমসঃ পরস্তাৎ

'শান্তিনিকেতন' ১, নবযুগের উৎসব (দু বার) ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, অমৃতের পুত্র ১৩২১ মাঘ ১০। ১৯১৫

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ৩

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১০, ১৩৩০ পৌষ ৭। ১৯২৩

বেদাহমেতং

'শান্তিনিকেতন' ১, নবযুগের উৎসব (দু বার) ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯

'সঞ্চয়', ধর্মশিক্ষা ১৩১৮ মাঘ। ১৯১২

'শান্তিনিকেতন' ২, আরো ১৩২১ পৌষ ৭। ১৯১৪

'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ৯, ১৩৩০ পৌষ। ১৯২৩

'খৃস্ট', মানব সম্বন্ধের দেবতা ১৯২৬ ডিসেম্বর

'The Religion of Man' 1931, The Creative Spirit

বেদাহম্

'শান্তিনিকেতন' ১, নবযুগের উৎসব (দু বার) ১৩১৫ মাঘ ১১ । ১৯০৯

'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১০, ১৩৩০ পৌষ ৭। ১৯২৩

'ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ৬, ১৩৩৫ মাঘ। ১৯২৯

'ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ১, ১৩৪০ পৌষ। ১৯৩৩

পরোক্ষ উল্লেখ 'পত্রপুট', ১০-সংখ্যক কবিতা ১৯৩৫ নভেম্বর ৭

বেনস্তৎপশ্যন্নিহিতং গুহা সদ্যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।

তস্মিন্নিদংসং চ বি চৈতি সর্বং স ওতঃপ্রোতশ্চ বিভূঃ প্রজাসু ॥[১] ৩২।৮

আংশিক উদ্ধৃতি যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্

'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ৭, ১৩৩০ বৈশাখ। ১৯২৩

'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১২, ১৩৩২ পৌষ। ১৯২৫

স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।

যত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত ॥[২] ৩২।১০

আংশিক উদ্ধৃতি স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা

১ য. বা. কাণ্ব ৩৫।৩৫, অথর্ব ২।১।১ (শ্লোকের প্রথমার্ধ, পাঠভেদ 'নীড়ম্' স্থলে 'রূপম্'), তৈ. আ. ১০।১।৩, মহানা. ২।৩

২ তৈ. আ. ১০।১।৪, মহানা. ২।৫

'শান্তিনিকেতন' ১, সামঞ্জস্য[১] ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ২৯। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ১, বিধান[১] ১৩১৫ পৌষ ২১। ১৯০৯

'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ২, ১৩৩৪ শ্রাবণ। ১৯২৭

'চিঠিপত্র' ৭, পত্র ১[১] কাদম্বিনী দেবীকে লেখা

চিঠিপত্র' ৯, পত্র ৫৮[১] হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ নভেম্বর

শ নো বন্ধুর্জনিতা

'খৃস্ট', মানবসম্বন্ধের দেবতা ১৯২৬ ডিসেম্বর

স এব বন্ধুঃ

'শান্তিনিকেতন' ১, বিধান ১৩১৫ পৌষ ২১। ১৯০৯

স এব বিধাতা

'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ২, ১৩৩৪ শ্রাবণ। ১৯২৭

'শান্তিনিকেতন' ১, বিধান ১৩১৫ পৌষ ২১। ১৯০৯

ভূর্ভুবঃ স্বঃ[১]

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥[৩] ৩৬।৩ ত্রা নব. [৪]

পূর্ণ উদধৃতি 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম', প্রতিষ্ঠা দিবসের উপদেশ ১৩০৮ পৌষ। ১৯০১

'ধর্ম', নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ। ১৯০২

'ধর্ম', ধর্মের সরল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ। ১৯০৩

'শান্তিনিকেতন' ১, সত্যকে দেখা ১৩১৫ চৈত্র ৩। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, ভক্ত ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯

আংশিক উদধৃতি ভূর্ভুবঃ স্বঃ

'ধর্ম', প্রাচীন ভারতের এক ১৩০৮ ফাল্গুন। ১৯০২

'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম', প্রথম কার্যপ্রণালী ১৩০৯ কার্তিক। ১৯০২

---

৭ বর্ণদ্বন্দ্ব ... দুটি ... স্থানে আছে ...।

১ ... বা ... ১২, ৩।৩৭, ।।২৯ ছান্দো ... ১।৬।৩১

৩ ... ।।৩।১, ... বা মা ৩।৩৫, ২২।৯ ৩০।২ সাম ১৪৬২, তৈ সং ১।৫।৬।৪ ; ৪।১।১১।১ তৈ. আ ... ।১।১।২, ছান্দ্য বা ।৬।৩০, বৃহ ৬।৩।৬, ৬।৪।২৫

৪ 'নবরত্নমালায়' পাঠ, তৎসবিতুর্ ... প্রচোদয়াৎ।

'ধর্ম', ধর্মের সরল আদর্শ (দ্র বার) ১৩০৯ মাঘ। ১৯০৩
'শান্তিনিকেতন' ১, শোনা ১৩১৫ পৌষ ৫। ১৯০৮
'শান্তিনিকেতন' ১, প্রভাতে ১৩১৫ পৌষ ১৫। ১৯০৮
'শান্তিনিকেতন' ১, পবশরতন ১৩১৫ ফাল্গুন ১২। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ১, বিশ্বাস ১৩১৫ ফাল্গুন ১৬। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ১, সত্যকে দেখা ১৩১৫ চৈত্র ৩। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ১, ওঁ (দ্র বার) ১৩১৫ চৈত্র ১৫। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ২, ভক্ত ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯
'জীবনস্মৃতি' ১৯১২, পিতৃদেব
'সঞ্চয়', ধর্মের নবযুগ ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১২
'শান্তিনিকেতন' ২, সত্যবোধ ১৩১৯। ১৯১২
'শান্তিনিকেতন' ২, একটি মন্ত্র ১৩২০ মাঘ ১৫। ১৯১৪
'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', অধ্যায় ৩, ১৩৪০ আশ্বিন। ১৯৩৩

ধিযো যো নঃ প্রচোদযাৎ

'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম', প্রথম কার্যপ্রণালী ১৩০৯ কার্তিক। ১৯০২
'শান্তিনিকেতন' ১, নমস্তেঽস্তু ১৩১৫ চৈত্র ২৬। ১৯০৯
'কালান্তর', সমস্যা ১৩৩০ অগ্রহায়ণ। ১৯২৩
'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', পরিশিষ্ট ১৯২৪ সেপ্টেম্বর ২৬

ধিযঃ, বরেণ্যং ভর্গ

'শান্তিনিকেতন' ২, ভক্ত ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯

পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু
মা মা হিংসীঃ ত্বষ্টৃমন্তস্ত্বা সপেম। ব্রা[১]
পুত্রান্‌পশূন্‌ময়ি ধেহি প্রজামস্মাসু
ধেহ্যরিষ্টাহং সহ পত্যা ভূয়াসম্‌ ॥[২] ৩৭।২০

আংশিক উদ্ধৃতি পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু

'শান্তিনিকেতন' ১, মন্ত্রের বাঁধন ১৩১৫ চৈত্র ২৭। ১৯০৯

১ 'ব্রাহ্মধর্মে' আছে, পিতা নোঽসি…হিংসীঃ

২ শ. ব্রা ১৪।১।৪।৫, তৈ. আ ৪।৭।৪, ৪।১০।৫, ৫।৬।৯, ৫।৮।১২, 'নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ' দ্র. ছান্দো. ব্রা. ১।৭।৯

'শান্তিনিকেতন' ২, ভক্ত ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ২, দ্বিধা ১৯১০ অক্টোবর
'শান্তিনিকেতন' ২, আত্মবোধ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১
'শান্তিনিকেতন' ২, ছোটা ও বড়ো ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪

পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি

'শান্তিনিকেতন' ১, নমস্তেঽস্তু ১৩১৫ চৈত্র ২৬। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ২, ছোটো ও বড়ো ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪
'শান্তিনিকেতন' ২, মা মা হিংসীঃ ১৩২১ শ্রাবণ ২০। ১৯১৪
'শান্তিনিকেতন' ২, সৃষ্টির ক্রিয়া ১৩২১ কার্তিক। ১৯১৪
'শান্তিনিকেতন' ২, আবির্ভাব ১৩২১ পৌষ ৭। ১৯১৪
'শান্তিনিকেতন' ২, মাধুর্যের পরিচয় ১৩২১ মাঘ ১১। ১৯১৫
'খৃস্ট', বড়োদিন ১৯৩২ ডিসেম্বর ২৫

পিতা নোঽসি

'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম', প্রথম কার্যপ্রণালী ১৩০৯ কার্তিক। ১৯০২
'শান্তিনিকেতন' ১, অভ্যাস (তিন বার) ১৩১৫ ফাল্গুন ১৩। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ১, নমস্তেঽস্তু (তিন বার) ১৩১৫ চৈত্র ২৬। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ১, মন্ত্রের বাঁধন (চার বার) ১৩১৫ চৈত্র ২৭। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ১, প্রাণ ও প্রেম (তিন বার) ১৩১৫ চৈত্র ২৮। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ১, ভয় ও আনন্দ (চার বার) ১৩১৫ চৈত্র ২৯। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ১, দশের ইচ্ছা ১৩১৫ চৈত্র ৩১। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ২, মাতৃশ্রাদ্ধ (সাত বার) ১৯১১ জানুআরি
'শান্তিনিকেতন' ২, পিতার বোধ (নয় বার) ১৩১৮ মাঘ ১১। ১৯১২
'শান্তিনিকেতন' ২, সৃষ্টির অধিকার (দু বার) ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪
'শান্তিনিকেতন' ২, ছোটো ও বড়ো ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪
'শান্তিনিকেতন' ২, সৌন্দর্যের সকরুণতা ১৩২১ মাঘ ১১। ১৯১৫

'খৃস্ট', খৃস্টোৎসব ১৯২৩ ডিসেম্বর ২৫

পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু

'শান্তিনিকেতন' ২, ছোটো ও বড়ো ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪

পিতা নো বোধি

'শান্তিনিকেতন' ২, পিতার বোধ (পাঁচ বার) ১৩১৮ মাঘ ১১। ১৯১২

নমস্তেঽস্তু

শান্তিনিকেতন' ১, নমস্তেঽস্তু (তেব বা׳) ১৩১৫ চৈত্র ২৬। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, ভয ও আনন্দ ১৩১৫ চৈত্র ২৯। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, পিতাব বোধ (পাঁচ বার) ১৩১৮ মাঘ ১১। ১৯১০

'শান্তিনিকেতন' ২, পাপেব মাজনা ১৩২১ ভাদ্র ৯। ১৯১৪

'শান্তিনিকেতন' ২, সৌন্দর্যেব সককণতা ১৩২১ মাঘ ১১। ১৯১৫

'ভানুসিংহেব পত্রাবলী', পত্র-১৭, ১৩২৫ ভাদ্র ২৯। ১৯১৮

মা মা হিংসীঃ

'শান্তিনিকেতন' ২, দ্বিধা (দু বার) ১৯১০ অকটোবব

'শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ ১৯১১ মে

'শান্তিনিকেতন' ২, আত্মবোধ (দু বাব) ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

'শান্তিনিকেতন' ২, মা মা হিংসীঃ (সাতবাব) ১৩২১ শ্রাবণ ২০। ১৯১০

কৃষ্ণ যজুর্বেদ

শান্তিবচন

ও সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।

তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥[১]

আংশিক উদধৃতি সহ বীর্যং করবাবহৈ বিদ্বিষাবহৈ

'শিক্ষা', জাতীয বিদ্যালয ১৩১৩ ভাদ্র। ১৯০৬

মা বিদ্বিষাবহৈ

'সাহিত্যেব পথে', সভাপতিব অভিভাষণ ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ। ১৯২৩

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

---

১ শ্বেতা. শান্তিপাঠ, কঠ. শান্তিপাঠ, তৈত্তি. শান্তিপাঠ, কেন. শান্তিপাঠ।

'ধর্ম', শান্তং শিবমদ্বৈতম্ (দু বার) ১৩১৩ পৌষ। ১৯০৬

'ধর্ম', আনন্দরূপ ১৩১৩ মাঘ। ১৯০৭

'শান্তিনিকেতন' ২, সৃষ্টির অধিকার ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪

সামবেদ

শান্তিবচন

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো
বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদং।
মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ
অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণং মেঽস্তু।
তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাঃ
তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু ॥[1] ব্রা.

পূর্ণ উদধৃতি 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

আংশিক উদধৃতি মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং অনিরাকরণং মেঽস্তু

'চারিত্রপূজা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-১, ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ ৩। ১৯০৪

মাহং ব্রহ্ম অনিরাকরণমস্তু

'শান্তিনিকেতন' ১, মৃত্যুর প্রকাশ ১৩১৫ মাঘ ৬। ১৯০৯

মাহং ব্রহ্ম নিরাকরোৎ

'চারিত্রপূজা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-১, ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ ৩। ১৯০৪

'শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

অথর্ববেদ

পরি দ্যাবা পৃথিবী সদ্য আয়মুপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য।
বাচমিব বক্তরি ভুবনেষ্ঠা ধাস্যুরেষ নন্বেষো অগ্নিঃ ॥ ২।১।৪

আংশিক উদধৃতি পরিদ্যাবা প্রথমজামৃতস্য

'শেষ সপ্তক', চল্লিশ সংখ্যক কবিতা ১৩৪১ বৈশাখ। ১৯৩৫

সং বো মনাংসি সংব্রতা সমাকূতীর্ণমামসি।
অমী যে বিব্রতা স্থন তান্ বঃ সংনমযামসি ॥[2] ৩।৮।৫

---

১ ছান্দো. শান্তিপাঠ, কেন. শান্তিপাঠ।

২ অথর্ব ৬।৯৪।১

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'পল্লীপ্রকৃতি', দেশের কাজ ১৯৩২ ফেব্রুআরি ৬
'পল্লীপ্রকৃতি', উপেক্ষিতা পল্লী ১৯৩৪ ফেব্রুআরি ৬

সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোবি বঃ।
অন্যোন্যমভিহর্য্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা ॥[1] ৩।৩০।১

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'পল্লীপ্রকৃতি', উপেক্ষিতা পল্লী ১৯৩৪ ফেব্রুআরি ৬

মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্ মা স্বসারমুত স্বসা।
সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া ॥ ৩।৩০।৩

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'পল্লীপ্রকৃতি', উপেক্ষিতা পল্লী ১৯৩৪ ফেব্রুআরি ৬

আপো অস্মান্… সূদয়ন্তু ·· ॥ ৬।৫১।২ দ্র. ঋ. ১০।১৭।১০
তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং…॥ ৭।২৬।৭ দ্র. ঋ. ১।২২।২০
দ্বা সুপর্ণা সযুজা… ॥ ৯।৯।২০ দ্র. ঋ. ১।১৬৪।২০
যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুঃ তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্
যো বেদ পরমেষ্ঠিনং যশ্চ বেদ প্রজাপতিম্
জ্যেষ্ঠং যে ব্রাহ্মণং বিদুস্তে স্কম্ভমনুসংবিদুঃ ॥ ১০।৭।১৭

আংশিক উদ্ধৃতি যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুঃ তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্
'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ৩

অবির্ বৈ নাম দেবতর্ তেনাস্তে পরীবৃতা।
তস্যা রূপেণেমে বৃক্ষা হরিতা হরিতস্রজঃ ॥ ১০।৮।৩১

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ। ১৯৪০

অন্তি সন্তং ন জহাতি অন্তি সন্তং ন পশ্যতি।
দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি ॥ ১০।৮।৩২

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ। ১৯৪০

আংশিক উদ্ধৃতি দেবস্য পশ্য কাব্যং
'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ। ১৯৪০

নমস্তে অস্তু আয়তে নমো অস্তু পরায়তে।[2]
নমস্তে রুদ্র তিষ্ঠত আসীনায়োত তে নমঃ ॥ ১১।২।১৫

আংশিক উদ্ধৃতি নমস্তে অস্তু… পরায়তে
'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬। ১৯০৯

---

১ পাঠান্তর কৃণোমি, অভিহর্যত

২ অথর্ব ১১।৪।৭

নমস্তে প্রাণ ক্রন্দায় নমস্তে স্তনয়িত্নবে।

নমস্তে প্রাণ বিদ্যুতে নমস্তে প্রাণ বর্ষতে ॥ ১১।৪।২

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬। ১৯০৯

প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণস্তক্‌মা প্রাণং দেবা উপাসতে।

প্রাণো হ সত্যবাদিনমুত্তমে লোক আ দধৎ ॥ ১১।৪।১১

আংশিক উদ্‌ধৃতি প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণস্তকমা

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬। ১৯০৯

প্রাণো বিরাট্ প্রাণো দেষ্ট্রী প্রাণং সর্ব উপাসতে।

প্রাণো হ সূর্যশ্চন্দ্রমাঃ প্রাণমাহুঃ প্রজাপতিম্ ॥ ১১।৪।১২

আংশিক উদ্‌ধৃতি প্রাণো বিরাট্, প্রাণো হ সূর্যশ্চন্দ্রমা

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬। ১৯০৯

প্রাণমাহুর্মাতরিশ্বানং বাতো হ প্রাণ উচ্যতে।

প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ প্রাণে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১১।৪।১৫

আংশিক উদ্‌ধৃতি প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬। ১৯০৯

অষ্টাচক্রং বর্তত একনেমি সহস্রাক্ষরং প্র পুরো নি পশ্চা।

অর্ধেন বিশ্বং ভুবনং জজান যদস্যার্ধং কতমঃ স কেতুঃ ॥[১]

আংশিক উদ্‌ধৃতি তদস্যার্ধং কতমঃ স কেতুঃ

'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ। ১৯৪০

ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ।

ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিষ্টে বীর্যং লক্ষ্মীর্বলং বলে ॥ ১১।৭।১৭

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ২

আংশিক উদ্‌ধৃতি ঋতং সত্যং··· ভূতং ভবিষ্যৎ

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ৩ (দু বার)

ঋতং সত্যং, ধর্মশ্চ কর্ম চ, ভূতং ভবিষ্যৎ

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ২

বীর্যং লক্ষ্মীর্বলং

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ৩

১ শ্লোকটির সংখ্যা ১১।২।৬।২২। এই সংখ্যাটি দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত অথর্ববেদ (১৩৩২) থেকে গৃহীত।

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ২-৩
'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১২৩ হেমন্তবালাদেবীকে লেখা ১৯৩৩ অক্টোবর ১১

পূর্ণ অনুবাদ 'The Religion of Man' 1931, The Creative Spirit.

তস্মাদ্ বৈ বিদ্বান্ পুরুষমিদং ব্রহ্মেতি মন্যতে।
সর্বা হ্যস্মিন্ দেবতা গাবো গোষ্ঠ ইবাসতে ॥ ১১।৮।৩২

আংশিক উদ্ধৃতি তস্মাদ্ বৈ ··· মন্যতে
'The Religion of Man' 1931, The Surplus in Man
'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ৩

পুরুষ এবেদং সর্বং··· ॥ ১৯।৬।৪ দ্র. ঋ. ১০।৯০।২
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ · ॥ ১৯।৬।৬ দ্র. ঋ. ১০।৯০।১২
পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিরাপঃ···
শান্তি সর্বে মে দেবা শান্তিঃ শান্তি. শান্তি
তচ্ছিবং সর্বমেবশমস্তু নঃ ॥ ১৯।৯।১৪

আংশিক উদ্ধৃতি পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দ্যৌঃ শান্তিঃ
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ
'তপতী' ১৯২৯, ৪-ক্ষুব্ধতীর্থ। মাতঙ্গমন্দির

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পান্যেতেষাং বৈ শিল্পানামনুকৃতীহ
শিল্পমধিগম্যতে।··· আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং
বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে ॥ ৬।৫।১

আংশিক উদ্ধৃতি 'ছন্দ', ছন্দের প্রকৃতি ১৩৪১ বৈশাখ। ১৯৩৪
আত্মসংস্কৃতির্বাব · সংস্কুরুতে
'বাংলা শব্দতত্ত্ব', কালচার ও সংস্কৃতি ১৩৪২ ভাদ্র। ১৯৩৫
আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি
'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব ১৩৪০ ভাদ্র। ১৯৩৩

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ

যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব ॥ ১।৩।৯

আংশিক উদ্ধৃতি যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

'রাজাপ্রজা', ইম্পীরিয়লিজম্ ১৩১২। ১৯০৫

'শান্তিনিকেতন' ১, পরিণয় ১৩১৫ ফাল্গুন ৯। ১৯০৯

'ছন্দ', গদ্য কবিতার রূপ ও বিকাশ, ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা পত্র-৫, ১৩৩৯ কার্তিক ১২। ১৯৩২

যদেতদ্ হৃদয়ং মম

'সাহিত্যের পথে', সাহিত্য ১৩৩০ বৈশাখ। ১৯২৩

তৈত্তিরীয় আরণ্যক

অক্ষি দুঃখোত্থিতস্যৈব সুপ্রসন্নে কনীনিকে

আংক্তে চাদ্‌গণং নাস্তি ঋভূনাং তন্নিবোধত।

কনকাভানি বাসাংসি অহতানি নিবোধত

অন্নমশ্নীত মৃজ্মীত অহং বো জীবনপ্রদঃ।

এতা বাচঃ প্রযুজ্যন্তে শরদ্যত্রোপদৃশ্যতে॥ ১।৪।১

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'শারদোৎসব' ১৯০৮, দ্বিতীয় দৃশ্য

উপনিষদ্

উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আবাল্য পরিচয়ের কথা সুবিদিত। বাল্যে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থের মধ্যস্থতায় উপনিষদের সঙ্গে কবির যে পরিচয় ঘটেছিল, তাঁর জীবনে উত্তরোত্তর সে পরিচয় ব্যাপকতর ও ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। তাঁর রচনায় তাই ঔপনিষদিক উপকরণের পরিমাণ যেমন সর্বাধিক, নানা উপলক্ষে তার প্রসঙ্গ উল্লেখও তেমনি সবচেয়ে বেশি। এ স্থলে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রাপ্ত উপনিষদের উপকরণগুলি যথাসম্ভব সমগ্রভাবে সংকলিত হল।

এই সংকলনে উপনিষদ্‌গুলিকে কালক্রম-অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয় নি। কারণ উপনিষদগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হবার মতো কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। ওই জাতীয় গবেষণা বর্তমান গ্রন্থের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিকও বটে। কেননা রবীন্দ্রমানসে তথা সাহিত্যে উপনিষদের গুরুত্বনির্ণয়ই আমাদের উদ্দেশ্য। তাই যে উপনিষদ থেকে কবি তাঁর রচনায় সর্বাধিক সংখ্যক শ্লোক ব্যবহার করেছেন সেটিকে প্রথমে রেখে বাকিগুলিকে সেই ক্রম-অনুযায়ী সাজানো হল। আশা করি এতে রবীন্দ্র-ব্যবহৃত উপনিষদ্‌গুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব বোঝার সহায়তা হবে।

রবীন্দ্র ব্যবহৃত যে শ্লোকগুলি ব্রাহ্মধর্ম বা নববত্নমালা গ্রন্থে পাওয়া যায়, এই সংকলনে সেগুলিকে যথাক্রমে ব্রা. ও নব. শব্দে চিহ্নিত করা হয়েছে। রবীন্দ্রমানসের ঔপনিষদিক উপাদানের কতটুকু তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আর কতটুকু তাঁর মৌলিক অধ্যয়ন ও অন্বেষার ফল, এই পরিসংখ্যান থেকে তা বোঝা যাবে। আবার বিধুশেখর শাস্ত্রী-সংগৃহীত এবং রবীন্দ্র-সম্পাদিত 'উপনিষৎ-সংগ্রহ' গ্রন্থের যে শ্লোকগুলি এই সংকলনে পাওয়া গেছে সেগুলিও 'উপ' শব্দে চিহ্নিত হল। উক্ত শ্লোকগুলি অনুধাবন করলে উপনিষদের কোন্ কোন্ ভাবধারা কবিকে আকৃষ্ট করেছিল তা বোঝা যাবে এবং তার থেকে রবীন্দ্রনাথের মানসপ্রবণতার একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাবে।

এ ছাড়া এই সংকলনের পরিশিষ্টে মহানির্বাণ তন্ত্রের শ্লোকগুলিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। উপাদানের স্বল্পতা তথা উপনিষদের সঙ্গে ভাবসাম্যহেতু এগুলির জন্য আর পৃথক্ বিভাগ করা হয় নি।

পরিশেষে বলতে হয়, বৈদিক সংহিতার প্রসঙ্গে যে শান্তিপাঠগুলি উদ্‌ধৃত হয়েছে সেইগুলিই বিশেষ বিশেষ উপনিষদের প্রসঙ্গে উচ্চারিত হয়। সংহিতায় উল্লিখিত

শান্তিপাঠের পাদটীকায় কোন উপনিষদে কোন্ বেদের শান্তিপাঠ গৃহীত হয়েছে তারও তালিকা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং উপনিষদের প্রসঙ্গে ওইগুলির আর পুনরুল্লেখ করা হল না।

বলা প্রয়োজন এই সংকলনে শ্লোকগুলির পাশে পাশে যে সংখ্যা উদ্ধৃত হয়েছে, তা উপনিষদ্গুলির বিভিন্ন বিভাগের পরিচায়ক সংখ্যা। এ জন্যে এই সংখ্যাগুলির ক্রম-অনুযায়ী পৃথক পৃথক উপনিষদের বিভাগগুলির পরিচয় দেওয়া হল। —

ঈশা	মন্ত্র	বৃহদারণ্যক	অধ্যায়, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র
কঠ	অধ্যায়, বল্লী, মন্ত্র	মাণ্ডূক্য	মন্ত্র
কেন	খণ্ড, মন্ত্র	মুণ্ডক	মুণ্ডক, খণ্ড, মন্ত্র
ছান্দোগ্য	প্রপাঠক, খণ্ড, মন্ত্র	শ্বেতাশ্বতর	অধ্যায়, মন্ত্র
তৈত্তিরীয়	বল্লী, অনুবাক, মন্ত্র	মহানারায়ণ	খণ্ড, মন্ত্র
প্রশ্ন	প্রশ্ন, মন্ত্র	মহানির্বাণ তন্ত্র	উল্লাস, শ্লোক

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ। ১।১২ শ্বে

[illegible] উদ্ধৃতি [illegible] কিঞ্চিৎ

'শান্তিনিকেতন ১, [illegible] চৈত্র ১৪। ১৯০৭ খ্রি।

[illegible] ব্রহ্ম [illegible]

দ্রষ্টব্য ঋ ১০।১৩১

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি ॥ ২।৮ শ্বে.

আংশিক উদ্ধৃতি স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি

'উপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

যো দেবো অগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।

য ওষধীষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ ॥[১] ২।১৭ শ্বে

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম', প্রথম কার্যপ্রণালী ১৩০৯ কার্তিক। ১৯০২
'শিক্ষা', শিক্ষাসমস্যা ১৩১৩ আষাঢ়। ১৯০৬
'শান্তিনিকেতন' ১, বিশ্বব্যাপী (৩ বার) ১৩১৫ মাঘ ৫। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৯১০ জানুআরি
'শান্তিনিকেতন' ২, ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা ১৩১৮ বৈশাখ। ১৯১১

আংশিক উদ্ধৃতি যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ নমোনমঃ
'শান্তিনিকেতন' ১, দেখা ১৩১৫ পৌষ ৭। ১৯০৮ ডিসেম্বর
নমো নমঃ
'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ (দুই বার) ১৩১৮ মাঘ ১১। ১৯১২
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ ॥ ৩।৮ দ্র ব ব। মা ৩.১
যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ॥ ৩।৯

আংশিক উদ্ধৃতি বৃক্ষ ইব স্তব্ধো সর্বম্। ৩।
'ধর্ম', প্রাচীন ভারতের এক (তিন বার) ১৩০৮ ফাল্গুন। ১৯০২
বৃক্ষ ইব দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ
'ধর্ম', প্রাচীন ভারতের একঃ (চার বার) ১৩০৮ ফাল্গুন। ১৯০২
'বিচিত্র প্রবন্ধ', মন্দির ১৩১০ পৌষ। ১৯০৩
'শান্তিনিকেতন ২, বর্ষশেষ (তিন বার) ১৩১৭ চৈত্র। ১৯১১
'ছন্দ', গদ্য ছন্দ ১, ১৩৪১ বৈশাখ। ১৯৩৪
'চারিত্রপূজা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১, ১৩৪২ মাঘ ৬। ১৯৩৬
বৃক্ষ ইব স্তব্ধ
'চারিত্রপূজা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-৪, ১৩৪২ মাঘ ৬। ১৯৩৬

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'চারিত্রপূজা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-৪, ১৩৪২ মাঘ ৬। ১৯৩৬
'ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।

---

১ কাঠক সংহিতা ৪০।১২, 'নমো' স্থলে 'রুদ্রায়' পাঠ আছে, দ্র তৈ. কা. ৫।৫।৯।৩

২ তমেব বিদিত্বা…অয়নায়, শ্বেতা. ৬।১৫

য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি[১]

অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি ॥ ৩।১০ ব্রা. নব.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ।

সর্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ ॥ ৩।১১ ব্রা. নব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি সর্বভূতগুহাশয়ঃ

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৯১০ জানুআরি

সর্বব্যাপী…শিবঃ

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৯১০ জানুআরি

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ২

সর্বগতঃ শিবঃ

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৯১০ জানুআরি

পুরুষ এবেদং সর্বং…॥ ৩।১৫ দ্র. ঋ. ১০।৯০।২

সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥[২] ৩।১৬ ব্রা.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ২

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।

সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ ॥[৩] ৩।১৭ ব্রা. নব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ২

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্[৪]

আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।

তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকঃ

ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥ ৩।২০ ব্রা. নব. উপ.

আংশিক উদ্‌ধৃতি অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্

'জাপানযাত্রী', অধ্যায় ৬, ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ ২। ১৯১৬ মে

---

১ য এতদ্‌…অমৃতাস্তে ভবন্তি শ্বেতা ৩।১ ; ৩।১৩ ; ৪।১৭ ; বৃহ ৪।৪।১৪, কঠ ২।৩।২

২ ভগবদ্গীতা ১৩।১৩

৩ ভগবদ্গীতা ১৩।১৪,

৪ কঠ. ১।২।২০

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥[1] ৪।১ বা নব

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'সমূহ', সভাপতির অভিভাষণ পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী ১৩১৪ ফাল্গুন। ১৯০৮

'A vision of India's History' 1923

'The Religion of Man' 1931, The Creative spirit

'The Religion of Man', Appendix IV 1930 May 25

'চারিত্রপূজা', ভারতপথিক রামমোহন রায় ১, ১৩৪০ পৌষ ১৪ । ১৯৩৩

'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ। ১৯৪০

আংশিক উদ্ধৃতি য একোঽবর্ণ, বর্ণাননেকান সংযুনক্তু,

'শান্তিনিকেতন' ২ জন্মোৎসব ১৩১৭ বৈশাখ ২৫ ১৯১০

য একোঽবর্ণো দধাতি

'শান্তিনিকেতন' ১, সামঞ্জস্য ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ২৯। ১৯০৮

'কালান্তর', সত্যের আহ্বান ১৩২৮ কার্তিক। ১৯২১

'পল্লীপ্রকৃতি', পল্লীপ্রকৃতি ১৯২৮ ফেব্রুয়ারি

য একো অব

'শান্তিনিকেতন' ১, বর্ষশেষ ১৩১০ চৈত্রসংক্রান্তি

'কালান্তর', সমস্যা (ক্রমশ) ১৩৩০ অগ্রহায়ণ। ১৯২৩

য এক।

'ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ৬, ১৩৩৫ মাঘ। ১৯২৯

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ২

অবর্ণঃ

'শান্তিনিকেতন' ১, নবযুগের উৎসব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯

বহুধাশক্তিযোগাৎ দধাতি

'শান্তিনিকেতন' ১, রাত্রি ১৩১৫ পৌষ ১৪। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ১, পার্থক্য ১৩১৫ পৌষ ২৩। ১৯০৯

১ স নো…সংযুনক্তু, শ্বেতা ৩।৪, ৪।১২

'শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

বহুধাশক্তিযোগাৎ

'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১৪, ১৩৩৭ জ্যৈষ্ঠ। ১৯৩০

শক্তিযোগাৎ

'শান্তিনিকেতন' ১, পার্থক্য ১৩১৫ পৌষ ২৩। ১৯০৯

বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি

'শান্তিনিকেতন' ১, নবযুগের উৎসব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯

নিহিতার্থো দধাতি

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১

বিচৈতি চান্তে সংযুনক্তু

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-৫৮ হেমন্তবালাদেবীকে লেখা ১৯৩১ নভেম্বর ৮

বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ

'শান্তিনিকেতন' ২, চিরনবীনতা ১৯১০ জানুআরি

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৯১০ জানুআরি

শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-৫৮ হেমন্তবালাদেবীকে লেখা ১৯৩১ নভেম্বর ৮

স দেবঃ···সংযুনক্তু

'মানুষের ধর্ম', ভূমিকা ১৩৩৯ মাঘ। ১৯৩৩

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৯১০ জানুআরি

'শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

'কালান্তর', সত্যের আহ্বান ১৩২৮ কার্তিক। ১৯২১

'কালান্তর', সমস্যা (৪র্থ বার) ১৩৩০ অগ্রহায়ণ। ১৯২৩

'ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ৬, ১৩৩৫ মাঘ। ১৯২৯

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ২

'পল্লীপ্রকৃতি', পল্লীপ্রকৃতি ১৯৩৪ ফেব্রুআরি

পরোক্ষ উল্লেখ 'কালান্তর', চরকা ১৩৩২ ভাদ্র। ১৯২৫

'শান্তিনিকেতন' ১, সঞ্চয়তৃষ্ণা ১৩১৫ পৌষ ১০। ১৯১০

'শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

'পল্লীপ্রকৃতি', ম্যালেরিয়া ১৯২৪ ফেব্রুআরি

'সমবায়নীতি', সমবায়নীতি ১৩৩৫ মাঘ ২৭। ১৯২৯

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ২

পূর্ণ অনুবাদ 'The Religion of Man 1931, The Creative Spirit

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া · ॥ ৪।৬ দ্র. শ্ব. ১।১৬৪।২০

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে

বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং[1]

জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ৪।১৪ শ্বে.

আংশিক উদ্ধৃতি বিশ্বস্যৈকং শান্তিমত্যন্তমেতি। ব্রা.

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা

সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।[2]

হৃদা মনীষা মনসাভিক্লপ্তো[3]

য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥[4] ৪।১৭ শ্বে. উপ.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'শান্তিনিকেতন' ২, আত্মবোধ ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১১

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র ২০ হেমন্তবালাদেবীকে লেখা ১৩৩৮ আষাঢ় ৫ । ১৯৩১

আংশিক উদ্ধৃতি এষ দেবো বিশ্বকর্মা সন্নিবিষ্ট

'শান্তিনিকেতন' ১, নবযুগের উৎসব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯

'The Religion of Man' 1931, Spiritual Union

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-৪ হেমন্তবালাদেবীকে লেখা ১৩৩৮ বৈশাখ ১। ১৯৩১

'মানুষের ধর্ম', ভূমিকা ১৩৩৯ মাঘ। ১৯৩৩

মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ

'শান্তিনিকেতন' ২, ছোটো ও বড়ো ১৩২০ মাঘ। ১৯১৪

সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ

---

১ শ্বেতা ৩।৭, ৪।১৬, ৫।১৩ (বিশ্বস্যৈক পরিবেষ্টিতারম্) ২ শ্বেতা ৩।১৩, কঠ ২।৩।১০

৩ কঠ ২।৩।৯ (হৃদা মনীষা…ভবন্তি) ৪ শ্বেতা ৩।১০

'মানুষের ধর্ম', ভূমিকা ১৩৩৯ মাঘ। ১৯৩৩

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ২

সদা জনানাং হৃদয়ে

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-২১, হেমন্তবালাদেবীকে লেখা ১৩৩৮ আষাঢ় ৮ । ১৯৩১

জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ

'শান্তিনিকেতন' ১, সৃষ্টি ১৩১৫ চৈত্র ৩। ১৯০৯

হৃদা মনীষা মনসা ভবন্তি

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র ৫২ হেমন্তবালাদেবীকে লেখা ১৯৩১ অক্টোবর ২১

হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তঃ

'শান্তিনিকেতন' ১, নবযুগের উৎসব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯

হৃদা মনীষা মনসা

'খৃস্ট', মানবসম্বন্ধের দেবতা ১৯২৬ ডিসেম্বর

'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব ১৩৪০ ভাদ্র। ১৯৩৩

'সাহিত্যের পথে', ভূমিকা (অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা) ১৩৪৩ আশ্বিন । ১৯৩৬

হৃদা মনীষা

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র ২১ হেমন্তবালাদেবীকে লেখা ১৯৩১ জুন ২৩

য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি

'ধর্ম', প্রাচীন ভারতের একঃ ১৩০৮ ফাল্গুন। ১৯০২

'শান্তিনিকেতন' ১, ফল ১৩১৫ ফাল্গুন ২০। ১৯০৯

'সঞ্চয়', ধর্মশিক্ষা ১৩১৮ মাঘ। ১৯১২

'The Religion of Man' 1931, Spiritual Union

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র ২১ হেমন্তবালাদেবীকে লেখা ১৯৩১ জুন ২৩

অমৃতাস্তে ভবন্তি

'চিঠিপত্র' ২, পত্র-২০ রথীন্দ্রনাথকে লেখা ১৯১৬ অক্টোবর ২৮

'ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ৬, ১৩৩৫ মাঘ। ১৯২৯

পরোক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন ১, নবযুগের উৎসব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, বিমুখতা ১৩১৫ ফাল্গুন ১৮। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

'খৃস্ট', খৃস্টোৎসব ১৯২৩ ডিসেম্বর

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-৫৮ হেমন্তবালাদেবীকে লেখা ১৯৩১ নভেম্বর ৮

'মহাত্মা গান্ধী', মহাত্মাজির পুণ্যব্রত ১৩৩৯ আশ্বিন। ১৯৩২

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ৩

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি

র্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।

তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং

প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥৪।১৮

আংশিক উদ্ধৃতি যদাঽতমস্তন্ন…এব কেবলঃ

'ধর্ম', প্রাচীন ভারতের একঃ ১৩০৮ ফাল্গুন। ১৯০২

নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।[১]

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।[২] ৪।১৯ ব্র

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

আংশিক উদ্ধৃতি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্‌ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌ ॥ ৪।২১ নব.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

আংশিক উদ্ধৃতি রুদ্র যত্তে নিত্যম্‌। ব্রা.

'ধর্ম', প্রার্থনা ১৩১১ আষাঢ়। ১৯০৪

'ধর্ম', দুঃখ (দু বার) ১৩১৪ ফাল্গুন। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ১, প্রার্থনা (দু বার) ১৩১৫ পৌষ ৩। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ২, আত্মবোধ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

'শান্তিনিকেতন' ২, নববর্ষ ১৩১৮ বৈশাখ ১। ১৯১১

'চিঠিপত্র' ২, পত্র-৭ রথীন্দ্রনাথকে লেখা ১৯১২

'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৩, ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক। ১৯১৭

'ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ৭, ১৩৩৫ ভাদ্র। ১৯২৮

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং

'শান্তিনিকেতন' ২, ছোটো ও বড়ো ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪

১ য বা. মা. ৩২।২ দ্বিতীয়ার্ধ ২ দ্ব. বা মা ৩২।৩ প্রথমার্ধ

দক্ষিণং মুখং

'শান্তিনিকেতন' ১, দেখা ১৩১৫ পৌষ ৪ । ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ২, আত্মবোধ ১৩১৭ ফাল্গুন । ১৯১১

পাহি মাং নিত্যম্

'শান্তিনিকেতন' ২, শুচি (দু বার) ১৩১৯ আশ্বিন । ১৯১২

'পথের সঞ্চয়', সীমার সার্থকতা ১৩১৯ আশ্বিন । ১৯১২

চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৪৩ ইন্দিরা দেবীকে লেখা[১] ১৯৩১ অক্টোবর ৭

পরোক্ষ উল্লেখ 'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১০, ১৩৩০ পৌষ ৭ । ১৯২৩

'কালান্তর', স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ১৩৩৩ মাঘ । ১৯২৭

স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো

যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেঽয়ম্ ।

ধর্মাবহং পাপনুদং ভগেশং

জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম ॥ ৬।৬ শ্বে. উপ.

আংশিক উদ্ধৃতি স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যঃ

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১

ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে

ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ৬।৮ শ্বে. উপ.

আংশিক উদ্ধৃতি পরাস্য শক্তিঃ জ্ঞানবলক্রিয়া চ

'শান্তিনিকেতন' ১, শক্তি ১৩১৫ পৌষ ২৮ । ১৯০৯

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ

'শান্তিনিকেতন' ১, স্বাভাবিকী ক্রিয়া ১৩১৫ ফাল্গুন ১১ । ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্গুন । ১৯১১

'শান্তিনিকেতন' ২, একটি মন্ত্র (দু বার) ১৩২০ মাঘ ১৫ । ১৯১৪

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ৩

পরোক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ১, স্বাভাবিকী ক্রিয়া ১৩১৫ ফাল্গুন ১১ । ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, বিমুখতা ১৩১৫ ফাল্গুন ১৮ । ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, একটি মন্ত্র ১৩২০ মাঘ ১৫ । ১৯১৪

---

১ এই পত্রে 'পাহি' স্থলে আছে 'ত্রাহি' ।

একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ৬।১১ শ্বে

আংশিক উদ্ধৃতি কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ৩

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনা না-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান।[১] শ্বে.
তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্য
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ৬।১৩ শ্বে উপ

আংশিক উদ্ধৃতি নিত্যোঽনিত্যানাং

'শান্তিনিকেতন' ১, অখণ্ড শান্তি ১৩১৪ চৈত্র ১৭ । ১৯০৯

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি, কুতোঽয়মগ্নিঃ
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ ২।১৪ কঠ শ্বে উপ

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

'শান্তিনিকেতন' ১, ভয় ১৩১৫ চৈত্র ১৫। ১৯০৯

আংশিক উদ্ধৃতি ন তত্র সূর্যো ভাতি ... কুতোঽয়মগ্নিঃ

'জীবনস্মৃতি' ১৯১২, পাণ্ডুলিপি

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ ৬।১৮ শ্বে

আংশিক উদ্ধৃতি তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ৩

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥ ৬।১৯ শ্বে

আংশিক উদ্ধৃতি দগ্ধেন্ধনমিবানলঃ

১ কঠ ২।২।১৩ (নিত্যোঽনিত্যানাং ... কামান্)

'ধর্ম' প্রাচীন ভারতের একঃ ১৩০৮ ফাল্গুন। ১৯০২

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্

অথাতঃ পবমানানামেবাভ্যারোহঃ। । অসতো মা সদগময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়েতি স যদাহাসতো ম এবমেতৎ সাম বেদ ॥ ১।৩।২৮

আংশিক উদধৃতি অসতো মা সদগময় অমৃত গময়। ব্রা. নব

'উপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

'ধর্ম', নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ। ১৯০২

'ধর্ম', ধর্মের সরল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ। ১৯০৩

'চারিত্রপূজা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১, ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ ৩। ১৯০৪

'ধর্ম, প্রার্থনা ১৩১১ আষাঢ়। ১৯০৭

'শান্তিনিকেতন' ১, প্রার্থনা ১৩১৫ পৌষ ৩। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ১, বিকারশঙ্কা ১৩১৫ পৌষ ৩। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ১, প্রার্থনা। সভা ১৩১৫ পৌষ ২০। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, দিন ১৩১৫ পৌষ ২১। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, আশ্রম ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, ভক্ত ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, একটি মন্ত্র ১৩২০ মাঘ ১৫। ১৯১৪

'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৩, ১৩২৪ আশ্বিন কার্তিক। ১৯১৭

অসতো মা সদ্গময় জ্যোতির্গময়

'শান্তিনিকেতন' ২, একটি মন্ত্র ১৩২০ মাঘ ১৫। ১৯১৪

অসতো মা সদগময

'শান্তিনিকেতন' ১, হিসাব (অবশিষ্ট) ১৩১৫ পৌষ ৬। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ২, প্রতীক্ষা ১৩২০ পৌষ ৭। ১৯১৩

'শান্তিনিকেতন' ২, স্বাভাব অধিকার ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪

'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৬ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৯২০ ডিসেম্বর ২২

'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ৭, ১৩৩০ বৈশাখ। ১৯২৩

'পথে ও পথের প্রান্তে', অধ্যায় ৪৩, ১৩৩৬ কার্তিক। ১৯২৯

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র ২৯ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ জুলাই ২০

অসতো মা

'চিঠিপত্র' ৭, পরিশিষ্ট : যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লেখা ১৩১৭ পৌষ ১৮। ১৯১১

তমসো মা জ্যোতির্গময

'জাপানযাত্রী', অধ্যায় ১৪, ১৯১৬

'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী', পরিশিষ্ট ১৯২৪ সেপ্টেম্বর ২৬

পরোক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ., আদেশ ১৩১৫ চৈত্র ৯। ১৯০৯

'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র ১৭, ১৩২৫ ভাদ্র ২৯। ১৯১৮

'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র ১৮, ১৩২৫ আশ্বিন ৪। ১৯১৮

'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১০ ১৩৩০ পৌষ ৭। ১৯২৩

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩০ অধ্যায় ২

আংশিক অনুবাদ অসতো মা সদগময

'The Religion of Man' 1931, Spiritual Freedom

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা। স যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতীশ্বরো হ তথৈব স্যাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি ॥ ১।৪।৮

আংশিক উদ্ধৃতি তদেতৎ প্রেয়ঃ প্রিয় রোৎস্যতীতি। বা

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

তদেতৎ প্রেয়ঃ যদয়মাত্মা

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১ (অনুবাদ)

'ধর্ম', প্রাচীন ভারতের একঃ ১৩০৮ ফাল্গুন। ১৯০২

'ধর্ম', উৎসবের দিন ১৩১১ মাঘ। ১৯০৫

'শান্তিনিকেতন' ১, আত্মপ্রত্যয় ১৩১৫ চৈত্র ২১। ১৯০৯

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩০, অধ্যায় ২

তদেতৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা

'কালান্তর', স্বাধিকারপ্রমত্তঃ ১৩২৪ মাঘ। ১৯১৮

তদেতৎ প্রেয়ঃ সর্বস্মাৎ

'শান্তিনিকেতন' ২, ছোটো ও বড়ো ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'নৈবেদ্য', ১৩০৮ আষাঢ়। ১৯০১, ৭৯-সংখ্যক সনেট

পরোক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ১, বিশেষ ১৩১৫ পৌষ ১৬। ১৯০৮

'পরিচয়', ভগিনী নিবেদিতা ১৩১৮ অগ্রহায়ণ। ১৯১১

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র ··অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসৌ অন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্। যথা হ বৈ··· প্রিয় যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ॥ ১।৪।১০

আংশিক উদ্ধৃতি অথ যোঽন্যা . দেবানাম্

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩. অধ্যায় ৩

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী। যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব বিত্তেনাশাস্তি॥[১] ২।৪।২

আংশিক উদ্ধৃতি উপকরণবতাং জীবিত

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১

'সাহিত্যের স্বরূপ', সাহিত্যের মাত্রা ১৩৪০ শ্রাবণ। ১৯৩৩

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং যদেব ভগবান বেদ তদেব মে ব্রূহীতি॥ ২।৪।৩

আংশিক উদ্ধৃতি যেনাহং নামৃতা ··কুর্যাম। ব্রা.

'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী', ভূমিকা ১৮৯০

'ধর্ম', প্রাচীন ভারতের একঃ (দু বার) ১৩০৮ ফাল্গুন। ১৯০২

'ভারতবর্ষ', চীনেম্যানের চিঠি (দু বার) ১৩০৯ আষাঢ়। ১৯০২

'চারিত্রপূজা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১, ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ ৩। ১৯০৪

'ধর্ম', উৎসবের দিন ১৩১৩ অগ্রহায়ণ। ১৯০৬

'শান্তিনিকেতন' ১, পাপ ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ২৫। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন', ১, প্রার্থনা (চার বার) ১৩১৫ পৌষ ৩। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ১, পাওয়া ১৩১৫ পৌষ ২৫। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ (তিন বার) ১৯১০ জানুআরি

'সঞ্চয়,' ধর্মের অর্থ ১৩১৮ আশ্বিন কার্তিক। ১৯১১

'পথের সঞ্চয়', যাত্রার পূর্বপত্র ১৩১৯ আষাঢ়। ১৯১২

'শিক্ষা', শিক্ষার বাহন ১৩২২ পৌষ। ১৯১৫

'কালান্তর', বাতায়নিকের পত্র (দু বার) ১৩২৬ আষাঢ়। ১৯১৯

'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ৫, ১৩২৯ ভাদ্র। ১৯২২

---

১ বৃহ ৪।৫।৩ (ঈষৎ পরিবর্তিত)

'পথে ও পথের প্রান্তে', অধ্যায় ৪, ১৯২৬ ডিসেম্বর
'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ অধ্যায় ১

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শ্যামলী', অমৃত ১৯৩৬ জুলাই ৩

পরোক্ষ উল্লেখ 'শিক্ষা', জাতীয় বিদ্যালয় ১৩১৩ ভাদ্র। ১৯০৬
'শিক্ষা', শিক্ষার বাহন ১৩২১ পৌষ। ১৯১৫

স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায়…ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে সর্বং বিদিতম্ ॥ ২।৪।৫

আংশিক উদ্ধৃতি ন বা অরে পুত্রাণাং বিত্ত প্রিয়ং ভবতি
'সাহিত্য', বিশ্বসাহিত্য ১৩১৩ মাঘ। ১৯০৭

ন বা অরে পুত্রানা পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি

'শান্তিনিকেতন' ১, বৈরাগ্য ১৩১৫ ফাল্গুন ১৫। ১৯০৯
'কালান্তর', সত্যের আহ্বান ১৩২৮ কার্তিক। ১৯২১
'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১
'সাহিত্যের স্বরূপ', সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা[১] ১৯৪১ মে

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ১, বৈরাগ্য ১৩১৫ ফাল্গুন ১৫। ১৯০৯
'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব ১৩৪০ ভাদ্র। ১৯৩৩

পরোক্ষ উল্লেখ 'সাহিত্যের পথে', ভূমিকা (অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা) ১৩৪৩ আশ্বিন ৮। ১৯৩৬
'সাহিত্যের স্বরূপ', সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা ১৯৪১ মে

অয়মাকাশঃ সর্বেষাং ভূতানাং…যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মধ্যাত্মং… ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ২।৫।১০

আংশিক উদ্ধৃতি যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ। ব্রা. নব.
'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৯১০ জানুয়ারি

অয়মাত্মা সর্বেষাং… যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময় পুরুষো যশ্চায়মাত্মা …ব্রহ্মেদং সর্বম্ ॥ ২।৫।১৪

আংশিক উদ্ধৃতি যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ। ব্রা. নব.

১ এই প্রবন্ধে উদ্ধৃতিটি যথাযথ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি ছাড়া অন্যত্র কবি সবদা 'পুত্রাণাং' স্থলে পুত্রস্য এবং তদনুযায়ী পঙক্তিটির সর্বত্র একবচনের রূপ ব্যবহার করেছেন।

'শান্তিনিকেতন' ১, বিশ্ববোধ ১৯১০ জানুআরি

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ৩

যশ্চায়মস্মিন্ পুরুষঃ

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ৩

ইদং বৈ তন্মধু সর্বানুভূরিত্যনুশাসনম্ ॥ ২।৫।১৯

আংশিক উদ্ধৃতি সর্বানুভূঃ। ব্রা নব.

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ (তিন বার) ১৯১০ জানুআরি

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ৩ (দু বার)

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, সংযোজন মানবসত্য ৩

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ।
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধ
মাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি। ব্রা.
পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ ॥ ৩।৮।৯

আংশিক উদ্ধৃতি এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্তা· তিষ্ঠন্তি।

'সঞ্চয়' রূপ ও অরূপ ১৩১৮ পৌষ। ১৯১১

নিমেষা মুহূর্তা বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি

'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', পরিশিষ্ট ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১৫

অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি

'ধর্ম', নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ। ১৯০২

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'বিচিত্র প্রবন্ধ', ছবির অঙ্গ ১৩২২ আষাঢ়। ১৯১৫

যো বা এতদক্ষরং বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি যো বা · স
কৃপণঃ · স ব্রাহ্মণঃ ॥ ৩।৮।১০ ব্রা নব

আংশিক উদ্ধৃতি অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি

'সঞ্চয়', ধর্মের অধিকার ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১২

স কৃপণঃ

'শান্তিনিকেতন' ২, ভাগবত ১৯১১ জানুআরি

'সঞ্চয়', ধর্মের অধিকার ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১২

তদ্ বা এতদক্ষরং · বিজ্ঞাত্রেতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ
প্রোতশ্চেতি ॥ ৩।৮।১১ ব্রা.

আংশিক উদ্ধৃতি এতস্মিন্ন্‌ খলু অক্ষরে আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ

'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ। ১৯৪০

সলিল একো ··এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ॥[১] ৪।৩।৩২ ব্রা. নব.

আংশিক উদ্ধৃতি এষাস্য পরমা গতি ··পরম আনন্দঃ

'ধর্ম', প্রাচীন ভারতের একঃ ১৩০৮ ফাল্গুন। ১৯০২

ধর্ম', আনন্দরূপ ১৩১৩ মাঘ। ১৯০৭

'শান্তিনিকেতন' ১, এপার ওপার ১৩১৫ পৌষ ১২। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ১, পরিণয় ১৩১৫ ফাল্গুন ৯। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, শুচি ১৩১৯ আশ্বিন। ১৯১২

'শান্তিনিকেতন' ২, ছোটো ও বড়ো ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ২

এষোঽস্য পরম আনন্দ।

'শান্তিনিকেতন' ১, আশ্রম ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯

'সঞ্চয়', ধর্মের নবযুগ ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১২

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, পরিশিষ্ট: মানবসত্য

পরম আনন্দঃ পরমাগতি

'খৃস্ট', খৃস্টোৎসব ১৯২৩ ডিসেম্বর

এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি

'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১৯৭, ১৮৯৫ মার্চ ১২

'ধর্ম', ধর্মের সরল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ। ১৯০৩

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৯১০ জানুআরি

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'পথের সঞ্চয়', সীমা ও অসীমতা ১৩১৯ কার্তিক। ১৯১২

পরোক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ১, হওয়া ১৩১৬ বৈশাখ ৬। ১৯০৯

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ৪।৪।১১

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

'ধর্ম', ততঃকিম্ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ। ১৯০৬

---

১ ব্রাহ্মধর্মে আছে, এষাস্য পরমা গতিঃ···মাত্রামুপজীবন্তি।

'সঞ্চয়', আমার জগৎ ১৩২১ আশ্বিন। ১৯১৪

ইহৈব সন্তোহথ বিদ্মস্তদ্‌বয়ং
ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ।
যে তদ্‌ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি[১]
অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি ॥ ৪।৪।১৪ ব্রা. নব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি ইহৈব সন্তোহথ···মহতী বিনষ্টিঃ

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

মহতী বিনষ্টিঃ

'শান্তিনিকেতন' ১, মত ১৩১৫ মাঘ ২। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, দুর্লভ ১৯১০ অক্টোবর

'শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

'পথের সঞ্চয়', আনন্দরূপ ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ ২২। ১৯১২

'পথের সঞ্চয়', দুই ইচ্ছা ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ ২৩। ১৯১২

'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী' ১৯২৪ সেপ্‌টেম্বর ২৪

'রাশিয়ার চিঠি', পরিশিষ্ট : পল্লীসেবা ১৩৩৭ ফাল্গুন। ১৯৩১

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১

যদৈতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা।
ঈশানং ভূত ভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্‌সতে ॥[২] ৪।৪।১৫ ব্রা. নব.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'শান্তিনিকেতন' ১, আশ্রম ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯

আংশিক উদ্‌ধৃতি ঈশানং ভূতভব্যস্য

'চারিত্রপূজা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-১, ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ ৩। ১৯০৪

প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ।
তে নিচিক্যুর্ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্ ॥ ৪।৪।১৮ ব্রা. নব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি প্রাণস্য প্রাণং

'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ। ১৯৪০

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১ (দু বার)

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

---

১ য এতদ্‌···ভবন্তি, শ্বেতা ৩।১০ ২ ঈশানং···বিজুগুপ্‌সতে, কঠ ২।১।৫

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি[১] ॥ ৪।৪।১৯

আংশিক উদ্ধৃতি মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি

'ধর্ম', প্রাচীন ভারতের একঃ ১৩০৮ ফাল্গুন। ১৯০২

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।

বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ ॥ ৪।৪।২০ ব্রা. নব.

আংশিক উদ্ধৃতি একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্, পর আকাশাদজ আত্মা

'The Religion of Man' 1931, Spiritual Union

একধৈবানু···ধ্রুবম্

'ধর্ম', প্রাচীন ভারতেব একঃ ১৩০৮ ফাল্গুন। ১৯০২

একধৈবানুদ্রষ্টব্যঃ

'মানুষেব ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ২

স বা এষ মহানজ আত্মা ·এব সর্বেশ্বব এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধবণ এষাং লোকানামসংভেদায় ·· নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ ॥ ৪।৪।২২

আংশিক উদ্ধৃতি এষ সর্বেশ্বব অসংভেদায। ব্রা.

'ধর্ম', প্রাচীন ভাবতেব একঃ ১৩০৮ ফাল্গুন। ১৯০২

এষ সেতুর্বিধরণ লোকানামসংভেদায

'শান্তিনিকেতন' ২, সামঞ্জস্য ১৯১১ জানুআবি

তদেতদৃচাঽভ্যুক্তম্ তস্মাদেবংবিচ্ছান্তো দান্তো উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাঽঽত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি · দাস্যায়েতি ॥ ৪।৪।২৩

আংশিক উদ্ধৃতি শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ। ব্রা. নব.

'শান্তিনিকেতন' ১, ভয় ও আনন্দ ১৩১৫ চৈত্র ২৯। ১৯০৯

আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি। ব্রা.

'শান্তিনিকেতন' ১, ওঁ ১৩১৫ চৈত্র ১৫। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, আত্মপ্রত্যয় ১৩১৫ চৈত্র ২১। ১৯০৯

আত্মন্যেব

'আত্মপবিচয়', অধ্যায ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ। ১৯৪০

হিবণ্ময়েন পাত্রেণ · যত্তে রূপং কল্যাণতমং · পুরুষঃ সোঽহমস্মি ··কৃতং স্মর ··বিধেম ॥ ৫।১৫।১ দ্র. ঈশা ১৫-১৭

১ মৃত্যোঃ···পশ্যতি, কঠ ২।১।১১

শ্বেতকেতুর্হ বা আরুণেয়ঃ পঞ্চালানাং পরিষদমাজগাম···
পিত্রেত্যোমিতি হোবাচ ॥ ৬।২।১

প্রত্যক্ষ উল্লেখ···'শিক্ষা', বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ : ভাষণ ১৯৩২ ডিসেম্বর

কঠোপনিষদ্

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
-স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ॥ ১।২।১

আংশিক উদ্ধৃতি তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়ো বৃণীতে। ব্রা. নব.

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১

হীয়তেঽর্থাৎ

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
-স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীবোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥ ১।২।২ উপ.

আংশিক উদ্ধৃতি শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ···বিবিনক্তি ধীরঃ। ব্রা. নব.

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১

তন্দুর্দর্শং গূঢমনুপ্রবি ঁং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধি গমেন দেবং
মত্বা ধীরো হ্ষশোকৌ জহাতি ॥ ১।২।১২ ব্রা. নব. উপ.

আংশিক উদ্ধৃতি তন্দুর্দশং গূঢমনুপ্রবিষ্টং

'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ। ১৯৪০

গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং

'শান্তিনিকেতন' ২, গুহাহিত (দু বার) ১৩১৬ চৈত্র ২৩। ১৯১০

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। ব্রা.

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥[১] ১।২।১৮ উপ.

আংশিক উদ্ধৃতি ন জায়তে ম্রিয়তে
'শান্তিনিকেতন' ১, স্বভাবকে লাভ ১৩১৫ চৈত্র ৫। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' আত্মার প্রকাশ ১৩১৫ চৈত্র ৮। ১৯০৯
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে
'পারস্যযাত্রী', অধ্যায় ১, ১৯৩২ এপ্রিল ১৩

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'ঘরে-বাইরে' ১৯১৬, বিমলার আত্মকথা

অশরীরং শরীরেষ্বনবস্থেষ্ববস্থিতম্।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি[২] ॥ ১।২।২২ উপ.

আংশিক উদ্ধৃতি মহান্তং বিভুং···শোচতি। ব্রা. নব.
'কালান্তর', বাতায়নিকের পত্র-৪, ১৩২৬ আষাঢ়। ১৯১৯

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥[৩] ১।২।২৩ ব্রা. নব. উপ.

আংশিক উদ্ধৃতি ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
'শিক্ষা', শিক্ষাসমস্যা ১৩১৩ আষাঢ়। ১৯০৬
'সঞ্চয়', ধর্মশিক্ষা ১৩১৮ মাঘ। ১৯১২
'জীবনস্মৃতি' ১৯১২ জুলাই, স্বাদেশিকতা
'কালান্তর', স্বরাজসাধন ১৩৩২ আশ্বিন। ১৯২৫
'সাহিত্যের স্বরূপ', গদ্যকাব্য ১৩৪৬। ১৯৩৯ আগস্ট

পরোক্ষ উল্লেখ 'শিক্ষা', বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ : ভাষণ ১৯৩২ ডিসেম্বর

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥ ১।২।২৪ ব্রা. নব. উপ.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২

আংশিক উদ্ধৃতি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ
'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩

---

১ ভগবদ্গীতা ২।২০ ২ মহান্তং বিভু···শোচতি। কঠ ২।১।৪ ৩ মুণ্ডক ৩।২।৩

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥ ১।৩।১৪ ব্রা. নব. উপ.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'সমাজ', পরিশিষ্ট : ব্যাধি ও প্রতিকার ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১
'রাজাপ্রজা', রাজভক্তি ১৩১২ মাঘ। ১৯০৬
'ধর্ম', মনুষ্যত্ব ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১২

আংশিক উদ্‌ধৃতি উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১
'শান্তিনিকেতন' ১, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত (চার বার) ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ১৭। ১৯০৮
'শান্তিনিকেতন' ১, সংশয় ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ২৩। ১৯০৮
'শান্তিনিকেতন' ১, শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের উৎসব ১৩১৫ পৌষ ৭। ১৯০৮
'ধর্ম', মনুষ্যত্ব (তিন বার) ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১২

ক্ষুরস্য ধারা…বদন্তি
'চারিত্রপূজা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-১, ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ ৩। ১৯০৪
'সমূহ', দেশনায়ক ১৩১৩ জ্যৈষ্ঠ। ১৯০৬
'সঞ্চয়', ধর্মের অধিকার ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১২

দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি
'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' (দু বার) ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১
'সমূহ', সদুপায় ১৩১৫। ১৯০৮
'ধর্ম', মনুষ্যত্ব ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১২
'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৬৭ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা ১৩২৪ ফাল্গুন ২। ১৯১৮
'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৩, ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক। ১৯১৭
'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১

পরোক্ষ উল্লেখ 'আত্মশক্তি', য়ুনিভার্সিটি বিল ১৩১১ আষাঢ়। ১৯০৪
'শান্তিনিকেতন' ২, দ্বিধা ১৯১০ অক্টোবর
'শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১
'চিঠিপত্র' ৭, পত্র-১৬ কাদম্বিনী দেবীকে লেখা ১৯১০ জুলাই ১৩
'পথের সঞ্চয়', সীমা ও অসীমতা ১৩১৯ কার্তিক। ১৯১২

'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৩, ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক। ১৯১৭

পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি বালা-
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেম্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥ ২।১।২ ব্রা. নব. উপ.

আংশিক উদ্‌ধৃতি অথ ধীরা…প্রার্থয়ন্তে

'কালান্তর', বাতায়নিকের পত্র-২, ১৩২৬ আষাঢ়। ১৯১৯

যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ২।১।১০

আংশিক উদ্‌ধৃতি মৃত্যোঃ স মৃত্যুং ··পশ্যতি

'ধর্ম', প্রাচীন ভারতের একঃ ১৩০৮ ফাল্গুন। ১৯০২

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ ২।১।১১

আংশিক উদ্‌ধৃতি মনসৈবেদমাপ্তব্য'…কিঞ্চন

'ধর্ম', প্রাচীন ভারতের একঃ ১৩০৮ ফাল্গুন। ১৯০২

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে। এতদ্বৈতৎ॥ ২।১।১২

আংশিক উদ্‌ধৃতি ঈশানো ভূতভব্যস্য[১]

'শান্তিনিকেতন' ১, আশ্রম ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯

ঊর্ধ্বং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে॥ ২।২।৩

আংশিক উদ্‌ধৃতি মধ্যে বামনমাসীনং…উপাসতে। ব্রা. নব.

'শান্তিনিকেতন' ২, চিরনবীনতা ১৯১০ জানুআরি

য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ॥
২।২।৮ ব্রা. নব. উপ.

আংশিক উদ্‌ধৃতি য এষ সুপ্তেষু…নির্মিমাণঃ

'শান্তিনিকেতন' ১, রাত্রি ১৩১৫ পৌষ ১৪। ১৯০৮

---

১ কঠ ২।১।১৩

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥[১] ২।২।১২ ব্রা. নব. উপ.

আংশিক উদ্ধৃতি একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
'শান্তিনিকেতন' ১, নবযুগের উৎসব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯
একং রূপং বহুধা…নেতরেষাম্
শান্তিনিকেতন' ২, আত্মবোধ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১
ন তত্র সূর্যো…সর্বমিদং বিভাতি ॥ ২।২।১৫ দ্র. শ্বেতা ৬।১৪

ঊর্ধ্বমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ॥
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে।
তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈতৎ ॥ ২।৩।১ উপ.

পরোক্ষ উল্লেখ 'কালান্তর', রায়তের কথা ১৩৩৩ আষাঢ়। ১৯২৬

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥[২] ২।৩।২ ব্রা. নব.

আংশিক উদ্ধৃতি যদিদং কিঞ্চ…বজ্রমুদ্যতম্
'শান্তিনিকেতন' ১, ভয় ও আনন্দ ১৩১৫ চৈত্র ২৯। ১৯০৯
যদিদং কিঞ্চ…নিঃসৃতম্
'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১
'শান্তিনিকেতন' ১, প্রাণ ও প্রেম ১৩১৫ চৈত্র ২৮। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ২, একটি মন্ত্র ১৩২০ মাঘ ১৫। ১৯১৪
'চিঠিপত্র' ৬, পরিশিষ্ট ২ : জগদীশচন্দ্র ১৩৪৪ পৌষ। ১৯৩৭
যৎ কিঞ্চ যদিদং সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্
'The Religion of Man' 1931, Spiritual Union
যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্

১ তমাত্মস্থং…নেতরেষাম্. শ্বেতা ৬।১২ : কঠ ২।২।১৩ (ঈষৎ পরিবর্তিত)
২ য এতদ্…ভবন্তি, শ্বেতা ৪।১৭

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩

'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', অধ্যায় ১, ১৩৪৩ আষাঢ়। ১৯৩৬

যদিদং সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্

'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র। ১৯১৮

যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৯১০ জানুআরি

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

'চিঠিপত্র' ৬, পরিশিষ্ট ২ : আচার্য জগদীশের জয়বার্তা ১৩০৮ আষাঢ় । ১৯০১

সর্বং প্রাণ এজতি

'সাহিত্য', সৌন্দর্য ও সাহিত্য ১৩১৪ বৈশাখ। ১৯০৭

মহদ্‌ভয়ং ·· ভবন্তি

'শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

'শান্তিনিকেতন' ২, সুন্দর ১৩১৭ চৈত্র ১৫। ১৯১১

মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্

'ধর্ম', প্রাচীন ভারতের্‌ একঃ ১৩০৮ ফাল্গুন। ১৯০২

'শান্তিনিকেতন' ১, ভয় ও আনন্দ ১৩১৫ চৈত্র ২৯। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, নিয়ম ও মুক্তি ১৩১৫ চৈত্র ৩০। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, সুন্দব ১৩১৭ চৈত্র ১৫। ১৯১১

'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৩, ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক। ১৯১৭

বজ্রমুদ্যতম্

'শান্তিনিকেতন' ১, দীক্ষা ১৩১৫ পৌষ ৭। ১৯০৮

পরোক্ষ উল্লেখ 'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যরূপ ১৩৩৫ বৈশাখ। ১৯২৮

'শিক্ষা', আশ্রমের শিক্ষা ১৩৪৩ আষাঢ়। ১৯৩৬

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ।

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ২।৩।৩ ব্রা. নব. উপ.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'সঞ্চয়', ধর্মের অর্থ ১৩১৮ আশ্বিন-কার্তিক। ১৯১১

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশেষত্ব ও বিশ্ব ১৩১৯ অগ্রহায়ণ। ১৯১২

'সাহিত্যের পথে', কবির অভিভাষণ ১৩৩৪ ফাল্গুন। ১৯২৮

ভয়াদস্যাগ্নি··· সূর্যঃ

'শান্তিনিকেতন' ১, ভয় ও আনন্দ ১৩১৫ চৈত্র ২৯। ১৯০৯

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি

'শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি

'শান্তিনিকেতন' ২, সুন্দর ১৩১৭ চৈত্র ১৫। ১৯১১

মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ

'সাহিত্যের পথে', কবির অভিভাষণ ১৩৩৪ ফাল্গুন।১৯২৮

যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে।
যথাপ্‌স্বু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্বলোকে।
ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥ ২।৩।৫

আংশিক উদ্ধৃতি ছায়াতপয়োরিব

'চারিত্রপূজা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-২, ১৩১১ মাঘ। ১৯০৫

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ ২।৩।১২ ব্রা. নব. উপ.

আংশিক উদ্ধৃতি অস্তীতি ·· তদুপলভ্যতে

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২

ছান্দোগ্যোপনিষদ্

স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্ধ্যোঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ ॥ ১।১।৩

আংশিক উদ্ধৃতি রসানাং রসতমঃ

'শান্তিনিকেতন' ১, অখণ্ড পাওয়া ১৩১৫ চৈত্র ১৭। ১৯০৯

বাগেব ঋক্ প্রাণঃ সাম ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথস্তদ্ বা এতন্মিথুনং
যদ্ বাক্ চ প্রাণশ্চ ঋক্ চ সাম চ ॥
তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে যদা বৈ মিথুনৌ
সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামম্ ॥ ১।১।৫-৬

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ১, ওঁ ১৩১৫ চৈত্র ১৫। ১৯০৯

যদা বা ঋচমাপ্নোত্যোমিত্যেবাতিস্বরত্যেবং···যদেতদক্ষর-
-মেতদমৃতমভয়ং···অভয়া অভবন্ ॥ ১।৪।৪ নব.

আংশিক উদ্ধৃতি এতদমৃতমভয়ং[১]

'কালান্তর', বাতায়নিকের পত্র-১, ১৩২৬ আষাঢ়। ১৯১৯

তং হ শিলকঃ শালাবত্যঃ··· অপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে
দাল্‌ভ্য সাম···বিপতেদিতি ॥ ১।৮।৬

আংশিক উদ্ধৃতি অপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে সাম

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১

তং হ প্রবাহণো জৈবলিরুবাচান্তবদ্ বৈ কিল তে শালাবত্য সাম,
যস্ত্বেতর্হি·· বিদ্ধীতি হোবাচ ॥ ১।৮।৮

আংশিক উদ্ধৃতি অন্তবদ্ বৈ কিল তে সাম

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ
পুরুষো · স ক্রতুং কুর্বীত ॥ ৩।১৪।১

আংশিক উদ্ধৃতি শান্ত উপাসীত। ব্রা. নব. উপ.

'কালান্তর', বাতায়নিকের পত্র-১, ১৩২৬ আষাঢ়। ১৯১৯

অন্তরিক্ষোদরঃ কোশো ভূমিবুধ্নো ন জীর্যতি, দিশো হ্যস্য স্রক্তয়ো
দ্যৌরস্যোত্তরং বিলং স এষ কোশো বসুধানস্তস্মিন্ বিশ্বমিদং
শ্রিতম্ ॥

তস্য প্রাচী দিগ্‌জুহূর্নাম সহমানা নাম দক্ষিণা রাজ্ঞী নাম প্রতীচী
সুভূতানামোদীচী, তাসাং বায়ুর্বৎসঃ, স য এতমেবং বায়ুং দিশাং
বৎসং বেদ, ন পুত্ররোদং রোদিতি, সোঽহমেতমেবং বায়ুং দিশাং
বৎসং বেদ, মা পুত্ররোদং রুদম্ ॥ ৩।১৫।১-২

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'কালমৃগয়া' ১৮৮২, তৃতীয় দৃশ্য

আদিৎপ্রত্নস্য রেতসঃ জ্যোতিষ্পশ্যন্তি বাসরম্ পরো যদিধ্যতে
দিবি উদ্বয়ন্তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরং
দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিতি জ্যোতিরুত্তমমিতি ॥[২]
৩।১৭।৭

১ ছান্দোগ্য ১।৪।৫, ৮।৩।৪

২ এই মন্ত্রটিই ঋগ্‌বেদে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে দেখা যায়।—
আদিৎপ্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিষ্পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবা ॥ ৮।৬।৩০
উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্তি উত্তরম্। দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিতি ॥ ১।৫০।১০

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'A Vision of India's History' 1923

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ তদ্ধৈক আহুরসদে-
বেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত ॥ ৬।২।১
নব. উপ.

আংশিক উদ্ধৃতি একমেবাদ্বিতীয়ম্

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১
'ধর্ম', বর্ষশেষ ১৩০৮ চৈত্র। ১৯০২
'ধর্ম', নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ। ১৯০২
'শান্তিনিকেতন' ১, মত ১৩১৫ মাঘ ২। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ১, নবযুগের উৎসব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ২, আত্মবোধ (তিন বার) ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১
'চারিত্রপূজা', ভারতপথিক রামমোহন রায়-২, ১৩৪০ পৌষ। ১৯৩৩

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব
বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।[১] ভূমানং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥
৭।২৩।১ ব্রা. নব. উপ.

আংশিক উদ্ধৃতি যো বৈ ভূমা তৎসুখং

'শান্তিনিকেতন' ২, আত্মবোধ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি

'ধর্ম', ধর্মের সরল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ। ১৯০৩

নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ

'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ২, একটি মন্ত্র ১৩২০ মাঘ ১৫। ১৯১৪

ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি

'আধুনিক সাহিত্য', সাকার ও নিরাকার ১৩০৫ আশ্বিন। ১৮৯৮
'ঔপনিষদ ব্রহ্ম', ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১
'ভারতবর্ষ', নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ। ১৯০২
'ভারতবর্ষ', চীনেম্যানের চিঠি ১৩০৯ আষাঢ়। ১৯০২
'শিক্ষা', জাতীয় বিদ্যালয় ১৩১৩ ভাদ্র। ১৯০৬
'ধর্ম', আনন্দরূপ ১৩১৩ মাঘ। ১৯০৭

---

১ যো বৈ ভূমা…বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। ব্রা. নব.

'শান্তিনিকেতন' ১, দিন ১৩১৫ পৌষ ১১। ১৯০৮
'শান্তিনিকেতন' ২, গুহাহিত ১৩১৬ চৈত্র ২৩। ১৯১০
'শান্তিনিকেতন' ২, দুর্লভ ১৯১০ অক্টোবর
'ধর্ম', মনুষ্যত্ব ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১২
'কালান্তর', কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ১৩২৪ ভাদ্র। ১৯১৭
'রাশিয়ার চিঠি', পরিশিষ্ট : পল্লীসেবা ১৩৩৭ ফাল্গুন। ১৯৩১
'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১

ভূমৈব সুখং

'সঞ্চয়', ধর্মের অধিকার ১৩১৮ ফাল্গুন।১৯১২
'পথের সঞ্চয়', দুই ইচ্ছা ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ। ১৯১২
'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ৬ (তিন বার) ১৩২৯ ভাদ্র। ১৯২২
'The Religion of Man' 1931, The Surplus in Man
'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১
'সাহিত্যের পথে', ভূমিকা (অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা) ১৩৪৩ আশ্বিন। ১৯৩৬

ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ

'শান্তিনিকেতন' ১, ভূমা, ১৩১৫ চৈত্র ১৪। ১৯০৯
'জাপানযাত্রী', অধ্যায় ৭, ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ। ১৯১৬

নাল্পে সুখমস্তি ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ

'পথের সঞ্চয়', দুই ইচ্ছা ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ। ১৯১২

নাল্পে সুখমস্তি

'শান্তিনিকেতন' ২, গুহাহিত ১৩১৬ চৈত্র ২৩। ১৯১০

ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ

'চারিত্রপূজা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-১, ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ ৩। ১৯০৪
'শান্তিনিকেতন' ১, ব্রহ্মবিহার ১৩১৫ চৈত্র ১১। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ২, একটি মন্ত্র ১৩২০ মাঘ ১৫। ১৯১৪

পরোক্ষ উল্লেখ 'সঞ্চয়', ধর্মের অধিকার ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১২
'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ৪, ১৩২৮ ফাল্গুন। ১৯২২

যত্র নান্যৎ পশ্যতি···যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যং স

ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি, স্বে মহিম্নি, যদি বা ন মহিম্নীতি ॥
৭।২৪।১ উপ.

আংশিক উদ্ধৃতি স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নি। ব্রা. নব.

'ধর্ম', ধর্মপ্রচার ১৩১০ ফাল্গুন। ১৯০৪

'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১৪

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্বমিতি। অথাতোঽহঙ্কারাদেশ…সর্বমিতি ॥
৭।২৫।১

আংশিক উদ্ধৃতি স এবাধস্তাৎ…উত্তরতঃ। ব্রা. নব. উপ.

'ধর্ম', আনন্দরূপ ১৩১৩ মাঘ। ১৯০৭

অথ য এষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ…তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি ॥ ৮।৩।৪ নব.

আংশিক উদ্ধৃতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যম্। ব্রা.

'রাজাপ্রজা', পথ ও পাথেয় ১৩১৫। ১৯০৮

অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসংভেদায়, নৈতং সেতুমহোরাত্রে তরতো ন জরা ন মৃত্যুর্ন শোকো…ব্রহ্মলোকঃ ॥
৮।৪।১ ব্রা.[1] নব.

আংশিক উদ্ধৃতি স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাম্

'রাজা প্রজা', পথ ও পাথেয় ১৩১৫। ১৯০৮

ন জরা ন মৃত্যুঃ শোকঃ

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোবিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। স সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি…প্রজাপতিরুবাচ ॥ ৮।৭।১ ব্রা. নব.

আংশিক উদ্ধৃতি য আত্মা অপহতপাপ্মা…বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩

১ স সেতুর্বিধৃতি…মৃত্যু ন শোকঃ। ব্রা. নব.

মুণ্ডকোপনিষদ্

যদর্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ যস্মিল্লোঁকা নিহিতা লোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্‌মনঃ।
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্‌বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি ॥২।২।২

ব্রা.[১] নব. উপ.

আংশিক উদ্‌ধৃতি যদণুভ্যোঽণু লোকিনশ্চ। তদ্‌বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

তদেতৎ সত্যং সোম্য বিদ্ধি

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

তদেতৎ সত্যং

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১ (দু বার)

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আযম্য তদ্‌ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি ॥ ২।২।৩ উপ

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

আংশিক উদ্‌ধৃতি তদ্‌ভাবগতেন চেতসা

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ২।২।৪ ব্রা. নব. উপ

আংশিক উদ্‌ধৃতি প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

'A Vision of India's History' 1923

ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ

'শান্তিনিকেতন' ১, আত্মসমর্পণ ১৩১৫ চৈত্র ১৮। ১৯০৯

শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

'সঞ্চয়', ধর্মের অধিকার ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১২

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

১ যদর্চিমদ্…লোকিনশ্চ। তদেতৎ সত্যং ·বিদ্ধি। ব্রা নব.

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষম্
ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানম্
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ ২।২।৫ ব্রা. নব. উপ.

আংশিক উধৃতি তমেবৈকং জানথ আত্মানম্। অমৃতস্যৈষ সেতুঃ

'শান্তিনিকেতন' ২, আত্মবোধ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

তমেবৈকং জানথ আত্মানম্

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ২

'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ। ১৯৪০

যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।
মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্‌বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ
আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি ॥ ২।২।৭ নব[১]. উপ.

আংশিক উদ্‌ধৃতি আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি। ব্রা.

'ধর্ম', উৎসব (দ্র বার) ১৩১২ মাঘ। ১৯০৬

'সাহিত্য', সৌন্দর্যবোধ ১৩১৩ পৌষ। ১৯০৬

'ধর্ম', আনন্দরূপ (দ্র বার) ১৩১৩ মাঘ। ১৯০৭

'সাহিত্য', সৌন্দর্য ও সাহিত্য ১৩১৪ বৈশাখ। ১৯০৭

'শান্তিনিকেতন' ১, পার্থক্য ১৩১৫ পৌষ ২৩। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, প্রাণ ১৩১৫ পৌষ ২৯। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, বৈরাগ্য ১৩১৫ ফাল্গুন ১৫। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, মুক্তি ১৩১৬ বৈশাখ ৭। ১৯০৯

'জাপানযাত্রী', অধ্যায় ৪, ১৩২৩ বৈশাখ ২৭। ১৯১৬

'সাহিত্যের পথে', সাহিত্য (দ্র বার) ১৩৩০ বৈশাখ। ১৯২৩

'সাহিত্যের পথে', কবির অভিভাষণ ১৩৩৪ ফাল্গুন। ১৯২৮

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, পরিশিষ্ট : মানবসত্য-২

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১২২ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯১৩ অক্টোবর ৪

---

১ যঃ সর্বজ্ঞঃ…দিব্যে। তদ্‌বিজ্ঞানেন…যদ্‌বিভাতি। নব.

আনন্দরূপমমৃতং বিভাতি

'শান্তিনিকেতন' ১, পরিণয় ১৩১৫ ফাল্গুন ৯। ১৯০৯

আনন্দরূপমমৃতং

'ধর্ম', প্রাচীন ভারতের একঃ ১৩০৮ ফাল্গুন। ১৯০২

'চারিত্রপূজা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-২, ১৩১১ মাঘ। ১৯০৫

'সাহিত্য', সৌন্দর্যবোধ ১৩১৩ পৌষ। ১৯০৬

'ধর্ম', আনন্দরূপ (চার বার) ১৩১৩ মাঘ। ১৯০৭

'ধর্ম', দুঃখ (পাঁচ বার) ১৩১৪ ফাল্গুন। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ১, আত্মার দৃষ্টি ১৩১৫ অগ্রহায়ণ। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ১, দেখা ১৩১৫ পৌষ ৪। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ১, সৌন্দর্য ১৩১৫ পৌষ ১৯। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, প্রার্থনার সত্য ১৩১৫ পৌষ ২০। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, মুক্তি ১৩১৬ বৈশাখ ৭। ১৯০৯

'পথের সঞ্চয়', আনন্দরূপ ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ ২২। ১৯১২

'শান্তিনিকেতন' ২, একটি মন্ত্র ১৩২০ মাঘ ১৫। ১৯১৪

'চিঠিপত্র' ৭, পত্র-৯২ কাদম্বিনী দত্তকে লেখা ১৯২৮ ফেব্রুআরি ৩

'ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ৭, ১৩৩৫ ভাদ্র। ১৯২৮

অমৃতং যদ্‌বিভাতি

'শান্তিনিকেতন' ১, আত্মার দৃষ্টি ১৩১৫ অগ্রহায়ণ। ১৯০৮

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'রোগশয্যায়', ২৫-সংখ্যক কবিতা ১৯৪০ নভেম্বর ২৮

পরোক্ষ উল্লেখ 'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ। ১৯৪০

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।

তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥ ২।২।৯ ব্রা.

আংশিক উদ্‌ধৃতি তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ

'শান্তিনিকেতন' ১, তিনতলা ১৩১৫ ফাল্গুন ১০। ১৯০৯

জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ

'শান্তিনিকেতন' ১, প্রার্থনা ১৩১৫ ফাল্গুন ১৪। ১৯০৯

পরোক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ১, দ্রষ্টা ১৩১৫ ফাল্গুন ৬। ১৯০৯

ন তত্র সূর্যো···সর্বমিদং বিভাতি ॥ ২।২।১০ দ্র. শ্বেতা. ৬।১৪

দ্বা সুপর্ণা সযুজা·· অভিচাকশীতি ॥ ৩।১।১ দ্র. ঋ ১।১৬৪।২০

প্রাণো হ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি
বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।
আত্মক্রীড আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্
এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ ॥ ৩।১।৪ ব্রা. নব.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'শান্তিনিকেতন' ১, প্রাণ ১৩১৫ পৌষ ২৯। ১৯০৯

আংশিক উদ্‌ধৃতি প্রাণো হ্যেষ নাতিবাদী।
'চিঠিপত্র' ৫, পত্র ৭১ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা ১৩২৫ কার্তিক ৮। ১৯১৮
আত্মক্রীডঃ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ
'শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১
ভবতে·· আত্মরতিঃ, ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ
'শান্তিনিকেতন' ১, প্রাণ ১৩১৫ পৌষ ২৯। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

সত্যমেব জয়তে নানৃতং
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা
যত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্ ॥ ৩।১।৬ ব্রা.[1] নব.[1] উপ.

আংশিক উদ্‌ধৃতি সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। ব্রা
'চারিত্রপূজা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-১, ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ ৩। ১৯০৪
'কালান্তর', সত্যের আহ্বান ১৩২৮ কার্তিক। ১৯২১
সত্যমেব জয়তে
'সঞ্চয়', ধর্মের অধিকার ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১২

নায়মাত্মা প্রবচনেন তনূং স্বাম্ ॥ ৩।২।৩ দ্র. কঠ ১।২।২৩
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বান্
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ ৩।২।৪ উপ.

আংশিক উদ্‌ধৃতি নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ
'আত্মশক্তি', দেশীয় রাজ্য (দু বার) ১৩১২ শ্রাবণ। ১৯০৫
'সমাজ' পূর্ব ও পশ্চিম ১৩১৫ ভাদ্র। ১৯০৮

---

১ সত্যমেব নানৃতম্, যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো···নিধানম্। ব্রা. নব

'ধর্ম', মনুষ্যত্ব ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১২

'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৩, ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক। ১৯১৭

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১২৩ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩৩ অকটোবর ১১

সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি ॥ ৩।২।৫ ব্রা. নব.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'শান্তিনিকেতন' ১, বিশ্ববোধ ১৯১০ জানুআরি

'ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ৩, ১৩৪৭ মাঘ। ১৯৪১

আংশিক উদ্ধৃতি তে সর্বগং সর্বতঃ···সর্বমেবাবিশন্তি

'শান্তিনিকেতন' ১, আত্মার দৃষ্টি ১৩১৫ অগ্রহায়ণ। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ১, নবযুগের উৎসব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, ওঁ ১৩১৫ চৈত্র ১৫। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, ধীর যুক্তাত্মা ১৩১৫ চৈত্র ২২। ১৯০৯

'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ১, ১৩৩৪ শ্রাবণ। ১৯২৭

'The Religion of Man' 1931, The Teacher

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-৮৯ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩২ আগস্ট ৪

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২

সর্বতঃ প্রাপ্য

'শান্তিনিকেতন' ১, পাপ ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ২৫। ১৯০৮

ধীরা সর্বমেবাবিশন্তি

'খৃস্ট', যিশুচরিত ১৯১০ ডিসেম্বর ২৫

যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩

সর্বমেবাবিশন্তি

'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যের তাৎপর্য ১৯৩৪ জুলাই ১২

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩

তদেতৎ সত্যমৃষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণব্রতোঽধীতে।
নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥ ৩।২।১১

আংশিক উদ্‌ধৃতি নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ[১]

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্[২]

যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপঃ।...শ্রুতং মে গোপায়।

আবহন্তী বিতন্বানা।...ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা।

যশো জনেঽসানি স্বাহা।...যথাপঃ প্রবতা যন্তি। যথা মাসা অহর্জরম্। এবং মাং ব্রহ্মচারিণঃ। ধাতবায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা। প্রতিবেশোঽসি...প্র মা পদ্যস্ব ॥ ১।৪

আংশিক উদ্‌ধৃতি যথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরম্।
এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা ॥

'শিক্ষা', জাতীয় বিদ্যালয় ১৩১৩ ভাদ্র। ১৯০৬

'শান্তিনিকেতন' ১, নবযুগের উৎসব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯

'কালান্তর', সত্যের আহ্বান ১৩২৮ কার্তিক। ১৯২১

আযন্তু সর্বতঃ স্বাহা

'কালান্তর,' সত্যের আহ্বান ১৩২৮ কার্তিক। ১৯২১

'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ৪, ১৩২৮ ফাল্গুন। ১৯২২

'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ৫, ১৩২৯ (ভাদ্র ?)। ১৯২২

'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১২, ১৩৩২ পৌষ ৯। ১৯২৫

'চারিত্রপূজা', ভারতপথিক রামমোহন রায় ১৩৪০ পৌষ ১৪। ১৯৩৩

'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১৮, ১৩৪৫ পৌষ ৮। ১৯৩৮

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বম্। ওমিত্যেতদনুকৃতির্হ স্ম বা অপ্যোংশ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওঁ শোমিতি শস্ত্রাণি শংসন্তি। ওমিত্যধ্বর্যুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওমিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি। ওমিতি ...ব্রহ্মৈবোপাপ্নোতি ॥ ১।৮ নব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বং। ওমিত্যেতদনুকৃতি হ স্ম।

---

১ প্রশ্ন ৬।৮

২ এই উপনিষদের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বল্লী যথাক্রমে শিক্ষাধ্যায়, ব্রহ্মানন্দবল্লী এবং ভৃগুবল্লী নামে পরিচিত।

ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি।

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

ওঁ ইতি ব্রহ্ম

'ভারতবর্ষ', নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ। ১৯০২

বেদমনূচ্যাচার্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি। সত্যং বদ।...আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্।.. স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব।.. অতিথিদেবো ভব।.. তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি।...শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্।...অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ...এবমুচৈতদুপাস্যম্॥ ১।১১

আংশিক উদধৃতি প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। উপ

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্ ভূত্যৈ র্ন প্রমদিতব্যম্। নব. উপ.

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

অতিথিদেবো ভব। উপ.

'সমাজ', পরিশিষ্ট: বিদেশীয় অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য ১৩০১ শ্রাবণ। ১৮৯৪

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩

'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ। ১৯৪০

শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। নব.

'ভারতবর্ষ', ভারতবর্ষের ইতিহাস ১৩০৯ ভাদ্র। ১৯০২

'পরিচয়', ভগিনী নিবেদিতা ১৩১৮ অগ্রহায়ণ। ১৯১১

'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', পরিশিষ্ট ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১২

'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৩৬ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৩৩৮ বৈশাখ ১। ১৯৩১

শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্

'বুদ্ধদেব', বুদ্ধদেব ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ। ১৯৩৫

শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। উপ. নব.

'শান্তিনিকেতন' ২, পিতার বোধ (দু বার) ১৩১৮ মাঘ। ১৯১২

'সাহিত্যের পথে', কবির কৈফিয়ত ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ। ১৯১৫
'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১৩, ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ। ১৯২৬
'সাহিত্যের পথে', পঞ্চাশোর্ধ্বম্ ১৩৩৬ ফাল্গুন। ১৯৩০
'রাশিয়ার চিঠি', পরিশিষ্ট : পল্লীসেবা ১৩৩৭। ১৯৩০
'রাশিযার চিঠি', উপসংহার ১৩৩৮ বৈশাখ। ১৯৩১
'শিক্ষা', বিশ্ববিদ্যালযের রূপ : ভাষণ ১৯৩২ ডিসেম্বর
'বিশ্বভারতী', অধ্যায ১৮, ১৩৪৫ পৌষ। ১৯৩৮
'পল্লীপ্রকৃতি', শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ ১৩৪৬। ১৯৩৯

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'চারিত্রপূজা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-২, ১৩১১ মাঘ। ১৯০৫

সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। · শান্তিঃ ॥ ২ শান্তিপাঠ[১]

দ্র. কৃষ্ণ যজু. শান্তিবচন

ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাভ্যুক্তা সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহাযাং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি। শ্লোকো ভবতি ॥ ২।১

আংশিক উদ্ধৃতি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ॥ ব্রা. নব.

· 'শান্তিনিকেতন' ১, পরিণয ১৩১৫ ফাল্গুন ৯। ১৯০৯

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম নিহিতং গুহায়াং

'শান্তিনিকেতন' ১, দ্রষ্টা ১৩১৫ ফাল্গুন ৬। ১৯০৯

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম

'ধর্ম', ধর্মের সরল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ। ১৯০৩
'ধর্ম', উৎসব ১৩১২ মাঘ। ১৯০৬
'শান্তিনিকেতন' ১, নমস্তেঽস্তু ১৩১৫ চৈত্র ২৬। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ২, ভক্ত ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ২, জাগরণ ১৩১৭ মাঘ। ১৯১১
'চিঠিপত্র' ৭, গ্রন্থপরিচয় : যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাযকে লেখা পত্র ১৩১৭ ফাল্গুন ৯। ১৯১১
'সঞ্চয়', ধর্মের নবযুগ ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১২
'সঞ্চয', ধর্মের অধিকার ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১২

---

১ তৈত্তি. ৩ বা ভৃগুবল্লী, শান্তিপাঠ

'শান্তিনিকেতন' ২, সত্য হওয়া (দু বার) ১৩১৯ পৌষ। ১৯১২

'শান্তিনিকেতন' ২, ছোটো ও বড়ো (দু বার) ১৩২০ মাঘ। ১৯১৪

'শান্তিনিকেতন' ২, একটি মন্ত্র (তের বার) ১৩২০ মাঘ ১৫। ১৯১৪

'শান্তিনিকেতন' ২, যাত্রীর উৎসব ১৩২১ মাঘ ১১। ১৯১৫

'ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ৩, ১৩৪৭ মাঘ। ১৯৪১

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্

'ধর্ম', আনন্দরূপ (তিন বার) ১৩১৩ মাঘ। ১৯০৭

'শান্তিনিকেতন' ১, পরিণয় (দু বার) ১৩১৫ ফাল্গুন ৯। ১৯০৯

'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৩ (দু বার) ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক। ১৯১৭

'সাহিত্যের পথে', সাহিত্য ১৩৩০ বৈশাখ। ১৯২৩

অনন্তং ব্রহ্ম

'শান্তিনিকেতন' ২, ছোটো ও বড়ো ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪

নিহিতং গুহায়াম্[১]

'শান্তিনিকেতন' ২, গুহাহিত ১৩১৬ চৈত্র ২৩। ১৯১০

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচনেতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা। যঃ পূর্বস্য।...তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ২।৪

আংশিক উদ্ধৃতি যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন॥ ব্রা. নব.

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

'শান্তিনিকেতন' ১, পাওয়া ও না-পাওয়া ১৩১৬ বৈশাখ ৪। ১৯০৯

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন

'ভারতবর্ষ', নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ। ১৯০২

'ধর্ম', নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ। ১৯০২

'শান্তিনিকেতন' ১, পাওয়া ১৩১৫ পৌষ ২৫। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, নিত্যধাম ১৩১৫ ফাল্গুন ৭। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, পরিণয় ১৩১৫ ফাল্গুন ৯। ১৯০৯

অসন্নেব ভবতি। অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ...বিদুরিতি। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা।...সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।

১ মুণ্ডক ২।১।১০ ; ৩।১।৭

স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা। ইদং সর্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা…তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ২।৬

আংশিক উদ্‌ধৃতি[১] স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা…যদিদং কিঞ্চ। ব্রা. নব.

'ধর্ম', দুঃখ ১৩১৪ ফাল্গুন। ১৯০৮

'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ৬, ১৩২৯ ভাদ্র। ১৯২২

স তপোঽতপ্যত

'পথের সঞ্চয়', জলস্থল ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ। ১৯১২

'শান্তিনিকেতন' ২, ছোটো ও বড়ো ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪

স তপস্তপ্‌ত্বা সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-৩৫ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ আগস্ট ২১

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'পথের সঞ্চয়', সীমা ও অসীমতা ১৩১৯ কার্তিক। ১৯১২

'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৩, ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক। ১৯১৭

সোঽকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি

পরোক্ষ উল্লেখ 'বিচিত্র প্রবন্ধ', ছবির অঙ্গ ১৩২২ আষাঢ়। ১৯১৫

'পথে ও পথের প্রান্তে', ১৯২৯ ফেব্রুআরি ২৮

'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব ১৩৪০ ভাদ্র। ১৯৩৩

অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ।…যদ্ বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ…শ্লোকো ভবতি ॥ ২।৭ ব্রা.[১] নব উপ.

আংশিক উদ্‌ধৃতি রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।

'সাহিত্য', সৌন্দর্যবোধ ১৩১৩ পৌষ। ১৯০৬

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬। ১৯১০ জানুআরি

রসো বৈ সঃ

'ধর্ম', দুঃখ ১৩১৪ ফাল্গুন। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ১, প্রার্থনার সত্য ১৩১৫ পৌষ ২০। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬। ১৯১০ জানুআরি

---

১ রসো বৈ সঃ…সোঽভয়ং গতো ভবতি। ব্রা. নব.

'শান্তিনিকেতন' ২, রসের ধর্ম ১৯১০
'শান্তিনিকেতন' ২, সামঞ্জস্য ১৩১৭ মাঘ। ১৯১১
'শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১
'সঞ্চয়', ধর্মের নবযুগ ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১২
'খৃস্ট', মানবসম্বন্ধের দেবতা ১৯২৬ ডিসেম্বর
'The Religion of Man' 1931, Spiritual Union
'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ২
'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, সংযোজন : মানবসত্য-২
'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-৪ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ এপ্রিল ২১

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ১, প্রেম ১৩১৫ অগ্রহায়ণ। ১৯০৮

আংশিক উদ্ধৃতি কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়তি। নব

'শান্তিনিকেতন' ১, প্রার্থনার সত্য ১৩১৫ পৌষ ২০। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ১, প্রাণ ও প্রেম ১৩১৫ চৈত্র ২৮। ১৯০৯

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ ন স্যাৎ।

'ধর্ম', নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ। ১৯০২
'ধর্ম', ধর্মের সরল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ। ১৯০৩
'ধর্ম', দুঃখ ১৩১৪ ফাল্গুন। ১৯০৮
'শান্তিনিকেতন' ১, এ পার ও পার ১৩১৫ পৌষ ১২। ১৯০৮
'শান্তিনিকেতন' ১, আত্মসমর্পণ ১৩১৫ চৈত্র ১৮। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬। ১৯১০ জানুআরি
'সাহিত্যের পথে', কবির কৈফিয়ত ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ। ১৯১৫
'সমাজ', ভারতবর্ষীয় বিবাহ ১৩৩২। ১৯২৫
'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৫, ১৩৩৮ পৌষ। ১৯৩১
'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ৩

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ

'শান্তিনিকেতন' ১, কর্ম ১৩১৫ পৌষ ২৭। ১৯০৯
'রোগশয্যায়', ৩৬-সংখ্যক কবিতা ১৯৪০ ডিসেম্বর

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যে…অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি।

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

ভীষাস্মাদ্‌বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি।...এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ ২।৮

আংশিক উদ্‌ধৃতি ভীষাস্মাদ্‌বাতঃ পবতে। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। ব্রা.

'শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

এতমন্নময়মাত্মানম্...এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি।

পরোক্ষ উল্লেখ 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১৬১ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯৪ অক্টোবর ৯

'কালান্তর', চরকা ১৩৩২ ভাদ্র। ১৯২৫

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১

যতো বাচো নিবর্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চনেতি। এতং হ বাব ন তপতি।... য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ॥ ২।৯

আংশিক উদ্‌ধৃতি যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥ ব্রা.

'আধুনিক সাহিত্য', সাকার ও নিরাকার ১৩০৫ আশ্বিন। ১৮৯৮

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

'ধর্ম', ধর্মের সরল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ। ১৯০৩

'শান্তিনিকেতন' ১, সামঞ্জস্য ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ২৯। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ২, সামঞ্জস্য ১৩১৭ মাঘ। ১৯১১

'শান্তিনিকেতন' ২, আত্মবোধ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ

'আধুনিক সাহিত্য', সাকার ও নিরাকার ১৩০৫ আশ্বিন। ১৮৯৮

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন

'ধর্ম', ধর্মের সরল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ। ১৯০৩

'ধর্ম', ধর্মপ্রচার ১৩১০ ফাল্গুন। ১৯০৪

'ধর্ম', উৎসবের দিন (দু বার) ১৩১১ মাঘ। ১৯০৫

'ধর্ম', আনন্দরূপ ১৩১৩ মাঘ। ১৯০৭

'শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ২, আবির্ভাব ১৩২১ পৌষ ৭। ১৯১৪

ভৃগুর্বৈ বারুণিঃ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ ব্রহ্মেতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা ॥ ৩।১

আংশিক উদ্‌ধৃতি যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্‌ ব্রহ্ম। ব্রা.

'শান্তিনিকেতন' ১, কর্ম ১৩১৫ পৌষ ২৭। ১৯০৯

যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি

'শান্তিনিকেতন' ১, বর্ষশেষ ১৩১৫ চৈত্র ৩১। ১৯০৯

অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। স তপস্তপ্‌ত্বা ॥ ৩।২

আংশিক উদ্‌ধৃতি তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।[১] ব্রা.

'শান্তিনিকেতন' ১, সাধন ১৩১৫ চৈত্র ১০। ১৯০৯

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি। সৈষা ভার্গবী মহান্‌ কীর্ত্যা ॥ ৩।৬

আংশিক উদ্‌ধৃতি আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। ব্রা.

'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১৪৪ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯৪ আগস্ট ১৩

'আধুনিক সাহিত্য', সাকার ও নিরাকার ১৩০৫ আশ্বিন। ১৮৯৮

'ধর্ম', নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ। ১৯০২

'ধর্ম', ধর্মের সরল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ। ১৯০৩

'ধর্ম', দিন ও রাত্রি ১৩১০ মাঘ। ১৯০৪

'শান্তিনিকেতন' ১, কর্ম ১৩১৫ পৌষ ২৭। ১৯০৯

'সাহিত্যের পথে', কবির কৈফিয়ত ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ। ১৯১৫

আনন্দাদ্ধ্যেব জায়ন্তে। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি

'সাহিত্যের পথে', কবির কৈফিয়ত ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ। ১৯১৫

'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৩, ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক। ১৯১৭

---

১ তৈত্তি. ৩।৩, ৩।৪, ৩।৫

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে

'ধর্ম', উৎসব ১৩১২ মাঘ। ১৯০৬

'ধর্ম', দুঃখ ১৩১৪ ফাল্গুন। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ১, প্রেম ১৩১৫ অগ্রহায়ণ। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন', ১, পার্থক্য ১৩১৫ পৌষ ২৩। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, কর্ম ১৩১৫ পৌষ ২৭। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, নির্বিশেষ ১৩১৫ মাঘ ৩। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, স্বভাবকে লাভ ১৩১৫ চৈত্র ৫। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, ধীর যুক্তাত্মা ১৩১৫ চৈত্র ২২। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, ভয় ও আনন্দ ১৩১৫ চৈত্র ২৯। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, শ্রাবণসন্ধ্যা

'শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ (৩ বার) ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

'পথের সঞ্চয়', জলস্থল ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ। ১৯১২

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি জায়ন্তে

'শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

আনন্দাদ্ধ্যেব

'সাহিত্যের পথে', বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশ ১৩৪১ মাঘ। ১৯৩৫

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ২, চিরনবীনতা ১৯১০ জানুআরি

পরোক্ষ উল্লেখ 'পথের সঞ্চয়', যাত্রার পূর্বপত্র ১৩১৯ আষাঢ়। ১৯১২

ঈশা

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥ ১ ব্রা. নব. উপ.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম', ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

'ধর্ম', ধর্মপ্রচার ১৩১০ ফাল্গুন। ১৯০৪

'ধর্ম', ততঃ কিম্ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ। ১৯০৬

'শান্তিনিকেতন' ১, অখণ্ড পাওয়া ১৩১৫ চৈত্র ১৭। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, দীক্ষার দিন ১৩২১ পৌষ ৭। ১৯১৪

'ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ৮, ১৩২২ কার্তিক। ১৯১৫

'কালান্তর', শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন। ১৯২১

'The Religion of Man', Appendix IV 1930 May 25

আংশিক উদ্ধৃতি ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম', ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

'শান্তিনিকেতন' ১, অন্তরবাহির ১৩১৫ ফাল্গুন ৩। ১৯০৯

'চিঠিপত্র' ৭, পত্র-১১ কাদম্বিনী দেবীকে লেখা ১৯০৯ জুলাই ২৬

'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৯১০ জানুআরি

'চারিত্রপূজা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-৪, ১৩৪২ মাঘ ৬। ১৯৩৬

'কালান্তর', শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন। ১৯২১

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং

'ধর্ম', ধর্মপ্রচার ১৩১০ ফাল্গুন। ১৯০৪

'চারিত্রপূজা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-১, ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ ৩। ১৯০৪

'শান্তিনিকেতন' ২, মুক্তির দীক্ষা ১৩২০ পৌষ ৭। ১৯১৩

'শান্তিনিকেতন' ২, অগ্রসর হওয়ার আহ্বান ১৩২০ পৌষ ৭। ১৯১৩

'শান্তিনিকেতন' ২, আবে (দু বার) ১৩২১ পৌষ ৭। ১৯১৪

'কালান্তর', শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন। ১৯২১

যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ

'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, ভক্ত ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ

'The Religion of Man' 1931, Spiritual Union.

'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৫, ১৩৩৮ পৌষ। ১৯৩১

ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ (দু বার) ১৯১০ জানুআরি

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন (দু বার) ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

'কালান্তর', শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন। ১৯২১

'রাশিয়ার চিঠি', অধ্যায় ৭ (দু বার) ১৯৩০ অক্টোবর

ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ

'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯
'পথের সঞ্চয়', অন্তরবাহির ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ ২৫। ১৯১২
মা গৃধঃ
'শান্তিনিকেতন' ২, দীক্ষার দিন ১৩২১ পৌষ ৭। ১৯১৪
'সাহিত্যের পথে', তথ্য ও সত্য ১৩৩১ ভাদ্র। ১৯২৪
'সাহিত্যের পথে', সৃষ্টি ১৩৩১ কার্তিক। ১৯২৭
'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী' ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১৫
'পথে ও পথের প্রান্তে', অধ্যায় ২৯, ১৯২৯ মার্চ
'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১৪, ১৩৩৭ জ্যৈষ্ঠ ১৯৩০
'The Religion of Man' 1931, The Music Maker
'রাশিয়ার চিঠি', অধ্যায় ৭, ১৯৩০ অকটোবর
'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-৩১ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ জুলাই ২৭
'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩
মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্
'রাশিয়ার চিঠি', অধ্যায় ৭, ১৯৩০ অক্টোবর
'পথের সঞ্চয়', সীমার সার্থকতা ১৩১৯ আশ্বিন। ১৯১২
প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ২, সামঞ্জস্য ১৯১০ জানুআরি
'The Religion of Man' 1931, Man's Universe
'The Religion of Man' 1931, The Man of My Heart
'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-৫২ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ অক্টোবর ২১
পূর্ণ অনুবাদ 'The Religion of Man', Appendix IV 1930 May 25
কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥ ২ উপ.
পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১
'ধর্ম', ততঃ কিম্ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ। ১৯০৬
আংশিক উদ্‌ধৃতি কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ
'শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ (দু বার) ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১
এবং ত্বয়ি···ন কর্ম লিপ্যতে নরে
'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০৯
প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'The Religion of Man' 1931, The Man of My Heart

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩

অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥ ৩ উপ.

আংশিক উদ্ধৃতি আত্মহনো জনাঃ

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো

নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।

তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ

তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥ ৪ ব্রা. উপ.

আংশিক উদ্ধৃতি মনসো জবীযো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।

তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫ ব্রা. নব উপ

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'শান্তিনিকেতন' ১, ওঁ ১৩১৫ চৈত্র ১৫। ১৯০৯

আংশিক উদ্ধৃতি তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে

'সঞ্চয়', আমার জগৎ (দ্র বার) ১৩২১ আশ্বিন। ১৯১৪

তদেজতি তন্নৈজতি

'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', পরিশিষ্ট ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১২

তদ্দূরে তদ্বন্তিকে

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১

পূর্ণ অনুবাদ 'The Religion of Man' 1931, The Man of My Heart

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ৬ ব্রা. নব. উপ.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

'শান্তিনিকেতন' ১, নবযুগের উৎসব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬। ১৯১০ জানুআরি

'কালান্তর', শিক্ষার মিলন (দ্র বার) ১৩২৮ আশ্বিন। ১৯২১

'চারিত্রপূজা', ভারতপথিক রামমোহন রায়-১, ১৩৪০ পৌষ ১৪। ১৯৩৩

'বুদ্ধদেব', বুদ্ধদেব ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ। ১৯৩৫

আংশিক উদ্ধৃতি সর্বভূতেষু চাত্মানং

'শান্তিনিকেতন' ১, আশ্রম ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯

* ন ততো বিজুগুপ্সতে[১]

'কালান্তর', শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন। ১৯২১

'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ৭, ১৩৩০ বৈশাখ। ১৯২৩

'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১০, ১৩৩০ পৌষ। ১৯২৩

'রাশিয়ার চিঠি', পরিশিষ্ট : পল্লীসেবা ১৩৩৭ ফাল্গুন। ১৯৩১

'বুদ্ধদেব', বুদ্ধদেব ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ। ১৯৩৫

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥ ৭

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'কালান্তর', শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন। ১৯২১

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
-মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥ ৮ ব্রা. নব. উপ

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'শান্তিনিকেতন' ১, দুই ১৩১৫ মাঘ ৪। ১৯০৯

আংশিক উদ্ধৃতি স পর্যগাচ্ছুক্রম, ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ

'শান্তিনিকেতন' ১, সামঞ্জস্য ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ২৯। ১৯০৮

শুক্রম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্

'পথের সঞ্চয়', আমেরিকার চিঠি ১৩১৯ অগ্রহায়ণ। ১৯১২

শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্

'শান্তিনিকেতন' ১, পাপ ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ২৫। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ১, ভাবুকতা ও পবিত্রতা ১৩১৫ ফাল্গুন ২। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, পরশরতন ১৩১৫ ফাল্গুন ১২। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, আদেশ ১৩১৫ চৈত্র ৯। ১৯০৯

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ

'শান্তিনিকেতন' ২, ছোটো ও বড়ো ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪

যাথাতথ্যতোঽর্থান্…সমাভ্যঃ

১ নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ 'ততো ন বিজুগুপ্সতে' স্থলে 'ন ততো বিজুগুপ্সতে' লিখেছেন। বৃহ. ৪।৪।১৫ মন্ত্রের শেষাংশে 'ন ততো বিজুগুপ্সতে' আছে। উক্ত শ্লোকটিও কবি তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন। বোধ করি সেই কারণেই বর্তমান শ্লোকের প্রসঙ্গে তাঁর এই ভ্রান্তি।

'শান্তিনিকেতন' ১, বিধান ১৩১৫ পৌষ ২১। ১৯০৯
'কালান্তর', কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ১৩২৪ ভাদ্র। ১৯১৭
'কালান্তর', শিক্ষার মিলন (দু বার) ১৩২৮ আশ্বিন। ১৯২১

পরোক্ষ উল্লেখ 'সমালোচনা', মেঘনাদবধ কাব্য ১২৮৯ ভাদ্র। ১৮৮২
'শান্তিনিকেতন' ১, পার্থক্য ১৩১৫ পৌষ ২৩। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ১, স্বভাব লাভ ১৩১৫ চৈত্র ১৬। ১৯০৯

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি · বিদ্যায়াং রতাঃ ॥ ৯ দ্র. বৃহ ৪।৪।১০
বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্‌বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যযামৃতমশ্নুতে ॥ ১১ উপ.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১
'ধর্ম', ততঃ কিম্‌ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ। ১৯০৬
'সঞ্চয়', আমার জগৎ ১৩২১ আশ্বিন। ১৯১৪
'কালান্তর', শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন। ১৯২১

আংশিক উদ্‌ধৃতি অবিদ্যযা মৃত্যুং অমৃতমশ্নুতে
'ভারতবর্ষ', ব্রাহ্মণ ১৩০৯ আষাঢ়। ১৯০২
'শান্তিনিকেতন' ১, কর্ম ১৩১৫ পৌষ ২৭। ১৯০৯
'কালান্তর', শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন। ১৯২১

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদবেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥ ১৪

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্‌।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায দৃষ্টয়ে ॥ ১৫

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'A Vision of India's History' 1923

আংশিক উদ্‌ধৃতি হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্‌
'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ৭, ১৩৩০ বৈশাখ। ১৯২৩

অপাবৃণু

'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ৭ (দু বার) ১৩৩০ বৈশাখ। ১৯২৩
'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী' (তিন বার) ১৯২৪ সেপ্‌টেম্‌বর ২৬
'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী, পরিশিষ্ট (তিন বার) ১৯১৪ সেপ্‌টেম্বর ২৬
'চারিত্রপূজা', ভারতপথিক রামমোহন রায়-২, ১৩৪০ পৌষ ১৬। ১৯৩৩

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ৭, ১৩৩০ বৈশাখ। ১৯২৩
'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৪ সেপ্‌টেম্বর ২৬
'পশ্চিম-যাত্রীর ডাযারী', পরিশিষ্ট (তিন বার) ১৯২৪ সেপ্‌টেম্বর ৬
'জন্মদিনে', ১৩-সংখ্যক কবিতা ১৩৪৭ মাঘ ১১। ১৯৪১

পরোক্ষ উল্লেখ 'শেষসপ্তক', পনেরো-২, ১৯৩৫ এপ্রিল ৮

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য
প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে
পশ্যামি যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬

আংশিক উদ্‌ধৃতি যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
'আত্মপরিচয', অধ্যায় ৫, ১৩৩৮ পৌষ। ১৯৩১
সোঽহমস্মি, অহমস্মি
'সঞ্চয', আমাব জগৎ ১৩২১ আশ্বিন। ১৯১৪

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'জন্মদিনে', ১৩-সংখ্যক কবিতা ১৩৪৭ মাঘ ১১। ১৯৪১

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥ ১৭
অগ্নে নযে সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ ১৮

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি ও অনুবাদ 'তপতী' ১৯২৯, শেষ দৃশ্য
প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'জন্মদিনে', ১৩-সংখ্যক কবিতা ১৩৪৭ মাঘ ১১। ১৯৪১

কেনোপনিষদ্

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি ॥ ১।১ উপ.

আংশিক উদ্‌ধৃতি কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ
'শান্তিনিকেতন' ১, প্রাণ ও প্রেম ১৩১৫ চৈত্র ২৮। ১৯০৯
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং··· প্রাণস্য প্রাণঃ · ॥ ১।২ ব্রা. উপ. দ্র. বৃহ. ৪।৪।১৮

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে ॥ ১।৩ ব্রা. উপ.

আংশিক অনুবাদ অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি
'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ১।৪ ব্রা. নব.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

আংশিক উদ্‌ধৃতি তদ্ বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে[১]
'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১

নেদং যদিদমুপাসতে
'মানুষের ধর্ম', ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ১।৫ ব্রা. নব.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥২।২ ব্রা. নব. উপ.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

আংশিক উদ্‌ধৃতি নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ
'শান্তিনিকেতন' ১, পাওয়া ও না-পাওয়া ১৩১৬ বৈশাখ ৪। ১৯০৯
'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-১ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৯১৩ মে ৬

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতম্ বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥ ২।৩ ব্রা. নব. উপ.

আংশিক উদ্‌ধৃতি অবিজ্ঞাতম্ বিজানতাং…অবিজানতাম্
'শান্তিনিকেতন' ১, পাওয়া ও না-পাওয়া ১৩১৬ বৈশাখ ৪। ১৯০৯

প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্ ॥ ২।৪ উপ.

---

১ ত্বং বিদ্ধি…উপাসতে, কেন ১।৪,৫,৬,৭,৮,৯ মন্ত্র। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই শ্লোকাংশটির 'ত্বং বিদ্ধি' স্থলে 'তদ্বিদ্ধি' লিখেছেন।

আংশিক উদ্ধৃতি প্রতিবোধবিদিতম্

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি

ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ

প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ ২।৫ ব্রা. নব. উপ.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬। ১৯১০ জানুআরি

আংশিক উদ্ধৃতি ইহ চেদবেদীদথ…মহতী বিনষ্টিঃ[১]

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১ (দু বার)

'ভারতপথিক রামমোহন রায়', রামমোহন-প্রসঙ্গ ৩, ১৩১৫ মাঘ। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, নবযুগের উৎসব ১৩১৫ মাঘ ১১। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬। ১৯১০ জানুআরি

ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬। ১৯১০ জানুআরি

প্রশ্নোপনিষদ্

ওঁ সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ, শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্যায়ণী চ গার্গ্যঃ কৌশল্যশ্চাশ্বলায়নো ভার্গবো বৈদর্ভিঃ কবন্ধী কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ। পরং ব্রহ্মান্বেষমাণাঃ…পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ ॥ ১।১ উপ.

আংশিক উদ্ধৃতি ওঁ সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈব্যশ্চ সত্যকামঃ…ব্রহ্মান্বেষমাণাঃ

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

তস্মৈ স হোবাচ…স তপোঽতপ্যত …॥ ১।৪ দ্র. তৈত্তি. ২।৬

তদ্ যে হ তৎ…তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১।১৫

আংশিক উদ্ধৃতি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো…প্রতিষ্ঠিতম্

'ধর্ম', ধর্মপ্রচার ১৩১০ ফাল্গুন। ১৯০৪

ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈক ঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ।

বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্বনঃ ॥ ২।১১

১ মহতী বিনষ্টিঃ, বৃহ. ৪।৪।১৪

আংশিক উদ্ধৃতি ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণ

'চারিত্রপূজা', ভারতপথিক রামমোহন রায়-১, ১৩৪০ পৌষ ১৪ । ১৯৩৩

স যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে।

এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে ॥ ৪।৭ ব্রা. নব.উপ.

আংশিক উদ্ধৃতি যথা সোম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে…সম্প্রতিষ্ঠতে

'ধর্ম', প্রাচীন ভারতের এক: ১৩০৮ ফাল্গুন। ১৯০২

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্বৈঃ

প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।

তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য

স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশ, ইতি ॥ ৪।১১ ব্রা. নব. উপ.

আংশিক উদ্ধৃতি স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশ

'স্বদেশ', সমাজভেদ ১৩০৮। ১৯০১

সর্বমেবাবিবেশ

'ধর্ম', ধর্মপ্রচার ১৩১০ ফাল্গুন। ১৯০৪

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ।

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি ॥ ৬।৬ উপ.

আংশিক উদ্ধৃতি তং বেদ্যং পুরুষং…পরিব্যথাঃ। ব্রা. নব.

'The Religion of Man' 1931, Spiritual Union

'The Religion of Man' 1931, Man's Nature

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-২১ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ জুন ২৩

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-২৯ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ জুলাই ২০

'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব ১৩৪০ ভাদ্র। ১৯৩৩

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-২১ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ জুন ২৩

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩

তং বেদ্যং পুরুষং

'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব ১৩৪০ ভাদ্র। ১৯৩৩

মাণ্ডূক্যোপনিষদ্

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং…নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যম-লক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে।…বিজ্ঞেয়ঃ ॥ মন্ত্র ৭

আংশিক উদ্ধৃতি একাত্মপ্রত্যয়সারং। ব্রা. নব.

'শান্তিনিকেতন' ১, আত্মপ্রত্যয় ১৩১৫ চৈত্র ২১। ১৯০৯

শান্তং শিবমদ্বৈতম্। ব্রা. নব. উপ.

'ধর্ম', ধর্মের সরল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ। ১৯০৩

'বিচিত্র প্রবন্ধ', মন্দির ১৩১০ পৌষ। ১৯০৩

'ধর্ম', শান্তং শিবমদ্বৈতম্ (দু বার) ১৩১৩ পৌষ। ১৯০৬

'ধর্ম', দুঃখ ১৩১৪ ফাল্গুন। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ১, তিন ১৩১৫ পৌষ ২১। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, প্রাণ ১৩১৫ পৌষ ২৯। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, পরশরতন ১৩১৫ ফাল্গুন ১২। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, আদেশ ১৩১৫ চৈত্র ৯। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, ওঁ ১৩১৫ চৈত্র ১৫। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, আশ্রম ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, ভক্ত ১৩১৬ পৌষ ৭। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, চিরনবীনতা (চার বার) ১৯১০ জানুআরি

'চিঠিপত্র' ৭, পত্র-১৫ নির্ঝরিণী সরকারকে লেখা ১৯১০ আগস্ট ৬

'শান্তিনিকেতন' ২, সামঞ্জস্য (তিন বার) ১৯১১ জানুআরি

'চিঠিপত্র' ৭, পরিশিষ্ট : যতীন্দ্রনাথকে লেখা পত্র (দু বার) ১৩১৭ পৌষ ১৮। ১৯১১

'চিঠিপত্র' ৭, পরিশিষ্ট : যতীন্দ্রনাথকে লেখা পত্র ১৩১৭ ফাল্গুন ৯। ১৯১১

'সঞ্চয়', ধর্মশিক্ষা (দু বার) ১৩১৮ মাঘ। ১৯১২

'শান্তিনিকেতন' ২, প্রতীক্ষা ১৩২০ পৌষ ৭। ১৯১৩

'শান্তিনিকেতন' ২, ছোটো ও বড়ো ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪

'শান্তিনিকেতন' ২, একটি মন্ত্র ১৩২০ মাঘ ১৫। ১৯১৪

'শান্তিনিকেতন' ২, সৃষ্টির ক্রিয়া (দু বার) ১৩২১ কার্তিক। ১৯১৪

'শান্তিনিকেতন' ২, আরো (দু বার) ১৩২১ পৌষ ৭ । ১৯১৪
'শান্তিনিকেতন' ২, অন্তরতর শান্তি (দু বার) ১৩২১ পৌষ ৭ । ১৯১৪
'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৩ (দু বার) ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক । ১৯১৭
'কালান্তর', শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন । ১৯২১
'A Vision of India's History' 1923
'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', পরিশিষ্ট (তিন বার) ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১২
'চিঠিপত্র' ৭, পত্র-৯২ কাদম্বিনী দত্তকে লেখা ১৯২৮ ফেব্রুআরি ৩
'ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ৬, ১৩৩৫ মাঘ । ১৯২৯
'চারিত্রপূজা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-৪, ১৩৪২ মাঘ ৬ । ১৯৩৬

পরোক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন', সামঞ্জস্য ১৯১১ জানুআরি
'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৩, ১৩১৪ আশ্বিন-কার্তিক । ১৯১৭
'কালান্তর', প্রলয়ের সৃষ্টি ১৩৪৪ পৌষ । ১৯৩৭
'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৬, ১৩৪৭ বৈশাখ । ১৯৭০

মহানারায়ণ উপনিষদ্

যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্ ॥ ২।৩ দ্র. য. বা. মা. ৩২।৮
স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ॥ ২।৫ দ্র য বা. মা. ৩২।১০
ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্তং তপো দানং।
তপো যজ্ঞস্তপো ভূর্ভুবঃ সুবর্ব্রহ্মৈতদুপাস্যৈতৎ তপঃ ॥ ৮।৮

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'ধর্ম', ধর্মপ্রচার ১৩১০ ফাল্গুন । ১৯০৪

পরিশেষ ঃ মহানির্বাণতন্ত্র

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্ ।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্ ॥ ৩।৬১ ব্রা. নব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্
'ধর্ম', দুঃখ ১৩১৪ ফাল্গুন । ১৯০৮
'শান্তিনিকেতন' ১, দীক্ষা ১৩১৫ পৌষ ৭ । ১৯০৮
'শান্তিনিকেতন' ১, ভয় ও আনন্দ ১৩১৫ চৈত্র ২৯ । ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, সুন্দর ১৩১৭ চৈত্র ১৫ । ১৯১১

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।

যদ্ যদ্ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥ ৮।২৩ ব্রা.[১] নব.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'ভারতবর্ষ', প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ। ১৯০১

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম' ১৩০৮ শ্রাবণ । ১৯০১

'A Vision of India's History' 1923

আংশিক উদ্ধৃতি যদ্ যদ্ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ

'শান্তিনিকেতন' ১, ত্যাগের ফল ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ২৮। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ১, কর্ম ১৩১৫ পৌষ ২৭। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ২, কর্মযোগ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

'ধর্ম', মনুষ্যত্ব ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১২

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম'[২] (দু বার) ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

পরোক্ষ উল্লেখ 'চারিত্রপূজা', মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-২, ১৩১১ মাঘ। ১৯০৫

ন বিভেতি রণাদ্ যো বৈ সংগ্রামেঽপ্যপরাঙ্মুখঃ।

ধর্মযুদ্ধে মৃতো বা পি তেন লোকত্রয়ং জিতম্ ॥ ৮।৬৭ ব্রা.

আংশিক উদ্ধৃতি ধর্মযুদ্ধে মৃতো··· লোকত্রয়ং জিতম্

'ইতিহাস', পরিশিষ্ট ২ : ঐতিহাসিক চিত্র ১৩০৫ ভাদ্র। ১৮৯৮

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২

'চার অধ্যায়' ১৯৩৪, তৃতীয় অধ্যায়

পরোক্ষ উল্লেখ 'সমাজ', হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন

'মহাত্মা গান্ধী', মহাত্মা গান্ধী ১৩৪৪ আশ্বিন। ১৯৩৭

১ এই শ্লোকের 'তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ' পাঠটি ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং রবীন্দ্রনাথ তারই অনুসরণে এই পাঠ রেখেছেন। মহানির্বাণতন্ত্রের প্রচলিত সংস্করণগুলিতে পাই 'ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ'।

২ এই পুস্তিকায় কবি শ্লোকটিকে মনুর উক্তি বলে উল্লেখ করেছেন।

বৌদ্ধ সাহিত্য

বৌদ্ধ শাস্ত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের কথা সুবিদিত। তাঁর উৎসাহেই পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী পালি ভাষা শিক্ষা করে বৌদ্ধ শাস্ত্রে পারঙ্গম হয়েছিলেন এবং কবির নির্দেশে তাঁর তত্ত্বাবধানে রথীন্দ্রনাথকে 'ধম্মপদ' গ্রন্থখানি কণ্ঠস্থ এবং অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' গ্রন্থটি অনুবাদ করতে হয়েছিল। কবি স্বয়ং এই অনুবাদের কিছু অংশ সংশোধন করে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনার জন্য তিনি বিশ্বভারতীতে ভিক্ষুদের আমন্ত্রণ ও তাঁদের বক্তৃতার আয়োজন করে সোৎসাহে সেগুলিতে উপস্থিত থাকতেন।

ত্রিপিটক শাস্ত্রের সঙ্গে কবির প্রত্যক্ষ পরিচয় কতদূর ছিল, তা জানা না গেলেও রবীন্দ্রসাহিত্যে তার কিছু উদ্‌ধৃতি চোখে পড়ে। এ স্থলে সেগুলি সংকলিত হল। এই শ্লোকের যেগুলি ধর্মরাজ বড়ুয়ার 'হস্তসার' গ্রন্থে (১৮৯৩) এবং পুন্নানন্দ সামীর 'রতনমালা' গ্রন্থে (১৯১২) পাওয়া গেছে সেগুলি যথাক্রমে 'হস্ত.' এবং 'রত্ন.' শব্দে চিহ্নিত করা হয়েছে। ত্রিপিটক-বহির্ভূত কতকগুলি অর্বাচীন পালি শ্লোক কেবলমাত্র হস্তসার এবং রত্নমালায় পাওয়া গেছে। সেগুলিও উল্লিখিত হল। এই সংকলনের শেষ তিনটি উদ্‌ধৃতির উৎস নির্ণয় করা যায় নি।

'বুদ্ধচরিত' বা 'মহাশ্রদ্ধোৎপাদন শাস্ত্র'-এর সঙ্গে কবির পরিচয় থাকলেও এগুলি থেকে কবি কোনো উদ্‌ধৃতি ব্যবহার করেন নি। তবে ললিতবিস্তরের যে অংশটুকু কবি উদ্‌ধৃত করেছেন সেটি এ স্থলে উল্লিখিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলতে হয় যে রত্নমালা বা ললিতবিস্তরের পাঠের সঙ্গে কবির পাঠের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। তবে এই সংকলনে রবীন্দ্রধৃত পাঠই উল্লিখিত হল।

অশোকের শিলালিপিগুলির সঙ্গেও যে কবির কিছু পরিচয় ছিল, এমন অনুমান অসংগত নয়। 'বৌদ্ধ সাহিত্য ও সংস্কৃতি' অধ্যায়ে তার প্রমাণ দেখা গেছে। কিন্তু সেসবই পরোক্ষ প্রমাণ মাত্র। কবি কোথাও শিলালিপিগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে উদ্‌ধৃত বা উল্লেখ করেন নি। তাই এই তালিকায় সেগুলিকে স্থান দেওয়া হল না।

সুত্তপিটক

খুদ্দকনিকায় : সুত্তনিপাত : করণীয়মেত্তসুত্ত

করণীয়মত্থকুসলেন যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ।
সক্কো উজূ চ সুহুজূ চ সুবচো চস্স মুদু অনতিমানী ॥ ১

সন্তুস্সকো চ সুভরো চ অপ্পকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি ।
সন্তিন্দ্রিয়ো চ নিপকো চ অপ্পগব্‌ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো ॥ ২
ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি যেন বিঞ্ঞূ পরে উপবদেয়্যুং ।
সুখিনো বা খেমিনো বা সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা ॥ ৩
যে কেচি পাণভূতত্থি তসা বা থাবরা বা অনবসেসা ।
দীঘা বা যে মহন্তা বা মজ্‌ঝিমা রস্সকা অণুকথূলা ॥ ৪
দিট্‌ঠা বা যে চ অদিট্‌ঠা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে ।
ভূতা বা সম্ভবেসী বা সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা ॥ ৫
ন পরোপরং নিকুব্বেথ নাতিমঞ্ঞেথ কথচি ন কঞ্চি ।
ব্যারোসনা পটিঘসঞ্ঞা নঞ্ঞমঞ্ঞস্স দুক্খমিচ্ছেয্য ॥ ৬
মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে ।
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং ॥ ৭
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং ।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং ॥ ৮
তিট্‌ঠং চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো ।
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু ॥ ৯
দিট্‌ঠিং চ অনুপগম্ম সীলবা দস্সনেন সম্পন্নো ।
কামেসু বিনেয্য গেধং নহিজ্জাতু গব্ভসেয্যং পুনরেতীতি ॥ ১০

হস্ত. রত্ন.

পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অনুবাদ করণীয়মত্থকুসলেন·· বিহারমিধমাহু ॥ ১-৯
'শান্তিনিকেতন' ১, ব্রহ্মবিহার ১৩১৫ চৈত্র ১১ । ১৯০৯
মাতা যথা নিযং পুত্তং···বিহারমিধমাহু ॥ ৭-৯
পূর্ণ উদ্ধৃতি 'ধর্ম', উৎসবের দিন ১৩১১ মাঘ । ১৯০৫
'বুদ্ধদেব', বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ ১৩১৮ । ১৯১১
মাতা যথা···ভাবয়ে অপরিমাণং ॥ ৭
পূর্ণ উদ্ধৃতি 'মানুষের ধর্ম', ১৯৩৩, অধ্যায় ৩
আংশিক উদ্ধৃতি মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং
'শান্তিনিকেতন' ১, পূর্ণতা ১৩১৫ চৈত্র ১২ । ১৯০৯
প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬ । ১৯১০ জানুআরি
'সাহিত্যের পথে', সৃষ্টি ১৩৩১ কার্তিক । ১৯২৪

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-২০ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৩৩৮ আষাঢ়।

১৯৩১

'ন পরোপরং··· বিহারমিধমাহু ॥ ৬-৯

পূর্ণ অনুবাদ 'Sadhana' 1920, Realisation in Love

'The Religion of Man' 1931, Spiritual Union

খুদ্দকনিকায় : সুত্তনিপাত : মেত্তভাবনা

ইমস্মিং বিহারে ইমস্মিং গোচরগামে ইমস্মিং নগরে ইমস্মিং বঙ্গদেসে ইমস্মিং জনপদে ইমস্মিং জম্বুদীপে, ইমস্মিং পঠবিয়ং ইমস্মিং চক্কবালে ইস্‌সরজনা সীমট্ঠকদেবতা সব্বে সত্তা অবেরা হোন্তু অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু অনীঘা হোন্তু সুখী অত্তানং পরিহরন্তু দুক্‌খা মুঞ্চন্তু যথালদ্ধসম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু কম্মসসকা ॥ ২

হস্ত. রত্ন.

আংশিক উদ্‌ধৃতি সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু। সব্বে সত্তা দুকখাপমুঞ্চন্তু। সব্বে সত্তা মা যথালদ্ধ-সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।[১]

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ৩

সব্বে সত্তা ·পরিহরন্তু। সব্বে সত্তা মা যথালদ্ধ-সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।

'শান্তিনিকেতন' ১, ব্রহ্মবিহার ১৩১৫ চৈত্র ১১। ১৯০৯

খুদ্দকনিকায় : খুদ্দকপাঠ : মঙ্গলসুত্ত

বহূ দেবা মনুস্‌সা চ মঙ্গলানি অচিন্তয়ুং।
আকঙ্খমানা সোত্থানং ব্রূহি মঙ্গলমুত্তমম্ ॥ ১
অসেবনা চ বালানং পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা।
পূজা চ পূজনেয্যানং এতং মঙ্গলমুত্তমম্ ॥ ২
পতিরূপদেসবাসো পুব্বে চ কতপুঞ্ঞতা।
অত্তসম্মাপণিধি চ এতং মঙ্গলমুত্তমম্ ॥ ৩

১ এই অংশটুকু মেত্তভাবনার প্রথম এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষাংশেও দেখা যায়। অবশ্য রবীন্দ্র-উদ্‌ধৃত পাঠ মূল পাঠ থেকে সামান্য স্বতন্ত্র।

বহুসথঞ্চ সিপ্পঞ্চ বিনয়ো চ সুসিক্খিতো।
সুভাসিতা চ যা বাচা এতং মঙ্গলমুত্তমম্‌॥ ৪
মাতাপিতু-উপট্‌ঠানং পুত্তদারস্‌স সংগহো।
অনাকুলা চ কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমম্‌॥ ৫
দানঞ্চ ধম্মচরিয়ঞ্চ ঞ্‌ঞাতকানঞ্চ সংগহো।
অনবজ্জানি কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমম্‌॥ ৬
আরতী বিরতি পাপা মজ্জপানা চ সঞ্‌ঞমো।
অপ্‌পমাদো চ ধম্মেসু এতং মঙ্গলমুত্তমম্‌॥ ৭
গারবো চ নিবাতো চ সন্তুট্‌ঠী চ কতঞ্‌ঞ্ঞুতা।
কালেন ধম্মসবনং এতং মঙ্গলমুত্তমম্‌॥ ৮
খন্তী চ সোবচস্‌সতা সমণানঞ্চ দস্‌সনং।
কালেন ধম্মসাকচ্ছা এতং মঙ্গলমুত্তমম্‌॥ ৯
তপো চ ব্রহ্মচরিয়ঞ্চ অরিয়সচ্চান দস্‌সনং।
নিব্বানসচ্ছিকিরিয়া এতং মঙ্গলমুত্তমম্‌॥[১] ১০
ফুট্‌ঠস্‌স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্‌স ন কম্পতি।
অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গলমুত্তমম্‌॥ ১১
এতাদিসানি কত্বান সব্বত্থমপরাজিতা।
সব্বত্থ সোত্থি গচ্ছন্তি তং তেসং মঙ্গলমুত্তমন্তি॥ ১২ হস্ত. রত্ন.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি ও অনুবাদ 'শান্তিনিকেতন' ১, ব্রহ্মবিহার ১৩১৫ চৈত্র ১১। ১৯০৯

খুদ্দকনিকায় : ধম্মপদ : যমকবগ্‌গো

মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া।
মনসা চে পদুট্‌ঠেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো নং দুক্‌খমন্বেতি চক্কং ব বহতো পদং॥ ১

আংশিক উদ্‌ধৃতি মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া
'প্রাচীন সাহিত্য', ধম্মপদং ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ। ১৯০৫

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে।
যে তং ন উপনয্‌হন্তি বেরং তেসূপসম্মতি॥ ৪

---

১ এই ১০-সংখ্যক শ্লোকটি হস্তসার গ্রন্থে (১৮৯৩সং) বাদ পড়েছে। ৯-এর পরই ১১-সংখ্যক শ্লোকটি ছাপা হয়েছে। তবে 'সান্বয়ার্থ' স্থানে শ্লোকটি উল্লিখিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অনুবাদ 'প্রাচীন সাহিত্য', ধম্মপদং ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ। ১৯০৫

খুদ্দকনিকায় : ধম্মপদ : কোধবগ্‌গো

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেনালিকবাদিনং॥ ৩ নব.

আংশিক উদ্ধৃতি অক্কোধেন জিনে কোধং

'বুদ্ধদেব', বুদ্ধদেব ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ ৪। ১৯৩৫

দীঘনিকায় : আটানাটিয় সুত্ত

বচসা মনসা চেব বন্দামেতে তথাগতে।
সয়নে আসনে ঠানে গমনে চাপি সব্বদা॥ ১৫ হস্ত. রত্ন

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'নটীর পূজা' ১৯২৬, দ্বিতীয় অঙ্ক

কম্মট্‌ঠানং সীলানুস্‌সতি

আংশিক উদ্ধৃতি ইধ অবিযসাবকো অত্তনো সীলানি অনুস্‌সরতি। অখণ্ডানি অচ্ছিদ্দানি, অসবলানি অকম্মাসানি ভুজিস্‌সানি বিঞ্‌ঞুপ্‌পসত্থানি অপবামট্‌ঠানি সমাধিসংবত্তনিকানি॥ হস্ত.

'শান্তিনিকেতন' ১, ব্রহ্মবিহার ১৩১৫ চৈত্র ১১। ১৯০৯

রতনত্তয়-পণাম-গাথা

বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণামহাণ্ণবো
যোচ্চন্ত সুদ্ধব্বর-ঞানলোচনো।
লোকস্‌স পাপূপকিলেসঘাতকো
বন্দামি বুদ্ধম্ অহমাদবেণ তম্॥ হস্ত.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'চণ্ডালিকা' ১৯৩৩, প্রথম দৃশ্য ও দ্বিতীয় দৃশ্য

বুদ্ধাভিগীতি

নত্থি মে সরণং অঞ্‌ঞং বুদ্ধো মে সরণং বরং
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং॥[১] হস্ত. রত্ন.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'নটীর পূজা' ১৯২৬, চতুর্থ অঙ্ক

১ রবীন্দ্রধৃত এই পাঠটি 'রত্নমালায়' দেখা গেছে। 'হস্তসার' গ্রন্থের পাঠ ঈষৎ পরিবর্তিত।

ত্রিশরণ

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি ॥ হস্ত.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'নটীর পূজা' ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্ক ও চতুর্থ অঙ্ক (পাঁচ বার)।

গাথায় অষ্টশীল বর্ণনা

পাণং ন হানে ন চদিন্নমাদিয়ে
মুসা ন ভাসে ন চ মজ্জপো সিয়া।
অব্রহ্মচরিয়া বিরমেয্য মেথুনা
রত্তিং ন ভুঞ্জেয্য বিকালভোজনং ॥ ১ বত্থু.

আংশিক উদ্ধৃতি পাণং ন হানে···ন চ মজ্জপো সিয়া ॥
'শান্তিনিকেতন' ১, ব্রহ্মবিহার ১৩১৫ চৈত্র ১১। ১৯০৯

সুপুব্বণ্হসুত্ত

ভবতু সব্বমঙ্গলং রক্‌খন্তু সব্বদেবতা।
সব্ববুদ্ধানুভাবেন সদা সোত্থী ভবন্তু তে ॥ ৭ রত্ন.
মহাকারুণিকো নাথো হিতায় সব্বপাণিনং।
পূরেত্বা পারমী সব্বা পত্তো সম্বোধিমুত্তমম্ ॥ ৮ হস্ত. রত্ন.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'নটীর পূজা' ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক

বুদ্ধ-বন্দনা

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়
নমো নমো গোতম-চন্দিমায়।
নমো নমোনন্তগুণন্নবায়
নমো নমো সাকিয়নন্দনায় ॥ রত্ন.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'নটীর পূজা' ১৯২৬, দ্বিতীয় অঙ্ক
'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য ১৯৩৮, দ্বিতীয় দৃশ্য

উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসু বরুত্তমং।
বুদ্ধো যো খলিতো দোসো বুদ্ধো খমতু তং মম ॥ রত্ন.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'নটীর পূজা', দ্বিতীয় অঙ্ক ও তৃতীয় অঙ্ক

ত্রিরত্ন-বন্দনা

যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে
মারং সসেনং মহতিং বিজেত্বা।
সম্বোধিমাগঞ্ছি অনন্তঞাণো
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং ॥ রত্ন.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'নটীর পূজা' ১৯২৬, দ্বিতীয় অঙ্ক
'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য ১৯৩৮, প্রথম দৃশ্য

পূজা : ফুল-সুগন্ধি-প্রদীপ ও আহার -পূজা

বন্ন-গন্ধ-গুণোপেতং এতং কুসুমসন্ততিং
পূজয়ামি মুনিন্দস্স সিরি-পাদ-সরোরুহে।
গন্ধ -সম্ভার-যুত্তেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা
পূজয়ে পূজনেয্যন্ত্যং পূজাভাজনমুত্তমং।
ঘনসারপ্পদিত্তেন দীপেন তমধংসিনা
তিলোকদীপং সম্বুদ্ধং পূজয়ামি তমোনুদং।
অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপ্পিতং
অনুকম্পং উপাদায় পতিগণ্হাতুমুত্তমং ॥ রত্ন.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'নটীর পূজা' ১৯২৬, দ্বিতীয় অঙ্ক
বন্ন-গন্ধ-গুণোপেতং··· পূজাভাজনমুত্তমং

ভাবানুবাদ 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য ১৯৩৮, দ্বিতীয় দৃশ্য
ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে
নমঃ সংঘায় মহত্তমায়
নমঃ পরমশান্তায় মহাকারুণিকায়।

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'নটীর পূজা' ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক
ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে
নমো ধর্মায় তারিণে
নমঃ সংঘায় মহত্তমায়
নমঃ মদ্বিতায় অনাথায় অনুকম্পায় যে বিভো।

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'নটীর পূজা' ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক

ইতিবুত্তকং

আংশিক উদ্ধৃতি যস্‌সঁ রাগো চ দোসো চ অবিজ্জা চ বিরাজিতা
তম্‌ ভাবিতত্তঞ্‌ঞতরম্‌ ব্রহ্মভূতম্‌ তথাগতম্‌।
বুদ্ধম্‌ বেরভয়াতীতম্‌ আহু সব্বপহায়িনন্তি।
'বুদ্ধদেব', বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ ১৩১৮। ১৯১১

ললিতবিস্তর

সুবসন্তকে ঋতুবরে আগতকে
রতিমো প্রিয়াফুল্লিতপাদপকে
তবরূপ সুরূপ সুশোভনকো
বসবর্তী সুলক্ষণবিচিত্রিতকো ॥ ২১।২
বয়ং জাত সুজাত সুসংস্থিতিকাঃ
সুখকারণ দেব নরাণবসম্ভূতিকাঃ।
উত্থি লঘু পরিভুঙ্ক্ষ সুযৌবনকং
দুর্লভ বোধি নিবর্তয় মানসকম্‌ ॥[১] ২১।২
পূর্ণ উদ্ধৃতি 'শব্দতত্ত্ব', বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ ১৩০৫। ১৮৯৮

১ রবীন্দ্রধৃত এই পাঠের সঙ্গে Dr. Lefmann-সম্পাদিত 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থের (১৯০২) পাঠের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়।

রামায়ণ

বাল্মীকি-রামায়ণের ঋজুপাঠে ধৃত অংশটুকুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে বাল্যেই পরিচয় হয়েছিল, 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থ থেকে তা জানা যায়। তবে সমগ্র সংস্কৃত রামায়ণের সঙ্গে তিনি কতদূর পরিচিত ছিলেন তা জানা যায় নি। রবীন্দ্রসাহিত্যে রামায়ণের উদ্‌ধৃতির পরিমাণও অপেক্ষাকৃত স্বল্প। এ স্থলে রবীন্দ্র-ব্যবহৃত উদ্‌ধৃতিগুলি সংকলিত হল। উদ্‌ধৃত শ্লোকের পাশে যথাক্রমে রামায়ণ কাব্যের কাণ্ডগুলির সর্গ ও শ্লোকের সংখ্যা উল্লিখিত হল।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, রামায়ণে প্রচলিত বিভিন্ন সংস্করণগুলির সর্গ ও শ্লোক-সংখ্যা সর্বত্র এক নয়। বিশেষতঃ এই সংকলনে উদ্‌ধৃত আদিকাণ্ডের প্রথম দুটি শ্লোক (আদি ১৬, ১।১০) রামায়ণের সব সংস্করণে পাওয়া যায় না। সুতরাং উক্ত শ্লোক দুটি শ্রীযদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন -সম্পাদিত 'বাল্মীকীয়ং রামায়ণং' আদিকাণ্ডঃ, প্রথম খণ্ড (সম্বৎ ১৯২০) গ্রন্থ থেকে এবং অন্যান্য শ্লোক পণ্ডিত কাশীনাথ শর্মা -সম্পাদিত রামায়ণ (বম্বে, নির্ণয়সাগর প্রেস ১৯১০) থেকে গৃহীত হল।

আদিকাণ্ড

সমগ্রা রূপিণী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরম্।
অনিলানলসূর্যেন্দুশক্রোপেন্দ্রসমশ্চ কঃ॥ ১।৬

আংশিক উদ্‌ধৃতি সমগ্রা রূপিণী · নরম্

'প্রাচীন সাহিত্য', রামায়ণ ১৩১০ পৌষ ৫। ১৯০৩

দেবেষ্বপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভির্গুণৈর্যুতম্।
শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভির্যো যুক্তো নরচন্দ্রমাঃ॥ ১।১০

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'প্রাচীন সাহিত্য', রামায়ণ ১৩১০ পৌষ ৫। ১৯০৩

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥ ২।১৫ নব.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ১৮৮১, পঞ্চম দৃশ্য

অযোধ্যাকাণ্ড

একৈকং পাদপং গুল্মং লতাং বা পুষ্পশালিনীম্।
অদৃষ্টরূপাং পশ্যন্তী রামং পপ্রচ্ছ সাবলা॥ ৫৫।২৯

রমণীয়ান্ বহুবিধান্ পাদপান্ কুসুমোৎকরান্।
সীতাবচনসংরব্ধ আনয়ামাস লক্ষ্মণঃ ॥ ৫৫।৩০
বিচিত্রবালুকাজলাং হংসসারসনাদিতাম্।
রেমে জনকরাজস্য সুতা প্রেক্ষ্য তদা নদীম্ ॥ ৫৫।৩১

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি ও অনুবাদ 'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

সুরম্যমাসাদ্য তু চিত্রকূটং
নদীঞ্চ তাং মাল্যবতীং সুতীর্থাম্।
ননন্দ হৃষ্টো মৃগপক্ষিজুষ্টাং
জহৌ চ দুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ ॥ ৫৬।৩৫

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি ও অনুবাদ 'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

পুত্রব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাম্প্রতম্।
এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যসি ॥ ৬৪।৫৪

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'কালমৃগয়া' ১৮৮২, ষষ্ঠ দৃশ্য

দীর্ঘকালোষিতস্তস্মিন্ গিরৌ গিরিবনপ্রিয়ঃ।
বৈদেহ্যাঃ প্রিয়মাকাঙ্ক্ষন্ স্বং চ চিত্তং বিলোভয়ন্ ॥ ৯৪।১

আংশিক উদ্‌ধৃতি দীর্ঘকালোষিতঃ…বনপ্রিয়ঃ
'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ।
মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্ ॥ ৯৪।৩

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি ও অনুবাদ 'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

অরণ্যকাণ্ড

শরণ্যং সর্বভূতানাম্ সুসংমৃষ্টাজিরং সদা।
মৃগৈর্বহুভিরাকীর্ণং পক্ষিসংঘৈঃ সমাবৃতম্ ॥ ১।৩

আংশিক উদ্‌ধৃতি শরণ্যং সর্বভূতানাম্
'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

মহাভারত

রবীন্দ্রনাথ কাশীরাম দাস এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে জানা গেছে। কিন্তু ব্যাসদেব -কৃত মূল সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় কতদূর ছিল তা নিঃসংশয়ে বলার উপায় নেই। এ স্থলে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রাপ্ত সংস্কৃত মহাভারতের শ্লোকগুলি সংকলিত হল। অবশ্য এই সংকলনে সর্বত্র উদ্‌ধৃতিগুলি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় নি। পাঠান্তরবশতঃ অথবা ভাবের প্রয়োজনে কবি উদ্‌ধৃতি-গুলির কিছু পরির্তন করেছেন। যেমন আদি ১।১১১ শ্লোকে 'বিজয়ায়' স্থলে করেছেন 'মরণায়' এবং উদ্যোগ ৩৩।৫৫ শ্লোকে 'শক্তানাং' স্থলে করেছেন 'শক্তস্য'।

রবীন্দ্র-ব্যবহৃত শ্লোকের অধিকাংশই 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেগুলি ব্রা. অক্ষরে চিহ্নিত করা হল। আর প্রত্যেক পর্বের অন্তর্গত শ্লোকের পাশে পাশে অধ্যায় ও শ্লোকের সংখ্যা উল্লিখিত হল।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, মহাভাবতেব বিভিন্ন প্রচলিত সংস্করণগুলিতে অধ্যায় ও শ্লোকের সংখ্যায় যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এই সংকলনে পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ -সম্পাদিত সংস্করণ অনুযায়ী অধ্যায় ও শ্লোকের সংখ্যা দেওয়া হল। শুধু অনুশাসন ও শান্তিপর্বের অন্তর্গত শ্লোকের সংখ্যা বর্ধমান সংস্করণ মহাভারত থেকে গৃহীত হল[১]।

আদিপর্ব

যদাশ্রৌষং ধনুরায়ম্য চিত্রং
বিদ্ধং লক্ষ্যং পাতিতং বৈ পৃথিব্যাম্।
কৃষ্ণাং হৃতাং প্রেক্ষতাং সর্বরাজ্ঞাং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥ ১।১১১

আংশিক উদ্‌ধৃতি তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়[২]

'চিঠিপত্র' ৭, পত্র-৭৭ কাদম্বিনী দেবীকে লেখা ১৯২২ ফেব্রুআরি ৫

তদা নাশংসে মরণায় সঞ্জয়

'গোরা' ১৯১০, অধ্যায় ২

১ পরবর্তী উৎস নির্দেশে এই আকর গ্রন্থগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে।

২ শ্লোকটির এই চতুর্থ চরণ আদি ১।১১২-১৭৩ পর্যন্ত প্রত্যেক শ্লোকেই দেখা যায়।

न জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥[১] ৬৩।৫২ ব্রা. নব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে
'ধর্ম', ততঃ কিম্‌ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ। ১৯০৬
'চিরকুমার সভা'[২] ১৯২৬, চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য

প্রাজ্ঞস্তু জল্পতাং পুংসাং শ্রুত্বা বাচঃ শুভাশুভাঃ।
গুণবদ্‌বাক্যমাদত্তে হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ॥[৩] ৮৮।৯১

পরোক্ষ উল্লেখ 'পঞ্চভূত', গদ্য ও পদ্য ১২৯৯ ফাল্গুন। ১৮৯৩

প্রহরিষ্যন্‌ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ প্রহরন্নপি ভারত।
প্রহৃত্য চ কৃপায়ীত শোচেত চ রুদেত চ॥[৪] ১৩৫।৫৬

পূর্ণ অনুবাদ সাহিত্য-প্রসঙ্গ, বঙ্গদর্শন ১৩০৮ বৈশাখ[৫]

বনপর্ব

ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ।
আত্মনৈব হতঃ পাপো যঃ পাপং কর্তুমিচ্ছতি॥ ১৭৫।৪৪

আংশিক উদ্‌ধৃতি ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ
'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২

অহিংসা পরমো ধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।
সত্যে কৃত্বা প্রতিষ্ঠাং তু প্রবর্তন্তে প্রবৃত্তয়ঃ॥ ১৭৫।৭৩

আংশিক উদ্‌ধৃতি অহিংসা পরমো ধর্মঃ[৬]
'রাজাপ্রজা', অপমানের প্রতিকার ১৩০১ ভাদ্র। ১৮৯৪

---

১ মহা আদি ৭৩।১২, মনু ২।৯৪

২ দ্র. 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, একাদশ পরিচ্ছেদ

৩ হংসঃ ক্ষীরমিবাম্ভসঃ, যোগ. ১৬।১১

৪ সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারে এই শ্লোকের একটি পাঠান্তর পাওয়া যায়।—

প্রহরিষ্যন্‌ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ প্রহৃত্যাপি প্রিয়োত্তরম্‌।
অপি চাস্য শিরশ্ছিত্ত্বা রুদ্যাৎ শোচেৎ তথাপি চ॥

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ এই পাঠান্তরের অনুসরণেই কৃত। দ্র. 'রূপান্তর' ১৯৬৫, পৃ ৪০, ৪৪

৫ দ্র. 'রূপান্তর' (বিশ্বভারতী, ১৯৬৫), গ্রন্থপরিচয়, পৃ ২০৭

৬ মহা. অনুশাসন ১১৬।৩৮

'নটীর পূজা' ১৯২৬, দ্বিতীয় অঙ্ক

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥[১] ২৬৭।৮৪

আংশিক উদ্ধৃতি ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্

'সঞ্চয়', ধর্মের অর্থ ১৩১৮ আশ্বিন-কার্তিক। ১৯১১

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ

'কালান্তর', লোকহিত ১৩২১ ভাদ্র। ১৯১৪

'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৫, ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৩২৬ অগ্রহায়ণ। ১৯১৯

উদ্যোগপর্ব

একমেবাদ্বিতীয়ং যত্তদ্রাজন্! নাববুধ্যসে।
সত্যং স্বর্গস্য সোপানং পারাবারস্য নৌরিব ॥ ৩৩।৫৩

আংশিক উদ্ধৃতি একমেবাদ্বিতীয়ম্

'ঔপনিষদ ব্রহ্ম', ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

'ধর্ম', বর্ষশেষ ১৩০৮ চৈত্র। ১৯০২

'ধর্ম', নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ। ১৯০২

'শান্তিনিকেতন' ১, নবযুগের উৎসব (ছ বার) ১৯০৯ এপ্রিল

'শান্তিনিকেতন' ২, আত্মবোধ (তিন বার) ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

'চারিত্রপূজা', ভারতপথিক রামমোহন রায়-২, ১৩৪০ পৌষ ১৬। ১৯৩৩

সোহস্য দোষো ন মন্তব্যঃ ক্ষমা হি পরমং বলম্।
ক্ষমা গুণোহ্যশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা ॥ ৩৩।৫৫ ব্রা. নব.

আংশিক উদ্ধৃতি শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা

'সাহিত্য', সৌন্দর্যবোধ ১৩১৩ পৌষ। ১৯০৬

ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥[২] ৩৭।১৭

---

১ গরুড় ১০৯।৫১ (ঈষৎ পারবর্তিত), সুভা. বল্লভ ৩৪৩৭

২ চাণক্য ২৯, প. মি. ৩৮৬, প. কাকো. ৮২, হি. মি. লা. ১৫৮, গরুড় ১০৯।২, শার্ঙ্গ ১৪৬২

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'ধর্ম', ততঃ কিম্ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ। ১৯০৬

আংশিক উদ্ধৃতি আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ

'ভারতবর্ষ', চীনেম্যানের চিঠি ১৩০৯ আষাঢ়। ১৯০২

আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।

আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি ॥[1] ৩৭।১৮

আংশিক উদ্ধৃতি আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি

'বিবিধ প্রসঙ্গ', স্ত্রৈণ ১২৮৮ ভাদ্র। ১৮৮১

যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ।

তেন সর্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্বিকৃতিশ্চ যা ॥ ৩৭।৪৯ ব্রা.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২

আংশিক উদ্ধৃতি তেন সর্বমিদং বুদ্ধং

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধমসাধুং সাধুনা জয়েৎ।

জয়েৎ কদর্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্ ॥ ৩৯।৭২ ব্রা.

আংশিক উদ্ধৃতি অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম

'গল্পগুচ্ছ', নামঞ্জুর গল্প ১৩৩২ অগ্রহায়ণ। ১৯২৫

মৌনান্নস মুনির্ভবতি নারণ্যবসনান্মুনিঃ।

স্বলক্ষণন্তু যো বেদ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥ ৪৩।৬০ ব্রা. নব.

আংশিক উদ্ধৃতি স্বলক্ষণন্তু যো বেদ স মুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২

অনুশাসনপর্ব

যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মো

যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ। নব

বাসুদেবেন তীর্থেন

পুত্র সংশাম্য পাণ্ডবৈ. ॥ ১৬৭।৪১

আংশিক উদ্ধৃতি যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ

'ইতিহাস', শিবাজী ও গুরু গোবিন্দসিংহ ১৩১৬ চৈত্র। ১৯১০

---

১ মনু ৭।২১৩, চাণক্য ২৭, প. মি. ৩৮৭, প. কাকো. ৮৪, হি. মি. লা ৪৩, গরুড় ১০৯।১, ধম্ম ১৪

শান্তিপর্ব

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাঽপ্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা ॥ ২৫।২৬ ব্রা. নব.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'চিঠিপত্র' ১, পত্র-১৬ মৃণালিনী দেবীকে লেখা ১৮৯৮ জুন
'চিঠিপত্র' ৮, পত্র-১১৫ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা ১৯০০ আগস্ট ?
'স্মৃতি' পৃ ৪৪, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র ১৩১১ কার্তিক ৯। ১৯০৪
'চিঠিপত্র' ৭, পত্র-৩ কাদম্বিনী দেবীকে লেখা ১৯০৬ মে ৯
'চিঠিপত্র' ৪, পত্র-৩৪ মীরা দেবীকে লেখা ১৯২০ জুন

আংশিক উদ্ধৃতি সুখং বা যদি বা দুঃখং · বাঽপ্রিয়ম্
'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-২১৫, ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯৫ জুন ২৮

পূর্ণ অনুবাদ 'স্মৃতি' পৃ ৪৪, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র ১৩১১ কার্তিক ৯। ১৯০৪

ভগবদ্গীতা

গীতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের কথা সুবিদিত নয়। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ভগবদ্গীতা অধ্যায়ে রবীন্দ্ররচনায় গীতার গুরুত্বের বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই তালিকা থেকেও বোঝা যাবে গীতাকে কবি কতদূর অধিগত করে নিয়েছিলেন। এই তালিকায় 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' উদ্বোধন সংস্করণ (১৩৭৫) গ্রন্থ অনুযায়ী গীতার অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা দেওয়া হল। তাই গীতার কোনো কোনো সংস্করণে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৩, ১৪ ও ১৬ সংখ্যক শ্লোক রূপে পরিগণিত শ্লোকগুলিকে এ স্থলে ১৪, ১৫ ও ১৭ সংখ্যক শ্লোক রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ-সংকলিত নবরত্নমালার শ্লোকসংখ্যাও উদ্বোধন সংস্করণের অনুরূপ। রবীন্দ্র-ব্যবহৃত গীতার এই শ্লোকগুলির মধ্যে যেগুলি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-সংকলিত 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থে, বা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভগবদ্‌-গীতা হইতে শ্লোকসংগ্রহ' (শকাব্দ ১৭৯৭ মাঘ, ১৭৯৮ পৌষ-মাঘ, ১৭৯৯ অগ্রহায়ণ) ও 'ভগবদ্গীতা বিষয়ে বক্তৃতা' (শকাব্দ ১৭৯৮ চৈত্র, ১৭৯৯ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) প্রবন্ধে অথবা নবরত্নমালায় পাওয়া গেছে সেগুলি নিম্নলিখিত সংকেতদ্বারা চিহ্নিত হয়েছে।—

ব্রাহ্মধর্ম	ব্রা.
ভগবদ্গীতা হইতে শ্লোকসংগ্রহ	শ্লো.
ভগবদ্গীতা বিষয়ে বক্তৃতা	ব.
নবরত্নমালায় উদ্ধৃত	নব.
নবরত্নমালায় উদ্ধৃত ও অনূদিত	নব*
নবরত্নমালায় অনূদিত	নব+

এ স্থলে বলা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রসাহিত্যে বহুবার নানা উপলক্ষে গীতা গ্রন্থের প্রসঙ্গ উল্লিখিত বা আলোচিত হতে দেখা গেছে। তবে শুধুমাত্র গ্রন্থ-উল্লেখের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম বলে এ ক্ষেত্রে গীতার অন্তর্গত শ্লোকের উদ্ধৃতি বা শ্লোক-সম্পর্কিত উল্লেখগুলি সংকলন করা হল।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ···॥ ২।২০ নব* দ্র. কঠ. ১।২।১৮

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২।২৩ নব*

পরোক্ষ উল্লেখ 'খৃস্ট', যিশুচরিত ১৯১০ ডিসেম্বর

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥[১] ২।২৮

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'শান্তিনিকেতন' ১, তরী বোঝাই ১৩১৫ চৈত্র ৪। ১৯০৯

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২।২৯ শ্লো

আংশিক উদ্ধৃতি আশ্চর্যবৎ পশ্যতি
'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৫ ফেব্রুআরি ৯

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ২।৪০ ব.

আংশিক উদ্ধৃতি স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে ভয়াৎ
'সঞ্চয়', ধর্মের অধিকার ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১২
'কালান্তর', কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ১৩২৪ ভাদ্র। ১৯১৭
'কালান্তর', শক্তিপূজা ১৩২৬ কার্তিক। ১৯১৯
'কালান্তর', সত্যের আহ্বান ১৩২৮ কার্তিক। ১৯২১
'কালান্তর', স্বরাজসাধন ১৩৩২ আশ্বিন। ১৯২৫
'খৃস্ট', খৃস্ট ১৯৩৬ ডিসেম্বর

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'পথের সঞ্চয়', যাত্রার পূর্বপত্র ১৩১৯ আষাঢ়। ১৯১২

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ২।৪২ নবক
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি ॥ ২।৪৩ নবক
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ২।৪৪ নবক

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'A Vision of India's History' 1923

---

১ দ্র 'রোগশয্যায়', ২৮-সংখ্যক কবিতা — যে চৈতন্যজ্যোতি...
দ্র. গরুড় ১১৩।৪৮ — আদি যার শূন্যময় অন্তে যার মৃত্যু নিরর্থক,
পাঠান্তর 'ভারত' স্থলে 'শৌনকঃ' — মাঝখানে কিছুক্ষণ
যাহা-কিছু আছে তার অর্থ যাহা করে উদ্ভাসিত

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ২।৪৫

আংশিক উদ্‌ধৃতি নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন

'গল্পগুচ্ছ', নামঞ্জুর গল্প ১৩৩২ অগ্রহায়ণ। ১৯২৫

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ২।৪৭ ব. নবক

আংশিক উদ্‌ধৃতি কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন

'ইতিহাস', পরিশিষ্ট ২ : ঐতিহাসিক চিত্র, সূচনা ১৮৯৯ জানুআরি

'সমূহ', পরিশিষ্ট : ঘুষাঘুষি ১৩১০ ভাদ্র। ১৯০৩

'শান্তিনিকেতন' ১, স্বভাবকে লাভ ১৩১৫ চৈত্র ৫। ১৯০৯

'চার অধ্যায়' ১৯৩৪, প্রথম অধ্যায়

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১০৫ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩২ নভেম্বর ১৪

মা ফলেষু কদাচন

'ঘরে-বাইরে' ১৯১৬, সন্দীপের আত্মকথা ২

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র ১৬৯ ইন্দিরা দেবীকে লেখা, ১৮৯৪ অক্টোবর ২৫

'স্মৃতি' পৃ ৬৯, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র ১৩১৪ ফাল্গুন ৮ । ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ১, ত্যাগ ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ২৭। ১৯০৮

'শান্তিনিকেতন' ২, বিশ্ববোধ ১৩১৬। ১৯১০ জানুআরি

'বিচিত্র প্রবন্ধ', আষাঢ় ১৩২১ আষাঢ়। ১৯১৪

'সমাধান',[১] প্রবাসী ১৩৩০ অগ্রহায়ণ। ১৯২৩

'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১১, ১৩৩১ ভাদ্র। ১৯২৪

'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী' ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১৫

'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ৫, ১৯২৭ জুলাই ২৮

'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ৮, ১৯২৭ আগস্ট ১৩

'চিঠিপত্র' ৪, পত্র-২, নন্দিতা দেবীকে লেখা ১৯৩৫ মার্চ ২৭

পরোক্ষ উল্লেখ 'সমাজ', আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত ১২৯৮। ১৮৯১ (?)

'চিঠিপত্র' ১, পত্র-১৬ মৃণালিনী দেবীকে লেখা ১৮৯৮ জুন

---

১ দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (২৪শ খণ্ড) বিশ্বভারতী সংস্করণ : গ্রন্থ-পরিচয়

'চিঠিপত্র' ১, পত্র-২০ মৃণালিনী দেবীকে লেখা ১৯০০ ডিসেম্বর
'ভারতবর্ষ', নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ। ১৯০২
'চিঠিপত্র' ৭, পত্র-১, কাদম্বিনী দেবীকে লেখা
'আত্মশক্তি', ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ ১৩১২ বৈশাখ। ১৯০৫
'সমূহ', পরিশিষ্ট : দেশহিত ১৩১৫ আশ্বিন। ১৯০৮
'শান্তিনিকেতন' ১, কর্ম ১৩১৫ পৌষ ২৭। ১৯০৯
'সাহিত্যের পথে', তথ্য ও সত্য ১৩৩১ ভাদ্র। ১৯২৪
'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ১, ১৩৩৪ শ্রাবণ। ১৯২৭

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ২।৫৩

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'A Vision of India's Histoıy' 1923

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ২।৫৬

আংশিক উদ্ধৃতি দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা·· বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ
'যোগাযোগ' ১৯২৯, অধ্যায় ১৩

পরোক্ষ উল্লেখ 'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-১৯ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৩৩২ কার্তিক ৯। ১৯২৫
'গল্পগুচ্ছ', নামঞ্জুর গল্প ১৩৩২ অগ্রহায়ণ। ১৯২৫

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ২।৭১

পূর্ণ অনুবাদ 'The Religion of Man' 1931, The Prophet

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩।৯
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ৩।২০
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ৩।২৫

পরোক্ষ উল্লেখ 'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ১, ১৩৩৪ শ্রাবণ। ১৯২৭

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩।৩০

পূর্ণ অনুবাদ 'The Religion of Man' 1931, The Prophet

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩।৩৫ নব*

আংশিক উদ্ধৃতি স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ…ভয়াবহঃ

'চতুরঙ্গ' ১৯১৬, শ্রীবিলাস-২

'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৮ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৯২১ অক্টোবর ২০

'সাহিত্যের পথে', সভাপতির অভিভাষণ ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ। ১৯২৩

'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী' ১৯২৪ সেপ্টেম্বর ২৪

'কালান্তর', শূদ্রধর্ম ১৩৩২ অগ্রহায়ণ। ১৯২৫

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ

'কালান্তর', শূদ্রধর্ম (দু বার) ১৩৩২ অগ্রহায়ণ। ১৯২৫

'পথে ও পথের প্রান্তে', অধ্যায় ১৩, ১৩৩৪ বৈশাখ। ১৯২৭

পরধর্মো ভয়াবহঃ

'ভারতবর্ষ', চীনেম্যানের চিঠি ১৩০৯ আষাঢ়। ১৯০২

'কালান্তর', কংগ্রেস ১৩৪৬ আষাঢ়। ১৯৩৯

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'দুই বোন' ১৯৩৩, উর্মিমালা

পরোক্ষ উল্লেখ 'সমূহ', পরিশিষ্ট : বিরোধমূলক আদর্শ ১৩০৮ আশ্বিন। ১৯০১

'চিঠিপত্র' ৭, পত্র-৮৮ কাদম্বিনী দেবীকে লেখা ১৯২৬ এপ্রিল ১৭

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৩।৪২ নবক

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬। ১৯০৯

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ৪।২

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'A Vision of India's History' 1923

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্‌বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪।৪

আংশিক উদ্ধৃতি অপরং ভবতো জন্ম

'ছন্দ', অনুষঙ্গ ২, দিলীপকুমার রায়কে লেখা পত্র-৩, ১৩৩৯ মাঘ ১৩। ১৯৩৩

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৪।৫

'ছন্দ', অনুষঙ্গ ২, দিলীপকুমার রায়কে লেখা পত্র-৩, ১৩৩৯ মাঘ ১৩।
১৯৩৩

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪।৮ নব*

আংশিক উদ্‌ধৃতি বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৫৬ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩৪ নভেম্বর ২১

সম্ভবামি যুগে যুগে

'বিচিত্র প্রবন্ধ', পনেরো আনা ১৩০৯ মাঘ। ১৯০৩

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'কালান্তর', দেশনায়ক ১৯৩৯

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ৪।১১

পরোক্ষ উল্লেখ 'সঞ্চয়', ধর্মশিক্ষা[১] ১৩১৮ মাঘ। ১৯১২

শ্রেয়ান দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৪।৩৩ নবক*

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'কালান্তর', নবযুগ ১৩৩৯ পৌষ। ১৯৩২

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৮৭ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩৫ অক্টোবর ১৯

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৬।৫ নব*

আংশিক উদ্‌ধৃতি নাত্মানমবসাদয়েৎ

'চিঠিপত্র' ৭, পত্র-১৯, কাদম্বিনী দেবীকে লেখা ১৯১১ জুন ৮

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ৬।২২ নবক.

শ্লো. ব.

---

১ এই প্রবন্ধে আছে— গীতা বলিয়াছেন, আমাদের ভাবনাটা যেরূপ তাহার সিদ্ধিও সেইরূপ হইয়া থাকে'। কবির এই বক্তব্যের অনুরূপ শ্লোকাংশ হল—যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী (পঞ্চতন্ত্র. অপরীক্ষিতকারকম্ ৯৮; হলায়ুধের ধর্মবিবেক ১৯)। এটি কবির পরিচিত ও ব্যবহৃত শ্লোকখণ্ড। অথচ উক্ত প্রবন্ধে গীতার উল্লেখ আছে। তাই মনে হয় ওই স্থলে 'যে যথা মাং...'ইত্যাদি শ্লোকটিই (৪।১১) কবির অভিপ্রেত ছিল।

আংশিক উদ্ধৃতি   যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ

'কালান্তর', বাতায়নিকের পত্র-২, ১৩২৬ আষাঢ়। ১৯১৯

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ [১] ৬।২৯ নবক

পরোক্ষ উল্লেখ   'কালান্তর', কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ১৩২৪ ভাদ্র। ১৯১৭

'কালান্তর', স্বাধিকারপ্রমত্তঃ ১৩২৪ মাঘ। ১৯১৮

'কালান্তর', বৃহত্তর ভারত ১৩৩৪ শ্রাবণ। ১৯২৭

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ।

প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ ৭।৮ নবক

আংশিক উদ্ধৃতি   পৌরুষং নৃষু

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।

যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ৯।২৭ শ্লো. ব.

পূর্ণ উদ্ধৃতি   'যোগাযোগ' ১৯২৯, অধ্যায় ২৭

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ১০।৪১ নবক

পূর্ণ উদ্ধৃতি   'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।

দৃষ্ট্বাঽদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ১১।২০

আংশিক উদ্ধৃতি   দৃষ্ট্বাঽদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং   মহাত্মন্

'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ৩, ১৩৩৪ শ্রাবণ। ১৯২৭

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-

ল্লোকান্ সমগ্রান বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।

তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং

ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥ ১১।৩০ নবক

পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অনুবাদ 'ধর্ম', দুঃখ ১৩১৪ ফাল্গুন। ১৯০৮

১ তুলনীয়: 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু', আপস্তম্ব সংহিতা ১০।১১

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ॥ ১১।৪০ নবক. ব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং··· সর্বঃ
'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ৩, ১৩৩৪ শ্রাবণ। ১৯২৭

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বাম্ অহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥ ১১।৪৪ ব.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি ও অনুবাদ 'যোগাযোগ' ১৯২৯, অধ্যায় ৩৩

আংশিক উদ্‌ধৃতি পিতেব পুত্রস্য দেব সোঢ়ুম্
'যোগাযোগ' ১৯২৯, অধ্যায় ৩৩

প্রিয়ঃ প্রিযায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্
'যোগাযোগ' ১৯২৯, অধ্যায় ৩৩, ৩৪, ৩৭

যস্মান্নোদ্‌বিজতে লোকো লোকান্নোদ্‌বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্‌বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১২।১৫ শ্লো. নবক

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'চিঠিপত্র' ১, পত্র-১৭ মৃণালিনী দেবীকে লেখা ১৮৯৯ আগস্ট ২৮

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ ·॥ ১৩।১৪ ব্রা ব. নবক দ্র. শ্বেতা ৩।১৬
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং···॥ ১৩।১৫ ব্রা. ব. নবক দ্র. শ্বেতা ৩।১৭
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৩।১৭ ব. নবক

আংশিক উদ্‌ধৃতি অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্
'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১

ধর্মশাস্ত্র

ধর্মশাস্ত্র বলতে প্রধানতঃ মানবধর্মশাস্ত্র বা মনুসংহিতাকেই বোঝায়। তবে মনু ছাড়া অন্যান্য অন্ততঃ উনিশটি সংহিতা ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত বলে স্বীকৃত। রবীন্দ্রসাহিত্যে মনুসংহিতার বিভিন্ন শ্লোকের উদ্‌ধৃতি বিশেষতঃ তার উল্লেখের পরিমাণ যথেষ্ট। এ স্থলে যথাসম্ভব সমগ্রভাবে শ্লোকগুলি সংকলিত হল। আর অন্যান্য সংহিতার যে যে শ্লোক রবীন্দ্রসাহিত্যে উদ্‌ধৃত বা উল্লিখিত হতে দেখা গেছে সেগুলিকেও এ স্থলে সংকলন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে 'ব্রাহ্মধর্ম' এবং 'নবরত্নমালা' গ্রন্থে প্রাপ্ত শ্লোকগুলি ব্রা. এবং নব. সংকেত দ্বারা চিহ্নিত হল।

মনুসংহিতা

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে॥ ২।১৭
যস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥ ২।১৮

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'কালান্তর', সভ্যতার সংকট ১৩৪৮ বৈশাখ। ১৯৪১

ন জাতু কামঃ কামানাম্…॥ ২।৯৪ দ্র. মহা. আদি ৭৩।৫২
ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ॥ ২।৯৬ ব্রা.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'ধর্ম', ততঃ কিম্ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ। ১৯০৬
'কালান্তর', শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন। ১৯২১

পূর্ণ অনুবাদ 'The Religion of Man' 1931, The four stages of life

সম্মানাদ্‌ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্‌বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্বদা॥ ২।১৬২

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ২, ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১২
'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১৫, ১৩৩৯ পৌষ ৯। ১৯৩২
'কালান্তর', কংগ্রেস ১৩৪৬ আষাঢ়। ১৯৩৯

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ॥ ৩।২১

আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্‌।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্মো ধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩।২৭
জ্ঞাতিভ্যো দ্রবিণং দত্ত্বা কন্যায়ৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্যাপ্রদানং স্বাচ্ছন্দ্যাদাসুরো ধর্ম উচ্যতে ॥ ৩।৩১
ইচ্ছয়ান্যোন্য সংযোগঃ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ।
গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ ॥ ৩।৩২
হত্বা ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীং রুদতীং গৃহাৎ।
প্রসহ্য কন্যাহরণং রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে ॥ ৩।৩৩
সুপ্তাং মত্তাং প্রমত্তাং বা রহো যত্রোপগচ্ছতি।
স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ॥ ৩।৩৪

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'সমাজ', ভারতবর্ষীয় বিবাহ ১৩৩২। ১৯২৫

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩।৫৬

আংশিক উদ্‌ধৃতি যত্র নার্যস্তু…দেবতাঃ

'সমাজ', হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন। ১৮৮৭

যদি হি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ততে ॥ ৩।৬১

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'সমাজ', হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন। ১৮৮৭

পঞ্চ কৢপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাম্‌ ॥ ৩।৬৯
অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্‌।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্‌ ॥ ৩।৭০

পরোক্ষ উল্লেখ 'আত্মশক্তি', স্বদেশী সমাজ ১৩১১ ভাদ্র। ১৯০৪

স সন্ধার্য প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্যো দুর্বলেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৩।৭৯

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'সমাজ', ভারতবর্ষীয় বিবাহ ১৩৩২। ১৯২৫

ঋষয়ো পিতরো দেবা ভূতান্যতিথয়স্তথা।
আশাসতে কুটুম্বিভ্যস্তেভ্যঃ কার্যং বিজানতা ॥ ৩।৮০

অনুবাদ 'সমাজ', ভারতবর্ষীয় বিবাহ ১৩৩২। ১৯২৫

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্যয়ঃ ॥ ৪।১২ ব্রা. নব.

আংশিক উদ্ধৃতি সন্তোষং পরমাস্থায়…ভবেৎ
'ধর্ম', ধর্মের সরল আদর্শ[1] ১৩০৯ মাঘ। ১৯০৩
'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১
সুখার্থী সংযতো ভবেৎ
'সাহিত্য', সৌন্দর্যবোধ ১৩১৩ পৌষ। ১৯০৬
সংযতো ভবেৎ
'ধর্ম', ধর্মের সরল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ। ১৯০৩
যো হ্যস্য ধর্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতম্।
সোঽসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব মজ্জতি ॥ ৪।৮১
পরোক্ষ উল্লেখ 'সমাজ', হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন। ১৮৮৭
নিত্যানস্তনিতবর্ষেষু মহোল্কানাঞ্চ সংপ্লবে।
আকালিকমনধ্যায়মেতেষু মনুরব্রবীৎ ॥ ৪।১০৩
পরোক্ষ উল্লেখ 'বিচিত্র প্রবন্ধ', বসন্তযাপন ১৩০৯ চৈত্র। ১৯০৩
নাত্মানমবমন্যেত পূর্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ।
আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্লভাম্ ॥ ৪।১৩৭
আংশিক উদ্ধৃতি নাত্মানমবমন্যেত
'ধর্ম', নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ। ১৯০২
সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ ॥[2] ৪।১৬০ ব্রা. নব.
আংশিক উদ্ধৃতি সর্বং পরবশং…সুখম্
'বিচিত্র প্রবন্ধ', নানা কথা ১২৯২ জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র। ১৮৮৫
'আত্মশক্তি', ব্রতধারণ ১৩১২ ভাদ্র। ১৯০৫
'শিক্ষা', জাতীয় বিদ্যালয় ১৩১৩ ভাদ্র। ১৯০৬
'সঞ্চয়', ধর্মের অর্থ ১৩১৮ আশ্বিন কার্তিক। ১৯১১
সর্বমাত্মবশং সুখম্
'সঞ্চয়', ধর্মের অর্থ ১৩১৮ আশ্বিন-কার্তিক। ১৯১১
অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥ ৪।১৭৪ ব্রা. নব.

---

১ এই প্রবন্ধে 'পরমাস্থায়' স্থলে আছে 'হৃদিসংস্থায়'।

২ গরুড় ১১৩।৬১

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'সমূহ', পরিশিষ্ট : বিরোধমূলক আদর্শ (দু বার) ১৩০৮ আশ্বিন। ১৯০১
'ধর্ম', ধর্মের সরল আদর্শ ১৩০৯ মাঘ। ১৯০৩
'ধর্ম', প্রার্থনা ১৩১১ আষাঢ়। ১৯০৪
'শান্তিনিকেতন' ২, চিরনবীনতা ১৯১০ জানুআরি
'কালান্তর', ছোটো ও বড়ো ১৩২৪ অগ্রহায়ণ। ১৯১৭
'কালান্তব', বাতায়নিকের পত্র ১৩২৬ আষাঢ়। ১৯১৯
'কালান্তর', সভ্যতার সংকট ১৩৪৮ বৈশাখ। ১৯৪১

আংশিক উদ্‌ধৃতি সমূলেন বিনশ্যতি
'পল্লীপ্রকৃতি',[১] কর্মযজ্ঞ ১৩২১ ফাল্গুন। ১৯১৫
'মানুষেব ধর্ম'[১] ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২

মহর্ষিপিতৃদেবানাং গত্বানৃণ্যং যথাবিধি।
পুত্রে সর্বং সমাসজ্য বসেন্মাধ্যস্থ্যমাশ্রিতঃ॥ ৪।২৫৭

পরোক্ষ উল্লেখ 'বিবিধ প্রসঙ্গ', অন্ত্যেষ্টিসংকাব ১২৮৮ আশ্বিন। ১৮৮১
'পরিচয়', আত্মপবিচয় ১৩১৯ বৈশাখ। ১৯১২

প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং ব্রাহ্মণানাঞ্চ কাম্যয়া।
যথাবিধি নিযুক্তস্তু প্রাণানামেব চাত্যয়ে॥ ৫।২৭

পরোক্ষ উল্লেখ 'সমাজ', আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুব মত ১২৯৮ পৌষ। ১৮৯১

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥ ৫।৫৬

আংশিক উদ্‌ধৃতি প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা
'গল্পগুচ্ছ', তারাপ্রসন্নের কীর্তি ১২৯৮ ?। ১৮৯১ ?
'আত্মশক্তি', অবস্থা ও ব্যবস্থা ১৩১২ আশ্বিন। ১৯০৫
'সমাজ', ভাবতবর্ষীয় বিবাহ ১৩৩২। ১৯২৫

পরোক্ষ উল্লেখ 'সমাজ', আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুব মত ১২৯৮ পৌষ। ১৮৯১

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥ ৫।১০৯ ব্রা.

আংশিক উদ্‌ধৃতি অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি · শুধ্যতি
'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩

১ এই গ্রন্থ দুটিতে 'সমূলন্তু' স্থলে 'সমূলেন' আছে।

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্‌।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥[1] ৫।১৫৫

পূর্ণ অনুবাদ 'সমাজ', হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন। ১৮৮৭

ভার্যায়ৈ পূর্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্মণি।
পুনর্দারক্রিয়াং কুর্যাৎ পুনরাধানমেব চ ॥ ৫।১৬৮

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'সমাজ', হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন। ১৮৮৭

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্‌।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকো যথা ॥ ৬।৪৫ ব্রা.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১৫, ১৩৩৯ পৌষ ৯। ১৯৩২

আবৃত্তানাং গুরুকুলাদ্‌বিপ্রাণাং পূজকো ভবেৎ।
নৃপাণমক্ষয়ো হ্যেষ নিধির্ব্রাহ্মোঽভিধীয়তে ॥ ৭।৮২

পরোক্ষ উল্লেখ 'সমাজ', ভারতবর্ষীয় বিবাহ ১৩৩২। ১৯২৫

ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্‌।
ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতিবাদিনম্‌ ॥ ৭।৯১
ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্‌।
নাযুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্‌ ॥ ৭।৯২
নায়ুধব্যসনপ্রাপ্তং নার্তং নাতিপরিক্ষতম্‌।
ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্মমনুস্মরন্‌ ॥ ৭।৯৩

পরোক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম', প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ ১৩০৮ পৌষ ৭। ১৯০১

পূর্ণ অনুবাদ 'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২

আপদর্থং ধনং রক্ষেৎ ॥ ৭।২১৩ দ্র. মহা. উদ্যোগ ৩৭।১৮
ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।[2]
তস্মাদ্‌ ধর্মো ন হন্তব্যো মা নো ধর্মো হতোঽবধীৎ ॥ ৮।১৫ ব্রা. নব.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'ভারতবর্ষ', প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ। ১৯০১

১ বর্তমান গ্রন্থে প্রথম খণ্ডের ধর্মশাস্ত্র অধ্যায়ে (পৃ ১৮১) বলা হয়েছে যে মনুসংহিতায় এই শ্লোকটি চোখে পড়ে নি। সম্ভবতঃ তখন মনুসংহিতার যে সংস্করণ ব্যবহার করেছিলাম তাতে শ্লোকটি পাই নি। পরে পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত 'মনুসংহিতা' গ্রন্থে (১৩১০) শ্লোকটি পাওয়া গেছে। সুতরাং এ স্থলে যথাস্থানে শ্লোকটি উল্লিখিত হল।

২ মহা. বন ২৬৭।৯২, বিষ্ণুসংহিতা ২৫।১৫

আংশিক উদ্ধৃতি ধর্ম এব হতো…রক্ষিতঃ

'ভারতবর্ষ', প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ। ১৯০১

'আত্মশক্তি', সফলতার সদুপায় ১৩১১ চৈত্র। ১৯০৫

আংশিক উদ্ধৃতি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

'রাজাপ্রজা', ইংরাজ ও ভারতবাসী ১৩০০। ১৮৯৩

'সঞ্চয়', ধর্মের অধিকার ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১২

ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ শিষ্যো ভ্রাতা চ সোদরঃ।
প্রাপ্তাপরাধাস্তাড্যাঃ স্যূরজ্জ্বা বেণুদলেন বা॥ ৮।২৯৯

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'সমাজ', হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন। ১৮৮৭

ভর্তারং লঙ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা।
তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহু সংস্থিতে॥ ৮।৩৭১

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'সমাজ', প্রাচ্য সমাজ ১২৯৮ পৌষ। ১৮৯১

নৈতা রূপং পরীক্ষন্তে নাসাং বয়সি সংস্থিতিঃ।
স্বরূপংবা বিরূপংবা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে॥ ৯।১৪
পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈস্নেহ্যাচ্চ স্বভাবতঃ।
রক্ষিতা যত্নতোঽপীহ ভর্তৃষেতা বিকুর্বতে॥ ৯।১৫
এবং স্বভাবং জ্ঞাত্বাসাং প্রজাপতিনিসর্গজম্।
পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ পুরুষো রক্ষণং প্রতি॥ ৯।১৬

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'সমাজ', হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন। ১৮৮৭

শয্যাসনমলংকারং কামং ক্রোধমনার্জবং।
দ্রোহভাবং কুচর্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ॥ ৯।১৭

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'সমাজ', হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন। ১৮৮৭

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মোব্যবস্থিতঃ।
নিরিন্দ্রিয়াহ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি স্থিতিঃ॥ ৯।১৮

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'সমাজ', হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন। ১৮৮৭

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥ ৯।২৬ ব্রা. নব.

আংশিক উদ্ধৃতি প্রজনার্থং মহাভাগাঃ…গৃহদীপ্তয়ঃ

'সমাজ', হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন। ১৮৮৭

'প্রাচীন সাহিত্য', কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ১৩০৮ পৌষ। ১৯০১

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ

'গল্পগুচ্ছ', পুত্রযজ্ঞ ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৯৮

'সমাজ', নারীর মনুষ্যত্ব[১] ১৩৩৫ বৈশাখ। ১৯২৮

'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী' (ভূ বার) ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১৪

প্রজনার্থং

'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যধর্ম ১৩৩৪ শ্রাবণ। ১৯২৭

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।

প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনং ॥ ৯।২৭

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'সমাজ', হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন। ১৮৮৭

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।

নৈবং কুর্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ ॥ ১১।২৩১ ব্রা.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩

দক্ষসংহিতা

অদত্তদানা জায়ন্তে পরভাগ্যোপজীবিনঃ।

যদ্দদাতি বিশিষ্টেভ্যো যজ্জুহোতি দিনে দিনে ॥ ২।৩৫

পরোক্ষ উল্লেখ 'আলোচনা', আত্মা : শ্রেষ্ঠ অধিকার ১২৯১ শ্রাবণ ১৮৮৪

তেনৈব সীদমানেন সীদন্তিহেতবে ত্রয়ঃ।

মূলপ্রাণে ভবেৎ স্কন্ধঃ স্কন্ধাচ্ছাখাঃ সপল্লবাঃ ॥ ২।৪৪

মূলেনৈব বিনষ্টেন সর্বমেতদ্‌বিনশ্যতি।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন রক্ষিতব্যো গৃহাশ্রমী ॥ ২।৪৫

রাজ্ঞা চান্যৈস্ত্রিভিঃ পূজ্যো মাননীয়শ্চ সর্বদা। ২।৪৬

পরোক্ষ উল্লেখ 'সমাজ', ভারতবর্ষীয় বিবাহ ১৩৩২। ১৯২৫

গৃহস্থোঽপি ক্রিয়াযুক্তো ন গৃহেণ গৃহাশ্রমী ॥ ২।৪৬

ন চৈব পুত্রদারেণ স্বকর্ম পরিবর্জিতঃ। ২।৪৭

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'সমাজ', ভারতবর্ষীয় বিবাহ ১৩৩২। ১৯২৫

তথা তথৈব কার্যাণি ন কালস্তু বিধীয়তে।

অস্মিন্নেব প্রযুঞ্জানো হ্যস্মিন্নেব প্রলীয়তে[২] ॥ ২।৫৫

১ এই প্রবন্ধে 'প্রজনার্থং' স্থলে আছে 'জননার্থং'।

২ পাঠান্তর 'প্রলীয়তে' স্থলে 'তুলীয়তে'।

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'সমাজ', ভারতবর্ষীয় বিবাহ ১৩৩২। ১৯২৫

যথৈবাত্মা পরস্তদ্‌বদ্‌ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা।[১]
সুখদুঃখানি তুল্যানি যথাত্মনি তথা পরে॥ ৩।২০ ব্রা. নব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি যথৈবাত্মা পরস্তদ্‌বদ্‌ দ্রষ্টব্যঃ শুভমিচ্ছতা
'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২

আপস্তম্বসংহিতা

মাতৃবৎ পরদারাংশ্চ পরদ্রব্যাণি লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্বভূতানি যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥[২] ১০।১১ ব্রা. নব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি আত্মবৎ সর্বভূতেষু···পশ্যতি
'ধর্ম', শান্তং শিবমদ্বৈতম্‌ ১৩১৩ পৌষ। ১৯০৬
'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-১২ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৩৩০ ভাদ্র ৩১। ১৯২৩
'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১০, ১৩৩০ পৌষ ৭। ১৯২৩
'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-২০ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ জুন ১৮
'বুদ্ধদেব', বুদ্ধদেব ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ। ১৯৩৫
'পল্লীপ্রকৃতি', হলকর্ষণ ১৩৪৬ ভাদ্র। ১৯৩৯
'ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ৩, ১৩৪৭ মাঘ। ১৯৪১

শঙ্খসংহিতা

সা ভার্যা যা বহেদগ্নিং সা ভার্যা যা পতিব্রতা।
সা ভার্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্যা যা প্রজাবতী॥[৩] ৪।১৫ ব্রা.

আংশিক উদ্‌ধৃতি সা ভার্যা যা পতিপ্রাণা···প্রজাবতী
'সমাজ', হিন্দুবিবাহ ১২৯৪ আশ্বিন। ১৮৮৭

---

১ পাঠান্তর 'শুভমিচ্ছতা' স্থলে 'সুগমিচ্ছতা'

২ গরুড় ১১১।১২

৩ শ্লোকটির শেষ পঙ্‌ক্তি মাত্র ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থে উদ্‌ধৃত আছে। এই শ্লোকটি মহা. আদি ৮৮।৪০ এবং হি. মি লা ২০৯ -সংখ্যক শ্লোকে যে আকারে পাট তা হল—

সা ভার্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্যা যা প্রজাবতী।
সা ভার্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্যা যা পতিব্রতা॥

গরুড় পুরাণে (১০৮।১৯) এটি আর এক ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

সা ভার্যা যা প্রজাবতী

'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১৪

বসিষ্ঠসংহিতা

গৃহস্থ এব যজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ।

চতুর্ণামাশ্রমাণাস্তু গৃহস্থস্তু বিশিষ্যতে ॥ অধ্যায় ৮

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'সমাজ', ভারতবর্ষীয় বিবাহ ১৩০২। ১৮৯৫

বিষ্ণুসংহিতা

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো··· ॥ ২৫।১৫ দ্র. মনু ৫।১৫৫

পরাশরসংহিতা

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।

পঞ্চাস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥ ৪।২৬

পরোক্ষ উল্লেখ 'সমাজ', পরিশিষ্ট : প্রাচ্য সমাজ ১২৯৮। ১৮৯১

ব্যাসসংহিতা

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখী ব হিতকর্মসু। ব্রা.

দাসীবাদিষ্টকার্যেষু ভার্যা ভর্তুঃ সদা ভবেৎ ॥ ২।২৭

আংশিক উদ্‌ধৃতি ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা

'যোগাযোগ' ১৯২৬. অধ্যায় ১৬

নীতিসাহিত্য

ভর্তৃহরির নীতিশতক ব্যতীত রবীন্দ্র-ব্যবহৃত যাবতীয় নীতিবিষয়ক শ্লোক এ স্থলে সংকলিত হল। গরুড় পুরাণে কবি-কর্তৃক উদ্‌ধৃত বহু নীতিশ্লোক দেখা গেছে। কিন্তু ওই শ্লোকগুলি সবই গীতা, মনুসংহিতা, চাণক্য, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। তা ছাড়া গরুড় পুরাণের সঙ্গে কবির পরিচয় ছিল কি না জানা যায় নি। সুতরাং গরুড় পুরাণের অন্তর্গত শ্লোকগুলি অন্যান্য গ্রন্থের শ্লোকপ্রসঙ্গে পাদটীকায় উল্লিখিত হল। আবার কবিপ্রযুক্ত কতকগুলি নীতিশ্লোকের মূল উৎস নির্ণয় করা যায় নি। কিন্তু বহুকাল-প্রচলিত শার্ঙ্গধর পদ্ধতি, বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী, সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগার প্রভৃতি সংকলন-গ্রন্থে সেগুলি দেখা গেছে। সেই জন্য ওই সংকলন-গ্রন্থগুলিকেও এই সংগ্রহে স্থান দেওয়া হল।

নীতিশ্লোকের প্রসঙ্গে বলতে হয়, বিভিন্ন প্রচলিত চাণক্যশ্লোকগুলির মধ্যে শ্লোকসংখ্যায় এবং পাঠে যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। তবে রবীন্দ্র-ব্যবহৃত সমস্ত চাণক্যশ্লোকই হেবরলিনের 'কাব্যসংগ্রহে' পাওয়া গেছে। তাই এই সংকলনে হেবরলিনের 'চাণক্যশতক'-এর শ্লোকসংখ্যা ও পাঠ অনুসৃত হল। আবার হেবরলিনের কাব্য থেকেই বররুচি, ঘটকর্পর, বেতালভট্ট, হলায়ুধ, কুসুমদেব-প্রমুখ কবির এবং অষ্টরত্ন প্রভৃতি কাব্যের নীতিশ্লোকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। সুতরাং এই শ্লোকগুলির ক্ষেত্রেও হেবরলিনকে অনুসরণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহ ও নবরত্নমালায় প্রাপ্ত সমস্ত শ্লোককে হে ও নব. শব্দে চিহ্নিত করা হয়েছে।

চাণক্যশতক

মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী যেন বালো ন পাঠিতঃ।
সভামধ্যে ন শোভন্তে হংসমধ্যে বকো যথা ॥[১] ৭ হে.

আংশিক উদ্‌ধৃতি   হংস মধ্যে বকো যথা

'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', পঞ্চম পত্র ১২৮৬ ভাদ্র। ১৮৭৯

সভামধ্যে ন শোভন্তে

'শিক্ষা', আবরণ ১৩১৩ ভাদ্র। ১৯০৬

১ হি. কথা ৩৮, গরুড় ১১৫।৮০

লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোডশে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ ॥[১] ৯ হে.

আংশিক উদ্ধৃতি প্রাপ্তে তু ষোডশে…মিত্রবদাচরেৎ
'শান্তিনিকেতন' ১, নিয়ম ও মুক্তি ১৩১৫ চৈত্র ৩০। ১৯০৯
'শিক্ষা', ছাত্রশাসনতন্ত্র ১৩২২ চৈত্র। ১৯১৬
'শেষরক্ষা'[২] ১৯২৮ প্রথম অঙ্ক: তৃতীয় দৃশ্য

পরোক্ষ উল্লেখ 'শব্দতত্ত্ব', ভূমিকা: ভাষার কথা ১৩২৩। ১৯১৬

লালনে বহবো দোষাস্তাডনে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাডয়েন্ন তু লালয়েৎ ॥[৩] ১০ হে.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', নবম পত্র ১২৮৬ পৌষ। ১৮৭৯

আংশিক উদ্ধৃতি লালনে বহবো দোষাস্তাডনে বহবো গুণাঃ
'সাহিত্যের পথে', কবির কৈফিয়ত ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ। ১৯১৫

দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বশাটপটাবৃতঃ।
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবদ্ কিঞ্চিন্ন ভাষতে ॥[৪] ১৩

আংশিক উদ্ধৃতি তাবচ্চ শোভতে মূর্খো. ..ভাষতে
'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', পঞ্চম পত্র ১২৮৬ ভাদ্র। ১৮৭৯
তাবচ্চ বাঁচতে মূর্খো যাবৎ ন বকবকায়তে
'সে' ১৯৩৭, অধ্যায় ২
যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে
'চিরকুমার-সভা'[৫] ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক: প্রথম দৃশ্য
যাবৎ কিঞ্চিৎ, তাবচ্চ
'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', দ্বাদশ পত্র ১২৮৭ আষাঢ়। ১৮৮০
তাবচ্চ শোভতে
'বিচিত্র প্রবন্ধ', বাজে কথা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'চিঠিপত্র' ৪, পত্র-৪ মাধবীলতাকে লেখা ১৯১৩ ফেব্রুআরি ১৩

---

১ গরুড় ১১৪।৫৯

২ দ্র. 'গোড়ায় গলদ' ১৮৯২, প্রথম অঙ্ক: তৃতীয় দৃশ্য

৩ গরুড় ১১৫।৯

৪ হি কথা ৪০

৫ দ্র. 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, প্রথম পরিচ্ছেদ

'ছন্দ', বাংলা ছন্দ : দ্বিতীয় পর্যায়-৩ (এগুারসন্‌কে লেখা পত্র) ১৩২১ আষাঢ় ১৮। ১৯১৪

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।[১]
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥[২] ১৫ হে. নব.

আংশিক উদ্ধৃতি উৎসবে ব্যসনে চৈব · শ্মশানে চ

'বিশ্বভাবতী', অধ্যায় ১২, ১৩৩২ পৌষ। ১৯২৫

রাজদ্বাবে শ্মশানে চ · বান্ধবঃ

'রাজাপ্রজা', কণ্ঠবোধ ১৩০৫ বৈশাখ। ১৮৯৮

উৎসবে ব্যসনে চৈব, রাজদ্বাবে শ্মশানে চ

'আত্মশক্তি', ছাত্রদেব প্রতি সম্ভাষণ ১৩১২ বৈশাখ। ১৯০৫

লাইব্রেরিদ্বাবে শ্মশানে চ

'চিঠিপত্র' ৫, পত্র ৭৫ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা ১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ ২। ১৯১৯

নখিনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাং।
বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ॥[৩] ২৫ হে

আংশিক উদ্ধৃতি বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ বাজকুলেষু চ

'যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী', ১৮৯০ সেপ্‌টেম্বর ২২

স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ

'সমূহ', পবিশিষ্ট বঙ্গবিভাগ ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ। ১৯০৪

পরোক্ষ উল্লেখ 'গল্পগুচ্ছ', দিদি-৪, ১৩০১ চৈত্র। ১৮৯৫

'রাশিয়ার চিঠি', অধ্যায় ১৪, ১৯৩০ অক্টোবর ২৮

হস্তী হস্তসহস্রেণ শতহস্তেন ঘোটকঃ।
শৃঙ্গী চ দশহস্তেন স্থানত্যাগেন দুর্জনঃ॥ ২৬ হে.

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'যুরোপ প্রবাসীর পত্র', প্রথম পত্র ১২৮৬ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৭৯

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-৪৮ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ অক্টোবর ১০

'তিনসঙ্গী', ল্যাবরেটরি ১৩৪৭ আশ্বিন। ১৯৪০

পরোক্ষ উল্লেখ 'গোরা' ১৯১০, অধ্যায় ৩৬

আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ ॥ ২৭ হে. দ্র. মহা. উদ্যোগ ৩৭।১৮

---

১ রবীন্দ্রনাথ 'শত্রুবিগ্রহে' স্থলে লিখেছেন 'রাষ্ট্রবিপ্লবে'।

২ হি মি লা ৭৫, হি সন্ধি ৬৬, প. অপরী ৪০

৩ হি মি লা. ১৮, গরুড় ১০৯।১৪

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥[১] ২৯ হে.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'ধর্ম', ততঃ কিম্ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ। ১৯০৬

আংশিক উদ্‌ধৃতি আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ

'ভারতবর্ষ', চীনেম্যানের চিঠি ১৩০৯ আষাঢ়। ১৯০২

অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতি মানে চ কৌরবাঃ।
অতি দানে বলির্বদ্ধঃ সর্বমত্যন্তগর্হিতম্ ॥ ৪৮ হে. নব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি অতিদর্পে হতা লঙ্কা

'সমাজ', অযোগ্য ভক্তি ১৩১৫ অগ্রহায়ণ। ১৯০৮

'কালান্তর', বাতায়নিকেব পত্র ১৩২৬ আষাঢ়। ১৯১৯

সর্বমত্যন্তগর্হিতম্

'য়ুরোপ-যাত্রীব ডায়ারী', ভূমিকা ১২৯৮ বৈশাখ। ১৮৯১

'চিবকুমার-সভা'[২] ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য

যো ধ্রুবাণি পবিত্যজ্য অধ্রুবং পবিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব চ ॥[৩] ৬১ হে. নব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি যো ধ্রুবাণি পবিত্যজ্য

'চিঠিপত্র' ৮, পত্র-৭৭ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা ১৮৯৯ জুলাই ৫

'গল্পগুচ্ছ', ভাইফোঁটা ১৩২১ ভাদ্র। ১৯১৪

ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি···নষ্টমেব চ

'সমাজ', পরিশিষ্ট : আলোচনা ('নকলের নাকাল' সম্বন্ধে) ১৩০৮ । ১৯০.

পরোক্ষ উল্লেখ 'দুইবোন' ১৯৩৪, শর্মিলা

জীর্ণমন্নং প্রশংসীয়াৎ ভার্যাঞ্চ গতযৌবনাং।
রণাৎ প্রত্যাগতং শূরং শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্ ॥ ৭৭ হে.

আংশিক উদ্‌ধৃতি জীর্ণমন্নং প্রশংসীয়াং

'ইতিহাস', পবিশিষ্ট ২. ঐতিহাসিক চিত্র ১৩০৫ ভাদ্র। ১৮৯৮

শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্

---

১ প. মি. ৩৮৬, প. কাকো ৮২, হি মি. ১৫৮, গরুড় ১০৯।২, শার্ঙ্গ, ১৪৬২ (নীতি ৪৩)

২ দ্র. 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, প্রথম পরিচ্ছেদ

৩ প. মি. সং ১৪৪, হি. মি. ২২৫, গরুড় ১১০।১

'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৪১ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা

'চিঠিপত্র' ৫ পত্র-৫৯ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা ১৯১৭ অক্টোবর ২৩

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ।

যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্যতে ॥[১] ৯২ হে. নব.

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'সাহিত্য', পরিশিষ্ট : সাহিত্যপরিষৎ ১৩১৩ চৈত্র। ১৯০৭

পঞ্চতন্ত্র

মিত্রভেদ

পুত্রীতি জাতা মহতীহ চিন্তা

কস্মৈ প্রদেযেতি মহান্ বিতর্কঃ।

দত্ত্বা সুখং প্রাপ্স্যতি বা ন বেতি

কন্যাপিতৃত্বং খলু নাম কষ্টম্ ॥ ২২২

আংশিক উদ্ধৃতি কন্যাপিতৃত্বং খলু নাম কষ্টম্

'লোকসাহিত্য', গ্রাম্য সাহিত্য ১৩০৫ ফাল্গুন-চৈত্র। ১৮৯৯

'সমাজ', নারীব মনুষ্যত্ব ১৩৩৫ বৈশাখ। ১৯২৮

একস্য কর্ম সংবীক্ষ্য কবোত্যন্যেহপি গর্হিতম্।

গতানুগতিকো লোকো ন লোকঃ পাবমার্থিকঃ ॥ ৩৭৩

আংশিক উদ্ধৃতি গতানুগতিকো লোকো ·পারমার্থিকঃ

'চাবিত্রপূজা', বিদ্যাসাগবচবিত-২, ১৩০৫। ১৮৯৮

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে · ॥ ৩৮৬ দ্র. চাণক্য ২৭

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-

র্দৈবং হি দৈবমিতি[২] কাপুরুষা বদন্তি।

দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা

যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ ॥[৩] ৩৯২ নব.

আংশিক উদ্ধৃতি যত্নে কৃতে যদি ··দোষঃ

'আত্মশক্তি', সফলতাব সদুপায় ১৩১১ চৈত্র। ১৯০৫

---

১ হি বি. ১০

২ নবরত্নমালায পাঠান্তব পাই 'দৈবেন দেযমিতি'।

৩ প মি সং ১৩৭, প মি ২১৭ (ঈষৎ পবিবর্তিত), হি কথা ৩১, নীতি (ঘটকর্পর) ১৩, শার্ঙ্গ ৪৫৫ (উদ্যমাখ্যানম্ ২)

'চিরকুমার সভা'[১] ১৯২৬, দ্বিতীয় অঙ্ক : চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ

'শিক্ষা', শিক্ষা ও সংস্কৃতি ১৩৪২ শ্রাবণ। ১৯৩৫

যত্নে কৃতে ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ

'স্মৃতি' পৃ ৫৯, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র ১৩১৩ কার্তিক ২৭। ১৯০৬

যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি

'চিঠিপত্র' ৮, পত্র-৫৭ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা

পরোক্ষ উল্লেখ 'শিক্ষা', শিক্ষার বাহন ১৩২২ পৌষ। ১৯১৫

পূর্ণ অনুবাদ 'আত্মশক্তি', সফলতার সদুপায় ১৩১১ চৈত্র। ১৯০৫

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যশ্চ বিশ্বাসঘাতকঃ।

তে নরা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥ ৩৫৪

আংশিক উদ্‌ধৃতি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ

'শান্তিনিকেতন' ১, ইচ্ছা ১৩১৫ পৌষ ১৮। ১৯০৯

মিত্রসংপ্রাপ্তি

যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য… ॥ ১৪৪ দ্র. চাণক্য ৬১

কাকোলূকীয়ম্

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে… ॥ ৮২ দ্র. মহা. উদ্যোগ ৩৭।১৭

আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ… ॥ ৮৪ দ্র. মহা. উদ্যোগ ৩৭।১৮

লব্ধপ্রণাশম্

সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।

অর্ধেন কুরুতে কার্যং সর্বনাশো হি দুস্তরঃ॥[২] ২৮

আংশিক উদ্‌ধৃতি সর্বনাশে সমুৎপন্নে…পণ্ডিতঃ

'কালান্তর', চরকা ১৩৩২ ভাদ্র। ১৯২৫

অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ

১ দ্র. 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, অষ্টম পরিচ্ছেদ

২ প. অপরী. ৪১

'চারিত্রপূজা', বিদ্যাসাগরচরিত-২, ১৩০৫ । ১৮৯৮

'পথের সঞ্চয়', সমুদ্রপাড়ি ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৭ । ১৯১২

'ঘরে-বাইরে' ১৯১৬, সন্দীপের আত্মকথা-৪

অপরীক্ষিতকারকম্

অয়ং নিজঃ পরো বেত্তি গণনা লঘুচেতসাম্ ।

উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ॥[১] ৩৮ নব.

আংশিক উদ্ধৃতি বসুধৈব কুটুম্বকং

'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', সপ্তম পত্র ১২৮৬ ফাল্গুন । ১৮৮০

'বিবিধ প্রসঙ্গ', ধরা কথা (দ্র বার) ১২৮৮ আশ্বিন । ১৮৮১

'বিবিধ প্রসঙ্গ', বেশি দেখা ও কম দেখা ১২৮৮ মাঘ । ১৮৮২

'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী', ভূমিকা (দ্র বার) ১২৯৮ বৈশাখ । ১৮৯১

মন্ত্রে তীর্থে দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ ।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥[২] ৯৮

আংশিক উদ্ধৃতি যাদৃশী ভাবনা যস্য তাদৃশী

'চোখের বালি' ১৯০৩, অধ্যায় ২

'কালান্তর', লোকহিত ১৩২১ ভাদ্র । ১৯১৪

'ঘরে-বাইরে' ১৯১৬, সন্দীপের আত্মকথা

'কালান্তর', বৃহত্তর ভারত ১৩৩৪ শ্রাবণ । ১৯২৭

হিতোপদেশ

অবতরণিকা

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ ।

গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ ॥[৩] ৩ হে. নব.

আংশিক উদ্ধৃতি গৃহীত ইব কেশেষু···ধর্মমাচরেৎ

'ধর্ম', ততঃ কিম্ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ । ১৯০৬

১ হি. মি ৭২, শার্ঙ্গ ২৭৩ (উদারপ্রশংসা ৬)

২ ধর্ম ১৭ হে.

৩ শার্ঙ্গ ৬৬৯ (ধর্মবিবৃতি ৫), সুভা (বল্লভ) ২৯৫২, গুণরত্ন: ১২

কথারম্ভ

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহম্‌… ॥ ৩১ দ্র. প. মি. ৩৯২

মাতা শত্রুঃ পিতা বৈরী… ॥ ৩৮ দ্র. চাণক্য ৭

মিত্রলাভ

দরিদ্রান্‌ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্‌।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ ॥ ১৪

আংশিক উদ্‌ধৃতি দরিদ্রান্‌ ভর কৌন্তেয়…ধনম্‌

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১০৬ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩২ নভেম্বর ২৩

দরিদ্রান্‌ ভর কৌন্তেয়

'ছন্দ', ছন্দের হসন্ত হলন্ত : তৃতীয় পর্যায় ১৩৩৯ কার্তিক। ১৯৩২

আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ… ॥ ৪৩ দ্র. মহা. উদ্যোগ ৩৭।১৮

অয়ং নিজঃ পরো বেতি… ॥ ৭২ দ্র. পং. অপরী. ৩৮

উৎসবে ব্যসনে চৈব… ॥ ৭৫ দ্র. চাণক্য ১৫

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে… ॥ ১৫৮ দ্র. মহা. উদ্যোগ ৩৭।১৭

ন দেবায় ন বিপ্রায় ন বন্ধুভ্যো চাত্মনে।
কৃপণস্য ধনং যাতি বহ্নিতস্করপার্থিবৈঃ ॥ ১৭১ নব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি ন দেবায় ন ধর্মায়[১]

'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-৭৫ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯২ ডিসেম্বর ১৮

'সাহিত্য', বাংলা জাতীয় সাহিত্য ১৩০১ চৈত্র। ১৮৯৫

'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৪১ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা

মাসমেকং নরো যাতি
দ্বৌ মাসৌ মৃগশূকরৌ।
অহিরেকং দিনং যাতি
অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ ॥ ১৭৭

আংশিক উদ্‌ধৃতি অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ

---

১ নবরত্নমালায় যে পাঠটি পাওয়া গেছে তা হল।—

ন দেবায় ন ধর্মায় ন বন্ধুভ্যো ন চার্থিনে।
দুর্জনেনার্জিতং দ্রব্যং ভুজ্যতে রাজতস্করৈঃ ॥

রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্‌ধৃতিতে এই পাঠেরই অনুসরণ করেছেন।

'সাহিত্য', পরিশিষ্ট : সাহিত্যপরিষৎ ১৩১৩ চৈত্র। ১৯০৭
'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৮৬ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা ১৯২১ আগস্ট ১৭
'কালান্তর', রায়তের কথা ১৩৩৩ আষাঢ়। ১৯২৬
'স্মৃতি' পৃ ৯৫, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র ১৯২৮
অক্টোবর ১০

সুখমাপতিতং সেব্যং দুঃখমাপতিতং তথা।
চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ ১৮২

আংশিক উদ্ধৃতি চক্রবৎ পরিবর্তন্তে…সুখানি চ
'সমালোচনা', সংগীত ও কবিতা ১২৮৮ মাঘ। ১৮৮২
'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৫৯ ইন্দিবা দেবীকে লেখা[১] ১৩৪২ আশ্বিন। ১৯৩৫

পরোক্ষ উল্লেখ 'পল্লীপ্রকৃতি', অভিভাষণ : বিশ্বভারতী সম্মিলনী ১৩২৯। ১৯২২

যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য… ॥ ২২৫ দ্র. চাণক্য ৬১

অন্নদা ভূষণং পুংসঃ ক্ষমা লজ্জেব যোষিতাং।
পরাক্রমঃ পরিভবে বৈয়াত্যং সুরতেষ্বিব ॥[২] ৭

পরোক্ষ উল্লেখ 'বিবিধ প্রসঙ্গ', লজ্জাভূষণ ১২৮৮ মাঘ। ১৮৮২
'পশ্চিম-যাত্রার ডায়ারী' ১৯২৪ সেপ্‌টেম্বর ৩০

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ… ॥ ১০ দ্র. চাণক্য ৯২

ঘটকর্পর

নীতিসার

গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদা
লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মং।
ইন্দুর্দ্বিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধু-
র্যোযস্য মিত্রং নহি তস্য দূরম্ ॥[৩] ১ হে. নব.

আংশিক উদ্ধৃতি লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মঃ

১ এই পত্রে আছে—

দুঃখানি চ সুখানি চ চক্রবৎ পরিবর্তন্তে।

২ দ্র. শিশুপালবধ ২।৪৪

৩ এটি নবরত্নমালায় ধৃত পাঠ। হেবরলিনে পাঠান্তর পাই 'পদ্মং' স্থলে 'পদ্মাঃ' এবং 'ইন্দুর্দ্বিলক্ষে' স্থলে 'ইন্দুর্দ্বিলক্ষং'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্ধৃতিতে লিখেছেন 'পদ্মঃ'।

'আলোচনা', সৌন্দর্য ও প্রেম : সুদূর ঐক্য ১২৯১ আষাঢ়। ১৮৮৪

চলচ্চিত্তং চলদ্‌বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনং।

চলাচলমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি ॥ ৬ হে. নব.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'ফাল্গুনী' ১৯১৬, তৃতীয় দৃশ্য

আংশিক উদ্‌ধৃতি চরাচরমিদং সর্বং[১]

'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র-২২, ১৯১৮ অক্‌টোবর ২০

কীর্তির্যস্য স জীবতি

'ভারতবর্ষ', বারোয়ারি মঙ্গল ১৩০৮ চৈত্র। ১৯০২

'সমাজ', পরিশিষ্ট . স্মৃতিরক্ষা ১৩১২ বৈশাখ। ১৯০৫

ক্বচিদ্‌রুষ্টঃ ক্বচিত্তুষ্টো রুষ্টতুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে।

অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ ॥ ৯ হে. নব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি অব্যবস্থিত চিত্তস্য · ভয়ঙ্করঃ

'স্মৃতি' পৃ ৫৬, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র ১৩১৩ কার্তিক ৮ । ১৯০৬

'শান্তিনিকেতন' ১, জগতে মুক্তি ১৩১৫ মাঘ ১। ১৯০৯

প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ

'সাহিত্য', বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ শ্রাবণ। ১৯০২

দশ ব্যাঘ্রা জিতাঃ পূর্বং সপ্ত সিংহাস্তথো গজাঃ।

পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্বা অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া ॥ ১১ হে.

আংশিক উদ্‌ধৃতি অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া

'কালান্তর', লড়াইয়ের মূল ১৩২১ পৌষ। ১৯১৪

'সে' ১৯৩৭, অধ্যায় ১৩

কৃতস্য করণং নাস্তি মৃতস্য মরণং তথা।

গতস্য শোচনা নাস্তি হ্যেতদ্‌বেদবিদাং মতম্‌ ॥ ১৮ হে. নব

আংশিক উদ্‌ধৃতি গতস্য শোচনা

'বিচিত্র প্রবন্ধ', শরৎ ১৩২২ ভাদ্র-আশ্বিন। ১৯১৫

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-৫৬ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ নভেম্বর ১

১ নবরত্নমালা ও হেবরলিনে পাই 'চলাচলমিদং'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'চরাচরমিদং'।

বররুচি

নীতিরত্ন

ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ ॥[১] ২ হে. নব.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি ও অনুবাদ 'সাহিত্যের পথে', তথ্য ও সত্য ১৩৩১ ভাদ্র। ১৯২৪

আংশিক উদ্‌ধৃতি অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ · মা লিখ

'স্মৃতি' পৃ ৬৩, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র[২] ১৩১৪ ভাদ্র ১৫। ১৯০৭

'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যধর্ম ১৩৩৪ শ্রাবণ। ১৯২৭

'সাহিত্যের স্বরূপ', গদ্যকাব্য ১৯৩৯ আগস্ট

শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ

'বিচিত্র প্রবন্ধ', বাজে কথা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'পঞ্চভূত', অখণ্ডতা ১৩০০ শ্রাবণ। ১৮৯৩

'বিচিত্র প্রবন্ধ', বাজে কথা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২

পূর্ণ অনুবাদ 'পঞ্চভূত', গদ্য ও পদ্য ১২৯৯ ফাল্গুন। ১৮৯২

কাকস্য পক্ষৌ যদি স্বর্ণযুক্তৌ[৩]
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য।
একৈক পক্ষে গজরাজমুক্তা
তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ ॥ ৮ হে.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি ও অনুবাদ 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', পঞ্চম পত্র ১২৮৬ আশ্বিন। ১৮৭৯

১ হেবরলিনের গ্রন্থে 'ইতরতাপশতানি' স্থলে 'ইতরপাপফলানি' এবং 'রসস্য' স্থলে 'কবিত্ব' আছে। নবরত্নমালায় 'যথেচ্ছয়া', 'অরসিকেষু' এবং 'রসস্য' স্থলে যথাক্রমে 'যদৃচ্ছয়া', 'অরসিকে তু' এবং 'কবিত্ব' আছে।

২ 'স্মৃতি' গ্রন্থের উক্ত পত্রে কবি রহস্যচ্ছলে লিখেছেন 'সুরসিকেন কবিত্বপ্রচারণং'।

৩ হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহে এই শ্লোকের প্রথম চরণটি হল, 'কাকস্য চঞ্চুর্যদি স্বর্ণযুক্তা'।

বেতালভট্ট

নীতিপ্রদীপ

সিংহস্কন্ধকবীন্দ্রকুম্ভগলিতং রক্তাক্তমুক্তাফলং
কান্তারে বদরীধিয়া দ্রুতমগাৎ ভিল্লস্য পত্নী মুদা।
পাণীভ্যামবগুহ্য শুক্লকঠিনং তদ্‌বীক্ষ্য দূরে জহা-
বস্থানে পততামতীব মহতামেতাদৃশী স্যাদ্‌গতিঃ ॥ ৮ হে.

পূর্ণ অনুবাদ — ‘বিচিত্র প্রবন্ধ’, বাজে কথা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২

হলায়ুধ

ধর্মবিবেক

দাতঃ ক্ষ্মামখিলাং প্রদায় হবয়ে পাতালমূলং বলিঃ
শক্রপ্রস্থবিসর্জনাৎ স চ মুনিঃ স্বর্গং সমারোপিতঃ।
আবাল্যাদসতী সতী স্বপুবীং কুন্তী সমারোহযৎ
হা। সীতা পতিদেবতাগমদধো ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ ॥[1] ২ হে.

আংশিক উদ্‌ধৃতি — ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ

‘চারিত্রপূজা’, বিদ্যাসাগরচরিত ১, ১৩০২ ভাদ্র। ১৮৯৫

একা ভ্রূকুভয়োবৈক্যমুভয়োদল কাণ্ডযোঃ।
শাশিশ্যামাকযোর্ভেদঃ ফলেন পরিচীযতে ॥ ৯ হে.

আংশিক উদ্‌ধৃতি — ফলেন পরিচীযতে

‘চিরকুমার সভা’[2] ১৯২৬, পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য

অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরং।
হরো হিমালয়ে শেতে বিষ্ণুঃ শেতে মহোদধৌ ॥ ১২ হে. নব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি — অসারং খলু সংসারং মন্দিরং

‘বউ ঠাকুরাণীর হাট’ ১৮৮৩, সপ্তম পরিচ্ছেদ

দেবে তীর্থে দ্বিজে ॥ ১৭ দ্র. প. অপরী ৯৮

জয়োস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দনঃ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মো যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ ২০ হে. নব.

দ্র. মহা. অনুশাসন .৬৭। ৪১

---

১ ‘ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ’, ধর্ম ৩, সুভা (বল্লভ) ৩০৪৪

২ দ্র ‘প্রজাপতির নির্বন্ধ’ ১৯০৮, ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কুসুমদেব

দৃষ্টান্তশতক

ন ভাতি বাগ্মী বৈজাত্যে ন দেবা ভান্তি বাদিনি।
অঞ্জনং দূষণং বক্ত্রে ভূষণং কিল লোচনে ॥ ৮২ হে.

পরোক্ষ উল্লেখ 'চিঠিপত্র' ৯, কিশোরকান্তকে লেখা পত্র [মন্তব্য] ১৯৩৮ অকটোবর ২·

অষ্টরত্নং

নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
চক্রেশঃ পুনর্বিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রাহ্মং পদং বাঞ্ছতি
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিঃ শিবপদং ত্বাশাবধিং কো গতঃ ॥ ৮ হে.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'ধর্ম', ততঃ কিম্ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ। ১৯০৬

আংশিক উদ্ধৃতি আশাবধিং কো গতঃ
'পঞ্চভূত', অখণ্ডতা ১৩০০ শ্রাবণ। ১৮৯৩

শার্ঙ্গধর পদ্ধতি

দরিদ্রনিন্দা

উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।
বালবৈধব্যদগ্ধানাং কুলস্ত্রীণাং কুচা ইব ॥ ৪০১

আংশিক উদ্ধৃতি দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ
'রাশিয়ার চিঠি', উপসংহার ১৩৩৮ বৈশাখ। ১৯৩১

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'চিঠিপত্র' ৮, পত্র-১৭৭ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা ১৯০৪ এপ্রিল ২৮

নীতি ৭৩

কুভোজোন দিনং নষ্টং কুকলত্রেণ শর্বরী।
কুপুত্রেণ কুলং নষ্টং তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে ॥ ১৪৯২

আংশিক উদ্ধৃতি তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে
'বিচিত্র প্রবন্ধ', ছবির অঙ্গ ১৩২২ আষাঢ়। ১৯১৫
'জাভা-যাত্রীর পত্র', অধ্যায় ৯, ১৯২৭ আগস্ট ৩০

সুভাষিতাবলী (বল্লভদেব)

গতং তদগাম্ভীর্যং তটমপি চিতং জালিকশতৈঃ।
সখে হংসোত্তিষ্ঠ ত্বরিতমমুতো গচ্ছ সবসঃ॥ ৭০৭

পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অনুবাদ 'চিরকুমার-সভা'[১] ১৯২৬, পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য

সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্

বীথীষু বীথীষু বিলাসিনীনাং
মুখানি সংবীক্ষ্য শুচিস্মিতানি।
জালেষু জালেষু করং প্রসার্য
লাবণ্যভিক্ষামটতীব চন্দ্রঃ॥

পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অনুবাদ চিরকুমার-সভা[২] ১৯২৬, তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য

মন্দং নিধেহি চরণৌ পরিধেহি নীলং
বাসঃ পিধেহি বলয়াবলিমঞ্চলেন।
মা জল্প সাহসিনি শারদচন্দ্রকান্ত
দন্তাংশবস্তব তমাংসি সমাপয়ন্তি॥

পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অনুবাদ 'চিরকুমার সভা'[৩] ১৯২৬, তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য

হত্বা লোচন বিশিখৈর্গত্বা কতিচিৎ পদানি পদ্মাক্ষী।
জীবতি যুবা ন বা কিং ভূয়ো ভূয়ো বিলোকয়তি॥

পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অনুবাদ 'চিরকুমার সভা'[৪] ১৯২৬, চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য

লোচনে হরিণগর্বমোচনে মা বিদূষয় নতাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
সায়কঃ সপদি জীবহারকঃ কিং পুনর্হি গরলেন লেপিতঃ॥

পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অনুবাদ 'চিরকুমার-সভা'[৫] ১৯২৬, চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমাপি বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'ছিন্নপত্র', পত্র ৩ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা ১৮৮৬ এপ্রিল ১৭

---

১ দ্র. 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, ষোড়শ পরিচ্ছেদ

২ দ্র. 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, নবম পরিচ্ছেদ।

৩ দ্র. 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, দশম পরিচ্ছেদ।

৪ দ্র. 'প্রজাপতির নির্বন্ধ ১৯০৮ একাদশ পরিচ্ছেদ।

৫ দ্র. 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, একাদশ পরিচ্ছেদ।

পরিশেষ : যোগবাশিষ্ঠ

বৈরাগ্যপ্রকরণ-১৪

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি ॥ ১১

পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অনুবাদ 'চারিত্রপূজা', বিদ্যাসাগর-চরিত-২, ১৩০৫। ১৮৯৮

আংশিক উদ্ধৃতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি

'চারিত্রপূজা', বিদ্যাসাগর-চরিত-২, ১৩০৫। ১৮৯৮

সর্বদর্শনসংগ্রহ

চার্বাকদর্শন-১

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥ পঙ্‌ক্তি ১২৩

আংশিক উদ্ধৃতি ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ

'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৫৯ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা ১৯১৭ অক্টোবর ২

যাবজ্জীবেৎ নাই বা জীবেৎ ঋণং কৃত্বা বহিং পঠেৎ

'গল্পগুচ্ছ', পয়লা নম্বর ১৩২৪ আষাঢ়। ১৯১৭

পুরাণ-প্রসঙ্গ

মূল পুরাণের দুটি মাত্র উদ্‌ধৃতি রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। সে দুটি এ স্থলে সংকলিত হল। তবে পুরাণের বিভিন্ন দেবদেবী এবং বিবিধ কাহিনীর অসংখ্য উল্লেখ রবীন্দ্ররচনায় নানাভাবেই বিকীর্ণ হয়ে আছে। রবীন্দ্র-ব্যবহৃত সেই প্রসঙ্গগুলিকেও যথাসম্ভব সংকলন করে তার একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল।

দেবী পুরাণ

প্রাবাহো নিবহশ্চৈব উদ্‌বহঃ সংবহস্তথা।
বিবহঃ প্রবহশ্চৈব পরিবাহস্তথৈব চ।
অন্তরীক্ষে চ বাহ্যে তে পৃথঙ্‌মার্গবিচারিণঃ॥ অধ্যায় ৪৬

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : বিবিধ ১৩০৫-১৩১২। ১৮৯৮-১৯০৫

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ

ঊর্ধ্বপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকম্‌।
সর্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্‌।[১] ১।২৫।২৬

আংশিক উদ্‌ধৃতি ঊর্ধ্বপূর্ণমধঃপূর্ণং
'শান্তিনিকেতন' ১, নববুগের উৎসব ১৯০৯ এপ্রিল

দেবকল্পনা : শিব

পুরাণসাহিত্যে শিবের নাম ও রূপ-কল্পনার বৈচিত্র্য অসাধারণ। শিব-সম্পর্কিত বিচিত্র ভাবকল্পনা যেসব নামের মধ্যে রূপলাভ করেছে সেই নামগুলিকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রাপ্ত অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গগুলি এ স্থলে সংকলিত হয়েছে। তবে কবি যে সর্বত্র এই নামগুলির বিশেষ তাৎপর্য স্মরণ রেখে তাঁর রচনায় সেগুলিকে ব্যবহার করেছেন, তা বলা যায় না। তাই স্বতন্ত্র নাম অনুসারে তালিকা প্রস্তুত করার সময় মুখ্যতঃ নামের অন্তর্লীন ভাবধারার অনুসরণ করা হয়েছে। তাই 'শংকর' নামটি স্বভাবতঃই 'শিব'-এর অন্তর্গত রূপে উল্লিখিত হয়েছে। তেমনি যেখানে কবি

১ এই শ্লোকের উৎসটি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্রাহ্মধর্ম-প্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ' গ্রন্থের (১৯০৪) হিন্দুশাস্ত্রম্‌ নামক ৪র্থ অধ্যায় থেকে গৃহীত। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

'নীলকণ্ঠ' নামেব উল্লেখ না করে শুধুমাত্র শিবের হলাহল-পানের বিষয়টি স্মরণ করেছেন, সেখানেও প্রসঙ্গটি 'নীলকণ্ঠ' নামের অন্তর্গত করে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অন্যান্য দেব-দেবীদেব প্রসঙ্গেও এই ধাবা অনুসৃত হয়েছে।

শিব

'ভারতপথিক রামমোহন বায়', অধ্যায় ৯, ১৩০৩ (আশ্বিন ?)। ১৮৯৬
'পঞ্চভূত' ১৮৯৭, অপূর্ব রামায়ণ
'লোকসাহিত্য', গ্রাম্য সাহিত্য ১৩০৫। ১৮৯৮
'সমূহ', পরিশিষ্ট : প্রসঙ্গ কথা-১, ১৩০৫। ১৮৯৮
'পথের সঞ্চয়', দুই ইচ্ছা ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ ২৩। ১৯১২
'পথেব সঞ্চয', যাত্রাব পূর্বপত্র ১৩১৯ আষাঢ। ১৯১২
'বিচিত্র প্রবন্ধ', ছবির অঙ্গ ১৩২১ আষাঢ। ১৯১৫
'ভানুসিংহেব পত্রাবলী', পত্র-১৬, ১৩২৫ ভাদ্র ২৭। ১৯১৮
'কালান্তব', শক্তিপূজা ১৩২৬ কার্তিক। ১৯১৯
'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৮৭ প্রমথ চৌধুবীকে লেখা ১৩২৮ কার্তিক ১৮। ১৯২১
'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ৩, ১৩২৮ পৌষ ৮। ১৯২১
'সাহিত্যেব পথে', সভাপতির অভিভাষণ ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ। ১৯২৩
'পশ্চিম-যাত্রীব ডাযাবী' ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১৩
'পশ্চিম-যাত্রীব ডাযারী' ১৯২৫ ফেব্রুআবি ১৫
'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১২, ১৩৩২ পৌষ ৯। ১৯২৫
'জাভা-যাত্রীব পত্র', পত্র ১৪, ১৯২৭ সেপ্‌টেম্বর ১৭
'জাভা-যাত্রীব পত্র', পত্র ১৬, ১৯২৭ সেপ্‌টেম্বর ১৯
'মহুযা', সাগবিকা ১৯২৭ অক্টোবর
'পথে ও পথের প্রান্তে', অধ্যায ৩৮, ১৩৩৬ শ্রাবণ ৮। ১৯২৯
'পথে ও পথের প্রান্তে', অধ্যায় ৫৭, ১৯৩০ ফেব্রুআরি
'কালের যাত্রা' ১৯৩২, কবির দীক্ষা
'পাবস্যযাত্রী', অধ্যায ৫, ১৯৩২ এপ্রিল

অর্ধনারীশ্বব

'ধর্ম', ততঃ কিম্ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ। ১৯০৬

'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৫ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৩২৬ অগ্রহায়ণ ২১ । ১৯১৯

'সংগীতচিন্তা', আলাপ-আলোচনা : রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার-৩, ১৯২৬ ডিসেম্বর

'সমাজ', নারীর মনুষ্যত্ব ১৩৩৫ বৈশাখ । ১৯২৮

'চিত্রা' সূচনা ১৩৪৯ । ১৯৪২

নীলকণ্ঠ

'আলোচনা', ধর্ম : একটি রূপক ১২৯০ চৈত্র । ১৮৮৪

'বিচিত্র প্রবন্ধ', সোনার কাঠি ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ । ১৯১৫

'সাহিত্যের পথে', কবির কৈফিয়ত ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ । ১৯১৫

'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৩, ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক । ১৯১৭

'খৃস্ট', খৃস্টধর্ম ১৯২৪ ডিসেম্বর ২৫

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-২৪৭ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩৮ ডিসেম্বর ১৬

মৃত্যুঞ্জয়

'আলোচনা' ধর্ম : একটি রূপক ১২৯০ চৈত্র । ১৮৮৪

'কালান্তর', ছোটো ও বড়ো ১৩২৪ অগ্রহায়ণ । ১৯১৭

'মহুয়া', উজ্জীবন ১৩৩৬ (ভাদ্র ?) । ১৯২৯

রুদ্র

'সাহিত্য', সংযোজন : সাহিত্যপরিষৎ ১৩১৩ চৈত্র । ১৯০৭

'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৩, ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক । ১৯১৭

'কালান্তর', ছোটো ও বড়ো ১৩২৪ অগ্রহায়ণ । ১৯১৭

'কালান্তর', শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন । ১৯২১

'পূরবী', তপোভঙ্গ ১৩৩০ কার্তিক । ১৯২৩

'কালান্তর', স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ১৩৩৩ মাঘ । ১৯২৭

'মহুয়া', উজ্জীবন ১৩৩৬ (ভাদ্র ?) । ১৯২৯

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৩৭ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩৪ এপ্রিল ২

'তপতী' ১৯২৯, ১ : ভৈরব মন্দিরের প্রাঙ্গণ

মহাকাল

'ভারতপথিক রামমোহন রায়', অধ্যায় ১০, ১২৯১ মাঘ ৫ । ১৮৮৫

'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ২, ১৩১৮ ফাল্গুন। ১৯১২
'পূরবী', তপোভঙ্গ ১৩৩০ কার্তিক। ১৯২৩
'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ১৬, ১৯২৭ সেপ্‌টেম্বর ১৯
'পরিশেষ', মোহানা ১৩৩৪ কার্তিক। ১৯২৭
'প্রান্তিক', ১৭-সংখ্যক কবিতা ১৯৩৭ ডিসেম্বর

মহাদেব

'প্রভাত সংগীত' ১৮৮৩, মহাস্বপ্ন
'সমাজ', পরিশিষ্ট: বিদেশীয় অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য ১৩০১। ১৮৯৪
'সাহিত্য', বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ শ্রাবণ। ১৯০২
'জীবনস্মৃতি' ১৯১২, বিলাতি সংগীত
'পথের সঞ্চয়', ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি ১৩১৯ পৌষ। ১৯১২
'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র ৩১, ১৩২৫ পৌষ ১৯। ১৯১৯
'ছন্দ', গদ্যছন্দ ১৩৪১ বৈশাখ। ১৯৩৪

ভোলানাথ

'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১১৩ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯৪ ফেব্রুআরি ১৯
'বিচিত্র প্রবন্ধ', পাগল ১৩১১ শ্রাবণ। ১৯০৪
'বলাকা', ১ সংখ্যক কবিতা ১৩২১ বৈশাখ। ১৯১৪
'শিশু ভোলানাথ' ১৯২২, শিশু ভোলানাথ

নটরাজ

'বিচিত্র প্রবন্ধ', পাগল ১৩১১ শ্রাবণ। ১৯০৪
'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা', ভূমিকা . মুক্তিতত্ত্ব, নৃত্য ১৩৩৪। ১৯২৭
'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ১৬, ১৯২৭ সেপ্‌টেম্বর ১৯
'তপতী' ১৯২৯, ২-বিপাশার গান

বিষ্ণু

'আলোচনা', বৈষ্ণব কবির গান: সৌন্দর্যের ধৈর্য ১২৯১ কার্তিক। ১৮৮৪
'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১২৭ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯৪ জুলাই ৬

'ভারতপথিক রামমোহন রায়' অধ্যায় ৯, ১৩০৩ (আশ্বিন ?)। ১৮৯৬
'সাহিত্য', সৌন্দর্যবোধ ১৩১৩ পৌষ। ১৯০৬
'সঞ্চয়', ধর্মশিক্ষা ১৩১৮ মাঘ। ১৯১২
'জাপানযাত্রী', অধ্যায় ৩, ১৩২৩ বৈশাখ ২৪। ১৯১৬
'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৮ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৯২১ ডিসেম্বর ২০
'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৪ সেপ্‌টেম্‌বর ২৮
'কালান্তর', চরকা ১৩৩২ ভাদ্র। ১৯২৫
'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ২, ১৩৩৪ শ্রাবণ ২। ১৯২৭
'পথে ও পথের প্রান্তে', অধ্যায় ৪০, ১৩৩৬ শ্রাবণ ২৫। ১৯২৯
'ছন্দ', গদ্যকবিতার রূপ ও বিকাশ : ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখা পত্র-৪, ১৩৩৯ কার্তিক ৭। ১৯৩২
'ইতিহাস', ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ১৩১৯

নারায়ণ

'মানসী', কবির প্রতি নিবেদন ১৮৮৮ জ্যৈষ্ঠ
'রাজাপ্রজা', সমস্যা ১৩১৫ আষাঢ়। ১৯০৮
'শান্তিনিকেতন' ১, দশের ইচ্ছা ১৩১৫ চৈত্র ৩১। ১৯০৯
'গীতাঞ্জলি', ১০৮-সংখ্যক কবিতা ১৩১৭ আষাঢ়। ১৯১০
'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র। ১৯১৮
'Letters to a Friend' (1928), p 128 এন্‌ড্‌রুজকে লেখা ১৯২১ মার্চ
'কালান্তর', চরকা ১৩৩২ ভাদ্র। ১৯২৫
'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ৩, ১৩৩৪ শ্রাবণ ৩। ১৯২৭
'পথে ও পথের প্রান্তে', অধ্যায় ৪৭, ১৯৩০ ফেব্রুআরি
'The Religion of Man' 1931, Spiritual Union
'The Religion of Man' 1931, The Man of My Heart.
'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-২০ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ জুন ১৮
'জন্মদিনে', ৬-সংখ্যক কবিতা ১৩৪৭ বৈশাখ। ১৯৪১
'শেষ লেখা' ১১-সংখ্যক কবিতা ১৯৪১ মে ১৩

ব্রহ্মা

'সাহিত্য', বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ শ্রাবণ। ১৯০২

'জাপানযাত্রী', অধ্যায় ১, ১৩২৩। ১৯১৬

'শিক্ষা', বিদ্যাসমবায় ১৩২৬ আশ্বিন-কার্তিক। ১৯১৯

'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৪ সেপ্‌টেম্বর ৩০

'কালান্তর', চরকা ১৩৩২ ভাদ্র। ১৯২৫

'খাপছাড়া', ভূমিকা ১৩৪৩ ভাদ্র ৩। ১৯৩৬

'ইতিহাস', ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ১৩১৯

বিশ্বকর্মা

'পঞ্চভূত', গদ্য ও পদ্য ১২৯৯ ফাল্গুন। ১৮৯১

'চারিত্রপূজা', বিদ্যাসাগর-চরিত ১৩০২ ভাদ্র। ১৮৯৫

'বিচিত্র প্রবন্ধ', মাভৈঃ ১৩০৯ কার্তিক। ১৯০২

'বিচিত্র প্রবন্ধ', পনেরো আনা ১৩০৯ মাঘ। ১৯০৩

'সাহিত্য', সংযোজন : সাহিত্যপরিষৎ ১৩১৩ চৈত্র। ১৯০৭

'শান্তিনিকেতন' ১, বিমুখতা ১৩১৫ ফাল্গুন ১৮। ১৯০৯

'শান্তিনিকেতন' ১, ছুটির পর ১৯১০ জানুআরি

'শিক্ষা', ছাত্রশাসনতন্ত্র ১৩২২ চৈত্র। ১৯১৬

'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র-২১, ১৩২৫ আশ্বিন ১৬। ১৯১৮

'খৃস্ট', খৃস্টোৎসব ১৯২৩ ডিসেম্বর ২৫

'সাহিত্যের পথে', তথ্য ও সত্য ১৩৩১ ভাদ্র। ১৯২৪

'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ১, ১৩৩৪ শ্রাবণ ১। ১৯২৭

'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ৫, ১৯২৭ জুলাই ২৮

'জাভা যাত্রীর পত্র', পত্র ২০, ১৯২৭ অক্টোবর ১

'রাশিয়ার চিঠি', অধ্যায় ৭, ১৯৩০ অক্টোবর ৩

'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৪, ১৩৩৮ বৈশাখ ২৫। ১৯৩১

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-২১, হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৮৩৩ আষাঢ় ৮। ১৯৩১

'পল্লীপ্রকৃতি', পল্লীপ্রকৃতি ১৯৩৪ ফেব্রুআরি ৬

'সাহিত্যের স্বরূপ', সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা ১৯৪১ মে

ইন্দ্র

'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী', ১৮৯০ আগস্ট ২৬
'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-৯৩ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯৩ মে ২
'সাহিত্য', সৌন্দর্য ও সাহিত্য ১৩১৪ বৈশাখ। ১৯০৭
'সমূহ', সভাপতির অভিভাষণ : পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী ১৩১৪। ১৯০৭
'জীবনস্মৃতি' ১৯১২, বাহিরে যাত্রা
'শিক্ষা', শিক্ষার বাহন ১৩২২ পৌষ। ১৯১৫
'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র ১০ (তারিখ অনুল্লিখিত)
'চিঠিপত্র' ৪, পত্র-৪২ মীরা দেবীকে লেখা ১৩২৮ চৈত্র ১২। ১৯২২
'পূরবী', তপোভঙ্গ ১৩৩০ কার্তিক। ১৯২৩
'কালান্তর', সমস্যা ১৩৩০ অগ্রহায়ণ। ১৯২৩
'সাহিত্যের পথে', সৃষ্টি ১৩৩১ কার্তিক। ১৯২৪
'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৯৩ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা ১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ ৩১। ১৯২৫
'পথে ও পথের প্রান্তে', অধ্যায় ১১, ১৯২৭ মার্চ ২
'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ৩, ১৩৩৪ শ্রাবণ ৩। ১৯২৭
'পথে ও পথের প্রান্তে', অধ্যায় ৪৯, ১৯৩০ আগস্ট ১৮
'পারস্যযাত্রী', অধ্যায় ১, ১৯৩২ এপ্রিল ১১
'সাহিত্যের স্বরূপ', সাহিত্যের স্বরূপ ১৩৪৪ বৈশাখ। ১৯৩৭

গণেশ

'পঞ্চভূত', সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ ১৩০১ মাঘ। ১৮৯৫
'জীবনস্মৃতি' ১৯১২, গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ
'পথের সঞ্চয়', সংগীত ১৩১৯ অগ্রহায়ণ। ১৯১২
'বাংলা শব্দতত্ত্ব', অনুবাদচর্চা ১৩২৬ ভাদ্র-অগ্রহায়ণ। ১৯১৯
'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী' ১৯২৪ সেপ্টেম্বর ২৪
'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী' ১৯২৪ সেপ্টেম্বর ৩০
'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ৩, ১৩৩৪ শ্রাবণ ৩। ১৯২৭

কার্তিক

'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী' ১৯২৪ সেপ্টেম্বর ৩০

'ছন্দ', পত্রধারা তৃতীয় পর্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা
পত্র-১, ১৯৩৫ মে ১৭

কুবের

'সাহিত্য', বিশ্বসাহিত্য ১৩১৩ মাঘ। ১৯০৭
'কালান্তর', কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ১৩২৪ ভাদ্র। ১৯১৭
'শিক্ষা', শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন। ১৯২১
'রাশিয়ার চিঠি' ১৯৩১, উপসংহার
'পল্লীপ্রকৃতি', অভিভাষণ : শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার উদ্‌বোধন ১৩৪৫
অগ্রহায়ণ ২২। ১৯৩৮

নারদ

'আত্মশক্তি', ভারতবর্ষীয় সমাজ ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১
'পথের সঞ্চয়', অন্তরবাহির ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ। ১৯ ২
'জাপানযাত্রী', পত্র ৩, ১৩২৩ বৈশাখ। ১৯১৬
'জাপানযাত্রী', পত্র ১৫ (তারিখ অনুল্লিখিত)
'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র-২, ১৩২৪ ভাদ্র। ১৯১৭
'চিঠিপত্র' ৯, পত্র ১২৩, হেমন্তবালা দেবীকে লেখা, ১৯৩০ অকটোবর
১১

দেবীকল্পনা ঃ দুর্গা

'সাহিত্য', বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ শ্রাবণ। ১৯০২
'জীবনস্মৃতি' ১৯১২, বর্ষা ও শরৎ
'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৪ সেপ্‌টেম্বর ২০

পার্বতী

'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-২২০ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯৫ জুলাই ৯
'বিচিত্র প্রবন্ধ', শরৎ ১৩২২ ভাদ্র-আশ্বিন। ১৯১৫
'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র-১৯, ১৩২৫ আশ্বিন ৬। ১৯১৮
'সমাজ', নারীর মনুষ্যত্ব ১৩৩৫ বৈশাখ। ১৯২৮

উমা-সতী

'পরিচয়', ভগিনী নিবেদিতা ১৩১৮। ১৯১১

'কালান্তর', বিবেচনা ও অবিবেচনা ১৩২১ বৈশাখ। ১৯১৪
'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র-২০, ১৩২৫ আশ্বিন ১৪। ১৯১৮

অন্নপূর্ণা

'পঞ্চভূত', নরনারী ১২৯৯ চৈত্র। ১৮৯২
'সাহিত্য', বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ শ্রাবণ। ১৯০২
'শান্তিনিকেতন' ১, প্রকৃতি ১৩১৫ পৌষ ২৪। ১৯০৯
'জাপানযাত্রী', অধ্যায় ৪, ১৩২৩ বৈশাখ ২৭। ১৯১৬
'কালান্তর', শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন। ১৯২১
'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-১৩ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৩৩১ বৈশাখ ২৯। ১৯২৪
'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ৯, ১৯২৭ আগস্ট ৩০
'সমবায়নীতি', সমবায়নীতি ১৩৩৫। ১৯২৮
'পথে ও পথের প্রান্তে', অধ্যায় ৪৭, ১৯৩০ ফেব্রুআরি

কালী

'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-৬৮ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯২ জুলাই ২১
'আধুনিক সাহিত্য', সাকার ও নিরাকার ১৩০৫ আশ্বিন। ১৮৯৮
'শান্তিনিকেতন' ১, প্রকৃতি ১৩১৫ পৌষ ২৪। ১৯০৯
'জাপানযাত্রী', অধ্যায় ৪, ১৩২৩ বৈশাখ ২৭। ১৯১৬
'কালান্তর', বাতায়নিকের পত্র ১৩২৬ আষাঢ়। ১৯১৯
'কালান্তর', শক্তিপূজা ১৩২৬ কার্তিক। ১৯১৯
'পরিশেষ', মোহানা ১৩৩৪ কার্তিক ৭ কালীপূজা। ১৯২৭
'পথে ও পথের প্রান্তে', অধ্যায় ৩৮, ১৩৩৬ শ্রাবণ। ১৯২৯

লক্ষ্মী ও সরস্বতী

'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১৫ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯১ ফেব্রুআরি
'সমাজ', পরিশিষ্ট : আদিম আর্য-নিবাস ১২৯৯। ১৮৯২
'পঞ্চভূত', কাব্যের তাৎপর্য ১৩০১ অগ্রহায়ণ। ১৮৯৪
'বিচিত্র প্রবন্ধ', রঙ্গমঞ্চ ১৩০৯ পৌষ। ১৯০২
'পথের সঞ্চয়', সংগীত ১৩১৯ অগ্রহায়ণ। ১৯১২

'শিক্ষা', শিক্ষার বাহন ১৩২২ পৌষ। ১৯১৫

'পল্লীপ্রকৃতি', ভূমিলক্ষ্মী ১৩২৫ আশ্বিন। ১৯১৮

'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী' ১৯২৪ সেপ্টেম্বর ২৪

'কালান্তর', বাযতেব কথা ১৩৩৩ আষাঢ়। ১৯২৬

'সাহিত্যেব পথে', সাহিত্যধর্ম ১৩৩৪ শ্রাবণ। ১৯২৭

'শিক্ষা', শিক্ষাব বিকীরণ ১৯৩৩ ফেব্রুআরি

'শিক্ষা', ছাত্রসম্ভাষণ ১৩৪৩ ফাল্গুন। ১৯৩৭

লক্ষ্মী

'আলোচনা', সৌন্দর্য ও প্রেম : লক্ষ্মী ১২৯১ আষাঢ়। ১৮৮৪

'য়ুরোপ যাত্রীব ডায়ারী', ১৮৯০ সেপ্টেম্বব ২৫

'পঞ্চভূত', নবনাবী ১২৯৯ চৈত্র। ১৮৯৩

'পঞ্চভূত', সৌন্দর্যের সম্বন্ধ ১৩০০ ভাদ্র। ১৮৯৩

'আধুনিক সাহিত্য', বঙ্কিমচন্দ্র ১৩০১ বৈশাখ। ১৮৯৪

'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র ২৪৩, ১৮৯৫ (নভেমবব ২৮ ?)

'সাহিত্য', সৌন্দযবোধ ১৩১৩ পৌষ। ১৯০৬

'বাজাপ্রজা', সমস্যা ১৩১৫। ১৯০৮

'সঞ্চয', রূপ ও অরূপ ১৩১৮। ১৯১১

'পথের সঞ্চয', জলস্থল ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ। ১৯১২

'পথের সঞ্চয', খেলা ও কাজ ১৩১৯ ভাদ্র। ১৯১২

'কালান্তর', বিবেচনা ও অবিবেচনা ১৩২১ বৈশাখ। ১৯১৪

'কালান্তর', লডাইযেব মূল ১৩২১ পৌষ। ১৯১৪

'সমাজ', কৃপণতা ১৩২২। ১৯১৫

'জাপানযাত্রী', অধ্যায় ৪, ১৩২৩ বৈশাখ। ১৯১৬

'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায ১৩২৪ চৈত্র। ১৯১৮

'চিঠিপত্র' ৪, পত্র ৩৮ মীবা দেবীকে লেখা ১৯২০ অক্টোবর ২৯

'শিক্ষা', শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন। ১৯২১

'সাহিত্যের পথে', সাহিত্য ১৩৩০ বৈশাখ। ১৯২৩

'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়াবী' ১৯২৪ সেপ্টেম্বর ২৮

'সাহিত্যের পথে', সৃষ্টি ১৩৩১ কার্তিক। ১৯২৪

'পথে ও পথের প্রান্তে', অধ্যায় ৪৭, ১৯৩০ ফেব্রুআরি
'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-৬২ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ নভেম্বর ২৪
'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১২৩ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩৩ অক্টোবর ১১

সরস্বতী

'আধুনিক সাহিত্য', বঙ্কিমচন্দ্র ১৩০১ বৈশাখ। ১৮৯৪
'আধুনিক সাহিত্য', বিহারীলাল ১৩০১ আষাঢ়। ১৮৯৪
'লোকসাহিত্য', কবিসংগীত ১৩০২ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৯৫
'সাহিত্য', সাহিত্যের বিচারক ১৩১০ আশ্বিন। ১৯০৩
'সাহিত্য', সৌন্দর্যবোধ ১৩১৩ পৌষ। ১৯০৬
'পরিচয়', হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় ১৩১৮ অগ্রহায়ণ। ১৯১১
'সঞ্চয়', রূপ ও অরূপ ১৩১৮ পৌষ। ১৯১১
'জীবনস্মৃতি' ১৯১২, নানা বিদ্যার আয়োজন
'সাহিত্যের পথে', বাস্তব ১৩২১ শ্রাবণ। ১৯১৪
'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র-৮, ১৩২৫ শ্রাবণ ১৮। ১৯১৮
'সাহিত্যের পথে', সাহিত্য-সম্মিলন ১৩৩৩ বৈশাখ। ১৯২৬
'বিশ্বভারতী', অধ্যায় ১০, ১৩৩০ পৌষ ৭। ১৯২৩
'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৪ সেপ্টেম্বর ২৪
'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যবিচার ১৩৩৬ কার্তিক। ১৯২৯
'পারস্যযাত্রী', অধ্যায় ৭, ১৯৩২ এপ্রিল ২৯
'শিক্ষা', ছাত্রসম্ভাষণ ১৩৪৩ ফাল্গুন ৫। ১৯৩৭

উর্বশী

'বিচিত্র প্রবন্ধ', আষাঢ় ১৩২১ আষাঢ়। ১৯১৪
'বলাকা', দুই নারী ১৩২১ মাঘ। ১৯১৫
'সাহিত্যের পথে', সৃষ্টি ১৩৩১ কার্তিক। ১৯২৪
'চিত্রা' ১৩৪৯, গ্রন্থপরিচয় : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র
১৯৩৩ ফেব্রুআরি ২

কাহিনীকল্পনা

দক্ষযজ্ঞ

'সমূহ', যজ্ঞভঙ্গ ১৩১৪ । ১৯০৭
'বাংলা শব্দতত্ত্ব', ভূমিকা : ভাষার কথা ১৩২৩ । ১৯১৬
'পারস্যযাত্রী', অধ্যায় ৫, ১৯৩২ এপ্রিল
'কালান্তর', কংগ্রেস ১৩৪৬ আষাঢ় । ১৯৩৯

গঙ্গার মর্ত্যাবতরণ

'সাহিত্য', সংযোজন : আলস্য ও সাহিত্য ১২৯৪ শ্রাবণ । ১৮৮৭
'আধুনিক সাহিত্য', বঙ্কিমচন্দ্র ১৩০১ বৈশাখ । ১৮৯৪
'সাহিত্য', বিশ্বসাহিত্য ১৩১৩ মাঘ । ১৯০৭
'সমূহ', সভাপতির অভিভাষণ . পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী ১৩১৪ । ১৯০৭
'শিক্ষা', শিক্ষাবিধি ১৩১৯ আশ্বিন । ১৯১২
'বাংলা শব্দতত্ত্ব', ভূমিকা : ভাষার কথা ১৩২৩ । ১৯১৬
'শিক্ষা', শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ . ভাষণ ১৯৩৬ ফেব্রুআরি

সমুদ্রমন্থন

'বিবিধ প্রসঙ্গ', মনের বাগানবাড়ি ১২৮৮ শ্রাবণ । ১৮৮১
'বিবিধ প্রসঙ্গ', কিন্তু-ওয়ালা ১২৮৮ শ্রাবণ । ১৮৮১
'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী', ১৮৯০ আগস্ট ২৭ । ২৮
'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী', ভূমিকা ১২৯৮ বৈশাখ । ১৮৯১
'আধুনিক সাহিত্য', মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস ১৩০৫ শ্রাবণ । ১৮৯৮
'সমাজ', পরিশিষ্ট : ব্যাধি ও প্রতিকার ১৩০৮ । ১৯০১
'ভারতবর্ষ', বিজয়া-সম্মিলন ১৩১২ কার্তিক । ১৯০৫
'পথের সঞ্চয়', দুই ইচ্ছা ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ । ১৯১২
'পথের সঞ্চয়', যাত্রার পূর্বপত্র ১৩১৯ আষাঢ় । ১৯১২
'পল্লীপ্রকৃতি', কর্মযজ্ঞ ১৩২১ ফাল্গুন । ১৯১৫
'আত্মপরিচয়', অধ্যায় ৩, ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক । ১৯১৭

'চিঠিপত্র' ৪, পত্র-৩৯, মীরা দেবীকে লেখা ১৯২০

'চিঠিপত্র' ৬, পরিশিষ্ট ২ : পত্র-পরিচয় ১৩৩২ চৈত্র ২২। ১৯২৬

'রাশিয়ার চিঠি', অধ্যায় ৭, ১৯৩০ অক্টোবর ৩

'পল্লীপ্রকৃতি', বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত ১৩৩৮ আশ্বিন। ১৯৩১

'শিক্ষা', ছাত্রসম্ভাষণ ১৩৪৩ ফাল্গুন। ১৯৩৭।

কালিদাস

কালিদাসের নামে প্রচলিত চারখানি কাব্য ও তিনটি নাটকের সব ক'টির সঙ্গেই কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং তিনি অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক এবং মেঘদূত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ ও ঋতু-সংহার কাব্য থেকে একাধিক শ্লোক আপন রচনায় ব্যবহার করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্বশীর প্রসঙ্গ আলোচিত হলেও এই নাটক-দুটির থেকে কোনো উদ্‌ধৃতি বা তার উল্লেখ চোখে পড়ে না। শুধু মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্বশীর প্রস্তাবনায় প্রাপ্ত 'অলমতিবিস্তরেণ' এই উদ্‌ধৃতিটুকু পাওয়া গেছে। তবে ওটি অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকেও পাওয়া যায়। এ স্থলে শকুন্তলার প্রসঙ্গে ঐ উদ্‌ধৃতিটিকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

এই সংকলনে দেখা যায় যে, স্মৃতিভ্রম বা পাঠভেদের জন্য (শকু ১ 'রথবেগং নাটয়তি' ; কুমার ১।১৫), অথবা বক্তব্যের প্রয়োজনে (শকু ১।১৭) কিংবা কৌতুক-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে (শকু ১।২০) কবি মধ্যে মধ্যে মূল উদ্‌ধৃতির রূপান্তর ঘটিয়েছেন। সেগুলি যথাস্থানে উল্লিখিত হল।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে 'গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকম্' শ্লোকখণ্ডটি রবীন্দ্র-রচনায় একাধিক বার দেখা গেছে। কিন্তু উক্ত উদ্‌ধৃতির মূল এ পর্যন্ত পাই নি। তবে শকুন্তলা নাটকের ২য় অঙ্কে বিদূষকের প্রাকৃত ভাষার উক্তিতে দেখি—'গণ্ডস্স উবরি বিপ্‌ফোড়ও'। এই উক্তির স্মরণেই কবি অনুরূপ উদ্‌ধৃতি দেন, এ অনুমান করা চলে। অবশ্য বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকেও (৫ম অঙ্ক, ৩৫ অনুচ্ছেদ) অনুরূপ একটি উদ্‌ধৃতি দেখা যায় [রাক্ষস—(স্বগতম্) অয়মপরো গণ্ডস্যোপরি স্ফোটঃ]। যাই হক, মূল যে শ্লোক বা উক্তি থেকে রবীন্দ্রনাথ উদ্‌ধৃতিটি ব্যবহার করুন না কেন প্রাকৃত ভাষার উক্তিকে সংস্কৃতে রূপান্তরিত করে প্রয়োগ করার দৃষ্টান্ত কবির রচনায় আরও দেখা গেছে। যেমন শকুন্তলা নাটকের অনসূয়ার উক্তি—'সহি! ণ জুত্তং… অকিদসক্কারং অদিধিবিসেসং উজ্‌ঝিঅ সচ্ছন্দদো গমণং' (প্রথম অঙ্ক) চিরকুমার সভায় রসিকের মুখে—'সখি, ন যুক্তম্ অকৃতসৎকারম্ অতিথিবিশেষম্ উজ্‌ঝিত্বা স্বচ্ছন্দতো গমনম্' এই রূপ লাভ করেছে। তেমনি শকুন্তলা প্রবন্ধে কবি মৃগশিশুর সঙ্গে শকুন্তলার তুলনা প্রসঙ্গে যে উদ্‌ধৃতি দিয়েছেন—দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ, সেটিও মূল গ্রন্থের যে সংস্করণগুলি আমি দেখেছি তাতে পাই নি। উক্ত ভাবের প্রসঙ্গে শকুন্তলার একটি প্রাকৃত উক্তি দেখা গেছে—দুবে বি এত্থ আরণ্যআ ত্তি (৫ম অঙ্ক)।

এ স্থলে আর একটি বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শকুন্তলা প্রবন্ধে ('প্রাচীন সাহিত্য') হংসপদিকার গানের (৫।৮) 'নব মধুলোভী ওগো মধুকর' ইত্যাদি যে অনুবাদটি করেছেন তা সম্পূর্ণ মূলানুগ ও অভ্রান্ত নয়। যথাস্থানে এগুলি সবই উল্লিখিত হল। সেই সঙ্গে হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহ ও নবরত্নমালা গ্রন্থে প্রাপ্ত শ্লোকগুলি 'হে' এবং 'নব' শব্দে চিহ্নিত করা হল। অবশ্য সমগ্র মেঘদূত কাব্যখানিই নবরত্নমালায় সংকলিত ও অনূদিত হয়েছে।

এই সংকলনে অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের শ্লোকের পাশে পাশে যথাক্রমে অঙ্ক ও শ্লোকের সংখ্যা এবং কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ কাব্যের যথাক্রমে সর্গ ও শ্লোকের সংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল

অলমতিবিস্তরেণ। অঙ্ক ১ সূত্রধরের উক্তি

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি অলমতিবিস্তরেণ

'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৮ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা ১৮৯১ ?

'চিঠিপত্র' ৮, পত্র-১৩৯ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা ১৯০১ মার্চ ১৮

'সংগীতচিন্তা', আলাপ-আলোচনা : রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার-৩, ১৯২৬ ডিসেম্বর

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৪১ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩৪ এপ্রিল ২৪

'পথে ও পথের প্রান্তে', অধ্যায় ৫৭, ১৯৩৭ জুলাই ৯

'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-১২১ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা ১৯৩৭ জুলাই ১৪

আপরিতোষাদ্‌বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্‌।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ ॥ ১।২ সূত্রধরের উক্তি

আংশিক উদ্‌ধৃতি আপরিতোষাদ্‌বিদুষাং

'চিঠিপত্র' ৮, পত্র-৬৬ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা ১৮৮৯

পরোক্ষ উল্লেখ 'পঞ্চভূত', গদ্য ও পদ্য ১২৯৯ ফাল্গুন। ১৮৯৩

ভো ভো রাজন্‌ আশ্রমমৃগোঽয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তব্যঃ। অঙ্ক ১ নেপথ্যে

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'প্রাচীন সাহিত্য', শকুন্তলা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২

ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্‌
মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।

ক বত হরিণকানাং জীবিতং চাতিলোলং
ক চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে ॥ ১।১০ বৈখানসের উক্তি

আংশিক উদ্‌ধৃতি ন খলু ন খলু·· পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ
'প্রাচীন সাহিত্য', শকুন্তলা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২
পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ[১]
'মালঞ্চ' ১৯৩৪, অধ্যায় ৩

পূর্ণ অনুবাদ 'প্রাচীন সাহিত্য', শকুন্তলা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২
রথবেগং নাটযতি।[২] কালিদাসের নির্দেশ

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ১৪, ১৯২৭ সেপ্‌টেম্বর ১৭
শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ ॥ ১।১৭ দুষ্মন্তের উক্তি

আংশিক উদ্‌ধৃতি শুদ্ধান্তযোগ্য,[৩] আশ্রমবাসিনী
'য়ুরোপ প্রবাসীব পত্র', একাদশ পত্র, ১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮০

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'ছন্দ', ছন্দের হসন্ত-হলন্ত . দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৩৮ মাঘ। ১৯৩২
সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইযমধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ ॥ ১।২০ দুষ্মন্তেব উক্তি।

নব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি ইযমধিকমনোজ্ঞা চাপকানেনাপি তন্বী।
কিমিব হি মধুবাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ ॥
'চিরকুমার-সভা' ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্
'ছন্দ', ছন্দের হসন্ত-হলন্ত : দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৩৮ মাঘ। ১৯৩২
'বাংলা ভাষা-পরিচয়' ১৯৩৮, অধ্যায় ৯
অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥ ১।২২ দুষ্মন্তের উক্তি

পূর্ণ অনুবাদ 'প্রাচীন সাহিত্য', শকুন্তলা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২

১ পাঠান্তর 'তুলরাশাবিবাগ্নিঃ'। ২ পাঠান্তর রূপয়তি বা নিরূপয়তি। ৩ রবীন্দ্রনাথ 'দুর্লভম্' স্থলে 'যোগ্যা' লিখেছেন।

ইয়ং···তুএ কিদণামহেআ বণদোসিণী ত্তি ণোমালিআ। অঙ্ক ১
অনসূয়ার উক্তি

পরোক্ষ উল্লেখ 'বিবিধ প্রসঙ্গ', সংযোজনী : উপভোগ ১২৮৯ বৈশাখ। ১৮৮২

রমণীও কখু কালো ইমস্স পাদবমিহুণস্স বদিঅরো সংবুত্তো। জেণ ণবকুসুমজোব্বণা ণোমালিআ অঅং পি বহুফলদাএ উঅভোঅকখমো সহআরো। অঙ্ক ১ শকুন্তলার উক্তি

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

সহি ! ণ জুত্তং···অকিদসক্কারং অদিধিবিসেসং উজ্ঝিঅ সচ্ছন্দদো গমণং। অঙ্ক ১ অনসূয়ার উক্তি

(সখি, ন যুক্তম্ অকৃতসৎকারম্ অতিথিবিশেষম্ উজ্ঝিত্বা স্বচ্ছন্দতো গমনং।)

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'চিরকুমার-সভা' ১৯২৬, পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য

ভো ভোস্তপস্বিনঃ! তপোবনসন্নিহিতসত্ত্বরক্ষণায় সজ্জীভবন্তু ভবন্তঃ, প্রত্যাসন্নঃ কিল মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্মন্তঃ।

নেপথ্যে

পূর্ণ অনুবাদ 'প্রাচীন সাহিত্য', শকুন্তলা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২

তীব্রাঘাতাদভিমুখতরুস্কন্ধভগ্নৈকদন্তঃ
প্রৌঢাকৃষ্টব্রততিবলয়াসঙ্গনাজ্জাতপাশঃ।
মূর্তো বিঘ্নস্তপস ইব নো ভিন্নসারঙ্গযূথো
ধর্মারণ্যং প্রবিশতি[১] গজঃ স্যন্দনালোকভীতঃ॥ ১।৩৫

নেপথ্যে

আংশিক উদ্ধৃতি মূর্তো বিঘ্ন···স্যন্দনালোকভীতঃ

'প্রাচীন সাহিত্য', শকুন্তলা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥ ১।৩৬ দুষ্মন্তের উক্তি

পূর্ণ অনুবাদ 'মালতী পুঁথি' : পাণ্ডুলিপি পৃ ৬, দ্বিতীয় স্তম্ভ[২]

গণ্ডস্স উবরি বিপ্ফোড়ও। অঙ্ক ২ বিদূষকের উক্তি

(গণ্ডস্য উপরি বিস্ফোটকম্)।

আংশিক উদ্ধৃতি 'পঞ্চভূত', অখণ্ডতা ১৩০০ শ্রাবণ। ১৮৯৩

'চিঠিপত্র' ৮, পত্র-১৪৯ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা ১৯০১ মার্চ

'কালান্তর', কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ১৩২৪ ভাদ্র। ১৯১৭

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈ-

-রনামুক্তং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।

অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং

ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি ভুবি॥ ২।১১ দুষ্মন্তের উক্তি

আংশিক উদ্ধৃতি অনাঘ্রাতং পুষ্পং…কররুহৈঃ

'বনফুল' ১৮৮০, আখ্যাপত্র

'শিক্ষা', শিক্ষার বাহন ১৩২২ পৌষ। ১৯১৫

অনাঘ্রাতং পুষ্পং

'বিচিত্র প্রবন্ধ', নববর্ষা ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

অনাস্বাদিত মধু

'চিরকুমার-সভা' ১৯২৬, পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য

অয়মহং ভোঃ। অঙ্ক ৪ নেপথ্যে

আংশিক উদ্ধৃতি 'ঘরে-বাইরে' ১৯১৬, বিমলার আত্মকথা-৪

'পল্লীপ্রকৃতি' ভূমিলক্ষ্মী ১৩২৫ আশ্বিন। ১৯১৮

'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৪ অক্টোবর ৭

'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ২, ১৩৩৪ শ্রাবণ। ১৯২৭

'চিঠিপত্র', ৯, পত্র-১৯ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ জুন ১৪

'সাহিত্যের পথে', আধুনিক কাব্য ১৩৩৯ বৈশাখ। ১৯৩২

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১

'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব ১৩৪০ ভাদ্র। ১৯৩৩

'সাহিত্যের পথে', রূপশিল্প ১৩৪৬ আষাঢ়। ১৯৩৯

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্

আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।

তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং

লোকো নিয়ম্যত ইবৈষ দশান্তরেষু॥ ৪।২ কণ্বশিষ্যের উক্তি।

নব.।

আংশিক উদ্ধৃতি যাত্যেকতোঽস্তশিখরং…একতোঽর্কঃ
'চিঠিপত্র' ১৮৮৭, পত্র-৯ ষষ্ঠীচরণ দেবশর্মা-লিখিত
'সাহিত্য', সংযোজন : সাহিত্যসম্মিলন ১৩১৩ ফাল্গুন। ১৯০৭

পরোক্ষ উল্লেখ 'স্মৃতি' পৃ ৯৩, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র ১৩৩২ বৈশাখ ৩০। ১৯২৫

ভো ভোঃ! সন্নিহিতবনদেবতাস্তপোবনতরবঃ!
পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বসিক্তেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদৌ বঃ কুসুমপ্রবৃত্তিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥ ৪।১১ কণ্বের উক্তি। নব.

পূর্ণ অনুবাদ 'প্রাচীন সাহিত্য', শকুন্তলা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২

শকুন্তলা—হলা পিঅংবদে! অজ্জউত্তদংসণোস্সুআএ বি অস্সমপদং পবিচ্চঅন্তীএ দুক্খদুক্খেণ চলণা মে পুরমুহা ণ নিবড়ন্তি।

প্রিয়ংবদা—ণ কেবলং তুমং জ্জেব তবোবণবিরহকাদরা, তুএ উবট্ঠিতবিওঅস্স তবোবণস্স বি অবত্থং পেক্খ দাব।
উগ্‌গিল্লদব্‌ভকবলা মই.পরিচ্চত্তণচ্চণা মোরী।
ওসরিঅপাণ্ডুপত্তা মুঅন্তি অস্সূং বিঅ লদাও॥ ৪।১৪

পূর্ণ অনুবাদ 'প্রাচীন সাহিত্য', শকুন্তলা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২

শকুন্তলা—তাদ! এসা উডঅপজ্জন্তচারিণী গব্‌ভহারমন্থরা মিঅবহূ জদা সুহপ্‌পসবা ভবিস্‌সদি, তদা মে কম্পি পিঅণিবেদঅং বিসজ্জইস্‌সসি, মা এদং বিস্সুমরিস্‌সসি।

কণ্ব—বৎসে! নেদং বিস্মরিষ্যামি।

শকুন্তলা—অম্মো! কো ণু কখু এসে৷ পদক্কন্তো বিঅ মে পুণো পুণো বসণন্তে সজ্জদি।

কণ্ব—বৎসে!
যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাং
তৈলং ন্যষিচ্যত মুখে কুশসূচিবিদ্ধে।
শ্যামাকমুষ্টিপরিবর্ধিতকো জহাতি
সোঽয়ং ন পুত্রকৃতকঃ পদবীং মৃগস্তে॥ ৪।১৬

শকুন্তলা—বচ্ছ ! কিং মং সহবাসপরিচ্চাইণীং অণুবন্ধেসি, ণং অচিরপ্‌প-
-সুদোবরদাএ জণণীএ বিণা জধা মএ বড্‌ঢিদোসি তধা দাণিং
পি মএ বিরহিদং তাদো তুমং চিন্তইস্‌সদি। তা ণিউত্তস্‌স।

পূর্ণ অনুবাদ 'প্রাচীন সাহিত্য', শকুন্তলা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২

যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণ পদবীং মৃগস্তে

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

অহিণব-মহু-লোহ-ভাবিদো
তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।
কমলবসদিমেত্তণিব্বুদো
মহুঅর বিম্হরিদোসি ণং কহং ॥ ৫।৮ নেপথ্যে

পূর্ণ অনুবাদ 'প্রাচীন সাহিত্য', শকুন্তলা[১] ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২

বিদূষক—ভো বঅস্স। কিং দাব সে গীদিআএ অবি গহীদো ভঅদা
অক্‌খরত্থো।

রাজা—(সস্মিতম্) সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জন ইত্যক্ষরার্থঃ। তদহং দেবীং
হংসবতীমন্তরেণ উপালম্ভনমাগতোঽস্মি। সখে মাধব্য। মদ্‌-
বচনাদুচ্যতাং দেবী হংসবতী[২], সম্যগুপালব্ধোঽস্মীতি। গচ্ছ,
নাগরিকবৃত্ত্যা সান্ত্বয়ৈনাম্।

পূর্ণ অনুবাদ 'প্রাচীন সাহিত্য', শকুন্তলা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২

আংশিক উদ্‌ধৃতি সকৃৎকৃতপ্রণয়োঽয়ং জনঃ

'প্রাচীন সাহিত্য', শকুন্তলা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২
'সাহিত্যের পথে', সৃষ্টি ১৩৩১ কার্তিক। ১৯২৪

---

১ এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শ্লোকটির যে অনুবাদ করেছেন তাকে সম্পূর্ণ মূলানুগ বলা চলে না। তার অনুবাদে শ্লোকটির অর্থান্তর ঘটেছে। পক্ষান্তরে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদটি সম্পূর্ণ মূলানুগ। সেটি এ স্থলে দেওয়া হল।—

নূতন মধুর লালসা-লোলুপ অলি হে!
আম্র-মুকুলে গিয়েছিলে তুমি চুমিয়ে,
আজি কমলের দুয়ারে মাত্র বুলিয়ে
একেবারে তারে গেলে কি ভ্রমর ভুলিয়ে!
—'তীর্থসলিল', গান

২ 'হংসবতী' স্থলে রবীন্দ্রনাথ পাঠান্তর দিয়েছেন 'হংসপদিকা'।

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি ন নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥ ৫।২ দুষ্মন্তের উক্তি

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-৪০ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯২ ফেব্রুআরি ১২

আংশিক উদ্ধৃতি রম্যাণি বীক্ষ্য…শব্দান্

'বিচিত্র প্রবন্ধ', বাজে কথা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২

জননান্তরসৌহৃদানি

'বিচিত্র প্রবন্ধ', নববর্ষা ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র-৫৭[১], ১৩৩০ চৈত্র। ১৯২৪

পরোক্ষ উল্লেখ 'পঞ্চভূত', গদ্য ও পদ্য ১২৯৯ ফাল্গুন। ১৮৯৩

মহাভাগঃ কামং নরপতিরভিন্নস্থিতিরসৌ
ন কশ্চিদ্বর্ণানামপথমপকৃষ্টোঽপি ভজতে।
তথাপীদং শশ্বৎ পরিচিতবিবিক্তেন মনসা
জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব ॥ ৫।১১ শার্ঙ্গরবের উক্তি

আংশিক অনুবাদ জনাকীর্ণং মন্যে গৃহমিব

'প্রাচীন সাহিত্য', শকুন্তলা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২

অভ্যক্তমিব স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব সুপ্তম্।
বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জনমিহ সুখসঙ্গিনমবৈমি ॥ ৫।১২

শারদ্বতের উক্তি

পূর্ণ অনুবাদ 'প্রাচীন সাহিত্য', শকুন্তলা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২

আংশিক অনুবাদ অভ্যক্তমিব স্নাতঃ…সুপ্তম্

'সমালোচনা', তার্কিক ১২৯০ আশ্বিন। ১৮৮৩

ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলোদ্গমৈ-
র্নবাম্বুভির্দূরবিলম্বিনো ঘনাঃ।
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ
স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্[২] ॥ ৫।১৩ শার্ঙ্গরবের উক্তি

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'বিবিধ প্রসঙ্গ', কিন্তু-ওয়ালা ১২৮৮ শ্রাবণ। ১৮৮১

---

১ এই পত্রে 'জননান্তরসৌহৃদানি' স্থলে আছে 'জন্মান্তরসৌহৃদানি'।

২ এই শ্লোক ভর্তৃহরির নীতিশতকে (পরোপকারপদ্ধতি ৭১) দেখা যায়।

শকুন্তলা—দুবে বি এত্থ আরণ্যআ ত্তি (দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ)

আংশিক উদ্ধৃতি 'প্রাচীন সাহিত্য', শকুন্তলা ১৩০৯ আশ্বিন। ১৯০২

রাজা—মাতলে! ··তৎ কতমস্মিন্ পথি বর্তামহে মরুতাম্।

মাতলি—ত্রিস্রোতসং বহতি যো গগনপ্রতিষ্ঠাং
জ্যোতীংষি বর্তযতি চক্রবিভক্তরশ্মিঃ।
তস্য ব্যপেতরজসঃ প্রবহস্য বায়ো-
র্মার্গো দ্বিতীয়হরিবিক্রমপূত এষঃ॥ ৭।৬

পূর্ণ অনুবাদ 'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট, বিবিধ : সাময়িক সাহিত্য ১৩০৫-১২। ১৮৯৮-০৫

মাতলি—আয়ুষ্মন্। এষ খলু হেমকূটো নাম কিংপুরুষপর্বতঃ পরং তপস্বিনাং
ক্ষেত্রম্।
স্বাযম্ভুবান্মরীচের্যঃ প্রবভূব প্রজাপতিঃ।
সুরাসুরগুরুঃ সোঽস্মিন্ সপত্নীকস্তপশ্যতি॥ ৭।৯

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

বল্মীকার্ধনিমগ্নমূর্তিরুরগত্বগ্ ব্রহ্মসূত্রাস্তবঃ
কণ্ঠে জীর্ণলতাপ্রতানবলয়েনাত্যর্থসম্পীডিতঃ।
অংসব্যাপি শকুন্তনীডনিচিতং বিভ্রজ্জটামণ্ডলং
যত্র স্থাণুরিবাচলো মুনিরসাবভ্যর্কবিম্বং স্থিতঃ॥ ৭।১১

মাতলির উক্তি

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

অর্ধপীতস্তনং মাতুরামর্দক্লিষ্টকেশরম্।
প্রক্রীডিতুং সিংহশিশুং করেণৈবাবকর্ষতি॥ ৭।১৪ দুষ্মন্তের উক্তি

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-৭১ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯২ নভেম্বর ১৮
'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯
'পথে ও পথের প্রান্তে', অধ্যায় ৮, ১৯২৬ ডিসেম্বর (?)

বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্তি॥ ৭।২১ দুষ্মন্তের উক্তি

আংশিক উদ্ধৃতি বসনে পরিধূসরে···ধৃতৈকবেণিঃ
'প্রাচীন সাহিত্য', কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ১৩০৮ পৌষ। ১৯০১

কুমারসম্ভব

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥ ১।১

আংশিক উদ্‌ধৃতি অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা

'ছন্দ', বাংলা ছন্দ : প্রথম পর্যায়, এণ্ডারসনকে লেখা পত্র ১৩২০ ফাল্গুন ৬। ১৯১৪

দেবতাত্মা, নগাধিরাজ

'জীবনস্মৃতি' ১৯১২, হিমালয়যাত্রা , সাহিত্যের সঙ্গী

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৫ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ মে ৩০

পূর্বাপরৌ তোয়নিধী…মানদণ্ডঃ

'চারিত্রপূজা', ভারতপথিক রামমোহন রায়-২, ১৩৪০ পৌষ ১৬ । ১৯৩৭

পরোক্ষ উল্লেখ চিঠিপত্র' ৯, পত্র-২৪১ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩৮ জুলাই ৮

পূর্ণ অনুবাদ 'ছন্দ', ছন্দের মাত্রা : দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ। ১৯৩৪

মন্দাকিনী[১]নির্ঝরশীকরাণাং বোঢা মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ।
যদ্‌বায়ুরন্বিষ্টমৃগৈঃ কিরাতৈরাসেব্যতে ভিন্নশিখণ্ডিবর্হঃ॥ ১।১৫

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'জীবনস্মৃতি' ১৯১২, পিতৃদেব

আংশিক উদ্‌ধৃতি মন্দাকিনী…কম্পিতদেবদারুঃ

'গল্পগুচ্ছ', প্রগতি-সংহার[২] ১৩৪৮ আশ্বিন। ১৯৪১

শিরীষপুষ্পাধিকসৌকুমার্যৌ বাহু তদীয়াবিতি মে বিতর্কঃ।
পরাজিতেনাপি কৃতৌ হরস্য যৌ কণ্ঠপাশৌ মকরধ্বজেন॥ ১।৪১

পরোক্ষ উল্লেখ 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১১২ ইন্দিরা দেবীকে লেখা[৩] ১৮৯৩ সেপ্টেম্বর ৯

অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি।
পাদেন নাপেক্ষত সুন্দরীণাং সম্পর্কমাশিঞ্জিতনূপুরেণ॥ ৩।২৬
সদ্যঃ প্রবালোদ্‌গমচারুপত্রে নীতে সমাপ্তিং নবচূতবাণে।
নিবেশয়ামাস মধুর্দ্বিরেফান্ নামাক্ষরাণীব মনোভবস্য॥ ৩।২৭

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

---

১ পাঠভেদ 'ভাগীরথী'

২ দ্র. শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৪৮

৩ দ্র. কুমার ৫।৪, রঘু ১৮।৪৫

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ ॥ ৩।৩৬
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা ॥ ৩।৩৭

পূর্ণ অনুবাদ 'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

লতাগৃহদ্বারগতোঽথ নন্দী
বামপ্রকোষ্ঠার্পিত হেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়ৈব
মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ ॥ ৩।৪১ নব.

পরোক্ষ উল্লেখ 'বিচিত্র প্রবন্ধ', ছোটোনাগপুর ১২৯২ আষাঢ়। ১৮৮৫
'পঞ্চভূত', সৌন্দর্যের সম্বন্ধ ১৩০০ ভাদ্র। ১৮৯৩
'পথের সঞ্চয়', ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি ১৩১৯ পৌষ। ১৯১২
'বাংলা শব্দতত্ত্ব', চিহ্নবিভ্রাট ১৩৩৯ মাঘ। ১৯৩৩
'কালান্তর', কংগ্রেস ১৩৪৬ আষাঢ়। ১৯৩৯

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহম্
অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্
নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ ॥ ৩।৪৮ নব.

আংশিক উদ্ধৃতি অবৃষ্টিসংরম্ভ
'রাশিয়ার চিঠি', অধ্যায় ২, ১৯৩০ সেপ্টেম্বর ১৯

অনুত্তরঙ্গ, নিবাতনিষ্কম্প
'লোকসাহিত্য', গ্রাম্য সাহিত্য ১৩০৫ ফাল্গুন-চৈত্র। ১৮৯৯
'শান্তিনিকেতন' ১, দ্রষ্টা ১৩১৫ ফাল্গুন ৬। ১৯০৯
'শান্তিনিকেতন' ২, দ্বিধা ১৯১০ অক্টোবর

অনুত্তরঙ্গ
'শান্তিনিকেতন' ২, সামঞ্জস্য ১৯১১ জানুআরি

পরোক্ষ উল্লেখ 'গোরা' ১৯১০, অধ্যায় ৫৮

অশোকনির্ভর্ৎসিত পদ্মরাগমাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারং বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী ॥ ৩।৫৩

আংশিক উদ্ধৃতি বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী

'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব ১৩৪০ ভাদ্র। ১৯৩৩

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'আধুনিক সাহিত্য', সঞ্জীবচন্দ্র ১৩০১ পৌষ। ১৮৯৪

'প্রাচীন সাহিত্য', কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ১৩০৮ পৌষ। ১৯০১

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥ ৩।৫৪

নব.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'বিচিত্র প্রবন্ধ', কেকাধ্বনি ১৩০৯ ভাদ্র। ১৯০২

আংশিক উদ্‌ধৃতি সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব

'আধুনিক সাহিত্য', সঞ্জীবচন্দ্র ১৩০১ পৌষ। ১৮৯৪

'শেষরক্ষা' ১৯২৮ জুলাই, প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য

পরোক্ষ উল্লেখ 'দুই বোন' ১৯৩৩, নীরদ

'চার অধ্যায়' ১৯৩৪, দ্বিতীয় অধ্যায়

শৈলাত্মজাঽপি পিতুরুচ্ছিরসোঽভিলাষং
ব্যর্থং সমর্থ্য ললিতং বপুরাত্মনশ্চ।
সখ্যোঃ সমক্ষমিতি চাধিকজাতলজ্জা
শূন্যা জগাম ভবনাভিমুখী কথঞ্চিৎ ॥ ৩।৭৫

আংশিক উদ্‌ধৃতি ব্যর্থং সমর্থ্য···আত্মনশ্চ, শূন্যা জগাম···কথঞ্চিৎ

'প্রাচীন সাহিত্য', কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ১৩০৮ পৌষ। ১৯০১

তথা সমক্ষং দহতা মনোভবং
পিনাকিনা ভগ্নমনোরথা সতী।
নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী
প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা ॥ ৫।১

আংশিক উদ্‌ধৃতি নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী

'প্রাচীন সাহিত্য', কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ১৩০৮ পৌষ। ১৯০১

ইয়েষ সা কর্তুমবন্ধ্যরূপতাং
সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ।
অবাপ্যতে বা কথমন্যথা দ্বয়ং
তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ ॥ ৫।২

আংশিক উদ্‌ধৃতি ইয়েষ সা···তপোভিরাত্মনঃ

'প্রাচীন সাহিত্য', কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ১৩০৮ পৌষ। ১৯০১

মনীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবতা-
স্তপঃ ক্ব বৎসে ক্ব চ তাবকং বপুঃ।
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ॥ ৫।৪

পরোক্ষ উল্লেখ 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১১২ ইন্দিরা দেবীকে লেখা, ১৮৯৩ সেপ্টেম্বর ৯

প্রতিক্ষণং সা কৃতরোমবিক্রিয়াং
ব্রতায় মৌঞ্জীং ত্রিগুণাং বভার যাম্।
অকারি তৎপূর্বনিবদ্ধয়া তয়া
সরাগমস্যা রশনাগুণাস্পদম্॥ ৫।১০

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'প্রাচীন সাহিত্য', কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ১৩০৮ পৌষ। ১৯০১

তথাতিতপ্তং সবিতুর্গভস্তিভি-
র্মুখং তদীয়ং কমলশ্রিয়ং দধৌ।
অপাঙ্গয়োঃ কেবলমস্য দীর্ঘয়োঃ
শনৈঃ শনৈঃ শ্যামিকয়া কৃতং পদম্॥ ৫।২১

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'প্রাচীন সাহিত্য', কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ১৩০৮ পৌষ। ১৯০১

স্বয়ংবিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদা বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ॥ ৫।২৮

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'চিরকুমার-সভা' ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য

অলং বিবাদেন যথা শ্রুতস্ত্বয়া তথাবিধস্তাবদশেষমস্তু সঃ।
মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্ ন কামবৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে॥ ৫।৮২

আংশিক উদ্‌ধৃতি মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্

'সাহিত্য', সৌন্দর্যবোধ ১৩১৩ পৌষ। ১৯০৬

ভাবৈকরস

'পরিচয়', ভগিনী নিবেদিতা ১৩১৮ অগ্রহায়ণ। ১৯১১

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টি-
র্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ॥[1] ৫।৮৫

১ শ্লোকটি কালিদাসের নামে প্রচলিত শৃঙ্গাররসাষ্টকং কাব্যে (৭-সংখ্যক) দেখা যায়। দ্রষ্টব্য হেবরলিনের -সংকলিত 'কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থ ১৮৪৭, পৃ ৫১১

আংশিক উদ্‌ধৃতি   ন যযৌ ন তস্থৌ

'চিঠিপত্র' ৮, পত্র-১৩০ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা ১৯০০ অক্টোবর ২

'চিঠিপত্র' ৮, পত্র-১৪৯ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা ১৯০১ মার্চ

'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র-৩৮, ১৩২৬ আশ্বিন। ১৯১৯

'চিরকুমার-সভা', ১৯২৬, পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য

তদ্দর্শনাদভূৎ শম্ভোর্ভূর্যান্ দারার্থমাদরঃ।

ক্রিয়াণাং খলু ধর্ম্যাণাং সৎপত্ন্যো মূলকারণম্ ॥ ৬।১৩

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি   'প্রাচীন সাহিত্য', কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ১৩০৮ পৌষ। ১৯০১

ধর্মেনাপি পদং শর্বে কারিতে পার্বতীং প্রতি

পূর্বাপরাধভীতস্য কামস্যোচ্ছ্বসিতং মনঃ ॥ ৬।১৪

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি   'প্রাচীন সাহিত্য', কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ১৩০৮ পৌষ। ১৯০১

সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী গৃহীতপত্যুদ্‌গমনীয়বস্ত্রা।

নির্বৃত্তপর্জন্যজলাভিষেকা প্রফুল্লকাশা বসুধেব রেজে ॥ ৭।১১

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি   'প্রাচীন সাহিত্য', কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ১৩০৮ পৌষ। ১৯০১

তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং কালী কপালাভরণা চকাশে।

বলাকিনী নীলপয়োদরাজী দূরং পুরঃক্ষিপ্ত শতহ্রদেব ॥ ৭।৩৯

আংশিক উদ্‌ধৃতি   তাসাঞ্চ পশ্চাৎ··· চকাশে

'সাহিত্য', বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ শ্রাবণ। ১৯০২

রঘুবংশ

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।

জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ ॥ ১।১ নব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি   জগতঃ পিতরৌ ·পরমেশ্বরৌ

'যোগাযোগ' ১৯২৯, অধ্যায় ২১

পিতরৌ

'শান্তিনিকেতন' ২, দ্বিধা ১৯.০ অক্টোবর

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ

'পথে ও পথের প্রান্তে', অধ্যায় ৪৭, ১৯৩০ ফেব্রুআরি

প্রত্যক্ষ উল্লেখ   'ছন্দ', পত্রধারা তৃতীয় পর্যায়, পত্র-৩ ধূর্জটীপ্রসাদকে লেখা ১৯৩৫ জুন ৩

ক্ব সূর্য-প্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরংমোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্‌॥ ১।২ নব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি তিতীর্ষুর্দুস্তরং সাগরম্‌

'স্মৃতি' পৃ ৪৭, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র ১৩১০ চৈত্র ৯ । ১৯০৪

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্‌
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥ ১।৩ নব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্‌

'জীবনস্মৃতি' ১৯১২, সাহিত্যের সঙ্গী

গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্‌

'স্মৃতি' পৃ ৪৭, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র ১৩১০ চৈত্র ৯। ১৯০৪

'শিক্ষা', শিক্ষার বাহন[১] ১৩২২ পৌষ ১৯১৫

প্রাংশুলভ্যে বামনঃ

'সমালোচনা', একটি পুরাতন কথা ১২৯১ অগ্রহায়ণ। ১৮৮৪

'গল্পগুচ্ছ', প্রগতিসংহার[২] ১৩৪৮ আশ্বিন। ১৯৪১

পরোক্ষ উল্লেখ 'জীবনস্মৃতি' ১৯১২, কাব্যবচনাচর্চা

'চিঠিপত্র' ৫, পত্র ১১৭ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা ১৩৪২ বৈশাখ ৩ । ১৯৩৫

সোঽহমাজন্মশুদ্ধানামাফলোদয়কর্মণাম্‌।
আসমুদ্রক্ষিতীশানামানাকরথবর্ত্মনাম্‌॥ ১।৫ নব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি আনাকরথবর্ত্মনাম্‌

'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ৬, ১৩৩৪ শ্রাবণ। ১৯২৭

পূর্ণ অনুবাদ 'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

যথাবিধিহুতাগ্নীনাং যথাকামার্চিতার্থিনাম্‌।
যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকাল-প্রবোধিনাম্‌॥ ১।৬ নব.
ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্‌।
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্‌॥ ১।৭ নব.

---

১ এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'গমিষ্যত্যুপহাস্যতাম্‌' লিখেছেন।

২ দ্র. শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৪৮

শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্ ॥ ১।৮ নব.
রঘূণামন্বয়ং বক্ষ্যে তনুবাগ্‌বিভবোঽপি সন্।
তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ ॥ ১।৯ নব

পূর্ণ অনুবাদ 'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

ব্যূঢোরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।
আত্মকর্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রো ধর্ম ইবাশ্রিতঃ ॥ ১।১৩

আংশিক উদ্ধৃতি ব্যূঢোরস্কো…মহাভুজঃ

'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', প্রথম পত্র ১২৮৬ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ। ১৮৭৯

ব্যূঢোরস্কো, শালপ্রাংশু

'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী', ভূমিকা ১২৯৮ বৈশাখ। ১৮৯১

স বেলাবপ্রবলয়াং পরিখীকৃতসাগরাম্।
অনন্য শাসনামুর্বীং শশাসৈক পুরীমিব ॥ ১।৩০

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

বনান্তরাদুপাবৃত্তৈঃ সমিৎকুশফলাহরৈঃ।
পূর্যমাণমদৃশ্যাগ্নি প্রত্যুদ্যাতৈস্তপস্বিভিঃ ॥ ১।৪৯ নব.
আকীর্ণমৃষিপত্নীনামুটজদ্বাররোধিভিঃ।
অপত্যৈরিব নীবার-ভাগধেয়োচিতৈর্মৃগৈঃ ॥ ১।৫০ নব.
সেকান্তে মুনিকন্যাভিস্তৎক্ষণোজ্‌ঝিতবৃক্ষকম্।
বিশ্বাসায় বিহঙ্গানামালবালাম্বুপায়িনাম্ ॥ ১।৫১ নব.
আতপাত্যয়সংক্ষিপ্ত নীবারাসু নিষাদিভিঃ।
মৃগৈর্বর্তিতরোমন্থমুটজাঙ্গনভূমিষু ॥ ১।৫২ নব.
অভ্যুত্থিতাগ্নি-পিশুনৈরতিথীনাশ্রমোন্মুখান্।
পুনানং পবনোদ্ধূতৈর্ধূমৈরাহুতিগন্ধিভিঃ ॥ ১।৫৩ নব.

পূর্ণ অনুবাদ 'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

স তত্র মঞ্চেষু মনোজ্ঞ-বেষান্ সিংহাসনস্থানুপচারবৎসু।
বৈমানিকানাং মরুতামপশ্যাদাকৃষ্টলীলান্ নরলোকপালান্ ॥ ৬।১

পুরোপকণ্ঠোপবনাশ্রয়াণাং কলাপিনামুদ্ধতনৃত্যহেতৌ।
প্রধ্মাতশঙ্খে পরিতো দিগন্তাংস্তূর্যস্বনে মূর্চ্ছতি মঙ্গলার্থে ॥ ৬।৯

মন্দ্রস্যবাহুং চতুরস্রযানমধ্যাস্ত কন্যা পরিবারশোভি।
বিবেশ মঞ্চাম্বররাজমার্গং পতিংবরা কৢপ্তবিবাহ-বেষা॥ ৬।১০
এবং তয়োক্তে তমবেক্ষ্য কিঞ্চিদ্বিস্রংসিদূর্বাঙ্কমধূকমালা।
ঋজুপ্রণামক্রিয়য়ৈব তন্বী প্রত্যাদিদেশৈনমভাষমাণা॥ ৬।২৫

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-৬২ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯২ জুন ২৯
অথাঙ্গরাজাদবতার্য চক্ষুর্যাহীতি জন্যামবদৎ কুমারী।
নাসৌ ন কাম্যো ন চ বেদ সম্যক্‌দ্রষ্টুং ন সা ভিন্নরুচির্হি লোকঃ॥ ৬।৩০

আংশিক উদ্‌ধৃতি ভিন্নরুচির্হি লোকঃ
'লোকসাহিত্য', ছেলেভুলানো ছড়া ১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক। ১৮৯৪
'চিরকুমার-সভা'[১] ১৯২৬, দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য
'সাহিত্যের স্বরূপ', গদ্যকাব্য ১৯৩৯ আগস্ট ২৯
গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥ ৮।৬৭ নব

আংশিক উদ্‌ধৃতি গৃহিণী সচিবঃ···কলাবিধৌ
'সাহিত্য', বাংলা জাতীয় সাহিত্য ১৩০১ চৈত্র। ১৮৯৫
'যোগাযোগ' ১৯২৯, অধ্যায় ২৬
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ
'সাহিত্যের পথে', আধুনিক কাব্য ১৩৩৯ বৈশাখ। ১৯৩২
'শেষের কবিতা' ১৯২৯, অধ্যায় ১১ : মিলন-তত্ত্ব
শয্যাগতেন রামেণ মাতা শাতোদরী বভৌ।
সৈকতাম্ভোজবলিনা জাহ্নবীব শরৎকৃশা॥ ১০।৬৯

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'ছন্দ', পয়ার ও দ্বাদশাক্ষর ছন্দ ১৩০২ বৈশাখ। ১৮৯৫
দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজি নীলা
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥ ১৩।১৫

পরোক্ষ উল্লেখ 'বিচিত্র প্রবন্ধ', কেকাধ্বনি ১৩০৮ ভাদ্র। ১৯০১
'বিচিত্র প্রবন্ধ', আষাঢ় ১৩২১ আষাঢ়। ১৯১৪
'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-২১ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৯২৬ জুলাই ৩১

১ দ্র. 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, অষ্টম পরিচ্ছেদ

তত্র নাগফণোৎক্ষিপ্তসিংহাসননিষেদুষী।

সমুদ্ররশনা সাক্ষাৎ প্রাদুরাসীদ্বসুন্ধরা ॥ ১৫।৮৩

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'ছন্দ', পয়ার ও দ্বাদশাক্ষর ছন্দ ১৩০২ বৈশাখ। ১৮৯৫

শিরীষপুষ্পাধিক সৌকুমার্যঃ খেদং স যায়াদপি ভূষণেন।

নিতান্তগুর্বীমপি সোঽনুভাবাদ্ধুরং ধরিত্র্যা বিভরাম্বভূব ॥ ১৮।৪৫

পরোক্ষ উল্লেখ 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১১২ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯৩ সেপ্‌টেম্বর

মেঘদূত

মেঘদূত কাব্যে পাঠভেদ বিস্তর। রবীন্দ্রনাথ কোন্ পাঠ অনুসরণ করতেন তা জানা যায় নি। এ স্থলে প্যারীমোহন সেনগুপ্ত-অনূদিত এবং অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন -কৃত ভূমিকা ও পাঠ-সংস্কার -সংবলিত 'মেঘদূত' গ্রন্থের (প্রথম সংস্করণ ১৩৩৭) পাঠ যথসম্ভব অনুসৃত হল।

পূর্বমেঘ

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ

শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ।

যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু

স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু ॥ ১

আংশিক উদ্ধৃতি কশ্চিৎ ক'ন্তা প্রমত্ত

'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র। ১৯১৮

স্বাধিকারপ্রমত্ত

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১২ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ মে ১৫

'দুই বোন' ১৯৩৩, উর্মিমালা

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-২৩১ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩৮ ফেব্রুআরি ৮

কান্তাবিরহগুরুণা, শাপেনাস্তংগমিতমহিমা

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১২ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ মে ১৫

পূর্ণ অনুবাদ 'ছন্দ', পত্রধারা প্রথম পর্যায়, প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লেখা ১৯৩১ মার্চ ১৩

'ছন্দ', ছন্দের মাত্রা : প্রথম পর্যায় ১৩৩৯ কার্তিক। ১৯৩২

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ স কামী
নীত্বা মাসান্ কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢস্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং
বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥ ২

আংশিক উদ্‌ধৃতি কনকবলয়ভ্রংশবিক্তপ্রকোষ্ঠ

'চিবকুমাব সভা'[১] ১৯২৬, তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য

আষাঢস্য প্রথম · সানুম্

'বিচিত্র প্রবন্ধ', নানা কথা ১২৯২ জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র। ১৮৮৫

আষাঢস্য প্রথমদিবসে

'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র ৫৫ ইন্দিবা দেবীকে লেখা ১২৯৯ আষাঢ ২ । ১৮৯২

'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-১৪ প্রমথ চৌধুবীকে লেখা ১৮৯৪ জুন ১৬

'বিচিত্র প্রবন্ধ', নববর্ষা ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

পরোক্ষ উল্লেখ 'চিঠিপত্র' ৮, পত্র ১০৫ প্রিযনাথ সেনকে লেখা ১৯০০ জুলাই ১৭

'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র-৩৫, ১৩২৬ আষাঢ ৩। ১৯১৯

'শিক্ষা', শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ ১৯৩৬ ফেব্রুআরি

পূর্ণ অনুবাদ 'ছন্দ', ছন্দের মাত্রা : প্রথম পর্যায ১৩৩৯ কার্তিক। ১৯৩২

তস্য স্থিত্বা কথমপি পুবঃ কেতকাধানহেতো-
বন্তর্বাষ্পশ্চিবমনুচরো বাজরাজস্য দধ্যৌ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥ ৩

আংশিক উদ্‌ধৃতি মেঘালোকে ভবতি দূরসংস্থে

'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৪ প্রমথ চৌধুবীকে লেখা (তাবিখ অনুল্লিখিত)

মেঘালোকে·· চেতঃ, কিংপুনর্দূরসংস্থে

'লোকসাহিত্য', ছেলে-ভুলানো ছড়া ১৩০১। ১৮৯৪

মেঘালোকে ভবতি· চেতঃ

'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-৪০ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯২ ফেব্রুআবি ১২

'কালান্তর', হিন্দুমুসলমান (কালিদাস নাগকে লেখা) ১৩২৯ আষাঢ় ৭। ১৯২২

---

১ দ্র. 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, দশম পরিচ্ছেদ

'ছন্দ', পত্রধারা প্রথম পর্যায়, প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে লেখা ১৯৩১ মার্চ ১৩

স্থখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ

'বিচিত্র প্রবন্ধ', নববর্ষা ১৩০৮ শ্রাবণ। ১৯০১

অন্যথাবৃত্তি

'জাপানযাত্রী', অধ্যায় ৬, ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ ২। ১৯১৬

ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু॥ ৫

আংশিক উদ্ধৃতি ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ

'কালান্তর', হিন্দুমুসলমান (কালিদাস নাগকে লেখা) ১৩২৯ আষাঢ় ৭। ১৯২২

'শেষের কবিতা' ১৯২৯, অধ্যায় ২ : সংঘাত

'গল্পগুচ্ছ', চিত্রকর ১৩৩৬ কার্তিক। ১৯২৯

'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব ১৩৪০ ভাদ্র। ১৯৩৩

ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুৎ

'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৪ অক্টোবর ৭

কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু

'সাহিত্যের পথে', বাস্তব ১৩২১ শ্রাবণ। ১৯১৪

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তোয়গৃধ্নুঃ।
গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ॥ ৯

পরোক্ষ উল্লেখ 'সাহিত্য', সৌন্দর্যবোধ ১৩১৩ পৌষ। ১৯০৬

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভি-
র্দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥ ১৪

আংশিক উদ্ধৃতি স্থূলহস্তাবলেপ

'সাহিত্যের স্বরূপ', গদ্যকাব্য ১৯৩৯ আগস্ট
'পরিচয়', ভগিনী নিবেদিতা ১৩১৮ অগ্রহায়ণ।
'পথে ও পথের প্রান্তে', অধ্যায় ১৮, ১৩৩৫ শ্রাবণ। ১৯২৮
'যোগাযোগ' ১৯২৯, অধ্যায় ৪৬
'প্রহাসিনী', সংযোজন : ধ্যানভঙ্গ

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'সাহিত্যের পথে', বাস্তব ১৩২১ শ্রাবণ। ১৯১৪
'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৪ সেপ্‌টেম্বর ২৪

পরোক্ষ উল্লেখ 'চারিত্রপূজা', ভারতপথিক রামমোহন রায়-২, ১৩৪০ পৌষ ১৬ । ১৯৩৩

রত্নচ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাদ্
বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্য।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ ॥ ১৫

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'সাহিত্য', বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ শ্রাবণ। ১৯০২

ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকষণসুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ ॥ ১৬

আংশিক উদ্ধৃতি জনপদবধূ

'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-২৬ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯১ জুলাই ৪
'সাহিত্যের পথে', পঞ্চাশোর্ধ্বম্ ১৩৩৬ ফাল্গুন। ১৯৩০

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৪, প্রমথ চৌধুরীকে লেখা (তারিখ অনুল্লিখিত)
'প্রাচীন সাহিত্য', মেঘদূত ১২৯৮ অগ্রহায়ণ। ১৮৯১
'সাহিত্য', সৌন্দর্যবোধ ১৩১৩ পৌষ। ১৯০৬

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈ-
র্নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ।
ত্বয্যাসন্নে ফলপরিণতিশ্যামজম্বূবনান্তাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ ॥ ২৩

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৪ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা (তারিখ অনুল্লিখিত)
'প্রাচীন সাহিত্য', মেঘদূত ১২৯৮ অগ্রহায়ণ। ১৮৯১

'ছিন্নপত্রাবলী' পত্র-৮১ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯৩ ফেব্রুআরি ১৪

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বননদীতীরজাতানি সিঞ্চ-
ন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকাজালকানি।
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং
ছায়াদানাৎ ক্ষণপবিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্ ॥ ২৬

আংশিক উদ্‌ধৃতি নগনদী[১]

'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-৮১ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯৩ ফেব্রুআরি ১৪

পুষ্পলাবী

'প্রাচীন সাহিত্য', মেঘদূত ১২৯৮ অগ্রহায়ণ। ১৮৯১

প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্
পূর্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিনাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্ ॥ ৩০

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'প্রাচীন সাহিত্য', মেঘদূত, ১২৯৮ অগ্রহায়ণ। ১৮৯১

'বিচিত্র প্রবন্ধ', নববর্ষা ১৩০৮ শ্রাবণ ১৯০১

জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশসংস্কারধূপৈ-
র্বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ।
হর্ম্যেষ্বস্যাঃ কুসুমসুরভিষ্বধ্বখিন্নান্তরাত্মা
নীত্বা রাত্রিং ললিতবনিতাপাদরাগাঙ্কিতেষু ॥ ৩২

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'প্রাচীন সাহিত্য', মেঘদূত ১২৯৮ অগ্রহায়ণ। ১৯০১

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামিন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ ॥ ৩৭

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'চিঠিপত্র' ৫ পত্র-৪ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা (তারিখ অনুল্লিখিত)

'প্রাচীন সাহিত্য', মেঘদূত ১২৯৮ অগ্রহায়ণ। ১৮৯১

গত্বা চোর্ধ্বং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিতপ্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।

১ রবীন্দ্রনাথ 'বননদী' স্থলে 'নগনদী' লিখেছেন। দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ড : 'হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহ' অধ্যায়।

শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥ ৫৮

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'লোকসাহিত্য', গ্রাম্যসাহিত্য ১৩০৫ ফাল্গুন-চৈত্র। ১৮৯৯

উত্তর মেঘ

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥ ২১

আংশিক উদ্ধৃতি তন্বী, শিখরদশনা, মধ্যে ক্ষামা, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা
'চিঠিপত্র' ৫, পত্র ১ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৯১৩ মে ৬

শেষান মাসান গমনদিবসপ্রস্তুতস্যাবধের্বা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ।
সংযোগং বা হৃদয়নিহিতারম্ভমাস্বাদয়ন্তী
প্রায়েণৈতে রমণবিরহেষ্বঙ্গনানাং বিনোদাঃ ॥ ২৬

আংশিক উদ্ধৃতি দেহলীদত্তপুষ্পা
'শেষের কবিতা' ১৯২৯, অধ্যায় ২. সংঘাত

আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ।
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়া সার্ধমিচ্ছারতৈর্যা
তামেবোষ্ণৈর্বিরহমহতীমশ্রুভির্যাপয়ন্তীম্ ॥ ২৮

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-৮১ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯৩ ফেব্রুআরি ১৪

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্বস্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি ॥ ৪৬

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'প্রাচীন সাহিত্য', মেঘদূত ১২৯৮ অগ্রহায়ণ। ১৮৯১

ঋতুসংহার

গ্রীষ্মবর্ণন

নিশাঃ শশাঙ্কক্ষতনীলরাজয়ঃ
ক্বচিদ্‌বিচিত্রং জলযন্ত্রমন্দিরম্‌।
মণিপ্রকারাঃ সরসঞ্চ চন্দনং
শুচৌ প্রিয়ে। যান্তি জনস্য সেব্যতাম্‌॥ ১।২

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

বর্ষাবর্ণন

সশীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জর
স্তড়িৎপতাকোঽশনিশব্দমর্দলঃ।
সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতি-
র্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ প্রিয়ে॥ ২।১

আংশিক উদ্‌ধৃতি সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ[১]

'আধুনিক সাহিত্য', বঙ্কিমচন্দ্র ১৩০১ বৈশাখ। ১৮৯৪

রাজবদুন্নতধ্বনিঃ

'পথের সঞ্চয়', আমেরিকার চিঠি ১৩১৯ ফাল্গুন। ১৯১৩

'সাহিত্যের ', বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ১৩৪১ মাঘ। ১৯৩৫

মুদিত ইব কদম্বৈর্জাতপুষ্পৈঃ সমস্তাৎ
পবনচালিতশাখৈঃ শাখিভির্নৃত্যতীব।
হসিতমিব বিধত্তে সূচিভিঃ কেতকীনাং
নবসলিলনিষেকচ্ছিন্নতাপো বনান্তঃ॥ ২।২৩

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী
তরুবিটপলতানাং বান্ধবো নির্বিকারঃ।
জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণহেতু-
র্দিশতু তব হিতানি প্রায়শো বাঞ্ছিতানি॥ ২।২৮

---

১ রবীন্দ্রনাথ 'রাজবদুদ্ধতদ্যুতি' স্থলে লেখেন 'রাজবদুন্নতধ্বনি'। দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ড : হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহ' অধ্যায়, পৃ ৩২৮-২৯।

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'বিবিধ প্রসঙ্গ', বসন্ত ও বর্ষা ১২৮৮ ভাদ্র। ১৮৮১

শরদ্‌বর্ণন

কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা
সোন্মাদহংসরবনূপুরনাদরম্যা।
আপক্বশালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ
প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা॥ ৩।১

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

বসন্তবর্ণন

আকম্পয়ন্ কুসুমিতাঃ সহকারশাখাঃ
বিস্তারয়ন্ পরভৃতস্য বচাংসি দিক্ষু।
বায়ুর্বিবাতি হৃদয়ানি হরন্নরাণাং
নীহারপাতবিগমাৎ সুভগো বসন্তে॥ ৬।২২

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

মলয়পবনবিদ্ধঃ কোকিলেনাভিরম্যো
সুরভিমধুনিষেকল্লব্ধগন্ধপ্রবন্ধঃ।
বিবিধমধুপযূথৈর্বেষ্ট্যমানঃ সমন্তাদ্
ভবতু তব বসন্তঃ শ্রেষ্ঠকালঃ সুখায়[১]॥

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'বিবিধ প্রসঙ্গ', বসন্ত ও বর্ষা ১২৮৮ ভাদ্র। ১৮৮১

---

১ বসন্তবর্ণনার এই শ্লোকটি প্রচলিত ঋতুসংহার কাব্যে দেখা যায় না। তবে হেবরলিনের 'কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থে শ্লোকটি সংকলিত আছে। দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ড : 'হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহ' অধ্যায়, পৃ ৩২৯।

বাণভট্ট, ভর্তৃহরি ও অমরু

বাণভট্টের কাদম্বরী, ভর্তৃহরির বৈরাগ্য ও নীতিশতক এবং অমরু-বিরচিত অমরুশতক এই কাব্যগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, রবীন্দ্রসাহিত্যে ব্যবহৃত উদ্‌ধৃতি থেকে তা বোঝা যায়। তবে এই উদ্‌ধৃতির পরিমাণ স্বল্প। সেই কারণে কাব্যক'টির উপাদান একত্রে সংকলিত হল।

বাণভট্ট

কাদম্বরী-প্রণেতা হিসাবেই প্রধানতঃ বাণভট্টের সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। কেননা রবীন্দ্রসাহিত্যে কোথাও বাণভট্টের অপর কাব্য 'হর্ষচরিত'-এর উদ্‌ধৃতি বা উল্লেখ চোখে পড়ে নি। পক্ষান্তরে নানা প্রসঙ্গে একাধিকবার কাদম্বরীর উল্লেখ পাই। তবে কাদম্বরীর দীর্ঘ সমাসবহুল গদ্যপঙ্‌ক্তিগুলি অনায়াসে উদ্‌ধৃতিযোগ্য নয়। তাই কবির রচনায় তার উদ্‌ধৃতি বিশেষ চোখে পড়ে না। কেবল 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অন্তর্গত কাদম্বরীচিত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি উক্ত কাব্যের কিছু অংশ উৎকলন ও তার অনুবাদ করেছেন। এ ছাড়া তপোবন প্রবন্ধেও একটি অনুচ্ছেদের অনুবাদ দেখা যায়। এ স্থলে এইগুলি একত্রে সংকলিত হল। এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, কাদম্বরী গদ্যগ্রন্থ এবং এই গ্রন্থের বিভাগ-উপবিভাগের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প। তাই এই সংকলনে গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত যে দু খণ্ড 'কাদম্বরীকথা' (১৮৮৫) রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করতেন[১] তার পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করে উদ্‌ধৃতিগুলিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

কাদম্বরী : কথামুখ

পৃ ৯ — আসীদশেষ নরপতিশিরঃসমভ্যর্চিতশাসনঃ পাকশাসন ইবাপরঃ চতুরুদধিমালামেখলায়া ভুবো ভর্তা।

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি — 'প্রাচীন সাহিত্য', কাদম্বরীচিত্র ১৩০৬ মাঘ। ১৯০০

পৃ ১৩ — সমানবয়োবিদ্যালংকারৈঃ ··· অখিলকলাকলাপালোচনকঠোরমতিভিঃ অতিপ্রগল্‌ভৈঃ···অগ্রাম্যপরিহাসকুশলৈঃ···কাব্যনাটকাখ্যানাখ্যায়িকালেখ্যব্যাখ্যানাদিক্রিয়ানিপুণৈঃ···বিনয়ব্যবহারিভিঃ আত্মনঃ প্রতিবিম্বৈরিব রাজপুত্রৈঃ সহ রমমাণঃ।

---

১ রবীন্দ্রব্যবহৃত এই কাদম্বরী বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

আংশিক উদ্‌ধৃতি 'প্রাচীন সাহিত্য', কাদম্বরীচিত্র ১৩০৬ মাঘ। ১৯০০

পৃ ১৫ একদা তু নাতিদূরোদিতে নবনলিনদলসম্পুটভিদি কিঞ্চিদুন্মুক্ত-পাটলিম্নি ভগবতি মরীচিমালিনি।

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'প্রাচীন সাহিত্য', কাদম্বরীচিত্র ১৩০৬ মাঘ। ১৯০০

পৃ ১৫ রাজানমাস্থানমণ্ডপগতং অঙ্গনাজনবিরুদ্ধেন বামপার্শ্বাবলম্বিনা কৌক্ষেয়কেণ সন্নিহিতবিষধরেব চন্দনলতা ভীষণরমণীয়াকৃতি… রাজাজ্ঞেব মূর্তিমতী শরদিব কলহংসধবলাম্বরা বিন্ধ্যবন-ভূমিরিব বেত্রলতাবতী, রাজ্যাধিদেবতেব বিগ্রহিণী প্রতিহারী সমুপসৃত্য ক্ষিতিতলনিহিত জানুকরকমলা সবিনয়মব্রবীৎ…

পৃ ১৬ দক্ষিণাপথাদাগতা চণ্ডালকন্যকা পঞ্জরস্থং শুকমাদায় দেবং বিজ্ঞাপয়তি—'সকলভুবনতলসর্বরত্নানামুদধিরিবৈকভাজনং দেবঃ বিহঙ্গমশ্চায়মাশ্চর্যভূতো নিখিলভুবনতলরত্নমিতি কৃত্বা দেবপাদ-মূলমাদায়াগতাহম্, ইচ্ছামি দেবদর্শনসুখমনুভবিতুমিতি'।…

উপজাতকুতূহলস্তু রাজা সমীপবর্তিনাং রাজ্ঞামবলোক্য মুখানি, কো দোষঃ প্রবেশ্যতামিত্যাদিদেশ। অথ প্রতিহারী নরপতিকথনানন্তরমুত্থায় তাং মাতঙ্গকুমারীং প্রাবেশয়ৎ।

প্রবিশ্য চ সা নরপতিসহস্রমধ্যবর্তিনম্ অশনিভয়পুঞ্জিতকুলশৈল-মধ্যগতমিব কনকশিখরিণম্, অনেকরত্নাভরণকিরণজালকান্ত-রিতাবয়বম ইন্দ্রায়ুধসহস্রসঙ্কুলাষ্টদিগ্‌ভাগমিব জলধরসময়-দিবসম, অবলম্বিতস্থূলমুক্তাকলাপস্য কনকশৃঙ্খলানিয়মিতমণি-দণ্ডিকাচতুষ্টয়স্য গগনসিন্ধুফেনপটলপাণ্ডুরস্য নাতিমহতো দুকূলবিতানস্যাধস্তাৎ ইন্দুকান্তমণিপর্যঙ্কিকানিষণ্ণম্ উদ্‌ধূয়মান-কনকদণ্ডচামর-

পৃ ১৭ -কলাপম্ উন্মযুখমুখকান্তিবিজিতে পবাভবপ্রণতে শশিনীব স্ফাটিকে পাদপীঠে বিন্যস্তবামপাদম্ ·· অমৃতফেনধবলে গোরো-চনালিখিতহংসমিথুনসনাথপর্যন্তে দুকূলে বসানম্, অতিসুরভি-চন্দনানুলেপনধবলিতোরঃস্থলম্ উপরিবিন্যস্তকুঙ্কুমস্থাসকম্ অন্তরা-নিপতিতবালাতপচ্ছেদমিব কৈলাসশিখরিণম্…

পৃ ১৮ অতিচপলরাজলক্ষ্মীবন্ধননিগডশঙ্কামুপজনয়তেন্দ্রনীলকেয়ূরযুগলেন ··ঈষদালম্বিকর্ণোৎপলম্·· আমোদিতমালতীকুসুমশেখরম্ উবসি

শিখরপর্যন্ততারকাপুঞ্জমিব পশ্চিমাচলম্ ··· সেবাসংগতাভিরিব দিগ্‌বধূভির্বারবিলাসিনীভিঃ পরিবৃতম্···

পৃ ১৯ রাজানমদ্রাক্ষীৎ।

আলোক্য চ সা দূরস্থিতৈব···রক্তকুবলয়দলকোমলেন পাণিনা ···বেণুলতামাদায় নরপতিপ্রবোধনার্থং সকৃৎ সভাকুট্টিমমাজঘান ; যেন সকলমেব তদ্‌রাজকমেকপদে, বনকরিযূথমিব তালশব্দেন, তেন বেণুলতাধ্বননা যুগপদাবর্তিতবদনমবনিপালমুখাদাকৃষ্ট চক্ষুস্তদভিমুখমাসীৎ।

অবনিপতিস্তু·

পৃ ২০ ···অনুগৃহীতার্যবেশেন ধবলবাসসা পুরুষেণাধিষ্ঠিতপুরোভাগাম্, আকলাকুলকাকপক্ষধারিণা কনকশলাকানির্মিতমপ্যন্তর্গতশুক-প্রভাশ্যামায়মানং···পিঞ্জরমুদ্‌বহতা চাণ্ডালদারকেণানুগম্যমানাম্, অসুরগৃহীতামৃতাপহরণকৃতকপটপটুবিলাসিনীবেশস্য শ্যামতয়া ভগবতো হরেরিবানুকুর্বতীং, সঞ্চারিণীমিবেন্দ্রনীলমণিপুত্রিকাম্ আগুল্‌ফাবলম্বিনা নীলকঞ্চুকেনাবচ্ছন্নশরীরাম্ উপরি রক্তাংশুক-রচিতাবগুণ্ঠনাং নীলোৎপলস্থলীমিব নিপতিতসন্ধ্যাতপাম্ এককর্ণাবমুক্তদন্তপত্রপ্রভাধবলিতকপোলমণ্ডলাম্ উদ্যদিন্দুবিম্ব-কিরণচ্ছুরিতমুখীমিব বিভাবরীম্, আকপিলগোরোচনারচিততি-

পৃ ২১ -লকতৃতীয়লোচনাম্ ঈশানুচরিতকিরাতবেশামিব ভবানীম্···

পৃ ২২ ·· মূর্চ্ছামিব মনোহরাম্,···নিদ্রামিব লোচনগ্রাহিণীম্·· অচিরোপ-রূঢ়যৌবনাম্ অতিশয়রূপাকৃতিম্ অনিমিষলোচনো দদর্শ।

পূর্ণ অনুবাদ 'প্রাচীন সাহিত্য', কাদম্বরীচিত্র ১৩০৬ মাঘ। ১৯০০

পৃ ৪৯ একদা তু প্রভাতসন্ধ্যারাগলোহিতে গগনতলে কমলিনীমধুরক্ত-পক্ষসংপুটে বৃদ্ধ হংস ইব মন্দাকিনীপুলিনাদপরজলনিধিতটমবত-রতি চন্দ্রমসি, পরিণতরঙ্কুরোমপাণ্ডুনি ব্রজতি বিশালতামাশা-চক্রবালে, গজরুধিররক্তহরিসটালোমলোহিনীভিঃ, আতপ্ত-লাক্ষিকতন্তুপাটলাভিঃ আয়ামিনীভিরশিশিরকিরণদীধিতিভিঃ, পদ্মরাগরত্নশলাকাসম্মার্জনীভিরিব সমুৎসার্যমাণেগগনকুট্টিমকুসুম-প্রকরে তারাগণে—

পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অনুবাদ 'প্রাচীন সাহিত্য', কাদম্বরীচিত্র ১৩০৬ মাঘ। ১৯০০

পৃ ৬৩ স…সোপানৈরিবাযত্নেনৈব পাদপমধিরুহ্য তানমুপজাতোৎপতন-শক্তীন্ কাংশ্চিদল্পদিবসজাতান্ গর্ভচ্ছবিপাটলান্ শাল্মলিকুসুম-শঙ্কামুপজনয়তঃ, কাংশ্চিদুদ্ভিদ্যমানপক্ষতয়া নলিনীসংবর্তিকানু-কারিণঃ কাংশ্চিদর্কফলসদৃশান্, কাংশ্চিল্লোহিতায়মানচঞ্চুকোটীন্ ঈষদ্বিঘটিতদলপুটপাটলমুখানাং কমলমুকুলানাং শ্রিয়মুদ্বহতঃ, কাংশ্চিদনবরতশিরঃকম্পব্যাজেন নিবারয়ত ইব, প্রতিকাবা-সমর্থান্ একৈকশঃ ফলানীব তস্য বনস্পতেঃ শাখাসন্ধিভ্যঃ কোটরাভ্যন্তরেভ্যশ্চ শুকশাবকানগ্রহীৎ, অপগতাসূংশ্চ কৃত্বা ক্ষিতাবপাতয়ৎ।

অংশিক উদ্ধৃতি 'প্রাচীন সাহিত্য', কাদম্বরীচিত্র ১৩০৬ মাঘ। ১৯০০

পৃ ৭৪ অনিলাবনমিতশিখাভিঃ ..পাদপৈঃ আবদ্ধপল্লবপুটাঞ্জলিভিরুপাস্য-মানমিব বিষ্টপৈঃ উটজাজিরপ্রকীর্ণশুষ্কচ্ছ্যামাকম্ উপসংগৃহীতা-মলক-লবলী লবঙ্গ কর্কন্ধু-কদলী-লকুচ-চূত-তাল-ফলম্, অধ্যয়ন-মুখরবটুজনম্, অনবরতশ্রবণগৃহীত বষট্কারবাচালশুক-

পৃ ৭৫ -কুলম্,…অবণ্যকুক্কুটোপভুজ্যমান বৈশ্বদেববলিপিণ্ডম্, আসন্ন-বাপীকলহংসপীতভুজ্যমাননীবারবলিম্ এণীজিহ্বাপল্লবোপলিহ্য-মানমুনিবালকম্…

পৃ ৭৭ …আশ্রমমপশ্যম্।

পূর্ণ অনুবাদ 'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

পৃ ৯২ দিবাবসানে লোহিততারকা তপোবনধেনুরিব কপিলা পরিবর্ত-মানা সন্ধ্যা।

পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অনুবাদ 'প্রাচীন সাহিত্য', কাদম্বরীচিত্র ১৩০৬ মাঘ। ১৯০০

ভর্তৃহরি

ভর্তৃহরির শতকগুলির মধ্যে একমাত্র বৈরাগ্যশতকেরই একাধিক উদ্ধৃতি রবীন্দ্র-সাহিত্যে দেখা যায়। শৃঙ্গারশতকের উদ্ধৃতি একেবারেই পাই না। আর প্রাসঙ্গিক উল্লেখ বা দু একটি শ্লোকের অনুবাদ ছাড়া (দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ড: 'হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহ' অধ্যায়) রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় নীতিশতকের শ্লোক বিশেষ ব্যবহার করেন নি। এ স্থলে শ্লোকগুলি একত্রে সংকলিত হল। সম্ভবতঃ

হেবরলিনের 'কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থ থেকেই ভর্তৃহরির শতকগুলির সঙ্গে কবির পরিচয়। কেননা কবি-ব্যবহৃত সমস্ত শ্লোকই হেবরলিনের গ্রন্থে পাওয়া গেছে। তাই সংকলিত শ্লোকগুলি হে. অক্ষরে চিহ্নিত হল। এ ছাড়া যে যে শ্লোক নবরত্নমালায় পাওয়া গেছে সেগুলিও নব. শব্দে চিহ্নিত হয়েছে।

বৈরাগ্যশতক : ভোগস্থৈর্যবর্ণন

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্‌ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্যাভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্‌ভয়ং
সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম॥[1] ২৮ হে. নব.

আংশিক উদ্‌ধৃতি বৈরাগ্যমেবাভয়ম্[2]

'জাপানযাত্রী', অধ্যায় ১০, ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ। ১৯১৬
'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ৫, ১৯২৭ জুলাই ২৮
'জাভা-যাত্রীর পত্র', পত্র ৯, ১৯২৭ আগস্ট ৩০

যতিনৃপতিসংবাদ

প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘাস্ততঃ কিং
ন্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্।
সম্পাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈস্ততঃ কিং
কল্পস্থিতাস্তনুভৃতাং তনবস্ততঃ কিম্॥[3] ৬৬ হে. নব.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি ও অনুবাদ 'ধর্ম', ততঃ কিম্ ১৩১৩ অগ্রহায়ণ। ১৯০৬

আংশিক উদ্‌ধৃতি ততঃ কিম্

'চিঠিপত্র' ৮, পত্র-১২৭ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা ১৯০০ সেপ্‌টেম্বর ২১
'ধর্ম', ততঃ কিম্ (চার বাব) ১৩১৩ অগ্রহায়ণ। ১৯০৬
'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যধর্ম ১৩৩৪ শ্রাবণ। ১৯২৭
'কালান্তর', শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন। ১৯২১
'The Religion of Man' 1931, The Four stages of life
'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২,৩

১ অষ্টরত্ন ৫-সংখ্যক শ্লোক ২ নবরত্নমালায় পাই 'বৈরাগ্য এবাভয়ং'
৩ নবরত্নমালায় শ্লোকটির চতুর্থ চরণে পাই 'কল্পংস্থিতাস্তনুভৃতাং'।

পূর্ণ অনুবাদ 'The Religion of Man' 1931, The Four stages of life

নিত্যানিত্যবিচার

যাবৎস্বস্থমিদং শরীরমরুজং যাবজ্জরা দূরতো
যাবচ্চেন্দ্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎক্ষযো নাযুষঃ।
আত্মশ্রেযসি তাবদেব বিদুষা কার্যঃ প্রযত্নো মহান
সন্দীপ্তে ভবনে তু কূপখননং প্রত্যুদ্যম. কীদৃশঃ ॥[১] ৭৩ হে.

পরোক্ষ উল্লেখ 'কালান্তর', লোকহিত ১৩২১ ভাদ্র। ১৯১৪

অবধূতচর্যা

মৃৎপিণ্ডো জলরেখযা বলযিতঃ সর্বোঽপ্যযং নন্বণুঃ
স্বাংশীকৃত্য তমেব সংগরশতৈ রাজ্ঞাং গণা ভুঞ্জতে।
তে দদ্যুর্দদতোঽথবা কিমপরং ক্ষুদ্রা দরিদ্রা ভৃশং
ধিগ্ ধিক্তানপুরুষাধমান্ধনকণান্বাঞ্ছন্তি তেভ্যোঽপি যে ॥ ৯৬ হে.

আংশিক উদ্‌বৃতি মৃৎপিণ্ডো জলরেখযা বলযিতঃ
'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১৫৯ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯৪ অক্টোবর ৫
'ধর্ম', দুঃখ ১৩১৪ ফাল্গুন। ১৯০৮

পরোক্ষ উল্লেখ 'আত্মপরিচয', অধ্যায ১, ১৩১১। ১৯০৪

নীতিশতক : পরোপকার পদ্ধতি

ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ॥ ৭১ দ্র শকু ৫।১৩

অমরু

হেবরলিনের 'কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থে কবি অমরু-রচিত সমগ্র অমরুশতক কাব্যখানি সংকলিত আছে এবং 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ স্বযং বলেছেন যে, কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থ থেকেই কবি প্রথম অমরুশতকের শ্লোকগুলির সঙ্গে পরিচিত হন। এ স্থলে রবীন্দ্র-রচনায় প্রাপ্ত* অমরুশতকের দুটি শ্লোক সংকলিত হল এবং শ্লোক দুটি হে অক্ষরে চিহ্নিত করা হল। নবরত্নমালায় প্রাপ্ত শ্লোকটিকেও নব শব্দে নির্দেশ করা হল।

১ শার্ঙ্গ ৬৭৯। এই প্রসঙ্গে বলতে হয বর্তমান শ্লোকটির অনুরূপ অর্থে আর একটি সংস্কৃত শ্লোক প্রচলিত আছে। কবি তাঁর প্রবন্ধে কোন্ শ্লোকটি স্মরণ করেছেন তা নিঃসংশয়ে বলার উপায নেই। দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থের প্রথম খণ্ড 'হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহ' অধ্যায়, পৃ ৩২৯

অমরুশতক

কোপো যত্র ভ্রূকুটিরচনা নিগ্রহো যত্র মৌনং
যত্রান্যোন্যস্মিতমনুনয়ো যত্র দৃষ্টিঃ প্রসাদঃ।
তস্য প্রেম্ণস্তদিদমধুনা বৈষমং পশ্য জাতং
ত্বং পাদান্তে লুঠসি নহি মে মন্যুমোক্ষঃ খলায়াঃ ॥ ৩৪ হে.

আংশিক উদ্ধৃতি কোপো যত্র ভ্রূকুটিরচনা·· দৃষ্টিঃ প্রসাদঃ
'চিরকুমার-সভা'[১] ১৯২৬, প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য

বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা
নন্থ নিশৈব বরং ন পুনর্দিনম্।
উভয়মেতদুপৈত্বথবা ক্ষয়ং
প্রিয়জনেন ন যত্র সমাগমঃ ॥ ৬০ হে. নব.

পূর্ণ উদ্ধৃতি ও অনুবাদ 'চিরকুমার-সভা'[২] ১৯২৬, তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য

---

১ দ্র. 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২ দ্র. 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, দশম পরিচ্ছেদ

ভবভূতি

রবীন্দ্রসাহিত্যে মহাকবি ভবভূতির রচনা থেকে উদ্‌ধৃতির পরিমাণ নিতান্ত স্বল্প। উত্তররামচরিত নাটকের কয়েকটি এবং মালতীমাধবের একটি মাত্র শ্লোকের উদ্‌ধৃতি ও উল্লেখ দেখা যায়। মহাবীরচরিতের কোনো প্রসঙ্গ রবীন্দ্রবচনায় এ পর্যন্ত চোখে পড়ে নি। এ ছাড়া ভবভূতির নামে প্রচলিত গুণরত্নম্ কাব্যটি হেবরলিনের 'কাব্য সংগ্রহ' গ্রন্থে সংকলিত আছে। উক্ত কাব্যের দুটি শ্লোক রবীন্দ্রবচনায় দেখা গেছে। এগুলি হে. অক্ষরে চিহ্নিত হল। নবরত্নমালায় প্রাপ্ত শ্লোকগুলির পাশেও নব. শব্দ বসানো হয়েছে।

উত্তররামচরিত

জীবৎসু তাতপাদেষু নবে দারপরিগ্রহে।
মাতৃভিশ্চিন্ত্যমানানাং তে হি নো দিবসা গতাঃ ॥ ১।১৯

রামের উক্তি

আংশিক উদ্‌ধৃতি তে হি নো দিবসা গতাঃ

'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র ৪৫, ১৩২৮ পৌষ ২২। ১৯২২

'পরিশেষ', তে হি নো দিবসাঃ ১৯২৭ অকটোবর

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রমোহো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢেন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি চ সংমীলয়তি চ ॥ ১।৩৫ রামের উক্তি

আংশিক উদ্‌ধৃতি সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা

'আলোচনা', ডুব দেওয়া · তুলনায় অরুচি ১২৯১ বৈশাখ। ১৮৮৪

'সাহিত্য', সংযোজন, কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট (দু বার) ১২৯৩ চৈত্র । ১৮৮৭

'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১২২ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯৪ জুন ২৬

'চার-অধ্যায়' ১৯৩৪, দ্বিতীয় অধ্যায়

অকিঞ্চিদপি কুর্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।
তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ ॥ ২।১৯ নব.

রামের উক্তি

আংশিক উদ্‌ধৃতি স তস্য[১] কিমপি ·প্রিয়ো জনঃ

'সাহিত্য', সংযোজন, কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ১২৯৩ চৈত্র। ১৮৮৭

পরোক্ষ উল্লেখ 'সাহিত্য' সংযোজন, কাব্য ১২৯৮ চৈত্র। ১৮৯২

যত্র দ্রুমা অপি মৃগা অপি বন্ধবো মে
যানি প্রিয়াসহচরশ্চিরমধ্যবাৎসম্।
এতানি তানি বহুনির্ঝরকন্দরাণি
গোদাবরীপরিসরস্য গিরেস্তটানি ॥ ৩।৮ নেপথ্যে

আংশিক উদ্‌ধৃতি যত্র দ্রুমা অপি বন্ধবো মে

'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

করকমলবিতীর্ণৈরম্বুনীবারশষ্পৈ-
স্তরুশকুনিকুরঙ্গান্মৈথিলী যানপুষ্যৎ।
ভবতি মম বিকারস্তেষু দৃষ্টেষু কোঽপি
দ্রব ইব হৃদয়স্য প্রস্তরোদ্‌ভেদযোগ্যঃ ॥ ৩।২৬ রামের উক্তি

পূর্ণ অনুবাদ 'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন ১৩১৬ পৌষ। ১৯০৯

মালতীমাধব

প্রস্তাবনা

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী ॥ ১।৬ নব

আংশিক উদ্‌ধৃতি কালোহ্যয়ং নিরবধি পৃথ্বী

'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী', ভূমিকা ১২৯৮ বৈশাখ। ১৮৯১

কালোহ্যয়ং নিরবধি

'পঞ্চভূত', কৌতুকহাস্য ১৩০১ পৌষ। ১৮৯৪

'চিঠিপত্র' ৫, পত্র ৩৭ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা (তারিখ অনুল্লিখিত)

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র ৯ বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীকে লেখা ১৯৩৬ অক্টোবর ২৬

'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : বানানবিধি ১৩৪৪ আষাঢ়। ১৯৩৭

১ রবীন্দ্রনাথ তত্তস্য' স্থলে 'স তস্য' লিখেছেন।

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'পঞ্চভূত', গদ্য ও পদ্য ১২৯৯ ফাল্গুন। ১৮৯৩

'জীবনস্মৃতি' ১৯১২, নানা বিদ্যার আয়োজন

'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১৫

পরোক্ষ উল্লেখ 'সাহিত্য', বাংলা জাতীয় সাহিত্য ১৩০১ চৈত্র। ১৮৯৫

আংশিক অনুবাদ 'গল্পগুচ্ছ', ঠাকুরদা ১৩০২ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৯৫

গুণরত্ন

যা গোবিন্দরসপ্রমোদমধুরা সা মাধুরী মাধুরী।
যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী ॥ ১০ ৫

আংশিক উদ্ধৃতি যা দ্বয়লোকসাধনী চাতুরী[১]

'শান্তিনিকেতন ১, মরণ ১৩১৫ ফাল্গুন। ১৯০৯

অজব।মববং প্রাজ্ঞো ॥ '২ দ্রষ্টব্য তি অব ৩

---

১ রবীন্দ্রনাথ লোকদ্বয়সাধনী' স্থলে লিখেছেন দ্বয়লোকসাধনী'।

শংকরাচার্য, সোমদেব ও বিহ্লণ

শংকরাচার্য, সোমদেব ও বিহ্লণ এই তিন কবির কাব্যের সঙ্গেই যে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল, রবীন্দ্রসাহিত্যে তার প্রমাণ দেখা যায়। তবে এই তিন কবির কাব্য থেকে বিশেষতঃ সোমদেব ও বিহ্লণের কাব্য থেকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ উদ্‌ধৃতি ব্যবহার করেন নি। তবে ভারবির একটিমাত্র শ্লোকের একটি পরোক্ষ উল্লেখ রবীন্দ্র-রচনায় দেখা গেছে। এ ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যের আর একজন স্বল্পখ্যাত কবি ত্রিবিক্রমভট্টের (আনু. খ্রীঃ ৯১৫) নাম বা তার কাব্য 'নলচম্পূ'র কোনো প্রসঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্যে চোখে না পড়লেও এই কাব্যের একটি শ্লোক কবি ব্যবহার করেছেন। এ স্থলে সেই শ্লোকটি সংকলিত হল।

শংকরাচার্য

শংকরাচার্যের মোহমুদ্গর, আনন্দলহরী এবং যতিপঞ্চক এই তিনটি কাব্য থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় উদ্‌ধৃতি ব্যবহার করেছেন এবং এই তিনটি কাব্যই হেবরলিনের 'কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তাই এ স্থলে সংকলিত শ্লোকগুলিকে হে. অক্ষরে চিহ্নিত করা হল এবং হেবরলিনের অনুসরণেই এগুলির শ্লোকসংখ্যা দেওয়া হল। এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, আনন্দলহরী কাব্যখানি সৌন্দর্যলহরী নামেও পরিচিত। তবে 'কাব্যসংগ্রহে' কাব্যটি আনন্দলহরী নামে উল্লিখিত হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে এটিকে আনন্দলহরী নামেই উল্লেখ করেছেন। এ স্থলেও আনন্দলহরী নামটি রাখা হল।

মোহমুদ্গর

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
সর্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥ ২ হে.

আংশিক উদ্‌ধৃতি   অর্থমনর্থং ভাবয়··· সত্যম্

'শিক্ষা', শিক্ষার হেরফের ১২৯৯ পৌষ। ১৮৯২

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্

'সে' ১৯৩৭, অধ্যায় ১২

নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্

'শিক্ষা', শিক্ষার মিলন ১৩২৮ আশ্বিন। ১৯২১

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ

সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ।

কস্য ত্বং বা কুত আযাত-

স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥ ৩ শ্লো

আংশিক উদ্ধৃতি কা তব কান্তা কস্তে বিচিত্রঃ

'চতুরঙ্গ' ১৯১৬, শ্রীবিলাস

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ

'ঘরে-বাইরে' ১৯১৬, সন্দীপের আত্মকথা ৪

সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ

'গল্পগুচ্ছ', মণিহারা ১৩০৫ অগ্রহায়ণ। ১৮৯৮

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বং

হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্।

মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা

ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥ ৪ শ্লো

আংশিক উদ্ধৃতি মায়াময়মিদমখিলং বিদিত্বা

'জাপানযাত্রী', অধ্যায় ৭, ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ ৫। ১৯১৬

মায়াময়মিদমখিল

'চতুরঙ্গ' ১৯১৬, শ্রীবিলাস

পরোক্ষ উল্লেখ 'পঞ্চভূত', ভদ্রতার আদর্শ ১৩০২ আষাঢ়। ১৮৯৫

নলিনীদলগতজলমতিতরলং

তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্।

বিদ্ধি ব্যাধিব্যালগ্রস্তং

লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্॥ ৫ শ্লো.

আংশিক উদ্ধৃতি নলিনীদলগত জলমতি চপলম

'ফাল্গুনী' ১৯১৬, সূচনা রাজোদ্যান

পরোক্ষ উল্লেখ 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১৩৩, ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯৪ জুলাই ১৬

'চিঠিপত্র' ১, পত্র-৩১ মৃণালিনী দেবীকে লেখা ১৯০১

'চতুরঙ্গ' ১৯১৬, শ্রীবিলাস

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃতকম্পিত শোভিতদণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্॥ ১৫ হে.

আংশিক উদ্‌ধৃতি দন্তং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চতি আশাভাণ্ডম্

'ফাল্গুনী' ১৯১৬, সূচনা : রাজোদ্যান

আনন্দলহরী

কবীন্দ্রাণাং চেতঃ কমলবনমালাতপরুচিং
ভজন্তে যে সন্তঃ কতিচিদরুণামেব ভবতীম্।
বিরিঞ্চিপ্রেয়স্যাস্তরুণতরশৃঙ্গারলহরীং
গভীরাভির্বাগ্‌ভির্বিদধাতি সভারঞ্জনময়ীম্॥ ১৬ হে.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি ও অনুবাদ 'চিরকুমার-সভা'[১] ১৯২৬, তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য

বহন্তী সিন্দূরং প্রবলকবরীভারতিমির-
দ্বিষাং বৃন্দৈর্বন্দীকৃতমিব নবীনার্ককিরণম্।
তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদনসৌন্দর্যলহরী-
পরীবাহস্রোতঃসরণিরিব সীমন্তসরণিঃ॥ ৪৪ হে.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি ও অনুবাদ 'ছন্দ', গদ্যছন্দ[২] ১৩৪১ বৈশাখ। ১৯৩৪

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১৯০ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯৫ মার্চ ৭
'সমাজ', ভারতবর্ষীয় বিবাহ ১৩০২। ১৯২৫

যতিপঞ্চক

পঞ্চাক্ষরং পাবনমু[illegible]ঃ
পতিং পশূনাং হৃদি ভাবয়ন্তঃ।

১ দ্র. 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, দশম পরিচ্ছেদ

২ এই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিতে এক স্থানে 'আনন্দলহরী' এবং আর এক স্থানে 'সৌন্দর্যলহরী' ছিল। বঙ্গশ্রী পত্রিকায় এবং 'ছন্দ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের পাঠে 'আনন্দলহরী' দেখি। কিন্তু 'ছন্দ' গ্রন্থের শেষ সংস্করণে দুই স্থলেই 'সৌন্দর্যলহরী' পাই।

ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পবিভ্রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ৫ হে.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'ছন্দ', সংস্কৃত শব্দ ও ছন্দ ১৩০১ মাঘ। ১৮৯৫

সোমদেব

সোমদেবের কাব্য কথাসরিৎসাগবেব সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেব কতদূর পবিচয তা জানা না গেলেও কবিব একটি প্রবন্ধে কথাসরিৎসাগবেব অন্তর্গত কতকগুলি শ্লোকের এমন মূলানুগ অনুবাদ দেখা গেছে যে মনে হয়, সমগ্র গ্রন্থেব সঙ্গে না হলেও মূল গ্রন্থের কিছু অংশেব সঙ্গে কবি বিশেষভাবে পবিচিত ছিলেন। এ স্থলে মূল শ্লোকগুলি সংকলিত হল।

কথাসবিৎসাগব

অস্তি মামীক্ষিতুং পূর্বং ব্রহ্মা নাবা যণস্তথা।
মহীং ভ্রমন্তৌ হিমবৎপাদমূলমবাপতুঃ ॥ আদি ২৭
অলব্ধান্তৌ তপোভির্মাং তোষযামাসতুশ্চ তৌ।
আবিভূর্য মযা চোক্তৌ বরং বোহপ্যার্থতামিতি ॥ আদি ২৯
তচ্ছ্রুত্বৈবাব্রবীদ্ব্রহ্মা পুত্রো মেহস্তু ভবানিতি।
অপূজ্যস্তেন জাতোহসাবত্যাবোহেণ নিন্দিতঃ ॥ আদি ৩০
ততো নারাযণো দেবঃ স ববং মামযাচত।
ভূযাংস তত্র শুশ্রূষাপবোহহং ভগবন্নিতি ॥ আদি ৩১
অতঃ শবীবভূতোহসৌ মম জাতস্তদাত্মনা।
যো হি নাবাযণঃ সা ত্বং শক্তিঃ শক্তিমতো মম ॥ আদি ৩২

পূর্ণ অনুবাদ 'সাহিত্য', বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ শ্রাবণ। ১৯০২

কপালেষু শ্মশানেষু কস্মাদ্দেব রতিস্তব।
ইতি পৃষ্টস্ততো দেব্যা ভগবানিদমব্রবীৎ ॥ ২।৯
পুবা কল্পক্ষযে বৃত্তে জাতং জলমযং জগৎ।
মযা ততো বিভিদ্যোরুং রক্তবিন্দুর্নিপাতিতঃ ॥ ২।১০
জলান্তস্তদভূদণ্ডং তস্মাদ্দ্বেধাকৃতাৎপুমান্।
নিরগচ্ছত্ততঃ সৃষ্টা সর্গায় প্রকৃতির্মযা ॥ ২।১১
তৌ চ প্রজাপতীনন্যান্ সৃষ্টবন্তৌ প্রজাশ্চ তে।
অতঃ পিতামহঃ প্রোক্তঃ স পুমাঞ্জগতি প্রিয়ে ॥ ২।১২

এবং চরাচরং সৃষ্ট্বা বিশ্বং দর্পমগাদসৌ।
পুরুষস্তেন মূর্ধানমথৈতস্যাহমচ্ছিদম্ ॥ ২।১৩
ততোঽহমনুতাপেন ময়া মহাব্রতমগৃহ্যত।
অতঃ কপালপাণিত্বং শ্মশানপ্রিয়তা চ মে ॥ ২।১৪

পূর্ণ অনুবাদ 'সাহিত্য', বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৩০৯ শ্রাবণ। ১৯০২

বিহ্লণ

হেবরলিনের 'কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থ থেকেই সম্ভবতঃ বিহ্লণের চৌরপঞ্চাশিকা কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। তবে রবীন্দ্রধৃত পাঠের সঙ্গে হেবরলিনের পাঠের সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। যাই হক, এ স্থলে হেবরলিনের অনুসরণেই চৌরপঞ্চাশিকার রবীন্দ্র-ব্যবহৃত শ্লোকটির সংখ্যা দেওয়া হল এবং শ্লোকটি হে. অক্ষরে চিহ্নিত করা হল।

চৌরপঞ্চাশিকা

অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ততে মে[১]
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা ॥ ১০ হে.

পদ্য উদধৃতি 'সাহিত্য', সংযোজন : আলস্য ও সাহিত্য ১২৯৮ শ্রাবণ। ১৮৮৭

ভারবি

কিরাতার্জুনীয়ম্

ক্রিয়াসু যুক্তৈর্নৃপ চারচক্ষুষো-
ন বঞ্চনীয়াঃ প্রভবোঽনুজীবিভিঃ।
অতোঽর্হসি ক্ষন্তুমসাধু সাধু বা
হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ ॥ ১।৪

পরোক্ষ উল্লেখ 'গল্পগুচ্ছ', বোষ্টমী ১৩২১ আষাঢ়। ১৯১৪

---

১ হেবরলিনের 'কাব্যসংগ্রহে' 'তন্মনসি সম্প্রতি বর্ততে' স্থলে পাঠান্তর পাই 'তন্মুখশশী পরিবর্ততে'।

ত্রিবিক্রমভট্ট

নলচম্পূ

অপসরতি ন চক্ষুষো মৃগাক্ষী
রজনিরিয়ং চ ন যাতি নৈতি নিদ্রা।
প্রহরতি মদনোঽপি দুঃখিতানাং
বত বহুশোঽভিমুখীভবন্ত্যপায়াঃ ॥ ৭।৭৯

আংশিক উদ্‌ধৃতি ও অনুবাদ অপসরতি ন চক্ষুষো···নিদ্রা
'চিরকুমার-সভা'[১] ১৯২৬, তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য

---

১ দ্র. 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, দশম পরিচ্ছেদ

জয়দেব

জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শৈশবেই পরিচয় ঘটেছিল। এই কাব্যখানি সমগ্রভাবে হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহে স্থান পেয়েছে। এ স্থলে সংকলিত গীতগোবিন্দের শ্লোকগুলিকে হে. অক্ষরে চিহ্নিত করা হল।

জয়দেবের পরবর্তী বৈষ্ণব কবি রূপগোস্বামীর হংসদূত কাব্য থেকেও রবীন্দ্রনাথ একটি শ্লোক ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্র-ব্যবহৃত হেবরলিনেব 'কাব্যসংগ্রহে' এই হংসদূত কাব্যখানি পেন্‌সিলে চিহ্নিত অবস্থায় দেখা গেছে। সম্ভবতঃ এটি কবির সচেতন অধ্যয়নের নিদর্শন বহন করে। সপ্তদশ শতকের আলংকারিক জগন্নাথ পণ্ডিত-রচিত ভামিনী-বিলাস কাব্য থেকেও রবীন্দ্রসাহিত্যে একটি উদ্‌ধৃতি দেখা যায়। তবে এই কাব্যের সঙ্গে কবির পরিচয় কতদূর ছিল, তা জানা যায় নি। উপাদানের স্বল্পতার জন্য পৃথক্ বিভাগ না করে হংসদূত ও ভামিনী-বিলাস কাব্যকে গীতগোবিন্দের পরিশেষ অংশে স্থান দেওয়া হল।

গীতগোবিন্দ

প্রথম সর্গ : সামোদ দামোদর

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ ॥ ১

আংশিক উদ্‌ধৃতি মেঘৈর্মেদুরমম্বরং···দ্রুমৈঃ

'পারস্যযাত্রী'. অধ্যায় ৯, ১০৩২ মে

'ছন্দ', গদ্যছন্দ-২, ১৩৪১ বৈশাখ। ১৯৩৪

'ছন্দ', পত্রধারা তৃতীয় পর্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা ১৯৩৫ মে ২২

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৯৯ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩৬ মে ১৩

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'মানসী', মেঘদূত ১২৯২ জ্যৈষ্ঠ। ১৮৮৫

'সোনার তরী', বর্ষা-যাপন ১২৯৯। ১৮৯২

'চিঠিপত্র' ৬, পত্র-২১ জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা ১৯০২ জুন ২০

পূর্ণ অনুবাদ 'রূপান্তর' বিশ্বভারতী, গ্রন্থপরিচয় : নরেন্দ্র দেবকে লেখা পত্র

(দুটি অনুবাদ) ১৩৩৬ আশ্বিন ২৯। ১৯২৯

বাগ্‌দেবতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্মা
পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী।
শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেত-
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্‌ ॥ ২

আংশিক উদ্‌ধৃতি চবণচারণচক্রবর্তী

'কালান্তব', মহাজাতি-সদন ১৩৪৬ আশ্বিন। ১৯৩৯

বসন্তবাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে
ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে ॥ গী ৩ ৩।১

আংশিক উদ্‌ধৃতি বসন্তরাগেণ যতিতালাভ্যাং

'গল্পগুচ্ছ', মণিহারা ১৩০৫ অগ্রহায়ণ। ১৮৯৮

ললিতলবঙ্গলতাপবিশীলন

'ছন্দ', পত্রধারা দ্বিতীয় পর্যায়, দিলীপকুমার রায়কে লেখা-১, ১৩৩৮ শ্রাবণ ৯। ১৯৩১

'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব ১৩৪০ ভাদ্র। ১৯৩৩

ললিতলবঙ্গলতা।

'বিচিত্র প্রবন্ধ', কেকাধ্বনি ১৩০৮ ভাদ্র। ১৯০১

'শেষবর্ষা' ১৯২৮, প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য

'সে' ১৯৩৭, অধ্যায় ১২

বিহরতি হরিবিহ সরস বসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে ॥ গীত ৩ ধ্রুবম্‌

আংশিক উদ্‌ধৃতি হরিরিহ বিহরতি[১] সরস বসন্তে

'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র। ১৯১৮

দ্বিতীয় সর্গ : অক্লেশ কেশব

নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্‌।
চকিতবিলোকিত-সকলদিশা রতিরভসরসেন হসন্তম্‌ ॥ গীত ৬।১

আংশিক উদ্‌ধৃতি নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া · বসন্তম্‌

'জীবনস্মৃতি' ১৯১২, পিতৃদেব

---

১ রবীন্দ্রনাথ 'বিহরতি হরিরিহ' স্থলে লিখেছেন 'হরিরিহ বিহরতি'।

পঞ্চম সর্গ : সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ

ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
পীনপয়োধরপরিসরমর্দনচঞ্চলকরযুগশালী ॥ গীত ১১ ধ্রুবম্

আংশিক উদ্ধৃতি ধীরসমীরে যমুনাতীরে··· বনমালী
'চিরকুমার-সভা'[১] ১৯২৬, পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্ ॥ গীত ১১।৩

আংশিক উদ্ধৃতি পততি পতত্রে ভবদুপযানম্
'জীবনস্মৃতি' ১৯১২, নানা বিদ্যার আয়োজন

আংশিক অনুবাদ 'ছন্দ', বাংলা ছন্দ দ্বিতীয় পর্যায়, এনডারসন্‌কে লেখা পত্র ১৩২১
আষাঢ় ১৮। ১৯১৪

সপ্তম সর্গ : নাগর নারায়ণ

অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণং।
হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্ ॥ গীত ১৩।৭

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'জীবনস্মৃতি' ১৯১২, পিতৃদেব
'ছন্দ', ছন্দের অর্থ প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র। ১৯১৮

দশম সর্গ : মুগ্ধ মাধব

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদন চন্দ্রমা
রোচয়তি লোচন-চকোরম্ ॥ গীত ১৯।১

আংশিক উদ্ধৃতি বদসি যদি কিঞ্চিদপি ঘোরম্
'ছন্দ', বাংলা ছন্দ : দ্বিতীয় পর্যায়, এনডারসন্‌কে লেখা পত্র ১৩২১
আষাঢ় ১৮। ১৯১৪

'ছন্দ', ছন্দের প্রকৃতি-২, ১৩৪১ বৈশাখ। ১৯৩৪
বদসি যদি কিঞ্চিদপি
'ছন্দ', পত্রধারা দ্বিতীয় পর্যায়, দিলীপকুমার রায়কে লেখা-১, ১৩৩৮
শ্রাবণ ৯। ১৯৩১

১ দ্র. 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আংশিক অনুবাদ 'ছন্দ', বাংলা ছন্দ : দ্বিতীয় পর্যায়, এন্‌ডারসন্‌কে লেখা পত্র ১৩২১ আষাঢ় ১৮ । ১৯১৪

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনম্
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্ ।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্ ॥ গীত ১৯।৪

আংশিক উদ্‌ধৃতি ত্বমসি মম ভূষণং···ভবজলধিরত্নম্

'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', দ্বাদশ পত্র ১২৮৭ আষাঢ় । ১৮৮০
'শেষের কবিতা' ১৯২৯, অধ্যায় ১১ : মিলন-তত্ত্ব

পরিশেষ : রূপগোস্বামী

হংসদূত

অলিন্দে কালিন্দীকমলসুরভৌ কুঞ্জবসতে-
র্বসন্তীং বাসন্তীনবপরিমলোদ্‌গারচিকুরাম্ ।
ত্বদুৎসঙ্গে লীনাং মদমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং
কদাহং সেবিষ্যে কিসলয়কলাপব্যজনিনীম্ ॥ ১১৫ হং.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি ও অনুবাদ 'চিরকুমার-সভা'[১] ১৯২৬, তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য

জগন্নাথ পণ্ডিত

ভামিনী-বিলাস

নিঃসীমশোভাসৌভাগ্যং নতাঙ্গ্যা নয়নদ্বয়ং ।
অন্যোহন্যালোকনানন্দবিরহাদিব চঞ্চলম্ ॥ ২।৪৫

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি ও অনুবাদ 'চিরকুমার-সভা'[২] ১৯২৬, চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য

১ দ্র. 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, নবম পরিচ্ছেদ
২ দ্র. 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ১৯০৮, একাদশ পরিচ্ছেদ

ভাষা, ছন্দ ও অলংকার

সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষা, ছন্দ ও অলংকারের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণ, ছন্দশাস্ত্র বা অলংকারশাস্ত্র থেকে কবি প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ উপাদান সংগ্রহ করেন নি। রবীন্দ্রসাহিত্যে তাই পাণিনি, বোপদেব এমন কি লোহারাম পর্যন্ত বৈয়াকরণ বা অমরকোষ প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ দেখা গেলেও তার থেকে গৃহীত উদ্‌ধৃতি চোখে পড়ে না। অবশ্য বালক বয়সেই 'মুগ্ধবোধে'র সঙ্গে কবির যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল 'জীবনস্মৃতি' (নানা বিদ্যার আয়োজন) থেকে তা জানা গেছে। তবে জীবনস্মৃতিতে উদ্‌ধৃত 'মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং' টুকু ছাড়া উক্ত গ্রন্থ থেকে সম্ভবতঃ কবি আর কোনো উদ্‌ধৃতি ব্যবহার করেন নি।

সংস্কৃত ছন্দগ্রন্থের মধ্যে 'ছন্দোমালা'র দ্বারাই কবির প্রাথমিক ছন্দ শিক্ষার সূত্রপাত হয়। তবে এর থেকে কোনো উদ্‌ধৃতি বোধ হয় কবি ব্যবহার করেন নি। পরিণত বয়সে দেখি এক সময়ে তিনি নিজেকে প্রাকৃত ছান্দসিক পিঙ্গলাচার্যের অনুবর্তী বলে ঘোষণা করেছেন ('ছন্দ', ছন্দের মাত্রা : দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ) এবং প্রয়োজনমতো তাঁর 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' নামক ছন্দগ্রন্থ (খ্রীঃ ১৪শ শতক) থেকে উদ্‌ধৃতি ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত আলংকারিকদের মধ্যে কবি কেবলমাত্র বিশ্বনাথ কবিরাজের (খ্রীঃ ১০ম শতক) 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থ থেকে উদ্‌ধৃতি প্রয়োগ করেছেন।

পরিশেষে বলতে হয়, বাৎস্যায়ন-রচিত 'কামসূত্র' গ্রন্থে যশোধর-কৃত টীকায় চিত্রকলার যে ষড়ঙ্গের কথা বলা হয়েছে সেটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে ভাষা-বিষয়ক আলোচনাতেও কবি কামসূত্রের উদ্‌ধৃতি স্মরণ করেছেন। সে দুটি উদ্‌ধৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হল। এ ছাড়া রবীন্দ্রসাহিত্যে আয়ুর্বেদশাস্ত্রেরও কয়েকটি উদ্‌ধৃতি দেখা গেছে। 'রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতপ্রীতি'-শীর্ষক নিবন্ধে (বসুধারা ১৩৬৯ ফাল্গুন) অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী 'ডাকঘর' নাটকে ব্যবহৃত উদ্‌ধৃতির যে উৎস নির্দেশ করেছেন তার অনুসরণে যথাক্রমে চ্যবন ও চক্রধর দত্তের (চক্রপাণি দত্ত, খ্রীঃ ১০৬০ ?) শ্লোক দুটিকে এ স্থলে সংকলন করে দেওয়া হল।

পিঙ্গলাচার্য

প্রাকৃতপৈঙ্গল

পৈঙ্গল-ছন্দঃসূত্রাণি

ভংজিঅ মলঅচোলবই নিবলিঅ
গংজিঅ গুজ্জরা।
মালবরাঅ মলঅগিরি লুক্কিঅ
পরিহরি কুংজরা।
খুরাসাণ খুহিঅ রণমইঁ লংঘিঅ
মুহিঅ সাঅরা।[1]
হম্মীর চলিঅ হারব পলিঅ
রিউগণহ কাঅরা॥ ১।১৫১

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'ছন্দ', ছন্দের মাত্রা : দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ। ১৯৩৪

পঢ়ম দহ দিজ্জিআ
পুণ বি তহ কিজ্জিআ
পুণ বি দহ সত্ত তহ বিরই জাআ।
এম পরি বি বিহু দল
মত্ত সততীস পল
এহু কহু ঝুল্লণা ণাঅরাআ॥ ১।১৫৬

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'ছন্দ', ছন্দের মাত্রা : দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ। ১৯৩৪

বরিস জল ভমই ঘণ গঅণ
সিঅল পবণ মণহরণ
কণঅ-পিঅরি ণচই বিজুরি ফুল্লিআ ণীবা।
পত্থর-বিত্থর-হিঅলা
পিঅলা ণিঅলং ণ আবেই॥ ১।১৬৬

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'ছন্দ', গদ্যছন্দ-৫, ১৩৪১ বৈশাখ। ১৯৩৪

কুংতঅরু ধণুদ্ধরু হঅবরু ছক্কলু বি বি পাইক্ক দলে
বত্তীসহ মত্তহ পঅ সুপসিদ্ধউ জাণহ বুহঅণ হিঅঅতলে।
সউবীস অঠগ্‌গল কল সংপুণ্ণউ রুঅউ ফণি ভাসিঅ ভুঅণে
দংডঅল ণিরুত্তউ গুরু সংজুত্তউ পিংগল অংজংপংত মণে॥ ১।১৭৯

---

১ শ্লোকটির তৃতীয় চরণে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'রণমহ মুহিঅ লংঘিঅ সাঅরা'।

আংশিক উদ্‌ধৃতি কুংতঅরু ধণুদ্ধরু

হুঅবর গঅবরু[১]

ছক্কলু বিবি পা-

ইক্ক দলে ॥

'ছন্দ', ছন্দের মাত্রা : দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৪১ জ্যৈষ্ঠ। ১৯৩৪

বিশ্বনাথ কবিরাজ

সাহিত্যদর্পণ

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। ১। অবতরণিকা ৩

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'সাহিত্য', সাহিত্যসম্মিলন ১৩১৩ ফাল্গুন। ১৯০৭

'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব ১৩৪০ ভাদ্র। ১৯৩৩

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৩৩ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩৪ জানুআরি ২৭

'সাহিত্যের পথে', অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা পত্র ১৩৪৩ আশ্বিন ৮। ১৯৩৬

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'সাহিত্য', ঐতিহাসিক উপন্যাস ১৩০৫ আশ্বিন। ১৮৯৮

পরোক্ষ উল্লেখ 'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যধর্ম ১৩৩৪ শ্রাবণ। ১৯২৭

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।

জুগুপ্‌সা বিস্ময়শ্চেত্থমষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোঽপি চ ॥ ৩।১৮৪

পরোক্ষ উল্লেখ 'লোকসাহিত্য', ছেলেভুলানো ছড়া-২, ভূমিকা ১৩০১ মাঘ। ১৮৯৫

'সাহিত্য', ঐতিহাসিক উপন্যাস ১৩০৫ আশ্বিন। ১৮৯৮

পরিশেষ ঃ বাৎস্যায়ন

কামসূত্র

প্রথম অধিকরণ : তৃতীয় অধ্যায়, ১৬-সংখ্যক শ্লোকের পণ্ডিত যশোধর-কৃত টীকার অন্তর্গত।—

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।

সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষডঙ্গকম্ ॥

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'বিচিত্র প্রবন্ধ', ছবির অঙ্গ ১৩২২ আষাঢ়। ১৯১৫

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৯ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ জুন ১৪

---

১ প্রচলিত সংস্করণে 'গঅবরু' শব্দটি নেই।

আংশিক উদ্ধৃতি ভূম্নৌ পতদ্‌গ্রহঃ। ৪।৯

'চিঠিপত্র' ৫, পত্র-৭০ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা ১৩২৫ ভাদ্র ১।১৯১৮

চ্যবন

আংশিক উদ্ধৃতি ভেষজং হিতবাক্যঞ্চ তিক্তমাশুফলপ্রদম্।

'ডাকঘর'-১, ১৯১২ জানুআরি

চক্রধরদত্ত

অপস্মাব চিকিৎসা-প্রসঙ্গোক্ত পঞ্চগব্যঘৃত প্রকবণের শ্লোক।—

অপস্মারে জ্বরে কাশে শ্বযথাবুদবেযু চ।
গুল্মার্শঃ পাণ্ডুবোগেষু কামলায়াং হলীমকে ॥

আংশিক উদ্ধৃতি অপস্মাবে জ্বরে কাশে কামলায়াং হলীমকে

'ডাকঘব'-১, ১৯১২ জানুআবি

বৈষ্ণব পদাবলী

রবীন্দ্রব্যবহৃত বিভিন্ন বৈষ্ণব মহাজনের পদগুলি এ স্থানে সংকলিত হল। রবীন্দ্র-ব্যবহৃত আংশিক উদ্‌ধৃতিগুলি কোন্ পদের অন্তর্গত তা বোঝাবার জন্য প্রত্যেক স্বতন্ত্র পদের প্রথম পঙ্‌ক্তিটি উদ্‌ধৃত করা হয়েছে। আর যে আংশিক উদ্‌ধৃতির মূল পদ নির্ণয় করা যায় নি, রবীন্দ্রব্যবহৃত উদ্‌ধৃতির সমগ্রতা রক্ষার জন্য এ স্থলে সেগুলিকেও সংকলন করে দেওয়া হয়েছে। শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহায়তায় কবি যে 'পদরত্নাবলী' সংকলন করেছিলেন সেই গ্রন্থে প্রাপ্ত পদগুলিকে এ স্থানে 'পদ'-শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করা হল। এ ছাড়া কবি 'জীবনস্মৃতি'তে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র -সম্পাদিত 'প্রাচীন-কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের কথা বলেছিলেন। এই অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলীতে রবীন্দ্র-উল্লিখিত প্রায় সমস্ত পদই পাওয়া গেছে। সেগুলি তারকাচিহ্নিত করা হল। রবীন্দ্র-উদ্‌ধৃত চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদগুলিকেও উক্ত গ্রন্থের ক্রম অনুযায়ী সাজানো হল। বৈষ্ণব পদাবলীতে পাঠান্তর অসংখ্য। এমন কি পদরত্নাবলীর পাঠের সঙ্গেও রবীন্দ্রধৃত পাঠের মিল সর্বত্র পাওয়া যায় না। এ স্থলে রবীন্দ্রধৃত পাঠ দেওয়া হল।

চণ্ডীদাস

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম…*

আংশিক উদ্‌ধৃতি সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম

'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায় (ভু বার) ১৩২৪ চৈত্র। ১৯১৮

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো

আকুল করিয়া দিল প্রাণ

'গল্পগুচ্ছ', বদনাম ১৩৪৮ আষাঢ়। ১৯৪১

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো

'ছন্দ', ছন্দের হসন্ত-হলন্ত : প্রথম পর্যায় ১৩৩৮ পৌষ। ১৯৩১

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া

'গোরা' ১৯১০, অধ্যায় ৩৯

'সমাজ', নারীর মনুষ্যত্ব ১৩৩৫ বৈশাখ। ১৯২৮

জলদবরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু…*

আংশিক উদ্‌ধৃতি নয়ন চকোর মোর পিতে করে উতরোল,
নিমিখে নিমিখ নাহি হয়।

'আধুনিক সাহিত্য', বিদ্যাপতির রাধিকা ১২৯৮ চৈত্র
। ১৮৯১

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা…* পদ.

আংশিক উদ্‌ধৃতি সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন- তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমত যোগিনী পারা॥

'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র। ১৯১৮

তথা কনক বরণ কিবে দরপণ *

আংশিক উদ্‌ধৃতি তথা কনক বরণ কিবে দরপন নিছনি দিযে যে তার •
কপালে ললিত চান্দ যে শোভিত সিন্দুর অরুণ আর।

'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট . নিছনি ১২৯৯। ১৮৯২

পিরীতি রসের সাগর দেখিয়া·· *

আংশিক উদ্‌ধৃতি কহে চণ্ডীদাস, 'শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই ?
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঁই।'

'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন। ১৮৮২

সুখের লাগিয়া রন্ধন করিলুঁ…*

আংশিক উদ্‌ধৃতি কিছু কিছু সুধা বিষগুণা আধা

'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন। ১৮৮২

পিরীতি পিরীতি কি রীতি মুরতি
হৃদয়ে লাগল সে—

পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গডল কে ?
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
না জানি আছিল কোথা !
পিরীতি কণ্টক হিয়ায় ফুটল,
পরাণপুতলী যথা।
পিরীতি পিরীতি পিরীতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল নিবাইলে নহে,
হিয়ায় রহল শেল !
চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনি,
পিরীতি না কহে কথা—
পিরীতি লাগিয়ে পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলয়ে তথা। *

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন। ১৮৮২

রমণীমোহন বিলসিতে মন ··* পদ.

আংশিক উদ্ধৃতি অমিয়া নিছনি বাজিছে সঘনে মধুর মুরলী গীত
অবিচল কুল রমণী সকল শুনিয়া হরল চিত।
'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : নিন্দনি ১২৯৯। ১৮৯২

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে··· *

আংশিক উদ্ধৃতি বিষামৃতে একত্র করিয়া
'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন। ১৮৮২

আজু কে গো মুরলী বাজায় ·· *

আংশিক উদ্ধৃতি আজু কে গো মুরলী বাজায় !
এ তো কভু নহে শ্যামরায় !
ইহার গৌর বরণে করে আলো,
চূড়াটি বাঁধিয়া কে বা দিল !

ইহার বামে দেখি চিকণবরণী,
নীল উষলি নীলমণি ॥

'আলোচনা', বৈষ্ণব কবির গান : বিপরীত ১২৯১ কার্তিক । ১৮৮৪

এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা,
কেমনে আইল বাটে ?
আঙ্গিনার কোণে তিতিছে বঁধুয়া,
দেখিয়া পরাণ ফাটে ।
সই, কি আর বলিব তোরে,
বহু পুণ্যফলে সে-হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে ।
ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ,
বিলম্বে বাহির হৈনু—
আহা মরি মরি, সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু ।
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে । *

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন । ১৮৮২

আর একদিন সখী শুতিয়া আছিনু *

আংশিক উদ্ধৃতি যার যত জ্বালা তার তত‌ই পিরীতি

'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন । ১৮৮২

প্রভাত কালের কাক কোকিল ডাকিল *

আংশিক উদ্ধৃতি সদা জ্বালা যার তবে সে তাহার
মিলয়ে পিরীতি ধন ।

'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন । ১৮৮২

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি…*

আংশিক উদ্‌ধৃতি নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি

'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন। ১৮৮২

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি…*

আংশিক উদ্‌ধৃতি দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া

'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন। ১৮৮২

'প্রাচীন সাহিত্য', মেঘদূত ১২৯৮ অগ্রহায়ণ। ১৮৯১

নিতই নূতন পিরীতি দুজন…* পদ.

আংশিক উদ্‌ধৃতি নিতই নূতন পিরীতি দুজন
তিলে তিলে বাড়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাড়ায়,
পরিণামে নাহি খায়!

'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন। ১৮৮২

কি মোহিনী জান বঁধু, কি মোহিনী জান!
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন!
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি—
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি।
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর—
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।
কোন্ বিধি সিরজিল সোতের সেঁওলি,
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি।
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও। * পদ.

আংশিক উদ্‌ধৃতি 'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন। ১৮৮২

অবলার প্রাণ নিতে হেন

'ছন্দ', ছন্দের হসন্ত-হলন্ত : প্রথম পর্যায় (বর্জিত অংশ)[১] ১৩৩৮ পৌষ। ১৯৩১

আংশিক উদ্‌ধৃতি ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।

'সমূহ', পরিশিষ্ট : আল্‌ট্রা-কন্‌সাভেটিভ ১৩০৫ কার্তিক। ১৮৯৮

'সমাজ', পরিশিষ্ট · ব্যাধি ও প্রতিকার ১৩০৮ বৈশাখ। ১৯০১

'আত্মশক্তি', স্বদেশী সমাজ ১৩১১ ভাদ্র। ১৯০৪

ঘর হৈল বাহির বাহির হৈল ঘর

'গল্পগুচ্ছ', তপস্বিনী ১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ। ১৯১৭

স্রোতের সেঁওলি

'আত্মশক্তি', স্বদেশী সমাজ ১৩১১ ভাদ্র। ১৯০৪

তোমারে বুঝাই বঁধু, তোমারে বুঝাই,
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন কেহ নাই।
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে,
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে।
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ?
মোর আগে দাঁড়াও, তোমার দেখিব চাঁদমুখ।
খাইতে সোয়াস্তি নাই, নাহি টুটে ভুক—
কে মোর ব্যথিত আছে, কারে কব দুখ। *

আংশিক উদ্‌ধৃতি 'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন। ১৮৮২

যখন পিরীতি কৈলা আনি চাঁদ হাতে দিলা *

আংশিক উদ্‌ধৃতি ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ

'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী', ভূমিকা ১২৯৮। ১৮৯১

'রাজাপ্রজা', সমস্যা ১৩১৫। ১৯০৮

'প্রহাসিনী', সংযোজন . নামকরণ[২] ১৯৩৯ মার্চ ৭

১ দ্রষ্টব্য 'ছন্দ' ১৯৬২, পাঠপরিচয় পৃ ৩৮৭

২ এই কবিতায় 'হৈতে' স্থলে পাই 'হতে'।

মন আর নাহি লাগে গৃহকাজে…*

আংশিক উদ্‌ধৃতি যে ঝাড়ের তরল বাঁশি তারি লাগি পাও,
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও।

'সমাজ', পরিশিষ্ট : ব্যাধি ও প্রতিকার ১৩০৮ বৈশাখ। ১৯০১

তোমরা মোরে ডাকিয়া সুধাও না·· *

আংশিক উদ্‌ধৃতি নন্দের নন্দন গোকুল কানাই সবাই আপনা বোলে
মোপুনি ইছিয়া নিছিয়া লইনু অনাদি জনম ফলে।

'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : নিছনি ১২৯৯। ১৮৯২

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী…*

আংশিক উদ্‌ধৃতি অধিক জ্বালা যার তার অধিক পিরীতি

'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন। ১৮৮২

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর…*

আংশিক উদ্‌ধৃতি সই, পিরীতি না জানে যারা
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা ?

'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন। ১৮৮২

এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে,
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে।
গড়ন ভাঙ্গিতে, সই, আছে কত খল—
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল।
যথা তথা যাই আমি যত দূর পাই,
চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই।
সে-হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়
হায় নারী অবলার বধ লাগে তায় !
চণ্ডীদাস কহে, রাই, ভাবিছ অনেক—
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক। * পদ.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন। ১৮৮২

আংশিক উদ্‌ধৃতি গড়ন ভাঙ্গিতে বড় বিবল

'ছন্দ', ছন্দেব হসন্ত হলন্ত প্রথম পর্যায় (বর্জিত অংশ)[১] ১৩৩৮

পৌষ। ১৯৩১

সই, কেমনে ধবিব হিয়া ?
আমার বঁধুযা আন বাড়ি যায়
আমাব আঙ্গিনা দিয়া।
সে বঁধু কালিযা না চায় ফিরিযা,
এমতি কবিল কে ?
আমার অন্তব যেমন কবিছে
তেমনি হউক সে।
যাহাব লাগিযা সব তেযাগিনু,
লোকে অপযশ কয,
সেই গুণনিধি ছাড়িযা পিবীতি
আব জানি কাব হয।
যুবতী হইযা শ্যাম ভাঙ্গাইযা
এমতি কবিল কে ?
আমাব পবাণ যেমতি কবিছে
সেমতি হউক সে। *

আংশিক উদ্‌ধৃতি 'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন। ১৮৮২

সুখের লাগিযা এ ঘব বাঁধিনু অনলে পুড়িযা গেল[২] * পদ.
উচল দেখিযা অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে

পরোক্ষ উল্লেখ 'কালান্তব', বাযতের কথা ১৩৩৩ আষাঢ়। ১৯২৬

যদি বা পিবীতি সুজনের হয *

১ দ্রষ্টব্য 'ছন্দ' ১৯৬২, পাঠপরিচয পৃ ৩৮৪

২ অক্ষয়চন্দ্র সরকাবের গ্রন্থে এ পদ চণ্ডীদাসের (অনুরাগ সখীসম্বোধনে, পৃ ১০৯) এবং পদরত্নাবলীতে এটি জ্ঞানদাসের বলে উল্লিখিত।

আংশিক উদ্‌ধৃতি যেন মলয়জ ঘষিতে শীতল
অধিক সৌরভময়,
শ্যাম বঁধুয়ার পিরীতি ঐছন
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।

'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন। ১৮৮২

শ্যামের পিরীতি মুরতি⋯*

আংশিক উদ্‌ধৃতি পরাণ-সমান পিরীতি রতন
জুকিনু হৃদয়-তুলে—
পিরীতি-রতন অধিক হইল
পরাণ উঠিল চুলে।

'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন। ১৮৮২

পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর⋯*

আংশিক উদ্‌ধৃতি পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন-সার।
এই মোর মনে হয় রাতি দিনে
ইহা বই নাহি আর!

'সমালোচনা' চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন। ১৮৮২

পীরিতি নগরে বসতি করিব⋯*

আংশিক উদ্‌ধৃতি পিরীতিনগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শি করিব,
তা বিনু সকলি পর।

'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন।
১৮৮২

পিরীতি পিরীতি সব জন কহে,
পিরীতি সহজ কথা?

বিরিখের ফল নহে তো পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা।
পিরীতি অন্তরে, পিরীতি মন্তরে,
পিরীতি সাধিল যে
পিরীতি রতন লভিল সে জন—
বড ভাগ্যবান সে।
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে,
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে।
পিরীতি সাধন বডই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস,
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি-আশ। * পদ.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন। ১৮৮২

মরম করিতে ধরম না রয় *

আংশিক উদ্ধৃতি রজনীদিবসে হব পরবশে,
স্বপনে রাখিব লেহা—
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা।
'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন।
১৮৮২

নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল···*

আংশিক উদ্ধৃতি শুন রজকিনী রামি,
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি।
তুমি বেদ-বাদিনী হরের ঘরণী
তুমি সে নয়নের তারা,

তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা-যাজনে
তুমি সে গলার হারা।
রজকিনীরূপ কিশোরীস্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়,
রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়।

'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন। ১৮৮২

আংশিক উদ্ধৃতি তুমি বেদ বাদিনী·· নয়নের তারা

'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৪ সেপ্টেম্বর ৩০

আপনা আপনি দিবস রজনী ভাবিয়ে ··*

আংশিক উদ্ধৃতি বিধি যদি শুনিত মরণ হইত
ঘুচিত সকল দুখ।
চণ্ডীদাস কয় এমতি হইলে
পিরীতির কি বা সুখ!

'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন। ১৮৮২

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে॥
ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে না রব মুঞি ... ব বারাইয়া॥ ··

আংশিক উদ্ধৃতি এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে।
এবং দেশে না রব মুঞি যাব বারাইয়া।

'ছন্দ', ছন্দের হসন্ত-হলন্ত : প্রথম পর্যায় (বর্জিত অংশ)[১] ১৩৩৮ পৌষ
। ১৯৩১

সজনি, ও ধনি কে কহ বটে···পদ.

পরোক্ষ উল্লেখ চলে নীল শাড়ি নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিতে মোর

'শ্যামলী', স্বপ্ন ১৯৩৬ মে ৩০

বিদ্যাপতি

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর···পদ.

আংশিক উদ্ধৃতি সখি, এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

'সাহিত্য', সংযোজন, কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ১২৯৩ চৈত্র। ১৮৮৭

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর

'ঘরে-বাইরে' ১৯১৬, নিখিলেশের আত্মকথা-৩

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-১৭৩ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩৫ মে ২৪

'ছেলেবেলা' ১৯৪০, অধ্যায় ১৩

ভরা বাদর,···মোর

'সাহিত্য', সাহিত্যসৃষ্টি ১৩১৪ আষাঢ়। ১৯০৭

'শান্তিনিকেতন' ২, শ্রাবণসন্ধ্যা ১৯১০ অক্টোবর

'ঘরে-বাইরে' ১৯১৬, নিখিলেশের আত্মকথা-৩ (তিন বার)

ভরা বাদর, মাহ ভাদর

'চিঠিপত্র' ৮, পত্র-১২৫ প্রিয়নাথ সেনকে লেখা ১৯০০

'জীবনস্মৃতি' ১৯১২, গঙ্গাতীর

মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাতিয়া

'বিচিত্র প্রবন্ধ', কেকাধ্বনি ১৩০৮ ভাদ্র। ১৯০১

তিমির দিগ্‌ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া
বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া।

'শান্তিনিকেতন' ২, শ্রাবণসন্ধ্যা ১৯১০ অক্টোবর

বিদ্যাপতি কহে ··· দিনরাতিয়া

'ঘরে-বাইরে' ১৯১৬, নিখিলেশের আত্মকথা-৩

'শেষের কবিতা' ১৯২৯, অধ্যায় ১০ : দ্বিতীয় সাধনা

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'বীথিকা', ছায়াছবি ১৩৪২ আষাঢ়। ১৯৩৫

পরোক্ষ উল্লেখ 'ছিন্নপত্র', পত্র-৮ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা ১৮৮৭ জুলাই ২৭

সখি রে, কি পুছসি অনুভব মোয় !
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয় ।
জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল ।
কত মধু-যামিনী রভসে গোয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেল.
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল ।
যত যত রসিকজন রস-অনুমগন—
অনুভব কহে, না পেখে !
বিদ্যাপতি কহে, প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল একে ।[১] পদ.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন । ১৮৮২

আংশিক উদ্ধৃতি সখি কি পুছসি অনুভব মোয়
'বাংলা শব্দতত্ত্ব', ভাষার খেয়াল ১৩৪২ ভাদ্র । ১৯৩৫
তিলে তিলে নূতন হোয়
'শেষ সপ্তক' ১৯৩৫, ১২-সংখ্যক কবিতা
জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল
'শেষরক্ষা' ১৯২৮, প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য
'আলোচনা', ডুব দেওয়া : ডুবিবার স্থান ১২৯১ বৈশাখ ।

১৮৮৪

---

১ এই পদটির রচয়িতা সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ আছে । বৈষ্ণব সাহিত্য-বিশেষজ্ঞ ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এটিকে কবিবল্লভের রচিত বলে মনে করেছেন (দ্রষ্টব্য 'রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান' ১৩৬৮, পৃ ২০০) । পদরত্নাবলীতেও এটি কবিবল্লভের ভণিতায় উল্লিখিত । তবে এই গ্রন্থের পাদটীকায় দেখি "এই কবিতা সাধারণতঃ বিদ্যাপতির বলিয়া পরিচিত" । রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে এটিকে বিদ্যাপতির বলে মনে করতেন তাঁর একাধিক রচনায় তার পরিচয় পাওয়া গেছে । সেই কারণে এ স্থলে এটি বিদ্যাপতির পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হল ।

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনমু, শ্রুতিপথে পরশ না গেল।

'পঞ্চভূত', কাব্যের তাৎপর্য ১৩০১ অগ্রহায়ণ। ১৮৯৪

জনম অবধি হম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

'আধুনিক সাহিত্য', বিদ্যাপতির রাধিকা ১২৯৮ চৈত্র। ১৮৯২
'গোড়ায় গলদ' ১৮৯২, প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য
'সাহিত্য', সংযোজন : সাহিত্যসম্মিলন ১৩১৩ ফাল্গুন। ১৯০৭
'সাহিত্যের পথে', তথ্য ও সত্য ১৩৩১ ভাদ্র। ১৯২৪
'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব ১৩৪০ ভাদ্র। ১৯৩৩
'সাহিত্যের স্বরূপ', সাহিত্যে আধুনিকতা ১৩৪১ মাঘ। ১৯৩৫

লাখ লাখ···গেল

'সমালোচনা', বসন্তরায় ১২৮৯ শ্রাবণ। ১৮৮২
'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', ১৯২৫ ফেব্রুআরি ৯
'সাহিত্যের স্বরূপ', সাহিত্যে চিত্রবিভাগ ১৩৪৮ বৈশাখ। ১৯৪১

লাখে না মিলল একে

'বিবিধ প্রসঙ্গ', আত্মসংসর্গ ১২৮৮ ফাল্গুন। ১৮৮২
'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যধর্ম ১৩৩৪ শ্রাবণ। ১৯২৭

যব গোধূলি সময় বেলি···

আংশিক উদ্ধৃতি যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি

'সাহিত্যের পথে', তথ্য ও সত্য ১৩৩১ ভাদ্র। ১৯২৪
'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যরূপ ১৩৩৫ বৈশাখ। ১৯২৮
প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যের তাৎপর্য ১৯৩৪ ডিসেম্বর

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম···

আংশিক উদ্ধৃতি মিলি মিলি যাওব সাগরলহরী-সমানা

'ভারতবর্ষ', নববর্ষ ১৩০৯ বৈশাখ। ১৯০২

শুনো লো রাজার ঝি…

আংশিক উদ্‌ধৃতি

বেলি অবসান কালে
কবে গিয়াছিলা জলে।
তাহারে দেখিয়া ইষত হাসিয়া ধরিলি সখীর গলে॥

'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র। ১৯১৮

শৈশব যৌবন দরশন ভেল…

আংশিক উদ্‌ধৃতি

কবহুঁ বাঁধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি
কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি।

'আধুনিক সাহিত্য', বিদ্যাপতির রাধিকা ১২৯৮ চৈত্র। ১৮৯২

নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ,
নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দীপুলিনকুঞ্জ নবশোভন,
নব নব প্রেমবিভোর॥
নবীন রসালমুকুলমধু মাতিয়া
নব কোকিলকুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত উমতায়ই
নব রসে কাননে ধায়॥
নব যুবরাজ নবীন নব নাগরী
মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতিমতি মাতি॥ পদ.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি

'আধুনিক সাহিত্য', বিদ্যাপতির রাধিকা ১২৯৮ চৈত্র। ১৮৯২

মধু ঋতু, মধুকরপাঁতি
মধুর-কুসুম-মধু-মাতি।

মধুর বৃন্দাবনমাঝ
মধুর মধুর রসরাজ।
মধুর যুবতীগণসঙ্গ
মধুর মধুর রসরঙ্গ।
মধুর যন্ত্র স্বরসাল,
মধুর মধুর করতাল।
মধুর নটনগতিভঙ্গ,
মধুর নটিনীনটরঙ্গ।
মধুর মধুর রসগান,
মধুর বিদ্যাপতি ভান। পদ

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'আধুনিক সাহিত্য', বিদ্যাপতির রাধিকা ১২৯৮ চৈত্র। ১০৯০

সজনি, ভালো করি পেখন না ভেল
আংশিক উদ্ধৃতি: ভালো করি পেখন না ভেল
এবং আধ আঁচর খসি আধ বদনে হসি
আধ হি নয়ানতরঙ্গ।
'আধুনিক সাহিত্য', বিদ্যাপতির রাধিকা ১২৯৮ চৈত্র ১০৯২

গেলি কামিনী গজবরগামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুমসায়ক
কুহকী ভেল বরনারী।
জোরি ভুজযুগ মোড় বেড়ল,
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দামচম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদচন্দ।
উরহি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল,
আধ পয়োধর হেরু।
পবন-পরভাবে শরদঘন জনু
বেকত কয়ল সুমেরু।

পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব,
টুটব বিরহ কওর।
চরণযাবক হৃদয়পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর।

আংশিক উদ্ধৃতি 'সমালোচনা', বসন্তরায় ১২৮৯ শ্রাবণ। ১৮৮২

এ সখি কি দেখনু এক অপরূপ,
শুনাইতে মানবি স্বপনস্বরূপ।
কমলযুগল-'পর চাঁদাকি মাল,
তা 'পর উপজল তরুণ তমাল।
তা 'পর বেড়ল বিজুরীলতা,
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা।
শাখাশিখর সুধাকরপাঁতি,
তাহে নবপল্লব অরুণক ভাতি।
বিমল বিম্বফলযুগল বিকাশ,
তা 'পর কির থির করু বাস।
তা 'পর চঞ্চল খঞ্জনযোড়,
তা 'পর সাপিনী ঝাঁপল মোড়।

আংশিক উদ্ধৃতি 'সমালোচনা', বসন্ত রায় ১২৮৯ শ্রাবণ। ১৮৮২

দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল,
হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল।
যতহুঁ আছিল মঝু হৃদযক সাধ
সো সব পূরল পিয়া-পরসাদ।
রভস-আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল,
অধরহি পান বিরহ দূর গেল।
চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ,
হেরইতে নযানে নাহি অবকাশ।
ভনহ বিদ্যাপতি আর নহ আধি,
সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি। পদ.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'সমালোচনা', চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ১২৮৮ ফাল্গুন। ১৮৮২

বিগলিতচিকুর মিলিত মুখমণ্ডল···
আংশিক উদ্‌ধৃতি বিগলিতচিকুর মিলিত মুখমণ্ডল
'সমালোচনা', বসন্তরায় ১২৮৯ শ্রাবণ ১৮৮২

আংশিক উদ্‌ধৃতি তুহারি চরিত নাহি জানি, বিদ্যাপতি পুন শিবে কব হানি
'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : পহুঁ ১২৯৯। ১৮৯২

জ্ঞানদাস

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা··· পদ.
উদ্‌ধৃতি রজনী শাঙনঘন ঘন দেয়া-গরজন,
ঝিমঝিম শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।
'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র। ১৯১৮
রজনী শাঙন···বরিষে
'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : দ্বিতীয় পর্যায়[১] ১৩৩০ আষাঢ়। ১৯২৩
রজনী শাঙন···গরজন
'শ্যামলী', স্বপ্ন ১৯৩৬ মে ৩০

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ।
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতিঅনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা ব'লে ডাকে আমার নাম॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিতধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ূরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ॥

১ দ্রষ্টব্য 'বাংলা ভাষা-পরিচয়' ১৯৩৮, অধ্যায় ১১ (অংশ)

কোন্ রন্ধ্রে ষড ঋতু হয় এককালে।
কোন রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুলে ফলে ॥
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায় ॥
জ্ঞানদাস কহে হাসি।
"রাধে মোর" বোল বাজিবেক বাঁশী ॥ পদ

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'আলোচনা', বৈষ্ণবকবির গান : জ্ঞানদাসের গান ১২৯১ কার্তিক।
১৮৮৪

কি মোহন নন্দকিশোর··· পদ.

আংশিক উদ্ধৃতি হাসি-মিশা বাঁশি বায়
'সাহিত্য', সংযোজন, কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ১২৯৩ চৈত্র। ১৮৮৭

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে ··· পদ

আংশিক উদ্ধৃতি শিশুকাল হৈতে বঁধুর সহিতে পরাণে পরাণে লেহা
'সাহিত্য', কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ১২৯৩ চৈত্র। ১৮৮৭

বন্ধুর রসের কথা কি কহব তোয়···

আংশিক উদ্ধৃতি এক দুই গণইতে অন্ত নাহি পাই,
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই।
'সাহিত্যের পথে', তথ্য ও সত্য ১৩৩১ ভাদ্র। ১৯২৪

আলো মুঞি জানো না, জানিলে যাইতাম না···

আংশিক উদ্ধৃতি রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল
যৌবনের বনে মন পথ হারাইল।
'সাহিত্যের পথে', তথ্য ও সত্য ১৩৩১ ভাদ্র। ১৯২৪

অপরূপ তুয়া মুরলী ধ্বনি···

আংশিক উদ্ধৃতি জাগিয়া জাগিয়া হইল খীন।
অসিত চাঁদের উদয় দিন ॥
'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র। ১৯১৮

দেখ রি সখি শ্যামচন্দ ইন্দুবদন রাধিকা…

আংশিক উদ্ধৃতি মন্দ পবন, কুঞ্জভবন, কুসুম-গন্ধ-মাধুরী

'ছন্দ', বাংলা শব্দ ও ছন্দ ১২৯৯ শ্রাবণ। ১৮৯২

কানুক ঐছন বাত…

আংশিক উদ্ধৃতি মলিন বদন ভেল, ধীরে ধীরে চলি গেল।

আওল রাইর পাশ, কি কহিব জ্ঞানদাস।

'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র। ১৯১৮

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া··পদ.

আংশিক উদ্ধৃতি হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া

মধুর কথাটি কয়।

ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে

পথের নিকটে রয়॥

'ছন্দ', ছন্দের হসন্ত-হলন্ত : দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৩৮ মাঘ। ১৯৩২

গোবিন্দদাস

কুঞ্চিত কেশিনী নিরুপম বেশিনী…*

আংশিক উদ্ধৃতি সুন্দরি রাধে আওয়ে বনি

'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-৭২ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯২

ডিসেম্বর ৫

সুন্দরি রাধে আওয়ে বনি

ব্রজরমণীগণ-মুকুটমণি !

'ছন্দ', বাংলা ছন্দ : প্রথম পর্যায় (এনডারসনকে লেখা পত্র) ১৩২০

ফাল্গুন ৬। ১৯১৪

নব অনুরাগিণী অখিল সোহাগিনী

পঞ্চম রাগিণী মোহিনী রে

'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : বাংলা ব্যাকরণ ১৩০৮। ১৯০১

প্রত্যক্ষ উল্লেখ 'আধুনিক সাহিত্য', সঞ্জীবচন্দ্র ১৩০১ পৌষ। ১৮৯৪

শরদচন্দ পবন মন্দ…* পদ.

আংশিক উদ্ধৃতি শরদচন্দ পবন মন্দ,
বিপিন ভরল কুসুমগন্ধ
ফুল্ল মল্লি মালতি যূথি
মত্তমধুপভোরনী।

'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র। ১৯১৮
'সাহিত্যের পথে', তথ্য ও সত্য ১৩৩১ ভাদ্র। ১৯২৪

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি…* পদ.

আংশিক উদ্ধৃতি ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।

'বাংলাভাষা-পরিচয়' ১৯৩৮, অধ্যায় ৪

চিকনকালা গলায় মালা…*

আংশিক উদ্ধৃতি চিকনকালা গলায় মালা
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়ানে চায়॥

'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র। ১৯১৮

গগনহি নিমগন …*

আংশিক উদ্ধৃতি গগনহি নিমগন দিনমণিকাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিনরাতি॥
চৌদিকে অথির পবন তরুদোল।
জগভরি শীকরনিকর হিলোল॥
চলইতে গোবি নগরপুরবাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট॥

'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১৬৯ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯৪
অক্টোবর ২৫

শরদ- সুধাকর- মণ্ডল- মণ্ডন- খণ্ডন ···*

আংশিক উদ্ধৃতি পদ-পঙ্কজপরি মণিময় নূপুর রুনুঝনু খঞ্জন ভাষ
মদন মুকুর জনু নখমণি দরপণ নিছনি গোবিন্দদাস।

'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : নিছনি-২, ১২৯৯। ১৮৯২

পতিত হেরিয়া কান্দে থির নাহি বান্ধে···*

আংশিক উদ্ধৃতি গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি

'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : নিছনি- ১, ১২৯৮। ১৮৯১

ও নব জলধর অঙ্গ,
ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ।···*

আংশিক উদ্ধৃতি ও নব পদ্মিনী সাজ,
ইহ মত্ত মধুকর বাজ।
ও মুখ চন্দ উজোর,
ইহ দিঠি লুবধ চকোর।
গোবিন্দদাস পহু ধন্দ,
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ।

'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : প্রত্যুত্তর, পঁহু-প্রসঙ্গ ১২৯৯। ১৮৯২

সখীগণ মেলি করল জয়কার,
শ্যামক অঙ্গে দেয়ল ফুলহার।
নিজ মন্দিরে ধনী করল প্রয়াণ,
ঘন বনে রহল সুনাগর কান।
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে চলু গোরী,
মণিময় ভূষণে অঙ্গ উজোরি।
শঙ্খ শব্দ ঘন জয়জয় কার,
সুন্দর বদনে কবরী কেশভার।
হেরি মদন কত পরাভব পায়,
গোবিন্দদাস পহুঁ এহ রস গায়॥ *

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : প্রত্যুত্তর, পঁহু-প্রসঙ্গ ১২৯৯। ১৮৯২

গোঠ মাঝহি করল পয়ান · *

আংশিক উদ্‌ধৃতি

সুন্দর অপরূপ শ্যামরু চন্দ,
দোহত ধেনু করত কত ছন্দ।
গোধন গরজত বড়ই গভীর,
ঘন ঘন দোহন করত যদুবীর।
গোরস ধীর ধীর বিরাজিত অঙ্গ,
তমালে বিথারল মোহিত রঙ্গ।
মুটকি মুটকি ভার রাখত ঢারি,
গোবিন্দদাস পঁহু করত নেহারি।

'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : প্রত্যুত্তর, পঁহু প্রসঙ্গ ১২৯৯। ১৮৯২

নিজ মন্দির যাই বৈঠল বরবর্তী
গুরুজন নিরখি আনন্দ।
শিরীষ কুসুম জিনি তনু অতি সুকোমল
ঢর ঢর ও মুখচন্দ। ·
গৃহ নিজ কাজ সমাপন সখীজন
গুরুজন সেবন ফেলি।
গোবিন্দদাস পঁহু দীপ সাযাহ্ন
বেলি অবসান ভৈ গেলি[1] ॥ *

আংশিক উদ্‌ধৃতি 'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট . প্রত্যুত্তর, পঁহু প্রসঙ্গ ১২৯৯। ১৮৯২

বনি বনমালা আজানুলম্বিত
পরিমলে অলিকুল মাতি রহু।
বিম্বাধর পর মোহন মুরলী
গায়ত গোবিন্দদাস পঁহু।

আংশিক উদ্‌ধৃতি 'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট . প্রত্যুত্তর, পঁহু প্রসঙ্গ ১২৯৯। ১৮৯২

১ এই ভণিতাটি অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত পদাবলীর 'ঋতুপতি বিহরই নাগর শ্যাম' (পৃ ৭৮) এবং 'চাঁচর চিকুরে মণিচন্দ্রক' (পৃ ৮৮) ইত্যাদি পদ দুটিতেও পাওয়া যায়।

গোখুর ধূলী উছলি ভরু অম্বর·· *

আংশিক উদ্‌ধৃতি গোবিন্দদাস পঁহু নটবর শেখর।

'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : প্রত্যুত্তর, পঁহু-প্রসঙ্গ ১২৯৯। ১৮৯২

অরুণ উদয় বেলা, সব শিশু হঞা মেলা,···*

আংশিক উদ্‌ধৃতি গোবিন্দাদাসের পঁহু

হাসিয়া হাসিয়া রহু।

'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : 'পহুঁ' ১২৯৯। ১৮৯২

কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল কোকিল শোকিল বৃন্দাবন বনদাব।···*

আংশিক উদ্‌ধৃতি গোবিন্দদাস কহই পুন এতিখনে জানিয়ে কী ভেল গোরি।

'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : 'পহুঁ' ১২৯৯। ১৮৯২

বাঢল নিঃ রস বৈঠল দুহু জন মোছই আনন চন্দ ··*

আংশিক উদ্‌ধৃতি দোঁহে দোঁহে তনু নিরছাই।

'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : নিছনি-১, ১২৯৮। ১৮৯১

ঋতুপতি রাতি, বিরহ জ্বরে জাগবি, দুবী উপেখলি রামা·· *

আংশিক উদ্‌ধৃতি বরু হাম জীবন তোহে নিরমঞ্ছব

তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ।

'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : নিছনি-১, ১২৯৮। ১৮৯১

মুঞি জান হবি, রাইক পরিহবি · *

আংশিক উদ্‌ধৃতি কুণ্ডল পিচ্ছে চরণ নিরমঞ্ছল[১]

অব কিয়ে সাধসি মান।

'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : নিছনি-১, ১২৯৮। ১৮৯১

---

১ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পদাবলীতে 'পিচ্ছে' স্থলে 'পিঞ্ছে' ও পাদটীকায় 'পিঞ্ছে' এবং 'নিরমঞ্ছল' স্থলে 'নিরমঞ্ছব' ও পাদটীকায় 'নিবমঞ্ছব' আছে।

বসন্তরায়

সজনি, কি হেরনু ও মুখশোভা!
অতুল কমল সৌরভ শীতল,
অরুণনয়ন অলি-আভা।
প্রফুল্লিত ইন্দীবর বর সুন্দর
মুকুরকান্তি মনোৎসাহা।
রূপ বরণিব কত ভাবিতে থকিত চিত,
কিয়ে নিরমল শশিশোহা।
বরিহা বকুল ফুল অলিকুল আকুল,
চূড়া হেরি জুড়ায় পরাণ!
অধর বান্ধুলী ফুল শ্রুতি মণিকুণ্ডল
প্রিয় অবতংস বনান।
হাসিখানি তাহে ভায়, অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে চায়,
বিদগধ মোহন রায়।
মুরলীতে কি বা গায় শুনি আন নাহি ভায়,
জাতি কুলশীল দিনু তায়।
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে দেখিলে না হিয়া বাঁধে,
অনুখন মদনতরঙ্গ।
হেরইতে চাঁদ মুখ মরমে পরম সুখ,
সুন্দর শ্যামর অঙ্গ।
চরণে নূপুরমণি সুমধুর ধ্বনি শুনি
ধরণীক ধৈরজ ভঙ্গ।
ও রূপসাগরে রস- হিলোলে নয়ন মন
আটকল রায় বসন্ত।

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'সমালোচনা', বসন্তরায় ১২৮৯ শ্রাবণ। ১৮৮২

আংশিক উদ্ধৃতি হাসিখানি তাহে ভায়
'বিবিধ প্রসঙ্গ', সংযোজনী : উপভোগ ১২৮৯ বৈশাখ। ১৮৮২

সই লো কি মোহন রূপ সুঠাম,
হেরইতে মানিনী তেজই মান॥

উজর নীলমণি মরকতছবি জিনি
দলিতাঞ্জন হেন ভাল।
জিনিয়া যমুনার জল নিরমল ঢলঢল
দরপণ নবীন রসাল।
কিয়ে নবনীল নলিনী কিয়ে উতপল
জলধর নহত সমান।
কমনীয়া কিশোর কুসুম অতি সুকোমল
কেবল রসনিরমাণ।
অমল শশধর জিনি মুখ সুন্দর
সুরঙ্গ অধর পরকাশ
ঈষৎ মধুর হাস সরসহি সম্ভাষ
রায়বসন্ত পহু রঙ্গিণীবিলাস।

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'সমালোচনা', বসন্তরায় ১২৮৯ শ্রাবণ। ১৮৮২

বড়-অপরূপ দেখিনু সজনি
নয়লি কুঞ্জের মাঝে,
ইন্দ্রনীল মণি কেতকে জড়িত
হিয়ার উপরে সাজে।
কুসুমশয়ানে মিলিত নয়ানে
উলসিত অরবিন্দ,
শ্যামসোহাগিনী কোরে ঘুমায়লি
চাঁদের উপরে চন্দ।
কুঞ্জ কুসুমিত সুধাকরে রঞ্জিত
তাহে পিককুল গান—
মরমে মদনবাণ দুঁহে অগেয়ান,
কি বিধি কৈল নিরমাণ।
মন্দ মলয়জ পবন বহে মৃদু
ও সুখ কো করু অন্ত।
সরবস-ধন দোঁহার দুঁহু জন
কহয়ে রায় বসন্ত॥ পর্দ.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'সমালোচনা', বসন্তরায় ১২৮৯ শ্রাবণ। ১৮৮২

আলো ধনি, স্বন্দরি, কি আর বলিব ?
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব ?
তোমার মিলন মোর পুণ্যপুঞ্জরাশি,
মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি।
আনন্দমন্দির তুমি, জ্ঞান শকতি,
বাঞ্ছাকল্পলতা মোর কামনামূরতি।
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি স্থখময় ঠাম।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধা নাম।
গলে বনমালা তুমি, মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর ॥ পদ.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'সমালোচনা', বসন্তরায় ১২৮৯ শ্রাবণ। ১৮৮২

প্রাণনাথ, কেমন করিব আমি ?
তোমা বিনে প্রাণ করে উচাটন
কে জানে কেমন তুমি।
না দেখি নয়ন ঝরে অনুক্ষণ,
দেখিতে তোমায় দেখি।
সোঙরণে মন মূরছিত-হেন,
মুদিয়া রহিয়ে আখি।
শ্রবণে শুনিয়ে তোমার চরিত,
আন না ভাবিয়ে মনে।
নিমিষের আধ পাশরিতে নারি,
ঘুমালে দেখি স্বপনে !
জাগিলে চেতন হারাই যে আমি,
তোমা নাম করি কাঁদি।
পরবোধ দেই এ রায়-বসন্ত
তিলেক থির নাহি বাঁধি ॥ পদ.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'সমালোচনা', বসন্তরায় ১২৮৯ শ্রাবণ। ১৮৮২

ওহে নাথ, কিছুই না জানি,
তোমাতে মগন মন দিবস রজনী।
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি,
পরাণপুতলী তুমি জীবনের সখি!
অঙ্গ-আভরণ তুমি শ্রবণরঞ্জন,
বদনে বচন তুমি নয়নে অঞ্জন!
নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি,
রায় বসন্ত কহে পহু প্রেমরাশি॥ পদ.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'সমালোচনা', বসন্তরায় ১২৮৯ শ্রাবণ। ১৮৮২

আংশিক উদ্ধৃতি নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি
'সমালোচনা', বসন্তরায় ১২৮৯ শ্রাবণ। ১৮৮২
'ছিন্নপত্রাবলী', পত্র-১৩০ ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৮৯৪ জুলাই ১০
'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারী', পরিশিষ্ট ১৯২৫ ফেব্রুআরি ১২

আংশিক উদ্ধৃতি রায় বসন্ত কহে ও রূপ পিরীতিময়
'সমালোচনা', বসন্ত রায় ১২৮৯ শ্রাবণ। ১৮৮২

আংশিক উদ্ধৃতি পরাণ কেমন করে মরম কহিনু তোরে
জীবন নিছনি তুয়া পাশ।
'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : নিছনি-১, ১২৯৮। ১৮৯১

আংশিক উদ্ধৃতি তোমার পিরীতে হাম হইনু বিকিনী,
মূলে বিকালাঙ আর কি দিব নিছনি।
'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : নিছনি-১, ১২৯৮। ১৮৯১

বলরাম দাস

কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম··· পদ.

আংশিক উদ্ধৃতি পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে
'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায়-২, ১৩২৪ চৈত্র। ১৯১৮
'বাংলা ভাষা-পরিচয়' ১৯৩৮, অধ্যায় ৪

'সাহিত্যের স্বরূপ', সাহিত্যে চিত্রবিভাগ ১৩৪৮ বৈশাখ। ১৯৪১

অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা খেচনি··· পদ.

আংশিক উদ্ধৃতি আধ চরণে আধ চলনি আধ মধুর হাস

সাহিত্য', সংযোজন, কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ১২৯৩ চৈত্র। ১৮৮৭

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি··· পদ.

আংশিক উদ্ধৃতি হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির

তেঁই বলরামের, পহু, চিত নহে স্থির।

'প্রাচীন সাহিত্য', মেঘদূত ১২৯৮ অগ্রহায়ণ। ১৮৯১

তোমায় হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির

'সাহিত্য', বিশ্বসাহিত্য ১৩১৩ মাঘ। ১৯০৭

'শান্তিনিকেতন' ২, আত্মবোধ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

আংশিক উদ্ধৃতি দেখিবারে আঁখি-পাখি ধায়

'সাহিত্য', সাহিত্যের তাৎপর্য ১৩১০ অগ্রহায়ণ। ১৯০৩

'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যের তাৎপর্য ১৯৩৪ ডিসেম্বর

রাধামোহন দাস

রাধামোহন পহুঁ রসিক সুনাহ।

রাধামোহন পহুঁ হুঁহু অতি নিরুপম।

রাধামোহন পহুঁ তুয়া পায়ে নিবেদয়ে।

রাধামোহন পুন তঁহি ভেল বঞ্চিত।

আংশিক উদ্ধৃতি 'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : 'পহুঁ' ১২৯৯। ১৮৯২

প্রেমগজদলন সহই ন পারই জীবইতে করই ধিকার।

অন্তরগত তুহুঁ নিরগত করইতে কত কত করত সঞ্চার।

অথির নয়ন শরঘাতে বিষম জর ছটফট জলজ শয়ান।

রাধামোহন পঁহু কহই অপরূপ নহ যাহে লাগয়ে পাঁচবান।

আংশিক উদ্ধৃতি 'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : প্রত্যুত্তর, পঁহু-প্রসঙ্গ ১২৯৯। ১৮৯২

ঘনরাম দাস

দধিমন্থধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতি হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ,
চুম্বয়ে চান্দ-বয়ান॥
কহে, শুন যাদুমণি, তোরে দিব ক্ষীরননী,
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে॥
রানী দিল পুরি কর, খাইতে রঙ্গিমাধব
অতি সুশোভিত ভেল তায়।
খাইতে খাইতে নাচে, কটিতে কিঙ্কিণী বাজে,
হেরি হরষিত ভেল মায়॥
নন্দ দুলাল নাচে ভালি।
ছাড়িল মন্থনদণ্ড, উথলিল মহানন্দ,
সঘনে দেই করতালি॥
দেখো দেখো রোহিণী, গদ গদ কহে রানী,
যাদুয়া নাচিছে দেখো মোর।
ঘনরাম দাসে[১] কয় রোহিণী আনন্দময়
দুহুঁ ভেল প্রেমে বিভোর॥ পদ.

পূর্ণ উদ্ধৃতি 'সাহিত্যের স্বরূপ', সাহিত্যে চিত্রবিভাগ ১৩৪৮ বৈশাখ। ১৯৪১

নরোত্তম দাস

তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে⋯। পদ.

আংশিক উদ্ধৃতি হিয়ার মাঝারে থুই জুড়াব পরাণী
'ছন্দ', ছন্দের হসন্ত-হলন্ত : প্রথম পর্যায় (বর্জিত অংশ)[২] ১৩৩৮ পৌষ। ১৯৩১

---

১ 'পদরত্নাবলী'তে ভণিতা পাই বলরাম দাস।

নরোত্তম দাস পহুঁ নাগর কান,
রসিক কলাগুরু তুহুঁ সব জান।

আংশিক উদ্‌ধৃতি 'শব্দতত্ত্ব', পরিশিষ্ট : 'পহুঁ' ১২৯৯। ১৮৯২

যদুনাথ দাস

কে যাবে মথুরা দিকে যাব তার সনে পদ.

আংশিক উদ্‌ধৃতি কে যাবে মথুরা দিকে যাব তার সনে

'ছন্দ', ছন্দের হসন্ত হলন্ত : প্রথম পর্যায় (বর্জিত অংশ)[১] ১৩৩৮ পৌষ। ১৯৩১

যদুনন্দন দাস

কহ কহ সুন্দরী বাধে

আংশিক উদ্‌ধৃতি কেন তোবে আনমন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতিতল লেখি॥

'ছন্দ', ছন্দের অর্থ : প্রথম পর্যায় ১৩২৪ চৈত্র। ১৯১৮

অজ্ঞাতনামা কবি[২]

এসো বঁধু এসো আধ আঁচরে বসো পদ.

আংশিক উদ্‌ধৃতি এসো এসো বঁধু এসো, আঁধ আঁচরে বসো,
ন য়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

'আধুনিক সাহিত্য', আর্যগাথা ১৩০১ অগ্রহায়ণ। ১৮৯৪

আধ আঁচরে বসো।

'পথের সঞ্চয়', আমেরিকার চিঠি ১৩১৯ অগ্রহায়ণ। ১৯১২

মধ্যযুগের সাধক

মধ্যযুগের কবীর-দাদূ-বজ্জব -প্রমুখ সন্তদের বাণীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে বিশেষ পরিচয় ছিল, রবীন্দ্র-রচনাতেই তার প্রমাণ মেলে। তাঁর One hundred poems of Kabir নামক অনুবাদ গ্রন্থটি তার নিদর্শন। তবে কবি যে কিভাবে এই বাণীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, এগুলির জন্য তিনি কোনো আকর গ্রন্থ ব্যবহার করতেন কি না, তা জানা যায় নি। ১৯২৫ সালে ভারতীয় দার্শনিক সংঘের অভিভাষণে তাঁকে বলতে শোনা গেছে—'শৈশবে মনে পড়ে একজন ভক্ত হিন্দু গায়কের মুখে কবীরের এই গানটি শুনি'। সুতরাং সন্তদের কিছু বাণী যে এইভাবে লোকশ্রুতি থেকে সংগৃহীত, এ অনুমান করা চলে। এ ছাড়া ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর প্রবর্তনায় কবি যে বজ্জব -প্রমুখ একাধিক সন্তের বাণীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন, সে কথাও সুবিদিত।

এ স্থলে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রাপ্ত সন্তদের বাণীগুলি সমগ্রভাবে সংকলিত হল। তবে সমস্ত বাণীর মূল উৎস নির্ণয় করা যায় নি। যে বাণীগুলি ক্ষিতিমোহনের গ্রন্থে পাওয়া গেছে শুধু সেইগুলিরই উৎস উল্লিখিত হল। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় বঘেল-খণ্ডের কবি জ্ঞানদাসের কয়েকটি গানের যে ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদ করেছেন মূল গানের অভাবে এ স্থলে সেই অনুবাদগুলিই উদ্ধৃত করে দেওয়া হল।

কবীর

পানীমে মীন পিযাসী রে
মুকো শুনত শুনত লাগে হাঁসী রে।
পূরণ ব্রহ্ম সকল ঘট বরতে
ক্যা মথুরা ক্যা কাশী রে॥[১]

আংশিক উদ্ধৃতি ভারতীয় দার্শনিক সংঘের সভাপতির অভিভাষণ[২] ১৩৩২ মাঘ।

১৯২৬

পানীমে মীন পিযাসী
শুনত শুনত লাগে হাসি।

১ ক্ষিতিমোহন সেন-প্রণীত 'কবীর' ১ম খণ্ড, ৮১-সংখ্যক গান

২ প্রবন্ধটি Indian Philosophical Congress-এ পঠিত Philosophy of our people (1925 Dec.) ভাষণের প্রবাসীতে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ।

'শিক্ষা', শিক্ষার হেরফের ১২৯৯ পৌষ। ১৮৯২

আংশিক অনুবাদ Philosophy of our People 1925 December

যব হম রহল রহা নহি কোঈ,
হমরে মাহ রহল সব কোঈ।

আংশিক উদ্‌ধৃতি 'শান্তিনিকেতন' ২, জাগরণ ১৩১৭ মাঘ। ১৯১১

দাদূ

ভাই রে ঐসা পংথ হমারা,
দ্বৈপখরহিত পংথ গহি পূরা
অবরণ এক অধারা।
বাদ বিবাদ কাহূ সৌঁনাহীঁ
নাহি জগত থৈঁ ন্যারা॥[১]

আংশিক উদ্‌ধৃতি ভাই রে ঐসা···এক অধারা
'চারিত্রপূজা', ভারতপথিক রামমোহন রায়-১, ১৩৪০ পৌষ ১৪। ১৯৩৩

জাকৌঁ মারণ জাইয়ে সোঈ ফিরি মারৈ,
জাকৌঁ তারণ জাইয়ে সোঈ ফিরি তারৈ।[২]

—দাদূ, সাচ কৌ অঙ্গ ২৬

আংশিক উদ্‌ধৃতি 'চারিত্রপূজা', ভারতপথিক রামমোহন রায়-১, ১৩৪০ পৌষ ১৪। ১৯৩৩

আপা মেটৈ হরি ভজৈ তন মন তজৈ বিকার।
নিরবৈরী সব জীব সৌঁ দাদূ যহ মত সার॥···
সব হম দেখ্যা সোধি করি, দূজা নাঁহীঁ আন।
সব ঘট একৈ আতমা ক্যা হিন্দু মুসলমান॥···
দাদূ কৈ দূজা নহীঁ এক আতম রাম।
সত গুরু সির পরি সাধু সব প্রেম ভগতি বিশ্রাম॥[৩]

—দাদূ, দয়া নির্বৈরতা অঙ্গ ৫

১ ক্ষিতিমোহন সেন্ -প্রণীত 'দাদূ' ১৩৪২, মাধুকরী পৃ ৫৯৫
২ 'দাদূ' ১৩৪২, উপক্রমণিকা পৃ ৬৬; দাদূবাণী পৃ ২৭০ ও ২৭৮
৩ 'দাদূ' ১৩৪২, উপক্রমণিকা পৃ ১০৭; দাদূবাণী পৃ ২৪৯

আংশিক উদ্ধৃতি সব ঘট একৈ আত্মা, ক্যা হিন্দু মুসলমান

'চারিত্রপূজা', ভারতপথিক রামমোহন রায়-১, ১৩৪০ পৌষ ১৪। ১৯৩৩

রজ্জব

সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝূঠ।
জন রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ॥

আংশিক উদ্ধৃতি 'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩

হাথ জোড়্ গুরু সূঁ হৌঁ মিলৈ হিন্দু মুসলমান।
সাধন মাগি জোগ নহি জৈ, ক্যা সাধন পরমাণ॥

আংশিক উদ্ধৃতি 'চারিত্রপূজা', ভারতপথিক রামমোহন রায়-১, ১৩৪০ পৌষ ১৪। ১৯৩৩

বুংদ বুংদ মিলি রস সিংধ হৈ, জুদা জুদা মরু ভায়।

আংশিক উদ্ধৃতি 'চারিত্রপূজা', ভাবতপথিক রামমোহন রায়-১, ১৩৪০ পৌষ ১৪। ১৯৩৩

প্রেমদাস

বৃথা শোচ কুছ কাম না আওয়ে—
ভোগ বিনা নাহি মিট্‌না।

আংশিক উদ্ধৃতি 'চিঠিপত্র' ৬, পত্র-৩ জগদীশচন্দ্র বসুকে লেখা ১৩০৬ আষাঢ় ১০। ১৮৯৯ জুন ২৪

প্রেমদাস সুন্দর মূরখ হ্যায়
কহ না হ্যায়, নেহি কর না।

আংশিক উদ্ধৃতি 'স্মৃতি' (পৃ ৬৯), মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা পত্র ১৩১৪ ফাল্গুন ৮। ১৯০৮

জ্ঞানদাস বঘেলি

অসীম ক্ষুধায় অসীম তৃষায়,
বহ প্রভু অসীম ভাষায়—
(তাই দীননাথ) আমি ক্ষুধিত, আমি তৃষিত,
'তাই তো আমি দীন।

আংশিক অনুবাদ 'শান্তিনিকেতন' ২, আত্মবোধ ১৩১৭ ফাল্গুন। ১৯১১

Messenger, morning brought you, habited in gold.
After sunset, your song wore a tune of ascetic grey,
and then came night.
Your message was written in bright letters across
the black.
Why is such splendour about you, to lure the heart
of one who is nothing ?
Great is the festival hall where you are to be the
only guest.
Therefore the letter to you is written from sky to sky,
And I, the proud servant, bring the invitation with all
ceremony.
What hast thou come to beg from the beggar, O king
of kings ?
My kingdom is poor for want of him, my dear one, and
I wait for him in sorrow.
How long will you keep him waiting, O wretch,
who has waited for you for ages in silence and stillness ?
Open your gate, make this very moment fit for the
union.

পূর্ণ অনুবাদ 'Creative Unity' 1922, An Indian Folk Religion

I had travelled all day and was tired ; then I bowed my
head towards thy kingly court still far away.
The night deepened, a longing burned in my heart.
Whatever the words I sang, pain cried through them—
for even my songs thirsted—
O my Lover, my Beloved, my Best in all the
world.
When time seemed lost in darkness,

thy hand dropped its sceptre to take up the lute
and strike the uttermost chords ;
And my heart sang out,
O my Lover, my Beloved, my Best in all the world.
Ah, who is this whose arms enfold me ?
Whatever I have to leave, let me leave ; and
whatever I have to bear, let me bear.
Only let me walk with thee,
O my Lover, my Beloved, my Best in all the
world.
Descend at whiles from thy high audience hall,
come down amid joys and sorrows
Hide in all forms and delights, in love,
And in my heart sing thy songs,—
O my Lover, my Beloved, my Best in all the
world.

পূর্ণ অনুবাদ 'Creative Unity' 1922, An Indian Folk Religion

বাউল পদাবলী

রবীন্দ্রসাহিত্যে উদ্ধৃত বাউল গানগুলি এ স্থলে সংকলিত হল। রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত যে গানগুলি প্রবাসীর 'হারামণি' বিভাগে দেখা গেছে সেগুলি 'হারা'. শব্দে এবং কবি-সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য-পরিচয়' (১৩৪৫) গ্রন্থে যে গানগুলি সংকলিত আছে সেগুলি 'কা'. অক্ষরে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ছাড়া রবীন্দ্র-উদ্ধৃত যে গানগুলি ক্ষিতিমোহন সেনের গ্রন্থে পাওয়া যায় এ স্থলে সেগুলিও উল্লিখিত হল। সেই সঙ্গে রবীন্দ্ররচনায় উৎকলিত যে গানগুলি ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় -সম্পাদিত বঙ্গবীণা' গ্রন্থে (১৯৩৪) পাওয়া গেছে সেগুলি 'বঙ্গ'. শব্দে চিহ্নিত করা হল। লালন ফকিরের গানগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় -প্রকাশিত 'লালন-গীতিকা' গ্রন্থের ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। রবীন্দ্র-উদ্ধৃত কতকগুলি গান ক্ষিতিমোহন সেনের গ্রন্থে পাওয়া গেছে। কিন্তু তার রচয়িতার নাম পাওয়া যায় নি। এ স্থলে সেই গানগুলিকে 'অজ্ঞাত' নামে সংকলন করা হল।

লালন

আছে যার মনের মানুষ আপন মনে
সে কি আর জপে মালা।
নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা।
কাছে রয়, ডাকে তারে
উচ্চস্বরে
কোন্ পাগেলা,
ওরে যে যা বোঝে তাই সে বুঝে
থাকে ভোলা।
যেথা যার ব্যথা নেহার
সেইখা[illegible] হাত
ডলামলা,
তেমনি জেনো মনের মানুষ মনে তোলা।
যে জনা দেখে সে রূপ
করিয়া চুপ
রয় নিরালা।

ওরে লালন-ভেড়ের লোকদেখানো
মুখে হরি হরি বোলা ॥ ৭ হারা.[১]

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'ছন্দ', ছন্দের প্রকৃতি ১৩৪১ বৈশাখ। ১৯৩৪

কোথা আছে রে সেই দীন দরদী সাঁই··· ॥ ৬০ হারা.[২]

আংশিক উদ্‌ধৃতি চক্ষু আঁধার দিলের ধোঁকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়,
কী রঙ্গ সাঁই দেখছ সদাই
বসে নিগম ঠাঁই।
এখানে না দেখলেম তারে
চিনব তবে কেমন করে,
ভাগ্যেতে আখেরে তারে
চিনতে যদি পাই।

'ছন্দ', ছন্দের প্রকৃতি ১৩৪১ বৈশাখ। ১৯৩৪

খাঁচার ভিতর অচিন্ পাখি· · ॥ ২৯৯

আংশিক উদ্‌ধৃতি খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কম্‌নে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

'গোরা', অধ্যায় ১, ১৩১৪ ভাদ্র। ১৯০৭
'জীবনস্মৃতি' ১৯১২ জুলাই, গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ
ভারতীয় দার্শনিক সংঘের সভাপতির অভিভাষণ[৩] ১৩৩২ মাঘ। ১৯২৬

খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কমনে আসে যায়।

'শান্তিনিকেতন' ২, ছোটো ও বড়ো ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪

পরোক্ষ উল্লেখ 'শেষ সপ্তক' ১৯৩৫ মে, ১৩-সংখ্যক কবিতা

আংশিক অনুবাদ Philosophy of our People 1925 December

১, ২ 'হারামণি', প্রবাসী ১৩২২ আশ্বিন। ৭-সংখ্যক গানটির পাঠের সঙ্গে প্রবাসীর পাঠের প্রভেদ দেখা যায়। এ স্থলে 'ছন্দ' গ্রন্থের পাঠ উদ্‌ধৃত হল।

৩ প্রবন্ধটি Indian Philosophical Congress-এ পঠিত Philosophy of our People (1925 Dec.) ভাষণের প্রবাসীতে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ।

এমন মানব-জনম আর কি হবে।
যা কর মন ত্বরায কর
এই ভবে।
অনন্ত রূপ ছিষ্টি করেন সাঁই,
শুনি মানবের তুলনা কিছুই নাই।
দেবদেবতাগণ
করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে।…
এই মানুষে হবে মাধুর্যভজন
তাইতে মানুষ-রূপ গঠিল নিরঞ্জন।
এবার ঠকলে আর
না দেখি কিনার
লালন কয় কাতরভাবে ॥ ৪১৪ হারা.[১]

আংশিক উদ্‌ধৃতি 'ছন্দ', ছন্দের প্রকৃতি ১৩৪১ বৈশাখ। ১৯৩৪

পরোক্ষ উল্লেখ দেবদেবতাগণ…মানবে

'Creative Unity' 1922, An Indian Folk Religion

গগন

আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে।…
হারা.[২] বঙ্গ. ক্ষি.[৩] কা.

আংশিক অনুবাদ আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশবিদেশে বেড়াই ঘুরে।
লাগি সেই হৃদয়শশী
সদা প্রাণ রয় উদাসী,

১ 'হারামণি', প্রবাসী ১৩২২ পৌষ (পাঠ পরিবর্তিত)।

২ প্রথম প্রকাশ : 'হারামণি', প্রবাসী ১৩২২ বৈশাখ (পাঠ পরিবর্তিত)। এটি অসম্পূর্ণ থাকায় জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় গানটির পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশিত হয়।

৩ ক্ষিতিমোহন সেন -প্রণীত 'বাংলার সাধনা' ১৯৬৫, বাংলার বাউল পৃ ৫৫

পেলে মন হোত খুশী,
দেখতাম নয়ন ভরে ॥

'Creative Unity' 1922, An Indian Folk Religion

আংশিক উদ্ধৃতি আমি কোথায় পাব…ঘুরে

'সংগীতচিন্তা', পরিশিষ্ট ১ : বাউল-গান ১৩৩৪ চৈত্র। ১৯২৮

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩, অধ্যায় ১

'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যের তাৎপর্য ১৯৩৪ জুলাই

আমি কোথায় পাব…মানুষ যে রে

'শান্তিনিকেতন' ২, ছোটো ও বড়ো (চাব বার) ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪

'চিঠিপত্র' ৯, পত্র-২১ হেমন্তবালা দেবীকে লেখা ১৯৩১ জুন ২৩।

'সাহিত্যের পথে', সাহিত্যতত্ত্ব ১৩৪০ ভাদ্র। ১৯৩৩

পরোক্ষ উল্লেখ 'শেষ সপ্তক' ১৯৩৫, ৪৩-সংখ্যক কবিতা

আমার মনের মানুষ যেখানে
আমি কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে !

আংশিক উদ্ধৃতি 'শান্তিনিকেতন', ছোটো ও বড়ো (ভ্র বার) ১৩২০ মাঘ ১১। ১৯১৪

ক্ষেপা বলে ওবে আমার মন ··। হারা.[১]

আংশিক উদ্ধৃতি মনের মানুষ মনের মাঝে কর অন্বেষণ।
একবার দিব্য চক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সর্বঠাঁই।

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ৩

মনের মানুষ·· অন্বেষণ

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ১

মদন

নিঠুর গরজী,
তুই কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে ?

১ 'হারামণি' (ক্ষেপার গান), প্রবাসী ১৩২২ চৈত্র

তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি, সবুর বিহনে।
দেখ্-না আমার পরম গুরু সাঁই,
সে যুগ-যুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাড়াহুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড, তাই ভরসা দণ্ড—
এর আছে কোন্ উপায়।
কয় সে মদন, দিস নে বেদন, শোন্ নিবেদন
সেই শ্রীগুরুর মনে।
সহজধারা আপনহারা তাঁর বাণী শোনে,
রে গরজী॥ ক্ষি.[১] কা. বঙ্গ.

পূর্ণ উদ্ধৃতি ভারতীয় দার্শনিক সংঘের সভাপতির অভিভাষণ ১৩৩২ মাঘ। ১৯২৬
'রাশিয়ার চিঠি' ১৯৩১, উপসংহার

পূর্ণ অনুবাদ Philosophy of our People,[২] 1925 December

তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মস্‌জেদে··· । ক্ষি.[৩] কা.

আংশিক অনুবাদ তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মস্‌জেদে
তোমার ডাক শুনে সাঁই
চলতে না পাই
রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মোরশেদে।
'The Religion of Man' 1931, The Man of My Heart.

গঙ্গারাম

পরান আমার সোতের দীয়া··· । কা. বঙ্গ.

আংশিক উদ্ধৃতি পরান আমার স্রোতের দীয়া
(আমায় ভাসাইলা কোন্ ঘাটে)।
আগে আন্ধার পাছে আন্ধার, আন্ধার নিস্থইৎ-ঢালা।

---

১ 'ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা' ১৩৫৬, মিলিত সাধনা পৃ ৩১

২ এই ভাষণের যে অংশটুকু Spiritual Freedom নামে The Religion of Man গ্রন্থে সংকলিত তাতেও এই অনুবাদটি আছে।

৩ 'ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসাধনা' ১৩৫৬, মিলিত সাধনা পৃ ৩৩; 'বাংলার সাধনা'১৩৬৫, বাংলার বাউল পৃ ৫৬। বাংলা কাব্য-পরিচয়ের পাঠ ঈষৎ পরিবর্তিত।

আন্ধার মাঝে কেবল বাজে লহরেরি মালা।
তার তলেতে কেবল চলে নিস্থইৎ রাতের ধারা,
সাথের সাথি চলে বাতি, নাই গো কূলকিনারা।

'বাংলা ভাষা -পরিচয়' ১৯৩৮, অধ্যায় ১১

ধন্য আমি শূন্যকুম্ভ পূর্ণকুম্ভ নই।
তাইতে তোমার জলের খেলায়
তোমাব বুকের তলে রই গো সখি—
বুকের তলে রই।…
যারা তোমাব পূর্ণকুম্ভ, তাদেব রাখ গো তীরে,
কাজের লাগি লইয়া গো যাও, যখন যাও ঘরে ফিরে।
আমি নাচি তোমার সাথে আনন্দ-নীবে।
আমায় তুমি বাঁধ্‌লা প্রেমের বাহুতে ঘিবে।
(তাই) জল-তরঙ্গে (তোমার) বুক-তরঙ্গে
নাইচ্যা আকুল হই ॥ ক্ষি.[১]

পূর্ণ অনুবাদ 'Creative Unity' 1922, An Indian Folk Religion

বিশা ভুঁইমালী

হৃদয়-কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি
তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা উপায় কি করি।
ফুটে ফুটে ফুটে কমল, ফুটার না হয় শেষ
এই কমলের যে-এক মধু, রস যে তায় বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পারো না যে তাই,
তাই তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা, মুক্তি কোথাও নাই ॥ ক্ষি.[২]

কা. বঙ্গ.

পূর্ণ অনুবাদ Philosophy of our People 1925 December

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি ভারতীয় দার্শনিক সংঘের সভাপতির অভিভাষণ ১৩৩২ মাঘ। ১৯২৬

১ 'বাংলার সাধনা' ১৩৬৫, বাংলার বাউল পৃ ৫৯; 'ভারতেব হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা' ১৩৫৬, মিলিত সাধনা পৃ ৩২

২ 'বাংলার সাধনা', বাংলার বাউল পৃ ৫৮

জগা কৈবর্ত

অচিন ডাকে নদীর বাঁকে
ডাক যে শোনা যায়।
অকূল পাড়ি থামতে নারি,
সদাই ধারা ধায়।
ধারার টানে তরী চলে,
ডাকের চোটে মন যে টলে,
টানাটানি ঘুচাও জগার
হল বিষম দায়॥ কা.

পূর্ণ উদ্‌ধৃতি 'ছন্দ', বাংলা প্রাকৃত ছন্দ : তৃতীয় পর্যায়[১] ১৩৪৫ কার্তিক। ১৯৩৮

অজ্ঞাত

আজি আমার সঙ্গে তোমার হোরি
ওগো রসরায়।
আমার একলা দায় নহে গো,
রয়েছে যে তোমারো দায়।
তোমার সুখের চাইতো হাসি
তোমার ফুঁকের চাইতো বাঁশি
আমার অঙ্গে তোমার বিলাস,
তাই ধরতে যে হয় আমারো পায়॥ ক্ষি.[২]

পূর্ণ অনুবাদ 'Creative Unity' 1922, An Indian Folk Religion

যদি আমায় ছাড়া ওগো রসিক
তোমার প্রেমের লীলা চলে,
তবে এখান থেকেই দাওগো বিদায়,
আমি বস্‌ব না তা বলে।
হাটের ধূলার মাঠের তাপে
আমি চলতে যে আর নারি।

১ 'বাংলা ভাষা-পরিচয়' ১৯৩৮, অধ্যায় ১১।

২ 'বাংলার সাধনা', ১৯৬৫, বাংলার বাউল পৃ ৫৮

তুমি প্রেমের দায়ে লবে খুঁজে,
জানি হৃদ্‌বিহারী,
তাই বসলেম এবার পথে ॥ ক্ষি.[১]

পূর্ণ অনুবাদ 'Creative Unity' 1922, An Indian Folk Religion.

আংশিক উদ্‌ধৃতি প্রেম আমার পরশমণি
তারে ছুঁইলে যে কাম হয় রে সেবা। ক্ষি.[২]
'The Religion of Man' 1931, The Man of my Heart

আংশিক উদ্‌ধৃতি মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন ;
শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম ;
আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম।
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশ্‌বয় বদবয় ॥ ক্ষি.[৩]
ভারতীয় দার্শনিক সংঘের সভাপতির অভিভাষণ ১৩৩২ মাঘ। ১৯২৬

আংশিক উদ্‌ধৃতি রূপ দেখিলাম রে
নয়নে আপনার রূপ দেখিলাম রে।
আমার মাঝত বাহির হইয়া
দেখা দিল আমারে ॥ ক্ষি.[৪]
ভারতীয় দার্শনিক সংঘের সভাপতির অভিভাষণ ১৩৩২ মাঘ। ১৯২৬
আংশিক অনুবাদ Philosophy of our People 1925 December.

আংশিক উদ্‌ধৃতি ফুলের বনে কে ঢুকেছে রে সোনার জহরি
নিকষে ঘসয়ে কমল আ মরি মরি।
ভারতীয় দার্শনিক সংঘের সভাপতির অভিভাষণ ১৩৩২ মাঘ। ১৯২৬
আংশিক অনুবাদ Philosophy of our People 1925 December.

১ 'বাংলার সাধনা', ১৯৬৫, বাংলার বাউল পৃ ৫৮

২ 'বাংলার সাধনা', বাংলার বাউল পৃ ৫৬

৩, ৪ 'বাংলার সাধনা', বাংলাদেশের প্রাকৃত মানবতাধর্ম, পৃ ৩২

আংশিক উদ্ধৃতি তোরই ভিতর অতল সাগর

'মানুষের ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায় ২, ৩

মন .র তুই আমাব মনে মিশবি যদি আয়… ।[১]

আংশিক উদ্ধৃতি মন বে আমার মনেব সাথে মিলবি যদি আয়

তুই মনেতে এক হয়ে আজব সহব চলে যাই।

ভারতীয় দার্শনিক সংঘের সভাপতিব অভিভাষণ ১৩৩২ মাঘ। ১৯২৬

আংশিক উদ্ধৃতি জীবে জীবে চাইয়া দেখি সবই যে শাব অবতার

ও তুই নূতন লীলা কী দেখাবি যাব নিত্য লীলা চমৎকাব।

'মানুষেব ধর্ম' ১৯৩৩ মে, অধ্যায ৩

---

১ দ্রষ্টব্য অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-প্রণীত 'বাংলাব বাউল ও বাউল গান' ১৩৬৪, দ্বিতীয় খণ্ড. ৪৭৪ সংখ্যক গান, পৃ ৩৯৮। এই গানটির উৎস সম্বন্ধে লেখক বলেছেন— বর্ধমান জেলার বেতালবন গ্রামের বাউল সমাবেশ হইতে বিশেষ ভাবে সংগৃহীত'। রবীন্দ্রনাথ গানটি কিভাবে সংগ্রহ করেছিলেন জানি না। রবীন্দ্রধৃত পাঠটিও সামান্য পৃথক্।

রবীন্দ্র-ব্যবহৃত শ্লোকের বর্ণানুক্রমিক সূচি

উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে রবীন্দ্র-ব্যবহৃত যেসব সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত শ্লোক সংকলিত আছে এ স্থলে তার একটি বর্ণানুক্রমিক সূচি দেওয়া হল। রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র সব শ্লোকের পূর্ণ রূপ ব্যবহার করেন নি, প্রয়োজনমতো শ্লোকের আদি, মধ্য বা অন্ত ভাগ থেকে যে-কোনো খণ্ডাংশ ব্যবহার করেছেন। পাঠকের সুবিধার প্রতি লক্ষ রেখে রবীন্দ্র-ব্যবহৃত পূর্ণ শ্লোকের আদি এবং খণ্ড শ্লোকের যে অংশ কবি ব্যবহার করেছেন সেই অংশের আদিটুকু এই তালিকায় গৃহীত হয়েছে। যে শ্লোকের আদি অংশ কবি ব্যবহার করেন নি অর্থাৎ যে শ্লোকখণ্ডগুলি শ্লোকের মধ্য বা অন্ত ভাগ থেকে নেওয়া সেইগুলিকে এ স্থলে তারকাচিহ্নিত করে দেওয়া হল। বলা বাহুল্য, উপাদান-সংগ্রহ বিভাগে সমস্ত শ্লোকেরই পূর্ণ রূপ পাওয়া যাবে।

এই তালিকায় শুধুমাত্র শ্লোকের পূর্ণ বা আংশিক উদ্ধৃতিগুলিকেই স্থান দেওয়া হয়েছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ অথবা অনুবাদগুলিকে নয়। এ ছাড়া বৈষ্ণবপদাবলী, মধ্যযুগের সাধকদের হিন্দী দোঁহা বা বাউল পদাবলীও এই তালিকায় স্থান পায় নি। সেগুলি পাঠকের পক্ষে যথাসম্ভব সহজ-ব্যবহার্য করে উপাদান সংগ্রহ বিভাগে একত্রে সংকলিত আছে।

উৎস-নির্দেশ

এই গ্রন্থরচনায় যেসব প্রামাণ্য পুস্তক ও প্রবন্ধ থেকে উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে, উৎস-নির্দেশে তার একটি তালিকা দেওয়া গেল। এই তালিকাটি 'রবীন্দ্র-ব্যবহৃত ও রবীন্দ্র-সম্পাদিত গ্রন্থ' এবং 'বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত বিবিধ গ্রন্থ' এই দুই ভাগে বিন্যস্ত হয়েছে। এই গ্রন্থে প্রয়োজনমতো আমার পূর্বরচিত কয়েকটি প্রবন্ধের সহায়তা নিয়েছি সেগুলিও এই উৎস-নির্দেশে উল্লিখিত হল।

এই তালিকায় উল্লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে বলতে হয় পাঠভেদ, মুদ্রণ-প্রমাদ ইত্যাদি বিবিধ কারণে অনেক ক্ষেত্রে একই গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ ব্যবহার করতে হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে যে সংস্করণগুলি ব্যবহৃত হয়েছে এই তালিকায় শুধুমাত্র সেই সেই সংস্করণ উল্লিখিত হল। তবে কয়েকটি গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন রামায়ণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আদি কাণ্ডের অন্তর্গত কয়েকটি শ্লোক সব সংস্করণে পাওয়া যায় না। সে স্থলে আদি কাণ্ডের জন্য যদুনাথ ন্যায়পঞ্চাননের সংস্করণ এবং অন্যান্য কাণ্ডের জন্য নির্ণয়সাগর প্রেসের সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছে। তেমনি মহাভারতের প্রসঙ্গে সর্বত্র হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের সংস্করণ ব্যবহৃত হলেও শান্তিপর্ব ও অনুশাসন পর্বের শ্লোক বর্ধমান রাজসংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছে। কারণ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে সিদ্ধান্তবাগীশ-সম্পাদিত ওই দুই পর্ব পাওয়া যায় নি।

রবীন্দ্র-ব্যবহৃত ও রবীন্দ্র-সম্পাদিত গ্রন্থ

ক. সংস্কৃত

উপনিষৎ-সংগ্রহ : বিধুশেখর ভট্টাচার্য-সংকলিত এবং সরল সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ-সংবলিত। প্রথম খণ্ড : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত ১৩১৭ বৈশাখ, দ্বিতীয় খণ্ড[1] ১৩১৮ আশ্বিন।

কাদম্বরী-কথা : পূর্বভাগ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন-রচিত টীকা ও সুসংগত পাঠান্তর-সমন্বিত। গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে হরিশচন্দ্র কবিরত্ন-প্রকাশিত, ১৮৮৫।

কাব্যসংগ্রহঃ : অর্থাৎ কালিদাসাদি মহাকবিগণ-বিরচিত ত্রিপঞ্চাশৎ উত্তমসম্পূর্ণ কাব্য-সংকলন। শ্রী ডাক্তর যোহন হেবরলিন কর্তৃক সমাহৃত ও শ্রীরাম-পুরীয় চন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত ১৮৪৭।

---

১ এই খণ্ডে সম্পাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাম নেই।

নবরত্নমালা বা শাস্ত্রীয় প্রবচন : কাব্য ও বিবিধ কবিতা এবং মহারাষ্ট্রীয় ভক্তকবি তুকারামের জীবনী ও অভঙ্গ-সংগ্রহ। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সংকলিত ও ইন্দিরা দেবী-প্রকাশিত। উইক্‌লী নোট্‌স্‌ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা ১৩৩১।

ব্রাহ্মধর্মঃ : প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সংকলিত ও সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী-সম্পাদিত, ব্রাহ্মমিশন প্রেস ১৯৩৭।

খ. পালি ও প্রাকৃত

রত্নমালা : গুণালংকার মহাস্থবির ও সমণ পুণ্ণানন্দ সামী-সংকলিত, কলিকাতা ১৯২৪ জুলাই।

হৃস্তসার বা বৌদ্ধ মহাপবিত্রাণ . প্রথম খণ্ড, পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া-প্রণীত ও প্রকাশিত, কলিকাতা ১৮৯৩।

প্রাকৃত-পৈঙ্গলম্‌ : ভোলাশংকর ব্যাস-সম্পাদিত, প্রাকৃত টেকস্ট সিরিজ-১, প্রাকৃত গ্রন্থ-পরিষদ্‌, বারাণসী ১৯৫৭।

গ. বাংলা

গোবিন্দদাস-কৃত পদাবলী . (অনেকগুলি পদকর্তার নাম গোবিন্দদাস , সকলেরই পদ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে)। অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত। চুঁচুড়া সাধারণী যন্ত্রে নন্দলাল বসু কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৮৫।

চণ্ডীদাস-কৃত পদাবলী, . অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত, চুঁচুড়া, সাধারণী যন্ত্রে নন্দলাল বসু কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮৫।

পদরত্নাবলী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, সুরেশচন্দ্র মজুমদার -প্রকাশিত আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত ১২৯২।

বঙ্গবীণা . ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত ‘পরিচয়’ সংবলিত, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ ১৯৩৭।

বাংলা কাব্য-পরিচয় . রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা-১, কলিকাতা ১৩৪৫।

ঘ. ইংরেজি

The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal by Rajendralal Mitra, Baptist Mission Press, Asiatic Society of Bengal, 1882.

বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত বিবিধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

ক. সংস্কৃত

অথর্ববেদ-সংহিতা : শ্রীপাদশর্মা-সম্পাদিত, বসন্ত-শ্রীপাদ-সাতবলেকর-প্রকাশিত, ভারত মুদ্রণালয় ১৯৫৮।

অথর্ববেদ-সংহিতা : ১ম-৫ম খণ্ড, দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত, ধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, হাওড়া ১৩৩২।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ : হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, হেমচন্দ্র তর্কবাগীশ -প্রকাশিত, সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়, তৃতীয় সংস্করণ ১৮৮৩ শক।

ঈশাদিবিংশোত্তরশতোপনিষৎ : নারায়ণরাম আচার্য-সম্পাদিত, নির্ণয়সাগর প্রেস, বম্বে ১৯৪৮।

উত্তররামচরিতম্ : আর. ডি কারমারকর-সম্পাদিত, ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পুণা ১৯১৪।

উপনিষদ্ : ঈশা-কেন কঠ-মুণ্ডক মাণ্ডুক্য-তৈত্তিরীয়-ঐতরেয়-প্রশ্ন-শ্বেতাশ্বতর, ('The Ten Upanisads') সীতানাথ তত্ত্বভূষণ-সম্পাদিত, ব্রাহ্মমিশন প্রেস ১৯২৫।

ঊনবিংশ সংহিতা : পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত ও ন্টবিহারী রায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১০।

ঋগ্বেদ-সংহিতা : ১ম-৮ম অষ্টক, রমেশচন্দ্র দত্ত-সম্পাদিত ও প্রকাশিত, স্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত, কলিকাতা ১২৯২।

ঋতু-সংহার : রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত ('কালিদাসের গ্রন্থাবলী' : প্রথম ভাগ), বসুমতী সাহিত্য-মন্দির।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ : তৃতীয় খণ্ড, সত্যব্রত সামশ্রমী -সম্পাদিত, বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল ১৮৯৬।

কথাসরিৎসাগর : পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ ও কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্ পরব-সম্পাদিত, নির্ণয়সাগর প্রেস, বম্বে ১৯০৩।

কামসূত্র : পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ-সম্পাদিত ও যশোধর-কৃত 'জয়মঙ্গল' ব্যাখ্যা- সংবলিত, নির্ণয়সাগর প্রেস, বম্বে ১৮৯১।

কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ : ১ম ও ২য় সর্গ, পণ্ডিত গোপালদত্ত ত্রিপাঠী -সম্পাদিত ও -প্রকাশিত, ১৯৩৬।

কুমারসম্ভবম্ : ১ম-৫ম সর্গ, গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, সংস্কৃত বুক ডিপো ১৯৫৫।

কুমারসম্ভবম্ : ৬ষ্ঠ-৭ম সর্গ, রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত ('কালিদাসের গ্রন্থাবলী' : দ্বিতীয় ভাগ), বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির ১৩৩৬।

কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা : শ্রীপাদশর্মা-সম্পাদিত, বসন্ত শ্রীপাদসাতবলেকর -প্রকাশিত, ভারত মুদ্রণালয় ১৯৫৮।

গরুড় পুরাণম্ : পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, নটবর চক্রবর্তী-প্রকাশিত, ১৩১৪।

গীতা ('শ্রীমদভগবদ্গীতা') : স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত ও স্বামী জগদীশ্বরানন্দ -অনূদিত, উদ্‌বোধন কার্যালয়, কলিকাতা ১৩৭৫ ফাল্গুন।

গীতাপদার্থকোষ : মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, নবজীবন প্রকাশন মন্দির, অমদাবাদ ১৯৩৬।

চাণক্য-নীতি টেক্সট ট্রাডিশন : ১ম খণ্ড, Ludwik Sternbach-সম্পাদিত, বিশ্বেশ্বরানন্দ ভেডিক রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট ১৯৬৩।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ : মহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন ও সীতানাথ তত্ত্বভূষণ-সম্পাদিত, ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ১৯২৫-২৬।

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ : দুর্গামোহন ভট্টাচার্য -সম্পাদিত, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ রিসার্চ সিরিজ ১, ১৯৫৮।

তৈত্তিরীয়ারণ্যক : ১ম খণ্ড, এ. মহাদেব শাস্ত্রী এবং কে. রঙ্গচারিআ-সম্পাদিত, গভর্নমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী সিরিজ-২৬, বিবলিওথেকা স্যান্‌স্ক্রিটা ১৯০০।

দেবীপুরাণম্ : পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, সুটবিহারী রায়-মুদ্রিত ও-প্রকাশিত ১৩১১।

নলচম্পূ বা দময়ন্তীকথা : নন্দকিশোর শর্মা -সম্পাদিত (নারায়ণ শাস্ত্রী খিস্তের তত্ত্বাবধানে), চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বারাণসী ১৯৩২।

পঞ্চতন্ত্রকম্ : কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্ পরব ও বাসুদেব লক্ষ্মণশাস্ত্রী পংশীকর-সম্পাদিত, নির্ণয়সাগর প্রেস ১৯১৪।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ : মহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন ও সীতানাথ তত্ত্বভূষণ-সম্পাদিত, ব্রাহ্মমিশন প্রেস ১৯২৮।

ব্রাহ্মধর্ম প্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ : ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত, ৫ম সংস্করণ ১৯০৪।

ভামিনীবিলাসম্ : যদুনাথ তর্করত্ন-সম্পাদিত, সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত, কলিকাতা ১৮৬২।

মনুসংহিতা : পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, মুটবিহারী রায় -প্রকাশিত, বঙ্গবাসী ষ্টীম মেসিন প্রেস, কলিকাতা ১৩১০।

মহানির্বাণতন্ত্র . পঞ্চানন তর্করত্ন -সম্পাদিত, মুটবিহারী রায় -প্রকাশিত, কলিকাতা ১৩৩৩।

মহাভারতম্ : হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ -সম্পাদিত ও -প্রকাশিত, সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়, আদিপর্ব ১৩৩৬, বনপর্ব ১৩৪০, উদ্যোগপর্ব ১৩৪২।

মহাভারতম্ : বর্ধমানরাজ মহতাবচন্দ্রের ব্যয়ে বর্ধমান অধিরাজ যন্ত্রে মুদ্রিত, শান্তিপর্ব ও অনুশাসন পর্ব ১৭৯৯ শক।

মালতীমাধবম্ : রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর সম্পাদিত, গভর্নমেণ্ট সেণ্ট্রাল বুক ডিপো, বম্বে ১৯০৫।

মেঘদূত : প্যারীমোহন সেনগুপ্ত-অনূদিত, প্রবোধচন্দ্র সেন -সংশোধিত ও -সম্পাদিত, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ১৩৩৭।

যোগবাশিষ্ঠ : প্রথম ভাগ, বাসুদেব শর্মা সম্পাদিত, নির্ণয়সাগর প্রেস, বম্বে ১৯১৮।

রঘুবংশম্ : রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত ('কালিদাসের গ্রন্থাবলী' : প্রথম ভাগ), বসুমতী সাহিত্য মন্দির ১৩৭২।

রামায়ণম্ : কাশীনাথ শর্মা-সম্পাদিত, নির্ণয়সাগর প্রেস, বম্বে ১৯১০।

'বাল্মীকীয়ং রামায়ণং' : আদিকাণ্ড, যদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন -সম্পাদিত ও -অনূদিত, বটতলা, বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত ১৯২০।

শার্ঙ্গধর পদ্ধতি : ডঃ পীটর্ পীটরসন্ সম্পাদিত, বম্বে ১৮৮৮।

শিশুপালবধম্ : পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ-সম্পাদিত, নির্ণয়সাগর প্রেস ১৯৫৭।

শ্লোকসংগ্রহঃ : সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত, নববিধান পাবলিকেশন কমিটি, ১৯৫৬।

সর্বদর্শনসংগ্রহঃ : বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর-সম্পাদিত, ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, গভর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল (হিন্দু) সিরিজ-১, ১৯২৪।

সাহিত্যদর্পণ : হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত ও হেমচন্দ্র তর্কবাগীশ-প্রকাশিত, ৫ম সংস্করণ ১৮৭৫ শক।

সুভাষিত ত্রিশতী (ভর্তৃহরি) : দামোদর ধর্মানন্দ কৌসাম্বী ও নারায়ণরাম আচার্য -সম্পাদিত, নির্ণয়সাগর প্রেস ১৯৫৭।

সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারম্ : নারায়ণরাম আচার্য-সম্পাদিত, নির্ণয়সাগর প্রেস, বম্বে ১৯৫২

সুভাষিতাবলী (বল্লভদেব) : ডঃ পীটর্ পীটর্‌সন্ ও পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ -সম্পাদিত,

পুরবর্তিরাজকীয়গ্রন্থশালাধিকারী প্রকাশিত, এডুকেশন সোসাইটি যন্ত্রে মুদ্রিত ১৮৮৬।

হিতোপদেশ : তারাকুমার কবিরত্ন-সম্পাদিত, জে. এন. ব্যানর্জি এণ্ড্ সন্ প্রকাশিত ১২৪৫।

খ. পালি-প্রাকৃত

ধম্মপদ : ধর্মাধার মহাস্থবির, বুদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা ১৯৫৪।

ধম্মপদং : শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ও ভিক্ষু অনোমদর্শী -সম্পাদিত, প্রজ্ঞালোক প্রকাশনী ১৯৫৩।

ললিত-বিস্তর : Dr. S. Lefmann সম্পাদিত, Verlag Der Buchhandlung Des Waisenhauses, 1902.

সুত্তনিপাত : ভিক্ষু শীলভদ্র-অনূদিত, মহাবোধি সোসাইটি ১৩৪৮।

সুত্তন্ত পিটকে খুদ্দক নিকায়স্‌স খুদ্দকো পাঠো : শ্রীমৎ ধর্মতিলক স্থবির সংকলিত, ত্রিপিটক গ্রন্থমালা ২, ১৯৩২।

গ. বাংলা

গ্রন্থ

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত : প্রথম খণ্ড, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর-অনূদিত, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থমালা-২, ১৩৩১।

আত্মচরিত : রাজনারায়ণ বসু, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী ১৯৫২।

আত্মচরিত : শিবনাথ শাস্ত্রী, সিগ্‌নেট প্রেস ১৩৫৯।

আত্মজীবনী : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী-সম্পাদিত ১৯৬২।

আনন্দসংগীত : খ্রীষ্টীয় গীতাবলী, Christian tract and Book Society, Baptist Mission Press 1939.

আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাইপ্রবাস : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ভূমিকা ১৯১৫ আগস্ট।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী : বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির (তারিখ অনুল্লিখিত)।

উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস : শশিভূষণ দাশগুপ্ত, এ. মুখার্জী এণ্ড কোং

উপমা কালিদাসস্য : শশিভূষণ দাশগুপ্ত, সাহিত্যজগৎ ১৩৬৩ আশ্বিন।

ঋগ্‌বেদ সংহিতা : রমেশচন্দ্র দত্ত, জ্ঞানভারতী ১৯৬৩।
কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন ১৩৫৭।
কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ : নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী ১৯৫৮।
কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ : বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, জিজ্ঞাসা
কাব্যকৌতুক, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য : প্রগ্রেসিভ পাব্‌লিশার্স ১৩৬৩।
গীতাপাঠ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ ১৩২২।
চরিত-কথা : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ ১৩৬৫ বৈশাখ।
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি : বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিশির পাবলিশিং হাউস ১৩২৬ ফাল্গুন।
তীর্থ-সলিল : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী ১৩১৫।
তীর্থংকর : দিলীপকুমার রায়, কালচার পাব্‌লিশার্স ১৩৫১।
ত্রয়ী : শশিভূষণ দাশগুপ্ত, মিত্রালয় ১৩৬৪।
দাদূ : ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ১৩৪২ বৈশাখ।
দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী : বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ্‌ ১৩৫৩।
ধম্মপদ-পরিচয় . প্রবোধচন্দ্র সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ১৩৮০ শ্রাবণ।
ধর্মবিজয়ী অশোক : প্রবোধচন্দ্র সেন, পূর্বাশা লিমিটেড ১৩৫৪।
পৌরাণিক অভিধান : সুধীরচন্দ্র সরকার, এম. সি সরকার এ্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ,
প্রবন্ধ সংকলন : রমেশচন্দ্র দত্ত, নিখিল সেন সম্পাদিত, এভারেষ্ট বুক হাউস, ১৩৫৯।
প্রবন্ধ সংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, প্রমথ চৌধুরী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ১৯৫৭ আগস্ট।
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার : ১ম ও ২য় খণ্ড, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, ডি এম. লাইব্রেরী
বঙ্কিম-রচনাবলী : প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য-সংসদ
বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ ১৩৬৪ চৈত্র।
বাংলাদেশের ইতিহাস : দ্বিতীয় খণ্ড, রমেশচন্দ্র মজুমদার
বাংলার বাউল ও বাউল গান : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী ১৯৫৭।
বাংলার লোকসাহিত্য : আশুতোষ ভট্টাচার্য, ক্যালকাটা বুক হাউস ১৯৫৭।
বাংলার সাধনা : ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, বিশ্বভারতী, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-৪২,
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : তৃতীয় খণ্ড, সুকুমার সেন, ইস্টার্ন পাব্‌লিশার্স

বিদ্যাসাগর-রচনাবলী : দ্বিতীয় খণ্ড, দেবকুমার বসু সম্পাদিত, মণ্ডল বুক হাউস

বুদ্ধ-প্রসঙ্গ মহেশচন্দ্র ঘোষ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-১১৯, ১৩৬৩ জ্যৈষ্ঠ।

বৌদ্ধধর্ম : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ চৌধুরী -প্রকাশিত, উইক্‌লী নোট্‌স্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস কলিকাতা ১৩৩০।

বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য . প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চি, ভারতীভবন (তারিখ অনুল্লিখিত)।

ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ প্রবোধচন্দ্র সেন, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড,

ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী ১৯৩০।

ভারতে হিন্দুমুসলমানের যুক্ত-সাধনা ক্ষিতিমোহন সেন, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, বিশ্ব-বিদ্যাসংগ্রহ, ১৩৫৬ চৈত্র।

রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ড, বিমানবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত, বিশ্বভারতী

রবীন্দ্র গ্রন্থ পরিচয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী-৮৯, সাহিত্য-নিকেতন ১৯৪২

রবীন্দ্র জীবনী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, প্রথম খণ্ড ১৩৬৭ পৌষ, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৬৮ আশ্বিন, তৃতীয় খণ্ড ১৩৬৮ অগ্রহায়ণ, চতুর্থ খণ্ড ১৩৭১ অগ্রহায়ণ।

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, সাহিত্য-সংসদ

রবীন্দ্র-বীক্ষা নীলরতন সেন-সম্পাদিত, এশিয়া পাব্‌লিশিং কোম্পানী

রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান বিমানবিহারী মজুমদার, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড

রবীন্দ্র-সংগীত . শান্তিদেব ঘোষ, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র পরিচয় গ্রন্থমালা ১৩৫৬।

রবি-প্রদক্ষিণ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, বসুধারা প্রকাশনী

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ শিবনাথ শাস্ত্রী, নিউ এজ পাব্‌লিশার্স ১৩৬২।

রামায়ণ ও ভারতসংস্কৃতি প্রবোধচন্দ্র সেন, জিজ্ঞাসা

লালন গীতিকা : মতিলাল দাশ ও পীযূষকান্তি মহাপাত্র-সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ব-বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৮।

শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা . সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অনূদিত, ইন্দিরা দেবী-প্রকাশিত, ১৩৩০।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

প্রথম খণ্ড : কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৩৬৪, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬৬, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৩৫২, রামমোহন রায় ১৩৫০।

দ্বিতীয় খণ্ড : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৩৫০, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৫০।

তৃতীয় খণ্ড : রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৩৬৮, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৩৬৩, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (যোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত) ১৩৬৪।

চতুর্থ খণ্ড : রাজনারায়ণ বসু (যোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত) ১৩৬২।

পঞ্চম খণ্ড : রমেশচন্দ্র দত্ত ১৩৫৪।

ষষ্ঠ খণ্ড : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৬৫, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৫৪, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৬২, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৩৫৫, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৬২, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (যোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত) ১৩৬২।

সপ্তম খণ্ড : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩৫৬।

স্মৃতি : মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র-সংকলন, ১৩৪৮ শ্রাবণ।

স্বপ্নপ্রয়াণ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জিজ্ঞাসা ১৯৬৪।

প্রবন্ধ

আমাদের গৃহে অন্তঃপুরে শিক্ষা ও তাহার সংস্কার : স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রদীপ ১৩০৬ ভাদ্র।

কোরাণের উপদেশ সংগ্রহ : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শক ১৭৯৪ ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও চৈত্র।

কংফুচের জীবনচরিত : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শক ১৭৯৪ মাঘ।

গীতাবিচার : প্রবোধচন্দ্র সেন, দেশ ১৩৫৯।

'নিষ্কামকর্ম'-তত্ত্বের রবীন্দ্র-ভাষ্য : পম্পা ঘোষ (মজুমদার), ভারতবর্ষ ১৩৭৩ বৈশাখ।

পঙ্কজ : ভবতোষ দত্ত, জগজ্জ্যোতি ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৯৫৩ আশ্বিনী পূর্ণিমা।

পত্রাবলী : ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা শক ১৮৮০ বৈশাখ-আষাঢ়।

পত্রালাপ : অমিয়কুমার চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, প্রবাসী ১৩৪৭ আষাঢ়।

পারসীক ধর্ম : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শক ১৭৯৪ কার্তিক।

'বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত রচনা' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রদীপ ১৩০৬ আশ্বিন-কার্তিক (চিঠিপত্র, পুলিনবিহারী সেন, বিশ্বভারতী পত্রিকা ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা)

বাসুদেব কৃষ্ণ ও ভগবদ্‌গীতা : প্রবোধচন্দ্র সেন, পূর্বাশা ১৩৫৩ বৈশাখ।

ভগবদ্‌গীতা বিষয়ে বক্তৃতা : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শক ১৭৯৮ চৈত্র, ১৭৯৯ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।

ভগবদ্‌গীতা হইতে শ্লোকসংগ্রহ : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শক ১৭৯৭ মাঘ, ১৭৯৮ পৌষ ও মাঘ, ১৭৯৯ অগ্রহায়ণ।

ভোরের পাখি . প্রবোধচন্দ্র সেন, শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ

ভোরের পাখি : দ্বিতীয় পর্যায় (প্রকৃতির খেদ), প্রবোধচন্দ্র সেন, বিশ্বভারতী পত্রিকা

মহাভারত ও রবীন্দ্রনাথ . যূথিকা ঘোষ, রবীন্দ্র-শতায়ন (বেথুন বিদ্যায়তন স্মারক গ্রন্থ)।

মহাভারতপ্রসঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ দেবীপদ ভট্টাচার্য, সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ১৩৬৬ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা (রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা)

রবীন্দ্রচেতনায় গীতার রূপ . সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতবর্ষ

রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব পদাবলী পম্পা ঘোষ (মজুমদার), ভারতবর্ষ

রবীন্দ্রনাথ ও ভারত-সংস্কৃতি পম্পা ঘোষ (মজুমদার), পূর্বাশা

রবীন্দ্রনাথের বেদমন্ত্রানুবাদ ক্ষিতিমোহন সেন, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ শ্রাবণ-কার্তিক।

রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতপ্রীতি . চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, বসুধারা

রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি শব্দের বঙ্গানুবাদ বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ১৩৬৬ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা (রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা)।

রবীন্দ্র-ভাবনায় নারায়ণ · প্রবোধচন্দ্র সেন, বিশ্বভারতী পত্রিকা

রবীন্দ্র-ভাবনায় বিশ্বশক্তির মাতৃরূপ প্রবোধচন্দ্র সেন, সম্মেলনী

রবীন্দ্ররচনায় সংস্কৃত ছন্দ : পম্পা ঘোষ (মজুমদার), চতুষ্কোণ

সংস্কৃত শ্লোকদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ . হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী ১৩৪৮ ফাল্গুন।

শাক্যসিংহের জীবনচরিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শক ১৭৯৪ কার্তিক।

হারামণি, প্রবাসী ১৩২২ আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ।

ঘ. ইংরেজি

A Concordance to the Principal Upanisads and Bhagavadgita by Colonel G. A. Jacob, ভারতীয়বিশাসনসংরক্ষকতায়াং প্রকাশিতম্

A History of Indian Literature vol. I, by M. Winternitz, University of Calcutta 1927.

A History of Sanskrit Literature by A. B. Keith. Oxford University Press 1956.

A History of Sanskrit Literature by A. A. Macdonell, 'Short Histories of the Literatures of the World' series, vol. IX, 1913.

A Vedic Concordance by Maurice Bloomfield Harvard Oriental series, vol. X, 1906.

Alberuni's India by Edward C. Sachau, Trubner's Oriental series, 1914.

An Artist in Life by Niharranjan Roy,

Complete Works of Swami Vivekananda vol. I, Advaita Ashram

India's Past by A. A. Macdonell, Oxford University Press 1927.

Oxford History of India by V. A. Smith 1920.

The Discovery of India by Jawaharlal Nehru, Signet Press 1947.

The History of Bengal vol. 1, By Ramesh Chandra Majumder, 1943,

The Sanskrit Drama by A B. Keith, Oxford Clarendon Press, 1924.

নির্দেশিকা

এই নির্দেশিকায় গ্রন্থোক্ত সর্ববিধ নাম সংকলনের চেষ্টা করা গেল। 'নাম' কথাটি এখানে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছি। এ ক্ষেত্রে সীমানির্দেশ সহজসাধ্য নয়, সে চেষ্টাও আমি করি নি। গ্রন্থ-ব্যবহারে পাঠকের যাতে সহায়তা হয়, একমাত্র সে দিকে লক্ষ রেখে নাম সংকলনে প্রয়াসী হয়েছি। তাই এই নির্দেশিকায় বাস্তবের সঙ্গে কল্পিত, বিশেষের পাশে সাধারণের, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সঙ্গে ভাবগ্রাহ্য বিষয়ের নামও স্থান পেয়েছে। যেমন বাল্মীকি, কালিদাস, মধুসূদন, দুষ্যন্ত, কুন্তী, শিব. লক্ষ্মী, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, মন্দাক্রান্তা, বেদ, উপনিষদ্, জাতক, বৈষ্ণব পদাবলী, বেদান্ত, নাস্তিত্ববাদ ইত্যাদি। তবে গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উক্ত বিভিন্ন নাম যথাসম্ভব সমগ্রভাবে সংকলিত হলেও দ্বিতীয় খণ্ডে রবীন্দ্ররচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম বর্জিত হল। এ ছাড়া দ্বিতীয় খণ্ডে সংকেতে উল্লিখিত 'ব্রাহ্মধর্ম', 'নবরত্নমালা', 'হেবরলিনের কাব্যসংগ্রহ' ইত্যাদি গ্রন্থনামও বর্জিত হল। কিন্তু উক্ত গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে যেখানে কোনো আলোচনা করা হয়েছে সেগুলির পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লিখিত হল। যে নামশব্দগুলি বর্জিত হল সেগুলির জন্য এই নির্দেশিকার সহায়তা অত্যাবশ্যক নয়। কেননা সেগুলি পাঠকসাধারণের পক্ষে যথাসম্ভব সহজব্যবহার্য করে উপাদান-সংগ্রহ বিভাগেই সাজানো আছে।

এই নির্দেশিকায় গ্রন্থের নামগুলি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনমতো পাশে পাশে গ্রন্থকারের নাম উল্লিখিত হয়েছে। রবীন্দ্ররচিত গ্রন্থের সঙ্গে গ্রন্থোক্ত বিভিন্ন প্রবন্ধের নাম ও পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হল।

সংশোধন

সতর্কতা সত্ত্বেও গ্রন্থমধ্যে কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। তার মধ্যে যেগুলিকে অপেক্ষাকৃত গুরুতর বলে মনে হয়েছে সেগুলিকে নীচে পৃষ্ঠা ও পঙ্‌ক্তি-ক্রমে তালিকা-আকারে সাজিয়ে দেওয়া হল।

পৃষ্ঠা ও পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪।২০	'হিন্দুশাস্ত্রম্'	'ব্রাহ্মধর্ম-প্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ'
৪।২৩	Parsee, Chinese	Parseee, Chinese scriptures
৭।২০	'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' (১৩১৮)	'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' (১৩১৯)
১৬।১৬	তবু— তখনকার এই কাব্যরসের বঞ্চিত হইতাম না।	তবু 'তখনকার এই কাব্যরসের বঞ্চিত হইতাম না'।
৬৯।১৮	'হিন্দুশাস্ত্রম্'	'ব্রাহ্মধর্ম প্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ'
৮৬।২	'শান্তিনিকেতন' ২, তপোবন	'শান্তিনিকেতন' ১, তপোবন
১২১।৬	'শব্দতত্ত্ব'	'বাংলা শব্দতত্ত্ব'
১৩২।১৯	ভক্ত	ভণ্ড
১৩২।২২	সুখের মতন	মুখের মতন
১৫৮।২৬	একটি শ্লোকে (৩।৩৫)	একটি শ্লোকে (৩।২৫)
২৪১।২১	মোট ৩১টি নাটকের	মোট ১৩টি নাটকের
২৪৪	পৃষ্ঠার পর ৬টি পৃষ্ঠার পৃষ্ঠাঙ্ক	১৪৫ ১৫০ এর স্থলে ২৪৫-২৫০ হবে।
২৮৩।১০	ইত্যাদি শ্লোকটি (৫১৩)	ইত্যাদি শ্লোকটি (৫।১৩)
২৯৮।২৪	'শব্দতত্ত্ব'	'বাংলা শব্দতত্ত্ব'
৩২৫।১৫	যদি স্তবস্ত	যদি বা স্তবস্ত
৪১৬।৭	'Creative Unity (1759)	'Creative Unity' (1959)
৪৩৭-৪৪১	(শিরোনাম) উপাদান-সংগ্রহ বিভাগ	উপাদান-সংগ্রহ বিভাগ : মুখবন্ধ
৪৩৮।১০	ধর্মাধার মহাস্থবির	ধর্মরাজ বড়ুয়া
৪৮০।২৭	ততো ··রতাঃ ॥ ৪।৪।১১	ততো···রতাঃ ॥ ৪।৪।১০
৫১৫।১৯	পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ	পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ
৫২৫	(শিরোনাম) বুদ্ধ-বন্ধনা	বুদ্ধ-বন্দনা